বিভূতি-রচনাবলী

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তৃতীয় খণ্ড



মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ, ১২ই আশ্বিন ১৩৬১ (২২০০)

পঞ্চম মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২ (২২০০)

উপদেষ্টা পরিষদ :

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রী কালিদাস রায়

ডঃ সুকুমার সেন

শ্রী প্রমথনাথ বিশী

শ্রী জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক :

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

শ্রী চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় : শ্রী তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীঅশোককুমার ঘোষ কর্তৃক নিউ শশী প্রেস, ১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত

॥ সূচীপত্র ॥

ভূমিকা

একসময় বটতলা, বঙ্গবাসী এবং বসুমতী প্রকাশিত 'গ্রন্থাবলী' পুরাতন এবং নূতন বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকসমাজ সৃষ্টি করে বাঙ্গালা সাহিত্যের অশেষ উপকার সাধন করেছিল। বটতলা, বঙ্গবাসী, বসুমতীর প্রবর্তিত রীতি অনুসরণ করে এ-যুগের একাধিক প্রকাশক লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের 'রচনাবলী' প্রকাশ করছেন। যে-লেখক পরলোকগত এবং যাঁর নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, তেমন লেখকের রচনাবলী একত্র সংকলিত হওয়ার বিশেষ তাৎপর্য আছে। খণ্ড এবং বিচ্ছিন্ন রচনার মধ্যে লেখকের সমগ্র পরিচয় আচ্ছন্ন অথবা তার অংশমাত্র আভাসিত। 'রচনাবলী'-তে পাই লেখকের সমগ্র পরিচয়—তাঁর সৃষ্টির ব্যাপকতা, বিপুলতা এবং বৈচিত্র্য। আবার, 'রচনাবলী'-তে বিভিন্ন সময়ে রচিত বিচ্ছিন্ন রচনাগুলি কালপারম্পর্য অনুসারে বিন্যস্ত হওয়ায় লেখকের শিল্পরীতি এবং মানসপ্রবণতার বিবর্তন-ধারাও স্পষ্টভাবে এবং সমগ্রভাবে দেখতে পাই। এক কথায়, 'রচনাবলী'-তে একসঙ্গে দেখি, লেখকের সৃষ্টিশক্তির উন্মেষ থেকে পরিণতি, পূর্ব দিগন্ত থেকে পশ্চিম দিগন্ত। এই সমগ্রতার, ব্যাপকতার এবং বৈচিত্র্যের স্বাদই 'রচনাবলী'-র স্বাদ। 'বিভূতি রচনাবলী'-র প্রকাশ তাই বাঙ্গালা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে মনে করি।

কয়েক বছর আগে 'বিভূতি-বিচিত্রা' নামক সংকলন-গ্রন্থে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলীর বৈচিত্র্যের আভাস আংশিকভাবে পাওয়া গিয়েছিল। স্বল্পকালের মধ্যে 'বিভূতি-বিচিত্রা' নিঃশেষিত হওয়ায় বাঙালী পাঠকের হৃদয়ে বিভূতিভূষণের রচনা কি রকম স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত তার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। সেই সঙ্গে একথাও জানা গিয়েছিল, 'পথের পাঁচালী' এবং 'অপরাজিত' ছাড়াও বিভূতিভূষণের অপ্রধান এবং অপেক্ষাকৃত অল্পখ্যাত রচনাগুলি এমন কি তাঁর 'দিনলিপি' ও 'পত্রসাহিত্য'-এর প্রতিও সাধারণ বাঙালী পাঠকের আগ্রহ অপরিসীম। কিছুদিন আগে 'পথের পাঁচালী'-র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল এবং মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে এই অনুবাদ প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণাকে অসত্য প্রমাণিত করেছে। এখনও পর্যন্ত আমাদের বিশ্বাস, 'পথের পাঁচালী' দাঁড়িয়ে আছে বাঙালীয়ানার জোরে। বইখানি এমন অস্বাভাবিক রকমে বাঙালী-জীবনে নিষিক্ত যে বিদেশীর পক্ষে এর মর্মে প্রবেশ করা সাধ্যাতীত। তদুপরি আছে, 'পথের পাঁচালী'-র প্রকরণগত ত্রুটি-দুর্বলতা এবং আখ্যানাংশের ধীর-মন্থর গতি, যা গতিহীনতারই মত। তথাপি 'পথের পাঁচালী'-র রসে বিদেশী পাঠকের মন যে নিমজ্জিত হতে পেরেছে তাতেই বুঝি, সাহিত্যে 'ফর্মে'র' চেয়ে বক্তব্যটাই বেশি মূল্যবান। একথাও বুঝি, 'পথের পাঁচালী'-র বাইরের সাজটাই দেশী, এর ভিতরের সত্যটি সর্বদেশের। স্বীকার করি, সাধারণ পাঠকের 'রায়' সাহিত্য বিচারের চরম মানদণ্ড হিসাবে গ্রাহ্য নয়। কিন্তু সাহিত্য জিনিসটা যখন লেখক এবং পাঠকের সহযোগিতায় সৃষ্টি তখন পাঠকের 'রায়' একেবারে উপেক্ষণীয়ও নয়। এবং একথা অবশ্য জানা দরকার, রচনার কোন্ শক্তিতে বিভূতিভূষণ দেশী-বিদেশীর চিত্তকে এমনভাবে জয় করতে পেরেছেন।

বিভূতিভূষণ এমন একটি যুগের লোক যে-যুগ কালপরিমাপে বর্তমান যুগ থেকে বেশি দূরবর্তী না হয়েও ভাবের দিক থেকে বহু দূরের, প্রায় বিস্মৃত অতীতের। তাঁর সাহিত্যের বাণীও যেন ধ্যানলোক থেকে উৎসারিত অপরূপ অলোকিকতামণ্ডিত কোনো এক অজ্ঞাত

কালের বাণী। অজ্ঞাত কালের ধ্যানলব্ধ বাণী যে স্থান এবং কালের ব্যবধান মুছে ফেলে বর্তমান কালের শ্রোতার চিত্তরঞ্জন করছে তাতেই বুঝি সে-বাণীতে এমন কিছু আছে যা চিরন্তন। আধুনিক মানুষ পুরাতন মানুষ থেকে যতই পৃথক হক, চিরন্তন মানুষ থেকে পৃথক নয়। আধুনিক মানুষের মধ্যে যে চিরন্তন মানুষ, বিভূতিভূষণের রচনার আবেদন অবশ্যই সেই চিরন্তন মানুষের কাছে পৌঁচেছে।

॥ ২ ॥

'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'বইখানা দাঁড়িয়ে আছে আপন সত্যের জোরে। এই সত্যের জোর কি রবীন্দ্রনাথ তা স্পষ্ট করে বলেন নি। এই সত্য কি বিষয়ের সত্য না প্রকাশের সত্য? সম্ভবত উভয়ই। অনুমান করি, এই সত্য সহৃদয়তার, অকৃত্রিমতার এবং আন্তরিকতার। একথা শুধু 'পথের পাঁচালী' সম্পর্কে নয়, বিভূতিভূষণের সমগ্র রচনাবলী সম্পর্কে বলা চলে যে, তাঁর রচনায় ঘটনা-বিন্যাসে পারিপাট্য নেই, আখ্যানের চমৎকারিত্ব নেই, চরিত্র-চিত্রণে অসাধারণত্ব নেই। প্রকরণগত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি অমনোযোগী, এমন কি ভাষা-ব্যবহারেও অসতর্ক। তাঁর রচনাবলী দাঁড়িয়ে আছে সহৃদয়তা, আন্তরিকতা এবং অকৃত্রিমতার জোরে। তিনি সুর চড়ান নি, রং লেপেন নি, সাজিয়ে-বাজিয়ে বলেন নি, চোখে আঙুল দিয়ে দেখান নি। তিনি দেশহিতের বাণী প্রচার করেন নি, ইতিহাসের গহ্বরে প্রবেশ করেন নি, প্রেমের জটিলতা সৃষ্টি করেন নি। আড়ম্বর এবং ছলাকলার কৌশল তাঁর অনায়ত্ত। এ-সবই বিভূতি-সাহিত্যের প্রকাশ-রীতির বৈশিষ্ট্য, বিষয়ের বৈশিষ্ট্য নয়, বিষয়ীরও নয়। কিন্তু প্রকাশ-রীতির এই বিশিষ্টতার মূলে আছে শিল্পীর জীবন এবং শিল্পসাধনার এক গভীর সত্য-উপলব্ধি। এই সত্যোপলব্ধি বিভূতিভূষণের জীবন এবং সাহিত্যে সহজের সুর বেঁধেছে। তারই ফলে বিভূতি-সাহিত্যে চেনা জগতের নূতন ব্যঞ্জনা, অকিঞ্চিৎকরের অপরূপ মহিমা। বিভূতিভূষণের জীবন এবং শিল্প দুইই এই সত্যোপলব্ধির সূত্রে গ্রথিত; তাঁর জীবনের উপলব্ধ সত্য তাঁর সাহিত্যেরও সত্য। তাই বিভূতিভূষণের জীবন এবং সাহিত্য পরস্পরের পরিপূরক, একটি আর একটির ভাষ্য। সেদিক থেকে তিনি গীতিকবি। তাঁর জীবন তাঁর সাহিত্যের কেবলমাত্র পটভূমি নয়, তাঁর সাহিত্য-হর্ম্যের চাবিকাঠি আছে তাঁর জীবনে। তাঁর জীবনের আলো ফেললে তাঁর সাহিত্যে নূতন ব্যঞ্জনা জেগে উঠে।

॥ ৩ ॥

বিভূতিভূষণের জীবন এবং সাহিত্যের মূল সত্যোপলব্ধিকে সহজ ভাষায় বলতে পারি, প্রত্যক্ষ বাস্তব জগতের অতীত এক অতীন্দ্রিয় ভাবলোকের অস্তিত্ব-বোধ। বিভূতিভূষণ নিজে এই উপলব্ধির নাম দিয়েছিলেন ভাব-জীবন। একটি দিনলিপিতে এই ভাবজীবনের ইতিহাস অনুসন্ধান করে তিনি লিখেছেন, 'মনে হোল বহুকাল আগে শৈশবে হরি ঠাকুরদাদা সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়ীর দরজা থেকে চাল চেয়ে না পেয়ে মলিন মুখে ফিরে গিয়েচেন—সেই দিনটিতেই আমার ভাব-জীবনের বোধহয় আরম্ভ।' ('তৃণাঙ্কুর', পৃ. ৫০-৫১)। মানুষের প্রতি দুঃখবোধে এই ভাব-জীবনের উদ্বোধন, আনন্দময় চৈতন্যে এর পরিণতি। তাই বিভূতিভূষণের ভাবলোককে বলতে পারি, আনন্দময় ভাবলোক। বিভূতিভূষণের বিশ্বাস, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, জন্ম-মৃত্যু, দারিদ্র্য-মালিন্য নিয়ে যে জীবন-প্রবাহ তার অন্তরালের জীবনের আনন্দধারা নিত্য প্রবহমাণ।...'আমরা জীবনে এমন একটা জিনিস পেয়েচি, যা আমাদের এক মুহূর্তে সাংসারিক শান্তি-দ্বন্দ্বের ওপরে এক শাশ্বত আনন্দ-জীবনের স্তরে

উঠিয়ে দিতে পারে··· ।' ('তৃণাঙ্কুর', পৃ. ৪)। রবীন্দ্রনাথের কথার প্রতিধ্বনি শুনি এর মধ্যে। হয়ত তাই-ই। 'শাশ্বত আনন্দ-জীবন' হয়ত তত্ত্বরূপেই প্রথমে বিভূতিভূষণের কাছে প্রতিভাত হয়েছিল। কিন্তু যখন তাঁর নিজের মুখে শুনি—'সন্ধ্যা হয়ে গেল, আমি ছাদে নীরব সান্ধ্য আকাশের তলে প্রতিদিনের মত পায়চারী কর্তে লাগলাম—মনে এক অতীন্দ্রিয় আনন্দবোধ, সে আনন্দের তুলনা হয় না—ভেবে দেখলাম এই আনন্দেই জীবনের সার্থকতা। কিসে থেকে তা আসে সে কথা বিচারে কোনো সার্থকতা নেই আদৌ,—আনন্দ যে এসেচে, সেইটাই বড় কথা ও পরম সত্য।' ('তৃণাঙ্কুর', পৃ. ৫১)। তখন বুঝি, দর্শনের পরিভাষায় যে-তত্ত্বের ব্যাখ্যা দেওয়া চলে, উপনিষদের মন্ত্রে যে তত্ত্বের সমর্থন মেলে তা বিভূতিভূষণের চিত্তে অনির্বচনীয় উপলব্ধি। এ-উপলব্ধির বুদ্ধিগম্য অর্থ নেই, সত্য-মিথ্যা বিচার নেই। 'আমার সে কল্পনা সত্য কি মিথ্যা সে বিচারের কোনো প্রয়োজন নেই, আমার দৃষ্টিতে আমি যা দেখেচি, আমার কাছে সেটা মহাসত্য—revelation, চিন্তা ও কল্পনার আলোকে যা দেখা যায়—তাকে আমি মিথ্যা বলে ভাবতে পারি না।' ('তৃণাঙ্কুর' পৃ. ৩৩)। চেতনার পটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ-উপলব্ধি উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে—'আসল আনন্দকে জোর করে মনকে বুঝিয়ে, তর্ক করে আনতে হয় না—সে সহজ অর্থাৎ Spontaneous ('তৃণাঙ্কুর', পৃ. ৫২)। বিভূতিভূষণের চিত্তে ক্ষণে ক্ষণে আনন্দময় ভাবলোকের বার্তা এসে পেঁছালেও তিনি অরূপ জগতের mystic কবি নন। বাস্তব লোকের সুখ-দুঃখের হাসি-কান্নার জগৎ প্রবল শক্তিতে তাঁকে আকর্ষণ করেছে। তাঁর ভাবলোক বাস্তবলোককে অঙ্গীকার করে, বাস্তবলোককে অগ্রাহ্য করে, সে ভাবলোক অস্তিত্ব-হীন। তাই 'সেই শুধ চিন্ময় ভাবলোক যাঁর সন্ধান মেলে নদীতীরে নেমে আসা অপরাহ্নের নির্জনতায়, বনের ঝোপে ফোটা বনকলমীফুলের উদাস শোভায়, আঁধার নিশীথে মাথার উপরকার জ্বলজ্বলে নক্ষত্র ছিটানো ছায়াপথের বিরাট ইঙ্গিতে। যে জীবন-রহস্যের মূল উর্ধ্বাকাশে, শাখা-প্রশাখা ধরণীর ধূলিতলে।' ('অরণ্য মর্মর', পৃ. ২৩)।

॥ ৪ ॥

ধরণীর বাস্তবলোক এবং চিন্ময় ভাবলোকের সম্মিলনে বিভূতিভূষণের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক রচনাবলীর সৃষ্টি। বিভূতিভূষণের সার্থকতম সৃষ্টি অপু অর্ধেক বাস্তবলোকের, অর্ধেক ভাবলোকের। বাড়ীর দালানের জানালা থেকে দেখা অশ্বত্থ গাছের মাথা, উদার নীল রঙের আকাশ, নীলুদের তালগাছের মাথা, দূরে আকাশের গায়ে উড্ডীয়মান চিল, শৈশবেই অপুর মনে ভাবলোকের আবরণ উন্মোচন করে দিয়েছিল। শিশু অপুর ভাবলোক বহুলাংশে স্বপ্নলোক। রহস্যময় প্রকৃতি, অনতিক্রমণীয় দূরত্ব, অপরিচিতের আকর্ষণ ও বিস্ময় দিয়ে গড়া যে স্বপ্নলোক—অপুর কাছে তা নিশ্চিন্দিপুরের মত সত্য, হয়ত অধিক সত্য। কিন্তু প্রকৃতির সাহচর্যে এক আনন্দময় অনুভূতির স্পন্দন শৈশবেই অপু অনুভব করেছিল। 'বর্ষাসিতেজ, ঘন সবুজ ঝোপের মাথায় নাটা-কাঁটার সুগন্ধ ফুলের হলুদ রংএর শীষ, আসন্ন সূর্যাস্তের ছায়ায় ছোট ময়না-কাঁটা ডালের আগায় কাঠবিড়ালীর লঘুগতি আসা যাওয়া, পত্রপুষ্পফলের সে প্রাচুর্য, সবাকার অপেক্ষা যখন ঘনবনের প্রান্তবর্তী, ঝোপঝাপের সঙ্গীহীন বাঁকা ডালে বনের কোলে অজানা পাখী বসিয়া থাকে, তখন তাহার মনের বিচিত্র, অপূর্ব, গভীর আনন্দরসের বর্ণনা সে মুখে বলিয়া কাহাকেও বুঝাইতে পারে না।' ('পথের পাঁচালী', পৃ. ১৩৮)। 'অপরাজিত'-এর অপুও বিভূতিভূষণের মত বিশ্বাস করে, 'যে-জীবন যে-জগৎকে আমরা প্রতিদিনের কাজকর্মে হাটে-ঘাটে হাতের কাছে পাইতেছি জীবন

তাহা নয়, এই কর্মব্যস্ত অগভীর একঘেয়ে জীবনের পিছনে একটি সুন্দর পরিপূর্ণ, আনন্দভরা সৌম্যজীবন লুকানো আছে—সে এক শাশ্বত রহস্যভরা গহন গভীর জীবন-মন্দাকিনী, যাহার গতি কল্প হইতে কল্পান্তরে ; দুঃখকে তাহা করিয়াছে অমৃতত্বের পাথেয়, অশ্রুকে করিয়াছে অনন্ত জীবনের উৎসধারা…' ('অপরাজিত', পৃ. ৩০৭)।

॥ ৫ ॥

বিভূতি-রচনাবলীতে বাস্তবলোকের উপাদান, বিভূতিভূষণের অভিজ্ঞতার জগৎ, চোখে দেখা পরিচিত জগৎ। ভাবলোকের উপাদান তিনটি—প্রকৃতি, শিশু ও স্বপ্ন। বিভূতিভূষণের জীবনেও বটে, সাহিত্যেও বটে—প্রকৃতি ভাবলোকের উদ্বোধক। শিশুর জগতের প্রায় অধিকাংশই ভাবলোকের ; তাই বিভূতিভূষণেব সৃষ্ট সব চরিত্রই অল্পবিস্তর শিশুভাবাপন্ন। 'অপরাজিত'-এর অপু, হরিহর, সর্বজয়া, কেদার, শরৎ সকলেই বয়সের মাপে শিশুর চেয়ে বড়ো, মনের মাপে শিশুর সমবয়সী। তথাপি এরা বেমানান সৃষ্টিছাড়া নয়। কারণ, সব মানুষের মধ্যেই একটি শিশু আছে। যার মধ্যে নেই সে হয় অতি-মানুষ কিম্বা অ-মানুষ। এই দুই কোটির মানুষ বিভূতি-সাহিত্যে নেই। স্বপ্নকে ভাষান্তরে বলতে পারি রোম্যান্টিসিজম্। মানুষের ডানা নেই, স্বপ্ন আছে। স্বপ্নহীন মানুষও জগতে বিরল নয়, বিভূতি-সাহিত্যে বিরল। প্রকৃতি-শিশু-স্বপ্ন—এই তিন উপাদানে বিভূতিভূষণ বাস্তবলোকের চেনামানুষকে দেখিয়েছেন নূতন আর এক dimension-এ। তিনি সৃষ্টি করেছেন এক শ্রেণীর নরনারী যার বাস্তবজীবনের দারিদ্র্য-শ্রীহীনতার গভীরে আনন্দরসের ফল্গুধারা আবিষ্কার করে, যারা ভাবলোক থেকে আনন্দের স্ফুলিঙ্গ সংগ্রহ করে বাস্তবলোকের নিরানন্দের অন্ধকার বিদূরিত করে। এমন বস্তু, এমন ঘটনা তাদের আনন্দদায়ক, সাধারণ ব্যবহারিক মানুষের কাছে যা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ। বিভূতি-সাহিত্য অকিঞ্চিৎকরতার স্বর্গ। এই বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখে 'পথের পাঁচালী'র একজন সমালোচক বলেছেন, 'The book catches the rhythm of the ordinary.'

বাস্তবলোক এবং ভাবলোককে যথার্থরূপে উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যে মেলানোতেই উপন্যাসের সার্থকতা। 'পথের পাঁচালী'-তে বিভূতিভূষণ তা পেরেছেন, 'অপরাজিত'-তে পারেন নি। 'পথের পাঁচালী'-র শিশু অপুর জীবনে বাস্তবলোক ও ভাবলোকের সীমানা চোখে পড়ে না। নিশ্চিন্দিপুরের অপু এবং স্বপ্নলোকের অপু-র মধ্যে বিরোধ তো নেই-ই, পরন্তু স্বপ্নলোকের অপুকে বাদ দিলে নিশ্চিন্দিপুরের অপুর অনেকখানি বাদ পড়ে। যে অপু ভাগ্যবিড়ম্বিত কর্ণের দুঃখে চোখের জল ঢেকে রাখতে পারে না, শ্রুতিলিখনের 'প্রস্রবণ-গিরি' যার মনের মধ্যে রোমাঞ্চ আনে, গ্রামের সবুজ বনরেখার উপর ঝুঁকে পড়া নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে যার মন-কেমন করে, মুচকুন্দ-চাঁপার গন্ধ যার 'ক্লান্ত দেহমনকে খেলাধূলার অতীত ক্ষণগুলির জন্য বিরহাতুর' করে তোলে—সে-অপু যেমন সত্য, দুর্গার ভাই, রাণু-পটু-ন্যাড়ার খেলার সঙ্গী অপুও তেমনি সত্য। স্বপ্নলোকের অপু ও বাস্তবলোকের অপুকে নিয়ে যথার্থ অপু। 'অপরাজিত'-এর অপুর ভাবলোক ঐশী প্রেরণার মত ক্ষণে ক্ষণে অপুকে এক অনির্বচনীয় আনন্দলোকে নিয়ে যায়, কিন্তু অপু তার জীবনে আনন্দলোককে বাস্তবলোকের সঙ্গে মেলাতে পারে নি।

॥ ৬ ॥

মানুষের জীবন বিসর্পিতগতি পথের মত। পথের শেষ মানুষের দৃষ্টির অগোচরে। মানুষ জানে পথের বাঁকের খবর। এক বাঁকের শেষে আর এক বাঁকের পথের চেহারা তার জানা

নেই। পথ অতিক্রম করেই সে পথের খবর জানে। জীবন-পথ কখনও দুর্গম, কখনও সুগম। পথপার্শ্ব কখনও প্রতিকূল, কখনও অনুকূল। পথিকবন্ধু কখনও সজ্জন কখনও দুর্জন। পথের দেবতা মানব-ভাগ্যবিধাতা ; তাঁর ইঙ্গিতে মানুষ পথ চলে। এই রূপকটি 'পথের পাঁচালী'-র লেখকের মনে ছিল, এবং সেই অনুসারে তিনি বই-এর নামকরণও করেছিলেন। 'পথের পাঁচালী'-তে যে-পথের শুরু সেই একই পথ 'পথের পাঁচালী' পেরিয়ে 'অপরাজিত'-তে এসে পড়েছে। 'অপরাজিত'-তে পথের চেহারার পরিবর্তন হয়েছে, পুরাতন পথিক বিদায় নিয়েছে, নূতন পথিক এসেছে। কিন্তু পথ এগিয়ে চলেছে, এবং পথ অনুসরণ করে এগিয়ে চলেছে পরে প্রধান পথিক অপু। 'পথের পাঁচালী' এবং 'অপরাজিত' অপুর জীবন-পথ অতিক্রমণের কাহিনী। সুতরাং বই দুখানি হলেও, একখানি আর একখানির পরিপূরক। একখানিকে বাদ দিলে সমগ্র পথের খবর পাওয়া যায় না, অনেক পথিককে চেনা শক্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং ব্যবহারিক প্রয়োজনে 'পথের পাঁচালী'-র পালা-ভাগ করা হয়েছে। 'পথের পাঁচালী' প্রথম পালা, 'অপরাজিত' দ্বিতীয় পালা।

দ্বিতীয় পালা 'অপরাজিত'-তে অপু-জীবনের উত্তর খণ্ড। এ-জীবনের শুরু জীবন-পথের আর একটি বাঁকে। রায়চৌধুরী বাড়ী থেকে নিষ্ক্রমণ এবং মনসাপোতায় পদার্পণ—অপুর জীবন-পথের এই বাঁকটিতে পাঁচালীর প্রথম পালার সমাপ্তি এবং দ্বিতীয় পালার শুরু। লেখকের মতে কাহিনীর এই বিন্দুটিই পথের সবচেয়ে বড় বাঁক। 'পথের পাঁচালী'র শেষে 'জানার গণ্ডী এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশে' যাত্রাকালে পথের দেবতা অপুর ললাটে 'আনন্দ যাত্রার অদৃশ্য তিলক' পরিয়ে দিয়েছেন।

পালা-ভাগের যথার্থতায় সংশয় জাগে। ভবতারণ চক্রবর্তীর আমন্ত্রণে মনসাপোতায় যাত্রা অপু-জীবনের একটি বড় ঘটনা বলে মনে করতে পারি না। একথা ঠিক, মনসাপোতায় সর্বজয়ার মৃত্যু এবং সেখানেই অপুর দাম্পত্য-জীবনের শুরু। কিন্তু মনসাপোতায় অপু স্থায়ীভাবে বেশি দিন বাস করে নি। মনসাপোতায় যাজনবৃত্তিতে অপুর—বিশেষ করে সর্বজয়ার—জীবন-সমস্যার যে একটি সহজ সমাধানের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল অপু তাকে সমাধান বলে স্বীকার করতে পারে নি। এমন কি শেষ পর্যন্ত মনসাপোতা ছেড়ে নিশ্চিন্দিপুরে গিয়ে বাস করার কথাও দু-একবার সর্বজয়ার মনে উঁকি দিয়েছে। মনসাপোতার মানুষ-প্রকৃতি-পরিবেশের সঙ্গে অপু-সর্বজয়ার সংযোগ ক্ষীণ, নেই বললেও চলে। সেখান থেকে অপু জীবনের কোনো নূতন সম্পদ আহরণ করে নি। জীবন-যাত্রাপথে মনসাপোতা একটি সাময়িক আশ্রয়, যেমন সাময়িক আশ্রয় ছিল চৌধুরীবাড়ী (সাময়িক আশ্রয় হলেও চৌধুরীবাড়ীর জীবন নানা কারণে মূল্যবান ; একটি কারণ, লীলাকে এই বাড়ী থেকেই পাওয়া গিয়েছিল)। একটি সাময়িক আশ্রয় থেকে আর একটি সাময়িক আশ্রয়ে যাওয়ার ঘটনাকে জীবন-পথের একটি বড় বাঁক বলতে পারি না। মনসাপোতা-আড়বোয়ালের মাইনর স্কুল—দেওয়ানপুরের মডেল ইন্‌স্টিটিউশান্‌ অর্থাৎ রায়চৌধুরী বাড়ী ত্যাগ এবং কলকাতায় আগমন অপুর জীবন-পথের এই বাঁকটি ক্ষুদ্র, দূরত্বেও বটে, গুরুত্বেও বটে। অথচ এই ক্ষুদ্র গুরুত্বহীন বাঁকটি অতিক্রমণের প্রাক্কালে পথের দেবতা মহাসমারোহে অপুর কপালে তিলক এঁকে দিয়েছেন এবং লেখকও এইখানেই তাঁর প্রথম পালা সমাপ্ত করেছেন।

প্রথম পালার যথার্থ সমাপ্তি নিশ্চিন্দিপুরের কাহিনীর সমাপ্তিতে। 'অক্রূর সংবাদ' দ্বিতীয় পালার বস্তু। নিশ্চিন্দিপুরের পরিচিত পরিবেশ-পরিজনের স্নেহচ্ছায়ার বাইরে অপরিচিত বৃহত্তর জগতে প্রথম পদক্ষেপই অপুর জীবনের বৃহত্তম পদক্ষেপ। এর পরে পথের দেবতার ইঙ্গিতে সে এক অপরিচিত জগৎ থেকে আর এক অপরিচিত জগতে পদক্ষেপ করেছে।

পদক্ষেপ তেমন গুরুতর নয়। পরিচিত জগৎ থেকে অপরিচিত জগতে যাওয়া শক্ত, অপরিচিত জগৎ থেকে আর এক অপরিচিত জগতে যাওয়া শক্ত নয়। অপুর একমাত্র পরিচিত ভূখণ্ড নিশ্চিন্দিপুর, দীর্ঘকাল বসবাসেও কলকাতা পরিচিত হয় নি। তাই উত্তর জীবনে বাল্যের নিশ্চিন্দিপুরকেই সে সর্বত্র অন্বেষণ করে বেড়িয়েছে। 'অপরাজিত'-এর উপর নিশ্চিন্দিপুরের স্মৃতি ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। একদিকে নিশ্চিন্দিপুরের বাল্য জীবন, আর একদিকে সমগ্র উত্তর জীবন—এই দুটি জীবনের গুরুত্ব সমান সমান। সে-বিচারে নিশ্চিন্দিপুর ত্যাগ অপুর জীবন-পথের মধ্যপথ। পাঁচালীর প্রথম পালা এখানে শেষ হয়ে পথের দেবতার তিলক এখানেই অপুর ললাটে কেন আঁকা হল না, বোঝা শক্ত।

অনুমান করি, অপুর জীবন-পথের সমগ্রতা লেখকেরও দৃষ্টির অগোচরে ছিল। সাধারণের মত তিনিও পথের খণ্ডাংশই শুধু দেখেছেন। 'অপরাজিত'-তে খণ্ড-ভাগ নেই, কিন্তু 'পথের পাঁচালী'র তিনটি খণ্ড। পথকে যখন লেখক তিনটি খণ্ডে ভাগ করে দেখাতে চান তখন আমরা আশা করব, তিনটি খণ্ডে পথের একাংশের অখণ্ডরূপ উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠবে, তিনটি খণ্ডের লক্ষ্য একমুখী হবে। আগেই বলেছি তৃতীয় খণ্ড 'অক্রুর সংবাদ' আসলে 'অপরাজিত'-র সামগ্রী। দ্বিতীয় খণ্ড—সর্বাপেক্ষা বৃহৎ খণ্ড—যথার্থ 'পথের পাঁচালী'। এই পথে অপুর প্রধান সঙ্গী—দুর্গা এবং নিশ্চিন্দিপুর। দুর্গার পথ অল্পদূরে গিয়ে শেষ হয়ে গিয়েছে, নিশ্চিন্দিপুর শেষ হয়েছে আরও কিছু পরে। কিন্তু প্রথম খণ্ড 'বল্লালী-বালাই'-র সঙ্গে অপুর পথের সম্পর্ক কি? সে-কাহিনী শাখাপথের কাহিনী, ইন্দির ঠাকরুণের কাহিনী। মূলপথ থেকে বেশি দূরে বেঁকে না গেলে শাখাপথও অবান্তর নয়। কিন্তু 'বল্লালী-বালাই'-র শাখাপথ মূলপথ থেকে অনেক দূর বেঁকে গিয়েছে এবং পুনর্বার বাঁক ঘুরে মূলপথের সঙ্গে যুক্ত হয় নি। গয়ায় পিণ্ডদান দেওয়ার সময় ছাড়া উত্তর জীবনে ইন্দির ঠাকরুণের কথা অপু দ্বিতীয়বার স্মরণ করে নি। এতেই মনে হয়, 'পথের পাঁচালী'র পালা-ভাগ, খণ্ড-ভাগ কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে হয় নি। অপুর সঙ্গে লেখকও পথ চলেছেন, পথপার্শ্বের যে-দৃশ্য তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, তিনি সেই দৃশ্য দেখবার জন্য ছুটেছেন। বাঁক থেকে বাঁকান্তরে ঘুরে ঘুরে যে-পথ এগিয়ে গিয়েছে সে-পথের সম্পূর্ণ চেহারা তাঁর মনে ছিল না।

॥ ৭ ॥

'পথের পাঁচালী'র সঙ্গে তুলনায় 'অপরাজিত' নিষ্প্রভ। 'পথের পাঁচালী'তে লেখক অপুকে সৃষ্টি করেছেন। লেখককে এই সৃষ্টির কাজে সাহায্য করেছে দুর্গা-সর্বজয়া-রাণু-পটু এবং নিশ্চিন্দিপুর। 'অপরাজিত'-তে লেখক অপুকে সৃষ্টি করেন নি, তিনি তার জীবন-কাহিনীর বিবরণ দিয়েছেন। এ বিবরণে যে কৌশলই থাক, তা সৃষ্টি নয়। এবং সেই কারণে নিশ্চিন্দিপুরের অপুকে 'অপরাজিত'-তে চিনতে পারি না, যেমন ব্রজের গোপীরা মথুরার কৃষ্ণকে চিনতে পারে নি।

'অজানার রোমান্স' নিশ্চিন্দিপুরের অপুকে বিহ্বল করে তুলত, শিশুর পক্ষে তা স্বাভাবিক কিন্তু শৈশবের রোমান্স-তৃষ্ণা, কল্পনা-প্রবণতা যৌবনে স্থির জীবন-সত্যে রূপান্তরিত না হলে বুঝতে হবে শিশুর বয়স বেড়েছে, মন বাড়ে নি। স্পষ্ট জীবন-সত্যের অভাবে অপু চিরশিশু। যৌবনেও সে 'প্রাচীন দিনের জগৎ, অধুনালুপ্ত অতিকায় প্রাণীদল, বিশাল শূন্যের দৃশ্য, অদৃশ্য গ্রহনক্ষত্ররাজি, ফরাসী বিদ্রোহ' প্রভৃতি নানা-স্বপ্নে বিভোর। সত্য আর স্বপ্নের মিশ্রণে জীবন, সত্যকে বাদ দিয়ে জীবন আকাশকুসুম, স্বপ্নকে বাদ দিয়ে সত্য রূঢ়-নিষ্ঠুর। অপু সত্যের সম্মুখীন হতে অক্ষম, সত্যকে পাশ কাটিয়ে স্বপ্নে বিভোর

হওয়াই তার লক্ষ্য। সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তি থাকলে অপু তার নিজের জীবনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যকে স্পষ্টভাবে তার চিন্তায় কর্মে ব্যক্ত করতে পারত। সে কলকাতায় এসেছিল জীবনকে প্রসার করতে। এক বছর কলকাতায় কাটিয়ে অপু বুঝতে পারল তার জীবনের প্রসারতা অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে, জগৎ এবং জীবনকে সে নতুন চোখে দেখতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু 'মনের প্রসারতা' ব্যাপারটি কি এবং কেমন করে অপু তা আয়ত্ত করল আমরা পাঠকরা তা জানি না। 'মনের প্রসারতা' লাভে তার জীবনের গতি এবং লক্ষ্যের কি পরিবর্তন হল, তার প্রমাণও পাই না।

আমরা শুধু দেখি, অপুর নিজের মনের ধোঁয়া তার চলার পথকে আচ্ছন্ন করেছে এবং অস্বচ্ছ আলোকে পথ চলতে গিয়ে পদে পদে সে হোঁচট খেয়েছে, দিগ্‌ভ্রান্ত হয়েছে। যে-আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বলে এবং পদযাত্রা সহজ হয়, সে আলো অপুর মনে পৌঁছয় নি। সে কলেজের ক্লাস পালিয়েছে, বন্ধুদের কাছে নিজের অর্থ ও বংশ গৌরবের মিথ্যা বড়াই করেছে, বাইরের পোশাক এবং বাইরের ঘরের আসবাবপত্র দেখে মানুষের মনুষ্যত্ব বিচার করেছে, অন্ন এবং বাসস্থানের ধাঁধায় ঘোরাঘুরি করে উদ্বৃত্ত সময়ে পড়া-পড়া খেলা করেছে। পঠনীয় বিষয়ের মধ্যে কখনও গ্রীস ও রোমের জীবনযাত্রা প্রণালী, কখনও কীট্‌স, কখনও হল্যান্ড রোজের নেপোলিয়ান, কখনও চাঁদের দেশের পাহাড়শ্রেণী, কখনও বড়লোকের জীবনী। অপুর পঠিত গ্রন্থের তালিকা এবং বিষয়-সূচী দিয়ে লেখক আপন কর্তব্য শেষ করেছেন। কিন্তু পড়াটাই তো আসল নয়। চিন্তা-কর্ম-আদর্শ-জীবনভাবনার উপর অধীত বিদ্যার প্রভাবটাই আসল। সে-বিচারে অধ্যয়ন অপুর খেলার অঙ্গ। শৈশবে সে গুলঞ্চ লতা দিয়ে বাড়ীর উঠোনে টেলিগ্রাফের তার বসাত, যৌবনে সে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়ে—দুটোতে কোনো পার্থক্য নেই, দুটোই খেলা। আমরা দেখি, কলকাতায় যে-ব্যাপারটি সম্পর্কে অপু সর্বাপেক্ষা বেশি সচেতন এবং যে-ব্যাপারটি তাকে সর্বাপেক্ষা বেশি পীড়িত করেছে তা হলো অন্নকষ্ট। ক্ষুধা এবং ক্ষুন্নিবৃত্তির চিন্তা লেখক এবং অপু দুজনকেই বড় বেশি রকম উদ্‌ভ্রান্ত করেছে। 'অপরাজিত' পড়ে অপুর জন্য কষ্ট হয়, অপুর স্রষ্টার জন্য কষ্ট হয়। নিশ্চিন্দিপুরের নীল আকাশের নীচে যে মুগ্ধ বালকটি হেসে-খেলে, নেচে-দুলে বড় হয়েছে, লেখক তাঁকে কলকাতার খাঁচায় ছাতু খাইয়ে হত্যা করেছেন। নিশ্চিন্দিপুরের 'তরুণ গরুড়'কে অসীম সাহসিকতায় লেখক যৌবনে নিয়ে এসেছেন কিন্তু তার উড়বার আকাশ দিতে পারেন নি।

চিন্তা-অধ্যয়ন-জনসংসর্গ—প্রধানত এই তিন উপায়ে মানুষের মনের প্রসারতা আসে, জীবনভাবনা স্পষ্ট হয়। অপুর চিন্তার জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে কোনো জিজ্ঞাসা জাগে নি। সে চিন্তাশীল নয়, ভাবপ্রবণ। অধ্যয়ন তার খেলা। এবং সমগ্র 'অপরাজিত'-র জনতার মধ্যে অপু একটি সজ্জনব্যক্তিরও সাক্ষাৎ পায় নি। এমন কি ক্লাইভ স্ট্রীটের দালাল আবদুল তাকে প্রবঞ্চনা করেছে, ছাত্রী প্রীতি অপমান করেছে, সুরেশদার মা নববর্ষের প্রথম দিনটিতে তাকে না খাইয়ে বিদায় দিয়েছে, চাঁপদানীর স্কুল থেকে সে অসম্মানে বিতাড়িত হয়েছে। কলকাতার অসম্মানের-অভাবের-অনশনের-শ্রীহীনতার দিনগুলি অপুর জীবনের অগ্নিপরীক্ষা। কিন্তু অগ্নিতে জীবনের কোন্ খাদ পুড়ল, কোন্ স্বর্ণ ভাস্বর হয়ে উঠল তা দেখতে পাই না। অগ্নিপরীক্ষার পূর্বেকার এবং পরের অপুর পার্থক্য আমরা দেখতে চাই, কিন্তু দেখতে পাই না। কলকাতা-জীবনের মেঘ অপুর মনের মাটিতে ধারা-বর্ষণ না করেই শরতের মেঘের মত হাওয়ায় উড়ে গেছে।

ছাত্রজীবনের পর শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে তের টাকার ভাড়াতে নীচু একতলা ঘরে অপুর দাম্পত্য জীবন। লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন, 'শতকরা নিরানব্বই জনের বেলা যা হয়,

অপুর বেলাও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। যথা নিয়মে সংসার-যাত্রা, গৃহস্থালী, কেরানীগিরি, ভাড়া বাড়ী···।' অপুও বোঝে জীবনটা কলেপড়া ইঁদুরের মত। 'কোথায় সে নীল আকাশ, মাঠ, আমের বউলের গন্ধভরা জ্যোৎস্নারাত্রি ? পাখী আর ডাকে না, ফুল আর ফোটে না, আকাশ আর সবুজ মাঠের সঙ্গে মেলে না—ঘেঁটুফুলের ঝোপে সদ্য-ফোটা ফুলের তেতো গন্ধ আর বাতাসকে তেতো করে না।' অপুর রোমান্সের স্বপ্ন বিলীনপ্রায়। কিন্তু লেখক বলেন, এই মানসিক দারিদ্র্য ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে অপুর মনে একটা যুদ্ধ চলছে। আমরা কিন্তু যুদ্ধকাহের লক্ষণ দেখি না। আমরা দেখি, অপু সব কিছুকে বিনা প্রতিবাদে, বিনা যুদ্ধে মেনে নিয়ে জীবনকে অভাবনীয়ের হাতে সমর্পণ করে দিয়েছে। সেই অভাবনীয়ের সাক্ষাৎ মেলে অপর্ণার আকস্মিক মৃত্যুতে। অপর্ণার মৃত্যুই অপুকে সাময়িকভাবে বদ্ধ জীবনের দৈন্য থেকে উদ্ধার করেছে। জীবন-যুদ্ধের জয়লাভ থেকে এ মুক্তি আসে নি, এ-মুক্তি দৈবের হাত থেকে পাওয়া।

সর্বজয়ার মৃত্যুতে অপু বন্ধন-মুক্তির আনন্দ অনুভব করেছিল। কিন্তু সে মুক্তি জাগতিক স্নেহ-বন্ধন থেকে মুক্তি নয়, পিছু-টান থেকে মুক্তি। নিশ্চিন্দিপুর থেকে অপু-সর্বজয়ার যে জীবন একসঙ্গে বসে এসেছিল, মনসাপোতায় এসে তা প্রথম পৃথক হল। কলকাতাবাসী অপুর জগৎ এবং সর্বজয়ার জগৎ দুটি পৃথক জগৎ। অপু সর্বজয়ার জগতে ফিরে যেতে পারে না, সর্বজয়াও অপুর জগতের নাগাল পায় না। তাই সর্বজয়ার মৃত্যু প্রকৃতই অপুর বন্ধন-মুক্তি। মাতা-পুত্রের জগতের বৈষম্য থেকে মুক্তি, অতীত থেকে মুক্তি, পিছু-টান থেকে মুক্তি। অপর্ণার মৃত্যুতেও এক বদ্ধ জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে অপু বলে উঠেছে, 'মুক্ত ! মুক্ত ! মুক্ত ! আর কাহাকেও গ্রাহ্য করে না সে ! কথাটা ভাবিতেই সারা দেহ অপূর্ব উল্লাসে শিহরিয়া উঠিল— বাঁধন-ছেঁড়া মুক্তির উল্লাসে ! বহুকাল পর স্বাধীনতার আস্বাদন আজ পাওয়া গেল। ঐ আকাশের ক্রমবিলীয়মান নক্ষত্রটার মতই আজ সে দূর পথের পথিক।' অপুর মুখে মুক্তির এই উল্লাস আকস্মিকও বটে, অস্বাভাবিকও বটে। বৈরাগ্য নয়, আসক্তি-ই অপুর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অপু মিস্টিক নয়, রোমান্টিক। নিশ্চিন্দিপুরের সঙ্গে, রাণু-লীলা-পটুর সঙ্গে তার ভালোলাগার বন্ধন, ভালোবাসার বন্ধন। এ-বন্ধন এমনই প্রবল যে স্থানের দূরত্ব, কালের ব্যবধান সে-বন্ধনকে শিথিল করে নি, প্রবলতর করেছে। এই আসক্তির বন্ধন, ভালোবাসার বন্ধন থেকে মুক্তি, জীবন থেকে মুক্তিরই নামান্তর। সে-মুক্তি তো অপুর জীবনের কাম্য নয়, এই বন্ধন-ই অপুর জীবনের মূলধন। নয়ত তার রোমান্সের স্বপ্ন মিথ্যা। তাছাড়া, অপর্ণার সঙ্গে দাম্পত্য জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সুধায় ভরা ছিল। অপুর বদ্ধ জীবনের মরুভূমির মধ্যে অপর্ণাই ছিল শ্যামশোভা। এই মাধুর্যভরা দাম্পত্য জীবন থেকে উৎসারিত আনন্দ-ই ছিল অপুর জীবন-রস। অপর্ণা তো অপুকে বেঁধে রাখে নি, বাঁচিয়ে রেখেছে। অপুর মৃতপ্রায় জীবনকে অপর্ণা যখন আপন ভালোবাসা দিয়ে বাঁচিয়ে তুলছিল, সে-ভালবাসা অপু দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করেছে। কখনও একথা সে ভাবে নি, পলে পলে তার বন্ধনভীরু মনের গলায় বন্ধনের ফাঁস পড়েছে ; কখনও মনে করে নি, ভালোবাসার প্রাচীর তুলে অপর্ণা তার স্বপ্নজগৎকে দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে গেছে। অপর্ণার মৃত্যুর পরই সে প্রথম আবিষ্কার করল, মুক্তি এবং স্বাধীনতাই তার কাম্য। অপু আর যা-ই হক, 'অতিথি'-র তারাপদ নয়। লেখক অপুকে নিয়ে কি করবেন স্থির করতে না পেরে সহজ উপায়ে অনেক সমস্যার সমাধান করেছেন। অপুর বন্ধন-মুক্তিও সহজ সমাধানের দৃষ্টান্ত।

অপুর মুক্তির সংজ্ঞাও আমাদের কাছে দুর্বোধ্য। আমরা জানি, জীবনানন্দ যার লক্ষ্য সে জীবনকে এড়িয়ে নয়, জীবনকে স্বীকার করেই জীবনানন্দ আস্বাদন করে। কিন্তু

বন্ধনের মধ্যে যে বন্ধন-মুক্তি সে-মুক্তির সংবাদ অপুর জানা নেই। যে বন্ধনকে মেনে নিয়ে বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় জানে না, সে একটি বন্ধন এড়িয়ে আর একটি বন্ধনের ফাঁদে পা দেয়। অপুর নিজের জীবনেই তা ঘটতে দেখেছি। সর্বজয়ার বন্ধন ছিন্ন হতে না হতেই অপর্ণার বন্ধনে সে ধরা পড়েছে। অপর্ণার বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে সে কি আবার কাজলের বন্ধনে ধরা পড়ে নি? দূরে গিয়েও কি সে কাজলের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পেরেছে? মনে হয় না। বন্ধনকে স্বীকার করলে অপুকে ভবঘুরে হওয়ার ভান করতে হত না। মানুষ অপু আদৌ ভবঘুরে নয়, অপুর কল্পনা ভবঘুরে। ভবঘুরের জীবন অনাসক্তের জীবন। অপু তার পরিচিত পরিবেশ-পরিজনের সঙ্গে আসক্তিতে বদ্ধ। এদের বাদ দিয়ে জীবনের কোনো আনন্দই তার কাছে আনন্দ নয়। যে-আনন্দের জীবন সে আবাল্য অন্বেষণ করে ফিরেছে সে-জীবনের সন্ধান তো সে পেয়েছিল নাগপুরের অরণ্যে। 'অপুর এক সম্পূর্ণ নূতন জীবন শুরু হইল এ-দিনটি হইতে। এমন এক জীবন, যাহা সে চিরকাল ভালোবাসিয়াছে, যাহার স্বপ্ন দেখিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কোনোদিন যে হাতের মুঠায় নাগাল পাওয়া যাইবে তাহা ভাবে নাই।' লক্ষ্যে পৌঁছে অপু আবার পরিচিত জীবনের মধ্যে ফিরে এল কেন? নিশ্চিন্দিপুর, কাজল, লীলা, প্রণব, লীলাদি, মনসাপোতা, রাণুদি, রাণী, সতু—এরাই তাকে আবার ফিরিয়ে এনেছে। দূরের স্পর্শ পাওয়ার জন্য, অধরাকে ধরবার উদ্দেশ্যে অপু যেখানেই যাক, পরিচিত নিকটকে ঘিরে তার আনাগোনা চলবে। প্রণবের কাছে অপু নিশ্চিন্দিপুরের কথা বলতে গিয়ে স্বীকার করেছে, 'এখানে বুঝেছি জগতে কত সামান্য জিনিস থেকে কত গভীর আনন্দ আসতে পারে। তুচ্ছ টাকা, তুচ্ছ যশমান। আমার জীবনে এরাই হক অক্ষয়। এত ছায়া, এত ডাঁসা খেজুরের আতা ফুলের সুগন্ধ, এত স্মৃতির আনন্দ আর কোথায় পাব? হাজার বছর কাটিয়ে দিতে পারি এখানে, তবু এ পুরনো হবে না যেন।' তথাপি, ভবঘুরের জীবন কেন? যে-মাটিতে জীবন ধন্য, যে-আনন্দ জীবনে অক্ষয়, সেই মাটি, সেই আনন্দ ফেলে অপরিচিত দূর জগতে কিসের অন্বেষণ? এর উত্তর অপু জানে না, সম্ভবত লেখকও না।

আমি 'অপরাজিত'-র মধ্যে একটা ট্রাজেডি দেখতে পাই। কাছের পরিচিত জগৎকে অবহেলা করে দূরের অপরিচিতের রোমান্স-সন্ধানের ট্রাজেডি। মনসাপোতায় যাজনবৃত্তিতে অপুর মনে সায় ছিল না। তার ধারণা ছিল মনসাপোতায় 'অন্ধকার, দৈন্য, নিভিয়া যাওয়া' আর কলকাতায় 'জীবন, আলো, পুষ্টি, প্রসারতা।' শেষে অপু বুঝেছে 'কত সামান্য জিনিস থেকে কত গভীর আনন্দ আসতে পারে।' লাফালাফি, দৌড়াদৌড়ি, ঘোরাঘুরি করে এই 'গভীর আনন্দ' পাওয়া যায় না। অনেক চোখের জলে, অনেক পীড়নে অপুর এ-শিক্ষা হয়েছে। শিক্ষা যখন হয়েছে তখন সে হতোদ্যম, আশাহত। তাই প্রশান্ত মহাসাগরের ফিজি ও সামোয়া দ্বীপে সে আত্মগোপন করেছে। কিন্তু কাজলকে রেখে গিয়েছে সেই ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ জগতে।

নীরেন্দ্রনাথ রায় প্রশ্ন করেছিলেন, 'জীবনের জটিলতাকে জানিলে তবেই জীবনকে জয় করা সার্থক, যে তাহা জানিল না সে কিসে অপরাজিত?' সঙ্গত প্রশ্ন। নীহাররঞ্জন রায় এই সঙ্গত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নি। উত্তর 'অপরাজিত'-র মধ্যেই আছে। অপু জীবন-যুদ্ধে অপরাজিত—একথা বিভূতিভূষণ এবং নীহারবাবু স্বীকার করলেও নীরেন্দ্রনাথ রায়ের মত আমিও বিশ্বাস করতে পারি না। প্রণবের কাছে লেখা অপুর চিঠিখানি বিজয়ীর চিঠি নয়, সে চিঠির মধ্যে আশাহত ব্যর্থজীবনের দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাই। 'অপরাজিত'-তে জীবন-যুদ্ধ নেই, আছে দারিদ্র্যের পীড়ন। নির্মম দারিদ্র্য অপুকে ভেঙে মুষড়ে দিয়েছে, তার রঙীন স্বপ্নগুলিকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। 'অপরাজিত'-র শেষে যে-অপুকে দেখি—

সে আশাহত, ভগ্নোদ্যম, নির্বাপিত অপু। কিন্তু এখানেই অপরাজিতে'র শেষ নয়। 'অপরাজিত' যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে আর একটি 'তরুণ গরুড়' দুর্দমনীয় কৌতূহলে বড় বড় চোখ মেলে নিশ্চিন্দিপুরের অপুদের পরিত্যক্ত ভিটের উপর দাঁড়িয়ে ঝিকড়ে গাছের ঘন ডালপালার দিকে তাকিয়ে আছে। এক ঝলক হাওয়া পাশের পোড়ো ঢিবিটার দিক থেকে নবাগত শিশুর জন্য অভিনন্দন নিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে ভিটের মালিক ব্রজ চক্রবর্তী, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়, ঠাকুরদাদা হরিহর রায়, ঠাকুরমা সর্বজয়া, পিসিমা দুর্গা—জানা অজানা সমস্ত পূর্বপুরুষ প্রসন্ন হাসিতে শিশুকে অভ্যর্থনা করে বলল—এই তুমি আমাদের হয়ে ফিরে এসেছ, আমাদের সকলের প্রতিনিধি যে আজ তুমি।

অপুর আশাহত জীবন দিয়ে 'অপরাজিত' শেষ হয় নি, শেষ হয়েছে নবাগত শিশুর অভ্যর্থনায়। অপু ফুরিয়ে গেছে কিন্তু তার জীবন থেকে জ্বলে উঠেছে আর একটি জীবন। এতেই অপুর জয়। সে পেরেছে নিজের মুগ্ধ, কল্পনাবিলাসী, ভাববিহ্বল মনকে আর একটি জীবনের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে। কাজল-ই পরাজিত-পরাভূত-নির্বাপিত অপুর জয়পতাকা। অপুর পথের শেষ এইখানে। কিন্তু পথ এগিয়ে চলেছে নবাগত পথিককে নিয়ে। এই নতুন পথচারীকে দেখিয়ে পথের দেবতার উদ্দেশে অপু বলতে পারে—

কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি—
নতুন নামে ডাকবে মোরে,
বাঁধবে নতুন বাহু ডোরে,
আসব যাব চিরদিনের সেই আমি।

॥ ৮ ॥

বৃহৎ সৃষ্টির উদ্বৃত্ত রং-তুলি দিয়ে অমনোযোগে ও অবহেলায় যেন 'কেদার রাজা'-র সৃষ্টি। লেখকের মনোযোগ যেন অন্যত্র; ঘটনার জটিলতায় জড়িয়ে না পড়ে, চরিত্রের গভীরে প্রবেশ না করে কোনোক্রমে গল্পটি দাঁড় করিয়ে দিতে পারলেই যেন তিনি দায়মুক্ত হন। 'কেদার রাজা' যে-অবস্থায় ছাপা হয়েছে সেটা একমেটে। দোমেটে হলেও যে জৌলুস বাড়ত এমন নয়, তবে ভিতরের খড়-কুটো হয়ত ঢাকা পড়ত। বইখানির আদিতে গ্রাম্য জীবনের প্রসন্নতা, মধ্যে নাগর জীবনের বীভৎসতা, অন্ত্যে অতিপ্রাকৃত। দুটি জীবন, একটি ভালো আর একটি মন্দ, সাদা-কালো দুটি রেখার মত সমান্তরাল বয়ে গেছে। শেষে অতিপ্রাকৃতের আশ্রয়ে কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে। উপন্যাসখানি ঘটনাপ্রধান, কিন্তু ঘটনাসৃষ্টিতেও মৌলিকত্ব নেই, ঘটনাবিন্যাসেও চমৎকারিত্ব নেই। চরিত্রগুলিও রক্ত-মাংসের মানুষ নয়, লাল নীল কাগজের তৈরী। বইখানির যেটুকু প্রশংসনীয় তা লেখকের পূর্বরচনার পুনরাবৃত্তি।

পরাক্রমশালী রাজবংশের দরিদ্র অধস্তন কেদার বিষয়বুদ্ধিহীন, আত্মভোলা বাউল। কেদারের সুন্দরী বিধবা যুবতী কন্যা শরৎ তরুণী ধরিত্রীর মতই পবিত্রতা এবং সরলতার জ্যোতিতে বিভাসিত। শহরের দুটি দুর্বৃত্তের কৌশলে এই পিতা-পুত্রীর জীবনে যে দুর্যোগ এসেছিল 'কেদার রাজা'-য় সে কাহিনী বিবৃত হয়েছে।

লেখক ধরে নিয়েছেন বাংলাদেশের পল্লীজীবন তপোবনের জীবন। প্রকৃতির আশ্রয়ে প্রতিপালিত কেদার-শরতের জীবনও তপোবনবাসীর মত সরল। কিন্তু লেখক একথা মনে করে ভুল করেছেন যে, সরলতা নির্বুদ্ধিতার নামান্তর। তপোবনবাসীরাও নির্বোধ ছিলেন না, বাংলার পল্লীবাসীরাও নির্বোধ নয়। কেদার-শরতের নির্বুদ্ধিতাকে মূলধন করে

'কেদারে রাজা'-র গল্পের বিস্তার। শহুরে দুবৃত্তটি যখন শিকারী বিড়ালের মত ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল তার গোঁফ দেখে শরৎ অনায়াসে তাকে চিনতে পারত। শরতের যৌবনশ্রী অবশ্যই এরকম বহু শিকারী বিড়ালকে আকৃষ্ট করেছে। সুতরাং শরৎ তাদের চেনে এবং তাদের হাত থেকে আত্মরক্ষার কৌশলও জানে। প্রভাসকে যে শরৎ চিনতে পারে নি তাতেই মনে হয়, শরৎ চিনে না-চেনার ভান করেছে কিম্বা লেখক ইচ্ছে করে তাকে চিনতে দেন নি, গল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে। গড়শিবপুরে ইতিহাসের শ্মশানে নিঃসঙ্গ নিঃসহায় শরৎ প্রাকৃত-অতিপ্রাকৃতকে ভয় করে নি। প্রভাস গিরীনের কবল থেকে কৌশলে সে নিজেকে মুক্ত করেছে। মুক্ত হওয়ার পর বুদ্ধি এবং তেজস্বিতায় সে দেবী চৌধুরাণীর সমতুল্য। এরকম বুদ্ধিমতী তেজস্বিনী যুবতীকে দুটি নেংটি ইঁদুরে ফাঁদে ফেলতে পারে এ-কথা অবিশ্বাস্য। 'কেদার রাজা'-র ঘটনা ও চরিত্রে রূপকথার অবাস্তবতা, কিন্তু এর পরিবেশ বাস্তব।

কেদার রাজা নামক লোকটিকে প্রথম দিকে চলাফেরা করতে দেখা যায়, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ব্যক্তিত্বহীন এই লোকটি কন্যা শরৎসুন্দরীর আড়ালে আত্মগোপন করে। অবশ্য কেদার সম্পর্কে আমাদের কৌতূহলও তেমন তীব্র নয়। কারণ 'ইছামতী'-র সহায়হরি এবং 'পথের পাঁচালী'-র হরিহর-এর সঙ্গে কেদার রাজার জ্ঞাতি সম্পর্ক। প্রথমদিকে কেদার রাজাকে যেটুকু দেখা গিয়েছিল তাতেই তাকে সম্পূর্ণ দেখা হয়েছে। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শরৎসুন্দরী। শরতের জীবনের বিপর্যয় থেকে মুক্তি-ই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ঘটনা। সে বিচারে উপন্যাসের নামকরণ ঠিক হয় নি। সমগ্র বইখানির মধ্যে যে-চরিত্রটিকে মানুষ বলে চেনা যায় সে গোপেশ্বর চাটুজ্জে।

একটা পুরনো মন্দির দেখে 'কেদার রাজা'-র প্লট লেখকের মনে এসেছিল। 'শীতের সন্ধ্যায় চাঁচড়া দশমহাবিদ্যার মন্দির দেখতে দেখতে কি অদ্ভুত ভাব যে মনে জাগছিল—চারিধারের ঘন সবুজ বেত-ঝোপ, পুরোনো মজা দীঘি—মহলের পর মহল নির্জন, সঙ্গীহীন, ধূসর সান্ধ্য ছায়ায় শ্রীহীন অথচ গভীর রহস্যময় পাথর-পুরীর মত দেখাচ্ছিল। পেছনের ঘাট বাঁধানো প্রকান্ড দীঘিটাই বা কি অদ্ভুত !···রাজা রামচন্দ্র খাঁয়ের চাল ধোয়া পুকুরই বা দেখলাম কতকাল পরে। একটা সুন্দর প্লট মাথায় এসেচে। এই ভাঙা পুরী, বনেদী ঘরের দারিদ্র্য, জীবনের দুঃখ কষ্ট, Back ground-এ সব সময়ই পুরাতন দিনের আড়ম্বর ও ঐশ্বর্য—সহস্র tradition—এই সব নিয়ে।' ('তৃণাঙ্কুর', পৃ. ৬১) 'কেদারে রাজা'-য় ভগ্ন রাজপ্রাসাদ, দীঘি মন্দির আছে বটে কিন্তু সেগুলি গ্রাম্য থিয়েটারের স্টেজ-সজ্জার মত কৃত্রিম। Grand theme এবং majestic style—এ দুটিই বিভূতিভূষণের পক্ষে অনুপযুক্ত। বিভূতিভূষণের লেখনীতে ক্ষুদ্র মহনীয় হয়। সেই কারণে দশমহাবিদ্যা মন্দির দেখতে দেখতে যে-প্লট বিভূতিভূষণের মনে এসেছিল 'কেদার রাজা'-র সঙ্গে তার মিল শুধু বাইরের সাজের। এবং সে সাজও কৃত্রিম সাজ।

॥ ৯ ॥

'যাত্রাবদল' এবং 'উর্মিমুখর' যথাক্রমে ছোটগল্পের সমষ্টি এবং দিনলিপি। সমালোচকেরা অন্য কথা বলতে পারেন, আমার বিশ্বাস ছোটগল্পেই বিভূতিভূষণের স্বকীয়তার ছাপ সুপ্রকট। তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা কম ; তথাপি, উপন্যাসের বৃহৎ পটভূমিকায় নানা ঘটনার সমাবেশে চরিত্রের সূক্ষ্ম এবং জটিল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে বিভূতিভূষণের কৃতিত্ব নগণ্য। বিভূতি-ভূষণের রচনায় ছোট ক্রেমে ছোট ঘটনা, ছোট মাপের চরিত্র, এবং ছোট ছোট সুখ-দুঃখের

অলৌকিক চিত্র ফুটে উঠেছে। 'পথের পাঁচালী'-ও আসলে ছোট ছোট চিত্রের মালা। 'যাত্রাবদল' বিভূতিভূষণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক গল্পের সংকলন।

দিনলিপিগুলির সাহিত্যমূল্য ছাড়াও শিল্পীর অন্তর্জীবনের পরিচয়ের জন্য বিভূতি-সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকের কাছে এগুলি অপরিহার্য। উপন্যাস ও ছোটগল্পের অনেক আইডিয়ার নেপথ্যের রূপ পাওয়া যাবে দিনলিপিতে। এগুলি প্রকৃত বিচারে শিল্পীর আত্মজীবনী।

পরিশেষে বক্তব্য, বাঙ্গালা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ নূতনত্ব এনেছেন দুইভাবে। এক, তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর তাঁর রচনায় মহনীয় হয়েছে। দুই, শিশুর মনকে তিনি শিশুর মত সরলতায় ও সমবেদনায় ফুটিয়ে তুলেছেন। রচনার সহৃদয়তা এবং অকৃত্রিমতার গুণে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় চিরস্মরণীয়।

তারাপদ মুখোপাধ্যায়

অপরাজিত

(দ্বিতীয় খণ্ড)

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কলিকাতার কর্ম্মকঠোর, কোলাহলমুখর, বাস্তব জগতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গত কয়েকদিনের জীবনকে নিতান্ত স্বপ্ন বলিয়া মনে হইল অপুর। একথা কি সত্য—গত শুক্রবার বৈশাখী পূর্ণিমার শেষরাত্রে সে অনেক দূরের নদী-তীরবর্ত্তী এক অজানা গ্রামের অজানা গৃহস্থবাটির রূপসী মেয়েকে বলিয়াছিল—আমি এ বছর যদি আর না আসি অপর্ণা ?···

প্রথমবার মেয়েটি একটু হাসিয়া মুখ নিচু করিয়াছিল, কথা বলে নাই।

অপু আবার বলিয়াছিল—চুপ ক'রে থাকলে হবে না, তুমি যদি বলো আসব, নৈলে আসব না, সত্যি অপর্ণা। বলো কি বলবে ?

মেয়েটি লজ্জারক্তমুখে বলিয়াছিল—বা রে, আমি কে ? মা রয়েছেন, বাবা রয়েছেন, ওঁদের—আপনি ভারী—

—বেশ আসব না তবে। তোমার নিজের ইচ্ছে না থাকে—

—আমি কি সে কথা বলেছি ?

—তা হলে ?

—আপনার ইচ্ছে যদি হয় আসতে, আসবেন—না হয় আসবেন না, আমার কথায় কি হবে ?

ও-কথা ইহার বেশী আর অগ্রসর হয় নাই, অন্য সময় এ ক্ষেত্রে হয়ত অপুর অত্যন্ত অভিমান হইত, কিন্তু এ ক্ষেত্রে কৌতূহলটাই তাহার মনের অন্য সব প্রবৃত্তিকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে—ভালবাসার চোখে মেয়েটিকে সে এখনও দেখিতে পারে নাই, যেখানে ভালবাসা নাই, সেখানে অভিমানও নাই।

সেদিন বৈকালে গোলদীঘির মোড়ে একজন ফেরিওয়ালা চাঁপাফুল বেচিতেছিল, সে আগ্রহের সহিত গিয়া ফুল কিনিল। ফুলটা আঘ্রাণের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মনের মধ্যে একটা বেদনা সে সুস্পষ্ট অনুভব করিল, একটা কিছু পাইয়া হারাইবার বেদনা, একটা শূন্যতা, একটা খালি-খালি ভাব···মেয়েটির মাথায় চুলের সে গন্ধটাও যেন আবার পাওয়া যায়।···

অন্যমনস্কভাবে গোলদীঘির এক কোণে ঘাসের উপর অনেকক্ষণ একা বসিয়া বসিয়া সেদিনের সেই রাতটি আবার সে মনে আনিবার চেষ্টা করিল। মেয়েটির মুখখানি কি রকম যেন ?···ভারী সুন্দর মুখ···কিন্তু এই কয়দিনের মধ্যেই সব যেন মুছিয়া অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে—মেয়েটির মুখ মনে আনিবার ও ধরিয়া রাখিবার যত বেশী চেষ্টা করিতেছে সে, ততই সে-মুখ দ্রুত অস্পষ্ট হইয়া যাইতেছে। শুধু নতপল্লব কৃষ্ণতার-চোখ-দু'টির ভঙ্গি অল্প অল্প মনে আসে, আর মনে আসে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের সে স্নিগ্ধ হাসিটুকু। প্রথমে ললাটে লজ্জা ঘনাইয়া আসে, ললাট হইতে নামে ডাগর দু'টি চোখে, পরে কপোলে—তারপরই যেন সারা মুখখানি অল্পক্ষণের জন্য অন্ধকার হইয়া আসে···ভারী সুন্দর দেখায় সে সময়। তারপরই আসে সেই অপূর্ব্ব সুন্দর হাসিটি, ওরকম হাসি আর কারও মুখে অপু কখনও দেখে নাই। কিন্তু মুখের সব আদলটা তো মনে আসে না—সেটা মনে আনিবার জন্য সে ঘাসের উপর শুইয়া অনেকক্ষণ ভাবিল, অনেকক্ষণ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া দেখিল—না কিছুতেই মনে আসে না—কিংবা হয়ত আসে অতি অল্পক্ষণের জন্য, আবার তখনই অস্পষ্ট হইয়া যায়। অপর্ণা—কেমন নামটি···?

জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি প্রণব কলিকাতায় আসিল। বিবাহের পর এই তাহার সঙ্গে প্রথম দেখা। সে আসিয়া গল্প করিল, অপর্ণার মা বলিয়াছেন—তাঁহার কোন্ পুণ্যে এরকম তরুণ দেবতার মত রূপবান জামাই পাইয়াছেন জানেন না—তাহার কেহ কোথাও নাই শুনিয়া চোখের জল রাখিতে পারেন নাই।

অপু খুশী হইল, হাসিয়া বলিল—তবুও তো একটা ভাল জামা গায়ে দিতে পারলাম না, সাদা পাঞ্জাবী গায়ে বিয়ে হ'ল—দূর !···না খেয়ে-দেয়ে একটা সিল্কের জামা করালুম, সেটা গেল ছিঁড়ে-ছুটে, তখন তুমি এলে তোমার মামার বাড়িতে নিয়ে যেতে, তার অগ্রে আসতে পারলে না—আচ্ছা, সিল্কের জামাটাতে আমায় কেমন দেখাতো ?

—ওঃ—শ্বাক্ষাৎ য়্যাপোলো বেল্‌ভেডিয়ার !···ঢের ঢের হামবাগ দেখেছি, কিন্তু তোর জুড়ি খুঁজে পাওয়া ভার—বুঝলি ?

না—কিন্তু একটা কথা। অপর্ণার মা কি বলেন তাহা জানিতে অপুর তত কৌতূহল নাই—অপর্ণা কি বলিয়াছে ?—অপর্ণা ?···অপর্ণা কিছু বলে নাই ?···হয়ত কেনারাম মুখুয্যের ছেলের সঙ্গে বিবাহ না হওয়াতে মনে মনে দুঃখিত হইয়াছে—না ?

প্রণবের মামা এ বিবাহে তত সন্তুষ্ট হন নাই, স্ত্রীর উপরে মনে মনে চটিয়াছেন এবং তাঁহার মনের ধারণা—প্রণবই তাহার মামীমার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া নিজের বন্ধুর সঙ্গে বোনের বিবাহ দেওয়াইয়াছে। নাম নাই, বংশ নাই, চালচুলা নাই—চেহারা লইয়া কি মানুষ ধুইয়া খাইবে···কিন্তু এসব কথা প্রণব অপুকে কিছু বলিল না।

একটা কথা শুনিয়া সে দুঃখিত হইল।—কেনারাম মুখুয্যের ছেলেটি নিজে দেখিয়া মেয়ে পছন্দ করিয়াছিল। অপর্ণাকে বিবাহ করার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল তাহার—কিন্তু হঠাৎ বিবাহ-সভায় আসিয়া কি যেন গোলমাল হইয়া গেল, সারারাত্রি কোথা দিয়া কাটিল, সকালবেলা যখন একটু হুঁশ হইল, তখন সে দাদাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—দাদা, আমার বিয়ে হ'ল না ?

এখনও তাহার অবশ্য ঘোর কাটে নাই···বাড়ি ফিরিবার পথেও তাহার মুখে ওই কথা—এখন নাকি সে বদ্ধ উন্মাদ। ঘরে তালা দিয়ে রাখা হইয়াছে।

অপু বলিল—হাসিস কেন, হাসবার কি আছে ?···পাগল তো নিজের ইচ্ছেয় হয় নি, সে বেচারির আর দোষ কি ? ও নিয়ে হাসি ভাল লাগে না।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া ঘুম হয় না—কেবলই অপর্ণার কথা মনে আসে। প্রণব এ কি করিয়া দিল তাহাকে ? সে যে বেশ ছিল, এ কোন্ সোনার শিকল তাহার মুক্ত, বন্ধনহীন হাতে-পায়ে অদৃশ্য নাগপাশের মত দিন দিন জড়াইয়া পড়িতেছে ? লাইব্রেরীতে বসিয়া কেবল আজকাল বাংলা উপন্যাস পড়ে—দেখিল তাহার মত বিবাহ নভেলে অনেক ঘটিয়াছে, অভাব নাই।

পুজার সময় শ্বশুরবাড়ি যাওয়া ঘটিল না। এক তো অর্থাভাবে সে নিজের ভাল জামা-কাপড় কিনিতে পারিল না, শ্বশুরবাড়ি হইতে পুজার তত্ত্বে যাহা পাওয়া গেল, তাহা পরিয়া সেখানে যাইতে তাহার ভারী বাধবাধ ঠেকিল। তাহা ছাড়া অপর্ণার মা চিঠির উপর চিঠি দিলে কি হইবে, তাহার বাবার দিক হইতে জামাইকে পুজার সময় লইয়া যাইবার বিশেষ কোন আগ্রহ দেখা গেল না বরং তাঁহার নিকট হইতে উপদেশপূর্ণ পত্র পাওয়া গেল যে, একটা ভাল চাকুরি বাকুরি যেন সে শীঘ্র দেখিয়া লয়, এখন অল্প বয়স, এই তো অর্থ উপার্জ্জনের সময়, এখন আলস্য ও ব্যসনে কাটাইলে, এমনি ধরণের নানা কথা। এখানে বলা আবশ্যক, এ বিবাহে তিনি অপুকে একেবারেই ফাঁকি দিয়াছিলেন, কেনারাম মুখুয্যের ছেলেকে যাহা দিবার কথা ছিল তাহার সিকিও এ জামাইকে দেন নাই।

ছুটি পাওয়া গেল পুনরায় বৈশাখ মাসে। পূর্ব্বদিন রাত্রে তাহার কিছুতেই ঘুম আসে না, কি রকম চুল ছাঁটা হইয়াছে, আয়নায় দশবার দেখিল। ওই সাদা পাঞ্জাবীতে তাহাকে ভাল মানায়—না, এই তসরের কোটটাতে ?

অপর্ণার মা তাহাকে পাইয়া হাতে যেন আকাশের চাঁদ পাইলেন। সেদিনটা খুব বৃষ্টি,

অপু নৌকা হইতে নামিয়া বাড়ির বাহিরের উঠানে পা দিতেই, কে পূজার দালানে বসিয়াছিল, ছুটিয়া গিয়া বাড়ির মধ্যে খবর দিল। এক মুহূর্ত্তে বাড়ির উপরের নিচের সব জানালা খুলিয়া গেল, বাড়িতে ঝি-বৌয়ের সংখ্যা নাই, সকলে জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন—মুষলধারায় বৃষ্টিপাত অগ্রাহ্য করিয়া অপর্ণার মা উঠানে তাহাকে আগু বাড়াইয়া লইতে ছুটিয়া আসিলেন, সারা বাড়িতে একটা আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল।

ফুলশয্যার সেই ঘরে, সেই পালংকেই রাত্রে শুইয়া সে অপর্ণার প্রতীক্ষায় রহিল।

এক বৎসরে অপর্ণার এ কি পরিবর্ত্তন! তখন ছিল বালিকা—এখন ইহাকে দেখিলে যেন আর চেনা যায় না!···নীলার মত চোখ-ঝলসানো সৌন্দর্য্য ইহার নাই বটে, কিন্তু অপর্ণার যাহা আছে, তাহা উহাদের কাহারও নাই। অপুর মনে হইল দু-একখানা প্রাচীন পটে আঁকা তরুণী দেবীমূর্ত্তির, কি দশমহাবিদ্যার ষোড়শী মূর্ত্তির মুখে এ-ধরণের অনুপম, মহিমাময় স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য সে দেখিয়াছে। একটু সেকেলে, একটু প্রাচীন ধরণের সৌন্দর্য্য···সুতরাং দুষ্প্রাপ্য। যেন মনে হয় এ খাঁটি বাংলার জিনিস, দূরে পল্লীপ্রান্তরের নদীতীরের সকল শ্যামলতা, সকল সরসতা, পথিপ্রান্তে বনফুলের সকল সরলতা ছানিয়া এ মুখ গড়া, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাংলার পল্লীর চূত-বকুল-বীথির ছায়ায় ছায়ায় কত অপরাহ্নে, নদীঘাটের যাওয়া আসার পথে এই উজ্জ্বলশ্যামবর্ণা, রূপসী তরুণী বধূদের লক্ষ্মীর মত আলতা-রাঙা পদচিহ্ন কতবার পড়িয়াছে, মুছিয়াছে, আবার পড়িয়াছে···ইহাদেরই স্নেহ-প্রেমের, দুঃখ-সুখের কাহিনী, বেহুলা লখিন্দরের গানে, ফুল্লরার বারোমাস্যায়, সুবচনীর ব্রতকথায়, বাংলার বৈষ্ণব-কবিদের রাধিকার রূপ-বর্ণনায়, পাড়াগাঁয়ের ছড়ায়, উপকথায় সুয়োরানী দুয়োরানীর গল্পে!

অপু বলিল—তোমার সঙ্গে কিন্তু আড়ি, সারা বছরে একখানা চিঠি দিলে না কেন?—

অপর্ণা সলজ্জ মৃদু একটু হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল। তারপর একবার ডাগর চোখদু'টি তুলিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া-চাহিয়া দেখিল। খুব মৃদুস্বরে মুখে হাসি টিপিয়া বলিল—আর আমার বুঝি রাগ হতে নেই?···

অপু দেখিল—এতদিন কলিকাতায় সে জারুল কাঠের তক্তপোশে শুইয়া অপর্ণার যে মুখ ভাবিত—আসল মুখ একেবারেই তাহা নহে—ঠিক এই অনুপম মুখই সে দেখিয়াছিল বটে ফুলশয্যার রাত্রে, এমন ভুলও হয়!

—পুজোর সময় আসি নি তাই—তুমি ভাবতে কিনা?—ও-সব মুখের কথা, ছাই ভাবতে!···

—না গো না, মা বললেন, তুমি আসবে ষষ্ঠীর দিন, ষষ্ঠী গেল, পুজো গেল, তখনও মা বললেন তুমি একাদশীর পর আসবে—আমি—

অপর্ণা হঠাৎ থামিয়া গেল, অল্প একটু চাহিয়া চোখ নিচু করিল।

অপু আগ্রহের সুরে বলিল—তুমি কি, বললে না?

অপর্ণা বলিল—আমি জানি নে, বলব না—

অপু বলিল—আমি জানি আমার সঙ্গে বিয়ে হওয়াতে তুমি মনে মনে—

অপর্ণা স্নেহপূর্ণ তিরস্কারের সুরে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল—আবার ওই কথা?···ও-সব কথা বলতে আছে?—ছিঃ—বলো না—

—তা কৈ, তুমি খুশী হয়েছ, একথা তো তোমার মুখে শুনি নি অপর্ণা—

অপর্ণা হাসিমুখে বলিল—তারপর কতদিন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে গো শুনি—সেই আর-বছর বোশেখ আর এ বোশেখ—

—আচ্ছা বেশ, এখন তো দেখা হ'ল, এখন আমার কথার উত্তর দাও।

অপর্ণা কি-একটা হঠাৎ মনে পড়িবার ভঙ্গিতে তাহার দিকে চাহিয়া আগ্রহের সুরে বলিল—তুমি নাকি যুদ্ধে যাচ্ছিলে, পুলুদা বলছিল, সত্যি ?—

—যাই নি, এবার ভাবছি যাবো—এখান থেকে গিয়েই যাবো—

অপর্ণা ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলিল—আচ্ছা থাক্ গো, আর রাগ করতে হবে না, আচ্ছা তোমার কথার কি উত্তর দেব বলো তো ?—ওসব আমি মুখে বলতে পারব না—

—আচ্ছা, যুদ্ধ কাদের মধ্যে বেধেছে, জানো ?···

—ইংরেজদের সঙ্গে আর জার্মানির সঙ্গে—আমাদের বাড়িতে বাংলা কাগজ আসে। আমি পড়ি যে।

অপর্ণা রূপার ডিবাতে পান আনিয়াছিল, খুলিয়া বলিল—পান খাবে না ?···

বাহিরে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। এতটুকু গরম নাই, ঠাণ্ডা রাতটির ভিজা মাটির সুগন্ধে ঝিরঝিরে দক্ষিণ হাওয়া ভরপুর, একটু পরে সুন্দর জ্যোৎস্না উঠিল।

অপু বলিল—আচ্ছা অপর্ণা, চাঁপাফুল পাওয়া যায় তো কাউকে কাল বলো না, বিছানায় রেখে দেবে ? আছে চাঁপাগাছ কোথাও ?

—আমাদের বাগানেই আছে। আমি একথা কাউকে বলতে পারব না কিন্তু—তুমি বলো কাল সকালে ওই নৃপেনকে, কি অনাদিকে···কি আমার ছোট বোনকে বলো—

—আচ্ছা কেন বল তো চাঁপাফুলের কথা তুললাম ?

অপর্ণা সলজ্জ হাসিল। অপুর বুঝিতে দেরি হইল না যে, অপর্ণা তাহার মনের কথা ঠিক ধরিয়াছে। তাহার হাসিবার ভঙ্গিতে অপু একথা বুঝিল। বেশ বুদ্ধিমতী তো অপর্ণা !···

সে বলিল—হ্যাঁ একটা কথা অপর্ণা, তোমাকে একবার কিন্তু নিয়ে যাব দেশে, যাবে তো ?

অপর্ণা বলিল—মাকে বলো, আমার কথায় তো হবে না···

—তুমি রাজী কি না বলো আগে—সেখানে কিন্তু কষ্ট হবে। অপু একবার ভাবিল—সত্য কথাটা খুলিয়া বলে। কিন্তু সেই পুরাতন গর্ব ও বাহাদুরির ঝোঁক !—বলিল—অবিশ্যি একদিন আমাদেরও সবই ছিল। যেখানে থাকতুম—আমার পৈতৃক দেশ—এখন তো দোতলা মস্ত বাড়ি—মানে সবই—তবে শরিকানী মামলা আর মানে ম্যালেরিয়ায়—বুঝলে না ? এখন যেখানে থাকি, সেখানে দুখানা চালাঘর, তাও মা মারা যাওয়ার পর আর সেখানে যাই নি, তোমাদের মত ঝি-চাকর নেই, নিজের হাতে সব করতে হবে—তা আগে থেকেই ব'লে রাখি। তুমি হলে জমিদারের মেয়ে—

অপর্ণা কৌতুকের সুরে বলিল—আছিই তো জমিদারের মেয়ে। হিংসে হচ্ছে বুঝি ? একটু থামিয়া শান্ত সুরে বলিল—কেন একশ'বার ওকথা বলো ?···তুমি কাল মাকে বাবাকে ব'লে রাজী করাও, আমি তোমার সঙ্গে যেখানে নিয়ে যাবে যাবো, গাছতলাতেও যাবো, আমি তোমার সব কথা জানি, পুলুদা মায়ের কাছে বলছিল, আমি সব শুনেছি। যেখানে নিয়ে যাবে, নিয়ে চল, তোমার ইচ্ছে আমার তাতে মতামত কি ?

রাত্রে দুজনের কেহ ঘুমাইল না।

বধূকে লইয়া সে রওনা হইল। শ্বশুর প্রথমটা আপত্তি তুলিয়াছিলেন—নিয়ে তো যেতে চাইছ বাবাজী, কিন্তু এখন নিয়ে গিয়ে তুলবে কোথায় ? চাকরি-বাকরি ভাল কর, ঘর-দোর ওঠাও, নিয়ে যাবার এত তাড়াতাড়িটা কি ?

সিঁড়ির ঘরে অপর্ণার মা স্বামীকে বলিলেন—হ্যাঁগা, তোমার বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পেয়ে

যাচ্ছে দিন দিন—না কি ? জামাইকে ও-সব কথা বলেছ ? আজকালকার ছেলেমেয়েদের ধরণ আলাদা, তুমি জান না। ছেলেমানুষ জামাই, টাকাকড়ি, চাকরিবাকরি ভগবান যখন দেবেন তখন হবে। আজকালের মেয়েরা ও-সব বোঝে না, বিশেষ ক'রে তোমার মেয়ে সে ধরণেরই নয়, ওর মন আমি খুব ভাল বুঝি। দাও গিয়ে পাঠিয়ে ওকে জামাইয়ের সঙ্গে—ওদের সুখ নিয়েই সুখ।

উৎসাহে অপুর রাত্রে ঘুম হয় না এমন অবস্থা, কাল সারাদিন অপর্ণাকে লইয়া রেল স্টীমারে কাটানো—উঃ!···শুধু সে, আর কেউ না। রাত্রে অস্পষ্ট আলোকে অপর্ণাকে ভাল করিয়া দেখিবারই সুযোগ হয় না, দিনে দেখা হওয়া এ বাড়িতে অসম্ভব—কিন্তু কাল সকালটি হইতে তাহারা দুজনে—মাঝে আর কোন বাধা ব্যবধান থাকিবে না।

কিন্তু স্টীমারে অপর্ণা রহিল মেয়েদের জায়গায়। তিন ঘণ্টা কাল সেভাবে কাটিল। তার পরেই রেল।

এইখানেই অপু সর্বপ্রথম গৃহস্থালী পাতিল স্ত্রীর সঙ্গে। ট্রেনের তখনও অনেক দেরি। যাত্রীদের রান্না-খাওয়ার জন্য স্টেশন হইতে একটু দূরে ভৈরবের ধারে ছোট ছোট খড়ের ঘর অনেকগুলি—তারই একটা চার আনায় ভাড়া পাওয়া গেল। অপু দোকানের খাবার আনিতে যাইতেছে দেখিয়া বধূ বলিল—তা কেন ? এই তো এখানে উনুন আছে, যাত্রীরা সব রেঁধে খায়, এখনও তো তিন-চার ঘণ্টা দেরি গাড়ির, আমি রাঁধব।

অপু ভারী খুশী। সে ভারী মজা হইবে ! এ কথাটা এতক্ষণ তাহার যে কেন মনে আসে নাই !

মহা উৎসাহে বাজার হইতে জিনিসপত্র কিনিয়া আনিল। ঘরে ঢুকিয়া দেখে ইতিমধ্যেই কখন বধূ স্নান সারিয়া ভিজা চুলটি পিঠের উপর ফেলিয়া, কপালে সিন্দুরের টিপ দিয়া লালজরিপাড় মটকার শাড়ি পরিয়া ব্যস্তসমস্ত অবস্থায় এটা-ওটা ঠিক করিতেছে। হাসিমুখে বলিল—বাড়িওয়ালী জিগ্যেস করছে উনি তোমার ভাই বুঝি ? আমি হেসে ফেলতেই বুঝতে পেরেছে, বলছে—জামাই ! তাই তো বলি !—আরও কি বলিতে গিয়া অপর্ণা লজ্জায় কথা শেষ করিতে না পারিয়া হাসিয়া ফেলিল।

অপু মুগ্ধনেত্রে বধূর দিকে চাহিয়া ছিল। কিশোরীর তনুদেহটি বেড়িয়া স্ফুটনোন্মুখ যৌবন কি অপূর্ব সুষমায় আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সুন্দর নিটোল গৌর বাহু দুটি, চুলের খোঁপার ভঙ্গিটি কি অপরূপ ! গভীর রাত্রে শোবার ঘরে এ পর্যন্ত দেখাশোনা, দিনের আলোয় স্নানের পরে এ অবস্থায় তাহার স্বাভাবিক গতিবিধি লক্ষ্য করিবার সুযোগ কখনও ঘটে নাই—আজ দেখিয়া মনে হইল অপর্ণা সত্যই সুন্দরী বটে।

কাঁচা কাঠ কিছুতেই ধরে না, প্রথমে বধূ, পরে সে নিজে, ফুঁ দিয়া চোখ লাল করিয়া ফেলিল। প্রৌঢ়া বাড়িওয়ালী ইহাদের জন্য নিজের ঘরে বাটনা বাটিতে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া দু'জনের দুর্দশা দেখিয়া বলিল—ওগো মেয়ে, সরো বাছা, জামাইকে যেতে বলো। তোমাদের কি ও কাজ মা ? সরো আমি দি ধরিয়ে।

বধূ তাগিদ দিয়া অপুকে স্নানে পাঠাইল। নদী হইতে ফিরিয়া সে দেখিল—ইহার মধ্যে কখন বধূ বাড়িওয়ালীকে দিয়া বাজার হইতে রসগোল্লা ও ছানা আনাইয়াছে, রেকাবীতে পেঁপে কাটা, খাবার ও গ্লাসে নেবুর রস মিশানো চিনির শরবৎ। অপু হাসিয়া বলিল—উঃ, ভারী গিন্নীপনা যে ! আচ্ছা তরকারীতে নুন দেওয়ার সময় গিন্নীপনার দৌড়টা একবার দেখা যাবে।

অপর্ণা বলিল—আচ্ছা গো দেখো—পরে ছেলেমানুষের মত ঘাড় দুলাইয়া বলিল—ঠিক হ'লে কিন্তু আমায় কি দেবে ?

অপু কৌতুকের সুরে বলিল—ঠিক্ হ'লে যা দেব, তা এখুনি পেতে চাও ?

—যাও, আচ্ছা তো দুষ্টু !

একবার সে রন্ধনরত বধূর পিছনে আসিয়া চুপি-চুপি দাঁড়াইল। দৃশ্যটা এত নতুন, এত অভিনব ঠেকিতেছিল তাহার কাছে ! এই সুঠাম, সুন্দরী পরের মেয়েটি তাহার নিতান্ত আপনার জন—একমাত্র পৃথিবীতে আপনার জন ! পরে সে সন্তর্পণে নিচু হইয়া পিঠের উপরে এলানো চুলের গিঁঠটা ধরিয়া অতর্কিতে এক টান দিতেই বধূ পিছনে চাহিয়া কৃত্রিম কোপের সুরে বলিল—উঃ ! আমার লাগে না বুঝি ?···ভারী দুষ্টু তো···রান্না থাকবে পড়ে ব'লে দিচ্ছি যদি আবার চুল ধরে টানবে—

অপু ভাবে, মা ঠিক এই ধরণের কথা বলিত—এই ধরণেরই স্নেহ-প্রীতিঝরা চোখ। সে দেখিয়াছে, কি দিদি, কি রানু-দি, কি লীলা, কি অপর্ণা—সকলেরই মধ্যে মা যেন অল্পবিস্তর মিশাইয়া আছে—ঠিক সময়ে ঠিক অবস্থায় ইহারা একই ধরণের কথা বলে, চোখে-মুখে একই ধরণের স্নেহ ফুটিয়া ওঠে।

একটি ভদ্রলোক অনেকক্ষণ হইতে প্লাটফর্মে পায়চারী করিতেছিলেন। ট্রেনে উঠিবার কিছু পূর্বে অপু তাঁহাকে চিনিতে পারিল, দেওয়ানপুরের মাস্টার সেই সত্যেনবাবু। অপু থার্ডক্লাসে পড়িবার সময়ই ইনি আইন পাশ করিয়া স্কুলের চাকুরি ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, আর কখনও দেখা হয় নাই। পুরাতন ছাত্রকে দেখিয়া খুশী হইলেন, অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন, অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে কে কি করিতেছে শুনিবার আগ্রহ দেখাইলেন।

তিনি আজকাল পাটনা হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছেন, চালচলন দেখিয়া অপুর মনে হইল—বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করেন। তবুও বলিলেন, পুরানো দিনই ছিল ভাল, দেওয়ানপুরের কথা মনে হইলে কষ্ট হয়। ট্রেন আসিলে তিনি সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিলেন।

অপর্ণাকে সব ভাল করিয়া দেখাইবার জন্য শিয়ালদহ স্টেশনে নামিয়া অপু একখানা ফিটন গাড়ি ভাড়া করিয়া খানিকটা ঘুরিল।

অপু একটা জিনিস লক্ষ্য করিল, অপর্ণা কখনও কিছু দেখে নাই বটে, কিন্তু কোনও বিষয়ে কোনও অশোভন ব্যগ্রতা দেখায় না। ধীর, স্থির, সংযত, বুদ্ধিমতী—এই বয়সেই চরিত্রগত একটা কেমন সহজ গাম্ভীর্য্য—যাহার পরিণতি সে দেখিয়াছে ইহারই মায়ের মধ্যে ; উছলিয়া-পড়া মাতৃত্বের সঙ্গে চরিত্রের সে কি দৃঢ় অটলতা !

মনসাপোতা পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। অপু বাড়িঘরের বিশেষ কিছু ঠিক করে নাই, কাহাকেও সংবাদ দেয় নাই, কিছু না—অথচ হঠাৎ স্ত্রীকে আনিয়া হাজির করিয়াছে। বিবাহের পর মাত্র একবার এখানে দুদিনের জন্য আসিয়াছিল, বাড়িঘর অপরিষ্কার, রাত্রিবাসের অনুপযুক্ত, উঠানে ঢুকিয়া পেয়ারা গাছটার তলায় সন্ধ্যার অন্ধকারে বধূ দাঁড়াইয়া রহিল, অপু গরুর গাড়ি হইতে তোরঙ্গ ও কাঠের হাতবাক্সটা নামাইতে গেল। উঠানে পাশের জঙ্গলে নানা পতঙ্গ কুস্বর করিয়া ডাকিতেছে, ঝোপে-ঝাপে জোনাকির ঝাঁপ জ্বলিতেছে।

কেহ কোথাও নাই, কেহ তরুণ দম্পতিকে সাদরে বরণ ও অভ্যর্থনা করিয়া ঘরে তুলিয়া লইতে ছুটিয়া আসিল না, তাহারাই দুজনে টানাটানি করিয়া নিজেদের পেঁটরা-তোরঙ্গ মাত্র দেশলাইয়ের কাঠির আলোর সাহায্যে ঘরের দাওয়ায় তুলিতে লাগিল। সে আজ কাহাকেও ইচ্ছা করিয়াই খবর দেয় নাই, ভাবিয়াছিল মা যখন বরণ করে নিতে পারলেন না আমার বৌকে, অত সাধ ছিল মার—তখন আর কাউকে বরণ করতে হবে না, ও অধিকার আর কাউকে বুঝি দেব ?

অপর্ণা জানিত তাহার স্বামী দরিদ্র—কিন্তু এ রকম দরিদ্র তাহা সে ভাবে নাই। তাহাদের পাড়ার নাপিত-বাড়ির মত নিচু, ছোট চালাঘর। দাওয়ার একধারে গরু বাছুর

উঠিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, ছাঁচতলায় কাই বীচি ফুটিয়া বর্ষার জলে চারা বাহির হইয়াছে··· একস্থানে খড় উড়িয়া চালের বাখারি ঝুলিয়া পড়িয়াছে···বাড়ির চারিধারে কি পোকা একঘেয়ে ডাকিতেছে···এরকম ঘরে তাহাকে দিন কাটাইতে হইবে? অপর্ণার মন দমিয়া গেল। কি করিয়া থাকিবে সে এখানে? মায়ের কথা মনে হইল···খুড়ীমাদের কথা মনে হইল···ছোট ভাই বিনুর কথা মনে হইল···কান্না ঠেলিয়া বাহিরে আসিতে চাহিতেছিল···সে মরিয়া যাইবে এখানে থাকিলে···

অপু খুঁজিয়া-পাতিয়া একটা লণ্ঠন জ্বালিল। ঘরের মাটির মেঝেতে পোকায় খুঁড়িয়া মাটি জড় করিয়াছে। তক্তপোশের একটা পাশ ঝাড়িয়া তাহার উপর অপর্ণাকে বসাইল··· সবে অপর্ণাকে অন্ধকার ঘরে বসাইয়া লণ্ঠনটা হাতে বাহিরে হাতবাক্সটা আনিতে গেল··· অপর্ণার গা ছম ছম করিয়া উঠিল অন্ধকারে···পরক্ষণেই অপু নিজের ভুল বুঝিয়া আলো হাতে ঘরে ঢুকিয়া বলিল—দ্যাখো কাণ্ড, তোমাকে একা অন্ধকারে বসিয়ে রেখে—থাক্ লণ্ঠনটা এখানে—

অপর্ণার কান্না আসিতেছিল।···

আধঘণ্টা পরে ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া ঘরটা একরকম রাত্রি কাটানোর মত দাঁড়াইল। কি খাওয়া যায় রাত্রে?—রান্নাঘর ব্যবহারের উপযোগী নাই তো বটেই, তা ছাড়া চাল, ডাল, কাঠ কিছুই নাই। অপর্ণা তোরঙ্গ খুলিয়া একটা পুঁটুলি বার করিয়া বলিল—ভুলে গিয়েছিলুম তখন, মা নাড়ু দিয়েছিলেন এতে বেঁধে—অনেক আছে—এই খাও।

অপু অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল। সংসার কখনও করে নাই—এই নতুন—নিতান্ত আনাড়ী—অপর্ণাকে এ অবস্থায় এখানে আনা ভাল হয় নাই, সে এতক্ষণে বুঝিয়াছে। অপ্রতিভের সুরে বলিল—রাণাঘাট থেকে কিছু খাবার নিলেই হ'ত—তোমাকে একলা বসিয়ে রেখে যাই কি ক'রে—নৈলে ক্ষেত্র কাপালীর বাড়ি থেকে চিঁড়ে আর দুধ—যাব?···

অপর্ণা ঘাড় নাড়িয়া বারণ করিল।

তেলিদের বাড়িতে কেউ ছিল না, তিন-চারি মাস হইল তাহারা কলিকাতায় আছে, বাড়ি তালাবন্ধ, নতুবা কাল রাত্রে ইহাদের কথাবার্তা শুনিয়া সে-বাড়ির লোক আসিত। সকালে সংবাদ পাইয়া ও-পাড়া হইতে নিরুপমা ছুটিয়া আসিল। অপু কৌতুকের সুরে বলিল—এসো, এসো নিরুদিদি, এখন মা নেই, তোমরা কোথায় বরণ ক'রে ঘরে তুলবে, দুধে-আলতার পাথরে দাঁড় করাবে, তা না তুমি সকালে পান চিবুতে চিবুতে এলে। বেশ যা হোক্!

নিরুপমা অনুযোগ করিয়া বলিল—তুমি ভাই সেই চোদ্দ বছরে যেমন পাগলাটি ছিলে, এখনও ঠিক সেই আছ। বৌ নিয়ে আসছো তা একটা খবর না, কিছু না। কি ক'রে জানব তুমি এ অবস্থায় একজন ভদ্রলোকের মেয়েকে এই ভাঙা-ঘরে হুপ্ ক'রে এনে তুলবে? ছি ছি, দ্যাখ তো কাণ্ডখানা? রাত্রে যে রইলে কি ক'রে এখানে, সে কেবল তুমিই পার।

নিরুপমা গিনি দিয়া বৌ-এর মুখ দেখিল।

অপু বলিল—তোমাদের ভরসাতেই কিন্তু ওকে এখানে রেখে যাব নিরুদি। আমাকে সোমবার চাকরিতে যেতেই হবে।

নিরুপমা বৌ দেখিয়া খুব খুশী, বলিল—আমি আমাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রেখে দেব বৌকে, এখানে থাকতে দেব না।

অপু বলিল—তা হবে না, আমার মায়ের ভিটেতে সন্ধ্যে দেবে কে তাহলে? রাত্রে তোমাদের ওখানে শোবার জন্যে নিয়ে যেও।

নিরুপমা তাতেই রাজী। চোদ্দ বছরের ছেলে যখন প্রথম চেলী পরিয়া তাহাদের বাড়ি পূজা করিতে গিয়াছিল, তখন হইতে সে অপুকে সত্য সত্য স্নেহ করে, তাহার দিকে টানে। অপু ঘরবাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ায় সে মনে মনে খুব দুঃখিত হইয়াছিল। মেয়েরা গতিকে বোঝে না, বাহিরকে বিশ্বাস করে না, মানুষের উদ্দাম ছুটিবার বহির্মুখী আকাঙ্ক্ষাকে শান্ত সংযত করিয়া তাহাকে গৃহস্থালী পাতাইয়া, বাসা বাঁধাইবার প্রবৃত্তি নারী-মনের সহজাত ধর্ম, তাহাদের সকল মাধুর্য্য, স্নেহ, প্রেমের প্রয়োগ-নৈপুণ্য এখানে। সে শক্তিও এত বিশাল যে খুব কম পুরুষই তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া জয়ী হইবার আশা করিতে পারে। অপু বাড়ি ফিরিয়া নীড় বাঁধাতে নিরুপমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল।

কলিকাতায় ফিরিয়া অপুর আর কিছু ভাল লাগে না, কেবল শনিবারের অপেক্ষায় দিন গুণিতে থাকে। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যাহারা নব-বিবাহিত তাহাদের সঙ্গে কেবল বিবাহিত জীবনের গল্প করিতে ও শুনিতে ভাল লাগে। কোনও রকমে এক সপ্তাহ কাটাইয়া শনিবার দিন সে বাড়ি গেল। অপর্ণার গৃহিণীপনায় সে মনে মনে আশ্চর্য্য না হইয়া পারিল না। এই সাত-আট দিনের মধ্যেই অপর্ণা বাড়ির চেহারা একেবারে বদলাইয়া ফেলিয়াছে! তেলি-বাড়ির বুড়ী ঝিকে দিয়া নিজের তত্ত্বাবধানে ঘরের দেওয়াল লেপিয়া ঠিক করাইয়াছে। দাওয়ার মাটি ধরাইয়া দিয়াছে, রাঙা এলামাটি আনিয়া চারিধারে রঙ করাইয়াছে, নিজের হাতে এখানে তাক, ওখানে কুলুঙ্গি গাঁথিয়াছে, তক্তপোশের তলাকার রাশীকৃত ইঁদুরের মাটি নিজেই উঠাইয়া বাইরে ফেলিয়া গোবর-মাটি লেপিয়া দিয়াছে। সারা বাড়ি যেন ঝক্-ঝক্ তক্-তক্ করিতেছে। অথচ অপর্ণা জীবনে এই প্রথম মাটির ঘরে পা দিল। পূর্ব্ব গৌরব যতই ক্ষুণ্ণ হউক, তবুও সে ধনীবংশের মেয়ে, বাপ-মায়ের আদরে লালিত, বাড়ি থাকিতে নিজের হাতে তাহাকে কখনও বিশেষ কিছু করিতে হইত না।

মাসখানেক ধরিয়া প্রতি শনিবারে বাড়ি যাতায়াত করিবার পর অপু দেখিল তাহার যাহা আয়, ফি শনিবার বাড়ি যাওয়ার খরচ তাহাতে কুলায় না। সংসারে দশ-বারো টাকার বেশী মাসে এ পর্য্যন্ত সে দিতে পারে নাই। সে বোঝে—ইহাতে সংসার চালাইতে অপর্ণাকে দস্তুর-মতো বেগ পাইতে হয়। অতএব ঘন ঘন বাড়ি যাওয়া বন্ধ করিল।

ডাকপিয়নের খাকির পোশাক যে বুকের মধ্যে হঠাৎ এরূপ ঢেউ তুলিতে পারে, ব্যগ্র আশার আশ্বাস দিয়াই পরমুহূর্ত্তে নিরাশ ও দুঃখের অতলতলে নিমজ্জিত করিয়া দিতে পারে, পনেরো টাকা বেতনের আমহার্স্ট স্ট্রীট পোস্টাফিসের পিওন যে একদিন তাহার দুঃখ-সুখের বিধাতা হইবে, এ কথা কবে ভাবিয়াছিল? পূর্ব্বে কালে-ভদ্রে মায়ের চিঠি আসিত, তাহার জন্য এরূপ ব্যগ্র প্রতীক্ষার প্রয়োজন ছিল না। পরে মায়ের মৃত্যুর পর বৎসরখানেক তাহাকে একখানি পত্রও কেহ দেয় নাই! উঃ, কি দিনই গিয়াছে সেই এক বৎসর! মনে আছে, তখন রোজ সকালে চিঠির বাক্স বৃথা আশায় একবার করিয়া খোঁজ করিয়া হাসিমুখে পাশের ঘরের বন্ধুকে উদ্দেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিত—আরে, বীরেন বোসের জন্যে তো এ বাসায় আর থাকা চলে না দেখছি?—রোজ রোজ যত চিঠি আসে তার অর্দ্ধেক বীরেন বোসের নামে!

বন্ধু হাসিয়া বলিত—ওহে পাঁচজন থাকলেই চিঠিপত্তর আসে পাঁচদিক থেকে। তোমার নেই কোনও চুলোয় কেউ, দেবে কে চিঠি?

বোধ হয় কথাটা রূঢ় সত্য বলিয়াই অপুর মনে আঘাত লাগিল কথাটায়। বীরেন বোসের নানা ছাঁদের চিঠিগুলি লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত—সাদা খাম, সবুজ খাম, হলদে খাম, মেয়েলি হাতের লেখা পোস্টকার্ড, এক একবার হাতে তুলিয়া লোভ দমন করিতে না পারিয়া দেখিয়াছেও—ইতি তোমার দিদি, ইতি তোমার মা, আপনার স্নেহের ছোট বোন

সুশ্রী, ইত্যাদি। বীরেন বোস মিথ্যা বলে নাই, চারিদিকে আত্মীয় বন্ধু থাকিলেই রোজ পত্র আসে—তাহার চিঠি তো আর আকাশ হইতে পড়িবে না! আজকাল আর সে দিন নাই। পত্র লিখিবার লোক হইয়াছে এতদিনে।

জন্মাষ্টমীর ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার কথা, কিন্তু দিনগুলো মাসের মত দীর্ঘ।

অবশেষে জন্মাষ্টমীর ছুটি আসিয়া গেল। এডিটারকে বলিয়া বেলা তিনটার সময় অফিস হইতে বাহির হইয়া সে স্টেশনে আসিল। পথে নববিবাহিত বন্ধু অনাথবাবু বৈঠকখানা বাজার হইতে আম কিনিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ট্রাম ধরিতে ছুটিতেছেন। অপুর কথার উত্তরে বলিলেন—সময় নেই, তিনটে পনেরো ফেল করলে আবার সেই চারটে পঁচিশ, দু'ঘণ্টা দেরি হয়ে যাবে বাড়ি পৌঁছতে—আচ্ছা আসি, নমস্কার!

দাড়িটা ঠিক কামানো হইয়াছে তো?

মুখ রৌদ্রে, ধূলায় ও ঘামে যে বিবর্ণ হইয়া যাইবে তাহার কি? কী গাধাবোট গাড়িখানা, এতক্ষণে মোটে নৈহাটি? বাড়ি পৌঁছিতে প্রায় সন্ধ্যা হইতে পারে। খুশির সহিত ভাবিল, চিঠি লিখে তো যাচ্ছি নে, হঠাৎ দেখে অপর্ণা একেবারে অবাক হয়ে যাবে এখন—

বাড়ি যখন পৌঁছিল, তখনও সন্ধ্যার কিছু দেরি। বধূ বাড়ি নাই, বোধ হয় নিরুপমাদের বাড়ি কি পুকুরের ঘাটে গিয়াছে। কেহ কোথাও নাই। অপু ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পুঁটলি নামাইয়া রাখিয়া সাবানখানা খুঁজিয়া বাহির করিয়া আগে হাত মুখ ও মাথা ধুইয়া ফেলিয়া তাকের আয়না ও চিরুনীর সাহায্যে টেরী কাটিল। পরে নিজের আগমনের সকল চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল।

আধঘণ্টা পরেই সে ফিরিল। বধূ ঘরের মধ্যে প্রদীপের সামনে মাদুর পাতিয়া বসিয়া কি বই পড়িতেছে। অপু পা টিপিয়া টিপিয়া তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। এটা অপুর পুরানো রোগ; মায়ের সঙ্গে কতবার এরকম করিয়াছে। হঠাৎ কি একটা শব্দে বধূ পিছন ফিরিয়া চাহিয়া ভয়ে ধড়মড় করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে অপু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বধূ অপ্রতিভের সুরে বলিল—ওমা তুমি! কখন—কৈ—তোমার তো—

অপু হাসিতে হাসিতে বলিল—কেমন জব্দ। আচ্ছা তো ভীতু!

বধূ ততক্ষণে সামলাইয়া লইয়া হাসি মুখে বলিল—বা রে, ওই রকম ক'রে বুঝি আচমকা ভয় দেখাতে আছে? ক'টার গাড়িতে এলে এখন—তাই বুঝি আজ ছ-সাত দিন চিঠি দেওয়া হয় নি—আমি ভাবছি—

অপু বলিল—তারপর, তুমি কি রকম আছ, বল? মায়ের চিঠিপত্র পেয়েছ?

—তুমি কিন্তু রোগা হয়ে গিয়েছ, অসুখ-বিসুখ হয়েছিল বুঝি?

—আমার এবারকার চিঠির কাগজটা কেমন? ভালো না? তোমার জন্যে এনেছি পঁচিশখানা। তারপর রাত্রে কি খাওয়াবে বল?

—কি খাবে বলো? ঘি এনে রেখেছি, আলুপটলের ডালনা করি—আর দুধ আছে—

পরদিন সকালে উঠিয়া অপু দেখিয়া অবাক হইল, বাড়ির পিছনের উঠানে অপর্ণা ছোট ছোট বেড়া দিয়া শাকের ক্ষেত, বেগুনের ক্ষেত করিয়াছে। দাওয়ার ধারে ধারে নিজের হাতে গাঁদার চারা বসাইয়াছে। রান্নাঘরের চালায় পুঁইলতা, লাউলতা উঠাইয়া দিয়াছে। দেখাইয়া বলিল,—আজ পুঁই-শাক খাওয়াব আমার গাছের! ওই দোপাটিগুলো দ্যাখো? কত বড়, না? নিরুপমা দিদি বীজ দিয়েছেন। আর একটা জিনিস দ্যাখো নি? এসো দেখাব—

অপুর সারা শরীরে একটা আনন্দের শিহরণ বহিল। অপর্ণা যেন তাহার মনের গোপন কথাটি জানিয়া বুঝিয়াই কোথা হইতে একটা ছোট চাঁপা গাছের ডাল আনিয়া মাটিতে পুঁতিয়াছে, দেখাইয়া বলিল—দ্যাখো কেমন—হবে না এখানে ?

—হবে না আর কেন ? আচ্ছা, এত ফুল থাকতে চাঁপা ফুলের ডাল যে পুঁতত্তে গেলে ?

অপর্ণা সলজ্জমুখে বলিল—জানি নে—যাও।

অপু তো লেখে নাই, পত্রে তো একথা অপর্ণাকে জানায় নাই যে, মিত্তির বাড়ির কম্পাউন্ডের চাঁপাফুল গাছটা তাহাকে কি কষ্টই না দিয়াছে এই দু'মাস! চাঁপা ফুল যে হঠাৎ তাহার এত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, একথাটি মনে মনে অনুমান করিবার জন্য এই কর্ম্মব্যস্ত, সদা-হাসিমুখ মেয়েটির উপর তাহার মন কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল।

অপর্ণা বলিল—এখানে একটু বেড়া দিয়ে ঘিরে দেবে ? মাগো কি ছাগলের উৎপাতই তোমাদের দেশে! চারাগাছ থাকতে দেয় না, রোজ খেয়েদেয়ে সারা দুপুর কঞ্চি হাতে দাওয়ায় ব'সে ছাগল তাড়াই আর বই পড়ি—দুপুরে রোজ নিরুদি আসেন, ও-বাড়ির মেয়েরা আসে, ভারী ভাল মেয়ে কিন্তু নিরুদিদি।

আজ সারাদিন ছিল বর্ষা। সন্ধ্যার পর একটানা বৃষ্টি নামিয়াছে, হয়ত বা সারা রাত্রি ধরিয়া বর্ষা চলিবে। বাহিরে কৃষ্ণাষ্টমীর অন্ধকার মেঘে ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে। বধূ বলিল—রান্নাঘরে এসে বসবে ? গরম গরম সেঁকে দি—। অপু বলিল—তা হবে না, আজ এসো আমরা দুজনে এক পাতে খাবো! অপর্ণা প্রথমটা রাজী হইল না, অবশেষে স্বামীর পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া একটা থালায় রুটি সাজাইয়া খাবার ঠাঁই করিল।

অপু দেখিয়া বলিল—ও হবে না, তুমি আমার পাশে বসো, ও-রকম বসলে চলবে না। আরও একটু—আরও—পরে সে বাঁ-হাতে অপর্ণার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—এবার এসো দু'জনে খাই—

বধূ হাসিয়া বলিল—আচ্ছা তোমার বদখেয়ালও মাথায় আসে, মাগো মা! দেখতে তো খুব ভালমানুষটি!

লাভের মধ্যে বধূর একরূপ খাওয়াই হইল না সেরাত্রে। অন্যমনস্ক অপু গল্প করিতে করিতে থালার রুটি উঠাইতে উঠাইতে প্রায় শেষ করিয়া ফেলিল—পাছে স্বামীর কম পড়িয়া যায় এই ভয়ে সে বেচারী খান-তিনের বেশী নিজের জন্য লইতে পারিল না। খাওয়া-দাওয়ার পর অপর্ণা বলিল—কই, কি বই এনেছ বললে, দেখি ?

দু'জনেই কৌতুকপ্রিয়, সমবয়সী, সুস্থমন, বালকবালিকার মত আমোদ করিতে, গল্প করিতে, সারারাত জাগিতে, অকারণে অর্থহীন বকিতে দুজনেরই সমান আগ্রহ, সমান উৎসাহ। অপু একখানা নতুন-আনা বই খুলিয়া বলিল—পড়ো তো এই পদ্যটা ?

অপর্ণা প্রদীপের সলতেটা চাঁপার কলির মত আঙুলে দিয়া উস্কাইয়া দিয়া পিলসুজটা আরও নিকটে টানিয়া আনিল। পরে সে লজ্জা করিতেছে দেখিয়া অপু উৎসাহ দিবার জন্য বলিল—পড়ো না, কই দেখি ?

অপর্ণা যে কবিতা এত সুন্দর পড়িতে পারে অপুর তাহা জানা ছিল না। সে ঈষৎ লজ্জাজড়িত স্বরে পড়িতেছিল—

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা—

অপু পড়ার প্রশংসা করিতেই অপর্ণা বই মুড়িয়া বন্ধ করিল। স্বামীর দিকে উজ্জ্বল-মুখে চাহিয়া কৌতুকের ভঙ্গিতে বলিল—থাকগে পড়া, একটা গান করো না!

অপু বলিল—একটা টিপ পরো না খুকী ! ভারী সুন্দর মানাবে তোমার কপালে—

অপর্ণা সলজ্জ হাসিয়া বলিল—যাও—

—সত্য বলছি অপর্ণা, আছে টিপ ?—

—আমার বয়সে বুঝি টিপ পরে ? আমার ছোট বোন শান্তির এখন টিপ পরবার বয়স তো—

কিন্তু শেষে তাহাকে টিপ পরিতেই হইল। সত্যই ভারী সুন্দর দেখাইতেছিল, প্রতিমার চোখের মত টানা, আয়ত সুন্দর চোখ দুটির উপর দীর্ঘ, ঘনকালো, জোড়া ভুরুর মাঝখানটিতে টিপ মানাইয়াছে কি সুন্দর ! অপুর মনে হইল—এই মুখের জন্যই জগতের টিপ সৃষ্টি হইয়াছে—প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোয় এই টিপ-পরা মুখখানি বার-বার সতৃষ্ণ চোখে চাহিয়া দেখিবার জন্যই।

অপর্ণা বলে—ছাই দেখাচ্ছে, এ বয়সে কি টিপ মানায় ? কি করি পরের ছেলে, বললে তো আর কথা শুনবে না তুমি !

—না গো পরের মেয়ে, শোনো, একটু সরে এসো তো—

—ভারী দুষ্টু—এত জ্বালাতনও তুমি করতে পার !···

অপু বলিল—আচ্ছা, আমায় দেখতে কেমন দেখায় বলো—না সত্যি—কেমন মুখ আমার ? ভাল, না পেঁচার মত ?

অপর্ণার মুখ কৌতুকে উজ্জ্বল দেখাইল—নাক সিঁটকাইয়া বলিল—বিশ্রী, পেঁচার মত।

অপু কৃত্রিম অভিমানের সুরে বলিল—আর তোমার মুখ তো ভাল, তা হলেই হয়ে গেল। যাই, শুইগে যাই—রাত কম হয় নি—কাল ভোরে আবার—

বধূ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

এই রাত্রিটা গভীর দাগ দিয়া গিয়াছিল অপুর মনে। মাটির ঘরের আনাচে-কানাচে, গাছপালায় বাঁশবনে, ঝিম্-ঝিম্ নিশীথের একটানা বর্ষার ধারা। চারিধারই নিস্তব্ধ। পূর্বদিকের জানালা দিয়া বর্ষাসজল বাদল রাতের দমকা হাওয়া মাঝে মাঝে আসে—মাটির প্রদীপের আলোতে, খড়ের মেজেতে মাদুর বিছাইয়া সে ও অপর্ণা !

অপু বলিল—দ্যাখো আজ রাত্রে মায়ের কথা মনে হয়—মা যদি আজ থাকত !

অপর্ণা শান্ত সুরে বলিল—মা সবই জানেন, যেখানে গিয়াছেন, সেখানে থেকে সবই দেখছেন। পরে সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া চোখ তুলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—দ্যাখো, আমি মাকে দেখেছি।

অপু বিস্ময়ের দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাহিল। অপর্ণার মুখে শান্ত, স্থির বিশ্বাস ও সরল পবিত্রতা ছাড়া আর কিছু নাই।

অপর্ণা বলিল—শোন, একদিন কি মাসটায়, তোমার সেদিন চিঠি এল দুপুর বেলা। বিকেলে আঁচল পেতে পানচালার পিঁড়েতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি—সেদিন সকালে উঠোনের ঐ লাউগাছটাকে পুঁতেছি, কঞ্চি কেটে তাকে উঠিয়েছি, খেতে অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে, বুঝলে ? স্বপ্নে দেখছি—একজন কে দেখতে বেশ সুন্দর, লালপেড়ে শাড়ি-পরা, কপালে সিঁদুর, তোমার মুখের মত আদল, আমায় আদর ক'রে মাথার চুলে হাত বুলিয়ে বলছেন—ও আবাগীর মেয়ে, অবেলায় শুয়ো না, ওঠো, অসুক-বিসুক হবে আবার ? তারপর তিনি তাঁর হাতের সিঁদুরের কৌটো থেকে আমার কপালে সিঁদুর পরিয়ে দিতেই আমি চমকে জেগে উঠলাম—এমন স্পষ্ট আর সত্যি বলে মনে হ'ল যে তাড়াতাড়ি কপালে হাত দিয়ে দেখতে গেলাম সিঁদুর লেগে আছে কি না—দেখি কিছুই না—বুক ধড়াস্ ক'রে উঠল—চারদিকে অবাক হয়ে চেয়ে দেখি সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে—বাড়িতে কেউ নেই—খানিকক্ষণ না

পারি কিছু করতে—হাত পা যেন অবশ—তারপরে মনে হল, এ মা—আর কেউ না, ঠিক মা। মা এসেছিলেন এয়োতির সিঁদুর পরিয়ে দিতে। কাউকে বলি নি, আজ বললাম তোমায়।

বাহিরে বর্ষাধারার অবিশ্রান্ত রিমঝিম শব্দ। একটা কি পতঙ্গ বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে তান রাখিয়া একটানা ডাকিয়া চলিয়াছে, মাঝে মাঝে পূবে হাওয়ার দমকা, অপর্ণার মাথার চুলের গন্ধ। জীবনের এই সব মুহূর্ত্ত বড় অদ্ভুত। অনভিজ্ঞ হইলেও অপু তাহা বুঝিল। হঠাৎ ক্ষণিক বিদ্যুৎ-চমকে যেন অন্ধকার পথের অনেকখানি নজরে পড়ে। এমন সব চিন্তা মনে আসে, সাধারণ অবস্থায়, সুস্থ মনে সারাজীবনেও সে-সব চিন্তা মনে আসিত না।··· কেমন একটা রহস্য···আত্মার অদৃষ্টলিপি···একটা বিরাট অসীমতা···

কিন্তু পরক্ষণেই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। সে কোনও কথা বলিল না। কোন মন্তব্য প্রকাশ করিল না, কেহই কোন কথা বলিল না।

খানিকটা পরে সে বলিল, আর একটা কবিতা পড়ো—শুনি বরং—

অপর্ণা বলিল—তুমি একটা গান করো—

অপু রবিঠাকুরের গান গাহিল একটা, দুইটা তিনটা। তারপর আবার কথা, আবার গল্প। অপর্ণা হাসিয়া বলিল—আর রাত নেই কিন্তু—ফর্সা হয়ে এল—

—ঘুম পাচ্ছে ?

—না। তুমি একটা কাজ করো না ? কাল আর যেও না—

—অফিস কামাই করব ? তা কি কখনও চলে ?

ভোর হইয়া গেল। অপর্ণা উঠিতে যাইতেছিল, অপু কোন্ সময় ইতিমধ্যে তাহার আঁচলের সঙ্গে নিজের কাপড়ের সঙ্গে গিঁট বাঁধিয়া রাখিয়াছে, উঠিতে গিয়া টান পড়িল। অপর্ণা হাসিয়া বলিল—ওমা তুমি কি ! আচ্ছা দুষ্টু তো ··এখুনি হারাণের মা কাজ করতে আসবে—বুড়ী কি ভাববে বল দিকি ? ভাববে, এত বেলা অবধি ঘরের মধ্যে—মাগো মা, ছাড়ো, লজ্জা করে—ছিঃ।

অপু ততক্ষণে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া পড়িয়াছে।

—ছাড়ো, ছাড়ো, লক্ষ্মী—ছিঃ—এখুনি এল বলে বুড়ী, পায়ে পড়ি তোমার, ছাড়ো—

অপু নির্ব্বিকার।

এমন সময়ে বাহিরে হারাণের মায়ের গলা শোনা গেল। অপর্ণা ব্যস্তভাবে মিনতির সুরে বলিল—ওই এসেছে বুড়ী—ছাড়ো, ছিঃ—লক্ষ্মীটি—ওরকম দুষ্টুমি করে না—লক্ষ্মী—

হারাণের মা কপাটের গায়ে ধাক্কা দিয়া বলিল—ও বৌমা, ভোর হয়ে গিয়েছে। ওঠো, ওঠো, ঘড়া-ঘটিগুলো বার ক'রে দেবে না ?

অপু হাসিয়া উঠিয়া আঁচলের গিঁট খুলিয়া দিল।

অফিস কামাই করিয়া সে-দিনটাও অপু বাড়িতেই রহিয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে স্বাস্থ্য প্রদর্শনী উপলক্ষে খুব ভিড়। অপু অনেক দিন হইতে ইন্‌স্টিটিউটের সভ্য, তাহাদের জনকয়েকের উপর শিশুমঙ্গল ও খাদ্য বিভাগের তত্ত্বাবধানের ভার আছে। দুপুর হইতে সে এই কাজে লাগিয়া আছে। মন্মথ বি-এ পাশ, এটর্নির আর্টিক্‌ল্‌ড ক্লার্ক হইয়াছে। তাহার সহিত একদিন ইন্‌স্টিটিউটের বসিবার ঘরে ঘোর তর্ক। অপুর দৃঢ় বিশ্বাস—যুদ্ধের পর ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাইবে। বিলাতে লয়েড

জর্জ বলিয়াছেন, যুদ্ধশেষে ভারতবর্ষকে আমরা আর পদানত করিয়া রাখিব না। ভারতকে দিয়া আর ক্রীতদাসের কার্য্য করাইয়া লইলে চলিবে না। Indians must not remain as hewers of wood and drawers of water.

এই সময়েই একদিন ইন্‌স্টিটিউটের লাইব্রেরিতে কাগজ খুলিয়া একটা সংবাদ দেখিয়ে সে অবাক হইয়া গেল। জোয়ান অব্‌ আর্ককে রোমান্‌ ক্যাথলিক যাজক-শক্তি তাঁহাদের ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাধুর তালিকাভুক্ত করিয়াছেন।

তার শৈশবের আনন্দ-মুহূর্ত্তের সঙ্গিনী সেই পল্লীবালিকা জোয়ান—ইছামতীর ধারে শান্ত বাবলা-বনের ছায়ায় বসিয়া শৈশবের সে স্বপ্নভরা দিনগুলিতে যাহার সঙ্গে প্রথম পরিচয়! ইহার পর সে একদিন সিনেমাতে জোয়ান অব্‌ আর্কের বাৎসরিক স্মৃতি-উৎসব দেখিল। ডম্‌রেমির নিভৃত পল্লীপ্রান্তে ফ্রান্সের সকল প্রদেশ হইতে লোকজন জড়ো হইয়াছে—পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে কত নরনারী আসিয়াছে, সামরিক পোশাকে সজ্জিত ফরাসী সৈনিক কর্ম্মচারীর দল···সবসুদ্ধ মিলিয়া এক মাইল দীর্ঘ বিরাট শোভাযাত্রা ···জোয়ানের সঙ্গে তার নাড়ীর কি যেন যোগ—জোয়ানের সম্মানে তার নিজের বুক যেন গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিতেছিল, শৈশবের স্বপ্নের সে-মোহ অপু এখনও কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই।

বড় হইয়া অবধি সে এই মেয়েটিকে কি শ্রদ্ধার চোখে ভক্তির চোখে দেখিয়া আসিয়াছে এতদিন, সে-কথা জানিত এক অনিল—নতুবা কল্পনা যাহাদের পঙ্গু, মন মিনমিনে, পান্‌সে—তাহাদের কাছে সে-কথা তুলিয়া লাভ কি? কলেজে পড়িবার সময় সে বড় ইতিহাসে জোয়ানের বিস্তৃত বিবরণ পড়িয়াছে—অতীত শতাব্দীর সেই অবুঝ নিষ্ঠুরতা, ধর্ম্মমতের গোঁড়ামি, খুঁটিতে বাঁধিয়া হৃদয়হীন দাহন—সূর্য্যদেবের রথচক্রের দ্রুত আবর্ত্তনে অসীম আকাশে যেমন দুপুর হয় বৈকাল, বৈকাল হয় রাত্রি, রাত্রি হয় প্রভাত—মহাকালের রথচক্রের আবর্ত্তনে এক শতাব্দীর অন্ধকারপুঞ্জ তেমনি পরের শতাব্দীতে দূরীভূত হইয়া যাইতেছে। সত্যের শুকতারা একদিন যে প্রকাশ হইবেই, জীবনের দুঃখ দৈন্যের অন্ধকার শুধু যে প্রভাতেরই অগ্রদূত কলকাকলিময়, ফুল-ফোটা অমৃত-ঝরা প্রভাত।

অন্যমনস্ক মনে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া সে খাদ্য-বিভাগের ঘরে ঢুকিতে যাইতেছে, কে তাহাকে ডাকিল। ফিরিয়া চাহিয়া দেখিয়া প্রথমটা চিনিতে পারিল না—পরে বিস্ময়ের সুরে বলিল—প্রীতি, না? এগ্‌জিবিশন্‌ দেখতে এসেছিলে বুঝি? ভাল আছ?

প্রীতি অনেক বড় হইয়াছে। দেখিয়া বুঝিল, বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সে সঙ্গিনী একটি প্রৌঢ়া মহিলাকে ডাকিয়া বলিল—মা, আমার মাষ্টার মশায় অপূর্ব্ববাবু—সেই অপূর্ব্ববাবু।

অপু প্রণাম করিল। প্রীতি বলিল—আচ্ছা আপনার রাগ তো? এক কথায় ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন! দেখুন, কত ছোট ছিলুম, বুঝতুম কিছু? তারপর আপনাকে কত খোঁজ করেছিলুম, আর কোনও সন্ধানই কেউ বলতে পারলে না। আপনি আজকাল কি করছেন মাষ্টার মশায়?

—ছেলেও পড়াই, রাত্রে খবরের কাগজের অফিসে চাকরিও করি—

—আচ্ছা মাষ্টার মশাই, আপনাকে যদি বলি, আমাদের বাড়ি কি আপনি আর যাবেন না?

অপুর মনে পূর্ব্বতন ছাত্রীর উপর কেমন একটা স্নেহ আসিল। কথা গুছাইয়া বলিতে জানিত না, কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছিল সে সময়—তাহারও অত সহজে রাগ করা ঠিক হয় নাই। সে বলিল,—তুমি অত অপ্রতিভ ভাবে কথা বলছ কেন প্রীতি! দোষ আমারই, তুমি না হয় ছেলেমানুষ ছিলে, আমার রাগ করা উচিত হয় নি—

ঠিকানা বিনিময়ের পর প্রীতি পায়ের ধুলো লইয়া প্রণাম করিয়া বিদায় লইল।

আবার অপুর এ-কথা মনে না হইয়া পারিল না—কাল মহাকাল, সবারই মধ্যে পরিবর্ত্তন আনিয়া দিবে···তোমার বিচারের অধিকার কি?

আরও মাস দুই কোন রকমে কাটাইয়া অপু পূজার সময় দেশে গেল। সেদিন ষষ্ঠী, বাড়ির উঠানে পা দিয়া দেখিল পাড়ার একদল মেয়ে ঘরের দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া হাসিকলরব করিতেছে—অপু উপস্থিত হইতে অপর্ণা ঘোমটা টানিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল। পাড়ার মেয়েদের সে আজ ষষ্ঠী উপলক্ষে বৈকালিক জলযোগের নিমন্ত্রণ করিয়া নিজের হাতে সকলকে আলতো সিঁদুর পরাইয়াছে। হাসিয়া বলিল, ভাগ্যিস এলে! ভাবছিলাম এমন কলার বড়াটা আজ ভাজলাম—

—সত্যি, কৈ দেখি?

—বা রে, হাত মুখ ধোও—ঠাণ্ডা হও—অমন পেটুক কেন তুমি?···পেটুক গোপাল কোথাকার!

পরে সে রেকাবিতে খাবার আনিয়া বলিল,—এগুলো খেয়ে ফেলো, তারপর আরও দেব—দ্যাখো তো খেয়ে, মিষ্টি কম হয় নি তো?—তোমার তো আবার একটুখানি গুড়ে হবে না।

খাইতে খাইতে অপু ভাবিল—বেশ তো শিখেছে করতে! বেশ—

পরে দেওয়ালের দিকে চোখ পড়াতে বলিল,—বাঃ, ও-রকম আলপনা দিয়েছে কে? ভারী সুন্দর তো! অপর্ণা মৃদু হাসিয়া বলিল,—ভাদ্র মাসের লক্ষ্মীপুজোতে তো এলে না! আমি বাড়িতে পুজো করলাম,—মা করতেন, সিঁদুরমাখা কাঠা দেখি তোলা রয়েছে, তাতে নতুন ধান পেতে—বামুন খাওয়ালাম। তুমি এলেও দুটি খেতে পেতে গো—তারই ঐ আল্‌পনা—

—তাই তো! তুমি ভারী গিন্নী হয়ে উঠেছ দেখছি! লক্ষ্মীপুজো, লোক খাওয়ানো—আমার কিন্তু এসব ভারী ভাল লাগে অপর্ণা—সত্যি, মাও খুব ভালবাসতেন—একবার তখন আমরা এখানে নতুন এসেছি—একজন বুড়োমত লোক আমাদের উঠোনের ধারে এসে দাঁড়িয়ে বললে,—খোকা ক্ষিদে পেয়েছে, দুটো মুড়ি খাওয়াতে পারো?—আমি মাকে গিয়ে বললাম, মা, একজন মুড়ি খেতে চাচ্ছে, ওকে খানকতক রুটি করে খাওয়ালে ভারী খুশী হবে,—খাওয়াবে মা? মা কি করলে বলো তো?

—রুটি তৈরী ক'রে বুঝি—

—তা নয়। মা একটু ক'রে সরের ঘি ক'রে রাখত, আমি বোর্ডিং থেকে বাড়িটাড়ি এলে পাতে দিত। আমায় খুশী করবার জন্য মা সেই ঘি দিয়ে আট-দশখানা পরোটা ভেজে লোকটাকে ডেকে, দাওয়ার কোলে পিঁড়ি পেতে খেতে দিলে। লোকটা তো অবাক, তার মুখের এমন ভাব হ'ল!

রাত্রে অপর্ণা বলিল—দ্যাখো, মা চিঠি লিখেছেন,—পুজোর পর মুরারি-দা আসবেন নিতে, পাঁচ-ছ'মাস যাই নি, তুমি যাবে আমাদের ওখানে?

অপুর বড় অভিমান হইল। সে এত আশা করিয়া পূজার সময় বাড়ি আসিল, আর এ-দিকে কিনা অপর্ণা বাপের বাড়ি যাওয়ার জন্য পা বাড়াইয়া আছে? সে-ই তাহা হইলে ভাবিয়া মরে, অপর্ণার কাছে বাপেরবাড়ি যাওয়াটাই অধিকতর লোভনীয়!

অপু উদাস সুরে বলিল—বেশ, যাও। আমার যাওয়া ঘট্‌বে না, ছুটি নেই এখন। কথাটা শেষ করিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইয়া বই পড়িতে লাগিল। অপর্ণা খানিকক্ষণ পরে বলিল—এবার যে বইগুলো এনেছ আমার জন্যে, ওর মধ্যে একখানা 'চয়নিকা' তো আনলে

না ? সেই যে সে-বার বলে গেলে জন্মাষ্টমীর সময় ? এক-আধ কথার জবাব পাইয়া ভাবিল সারাদিনের কষ্টে স্বামীর হয়ত ঘুম আসিতেছে। তখন সেও ঘুমাইয়া পড়িল।

দশমীর পরদিনই মুরারি আসিয়া হাজির। জামাইকেও যাইতে হইবে, অপর্ণার মা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, ইত্যাদি নানা পীড়াপীড়ি শুরু করিল। অপু বলিল—পাগল ! ছুটি কোথায় যে যাব আমি ? বোনকে নিতে এসেছ, বোনকেই নিয়ে যাও ভাই—আমরা গরীব চাকুরে লোক, তোমাদের মত জমিদার নই—আমাদের কি গেলে চলে ?

অপর্ণা বুঝিয়াছিল স্বামী চটিয়াছে, এ অবস্থায় তাহার যাইবার ইচ্ছা ছিল না আদৌ, কিন্তু বড় ভাই লইতে আসিয়াছে সে কি করিয়াই বা 'না' বলে ? দো-টানার মধ্যে সে বড় মুশকিলে পড়িল। স্বামীকে বলিল—দ্যাখো, আমি যেতাম না। কিন্তু মুরারি-দা এসেছেন, আমি কি কিছু বলতে পারি ?···রাগ করো না লক্ষীটি, তুমি এখন না যাও, কালীপুজোর ছুটিতে অবিশ্যি ক'রে যেও—ভুলো না যেন।

অপর্ণা চলিয়া যাইবার পর মনসাপোতা আর এক দিনও ভাল লাগিল না। কিন্তু বাধ্য হইয়া সে রাত্রিটা সেখানে কাটাইতে হইল, কারণ অপর্ণারা গেল বৈকালের ট্রেনে। কোনদিন লুচি হয় না কিন্তু দাদার কাছে স্বামীকে ছোট হইতে না হয়, এই ভাবিয়া অপর্ণা দুইদিনই রাত্রে লুচির ব্যবস্থা করিয়াছিল—আজও স্বামীর খাবার আলাদা করিয়া ঘরের কোণে ঢাকিয়া রাখিয়া গিয়াছে। লুচি ক'খানা খাইয়াই অপু উদাস মনে জানালার কাছে আসিয়া বসিল। খুব জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, বাড়ির উঠানের গাছে গাছে এখনও কি পাখি ডাকিতেছে, শূন্য ঘর, শূন্য শয্যাপ্রান্ত···অপুর চোখে প্রায় জল আসিল। অপর্ণা সব বুঝিয়া তাহাকে এই কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া গেল। বড়লোকের মেয়ে কিনা ?···আচ্ছা বেশ।···অভিমানের মুখে সে একথা ভুলিয়া গেল যে, অপর্ণা আজ ছ'মাস শূন্যে বাড়িতে শূন্য শয্যায় তাহারই মুখ চাহিয়া কাটাইয়াছে !

পরদিন প্রত্যূষে অপু কলিকাতা রওনা হইল। সেখানে দিনচারেক পরেই অপর্ণার এক পত্র আসিল,—অপু সে পত্রের কোনও জবাব দিল না। দিন পাঁচ-ছয় পরে অপর্ণার আর একখানা চিঠি। উত্তর না পাইয়া ব্যস্ত আছে, শরীর ভাল আছে তো ? অসুখ-বিসুখের সময়, কেমন আছে পত্রপাঠ যেন জানায়, নতুবা বড় দুর্ভাবনার মধ্যে থাকিতে হইতেছে। তাহারও কোন জবাব গেল না।

•

মাসখানেক কাটিল।

কার্ত্তিক মাসের শেষের দিকে একদিন একখানা দীর্ঘ পত্র আসিল। অপর্ণা লিখিয়াছে—ওগো, আমার বুকে এমন পাষাণ চাপিয়ে আর কতদিন রাখবে, আমি এত কি অপরাধ করেছি তোমার কাছে ?···আজ একমাসের ওপর হ'ল তোমার একছত্র লেখা পাই নি, কি ক'রে দিন কাটাচ্ছি, তা কাকে জানাব ? দ্যাখো, যদি কোন দোষই ক'রে থাকি, তুমি যদি আমার উপর রাগ করবে তবে ত্রিভুবনে আর কার কাছে দাঁড়াই বল তো ?

অপু ভাবিল,—বেশ জব্দ, কেন যাও বাপের বাড়ি ?—আমাকে চাইবার দরকার কি, কে আমি ? সঙ্গে সঙ্গে একটা অপূর্ব্ব পুলকের ভাব মনের কোণে দেখা দিল—পথে, ট্রামে, আফিসে, বাসায়, সব-সময়, সকল অবস্থাতেই মনে না হইয়া পারিল না যে, পৃথিবীতে একজন কেহ আছে, যে সর্ব্বদা তাহার জন্য ভাবিতেছে, তাহারই চিঠি না পাইলে সে-জনের দিন কাটিতে চাহে না, জীবন বিস্বাদ লাগে।. সে যে হঠাৎ এক সুন্দরী তরুণীর নিকট এতটা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে—এ অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ অভিনব ও অদ্ভুত তাহার কাছে। অতএব তাহাকে আরও ভাবাও, আরও কষ্ট দাও, তাহার রজনী আরও বিনিদ্র করিয়া তোল।

সুতরাং অপর্ণার মিনতি বৃথা হইল। অপু চিঠির জবাব দিল না।

এদিকে অপুদের অফিসের অবস্থা বড় খারাপ হইয়া আসিল। কাগজ উঠিয়া যাইবার যোগাড়, একদিন স্বত্বাধিকারী তাহাদের কয়েকজনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, কি করা উচিত সে-সম্বন্ধে পরামর্শ। কথাবার্তার গতিকে বুঝিল কাগজের পরমায়ু আর বেশী দিন নয়। তাহার একজন সহকর্মী বাহিরে আসিয়া বলিল—এ বাজারে চাকরিটুকু গেলে মশাই দাঁড়াবার জো নেই একেবারে—বোনের বিয়েতে টাকা ধার, সুদে-আসলে অনেক দাঁড়িয়েছে, সুদটা দিয়ে থামিয়ে রাখার উপায় যদি না থাকে, মহাজন বাড়ি ক্রোক দেবে মশাই, কি যে করি!

ইতিমধ্যে অপু একদিন লীলাদের বাড়ি গেল। যাওয়া সেখানে ঘটে নাই প্রায় বছর দুই, হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে তাহাকে দেখিয়া লীলা আনন্দ ও বিস্ময়ের সুরে বলিয়া উঠিল—একি আপনি! আজ নিতান্তই পথ ভুলে বুঝি এদিকে এসে পড়লেন? অপু যে শুধু অপ্রতিভ হইল তাহা নয়, কোথায় যেন সে নিজেকে অপরাধী বিবেচনা করিল। একটুখানি আনাড়ীর মত হাসি ছাড়া লীলার কথার কোন উত্তর দিতে পারিল না। লীলা বলিল—এবার না হয় আপনার পরীক্ষার বছর, তার আগে তো অনায়াসেই আসতে পারতেন? অপু মৃদু হাসিয়া বলিল—কিসের পরীক্ষা? সে সব তো আজ বছর দুই ছেড়ে দিয়েছি। এখন খবরের কাগজের অফিসে চাকরি করি।

লীলা প্রথমটা অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কথাটা যেন বিশ্বাস করিল না, পরে দুঃখিতভাবে বলিল,—কেন, কি জন্যে ছাড়লেন পড়া, শুনি? আ-প-নি পড়া ছেড়েছেন!

লীলার চোখের ওই দৃষ্টিটা অপুর প্রাণে কেমন একটা বেদনার সৃষ্টি করিল, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার দৃষ্টি, তবুও সে হাসিমুখে কৌতুকের সুরে বলিল—এমনি দিলুম ছেড়ে, ভাল লাগে না আর, কি হবে পড়ে? তাহার এই হাল্‌কা কৌতুকের সুরে লীলা মনে আঘাত পাইল, অপূর্ব কি ঠিক সেই পুরানো দিনের অপূর্বই আছে? না যেন।

অপু বলিল—তুমি তো পড়ছ, না?

লীলা নিজের সম্বন্ধে কোন কথা হঠাৎ বলিতে চায় না, অপুর প্রশ্নের উত্তরে সহজভাবে বলিল—এবার আই-এ পাশ করেছি, থার্ড ইয়ারে পড়ছি। আপনি আজকাল পুরানো বাসায় থাকেন, না, আর কোথাও উঠে গিয়েছেন?

লীলার মা ও মাসীমা আসিলেন। লীলা নিজের আঁকা ছবি দেখাইল। বলিল—এবার আপনার মুখে 'স্বর্গ' হইতে বিদায়'টা শুনব, মা আর মাসীমা সেই জন্যে এসেছেন।

আরও খানিক পরে অপু বিদায় লইয়া বাহিরে আসিল, লীলা বৈঠকখানার দোর পর্যন্ত সঙ্গে আসিল, অপু হাসিয়া বলিল,—লীলা, আচ্ছা ছেলেবেলায় তোমাদের বাড়িতে কোন বিয়েতে তুমি একটা হাসির কবিতা বলেছিলে মনে আছে? মনে আছে সে কবিতাটা?

—উঃ! সে আপনি মনে ক'রে রেখেছেন এতদিন! সে সব কি আজকের কথা?

অপু অনেকটা আপন মনেই অন্যমনস্কভাবে বলিল—আর একবার তুমি তোমার জন্যে আনা দুধ অর্ধেকটা খাওয়ালে আমায় জোর ক'রে, শুনলে না কিছুতেই—ওঃ, দেখতে দেখতে কত বছর হয়ে গেল!

বলিয়া সে হাসিল, কিন্তু লীলা কোনও কথা বলিল না। অপু একবার পিছন দিকে চাহিল, লীলা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া কি যেন দেখিতেছে।

ফিরিবার পথে একটা কথা তাহার বার বার মনে আসিতেছিল। অপর্ণা সুন্দরী বটে,

কিন্তু লীলার সঙ্গে এ-পর্য্যন্ত দেখা কোন মেয়ের তুলনা হয় না, হওয়া অসম্ভব। লীলার রূপ মানুষের মত নয় যেন, দেবীর মত রূপ, মুখের অনুপম শ্রীতে, চোখের ও ভ্রূর ভঙ্গিতে, গায়ের রং-এ, গলার সুরে, গতির ছন্দে।

অপু বুঝিল সে লীলাকে ভালবাসে, গভীরভাবে ভালবাসে, কিন্তু তা আবেগহীন, শান্ত, ধীর ভালবাসা। মনে তৃপ্তি আনে, স্নিগ্ধ আনন্দ আনে, কিন্তু শিরায় উপশিরায় রক্তের তাণ্ডব নর্ত্তন তোলে না। লীলা তাহার বাল্যের সাথী, তাহার উপর মায়ের পেটের বোনের মত একটা মমতা, স্নেহ ও অনুকম্পা, একটা মাধুর্য্যভরা ভালবাসা।

দিন কয়েক পরে, একদিন লীলার দাদামশায়ের এক দারোয়ান আসিয়া তাহাকে একখানা পত্র দিল, উপরে লীলার হাতের ঠিকানা লেখা। পত্রখানা সে খুলিয়া পড়িল। দু-লাইনে পত্র, একবার বিশেষ প্রয়োজনে আজ বা কাল ভবানীপুরের বাড়িতে যাইতে লিখিয়াছে।

লীলা সাদাসিধা লালপাড় শাড়ি পরিয়া মাঝের ছোট ঘরে তাহার সঙ্গে দেখা করিল। যাহাই সে পরে, তাহাতেই তাহাকে কি সুন্দর না মানায়! সকাল আটটা, লীলা বোধ হয় বেশীক্ষণ ঘুম হইতে উঠে নাই, রাত্রির নিদ্রালুতা এখনও যেন ডাগর ডাগর সুন্দর চোখ হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই, মাথার চুল অবিন্যস্ত, ঘাড়ের দিকে ঈষৎ এলাইয়া পড়িয়াছে, প্রভাতের পদ্মের মত মুখের পাশে চূর্ণকুন্তলের দু'এক গাছা। অপু হাসিমুখে বলিল—থার্ড ইয়ার ব'লে বুঝি লেখাপড়া ঘুচেছে! আটটার সময় ঘুম ভাঙল? না, এখনও ঠিক ভাঙে নি?

লীলা যে কত পছন্দ করে অপুকে তাহার এই সহজ আনন্দ, খুশি ও হালকা হাসির আবহাওয়ার জন্য। ছেলেবেলাতেও সে দেখিয়াছে, শত দুঃখের মধ্যেও অপুর আনন্দ-উজ্জ্বলতা ও কৌতুকপ্রবণ মনের খুশি কেহ আটকাইয়া রাখিতে পারিত না, এখনও তাই, একরাশ বাহিরের আলো ও তারুণ্যের সজীব জীবনানন্দ সে সঙ্গে করিয়া আনে যেন, যখনই আসে—আপনা-আপনিই এসব কথা লীলার মনে হইল। তাহার মনে পড়িল, মায়ের মৃত্যুর খবরটা সে এই রকম হাসিমুখেই দিয়াছিল লালদীঘির মোড়ে।

—আসুন, বসুন, বসুন। কুড়েমি ক'রে ঘুমুই নি, কাল রাত্রে বড় মামীমার সঙ্গে বায়োস্কোপে গেছলাম সাড়ে-নটার শো'তে। ফিরতে হয়ে গেল পৌনে বারো, ঘুম আসতে দেড়টা। বসুন, চা আনি।

জাপানী গালার সুদৃশ্য চায়ের বাসনে সে চা আনিল। সঙ্গে পাঁউরুটি-টোস্ট, খোলাসুদ্ধ ডিম, কি এক প্রকার শাক, আধখানা ভাঙা আলু—সব সিদ্ধ, ধোঁয়া উড়িতেছে। অপু বলিল—এসব সাহেবী বন্দোবস্ত বোধ হয় তোমার দাদামশায়ের, লীলা? ডিম, তা আবার খোলাসুদ্ধ, এ শাকটা কি?

লীলা হাসিমুখে বলিল,—ওটা লেটুস্। দাঁড়ান, ডিম ছাড়িয়ে দি। আপনার দাড়ির কাছে ও কাটা দাগটা কিসের? কামাবার সময় কেটে ফেলেছেন বুঝি?

অপু বলিল,—ও কিছু না, এমনি কিসের। ব'সো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? তুমি চা খাবে না?

লীলার ছোট ভাই ঘরে ঢুকিয়া অপুর দিকে চাহিয়া হাসিল, নাম বিমলেন্দু, দশ-এগারো বছরের সুশ্রী বালক। লীলা তাহাকে চা ঢালিয়া দিল, পরে তিনজনে নানা গল্প করিল। লীলা নিজের আঁকা কতকগুলি ছবি দেখাইল, নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলিল। সে এম. এ. পাশ করিবে, নয় তো বি. এ. পাশ করিয়া বিদেশে যাইতে চায়, দাদামশায়কে রাজী করাইয়া লইবে, ইউরোপের বড় আর্ট গ্যালারিগুলির ছবি দেখিবে, ফিরিয়া আসিয়া অজন্তা

দেখিতে যাইবে, তার আগে নয়। একটা আলমারী দেখাইয়া বলিল—দেখুন না এই বইগুলো ? ভ্যাসারির লাইভস্—এডিশনটা কেমন ?···ছবিগুলো দেখুন—সেন্ট্ এ্যাণ্টনির ছবিটা আমার বড় ভাল লাগে, কেমন একটা তপস্যাশুদ্ধ ভাব, না ?—ইন্স্টলমেন্ট সিস্টেমে এগুলো কিনেছি—আপনি কিনবেন কিছু ? ওদের ক্যান্ভাসার আমাদের বাড়ি আসে, তা হ'লে ব'লে দি—

অপু বলিল—কত ক'রে মাসে ?···ভ্যাসারির এডিশনটা তা'হলে না হয়—

—এটা কেন কিনবেন ? এটা তো আমার কাছেই রয়েছে—আপনার যখন দরকার হবে, নেবেন—আমার কাছে যা যা আছে, তা আপনাকে কিনতে হবে কেন ?—দাঁড়ান, আর একটা বইয়ের একখানা ছবি দেখাই—

অপু ছবিটার দিক হইতে আর একবার লীলার দিকে চাহিয়া দেখিল—বতিচেলির প্রিন্সেস্ দেস্তু খুব সুন্দরী বটে, কিন্তু বতিচেলির বা দ্য-ভিঞ্চির প্রতিভা লইয়া যদি লীলার এই অপূর্ব্ব সুন্দর মুখ, এই যৌবন-পুষ্পিত দেহলতা ফুটাইয়া তুলিতে পারিত কেউ ?···

কথাটা সে বলিয়াই ফেলিল—আমি কি ভাবছি বলব লীলা ? আমি যদি ছবি আঁকতে পারতাম, তোমাকে মডেল ক'রে ছবি আঁকতাম—

লীলা সে কথার কোন জবাব না দিয়া হঠাৎ বলিল—ভাল কথা, আচ্ছা অপূর্ব্ববাবু, একটা ভাল চাকরি কোথাও যদি পাওয়া যায় তো করবেন ?

অপু বলিল—কেন করব না ; কিসের চাকরি ?

লীলা বিবরণটা বলিয়া গেল। তাহার দাদামশায় একটা বড় স্টেটের এটর্নি, তাদের অফিসে একজন সেক্রেটারী দরকার—মাইনে দেড়শো টাকা, চাকরিটা দাদামশায়ের হাতে, লীলা বলিলেই এখনই হইয়া যায়, সেই জন্যেই আজ তাহাকে এখানে ডাকিয়া আনা।

অপুর মনে পড়িল, সেদিন কথায় কথায় সে লীলার কাছে নিজের বর্ত্তমান চাকুরির দুরবস্থা ও খবরের কাগজখানা উঠিয়া যাওয়ার কথাটা কি সম্পর্কে একবারটি তুলিয়াছিল।

লীলা বলিল—সেদিন রাতে আমি তাঁর মুখে কথাটা শুনলাম, আজ সকালেই আপনাকে পত্র পাঠিয়ে দিয়েছি, আপনি রাজী আছেন তো ? আসুন, দাদামশায়ের কাছে আপনাকে নিয়ে যাই, ও'র একখানা চিঠিতে হয়ে যাবে।

কৃতজ্ঞতায় অপুর মন ভরিয়া গেল। এত কথার মধ্যে লীলা চাকুরি যাওয়ার কথাটাই কি ভাবে মনে ধরিয়া বসিয়াছিল !—

লীলা বলিল—আপনি আজ দুপুরে এখানে না খেয়ে যাবেন না। আসুন,—পাখাটা দয়া ক'রে টিপে দিন না।

কিন্তু চাকুরি হইল না। এসব ব্যাপারের অভিজ্ঞতা না থাকায় লীলা একটু ভুল করিয়াছিল, দাদামশায়কে বলিয়া রাখে নাই অপুর কথা। দিন দুই আগে লোক লওয়া হইয়া গিয়াছে। সে খুব দুঃখিত হইল, একটু অপ্রতিভও হইল। অপু দুঃখিত হইল লীলার জন্য। বেচারী লীলা ! সংসারের কোন অভিজ্ঞতা তাহার কি আছে ? একটা চাকুরি খালি থাকিলে যে কতখানা উমেদারীর দরখাস্ত পড়ে, বড়লোকের মেয়ে, তাহার খবর কি করিয়া জানিবে ?

লীলা বলিল—আপনি এক কাজ করুন না, আমার কথা রাখতে হবে কিন্তু, ছেলেবেলার মত একগুঁয়ে হলে কিন্তু চলবে না—প্রাইভেটে বি. এ.-টা দিয়ে দিন। আপনার পক্ষে সেটা কঠিন না কিছু।

অপু বলিল—বেশ দেব।

লীলা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল—ঠিক ? অনার ব্রাইট ?

—অনার ব্রাইট।

শীতের অনেক দেরি, কিন্তু এরই মধ্যে লীলাদের গাড়িবারান্দার পাশে জাফরিতে ওঠানো মার্শালনীলের লতায় ফুল দেখা দিয়াছে, বারান্দার সিঁড়ির দু'পাশের টবে বড় বড় পল নিরোন ও ব্ল্যাক প্রিন্স ফুটিয়াছে। বর্ষাশেষে চাইনিজ ফ্যান্ পামের পাতাগুলো ঘন সবুজ।

পদ্মপুকুর রোডে পা দিয়া অপুর চোখ জলে ভরিয়া আসিল। লীলা, ছেলেমানুষ লীলা—সে কি জানে সংসারের রূঢ়তা ও নিষ্ঠুর সংঘর্ষের কাহিনী? আজ তাহার মনে হইল, লীলার পায়ে একটা কাঁটা ফুটিলে সেটা তুলিয়া দিবার জন্য সে নিজের সুখ শান্তি সম্পূর্ণ উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করিতে পারে।

বিবাহের পর লীলার সঙ্গে এই প্রথম দেখা, কিন্তু দু-একবার বলি বলি করিয়াও অপু বিবাহের কথা বলিতে পারিল না, অথচ সে নিজে ভালই বোঝে যে, না বলিতে পারিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

এক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। পুনরায় পূজার বিলম্ব অতি সামান্যই।

শনিবার। অনেক অফিস আজ বন্ধ হইবে, অনেকগুলি সম্মুখের মঙ্গলবারে বন্ধ। দোকানে দোকানে খুব ভীড়—ঘণ্টাখানেক পথে হাঁটিলে হ্যাণ্ডবিল হাত পাতিয়া লইতে লইতে ঝুড়িখানেক হইয়া উঠে। একটা নতুন স্বদেশী দেশলাইয়ের কারখানা পথে পথে জাঁকাল বিজ্ঞাপন মারিয়াছে।

আমড়াতলা গলির বিখ্যাত ধনী ব্যবসাদার নকুলেশ্বর শীলের প্রাসাদোপম সুবৃহৎ অট্টালিকার নিম্নতলেই ইঁহাদের অফিস। অনেকগুলি ঘর ও দুটা বড় হল কর্ম্মচারিতে ভর্ত্তি। দিনমানেও ঘরগুলির মধ্যে ভালো আলো যায় না বলিয়া বেলা চারটা না বাজিতেই ইলেকট্রিক আলো জ্বলিতেছে।

ছোকরা টাইপিস্ট নৃপেন সন্তর্পণে পর্দ্দা ঠেলিয়া ম্যানেজারের ঘরে ঢুকিল। ম্যানেজার নকুলেশ্বর শীলের বড় জামাই দেবেন্দ্রবাবু। ভারী কড়া মেজাজের মানুষ। বয়স পঞ্চাশ ছাড়াইয়াছে, দোহারা ধরণের চেহারা। বেশ ফর্সা, মাথায় টাক। এক কলমের খোঁচায় লোকের চাকরি খাইতে এমন পারদর্শী লোক খুব অল্পই দেখা যায়। দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন —কি হে নৃপেন?

নৃপেন ভূমিকাস্বরূপ দুইখানা টাইপ-ছাপা কি কাগজ মঞ্জুর করাইবার ছলে তাঁহার টেবিলের উপর রাখিল।

সহি শেষ হইলে নৃপেন একটু উশখুশ করিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া আরক্তমুখে বলিল—আমি—এই—আজ বাড়ি যাব—একটু সকালে, চারটেতে গাড়ি কি না? সাড়ে তিনটেতে না গেলে—

—তুমি এই সেদিন তো বাড়ি গেলে মঙ্গলবারে। রোজ রোজ সকালে ছেড়ে দিতে গেলে অফিস চলে কেমন ক'রে? এখনও তো একখানা চিঠি টাইপ কর নি দেখছি—

এ অফিসে শনিবারে সকালে ছুটির নিয়ম নাই। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার পূর্ব্বে কোনদিন অফিসের ছুটি নাই। কি শনিবার কি অন্যদিন। কোনও পাল-পার্ব্বণে ছুটি নাই, কেবল পূজার সময় এক সপ্তাহ, শ্যামাপূজায় একদিন ও সরস্বতী পূজায় একদিন। অবশ্য রবিবারগুলি বাদ। ইহাদের বন্দোবস্ত এইরূপ—চাকরি করিতে হয় কর, নতুবা যাও চলিয়া। এ ভয়ানক বেকার সমস্যার দিনে কর্ম্মচারিগণ নবমীর পাঁঠার মত কাঁপিতে কাঁপিতে চাণক্য-

শ্লোকের উপদেশ মত চাকরিকে পুরোভাগে বজায় ও ছুটিছাটা, অপমান-অসুবিধাকে পশ্চাদ্দিকে নিক্ষেপ করতঃ কায়ক্লেশে দিন অতিবাহিত করিয়া চলিয়াছেন।

নৃপেন কি বলিতে যাইতেছিল—দেবেনবাবু বাধা দিয়া বলিলেন—মল্লিক ব্র্যান্ড্ চৌধুরীদের মর্টগেজখানা টাইপ করেছিলে ?

নৃপেন কাঁদ-কাঁদ মুখে বলিল—আজ্ঞে, কই ওদের অফিস থেকে তো পাঠিয়ে দেয় নি এখনও ?

—পাঠিয়ে দেয় নি তো ফোন কর নি কেন ? আজ সাতদিন থেকে বলছি—কচি খোকা তো নও ?···যা আমি না দেখব তাই হবে না ?

নৃপেনের ছুটির কথা চাপা পড়িয়া গেল এবং সে বেচারী পুনরায় সাহস করিয়া সে-কথা উঠাইতেও পারিল না।

সন্ধ্যার অল্প পূর্বে ক্যাশ ও ইংলিশ ডিপার্টমেণ্টের কেরানীরা বাহির হইল—অন্য অন্য কেরানীগণ আরও ঘণ্টাখানেক থাকিবে। অত্যন্ত কম বেতনের কেরানী বলিয়া কেহই তাহাদের মুখের দিকে চায় না, বা তাহারা নিজেরাও আপত্তি উঠাইতে ভয় পায়।

দেউড়িতে দারোয়ানেরা বসিয়া খৈনী খাইতেছে, ম্যানেজার ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের যাতায়াতের সময় উঠিয়া দাঁড়াইয়া ফৌজের কায়দায় সেলাম করে, ইহাদিগকে পোঁছেও না।

ফুটপাথে পা দিয়া নৃপেন বলিল—দেখলেন অপূর্ববাবু, ম্যানেজার বাবুর ব্যাপার ? এক দিন সাড়ে তিনটের সময় ছুটি চাইলাম, তা দিলে না—অন্য সব অফিস দেখুন গিয়ে দুটোতে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তারা সব এতক্ষণে ট্রেনে যে যার বাড়ি পেঁছে চা খাচ্ছে আর আমরা এই বেরুলাম—কি অত্যাচারটা বলুন দিকি ?

প্রবোধ মুহুরী বলিল—অত্যাচার ধ'লে মনে কর ভায়া, কাল থেকে এস না, মিটে গেল। কেউ তো অত্যাচার পোয়াতে বলে নি। ওঃ, খিদে যা পেয়েছে ভায়া, একটা মানুষ পেলে ধরে খাই এমন অবস্থা। রোজ রোজ এমনি—হার্টের রোগ জন্মে গেল ভায়া, শুধু না খেয়ে খেয়ে—

অপু হাসিয়া বলিল—দেখবেন প্রবোধ-দা, আমি পাশে আছি, এ যাত্রা আমাকে না হয় রেহাই দিন। ধরে খেতে হয় রাস্তার লোকের ওপর দিয়ে আজকের খিদেটা শান্ত করুন। আমি আজ তৈরী হয়ে আসি নি। দোহাই দাদা !

তাহার দুঃখের কথা লইয়া এরূপ ঠাট্টা করাতে প্রবোধ মুহুরী খুব খুশী হইল না। বিরক্তমুখে বলিল, তোমাদের তো সব তাতেই হাসি আর ঠাট্টা, ছেলেছোকরার কাছে কি কোন কথা বলতে আছে···আমি যাই, তাই বলি। হাসি সোজা ভাই, কই দাও দিকি ম্যানেজারকে ব'লে পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে ? হুঃ, তার বেলা—

অপুকে হাঁটিতে হয় রোজ অনেকটা। তার বাসা শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের মধ্যে, গোলদীঘির কাছে। তের টাকা ভাড়াতে নীচু একতলা ঘর, ছোট রান্নাঘর। সামান্য বেতনে দু'জায়গায় সংসার চালানো অসম্ভব বলিয়া আজ বছরখানেক হইল সে অপর্ণাকে কলিকাতায় আনিয়া বাসা করিয়াছে। তবুও এখানে চাকরিটি জুটিয়াছিল তাই রক্ষা।···

শৈশবের স্বপ্ন এ ভাবেই প্রায় পর্যবসিত হয়। অনভিজ্ঞ তরুণ মনের উচ্ছ্বাস, উৎসাহ—মাধুর্য-ভরা রঙীন ভবিষ্যতের স্বপ্ন—স্বপ্নই থাকিয়া যায়। যে ভাবে বড় সওদাগর হইবে, দেশে দেশে বাণিজ্যের কুঠী খুলিবে, তাহাকে হইতে হয় পাড়াগাঁয়ের হাতুড়ে ডাক্তার, যে ভাবে ওকালতি পাশ করিয়া রাসবিহারী ঘোষ হইবে, তাহাকে হইতে হয় কয়লার দোকানী, যাহার আশা থাকে সারা পৃথিবী ঘুরিয়া দেখিয়া বেড়াইবে, কি দ্বিতীয় কলম্বস হইবে, তাহাকে হইতে হয় চল্লিশ টাকা বেতনের স্কুলমাস্টার।

শতকরা নিরানব্বই জনের বেলা যা হয়, অপুর বেলাও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। যথা-নিয়মে সংসার-যাত্রা, গৃহস্থালী, কেরানীগিরি, ভাড়া বাড়ি, মেলিন্স্ ফুড ও অয়েলক্লথ। তবে তাহার শেষোক্ত দুটির এখনও আবশ্যক হয় নাই—এই যা।

অপর্ণা ঘরের দোরের কাছে বঁটি পাতিয়া কুট্না কুটিতেছে, স্বামীকে দেখিয়া বলিল—আজ এত সকাল সকাল যে! তারপর সে বঁটিখানা ও তরকারীর চুপড়ি একপাশে সরাইয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অপু বলিল, খুব সকাল আর কৈ, সাতটা বেজেছে, তবে অন্যদিনের তুলনায় সকাল বটে। হ্যাঁ, তেলওয়ালা আর আসে নি তো?

—এসেছিল একবার দুপুরে, ব'লে দিয়েছি বুধবারে মাইনে হ'লে আসতে। তোমার আসবার দেরি হবে ভেবে এখনও আমি চায়ের জল চড়াই নি।

কলের কাছে অন্য ভাড়াটেদের ঝি-বৌয়েরা এ সময় থাকে বলিয়া অপর্ণা স্বামীর হাত মুখ ধুইবার জল বারান্দার কোণে তুলিয়া রাখে। অপু মুখ ধুইতে গিয়া বলিল, রজনীগন্ধা গাছটা হেলে পড়েছে কেন বল তো? একটু বেঁধে দিও।

চা খাইতে বসিয়াছে, এমন সময়ে কলের কাছে কোন প্রৌঢ়া-কণ্ঠের কর্কশ আওয়াজ শোনা গেল—তা হলে বাপু একশো টাকা বাড়িভাড়া দিয়ে সাহেব পাড়ায় থাকো গে। আজ আমার মাথা ধরেছে, কাল আমার ছেলের সর্দি লেগেছে—পালার দিন হলেই যত ছুতো। নাও না, সারা ওপরটাই তোমরা ভাড়া নাও না; দাও না পঁয়ষট্টি টাকা—আমরা না হয় আর কোথাও উঠে যাই, রোজ রোজ হাঙ্গামা কে সহ্য করে বাপু?

অপু বলিল—আবার বুঝি আজ বেধেছে গাঙ্গুলী-গিন্নীর সঙ্গে?

অপর্ণা বলিল—নতুন ক'রে বাধবে কি, বেধেই তো আছে। গাঙ্গুলী-গিন্নীরও মুখ বড় খারাপ, হালদারদের বৌটা ছেলেমানুষ, কোলের মেয়ে নিয়ে পেরে ওঠে না, সংসারে তো আর মানুষ নেই, তবুও আমি এক-একদিন গিয়ে বাট্না বেটে দিয়ে আসি।

সিঁড়ি ও রোয়াক ধুইবার পালা লইয়া উপরের ভাড়াটেদের মধ্যে এ রেষারেষি, দ্বন্দ্ব—অপু আসিয়া অবধি এই এক বৎসরের মধ্যে মিটিল না। সকলের অপেক্ষা তাহার খারাপ লাগে ইহাদের এই সংকীর্ণতা, অনুদারতা। কট্ কট্ করিয়া শক্ত কথা শুনাইয়া দেয়—বাঁচিয়া, বাঁচাইয়া কথা বলে না, কোন্ কথায় লোকের মনে আঘাত লাগে, সে কথা ভাবিয়াও দেখে না।

বাড়িটাতে হাওয়া খেলে না, বারান্দাটাতে বসিলে হয়ত একটু পাওয়া যায়, কিন্তু একটু দূরেই ঝাঁঝরি-ড্রেন, সেখানে সারা বাসার তরকারীর খোসা, মাছের আঁশ, আবর্জনা, বাসি ভাত-তরকারী পচিতেছে, বর্ষার দিনে বাড়িময় ময়লা ও আধময়লা কাপড় শুকাইতেছে, এখানে তোবড়ানো টিনের বাক্স, ওখানে কয়লার ঝুড়ি। ছেলেমেয়েগুলো অপরিষ্কার, ময়লা পেনী বা ফ্রক পরা। অপুদের নিজেদের দিকটা ওরই মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিলে কি হয়, এই ছোট্ট বারান্দার টবে দু-চারটে রজনীগন্ধা, বিদ্যাপাতার গাছ রাখিলে কি হয়, এই এক বৎসর সেখানে আসিয়া অপু বুঝিয়াছে, জীবনের সকল সৌন্দর্য, পবিত্রতা, মাধুর্য এখানে পলে পলে নষ্ট করিয়া দেয়, এই আবহাওয়ার বিষাক্ত বাষ্পে মনের আনন্দকে গলা টিপিয়া মারে। চোখে পীড়া দেয় যে অসুন্দর, তা ইহাদের অঙ্গের আভরণ। থাকিতে জানে না, বাস করিতে জানে না, শূকরপালের মত খায় আর কাদায় গড়াগড়ি দিয়া মহা আনন্দে দিন কাটায়। এত কুশ্রী বেষ্টনীর মধ্যে দিন দিন যেন তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু উপায় নাই, মনসাপোতা থাকিলেও আর কুলায় না, অথচ তের টাকা ভাড়ায় এর চেয়ে ভাল ঘর শহরে কোথাও মেলে না। তবুও অপর্ণা এই আলো-হাওয়াবিহীন স্থানেও

শ্রী-ছাঁদ আনিয়াছে, ঘরটা নিজের হাতে সাজাইয়াছে, বাক্সপেঁটরাতে নিজের হাতে বোনা ঘেরাটোপ, জানালায় ছিটের পর্দ্দা, বালিশ মশারী সব ধপ ধপ করিতেছে, দিনে দু'তিনবার ঘর ঝাঁট দেয়।

এই বাড়ির উপরের তলার ভাড়াটে গাঙ্গুলীদের একজন দেশস্থ আত্মীয় পীড়িত অবস্থায় এখানে আসিয়া দু-তিন মাস আছেন। আত্মীয়টি প্রৌঢ়, সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে। দেখিয়া মনে হয় অতি দরিদ্র, বড়লোক আত্মীয়ের আশ্রয়ে এখানে রোগ সারাইতে আসিয়াছেন ও চোরের মত একপাশে পড়িয়া আছেন। বোটি যেমন শান্ত তেমনি নিরীহ,—ইতিপূর্ব্বেও কখনও কলিকাতায় আসে নাই—দিনরাত জুজুর মত হইয়া আছে। মা সারাদিন সংসারের খাটুনি খাটে, সময় পাইলেই, রুগ্ণ স্বামীর মুখের দিকে উদ্বিগ্নদৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া থাকে। তাহার উপর গাঙ্গুলী-বৌয়ের ঝঙ্কার, বিরক্তি প্রদর্শন, মধুবর্ষণ তো আছেই। অত্যন্ত গরীব, অপু রোগী দেখিতে যাইবার ছলে মাঝে মাঝে বেদানা, আঙ্গুর, লেবু দিয়া আসিয়াছে। সেদিনও বড় ছেলেটিকে জামা কিনিয়া দিয়াছে।

এদিকে তাহারও চলে না। এ সামান্য আয়ে সংসার চালানো একরূপ অসম্ভব। অপর্ণা অন্যদিকে ভাল গৃহিণী হইলেও পয়সা-কড়ির ব্যাপারটা ভাল বোঝে না—দুজনে মিলিয়া মহা আমোদে মাসের প্রথম দিকটা খুব খরচ করিয়া ফেলে—শেষের দিকে কষ্ট পায়।

কিন্তু সকলের অপেক্ষা কষ্টকর হইয়াছে অফিসের এই ভূতগত খাটুনি। ছুটি বলিয়া কোনও জিনিস নাই এখানে। ছোট ঘরটিতে টেবিলের সামনে ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া থাকা সকাল এগারোটা হইতে বৈকাল সাতটা পর্য্যন্ত। আজ দেড় বৎসর ধরিয়া এই চলিতেছে। এই দেড় বৎসরের মধ্যে সে শহরের বাহিরে কোথাও যায় নাই। অফিস আর বাসা, বাসা আর অফিস। শীলবাবুদের দমদমার বাগান-বাড়িতে সে একবার গিয়াছিল, সেই হইতে তাহার মনের মধ্যে সাধ নিজের মনের মত গাছ-পালায় সাজানো বাগান-বাড়িতে বাস করা। অফিসে যখন কাজ থাকে না, তখন একখানা কাগজে কাল্পনিক বাগান-বাড়ির নক্সা আঁকে। বাড়িটা যেমন তেমন হউক, গাছপালার বৈচিত্র্যই থাকিবে বেশী। গেটের দু'ধারে দুটা চীনা বাঁশের ঝাড় থাকুক। রাঙা সুরকীর পথের ধারে ধারে রজনীগন্ধা ও ল্যাভেণ্ডার ঘাসের পাড় বসানো বকুল ও কৃষ্ণচূড়ার ছায়া।

বাড়িতে ফিরিয়া চা ও খাবার খাইয়া স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করে—হ্যাঁ, তারপর কাঁটালি চাঁপার পারগোলাটা কোন্ দিকে হবে বলো তো?

অপর্ণা স্বামীকে এই দেড় বছরে খুব ভাল করিয়া বুঝিয়াছে। স্বামীর এইসব ছেলে-মানুষিতে সেও সোৎসাহে যোগ দেয়। ব'লে—শুধু কাঁটালি চাঁপা? আর কি কি থাকবে, জানলার জাফরিতে কি উঠিয়ে দেব বল তো?

যে আমড়াতলার গলির ভিতর দিয়া সে অফিস যায় তাহার মত নোংরা স্থান আর আছে কি-না সন্দেহ। ঢুকিতেই শুঁটকী চিংড়ি মাছের আড়ত সারি সারি দশ-পনেরোটা। চড়া রৌদ্রের দিনে যেমন তেমন, বৃষ্টির দিনে কার সাধ্য সেখান দিয়া যায়? স্থানে স্থানে মারোয়াড়ীদের গরু ও ষাঁড় পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া—পিচপিচে কাদা, গোবর, পচা আপেলের খোলা।

নিত্য দু'বেলা আজ দেড় বৎসর এই পথে যাতায়াত।

তা ছাড়া রোজ বেলা এগারোটা হইতে সাতটা পর্য্যন্ত এই দারুণ বদ্ধতা! অফিসে অন্য যাহারা আছে, তাহাদের ইহাতে তত কষ্ট হয় না। তাহারা প্রবীণ, বহুকাল ধরিয়া তাহাদের খাকের কলম শীলবাবুদের সেরেস্তায় অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিতেছে, তাহাদের গর্ব্বও এইখানে। রোকড়-নবীশ রামধনবাবু বলেন—হেঁ হেঁ, কেউ পারবে না মশাই, আজ এক

কলমে বাইশ বছর হ'ল বাবুদের এখানে—কোন ব্যাটার ফুঁ খাটবে না বলে দিও—চার সালের ভূমিকম্প মনে আছে? তখন কর্ত্তা বেঁচে, গদী থেকে বেরুচ্ছি, ওপর থেকে কর্ত্তা হেঁকে বললেন, ওহে রামধন, পোস্তা থেকে ল্যাংড়া আমের দরটা জেনে এসো দিকি চট ক'রে—বেরুতে যাবো মশাই—আর যেন মা বাসুকি একেবারে চৌদ্দ হাজার ফণা নাড়া দিয়ে উঠলেন—সে কি কাণ্ড মশাই? হেঁ হেঁ, আজকের লোক নই—

কষ্ট হয় অপুর ও ছোকরা টাইপিস্ট নৃপেনের। সে বেচারী উঁকি মারিয়া দেখিয়া আসে ম্যানেজার ঘরে বসিয়া আছে কিনা। অপুর কাছে টুলের উপর বসিয়া বলে, এখনও ম্যানেজার হাইকোর্ট থেকে ফেরেন নি বুঝি, অপূর্ব্ববাবু—ছটা বাজে, আজ ছুটি সেই সাতটায়—

অপু বলে, ও-কথা আর মনে করিয়ে দেবেন না, নৃপেনবাবু। বিকেল এত ভালবাসি, সেই বিকেল দেখি নি যে আজ কত দিন। দেখুন তো বাইরে চেয়ে, এমন চমৎকার বিকেলটি, আর এই অন্ধকার ঘরে ইলেকট্রিক আলো জেবলে ঠায় বসে আছি সেই সকাল দশটা থেকে।

মাটির সঙ্গে যোগ অনেকদিনই তো হারাইয়াছে, সে সব বৈকাল তো এখন দূরের স্মৃতি মাত্র। কিন্তু কলিকাতা শহরের যে সাধারণ বৈকালগুলি তাও তো সে হারাইতেছে প্রতিদিন। বেলা পাঁচটা বাজিলে এক-একদিন লুকাইয়া বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়া সম্মুখের বাড়ির উঁচু কার্ণিশের উপর যে একটুখানি বৈকালের আকাশ চোখে পড়ে তারই দিকে বুভুক্ষুর দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে।

সামনেই উপরের ঘরে মেজবাবু বন্ধুবান্ধব লইয়া বিলিয়ার্ড খেলিতেছেন, মার্কারটা রেলিং-এর ধারে দাঁড়াইয়া সিগারেট খাইয়া পুনরায় ঘরে ঢুকিল। মেজবাবুর বন্ধু নীলরতন-বাবু একবার বারান্দায় আসিয়া কাহাকে হাঁক দিলেন। অপুর মনে হয় তাহার জীবনের বৈকালগুলি এরা পয়সা দিয়া কিনিয়া লইয়াছে, সবগুলি এখন ওদের জিম্মায়, তাহার নিজের আর কোন অধিকার নাই উহাতে।

প্রথম জীবনের সে-সব মাধুরীভরা মুহূর্ত্তগুলি যৌবনের কলকোলাহলে কোথায় মিলাইয়া গেল? কোথায় সে নীল আকাশ, মাঠ, আমের বউলের গন্ধভরা জ্যোৎস্নারাত্রি? পাখি আর ডাকে না, ফুল আর ফোটে না, আকাশ আর সবুজ মাঠের সঙ্গে মেশে না—ঘেঁটুফুলের ঝোপে সদ্যফোটা ফুলের তেতো গন্ধ আর বাতাসকে তেতো করে না। জীবনে সে যে রোমান্সের স্বপ্ন দেখিয়াছিল—যে স্বপ্ন তাহাকে একদিন শত দুঃখের মধ্য দিয়া টানিয়া আনিয়াছে তার সন্ধান তো কই এখনও মিলিল না? এ তো একরঙা ছবির মত বৈচিত্র্যহীন, কর্ম্মব্যস্ত, একঘেয়ে জীবন—সারাদিন এখানে অফিসের বদ্ধজীবন, রোকড়, খতিয়ান, মর্টগেজ, ইনকামট্যাক্সের কাগজের বোঝার মধ্যে পক্ককেশ প্রবীণ ঝুনো সংসারাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সঙ্গে সাপিনা ধরানোর প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে পরামর্শ করা, এটর্নিদের নামে বড় বড় চিঠি মুশাবিদা করা—সন্ধ্যায় পায়রার খোপের মত অপরিস্কার নোংরা বাসাবাড়িতে ফিরিয়াই তখনি আবার ছেলে পড়াইতে ছোটা।

কেবল এক অপর্ণাই এই বদ্ধ জীবনের মধ্যে আনন্দ আনে। অফিস হইতে ফিরিলে সে যখন হাসিমুখে চা লইয়া কাছে দাঁড়ায়, কোনদিন হালুয়া, কোনদিন দু-চারখানা পরোটা, কোনদিন বা মুড়ি নারিকেল রেকাবিতে সাজাইয়া সামনে ধরে, তখন মনে হয় এ যদি না থাকিত! ভাগ্যে অপর্ণাকে সে পাইয়াছিল! এই ছোট্ট পায়রার খোপকে যে গৃহ বলিয়া মনে হয় সে শুধু অপর্ণা এখানে আছে বলিয়া, নতুবা চৌকী, টুল, বাসন-কোসন, জানালার পর্দ্দা, এসব সংসার নয়; অপর্ণা যখন বিশেষ ধরণের শাড়িটি পরিয়া ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করে, অপু ভাবে, এ স্নেহনীড় শুধু ওরই চারিধারে ঘিরিয়া, ওরই মুখের হাসি বুকের স্নেহ যেনুপরম আশ্রয়, নীড় রচনা সে ওরই ইন্দ্রজাল।

অফিসে সে নানা স্থানের ভ্রমণকাহিনী পড়ে, ডেস্কের মধ্যে পুরিয়া রাখে। পুরানো বইয়ের দোকান হইতে নানা দেশের ছবিওয়ালা বর্ণনাপূর্ণ বই কেনে—নানা দেশের রেলওয়ে বা স্টীমার কোম্পানী যে সব দেশে যাইতে সাধারণকে প্রলুব্ধ করিতেছে—কেহ বলিতেছে, হাওয়াই দ্বীপে এস একবার—এখানকার নারিকেল কুঞ্জে, ওয়াকিকির বালুময় সমুদ্রবেলায় জ্যোৎস্নারাত্রে যদি তারাভিমুখী ঊর্ম্মিমালার সঙ্গীত না শুনিয়া মর, তবে তোমার জীবন বৃথা।

এলো-পাশো দেখ নাই। দক্ষিণ কালিফোর্ণিয়ার চুনাপাথরের পাহাড়ের ঢালুতে, শান্ত রাত্রির তারাভরা আকাশের তলে কম্বল বিছাইয়া একবারটি ঘুমাইয়া দেখিও শীতের শেষে নুড়িভরা উঁচুনীচু প্রান্তরে কর্কশ ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে দু-এক ধরণের মাত্র বসন্তের ফুল প্রথম ফুটিতে শুরু করে, তখন সেখানকার সোডা-আলকালির পলিমাটিপড়া রৌদ্রদীপ্ত মুক্ত মরুবলয়ের রহস্যময় রূপ—কিংবা ওয়ালোয়া হ্রদের তীরে উন্নত পাইন ও ডগলাস ফারের ঘন অরণ্য, হ্রদের স্বচ্ছ, বরফগলা জলের তুষারকিরিটী মাজামা আগ্নেয়গিরি প্রতিচ্ছায়ার কম্পন—উত্তর আমেরিকার ঘন স্তব্ধ, নির্জ্জন অরণ্যভূমির নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল দৃশ্যরাজি, কর্কশ বন্ধুর পর্ব্বতমালা, গম্ভীরনিনাদী জলপ্রপাত, ফেনিল পাহাড়ী নদীতীরে বিচরণশীল বল্‌গা হরিণের দল, ভালুক, পাহাড়ী ছাগল, ভেড়ার দল, উষ্ণ প্রস্রবণ, তুষারপ্রবাহ, পাহাড়ের ঢালুর গায়ে সিডার ও মেপল গাছের বনের মধ্যে বুনো ভ্যালেরিয়ান্ ও ভায়োলেট্ ফুলের বিচিত্র বর্ণসমাবেশ—দেখ নাই এসব? এস এস।

টাহিটি! টাহিটি! কোথায় কত দূরে, কোন্ জ্যোৎস্নালোকিত রহস্যময় কূলহীন স্বপ্ন-সমুদ্রের পারে, শুভরাত্রে গভীর জলের তলায় যেখানে মুক্তার জন্ম হয়, সাগরগুহায় প্রবালের দল ফুটিয়া থাকে, কানে শুধু দূরশ্রুত সঙ্গীতের মত তাহাদের অপূর্ব্ব আহ্বান ভাসিয়া আসে। অফিসের ডেস্কে বসিয়া এক একদিন সে স্বপ্নে ভোর হইয়া থাকে—এই সবের স্বপ্নে। ঐ রকম নির্জ্জন স্থানে, যেখানে লোকালয় নাই, ঘন নারিকেল কুঞ্জের মধ্যে ছোট কুটিরে, খোলা জানালা দিয়া দূরের নীল সমুদ্র চোখে পড়িবে—তার ওপারে মরকতশ্যাম ছোট ছোট দ্বীপ, বিচিত্র পক্ষীরাজি, অজানা দেশের অজানা আকাশের তলে তারার আলোয় উজ্জ্বল মাঠটা একটা রহস্যের বার্ত্তা বহিয়া আনিবে—কুটিরের ধারে ফুটিয়া থাকিবে ছোট ছোট বনফুল—শুধু সে আর অপর্ণা।

এই সব বড়লোকের টাকা আছে, কিন্তু জগৎকে দেখিবার, জীবনকে বুঝিবার পিপাসা কই এদের? এ সিমেণ্টে বাঁধানো উঠান, চেয়ার, কোচ, মোটর—এ ভোগ নয়, এই শৌখীন বিলাসিতার মধ্যে জীবনের সবদিকে আলো-বাতাসের বাতায়ন আটকাইয়া এ মরিয়া থাকা—কে বলে ইহাকে জীবন? তাহার যদি টাকা থাকিত? কিছুও যদি থাকিত, সামান্যও কিছু! অথচ ইহারা তো লাভ ক্ষতি ছাড়া আর কিছু শেখে নাই, বোঝেও না, জানে না, জীবনে আগ্রহও নাই কিছুতেই, ইহাদের সিন্দুক-ভরা নোটের তাড়া।

এই অফিস-জীবনের বন্ধতাকে অপু শান্তভাবে, নিরুপায়ের মত দুর্ব্বলের মত মাথা পাতিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই। ইহার বিরুদ্ধে, এই মানসিক দারিদ্র্য ও সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে তাহার মনে একটা যুদ্ধ চলিতেছে অনবরত, সে হঠাৎ দমিবার পাত্র নয় বলিয়াই এখনও টিকিয়া আছে,—ফেনোচ্ছল সুরার মত জীবনের প্রাচুর্য্য ও মাদকতা তাহার সারা অঙ্গের শিরায় উপশিরায়—ব্যগ্র, আগ্রহভরা তরুণ জীবন বুকের রক্তে উন্মত্ততালে স্পন্দিত হইতেছে দিনরাত্রি—তাহার স্বপ্নকে আনন্দকে নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া মারিয়া ফেলা খুব সহজসাধ্য নয়।

কিন্তু এক এক সময় তাহারও সন্দেহ আসে। জীবন যে এই রকম হইবে, সূর্য্যোদয়

হইতে সর্ব্বান্ত পর্য্যন্ত প্রতি দণ্ড পল যে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর বৈচিত্র্যহীন ঘটনার ভরিয়া উঠিবে, তাহার কল্পনা তো তাহাকে এ আভাস দেয় নাই। তবে কেন এমন হয়! তাহাকে কাঁচা, অনভিজ্ঞ পাইয়া নিষ্ঠুর জীবন তাহাকে এতদিন কি প্রতারণাই করিয়া আসিয়াছে? ছেলেবেলায় মা যেমন নগ্ন দারিদ্র্যের রূপকে তাহার শৈশবচক্ষু হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে চাহিত তেমনই।···

দেখিতে দেখিতে পূজা আসিয়া গেল। আজ দু'বৎসর এখানে সে চাকরি করিতেছে, পূজার পূর্ব্বে প্রতিবারই সে ও নৃপেন টাইপিস্ট কোথাও না কোথাও যাইবার পরামর্শ আঁটিয়াছে, নক্সা আঁকিয়াছে, ভাড়া কষিয়াছে, কখনও পুরুলিয়া কখনও পুরী—যাওয়া অবশ্য কোথাও হয় না। তবুও যাইবার কল্পনা করিয়াও মনটা খুশী হয়। মনকে বোঝায় এবার না হয় আগামী পূজায় নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই— কেহ বাধা দিতে পারিবে না।

শনিবার অফিস বন্ধ হইয়া গেল। অপুর আজকাল এমন হইয়াছে বাড়ি ফিরিয়া অপর্ণার মুখ দেখিতে পারিলে যেন বাঁচে, কতক্ষণে সাতটা বাজিবে, ঘন ঘন ঘড়ির দিকে সতৃষ্ণ চোখে চায়। পাঁচটা বাজিয়া গেলে অকুল সময়-সমুদ্রে যেন থৈ পাওয়া যায়—আর মোটে ঘণ্টা-দুই। ছ'টা—আর এক। হোক্ পায়রার খোপের মত বাসা, অপর্ণা যেন সব দুঃখ ভুলাইয়া দেয়। তাহার কাছে গেলে আর কিছু মনে থাকে না।

অপর্ণা চা ও খাবার আনিল। এ সময়টা আধঘণ্টা সে স্বামীর কাছে থাকিতে পায়, গল্প করিতে পায়; আর সময় হয় না, এখনি আবার অপুকে ছেলে পড়াইতে বাহির হইতে হইবে। অপু এ-সময় তাহাকে সব দিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখিয়াছে, ফরসা লালপাড় শাড়িটি পরা, চুলটি বাঁধা, পায়ে আলতা, কপালে সিঁদুরের টিপ—মূর্ত্তিমতী গৃহলক্ষ্মীর মত হাসিমুখে তাহার জন্য চা আনে, গল্প করে, রাত্রে কি রান্না হইবে রোজ জিজ্ঞাসা করে, সারাদিনের বাসার ঘটনা বলে। বলে, ফিরে এসো, দুজনে আজ মহারাণী ঝিন্দন আর দিলীপ সিংহের কথাটা প'ড়ে শেষ ক'রে ফেলব।

বার-দুই অপু তাহাকে সিনেমায় লইয়া গিয়াছে, ছবি কি করিয়া নড়ে অপর্ণা বুঝিতে পারে না, অবাক হইয়া দেখে, গল্পটাও ভাল বুঝিতে পারে না। বাড়ি আসিয়া অপু বুঝাইয়া বলে।

চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়া অপু বলিল—এবার তো তোমায় নিয়ে যেতে লিখেছেন শ্বশুরমশায়, কিন্তু অফিসের ছুটির যা গতিক—রাম এসে কেন নিয়ে যাক্ না? তারপর আমি কার্ত্তিক মাসের দিকে না হয় দু-চারদিনের জন্যে যাব? তা ছাড়া যদি যেতেই হয় তবে এ সময় যত সকালে যেতে পারা যায়—এ সময়টা বাপ-মায়ের কাছে থাকা ভাল ভেবে দেখলাম।

অপর্ণা লজ্জারক্তমুখে বলিল—রাম ছেলেমানুষ, ও কি নিয়ে যেতে পারবে? তা ছাড়া মা তোমায় কতদিন দেখেন নি, দেখতে চেয়েছেন।

—তা বেশ চলো, আমিই যাই। রামের হাতে ছেড়ে দিতে ভরসা হয় না, এ অবস্থায় একটু সাবধানে ওঠা-নামা করতে হবে কিনা। দাও তো ছাতাটা, ছেলে পরিয়ে আসি। যাওয়া হয় তো চলো কালই যাই।—হ্যাঁ একটা সিগারেট দাও না?

—আবার সিগারেট! আটটা সিগারেট সকাল থেকে খেয়েছো—আর পাবে না—আবার পড়িয়ে এলে একটা পাবে।

—দাও দাও লক্ষ্মীটি—রাতে আর চাইব না—দাও একটি।

অপর্ণা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া হাসিমুখে বলিল—আবার রাত্রে তুমি কি ছাড়বে আর একটা না নিয়ে? তেমন ছেলে তুমি কিনা!···

বেশী সিগারেট খায় বলিয়া অপু সিগারেটের টিন অপর্ণার জিম্মায় রাখিবার প্রস্তাব

করিয়াছিল। অপর্ণার কড়াকড়ি বন্দোবস্ত সব সময় খাটে না, অপু বরাদ্দ অনুযায়ী সিগারেট নিঃশেষ করিবার পর আরও চায়, পীড়াপীড়ি করে, অপর্ণাকে শেষকালে দিতেই হয়। তবে ঘরে সিগারেট না মিলিলে বাহিরে গিয়া সে পারতপক্ষে কেনে না—অপর্ণাকে প্রবঞ্চনা করিতে মনে বড় বাধে—কিন্তু সবদিন নয়, ছুটি-ছাটার দিন বাড়িতে প্রাপ্য আদায় করিয়াও আরও দু-এক বাক্স কেনে, যদিও সে কথা অপর্ণাকে জানায় না।

ছেলে পড়াইয়া আসিয়া অপু দেখিল উপরের রুগ্ণ ভদ্রলোকটির ছোট মেয়ে পিণ্টু তাহাদের ঘরের এককোণে ভীত, পাংশু মুখে বসিয়া আছে। বাড়িসুদ্ধ হৈ-চৈ! অপর্ণা বলিল, ওগো এই পিণ্টু গাঙ্গুলীদের ছোট খুকীকে নিয়ে গোলদীঘিতে বেড়াতে বেরিয়েছিল। ও-বুঝি চীনেবাদাম খেয়ে কলে জল খেতে গিয়েছে, আর ফিরে এসে দ্যাখে খুকী নেই, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওর মা তো একেই জুজু হয়ে থাকে, আহা সে বেচারী তো নবমীর পাঁঠার মত কাঁপছে আর মাথা কুটছে। আমি পিণ্টুকে এখানে লুকিয়ে রেখে দিয়েছি নইলে ওর মা ওকে আজ গুঁড়ো ক'রে দেবে। আর গাঙ্গুলী-গিন্নী যে কি কাণ্ড করছে, জানোই তো তাকে, তুমিও একটু দেখো না গো!

গাঙ্গুলী-গিন্নী মরাকান্নার আওয়াজ করিতেছেন, কানে গেল।—ওগো আমি দুধ দিয়ে কি কালসাপ পুষেছিলাম গো! আমার এ কি সর্ব্বনাশ হ'ল গো মা, ওগো তাই আপদেরা বিদেয় হয় না আমার ঘাড় থেকে—এতদিনে মনোবাঞ্ছা—ইত্যাদি।

অপু তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল, বলিল—পিণ্টু খেয়েছে কিছু?

—খাবে কি? ও কি ওতে আছে? গাঙ্গুলী-গিন্নী দাঁত পিষছে, আহা, ওর কোন দোষ নেই, ও কিছুতেই নিয়ে যাবে না, সেও ছাড়বে না, তাকে আগলে রাখা কি ওর কাজ!

সকলে মিলিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে খুকীকে কলুটোলা থানায় পাওয়া গেল। সে পথ হারাইয়া ঘুরিতেছিল, বাড়ির নম্বর, রাস্তার নাম বলিতে পারে না, একজন কনস্টেবল এ অবস্থায় তাহাকে পাইয়া থানায় লইয়া গিয়াছিল।

বাড়ি আসিলে অপর্ণা বলিল—পাওয়া গিয়েছে ভালই হ'ল, আহা বৌটাকে আর মেয়েটাকে কি ক'রেই গাঙ্গুলী-গিন্নী দাঁতে পিষছে গো! মানুষ মানুষকে এমনও বলতে পারে! কাল নাকি এখান থেকে বিদেয় হতে হবে—হুকুম হয়ে গিয়েছে।

অপু বলিল—কিছু দরকার নেই। কাল আমরা তো চলে যাচ্ছি, আমার তো আসতে এখনও চার-পাঁচ দিন দেরি। ততদিন ও'রা রুগী নিয়ে আমাদের ঘরে এসে থাকুন, আমি এলেও অসুবিধে হবে না, আমি না হয় এই পাশেই বরদাবাবুদের মেসে গিয়ে রাত্রে শোব। তুমি গিয়ে বলো বৌ-ঠাকরুণকে। আমি বুঝি অপর্ণা! আমার মা আমার বাবাকে নিয়ে কাশীতে আমার ছেলেবেলায় ওই রকম বিপদে পড়েছিল—তোমাকে সে সব কথা কখনও বলি নি, অপর্ণা। বাবা মারা গেলেন, হাতে একটা সিকি-পয়সা নেই আমাদের, সেখানকার দু'একজন লোক কিছু কিছু সাহায্য করলে, হবিষ্যির খরচ জোটে না—মা-তে আমাতে রাত্রে শুধু অড়রের ডাল ভিজে খেয়ে কাটিয়েছি। আমি তখন ছেলেমানুষ, বছর দশেক মোটে বয়েস—গরীব হওয়ার কষ্ট যে কি, তা আমার বুঝতে বাকী নেই—কাল সকালেই ও'রা এখানে আসুন।

অপর্ণা যাইবার সময় পিণ্টুর-মা খুব কাঁদিল। এ বাড়িতে বিপদে-আপদে অপর্ণা যথেষ্ট করিয়াছে। রোগীর সেবা করিয়া ছেলেমেয়েকে দেখিতে সময় পাইত না, তাহাদের চুল বাঁধা, টিপ পরানো, খাবার খাওয়ানো, সব নিজের ঘরে ডাকিয়া আনিয়া অপর্ণা করিত। পিণ্টু তো মাসীমা বলিতে অজ্ঞান, সকলের কান্না থামে তো পিণ্টুকে আর থামানো যায় না। বউয়ের বয়স অপর্ণার চেয়ে অনেক বেশী। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, চিঠি দিও ভাই,

দুটো দু-ঠাঁই ভালয় ভালয় হয়ে গেলে আমি মায়ের পুজো দেবো।

ঘরের চাবি পিণ্টুর মায়ের কাছে রহিল।

রেলে ও স্টীমারে অনেকদিন পর চড়া। দুজনেই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। দুজনেই খুব খুশী। অপর্ণাও পল্লীগ্রামের মেয়ে, শহর তাহার ভাল লাগে না। এতটুকু ঘরে কোনদিন থাকে নাই, সকাল ও সন্ধ্যাবেলা যখন সব বাসাড়ে মিলিয়া একসঙ্গে কয়লার উনুনে আগুন দিত, ধোঁয়ায় অপর্ণার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিত, চোখ জ্বালা করিত, সে কি ভীষণ যন্ত্রণা! সে নদীর ধারের মুক্ত আলো-বাতাসে প্রকাণ্ড বাড়িতে মানুষ হইয়াছে। এসব কষ্ট জীবনে এই প্রথম—এক একদিন তাহার তো কান্না পাইত। কিন্তু এই দুই বৎসরে সে নিজের সুখ-সুবিধার কথা বড় একটা ভাবে নাই। অপুর উপর তাহার একটা অদ্ভুত স্নেহ গড়িয়া উঠিয়াছে, ছেলের উপর মায়ের স্নেহের মত। অপুর কৌতুকপ্রিয়তা, ছেলেমানুষি, খেয়াল, সংসার-অনভিজ্ঞতা, হাসি-খুশি, এসব অপর্ণার মাতৃত্বকে অদ্ভুতভাবে জাগাইয়া তুলিয়াছে। তাহার উপর স্বামীর দুঃখময় জীবনের কথা, ছাত্রাবস্থায় দারিদ্র্য ও অনাহারের সঙ্গে সংগ্রাম —সে সব শুনিয়াছে। সে-সব কথা অপু বলে নাই, সে-সব বলিয়াছে প্রণব। বরং অপু নিজের অবস্থা অনেক বাড়াইয়া বলিয়াছিল—নিশ্চিন্দিপুরের নদীর ধারের পৈতৃক বৃহৎ দোতলা বাড়িটার কথাটা আরও দু-একবার না তুলিয়াছিল এমন নহে—নিজে কলেজ হোস্টেলে ছিল এ কথাও বলিয়াছে। বুদ্ধিমতী অপর্ণার স্বামীকে চিনিতে বাকী নাই। কিন্তু স্বামীর কথা সে যে সর্ব্বৈব মিথ্যা বলিয়া বুঝিয়াছে এ ভাব একদিনও দেখায় নাই। বরং সস্নেহে বলে—দ্যাখো, তোমাদের দেশের বাড়িটাতে যাবে যাবে বললে, একদিনও তো গেলে না—ভাল বাড়িখানা,—পুলুদার মুখে শুনেছি, জমিজমাও বেশ আছে—একদিন গিয়ে বরং সব দেখে-শুনে এসো। না দেখলে কি ও-সব থাকে?···

অপু আমতা আমতা করিয়া বলে—তা যেতামই তো কিন্তু বড় ম্যালেরিয়া। তাতেই তো সব ছাড়লাম কিনা? নৈলে আজ অভাব কি?···

কিন্তু অসতর্ক মুহূর্ত্তে দু-একটা বেফাঁস কথা মাঝে মাঝে বলিয়াও ফেলে, ভুলিয়া যায় আগে কি বলিয়াছিল কোন্ সময়। অপর্ণা কখনও দেখায় নাই যে, এ সব কথার অসামঞ্জস্য সে বুঝিতে পারিয়াছে। না খাইয়া যে কষ্ট পায় অপর্ণার এ কথা জানা ছিল না। সচ্ছল ঘরের আদরে লালিতা মেয়ে, দুঃখ-কষ্টের সন্ধান সে জানে না। মনে মনে ভাবে, এখন হইতে স্বামীকে সে সুখে রাখিবে।

এটা একটা নেশার মত তাহাকে পাইয়াছে। অল্পদিনেই সে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল, অপু কি কি খাইতে ভালবাসে। তালের ফুলুরি সে করিতে জানিত না, কিন্তু অপু খাইতে ভালবাসে বলিয়া মনসাপোতায় নিরুপমার কাছে শিখিয়া লইয়াছিল।

এখানে সে কতদিন অপুকে কিছু না জানাইয়া বাজার হইতে তাল আনাইয়াছে, সব উপকরণ আনাইয়াছে। অপু হয়তো বর্ষার জলে ভিজিয়া অফিস হইতে বাসায় ফিরিয়া হাসিমুখে বলিত—কোথায় গেলে অপর্ণা? এত সকালে রান্নাঘরে কি, দেখি? পরে উঁকি দিয়া দেখিয়া বলিত, তালের বড়া ভাজা হচ্ছে বুঝি! তুমি জানলে কি ক'রে—বা রে!···

অপর্ণা উঠিয়া স্বামীর শুকনো কাপড়ের ব্যবস্থা করিয়া দিত, বলিত, এসো না, ওখানেই ব'সে খাবে, গরম গরম ভেজে দি—। অপুর বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিত। ঠিক এই ভাবেরই কথা বলিত মা। অপুর অদ্ভুত মনে হয়, মায়ের মত স্নেহশীলা, সেবাপরায়ণা, সেইরকম অন্তর্যামিনী। বার্দ্ধক্যের কর্ম্মক্লান্ত মা যেন ইহারই নবীন হাতে সকল ভার সঁপিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। মেয়েদের দেখিবার চোখ তাহার নতুন করিয়া ফোটে, প্রত্যেককে দেখিয়া

মনে হয়, এ কাহারও মা, কাহারও স্ত্রী, কাহারও বোন। জীবনে এই তিনরূপেই সে নারীকে পাইয়াছে, তাহাদের মঙ্গল হস্তের পরিবেষণে এই ছাব্বিশ বৎসরের জীবন পুষ্ট হইয়াছে, তাহাদের কি চিনিতে বাকী আছে তাহার?

স্টীমার ছাড়িয়া দুজনে নৌকায় চড়িল। অপর্ণার খুড়তুতো ভাই মুরারি উঁহাদের নামাইয়া লইতে আসিয়াছিল, সে-ও গল্প করিতে করিতে চলিল। অপর্ণা ঘোমটা দিয়া একপাশে সরিয়া বসিয়াছিল। হেমন্ত-অপরাহ্নের স্নিগ্ধ ছায়া নদীর বুকে নামিয়াছে, বাঁ দিকের তীরে সারি সারি গ্রাম, একখানা বড় হাঁড়ি-কলসী বোঝাই ভড় যশাইকাটির ঘাটে বাঁধা।

অপুর মনে একটা মুক্তির আনন্দ—আর মনেও হয় না যে জগতে শীলেদের অফিসের মত ভয়ানক স্থান আছে। তাহার সহজ আনন্দ-প্রবণ মন আবার নাচিয়া উঠিল, চারিধারের এই শ্যামলতা, প্রসার, নদীজলের গন্ধের সঙ্গে তাহার যে নাড়ীর যোগ আছে।

কৌতুক দেখিবার জন্য অপর্ণাকে লক্ষ্য করিয়া হাসিমুখে বলিল—ওগো কলাবৌ, ঘোমটা খোলো, চেয়ে দ্যাখো, বাপের বাড়ির দ্যাশটা চেয়ে দ্যাখো গো—

মুরারি হাসিমুখে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। অপর্ণা লজ্জায় আরও জড়সড় হইয়া বসিল। আরও খানিকটা আসিয়া মুরারি বলিল—তোমরা যাও, এইখানেই হাটে যদি বড় মাছ পাওয়া যায়, জ্যাঠাইমা কিনতে বলে দিয়েছেন। এইটুকু হেঁটে যাব এখন।

মুরারি নামিয়া গেলে অপর্ণা বলিল—আচ্ছা, তুমি কি? দাদার সামনে ওইরকম ক'রে আমায়—তোমার সেই দুষ্টুমি এখনও গেল না? কি ভাবলে বল তো দাদা—ছিঃ! পরে রাগের সুরে বলিল—দুষ্টু কোথাকার, তোমার সঙ্গে আমি আর কোথাও কখ্খনো যাবো না—কখ্খনো না, থেকো একলা বাসায়।

—বয়েই গেল! আমি তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে সেধেছিলুম কিনা? আমি নিজে মজা ক'রে রেঁধে খাব।

—তাই খেও। আহা হা, কি রান্নার ছাঁদ, তবু যদি আমি না জানতাম! আলু ভাতে, বেগুন ভাতে, সাত রকম তরকারী সব ভাতে—কি রাঁধুনী!

—নিজের দিকে চেয়ে কথা বলো। প্রথম যেদিন খুলনার ঘাটে রেঁধেছিলে, মনে আছে—সব আলুনি?

—ওমা মা আমার কি হবে! এত বড় মিথ্যেবাদী তুমি, সব আলুনি! ওমা আমি কোথায়—

—সব। বিলকুল। মায় পটলভাজা পর্য্যন্ত।

অপর্ণা রাগ করিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল—তুমি ভাঙন মাছ খাও নি? আমাদের এ নোনা গাঙের ভাঙন মাছ ভারী মিষ্টি। কাল মাকে বলে তোমায় খাওয়াব।

—লজ্জা করবে না তার বেলায়? কি বলবে মাকে—ও মা, এই আমার—

অপর্ণা স্বামীর মুখে হাত চাপা দিয়া বলিল—চুপ।

ঠিক সন্ধ্যার সময় অপর্ণাদের ঘাটে নৌকা লাগিল। দুজনেরই মনে এক অপূর্ব্ব ভাব। শটিবনের সুগন্ধভরা স্নিগ্ধ হেমন্ত-অপরাহ্ণ তার সবটা কারণ নয়, নদীতীরে ঝুপসি হইয়া থাকা গোলগাছের সবুজ সারিও নয়, কারণ—তাহাদের আনন্দ-প্রবণ অনাবিল যৌবন—ব্যগ্র, নবীন, আগ্রহভরা যৌবন।

জ্যোৎস্নারাত্রে উপরের ঘরে ফুলশয্যার সেই পালঙ্কে বাতি জ্বালিয়া বসিয়া পড়িতে পড়িতে সে অপর্ণার প্রতীক্ষায় থাকে। নারিকেলশাখায় দেবীপক্ষের বকের পালকের মত শুভ্র চাঁদের আলো পড়ে, বাহিরের রাত্রির দিকে চাহিয়া কত কথা মনে আসে, কত সব

পুরাতন স্মৃতি—কোথায় যেন এই ধরণের সব পুরানো দিনের কত জ্যোৎস্না ঝরা রাত। এ যেন সব আরব্য-উপন্যাসের কাহিনী, সে ছিল কোন্ কুঁড়েঘরে, পেট পুরিয়া সব দিন খাইতেও পাইত না—সে আজ এত বড় প্রাচীন জমিদার ঘরের জামাই, অথচ আশ্চর্য্য এই যে, এইটাই মনে হইতেছে সত্য। পুরানো দিনের জীবনটা অবাস্তব, অস্পষ্ট, ধোঁয়া ধোঁয়া মনে হয়।

হেমন্তের রাত্রি। ঠাণ্ডা বেশ। কেমন একটা গন্ধ বাতাসে, অপুর মনে হয় কুয়াসার গন্ধ। অনেক রাত্রে অপর্ণা আসে। অপু বলে—এত রাত যে! আমি কতক্ষণ জেগে বসে থাকি!

অপর্ণা হাসে। বলে—নিচে কাকাবাবুর শোবার ঘর। আমি সিঁড়ি দিয়ে এলে পায়ের শব্দ ওঁর কানে যায়—এই জন্য উনি ঘরে খিল না দিলে আসতে পারি নে। ভারী লজ্জা করে।

অপু জানালার খড়খড়িটা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিল। অপর্ণা লাজুক মুখে বলিল—এই শুরু হ'ল বুঝি দুষ্টুমি? তুমি কী!—কাকাবাবু এখনো ঘুমোন নি যে!

অপু আবার খটাস করিয়া খড়খড়ি খুলিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চসুরে বলিল—অপর্ণা, এক গ্লাস জল আনতে ভুলে গেলে যে!···ও অপর্ণা—অপর্ণা?···

অপর্ণা লজ্জায় বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজড়াইয়া পড়িয়া রহিল।

ভোর রাত্রেও দুজনে গল্প করিতেছিল।

সকালের আলো ফুটিল। অপর্ণা বলিল—তোমার ক'টায় স্টীমার?···সারারাত তো নিজেও ঘুমুলে না, আমাকেও ঘুমুতে দিলে না—এখন খানিকটা ঘুমিয়ে থাকো—আমি অন্যদিকে পাঠিয়ে তুলে দেব'খন বেলা হলে। গিয়েই চিঠি দিও কিন্তু। জানলার পর্দ্দাগুলো ধোপার বাড়ি দিও—আমি না গেলে আর সাবান কে দেবে? সস্নেহে স্বামীর গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল—কি রকম রোগা হয়ে গিয়েছ—এখন তোমাকে কাছছাড়া করতে ইচ্ছে করে না—কলকাতায় না মেলে দুধ, না মেলে কিছু। এখানে এসময় কিছুদিন থাকলে শরীরটা সারত। রোজ অফিস থেকে এসে মোহনভোগ খেও—পিন্টুর মাকে বলে এসেছি—সে-ই ক'রে দেবে। এখন তো খরচ কমল? বেশী ছেলে পড়ানোতে কাজ নেই। যাই তাহলে?

অপু বলিল—ব'সো ব'সো—এখনও কোথায় তেমন ফর্সা হয়েছে?—কাকার উঠতে এখনও দেরি!

অপর্ণা বলিল—হ্যাঁ, আর একটা কথা—দ্যাখো, মনসাপোতার ঘরটা এবার খুঁচি দিয়ে রেখো। নইলে বর্ষার দিকে বড্ড খরচ পড়ে যাবে, কলকাতার বাসায় তো চিরদিন চলবে না—ওই হ'ল আপন ঘরদোর। এবার মনসাপোতায় ফিরব, বাস না করলে খড়ের ঘর টেঁকে না। যাই এবার, কাকা এবার উঠবেন। যাই?

অপর্ণা চলিয়া গেলে অপুর মন খুঁত খুঁত করিতে লাগিল। এখনও বাড়ির কেহই উঠে নাই—কেন সে অপর্ণাকে ছাড়িয়া দিল? কেন বলিল—যাও! তাহার সম্মতি না পাইলে অপর্ণা কখনই যাইত না।

কিন্তু অপর্ণা আর একবার আসিয়াছিল ঘণ্টাখানেক পরে, চা দেওয়া হইবে কিনা জিজ্ঞাসা করিতে—অপু তখন ঘুমাইতেছে। খোলা জানালা দিয়া মুখে রৌদ্র লাগিতেছে। অপর্ণা সন্তর্পণে জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল। ঘুমন্ত অবস্থায় স্বামীকে এমন দেখায়! এমন একটা মায়া হয় ওর ওপরে! সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় ভাবিল, মা সত্যিই বলে বটে, পটের মুখ—পটে আঁকা ঠাকুর দেবতার মত মুখ—

চলিয়া আসিবার সময়ে কিন্তু অপর্ণার সঙ্গে দেখা হইল না। অপুর আগ্রহ ছিল, কিন্তু আত্মীয় কুটুম্ব পরিজনে বাড়ি সরগরম—কাহাকে যে বলে অপর্ণাকে একবার ডাকিয়া দিতে? মুখচোরা অপু ইচ্ছাটা কাহাকেও জানাইতে পারিল না। নৌকায় উঠিয়া মুরারির ছোট ভাই বিশু বলিল—আসবার সময় দিদির সঙ্গে দেখা ক'রে এলেন না কেন, জামাইবাবু? দিদি সিঁড়ির ঘরে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল, আপনি যখন চলে আসেন—

কিন্তু নৌকা তখন জোর ভাটার টানে যশাইকাটির বাঁকের প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পেঁছিয়াছে।

এবার কলিকাতায় আসিয়া অনেকদিন পরে দেওয়ানপুরের বাল্যবন্ধু দেবব্রতের সঙ্গে দেখা হইল। সে আমেরিকা যাইতেছে। পরস্পরের দেখা-সাক্ষাৎ না হওয়ায় কেহ কাহারও ঠিকানা জানিত না। অথচ দেবব্রত এখানেই কলেজে পড়িতেছিল, এবার বি. এস-সি. পাস করিয়াছে।...অপুর কাছে ব্যাপারটা আশ্চর্য ঠেকিল, আনন্দ হইল, হিংসাও হইল। প্রতি শনিবারে বাড়ি না যাইয়া যে থাকিতে পারিত না, সেই ঘর-পাগল দেবব্রত আমেরিকা চলিয়া যাইতেছে!

মাস দুই-তিন বড় কষ্টে কাটিল। আজ এক বছরের অভ্যাস—অফিস হইতে বাসায় ফিরিয়া অপর্ণার হাসিভরা মুখ দেখিয়া কর্মক্লান্ত মন শান্ত হইত। আজকাল এমন কষ্ট হয়! বাসায় না ফিরিয়াই সোজা ছেলে পড়াইতে যায় আজকাল, বাসায় মন লাগে না, খালি খালি ঠেকে।

লীলারা কেহ এখানে নাই। বর্ধমানের বিষয় লইয়া কি সব মামলা মকদ্দমা চলিতেছে, অনেকদিন হইতে তাহারা সেখানে।

একদিন রবিবারে সে বেলুড় মঠ বেড়াইয়া আসিয়া অপর্ণাকে এক লম্বা চিঠি দিল, ভারী ভাল লাগিয়াছে জায়গাটা, অপর্ণা এখানে আসিলে একদিন বেড়াইয়া আসিবে। এসব পত্রের উত্তর অপর্ণা খুব শীঘ্রই দেয়, কিন্তু পত্রখানার কোন জবাব আসিল না—দু'দিন, চারদিন, সাতদিন হইয়া গেল। তাহার মন অস্থির হইয়া উঠিল—কি ব্যাপার? অপর্ণা হয়ত নাই, সে মারা গিয়াছে—ঠিক তাই। রাত্রে নানা রকম স্বপ্ন দেখে—অপর্ণা ছলছল চোখে বলিতেছে—তোমায় তো বলেছিলাম আমি বেশীদিন বাঁচব না, মনে নেই? সেই মনসাপোতায় একদিন রাত্রে?—আমার মনে কে বলত। যাই—আবার আর জন্মে দেখা হবে।

পরদিন পড়িবে শনিবার। সে অফিসে গেল না, চাকুরির মায়া না করিয়াই সুটকেস গুছাইয়া বাহির হইয়া যাইতেছে এমন সময় শ্বশুরবাড়ির পত্র পাইল। সকলেই ভাল আছে। যাক্—বাঁচা গেল! উঃ, কি ভয়ানক দুর্ভাবনার মধ্যে ফেলিয়াছিল উহারা! অপর্ণার উপর একটু অভিমানও হইল। কি কাণ্ড, মন ভাল না থাকিলে এমন সব অদ্ভুত কথাও মনে আসে। কয়দিন সে ক্রমাগত ভাবিয়াছে, 'ওগো মাঝি তরী হেথা' গানটা কলিকাতায় আজকাল সবাই গায়। কিন্তু গানটার বর্ণনার সঙ্গে তার শ্বশুরবাড়ির এত হুবহু মিল হয় কি করিয়া? গানটা কি তাহার বেলায় খাটিয়া যাইবে?

শনিবার অফিস হইতে ফিরিয়া দেখিল, মুরারি তাহার বাসায় বার-বারান্দার চেয়ারখানাতে বসিয়া আছে। শ্যালককে দেখিয়া অপু খুব খুশী হইল—হাসিমুখে বলিল, এ কি, বাসরে! সাক্ষাৎ বড়কুটুম যে। কার মুখ দেখে না জানি যে আজ সকালে—

মুরারি খামে-আঁটা একখানা চিঠি তাহার হাতে দিল—কোন কথা বলিল না। অপু পত্রখানা হাত বাড়াইয়া লইতে গিয়া দেখিল, মুরারির মুখ কেমন হইয়া গিয়াছে। সে যেন চোখের জল চাপিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে।

অপুর বুকের ভিতরটা হঠাৎ যেন হিম হইয়া গেল। কেমন করিয়া আপনা-আপনি তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল—অপর্ণা নেই ?

—মুরারি নিজেকে আর সামলাইতে পারিল না।

—কি হয়েছিল ?

—কাল সকালে আটটার সময় প্রসব হ'ল—সাড়ে ন'টার সময়—

—জ্ঞান ছিল ?

—আগাগোড়া। ছোট কাকীমার কাছে চুপি চুপি নাকি বলেছিল ছেলে হওয়ার কথা তোমাকে তার ক'রে জানাতে। তখন ভালই ছিল। হঠাৎ ন'টার পর থেকে—

ইহার পর অপু অনেক সময় ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইত—সে তখন স্বাভাবিক সুরে অতগুলি প্রশ্ন একসঙ্গে করিয়াছিল কি করিয়া ! মুরারি বাড়ি ফিরিয়া গল্প করিয়াছিল—অপূর্ব্বকে কি ক'রে খবরটা শোনাব, সারা রেল স্টীমারে শুধু তাই ভেবেছিলাম—কিন্তু সেখানে গিয়ে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম, আমায় বলতে হ'ল না—ওই খবর টেনে বার করলে।

মুরারি চলিয়া গেলে সন্ধ্যার দিকে একবার অপুর মনে হইল, নবজাত পুত্রটি বাঁচিয়া আছে, না নাই ? সে কথা তো মুরারিকে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই বা সে-ও কিছু বলে নাই। কে জানে, হয়ত নাই।

কথাটা ক্রমে বাসার সকলেই শুনিল। পরদিন যথারীতি অফিসে গিয়াছিল, অফিস হইতে ফিরিয়া হাতমুখ ধুইতেছে, উপরের ভাড়াটে বৃদ্ধ সেন মহাশয় অপুদের ঘরের বারান্দাতে উঠিলেন। অপু বলিল—এই যে সেন মহাশয়, আসুন, আসুন।

সেন মহাশয় জিহ্বা ও তালুর সাহায্যে একটা দুঃখসূচক শব্দ উচ্চারণ করিয়া টুলখানা টানিয়া লইয়া হতাশভাবে বসিয়া পড়িলেন।

—আহা-হা, রূপে সরস্বতী গুণে লক্ষ্মী। কলের কাছে সেদিন মা আমার সাবান নিয়ে কাপড় ধুচ্ছেন, আমি সকাল সকাল স্নান করব বলে ওপরের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি। বললাম—কে, বৌমা ? তা মা আমার একটু হাসলেন—বলি তা থাক, মায়ের কাপড় কাচা হয়ে যাক্। স্নানটা না হয় ন'টার পরেই করা যাবে এখন—একদিন ইলিশ মাছের দইমাছ রেঁধেছেন, অমনি তা বাটি ক'রে ওপরে পাঠিয়ে দিয়েছেন—আহা কি নরম কথা, কি লক্ষ্মীশ্রী—সবই শ্রীহরির ইচ্ছে ! সবই তাঁর—

তিনি উঠিয়া যাইবার পর আসিলেন গাঙ্গুলী-গৃহিণী। বয়সে প্রবীণা হইলেও ইনি কখনও অপুর সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে কথাবার্ত্তা বলেন নাই। আধঘোমটা দিয়া ইনি দোরের আড়াল হইতে বলিতে লাগিলেন—আহা, জলজ্যান্ত বৌটা, এমন হবে তা কখনও জানি নি, ভাবি নি—কাল আমার বড় ছেলে নবীন বলছে রাত্তিরে, যে, মা শুনেছ এইরকম, অপূর্ব্ব-বাবুর স্ত্রী মারা গিয়েছেন এই মাত্তর খবর এল—তা বাবা আমি বিশ্বাস করি নি। আজ সকালে আবার বাটুল বললে—তা বলি, যাই জেনে আসি—আসব কি বাবা, দুই ছেলের আপিসের ভাত, বাটুলের আজকাল আবার দমদমার গুলির কারখানার কাজ, দুটো নাকে-মুখে গুঁজেই দৌড়োয়, এখন আড়াই টাকা হপ্তা, সাহেব বলেছে বোশেখ মাস থেকে দেড় টাকা বাড়িয়ে দেবে। ওই এক ছেলে রেখে ওরবাবা মারা যায়, সেই থেকে আমারই কাছে—আহা তা ভেবো না বাবা—সবারই ও কষ্ট আছে,—তুমি পুরুষ মানুষ তোমার ভাবনা কি বাবা ? বলে—

বজায় থাকুক্ চূড়ো-বাঁশী
মিলবে কত সেবাদাসী—

—একটা ছেড়ে দশটা বিয়ে কর না কেন ?—তোমার বয়েসটাই বা কি এমন—

অপু ভাবিল—এরা লোক ভাল তাই এসে এসে বলছে। কিন্তু আমায় কেন একটু একা থাকতে দেয় না? কেউ না আসে ঘরে সেই আমার ভাল। এরা কি বুঝবে?

সন্ধ্যা হইয়া গেল। বারান্দায় যে কোণে ফুলের টব সাজানো, দু-একটা মশা সেখানে বিন্ বিন্ করিতেছে। অন্যদিন সে সেই সময়ে আলো জ্বালে, স্টোভ জ্বালিয়া চা ও হালুয়া করে, আজ অন্ধকারের মধ্যে বারান্দার চেয়ারখানাতে বসিয়াই রহিল···একমনে সে কি একটা ভাবিতেছিল···গভীরভাবে ভাবিতেছিল।

ঘরের মধ্যে দেশলাই জ্বালার শব্দে সে চমকিয়া উঠিল। বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিয়া উঠিল—মুহূর্তের জন্য মনে হইল যেন অপর্ণা আছে। এখানে থাকিলে এই সময় সে স্টোভ ধরাইত, সন্ধ্যা দিত। ডাকিয়া বলিল—কে?

পিন্টু আসিয়া বলিল—ও কাকাবাবু—মা আপনাদের কেরোসিনের তেলের বোতলটা কোথায় জিজ্ঞেস করলে—

অপু বিস্ময়ের সুরে বলিল—ঘরে কে রে, পিন্টু? তোর মা? ও! বৌ-ঠাকরুণ?—বলিতে বলিতে সে উঠিয়া দেখিল পিন্টুর মা ঘরের মেঝেতে স্টোভ মুছিতেছে।

—বৌ-ঠাকরুণ, তা আপনি আবার কষ্ট ক'রে কেন মিথ্যে—আমি বরং ওটা—

তেলের বোতলটা দিয়া সে আবার আসিয়া বারান্দাতে বসিল। পিন্টুর মা স্টোভ জ্বালিয়া চা ও খাবার তৈরী করিয়া পিন্টুর হাতে পাঠাইয়া দিল ও রাত্রি নয়টার পর নিজের ঘর হইতে ভাত বাড়িয়া আনিয়া অপুদের ঘরের মেজেতে খাইবার ঠাঁই করিয়া ভাতের থালা ঢাকা দিয়া রাখিয়া গেল।

পিন্টুর বাবা সারিয়া উঠিয়াছেন, তবে এখন বড় দুর্বল, লাঠি ধরিয়া সকালে বিকালে একটু-আধটু গোলদীঘিতে বেড়াইতে যান, নিচের একঘর ভাড়াটে উঠিয়া যাওয়াতে সেই ঘরেই আজকাল ইঁহারা থাকেন। ডাক্তার বলিয়াছে, আর মাসখানেকের মধ্যে দেশে ফেরা চলিবে। পরদিন সকালেও পিন্টুর মা ভাত দিয়া গেল। বৈকালে অফিস হইতে আসিয়া কাপড় জামা না ছাড়িয়াই বাহিরে বারান্দাতে বসিয়াছে। বউটি স্টোভ ধরাইতে আসিল।

অপু উঠিয়া গিয়া বলিল—রোজ রোজ আপনাকে এ কষ্ট করতে হবে না, বৌদি। আমি এই গোলদীঘির ধারের দোকান থেকে খেয়ে আসব চা।

বউটি বলিল—আপনি অত কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন ঠাকুরপো, আমার আর কি কষ্ট? টুলটা নিয়ে এসে এখানে বসুন, দেখুন চা তৈরী করি।

এই প্রথম পিন্টুর মা তাহার সহিত কথা কহিল। পিন্টু বলিল—কাকাবাবু, আমাকে গোলদীঘিতে বেড়াতে নিয়ে যাবে—একটা ফুলের চারা তুলে আনবো, এনে পুঁতে দেব।

বউটির বয়স ত্রিশের মধ্যে—পাতলা একহারা গড়ন, শ্যামবর্ণ, মাঝামাঝি দেখিতে, খুব ভালও নয়, মন্দও নয়। অপু টুলটা দুয়ারের কাছে টানিয়া বসিল। বউটি চায়ের জল নামাইয়া বলিল—এক কাজ করি ঠাকুরপো, একেবারে চাট্টি ময়দা মেখে আপনাকে খানকতক লুচি ভেজে দি—ক'খানাই বা খান—একেবারে রাতের খাবারটা এই সঙ্গেই খাইয়ে দি—সারাদিনে ক্ষিদেও তো পেয়েছে।

মেয়েটির নিঃসংকোচ ব্যবহারে তাহার নিজের সঙ্কোচ ক্রমে চলিয়া যাইতেছিল। সে বলিল—বেশ, করুন। মন্দ কি। ওরে পিন্টু, ওই পেয়ালাটা নিয়ে আয়—

—থাক, থাক ঠাকুরপো, আমি ওকে আলাদা দিচ্ছি। কেটলিতে এখনও চা আছে—আপনি খান। আপনাদের বেলুনটা কোথায় ঠাকুরপো?

—সত্যি আপনি বড্ড কষ্ট করছেন, বৌ-ঠাকরুণ—আপনাকে এত কষ্ট দেওয়াটা—

পিন্টুর মা বলিল—আপনি বার বার ও রকম বলছেন কেন? আপনারা আমার যা

উপকার করেছেন, তা নিজের আত্মীয়ও করে না আজকাল। কে পরকে থাকবার জন্যে ঘর ছেড়ে দেয় ?···কিন্তু আমার সে বলবার মুখ তো দিলেন না ভগবান, কি করি বলুন। আমি রুগী সামলে মেয়েকে যদি খাওয়াতে না পারি, তাই সে দুবেলা আপনি খেয়ে অফিসে গেলেই পিন্টুকে নিজে গিয়ে ডেকে এনে আপনার পাতে খাওয়াত। এক একদিন—

কথা শেষ না করিয়াই পিন্টুর মা হঠাৎ চুপ করিল। অপুর মনে হইল ইহার সঙ্গে অপর্ণার কথা কহিয়া সুখ আছে, এ বুঝিবে, অন্য কেহ বুঝিবে না।

সারাদিন অপু কাজকর্মে ভুলিয়া থাকিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে, যখনই একটু মনে আসে অমনি একটা কিছু কাজ দিয়া সেটাকে চাপা দেয়। আগে সে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া কি ভাবিত, খাতাপত্রে গল্প কবিতা লিখিত—কাজ ফাঁকি দিয়া অন্য বই পড়িত। কিন্তু অপর্ণার মৃত্যুর পর হইতে সে দশগুণ খাটিতে লাগিল, সকলের কাছে কাজের তাগাদা করিয়া বেড়ায়, সারাদিনের কাজ দু'ঘণ্টায় করিয়া ফেলে, তাহার লেখা চিঠি টাইপ করিতে করিতে নৃপেন বিরক্ত হইয়া উঠিল।

পূর্ণিমা তিথিটা অপর্ণা ছাদের আলিসার ধারে দাঁড়াইয়া, এই তো গত কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রিতে লক্ষ্মীর মত মহিমময়ী, কি সুন্দর ডাগর চোখ দুটি, কি সুন্দর মুখশ্রী। অপুর মনে হইয়াছিল, ওর ঘাড় ফেরাবার ভঙ্গিটা যেন রাণীর মত—এক এক সময় সম্ভ্রম আসে মনে। অপর্ণা হাসিয়া বলে—আমার যে লজ্জা করে, নইলে সকালে তোমার খাবার ক'রে দিতে ইচ্ছে করে, আমার ছোট বোন লুচি ভাজতে জানে না,—সেজ খুড়ীমা ছেলে সামলে সময় পান না—মা থাকেন ভাঁড়ারে, তোমার খাবার কষ্ট হয়—না ? হঠাৎ অপুর মনে হয়—দূর ছাই—কি লিখে যাচ্ছি মিছে—কি হবে আর এসবে ?···

কি বিরাট শূন্যতা—কি যেন এক বিরাট ক্ষতি হইয়া গিয়াছে, জীবনে আর কখনও তাহা পূর্ণ হইবার নহে—কখনও নয়, কাহারও দ্বারা না—সম্মুখে বৃক্ষ নাই, লতা নাই, ফুলফল নাই—শুধু এক রুক্ষ ধূসর বালুকাময় বহুবিস্তীর্ণ মরুভূমি।

মাসখানেক পরে পিন্টুর মা চোখের জলে ভাসিয়া বিদায় লইল। পিন্টুর বাবা বেশ সবল হইয়া উঠিয়াছেন, দুইজনেই আত্মীয়ের মত নানা সান্ত্বনার কথা বলিয়া গেল। পিন্টুর মা বলিল—কখনো ভাই দেখি নি, ঠাকুরপো। আপনাকে সেই ভাইয়ের মত পেলুম, কিন্তু করতে পারলাম না কিছু—দিদি বলে' যদি মাঝে মাঝে আমাদের ওখানে যান—তবে জানব সত্যিই আমি ভাই পেয়েছি।

অপু সংসারের বহু দ্রব্য পিন্টুদের জিনিসপত্রের সঙ্গে বাঁধিয়া দিল—ডালা, কুলো, ধামা, বঁটি, চাকী, বেলুন। পিন্টুর মা কিছুতেই সে সব লইতে রাজী নয়—অপু বলল, কি হবে বৌঠান, সংসার তো উঠে গেল, ওসব আর হবে কি, অন্য কাউকে বিলিয়ে দেওয়ার চেয়ে আপনারা নিয়ে যান, আমার মনে তৃপ্ত হবে তবুও।

মৃত্যুর পর কি হয় কেহই বলিতে পারে না ? দু-একজনকে জিজ্ঞাসাও করিল—ওসব কথা ভাবিয়া তো তাহাদের ঘুম নাই। মেসে বরদাবাবুর উপর তাহার শ্রদ্ধা ছিল, তাঁহার কাছেও একদিন কথাটা পাড়িল। বরদাবাবু তাহাকে মামুলি সান্ত্বনার কথা বলিয়া কর্তব্য সমাপন করিলেন। একদিন পল ও ভার্জিনিয়ার গল্প পড়িতে পড়িতে দেখিল মৃত্যুর পর ভার্জিনিয়া প্রণয়ী পলকে দেখা দিয়াছিল—হতাশ মন এইটুকু সূত্রকেই ব্যগ্র আগ্রহে আঁকড়াইয়া ধরিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তবুও তো এতটুকু আলো ! সে অফিসে, মেসে, বাসায় যে সব লোকের সঙ্গে কারবার করে—তাহারা নিতান্ত মামুলি ধরণের সাংসারিক জীব—অপুর প্রশ্ন শুনিয়া তাহারা আড়ালে হাসে, চোখ টেপাটেপি করে—করুণার হাসি হাসে। এইটাই অপু বরদাস্ত করিতে পারে না আদৌ। একদিন একজন সন্ন্যাসীর সন্ধান

পাইয়া দরমাহাটার এক গলিতে তাঁহার কাছে সকালের দিকে গেল। লোকের খুব ভিড়, কেহ দর্শনপ্রার্থী, কেহ ঔষধ লইতে আসিয়াছে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর অপুর ডাক পড়িল। সন্ন্যাসী গেরুয়াধারী নহেন, সাদা ধুতি পরণে, গায়ে হাত-কাটা বেনিয়ান, জলচৌকির উপর আসন পাতিয়া বসিয়া আছেন। অপুর প্রশ্ন শুনিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন —আপনার স্ত্রী কতদিন মারা গেছেন? মাস দুই?—তার পুনর্জ্জন্ম হয়ে গিয়েছে। —অপু অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি ক'রে আপনি—মানে—

সন্ন্যাসীজী বলিলেন—মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই হয়। এতদিন থাকে না—আপনাকে বলে দিচ্ছি, বিশ্বাস করতে হয় এসব কথা। ইংরিজি পড়ে আপনারা তো এ সব মানেন না। তাই হতে হবে।

অপুর একথা আদৌ বিশ্বাস হইল না। অপর্ণা, তাহার অপর্ণা, আর মাস আট-নয় পরে অন্য দেশে কোন গৃহস্থের ঘরে সব ভুলিয়া ছোট খুকী হইয়া জন্মিবে?···এত স্নেহ, এত প্রেম, এত মমতা—এসব ভুয়োবাজি? অসম্ভব!···সারারাত কিন্তু এই চিন্তায় সে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল—একবার ভাবে, হয়ত সন্ন্যাসী ঠিকই বলিয়াছেন—কিন্তু তার মন বলে, ও-কথাই নয়—মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেও সে-কথা বিশ্বাস করিবে না। দুঃখের মধ্যে হাসিও পাইল।—ভাবিল অপর্ণার পুনর্জ্জন্ম হয়ে গেছে, ওর কাছে টেলিগ্রাম এসেছে! হামবাগ কোথাকার—দ্যাখ না কাণ্ড!···

এত ভয়ানক সঙ্গীহীনতার ভাব গত দশ-এগারো মাস তাহার হয় নাই। পিণ্টুরা চলিয়া যাওয়ার পর বাসাও আর ভাল লাগে না, অপর্ণার সঙ্গে বাসাটা এতখানি জড়ানো যে, আর সেখানে থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। তদুপরি বিপদ, গাঙ্গুলী-গিন্নী তাঁহার কোন বোনঝির সঙ্গে তাহার বিবাহের যোগাযোগের জন্য একেবারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাহাকে একা একটু বসিতে দেখিলে সংসারের অসারত্ব, কথিত বোনঝিটির রূপগুণ, সম্মুখের মাঘ মাসে মেয়েটিকে একেবারে দেখিয়া আসিবার প্রস্তাব, নানা বাজে কথা।

নিজে রাঁধিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা—অবশ্য ইতিপূর্ব্বে সে বরাবরই রাঁধিয়া খাইয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু এবার যেন রাঁধিতে গিয়া কাহার উপর একটা সুতীব্র অভিমান। ঘরটাও বড় নির্জ্জন, রাত্রিতে প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠে। পাষাণভারের মত দারুণ নির্জ্জনতা সব সময় বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া থাকে। এমন কি, শুধু ঘর নয়, পথে-ঘাটে অফিসেও তাই—মনে হয় জগতে কেহ কোথাও আপনার নাই।

তাহার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কে কোথায় চলিয়া গিয়াছে ঠিকানা নাই—প্রণবও নাই এখানে। মুখের আলাপী দু'চারজন বন্ধু আছে বটে কিন্তু ও-সব বে-দরদী লোকের সঙ্গ ভাল লাগে না। রবিবার ও ছুটির দিনগুলি তো আর কাটেই না—অপুর মনে পড়ে বৎসরখানেক পূর্ব্বেও শনিবারের প্রত্যাশায় সে-সব আগ্রহভরা দিন-গণনা—আর আজকাল? শনিবার যত নিকটে আসে তত ভয় বাড়ে।

বৌবাজারের এক গলির মধ্যে তাহার এক কলেজ-বন্ধুর পেটেণ্ট ঔষধের দোকান। অপর্ণার কথা ভুলিয়া থাকিবার জন্য সে মাঝে মাঝে সেখানে গিয়া বসে। এ রবিবার দিনটাও বেড়াইতে বেড়াইতে গেল। কারবারের অবস্থা খুব ভাল নয়। বন্ধুটি তাহাকে দেখিয়া বলিল—ও, তুমি?—আমার আজকাল হয়েছে ভাই—'কে আসিল বলে চমকিয়ে চাই, কাননে ডাকিলে পাখি'—সকাল থেকে হরদম পাওনাদার আসছে আর যাচ্ছে—আমি বলি বুঝি কোন পাওনাদার এল, ব'স ব'স।

অপু বসিয়া বলিল—কাবুলীর টাকাটা শোধ দিয়েছ?

—কোথা থেকে দেব দাদা? সে এলেই পালাই, নয় তো মিথ্যে কথা বলি। খবরের

কাগজে বিজ্ঞাপনের দেনার দরুন—ছোট আদালতে নালিশ করেছিল, পরশু এসে বাজপত্র আদালতের বেলিফ্ সীল ক'রে গিয়েছে। তোমার কাছে বলতে কি, এবেলার বাজারের খরচটা পর্যন্ত নেই—তার ওপর ভাই বাড়িতে সুখ নেই। আমি চাই একটু ঝগড়াঝাঁটি হোক, মান-অভিমান হোক—তা নয়, বৌটা হয়েছে এমন ভাল মানুষ সাতে চড়ে রা নেই—

অপু হাসিয়া উঠিয়া বলিল— বল কি হে, সে তোমার ভাল লাগে না বুঝি ?···

—রামোঃ—পানসে লাগে, ঘোর পানসে। আমি চাই একটু দুষ্টু হবে, একগুঁয়ে হবে—স্মার্ট হবে—তা নয় এত ভাল মানুষ, যা বলছি তাই করছে—সংসারের এই কষ্ট, হয়তো একবেলা খাওয়াই হ'ল না—মুখে কথাটি নেই! কাপড় নেই—তাই সই, ডাইনে বললে তক্ষুণি ডাইনে, বাঁয়ে বললে বাঁয়ে—নাঃ, অসহ্য হয়ে পড়েছে। বৈচিত্র্য নেই রে ভাই। পাশের বাসার বৌটা সেদিন কেমন স্বামীর উপর রাগ ক'রে কাচের গ্লাস, হাতবাক্স দুম্‌দাম্ করে আছাড় মেরে ভাঙলে, দেখে হিংসে হ'ল, ভাবলাম হায় রে, আমার কি কপাল! না, হাসি না—আমি তোমাকে সত্যি সত্যি প্রাণের কথা বলছি ভাই—এরকম পানসে ঘরকন্না আর আমার চলছে না—বিলিভ্ মি—অসম্ভব!···ভালমানুষ নিয়ে ধুয়ে খাব ?···একটা দুষ্টু মেয়ের সন্ধান দিতে পার ?···

—কেন, আবার বিয়ে করবে নাকি ?—একটাকে পার না খেতে দিতে—তোমার দেখছি সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়—

—না ভাই, এ সুখ আমার আর—জীবনটা এখন দেখছি একেবারে ব্যর্থ হ'ল, মনের কোনও সাধই মিটল না—এক এক সময় ভাবি ওর সঙ্গে আমার ঠিক মিলন হয় নি—মিলন যদি ঘটত তা হলে দ্বন্দ্বও হ'ত—বুঝলে না ?···কে, টেঁপি ?—এই আমার বড় মেয়ে—শোন, তোর মা'র কাছ থেকে দুটো পয়সা নিয়ে দু'পয়সার বেগুনি কিনে নিয়ে আয় তো আমাদের জন্যে, পার অমনি চায়ের কথা বলে দে—

—আচ্ছা মরণের পর মানুষ কোথায় যায় জান ? বলতে পার ?

—ও সব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাই নি কখনও। পাওনাদার কি ক'রে তাড়ানো যায় বলতে পার ? এখুনি কাবুলীওয়ালা একটা আসবে নেবুতলা থেকে। আঠার টাকা ধার নিয়েছি, চার আনা টাকা পিছু সুদ হপ্তায়। দু-হপ্তার সুদ বাকী, কি যে আজ তাকে বলি ?—স্কাউণ্ড্রেলটা এল বলে—দিতে পার দুটো টাকা ভাই ?

—এখন তো নেই কাছে, একটা আছে, রেখে দাও। কাল সকালে আর একটা টাকা দিয়ে যাব এখন। এই যে টেঁপি, বেশ বেগুনি এনেছিস্—না না, আমি খাব না, তোমরা খাও, আচ্ছা এই—এই একখানা তুলে নিলাম, নিয়ে যা টেঁপি।

বন্ধুর দোকান হইতে বাহির হইয়া সে খানিকটা লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিল। লীলা কি এখানে আছে ? একবার দেখিয়া আসিবে ? প্রায় এক বৎসর লীলারা এখানে নাই, তাহার দাদামহাশয় মামলা করিয়া লীলার পৈতৃক-সম্পত্তি কিছু উদ্ধার করিয়াছেন, আজকাল লীলা মায়ের সঙ্গে আবার বর্দ্ধমানের বাড়িতেই ফিরিয়া গিয়াছে। থার্ড ইয়ারে ভর্ত্তি হইয়া এক বৎসর পড়িয়াছিল—পরীক্ষা দেয় নাই, লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ভবানীপুরে লীলাদের ওখানে গেল। রামলগন বেয়ারা তাহাকে চেনে, বৈঠকখানায় বসাইল, মিঃ লাহিড়ী এখানে নাই, রাঁচি গিয়াছেন। লীলা দিদিমণি ? কেন, সে-কথা কিছু বাবুর জানা নাই ? দিদিমণির তো বিবাহ হইয়া গিয়াছে গত বৈশাখ মাসে। নাগপুরে জামাইবাবু বড় ইঞ্জিনিয়ার, বিলাতফেরত—একেবারে খাঁটি সাহেব, দেখিলে চিনিবার জো নাই। খুব বড়লোকের ছেলে—এদের সমান বড়লোক। কেন, বাবুর কাছে নিমন্ত্রণের চিঠি যায় নাই ?

অপু বিবর্ণমুখে বলিল—কই না, আমার কাছে, হ্যাঁ—না আর ব'সব না—আচ্ছা।

বাহিরে আসিয়া জগৎটা যেন অপুর কাছে একেবারে নির্জ্জন, সঙ্গীহীন, বিস্বাদ ও বৈচিত্র্যহীন ঠেকিল। কেন এ রকম মনে হইতেছে তাহার? লীলা বিবাহ করিবে ইহার মধ্যে অসম্ভব তো কিছু নাই! সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তবে তাহার মন খারাপ করিবার কি আছে? ভালই তো। জামাই ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষিত, অবস্থাপন্ন—লীলার উপযুক্ত বর জুটিয়াছে, ভালই তো।

রাস্তা ছাড়িয়া ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সম্মুখের মাঠটাতে অর্ধ অন্ধকারের মধ্যে সে উদ্‌ভ্রান্তের মত অনেকক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইল।

লীলার বিবাহ হইয়াছে, খুবই আনন্দের কথা, ভাল কথা। ভালই তো।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কলিকাতা আর ভাল লাগে না, কিছুতেই না—এখানকার ধরাবাঁধা রুটিনমাফিক কাজ, বদ্ধতা, একঘেয়েমি—এ যেন অপুর অসহ্য হইয়া উঠিল। তা ছাড়া একটা যুক্তিহীন ও ভিত্তিহীন অস্পষ্ট ধারণা তাহার মনের মধ্যে ক্রমেই গড়িয়া উঠিতেছিল—কলিকাতা ছাড়িলেই যেন সর্ব দুঃখ দূর হইবে—মনের শান্তি আবার ফিরিয়া পাওয়া যাইবে।

শীলেদের অফিসের কাজ ছাড়িয়া দিয়া অবশেষে সে চাঁপদানীর কাছে একটা গ্রাম্য স্কুলের মাস্টারি লইয়া গেল। জায়গাটা না-শহর, না-পাড়াগাঁ গোছের - চারিধারে পাটের কল ও কুলিবস্তি, টিনের চালাওয়ালা দোকানঘর ও বাজার, কয়লার গুঁড়োফেলা রাস্তার কালো ধুলো ও ধোঁয়া, শহরের পারিপাট্যও নাই, পাড়াগাঁয়ের সহজ শ্রীও নাই।

বড়দিনের ছুটিতে প্রণব ঢাকা হইতে কলিকাতায় অপুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। সে জানিত অপু আজকাল কলিকাতায় থাকে না—সন্ধ্যার কিছু আগে সে গিয়া চাঁপদানী পেঁছিল।

খুঁজিয়া খুঁজিয়া অপুর বাসাও বাহির করিল। বাজারের একপাশে একটা ছোট্ট ঘর—তার অর্ধেকটা একটা ডাক্তারখানা, স্থানীয় একজন হাতুড়ে ডাক্তার সকালে বিকালে রোগী দেখেন। বাকী অর্ধেকটাতে অপুর একখানা তক্তপোশ, একটা আধময়লা বিছানা, খানকতক বই, একটা বাঁশের আলনায় খানকতক কাপড় ঝুলানো। তক্তপোশের নিচে অপুর স্টীলের তোরঙ্গটা।

অপু বলিল—এসো এসো, এখানকার ঠিকানা কি ক'রে জানলে?

—সে কথার দরকার নেই। তারপর কলকাতা ছেড়ে এখানে কি মনে ক'রে?—বাস্! এমন জায়গায় মানুষ থাকে?

—খারাপ জায়গাটা কি দেখলি? তা ছাড়া কলকাতায় যেন আর ভাল লাগে না—দিনকতক এমন হ'ল যে, বাইরে যেখানে হয় যাব, সেই সময় এখানকার মাস্টারিটা জুটে গেল, তাই এখানে এলুম। দাঁড়া, তোর চায়ের কথা বলে আসি—।

পাশেই একটা বাঁকুড়ানিবাসী বামুনের তেলেভাজা পরোটার দোকান। রাত্রে তাদেরই দোকানে অতি অপকৃষ্ট খাদ্য কলঙ্ক-ধরা পিতলের থালায় আনীত হইতে দেখিয়া প্রণব অবাক হইয়া গেল—অপুর রুচি অন্ততঃ মার্জ্জিত ছিল চিরদিন, হয়ত তাহা সরল ছিল, অনাড়ম্বর ছিল, কিন্তু অমার্জ্জিত ছিল না। সেই অপুর এ কি অবনতি! এ-রকম একদিন নয়, রোজই রাত্রে নাকি এই তেলেভাজা পরোটাই অপুর প্রাণধারণের একমাত্র উপায়। এত অপরিষ্কারও তো সে অপুকে কস্মিন্‌কালে দেখিয়াছে এমন মনে হয় না।

কিন্তু প্রণবের সবচেয়ে বুকে বাজিল যখন পরদিন বৈকালে অপু তাহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া পাশের এক স্যাকরার দোকানে নীচ-শ্রেণীর তাসের আড্ডায় অতি ইতর ও স্থূল ধরণের হাস্য-পরিহাসের মধ্যে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া মহানন্দে তাস খেলিতে লাগিল।

অপুর ঘরটাতে ফিরিয়া আসিয়া প্রণব বলিল—কাল আমার সঙ্গে চল্ অপু—এখানে তোকে থাকতে হবে না—এখান থেকে চল্।

অপু বিস্ময়ের সুরে বলিল—কেন রে, কি খারাপ দেখলি এখানে? বেশ জায়গা তো, বেশ লোক সবাই। ওই যে দেখলি বিশ্বম্ভর স্বর্ণকার—উনি এদিকের একজন বেশ অবস্থাপন্ন লোক, ও'র বাড়ি দেখিস নি। গোলা কত! মেয়ের বিয়েতে আমায় নেমন্তন্ন করেছিল, কি খাওয়ানটাই খাওয়ালেন—উঃ! পরে খুশীর সহিত বলিল—এখানে ও'রা সব বলেছেন আমায় ধানের জমি দিয়ে বাস করাবেন—নিকটেই বেগমপুরে ও'দের—বেশ জায়গা—কাল তোকে দেখাব চল—ও'রাই ঘরদোর বেঁধে দেবেন বলেছেন···আপাতত মাটির, মানে, বিচুলির ছাউনি, এদেশে উলুখড় হয় না কিনা!

প্রণব সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করিল—অপু তর্ক করিল, নিজের অবস্থার প্রাধান্য প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে নানা যুক্তির অবতারণা করিল, শেষে রাগ করিল, বিরক্ত হইল—যাহা সে কখনও হয় না। প্রকৃতিতে তাহার রাগ বা বিরক্তি ছিল না কখনই। অবশেষে প্রণব নিরুপায় অবস্থায় পরদিন সকালের ট্রেনে কলিকাতায় ফিরিয়া গেল।

যাইবার সময় তাহার মনে হইল, সে অপু যেন আর নাই—প্রাণশক্তির প্রাচুর্য একদিন যাহার মধ্যে উছলিয়া উঠিতে দেখিয়াছে, আজ সে যেন প্রাণহীন নিষ্প্রভ। এমনতর স্থূল তৃপ্ত বা সন্তোষ-বোধ, এ ধরণের আশ্রয় আঁকড়াইয়া ধরিবার কাঙালপনা কই অপুর প্রকৃতিতে তো ছিল না কখনও!

স্কুল হইতে ফিরিয়া রোজ অপু নিজের ঘরে রোয়াকে একটা হাতলভাঙা চেয়ার পাতিয়া বসিয়া থাকে। এখানে সে অত্যন্ত একা ও সঙ্গীহীন মনে করে, বিশেষ করিয়া সন্ধ্যাবেলা। সেটা এত অসহনীয় হইয়া উঠে, কোথাও একটু বসিয়া গল্পগুজব করিতে ভাল লাগে, মানুষের সঙ্গ স্পৃহণীয় মনে হয়, কিন্তু এখানে অধিকাংশই পাটকলের সর্দার, বাবু, বাজারের দোকানদার, তাও সবাই তাহার অপরিচিত। বিশু স্যাকরার দোকানের সান্ধ্য আড্ডা সে নিজে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে, তবুও ন'টা-দশটা পর্যন্ত রাত একরকম কাটে ভালই।

অপুর ঘরের রোয়াকটার সামনেই মার্টিন কোম্পানীর ছোট লাইন, সেটা পার হইয়া একটা পুকুর, জল যেমন অপরিষ্কার, তেমনি বিস্বাদ। পুকুরের ওপারে একটা কুলিবস্তি, দু'বেলা যত ময়লা কাপড় সবাই এক পুকুরেই কাচিতে নামে। রৌদ্র উঠিলেই কুলি লাইনের ছাপ-মারা খয়েরী-রঙের বারো-হাতী শাড়ি পুকুরের ও-পারের ঘাসের উপর রৌদ্রে মেলানো অপুর রোয়াক হাতে দেখিতে পাওয়া যায়; কুলিবস্তির ও-পাশে গোটাকতক বাদাম গাছ, একটা ইটখোলা, খানিকটা ধানক্ষেত, একটা পাটের গাটবন্দী কল। এক একদিন রাত্রে ইটের পাঁজার ফাটলে ফাটলে রাঙা বেগুনী আলো জ্বলে, মাঝে মাঝে নিভিয়া যায়, আবার জ্বলে, অপু নিজের রোয়াকে বসিয়া বসিয়া মনোযোগের সঙ্গে দেখে। রাত দশটার মার্টিন লাইনের একখানা গাড়ি হাওড়ার দিক হইতে আসে—অপুর রোয়াক ঘেঁষিয়া যায়—পোঁটলা-পুঁটলি, লোকজন, মেয়েরা—পাশেই স্টেশনে গিয়া থামে, একটু পরেই বাঁকুড়াবাসী ঠাকুরটি তেলেভাজা পরোটা ও তরকারী আনিয়া হাজির করে, খাওয়া শেষ করিয়া শুইতে অপুর প্রায় এগারোটা বাজে। দিনের পর দিন একই রুটিন। বৈচিত্র্যও

নাই, বদলও নাই।

অপু কাহারো সহিত গায়ে পড়িয়া আত্মীয়তা করিতে যায় যে, কোন মতলব আঁটিয়া তাহা নহে, ইহা সে যখনই করে, তখনই সে করে নিজের অজ্ঞাতসারে—নিঃসঙ্গতা দূর করিবার অচেতন আগ্রহে। কিন্তু নিঃসঙ্গতা কাটিতে চায় না সব সময়। যাইবার মত জায়গা নাই, করিবার মত কাজও নাই—চুপচাপ বসিয়া বসিয়া সময় কাটে না। ছুটির দিনগুলি তো অসম্ভবরূপ দীর্ঘ হইয়া পড়ে।

নিকটেই ব্রাঞ্চ পোস্টাফিস। অপু রোজ বৈকালে ছুটির পরে সেখানে গিয়া বসিয়া প্রতিদিনের ডাক অতি আগ্রহের সহিত দেখে। ঠিক বৈকালে পাঁচটার সময় সব্-অফিসের পিওন চিঠিপত্র-ভরা সীল-করা ডাক-ব্যাগটি ঘাড়ে করিয়া আনিয়া হাজির করে, সীল ভাঙিয়া বড় কাঁচি দিয়া সেটার মুখের বাঁধন কাটা হয়। এক একদিন অপুই বলে—ব্যাগটা খুলি চরণবাবু?

চরণবাবু বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ, খুলুন না, আমি ততক্ষণ ইস্টাম্পের হিসেবটা মিলিয়ে ফেলি—এই নিন কাঁচি।

পোস্টকার্ড, খাম, খবরের কাগজ, পুলিন্দা, মনি-অর্ডার। চরণবাবু বলেন—মনি-অর্ডার সাতখানা? দেখেছেন কান্ডটা মশাই, এদিকে টাকা নেই মোটে। টোটালটা দেখুন না একবার দয়া ক'রে—সাতান্ন টাকা ন' আনা? তবেই হয়েছে—রইল পড়ে, আমি তো আর ইস্ত্রীর গয়না বন্ধক দিয়ে টাকা এনে মনি-অর্ডার তামিল করতে পারি না মশাই? এদিকে ক্যাশ বুঝে নেওয়া চাই বাবুদের রোজ রোজ—

প্রতিদিন বৈকালে পোস্টমাস্টারের টহলদারী করা অপুর কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক কাজ। সাগ্রহে স্কুলের ছুটির পর পোস্টাপিসে দৌড়ানো চাই-ই তাহার। তার সবচেয়ে আকর্ষণের বস্তু খামের চিঠিগুলি। প্রতিদিনের ডাকে বিস্তর খামের চিঠি আসে—নানাধরণের খাম, সাদা, গোলাপী, সবুজ, নীল। চিঠি-প্রাপ্তিটা চিরদিনই জীবনের একটি দুর্লভ ঘটনা বলিয়া, চিরদিনই চিঠির—বিশেষ করিয়া খামের চিঠির—প্রতি তাহার কেমন একটা বিচিত্র আকর্ষণ। মধ্যে দু' বৎসর অপর্ণা সে পিপাসা মিটাইয়াছিল—এক একখানা খাম বা তাহার উপরের লেখাটা এতটা হুবহু সে রকম, যে প্রথমটা হঠাৎ মনে হয় বুঝি বা সেই-ই চিঠি দিয়াছে। একদিন শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের বাসায় এই রকম খামের চিঠি তাহারও কত আসিত।

তাহার নিজের চিঠি কোনদিন থাকে না, সে জানে তাহা কোথাও হইতে আসিবার সম্ভাবনা নাই—কিন্তু শুধু নানা ধরণের চিঠির বাহ্যদৃশ্যের মোহটাই তাহার কাছে অত্যন্ত প্রবল।

একদিন কাহার একখানি মালিকশূন্য সাকিমশূন্য পোস্টকার্ডের চিঠি ডেড-লেটার অফিস হইতে ঘুরিয়া সারা অঙ্গে ভক্ত বৈষ্ণবের মত বহু ডাক-মোহরের ছাপ লইয়া এখানে আসিয়া পড়িল। বহু সন্ধান করিয়াও তাহার মালিক জুটিল না। সেখানা রোজ এ-গ্রাম ও-গ্রাম হইতে ঘুরিয়া আসে—পিওন কৈফিয়ৎ দেয়, এ নামে কোন লোকই নাই এ অঞ্চলে। ক্রমে— চিঠিখানা অনাদৃত অবস্থায় এখানে-ওখানে পড়িয়া থাকিতে দেখা গেল—একদিন ঘরঝাঁট দিবার সময় জঞ্জালের সঙ্গে কে সামনের মাঠের ঘাসের উপরে ফেলিয়া দিয়াছিল, অপু কৌতূহলের সঙ্গে কুড়াইয়া লইয়া পড়িল—

শ্রীচরণকমলেষু

মেজদাদা, আজ অনেকদিন যাবৎ আপনি আমাদের নিকট কোন পত্রাদি দেন না এবং আপনি কোথায় আছেন, কি ঠিকানা না জানিতে পারায় আপনাকেও আমরা পত্র লিখি

নাই। আপনার আগের ঠিকানাতেই এ পত্রখানা দিলাম, আশা করি উত্তর দিতে ভুলবেন না। আপনি কেন আমাদের নিকট পত্র দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন, তাহার কারণ বুঝিতে সক্ষম হই নাই। আপনি বোধহয় আমাদের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন, তাহা না হইলে আপনি আমাদের এখানে না আসিলেও একখানা পত্র দিতে পারেন। এতদিন আপনার খবর না জানিতে পারিয়া কি ভাবে দিন যাপন করিতেছি তাহা সামান্য পত্রে লিখিলে কি বিশ্বাস করিবেন মেজদাদা? আমাদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি একেবারেই ফুরাইয়া গিয়াছে? সে যা হোক, যেরূপ অদৃষ্ট নিয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সেইরূপ ফল। আপনাকে বৃথা দোষ দিব না। আশা করি আপনি অসন্তোষ হইবেন না। যদি অপরাধ হইয়া থাকে, ছোট বোন বলিয়া ক্ষমা করিবেন। আপনার শরীর কেমন আছে, আপনি আমার সভক্তি প্রণাম জানিবেন, খুব আশা করি পত্রের উত্তর পাইব। আপনার পত্রের আশায় পথ চাহিয়া রহিলাম। ইতি—

সেবিকা
কুসুমলতা বসু

কাঁচা মেয়েলি হাতের লেখা, লেখার অপটুত্ব ও বানান-ভুলে ভরা। সহোদর বোনের চিঠি নয়, কারণ পত্রখানা লেখা হইতেছে জীবনকৃষ্ণ চক্রবর্তী নামের কোন লোককে। এত আগ্রহপূর্ণ, আবেগভরা পত্রখানার শেষকালে এই গতি ঘটিল? মেয়েটি ঠিকানা জানে না, নয় তো লিখিতে ভুলিয়াছে! অপটু লেখার ছত্রে ছত্রে যে আন্তরিকতা ফুটিয়াছে তাহার প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য পত্রখানা সে তুলিয়া লইয়া নিজের বাক্সে আনিয়া রাখিল। মেয়েটির ছবি চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে—পনেরো-ষোল বৎসর বয়স, সুঠাম গড়ন, ছিপছিপে পাতলা, একরাশ কালো কোঁকড়া কোঁকড়া চুল মাথায়। ডাগর চোখ।···কোথায় সে তাহার মেজদাদার পত্রের উত্তরের অপেক্ষায় বৃথাই পথ চাহিয়া আছে! মানবমনের এত প্রেম, এত আগ্রহভরা আহ্বান, পবিত্র বালিকাহৃদয়ের এ অমূল্য অর্ঘ্য কেন জগতে এভাবে ধুলায় অনাদরে গড়াগড়ি যায়, কেহ পোঁছে না, কেহ তা লইয়া গর্ব্ব করে না?

বিশ্বম্ভর স্যাকরার দোকানে সেদিন রাত এগারটা পর্য্যন্ত জোর তাসের আড্ডা চলিল—সবাই উঠিতে চায়, সবাই বলে রাত বেশী হইয়াছে, অথচ অপু সকলকে অনুরোধ করিয়া বসায়, কিছুতেই খেলা ছাড়িতে চায় না। অবশেষে অনেক রাত্রে বাসায় ফিরিতেছে, কলুদের পুকুরের কাছে স্কুলের থার্ড পণ্ডিত আশু সান্যাল লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে চলিয়াছেন। অপুকে দেখিয়া বলিলেন, কি অপূর্ব্ববাবু যে, এত রাত্রে কোথায়?

—কোথাও না; এই বিশু স্যাকরার দোকানে তাসের—

থার্ড পণ্ডিত এদিক-ওদিক চাহিয়া নিম্ন সুরে বলিলেন—একটা কথা আপনাকে বলি, আপনি বিদেশী লোক—পূর্ণ বাঁড়ুয্যের খপ্পরে পড়ে গেলেন কি ক'রে বলুন তো?

অপু বুঝিতে না পারিয়া বলিল, খপ্পরে-পড়া কেমন বুঝতে পারছি নে—কি ব্যাপারটা বলুন তো?

পণ্ডিত আরও নিচু সুর করিয়া বলিল—ওখানে অত ঘন ঘন যাওয়া-আসা আপনার কি ভাল দেখাচ্ছে, ভাবছেন? ওদের টাকাকড়ি দেওয়া ও-সব? আপনি হচ্ছেন ইস্কুলের মাস্টার, আপনাকে নিয়ে অনেক কথা উঠেছে, তা বোধ করি জানেন না?

—না! কি কথা?

—কি কথা তা আর বুঝতে পারছেন না মশাই? হুঁ—পরে কিছু থামিয়া বলিলেন—ও সব ছেড়ে দিন, বুঝলেন? আরও একজন আপনার আগে ঐ রকম খপ্পরে পড়েছিল, এখানকার নন্দ পইয়ের আবগারী দোকানে কাজ করত, ঠিক আপনার মত অল্প বয়স—

মশাই, টাকা শ‌ুষে শ‌ুষে তাকে একেবারে—ওদের ব্যবসাই ঐ। সমাজে একঘরে করবার কথা হচ্ছে—থার্ড পণ্ডিত একটু থামিয়া একটু অর্থসূচক হাস্য করিয়া বলিলেন,—আর ও-মেয়ের এমন মোহই বা কি, শহর অঞ্চলে বরং ওর চেয়ে ঢের—

অপ‌ু এতক্ষণ পর্য্যন্ত পণ্ডিতের কথাবার্ত্তার গতি ও বক্তব্য-বিষয়ের উদ্দেশ্য কিছ‌ুই ধরিতে পারে নাই—কিন্তু শেষের কথাটাতে সে বিস্ময়ের সুরে বলিল—কোন্ মেয়ে, পটেশ্বরী?

—হ্যা হ্যা হ্যা, থাক্ থাক্, একটু আস্তে—

—কি করেছে বল্‌ছেন পটেশ্বরী?

—আমি আর কি বলছি কিছ‌ু, সবাই যা বলে আমিও তাই বলছি। নতুন কথা আর কিছ‌ু বলছি কি? যাবেন না ও-সবে, তাতে বিদেশী লোক, সাবধান ক'রে দি। ভদ্রলোকের ছেলে, নিজের চরিত্রটা আগে রাখতে হবে ভাল, বিশেষ যখন ইস্কুলের শিক্ষক এখানকার।

থার্ড পণ্ডিত পাশের পথে নামিয়া পড়িলেন। অপ‌ু প্রথমটা অবাক্ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু বাসায় ফিরিতে ফিরিতে সমস্ত ব্যাপারটা তাহার কাছে পরিষ্কার হইয়া গেল।

পূর্ণ দাঁঘ‌ুড়ীর বাড়িতে যাওয়া-আসার ইতিহাসটা এইরূপ—

প্রথমে এখানে আসিয়া অপ‌ু কয়েকজন ছাত্র লইয়া এক সেবা-সমিতি স্থাপন করিয়াছিল। একদিন সে স্কুল হইতে ফিরিতেছে, পথে একজন অপরিচিত প্রৌঢ় ব্যক্তি তাহার হাত দ‌ুটো জড়াইয়া ধরিয়া প্রায় ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া বলিল, আপনারা না দেখলে আমার ছেলেটা মারা যেতে বসেছে—আজ পনেরো দিন টাইফয়েড্, তা আমি কলের চাকরি বজায় রাখব, না রুগীর সেবা করব? আপনি দিন-মানটার জন্যে জনাকতক ভলাণ্টিয়ার যদি আমার বাড়ি—আর সেই সঙ্গে যদি দ‌ু-একদিন আপনি—

তেত্রিশ দিনে রোগী আরাম হইল। এই তেত্রিশ দিনের অধিকাংশ দিনই অপ‌ু নিজে ছাত্রদের সঙ্গে প্রাণপণে খাটিয়াছে। রাত্রি তিনটায় ঔষধ খাওয়াইতে হইবে, অপ‌ু ছাত্রদিগকে জাগিতে না দিয়া নিজে জাগিয়াছে, তিনটা না বাজা পর্য্যন্ত বাহিরের দাওয়ার একপাশে বই পড়িয়া সময় কাটাইয়াছে, পাছে এমনি বসিয়া থাকিলে ঘ‌ুমাইয়া পড়ে।

একদিন দ‌ুপ‌ুরে টাল খাইয়া রোগী যায়-যায় হইয়াছিল। দাঁঘ‌ুড়ী মশায় পাটকলে, সে দিন ভলাণ্টিয়ার-দলের আবার কেহই ছিল না, দ‌ুপ‌ুরে ভাত খাইতে গিয়াছিল। অপ‌ু দাঁঘ‌ুড়ী মশায়ের স্ত্রীকে ভরসা দিয়া ব‌ুঝাইয়া শান্ত রাখিয়া মেয়ে দ‌ুটির সাহায্যে গরম জল করাইয়া বোতলে প‌ুরিয়া সেঁক-তাপ ও হাত পা ঘষিতে ঘষিতে আবার দেহের উষ্ণতা ফিরিয়া আসে।

ছেলে সারিয়া উঠিলে দাঁঘ‌ুড়ী মশায় একদিন বলিলেন—আপনি আমার যা উপকারটা করেছেন মাস্টার মশায়—তা এক ম‌ুখে আর কি বলব—আমার স্ত্রী বলছিল, আপনার তো রেঁধে খাওয়ার কষ্ট—এই একমাসে আপনি তো আমাদের আপনার লোক হয়ে পড়েছেন—তা আপনি কেন আমাদের ওখানেই খান না? আপনি বাড়ির ছেলের মত থাকবেন, খাবেন, কোনও অস‌ুবিধে আপনার হতে পারে না।

সেই হইতেই অপ‌ু এখানে একবেলা করিয়া খায়।

পরিচয় অল্প দিনের বটে, কিন্তু বিপদের দিনের মধ্য দিয়া সে পরিচয়—কাজেই ঘনিষ্ঠতা ক্রমে আত্মীয়তায় পরিণত হইতে চলিয়াছে। অপ‌ু পূর্ণ দাঁঘ‌ুড়ীর স্ত্রীকে শ‌ুধ‌ু 'মাসিমা' বলিয়া ডাকে তাহাই নয়, মাসের বেতন পাইলে সবটা আনিয়া নতুন-পাতানো মাসিমার হাতে তুলিয়া দেয়। সে-টাকার হিসাব প্রতি মাসের শেষে মাসিমা ম‌ুখে ম‌ুখে ব‌ুঝাইয়া দিয়া আরও চার-পাঁচ টাকা বেশী খরচ দেখাইয়া দেন এবং পরের মাসের মাহিনা হইতে কাটিয়া রাখেন। বাজারে বিশ‌ু স্যাক্‌রা একদিন বলিয়াছিল—দাঁঘ‌ুড়ী বাড়ি টাকা রাখবেন না

অমন ক'রে, ওরা অভাবী লোক, বিশেষ ক'রে দাঁঘড়ী-গিন্নী ভারী খেলোয়াড় মেয়েছেলে, বিদেশী লোক আপনি, আপনাকে বলে রাখি, ওদের সঙ্গে অত মেলামেশার দরকার কি আপনার ?

মেয়ে-দুইটির সঙ্গে সে মেশে বটে। বড় মেয়েটির নাম পটেশ্বরী, বয়স বছর চৌদ্দ-পনেরো হইবে, রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, তবে তাহাকে দেখিয়া সুন্দরী বলিয়া কোনদিনই মনে হয় নাই অপুর। তবে এটুকু সে লক্ষ্য করিয়াছে, তাহার সুবিধা অসুবিধার দিকে বাড়ির এই মেয়েটিই একটু বেশী লক্ষ্য রাখে। পটেশ্বরী না রাঁধিয়া দিলে অর্ধেক দিন বোধ হয় তাহাকে না খাইয়াই স্কুলে যাইতে হইত। তাহার ময়লা রুমালগুলি নিজে চাহিয়া লইয়া সাবান দিয়া রাখে, ছোট ভাইয়ের হাতে টিফিনের সময় তাহার জন্য আটার রুটি পাঠাইয়া দেয়, অপু খাইতে বসিলে পান সাজিয়া রুমালে জড়াইয়া রাখে। কি একটা ব্রতের সময় বলিয়াছিল, আপনার হাত দিয়ে ব্রতটা নেব মাস্টার মশাই! এ সবের জন্য সে মনে মনে মেয়েটির উপর কৃতজ্ঞ—কিন্তু এ সব জিনিস যে বাহিরের দিক হইতে এরূপ ভাবে দেখা যাইতে পারে, একথা পর্যন্ত তাহার মনে কখনও উদয় হয় নাই—সে জানেই না এ ধরনের সন্দিগ্ধ ও অশুচি মনোভাবের খবর।

সে বিস্মিতও হইল, রাগও করিল। শেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া পরদিন হইতে পূর্ণ দাঁঘড়ীর বাড়ি যাওয়া-আসা বন্ধ করিল। ভাবিল—কিছু না, মাঝে পড়ে পটেশ্বরীকে বিপদে পড়তে হবে।

ইতিমধ্যে বাঁকুড়াবাসী বামুনটি রাশীকৃত বাজার-দেনা ফেলিয়া একদিন ঝাঁঝরা, হাতা ও বেলুনখানা মাত্র সম্বল করিয়া চাঁপদানীর বাজার হইতে রাতারাতি উধাও হইয়াছিল, সুতরাং আহারাদির খুবই কষ্ট হইতে লাগিল।

দাঁঘড়ী-বাড়ি হইতে ফিরিয়া সে মনে মনে ভাবিল, এ-রকম বাবা-মা তো কখনও দেখি নি ? বেচারীকে এ-ভাবে কষ্ট দেওয়া—ছিঃ—যাক্, ওদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক আর রাখব না।

সেদিন ছুটির পর অপু একখানা খবরের কাগজ উল্টাইতে উল্টাইতে দেখিতে পাইল একটা শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধের লেখক তাহার বন্ধু জানকী এবং নামের তলায় ব্র্যাকেটের মধ্যে লেখা আছে—On deputation to England.

জানকী ভাল করিয়া এম-এ ও বি-টি পাশ করিবার পর গবর্নমেণ্ট স্কুলে মাস্টারি করিতেছে এ-সংবাদ পূর্বেই সে জানিত কিন্তু তাহার বিলাত যাওয়ার কোন খবরই তাহার জানা ছিল না। কে-ই বা দিবে ? দেখি দেখি—বা রে! জানকী বিলাত গিয়াছে, বাঃ—

প্রবন্ধটা কৌতূহলের সহিত পড়িল। বিলাতের একটা বিখ্যাত স্কুলের শিক্ষাপ্রণালী ও ছাত্রজীবনের দৈনন্দিন ঘটনা-সংক্রান্ত আলোচনা। বাহির হইয়া পথ চলিতে চলিতে ভাবিল, উঃ, জানকী যে জানকী—সেও গেল বিলেত!

মনে পড়িল কলেজ-জীবনের কথা—বাগবাজারের সেই শ্যামরায়ের মন্দির ও ঠাকুরবাড়ি—গরীব ছাত্রজীবনে জানকীর সঙ্গে কতদিন সেখানে খাইতে যাওয়ার কথা। ভালই হইয়াছে, জানকী কম কষ্টটা করিয়াছিল কি একদিন! বেশ হইয়াছে, ভালই হইয়াছে।

এ-অঞ্চলের রাস্তায় বড় ধুলো, তাহার উপর আবার কয়লার গুঁড়ো দেওয়া—পথ হাঁটা মোটেই প্রীতিকর নয়। দুধারে কুলিবস্তী; ময়লা দড়ির চারপাই পাতিয়া লোকগুলো তামাক টানিতেছে ও গল্প করিতেছে। এ-পথ চলিতে চলিতে অপরিচ্ছন্ন, সংকীর্ণ বস্তী-গুলির দিকে চাহিয়া সে কতবার ভাবিয়াছে, মানুষ কোন্ টানে, কিসের লোভে এ-ধরণের নরককুণ্ডে স্বেচ্ছায় বাস করে ? জানে না, বেচারীরা জানে না, পলে পলে এই নোংরা

আবহাওয়া তাহাদের মনুষ্যত্বকে, রুচিকে, চরিত্রকে, ধর্ম্মস্পৃহাকে গলা টিপিয়া খুন করিতেছে। সূর্য্যের আলো কি ইহারা কখনও ভোগ করে নাই? বন-বনানীর শ্যামলতাকে ভালবাসে নাই? পৃথিবীর মুক্ত রূপকে প্রত্যক্ষ করে নাই?

নিকটে মাঠ নাই, বেগমপুরের মাঠ অনেক দূরে, রবিবার ভিন্ন সেখানে যাওয়া চলে না। সুতরাং খানিকটা বেড়াইয়াই সে ফিরিল।

অনেকদিন হইতে এ-অঞ্চলের মাঠে ও পাড়াগাঁয়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এদিকের গাছ-পালা ও বনের ফুলের একটা তালিকা ও বর্ণনা সে একখানা বড় খাতায় সংগ্রহ করিয়াছে। স্কুলের দু-একজন মাস্টারকে দেখাইলে তাঁহারা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। ও-সবের কথা লইয়া আবার বই! পাগল আর কাকে বলে!

বাসায় আসিয়া আজ আর সে বিশু স্যাক্‌রার আড্ডায় গেল না। বসিয়া বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে জানকীর কথা মনে পড়িল। বিলাতে—তা বেশ। কতদিন গিয়াছে কে জানে? ব্রিটিশ মিউজিয়ম-টিউজিয়ম এতদিনে সব দেখা হইয়া গিয়াছে নিশ্চয়। পুরানো নর্ম্যান দুর্গ দু-একটা, পাশে পাশে জুনিপারের বন, দূরে ঢেউ-খেলানো মাঠের সীমায় খড়িমাটির পাহাড়ের পিছনে সন্ধ্যাধূসর আটলান্টিকের উদার বুকে অস্ত-আকাশের রঙিন প্রতিচ্ছায়া, কি কি গাছ, পাড়াগাঁয়ের মাঠের ধারে কি কি বনের ফুল? ইংল্যাণ্ডের বনফুল নাকি ভারী দেখিতে সুন্দর—পপি, ক্লিম্যাটিস, ডেজী।

বিশু স্যাক্‌রার দোকান হইতে লোক ডাকিতে আসে, আসিবার আজ এত দেরি কিসের? খেলুড়ে ভীম সাধুখাঁ, মহেশ সাবুই, নীলু ময়রা, ফকির আড্ডি—ইহারা অনেকক্ষণ আসিয়া বসিয়া আছে—মাস্টার মশায়ের যাইবার অপেক্ষায় এখনও খেলা যে আরম্ভ হয় নাই।

অপু যায় না—তাহার মাথা ধরিয়াছে—না, আজ সে আর খেলায় যাইবে না।

ক্রমে রাত্রি বাড়ে, পদ্মপুকুরের ও-পারে কুলিবস্তীর আলো নিবিয়া যায়, নৈশ-বায়ু শীতল হয়, রাত্রি সাড়ে দশটায় আপ ট্রেন হেলিতে-দুলিতে ঝক-ঝক শব্দে রোয়াকের কোল ঘেঁষিয়া চলিয়া যায়, পয়েন্টস্‌ম্যান্ আঁধারে-লণ্ঠন-হাতে আসিয়া সিগ্‌ন্যালের বাতি নামাইয়া লইয়া যায়। জিজ্ঞাসা করে—মাস্টারবাবু, এখনও বসিয়ে আছেন?

—কে ভজুয়া? হ্যাঁ—সে এখনো বসিয়া আছে।

কিসের ক্ষুধা—কিসের যেন একটা অতৃপ্ত ক্ষুধা!

ও-বেলা একখানা পুরানো জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল—এখানা খুব ভাল বই এ-সম্বন্ধে। শীলেদের বাড়ির চাকরিজীবনে কিনিয়াছিল—এখানা হইতে অপর্ণাকে কতদিন নীহারিকা ও নক্ষত্রপুঞ্জের ফটোগ্রাফ দেখাইয়া বুঝাইয়া দিত—ও-বেলা যখন সেখানা লইয়া পড়িতেছিল তখন তাহার চোখে পড়িল, অতি ক্ষুদ্র সাদা রংয়ের—খালি চোখের খুব তেজ না থাকিলে দেখা প্রায় অসম্ভব—এরূপ একটা পোকা বইয়ের পাতায় চলিয়া বেড়াইতেছে। ওর সম্বন্ধে ভাবিয়াছিল—এই বিশাল জগৎ, নক্ষত্রপুঞ্জ, উল্কা, নীহারিকা, কোটি কোটি দৃশ্য-অদৃশ্য জগৎ লইয়া এই অনন্ত বিশ্ব—ও-ও তো এরই একজন অধিবাসী—এই যে চলিয়া বেড়াইতেছে পাতাটার উপরে, ও-ই ওর জীবনানন্দ—কতটুকু ওর জীবন, আনন্দ কতটুকু?

কিন্তু মানুষেরই বা কতটুকু? ঐ নক্ষত্র-জগতের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধই বা কি? আজকাল তাহার মনে একটা নৈরাশ্য ও সন্দেহবাদের ছায়া মাঝে মাঝে যেন উঁকি মারে। এই বর্ষাকালে সে দেখিয়াছে, ভিজা জুতার উপর এক রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছাতা গজায়—কতদিন মনে হইয়াছে মানুষও তেমনি পৃথিবীর পৃষ্ঠে এই রকম ছাতার মত জন্মিয়াছে—এখানকার উষ্ণ বায়ুমণ্ডল ও তাহার বিভিন্ন গ্যাসগুলো প্রাণপোষণের অনুকূল একটা অবস্থার

সৃষ্টি করিয়াছে বলিয়া। এরা নিতান্তই এই পৃথিবীর, এরই সঙ্গে এদের বন্ধন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো, ব্যাঙের ছাতার মতই হঠাৎ গজাইয়া উঠে, লাখে লাখে, পালে পালে জন্মায়, আবার পৃথিবীর বুকেই খায় মিলাইয়া। এরই মধ্য হইতে সহস্র ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ ঘটনার আনন্দ, হাসি-খুশিতে দৈন্য-ক্ষুদ্রতাকে ঢাকিয়া রাখে—গড়ে চল্লিশটা বছর পরে সব শেষ। যেমন ঐ পোকার সব শেষ হইয়া গেল তেমনি।

এই অবোধ জীবগণের সঙ্গে ঐ বিশাল নক্ষত্র-জগতের, ঐ গ্রহ, উল্কা, ধূমকেতু—ঐ নিঃসীম নাক্ষত্রিক বিরাট শূন্যের কি সম্পর্ক? সুদূরের পিপাসাও যেমন মিথ্যা, অনন্ত জীবনের স্বপ্নও তেমনি মিথ্যা—ভিজা জুতার বা পচা বিচালী-গাদায় ব্যাঙের ছাতার মত যাহাদের উৎপত্তি—এই মহনীয় অনন্তের সঙ্গে তাদের কিসের সম্পর্ক?

· মৃত্যুপারে কিছুই নাই, সব শেষ। মা গিয়াছে—অপর্ণা গিয়াছে—অনিল গিয়াছে—সব দাঁড়ি পড়িয়া গিয়াছে—পূর্ণচ্ছেদ।

ঐ জ্যোতির্বিজ্ঞানের বইখানাতে যে বিশ্বজগতের ছবি ফুটিয়াছে, ঐ পোকাটার পক্ষে যেমন তাহার কল্পনা ও ধারণা সম্পূর্ণ অসম্ভব, এমন সব উচ্চতর বিবর্তনের প্রাণী কি নাই যাহাদের জগতের তুলনায় মানুষের জগৎটা ঐ বইয়ের পাতায় বিচরণশীল প্রায় আনুবীক্ষণিক পোকাটার জগতের মতই ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, নগণ্য? .

হয়ত তাহাই সত্য, হয়ত মানুষের সকল কল্পনা, সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান মিলিয়া যে বিশ্বটার কল্পনা করিয়াছে সেটা বিরাট বাস্তবের অতি ক্ষুদ্র এক ভগ্নাংশ নয়,—তাহা নিতান্ত এ পৃথিবীর মাটির,···মাটির··· মাটির।

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জগতের তুলনায় ঐ পোকাটার জগতের মত! হয়ত তাহাই, কে বলিবে হ্যাঁ কি না?

মানুষ মরিয়া কোথায় যায়? ভিজা জুতাকে রৌদ্রে দিলে তাহার উপরকার ছাতা কোথায় যায়?

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

স্কুলের সেক্রেটারী স্থানীয় বিখ্যাত চাউল ব্যবসায়ী রামতারণ গুঁইয়ের বাড়ি এবার পূজার খুব ধুমধাম। স্কুলের বিদেশী মাস্টার মহাশয়েরা কেহ বাড়ি যান নাই, এই বাজারে চাকুরিটা যদি বা জুটিয়া গিয়াছে, এখন সেক্রেটারীর মনস্তুষ্টি করিয়া সেটা তো বজায় রাখিতে হইবে! তাঁহারা পূজার কয়দিন সেক্রেটারীর বাড়িতে প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া লোকজনের আদর-অভ্যর্থনা, খাওয়ানোর বিলি-বন্দোবস্ত প্রভৃতিতে মহাব্যস্ত, সকলেই বিজয়া দশমীর পরদিন বাড়ি যাইবেন। অপুর হাতে ছিল ভাঁড়ার। ঘরের চার্জ—কয়দিন রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত খাটিবার পর বিজয়া দশমীর দিন বৈকালে সে ছুটি পাইয়া কলিকাতায় আসিল।

প্রায় এক বৎসরের একঘেয়ে ওই পাড়াগেঁয়ে জীবনের পরে বেশ লাগে শহরের এই সজীবতা। এই দিনটার সঙ্গে বহু অতীত দিনের নানা উৎসব-চপল আনন্দস্মৃতি জড়ানো আছে, কলিকাতায় আসিলেই যেন পুরানো দিনের সে-সব উৎসবরাজি তাহাকে পুরাতন সঙ্গী বলিয়া চিনিয়া ফেলিয়া প্রীতিমধুর কলহাস্যে আবার তাহাকে ব্যগ্র আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া ফেলিবে। পথে চলিতে চলিতে নিজের ছেলের কথা মনে হইতে লাগিল বার বার। তাহাকে দেখা হয় নাই—কি জানি কি রকম দেখিতে হইয়াছে। অপর্ণার মত, না তাহার মত?··· ছেলের উপর অপু মনে মনে খুব সন্তুষ্ট ছিল না, অপর্ণার মৃত্যুর জন্য সে মনে মনে ছেলেকে দায়ী করিয়া বসিয়াছিল বোধ হয়। ভাবিয়াছিল, পূজার সময় একবার সেখানে

গিয়া দেখিয়া আসিবে—কিন্তু যাওয়ার কোন তাগিদ মনের মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না। চক্ষু-লজ্জার খাতিরে খোকার পোশাকের দরুন পাঁচটি টাকা শ্বশুরবাড়িতে মনি-অর্ডার করিয়া পাঠাইয়া পিতার কর্তব্য সমাপন করিয়াছে।

আজিকার দিনে শুধু আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা যায়। কিন্তু তাহার কোনও পূর্বপরিচিত বন্ধু আজকাল আর কলিকাতায় থাকে না, কে কোথায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গ্রে স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়াইয়া প্রতিমা দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিল —কোথায় যাওয়া যায় ?

তার পরে সে লক্ষ্যহীনভাবে চলিল। একটা সরু গলি, দুজন লোকে পাশাপাশি যাওয়া যায় না, দুধারে একতলা নীচু স্যাঁতসেঁতে ঘরে ছোট ছোট গৃহস্থেরা বাস করিতেছে —একটা রান্নাঘরে ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের একটি বৌ লুচি ভাজিতেছে, দুটি ছোট মেয়ে ময়দা বেলিয়া দিতেছে—অপু ভাবিল, একবৎসর পরে আজ হয়ত ইহাদের লুচি খাইবার উৎসব-দিন। একটা উঁচু রোয়াকে অনেকগুলি লোক কোলাকুলি করিতেছে, গোলাপী সিল্কের ফ্রকপরা কোঁকড়াচুল একটি ছোট মেয়ে দরজার পর্দা তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে। একটা দৃশ্যে তাহার ভারী দুঃখ হইল। এক মুড়ির দোকানে প্রৌঢ়া মুড়িওয়ালীকে একটি অল্পবয়সী নীচশ্রেণীর পতিতা মেয়ে বলিতেছে—ও দিদি—দিদি ? একটু পায়ের ধুলো দ্যাও। পরে পায়ের ধুলা লইয়া বলিতেছে, একটু সিদ্ধি খাওয়াবে না, শোনো—ও দিদি ? মুড়িওয়ালী তাহার কথায় আদৌ কান না দিয়া সোনার মোটা অনন্ত-পরা ঝিয়ের সহিত কথাবার্তা কহিতেছে—মেয়েটি তাহার মনোযোগ ও অনুগ্রহ আকর্ষণ করিবার জন্য আবার প্রণাম করিতেছে ও আবার বলিতেছে - দিদি, ও দিদি ? একটু পায়ের ধুলো দ্যাও। পরে হাসিয়া বলিতেছে—একটু সিদ্ধি খাওয়াবে না, ও দিদি ?

অপু ভাবিল, এ রূপহীনা হতভাগিনীও হয়ত কলিকাতায় তাহার মত একাকী, কোন খোলার ঘরের অন্ধকার গর্ভগৃহ হইতে আজিকার দিনের উৎসবে যোগ দিতে তাহার চুনুরি শাড়িখানা পরিয়া বাহির হইয়াছে। পাশের দোকানের অবস্থাপন্ন মুড়িওয়ালীর অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছে, উৎসবের অংশ হইতে যাহাতে সে বঞ্চিত না হয়। ওর চোখে ওই মুড়ি-ওয়ালীই হয়ত কত বড়লোক !

ঘুরিতে ঘুরিতে সেই কবিরাজ-বন্ধুটির দোকানে গেল। বন্ধু দোকানেই বসিয়া আছে, খুব আদর করিয়া বলিল—এসো, এসো ভাই, ছিলে কোথায় এতদিন ? বন্ধুর অবস্থা পূর্বাপেক্ষাও খারাপ, পূর্বের বাসা ছাড়িয়া নিকটের একটা গলিতে সাড়ে তিন টাকা ভাড়াতে একটা খোলার ঘর লইয়াছে—নতুবা চলে না। বলিল—আর ভাই পারি নে, এখন হয়েছে দিন-আনি দিন-খাই অবস্থা—আমি আর স্ত্রী দুজনে মিলে বাড়িতে আচার-চাটনি, পয়সা প্যাকেট চা—এই সব ক'রে বিক্রি করি—অসম্ভব স্ট্রাগল করতে হচ্ছে ভাই, এসো বাসায় এসো।

নীচু স্যাঁতসেঁতে ঘর। বন্ধুর বৌ বা ছেলেমেয়ে কেহই বাড়ি নাই—পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে গলির মুখে বড় রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া প্রতিমা দেখিতেছে। বন্ধু বলিল—এবার আর ছেলেমেয়েদের কাপড়-টাপড় দিতে পারি নি—বলি ঐ পুরানো কাপড় ধোপার বাড়ি থেকে কাচিয়ে পর্। বৌটার চোখে জল দেখে শেষকালে ছোট মেয়েটার জন্য একখানা ডুরে শাড়ি—তাই। ব'স ব'স, চা খাও, বাঃ, আজকের দিনে যদি এলে। দাঁড়াও, ডেকে আনি ওকে।

অপু ইতিমধ্যে গলির মোড়ের দোকান হইতে আট আনার খাবার কিনিয়া আনিল। খাবারের ঠোঙা হাতে যখন সে ফিরিয়াছে তখন বন্ধু ও বন্ধুপত্নী বাসায় ফিরিয়াছে।—

বাঃ রে, আবার কোথায় গিয়েছিলে—ওতে কি? খাবার? বাঃ রে, খাবার তুমি আবার কেন—

অপু হাসিমুখে বলিল—তোমার আমার জন্যে তো আনি নি? খুকী রয়েছে, ঐ খোকা রয়েছে—এস তো মানু—কি নাম? রমলা? ও বাবা, বাপের শখ দ্যাখ—রমলা! বৌ-ঠাকরুণ—ধরুন তো এটা।

বন্ধুপত্নী আধঘোমটা টানিয়া প্রসন্ন হাসিভরা মুখে ঠোঙাটি হাতে লইলেন। সকলকে চা ও খাবার দিলেন। সেই খাবারই।

আধঘণ্টাটাক পর অপু বলিল—উঠি ভাই, আবার চাঁপদানীতেই ফিরব - বেশ ভাল ভাই—কষ্টের সঙ্গে তুমি এই যে লড়াই করছ—এতেই তোমাকে ভাল করে চিনে নিলাম—কিন্তু বৌ-ঠাকরুণকে একটা কথা বলে যাই -অত ভালমানুষ হবেন না—আপনার স্বামী তা পছন্দ করেন না। দু-একদিন একটু-আধটু চুলোচুলি, হাতা-যুদ্ধ বেলুন-যুদ্ধ—জীবনটা বেশ একটু সরস হয়ে উঠবে—বুঝলেন না? এ আমার মত নয় কিন্তু, আমার এই বন্ধুটির মত—আচ্ছা আসি, নমস্কার।

বন্ধুটি পিছু পিছু আসিয়া হাসিমুখে বলিল ওহে তোমার বৌ-ঠাকরুণ বলছেন, ঠাকুরপোকে জিজ্ঞেস কর, উনি বিয়ে করবেন, না, এই রকম সন্ন্যিসি হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াবেন? ··উত্তর দাও।

অপু হাসিয়া বলিল—দেখে শুনে আর ইচ্ছে নেই ভাই, বলে দাও।

বাইরে আসিয়া ভাবে—আচ্ছা তবু এরা আজ ছিল বলে বিজয়ার আনন্দটা করা গেল। সত্যিই শান্ত বৌটি। ইচ্ছে করে এদের কোনও হেল্প করি—কি ক'রে হয়, হাতে এদিকে পয়সা কোথায়?

তাহার পর কিসের টানে সে ট্রামে উঠিয়া একেবারে ভবানীপুরে লীলাদের বাড়ি গিয়া হাজির হইল। রাত তখন প্রায় সাড়ে-আটটা। লীলার দাদামশায়ের লাইব্রেরী-ঘরটাতে লোকজন কথাবার্তা বলিতেছে - গাড়িবারান্দাতে দুখানা মোটর দাঁড়াইয়া আছে—পোকার উপদ্রবের ভয়ে হলের ইলেকট্রিক আলোগুলিতে রাঙা সিল্কের ঘেরাটোপ বাঁধা। মার্বেলের সিঁড়ির ধাপ বাহিয়া হলের সামনের চাতালে উঠিবার সময় সেই গন্ধটা পাইল - কিসের গন্ধ ঠিক সে জানে না, হয়ত দামী আসবাবপত্রের গন্ধ, নয়ত লীলার দাদামশাইয়ের দামী চুরুটের গন্ধ—এখানে আসিলেই ওটা পাওয়া যায়।

লীলা—এবার হয়ত লীলা···অপুর বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল।

লীলার ছোট ভাই বিমলেন্দু তাহাকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া হাত ধরিল।

এই বালকটিকে অপুর বড় ভাল লাগে - মাত্র বার দুই ইহার আগে সে অপুকে দেখিয়াছে, কিন্তু কি চোখেই যে দেখিয়াছে! একটু বিস্ময়মাখানো আনন্দের সুরে বলিল—অপূর্ববাবু, আপনি এতদিন পরে কোথা থেকে? আসুন, আসুন, বসবেন। বিজয়ার প্রণামটা, দাঁড়ান।

—এসো এসো, কল্যাণ হোক, মা কোথায়?

—মা গিয়েছেন বাগবাজারের বাড়িতে—আসবেন এখুনি—বসুন।

—ইয়ে—তোমার দিদি এখানে তো—না?—ও।

এক মুহূর্ত্তে সারা বিজয়া দশমীর উৎসবটা, আজিকার সকল ছুটাছুটি ও পরিশ্রমটা অপুর কাছে বিস্বাদ, নীরস, অর্থহীন হইয়া গেল। শুধু আজ বলিয়া নয়, পূজা আরম্ভ হইবার সময় হইতেই সে ভাবিতেছে—লীলা পূজার সময় নিশ্চয় কলিকাতায় আসিবে—বিজয়ার দিন গিয়া দেখা করিবে। আজ চাঁপদানীর চটকলে পাঁচটার ভোঁ বাজিয়া প্রভাত

সূচনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে অসীম আনন্দের সহিত বিছানায় শুইয়া ভাবিয়াছিল—বৎসর দুই পরে আজ লীলার সঙ্গে ওবেলা দেখা হইবে এখন! সেই লীলাই নাই এখানে!...

বিমলেন্দু তাহাকে উঠিতে দিল না। চা ও খাবার আনিয়া খাওয়াইল। বলিল—বসুন, এখন উঠতে দেব না, নতুন আইসক্রিমের কলটা এসেছে—বড়মামার বন্ধুদের জন্যে সিদ্ধির আইসক্রিম হচ্ছে—খাবেন সিদ্ধির আইসক্রিম? রোজ দেওয়া—আপনার জন্যে এক ডিশ আনতে বলে এলুম। আপনার গান শোনা হয় নি কতদিন, না সত্যি, একটা গান করতেই হবে—ছাড়ছি নে।

—লীলা কি সেই রায়পুরেই আছে? আসবে-টাসবে না?...

—এখন তো আসবে না দিদি—দিদির নিজের ইচ্ছেতে তো কিছু হবার জো নেই—দাদামশায় পত্র লিখেছিলেন, জামাইবাবু উত্তর দিলেন এখন নয়, দেখা যাবে এর পর।

তাহার পর সে অনেক কথা বলিল। অপু এ-সব জানিত না।—জামাইবাবু লোক ভাল নয়, খুব রাগী, বদমেজাজী। দিদি খুব তেজী মেয়ে বলিয়া পারিয়া উঠে না—তবু ব্যবহার আদৌ ভাল নয়। নীচু সুরে বলিল—নাকি খুব মাতালও—দিদি তো সব কথা লেখে না, কিন্তু এবার বড়দিদির ছেলে কিছুদিন বেড়াতে গিয়েছিল নাকি গরমের ছুটিতে, সে এসে সব বললে। বড়দিদিকে আপনি চেনেন না? সুজাতাদি? এখানেই আছেন, এসেছেন আজ—ডাকব তাঁকে?

অপুর মনে পড়িল সুজাতাকে। বড় বৌরানীর মেয়ে বাল্যের সেই সুন্দরী, তন্বী সুজাতা—বর্ধমানের বাড়িতে তাহারই যৌবনপুষ্পিত তনুলতাটি একদিন অপুর অনভিজ্ঞ শৈশবচক্ষুর সম্মুখে নারী-সৌন্দর্যের সমগ্র ভাণ্ডার যেন নিঃশেষে উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছিল—বারো বৎসর পূর্বের সে উৎসবের দিনটা আজও এমন স্পষ্ট মনে পড়ে!

একটু পরে সুজাতা হাসিমুখে পর্দা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিল, কিন্তু একজন অপরিচিত, সুদর্শন, তরুণ যুবককে ঘরের মধ্যে দেখিয়া প্রথমটা সে তাড়াতাড়ি পিছু হটিয়া পর্দাটা পুনরায় টানিতে যাইতেছিল—বিমলেন্দু হাসিয়া বলিল—বাঃ রে, ইনিই তো অপূর্ববাবু বড়দি, চিনতে পারেন নি?

অপু উঠিয়া পায়ের ধুলো লইয়া প্রণাম করিল। সে সুজাতা আর নাই, বয়স ত্রিশ পার হইয়াছে, খুব মোটা হইয়া গিয়াছে, মাথার সামনের দিকে দু-এক গাছা চুল উঠিতে শুরু হইয়াছে, যৌবনের চটুল লাবণ্য গিয়া মুখে মাতৃত্বের কোমলতা। বর্ধমানে থাকিতে অপুর সঙ্গে একদিনও সুজাতার আলাপ হয় নাই—রাঁধুনীর ছেলের সঙ্গে বাড়ির বড় মেয়ের কোন্ আলাপই বা সম্ভব ছিল? সবাই তো আর লীলা নয়! তবে বাড়ির রাঁধুনী বামনীর ছেলেটিকে ভয়ে ভয়ে বড়লোকের বাড়িতে একতলা দালানের বারান্দাতে অনেকবার সে বেড়াইতে, ঘোরাফেরা করিতে দেখিয়াছে বটে।

সুজাতা বলিল—এসো এসো, বস। এখানে কি কর? মা কোথায়?

—মা তো অনেকদিন মারা গিয়েছেন।

—তুমি বিয়ে-থাওয়া করেছ তো—কোথায়?

সে সংক্ষেপে সব বলিল। সুজাতা বলিল—তা আবার বিয়ে কর নি? না না, বিয়ে ক'রে ফেল, সংসারে থাকতে গেলে ও-সব তো আছেই, বিশেষ যখন তোমার মা-ও নেই। সে বাড়ির আর মেয়ে-টেয়ে নেই?

অপুর মনে হইল, লীলা থাকিলে, সে 'তোমার মা' এ-কথা না বলিয়া শুধু 'মা' বলিত, তাহাই সে বলে। লীলার মত আর কে এমন দয়াময়ী আছে তাহার জীবনে, যে তাহার সকল দারিদ্র্যকে, সকল হীনতাকে উপেক্ষা করিয়া পরিপূর্ণ করুণার ও মমতার স্নেহপাণি

সহজ বন্ধুত্বের মাধুর্য্যে তাহার দিকে এমন প্রসারিত করিয়া দিয়াছে ? সুজাতার কথার উত্তর দিতেই এ-কথাটা ভাবিয়া সে কেমন অন্যমনস্ক হইয়া গেল।

সুজাতা ভিতরে চলিয়া গেলে অপুর মনে হইল শুধু মাতৃত্বের শান্ত কোমলতা নয়, সুজাতার মধ্যে গৃহিণীপনার প্রবীণতাও আসিয়া গিয়াছে। বলিল আসি ভাই বিমল, আমার আবার সাড়ে দশটায় গাড়ি।

বিমলেন্দু তাকে আগাইয়া দিতে তাহার সহিত অনেকদূর আসিল। বলিল—আর বছর ফাগুন মাসে দিদি এসেছিল, দিন পনেরো ছিল। কাউকে বলবেন না, আপনার পুরোনো আপিসে একবার আমায় পাঠিয়েছিল আপনার খোঁজে—সবাই বললে তিনি চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছেন কোথায় কেউ জানে না। আপনার কথা আমি লিখব, আপনার ঠিকানাটা দিন্ না ?···দাঁড়ান, লিখে নিই।

মাঘীপূর্ণিমার দিনটা ছিল ছুটি। সারাদিন সে আশে-পাশের গ্রামগুলো পায়ে হাঁটিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। সন্ধ্যার অনেক পরে সে বাসায় আসিয়া শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িল। কত রাত্রে জানে না, তক্তপোশের কাছের জানালাতে কাহার মৃদু করাঘাতের শব্দে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। শীত এখনও বেশী বলিয়া জানালা বন্ধই ছিল, বিছানার উপর বসিয়া সে জানালাটা খুলিয়া ফেলিল। কে যেন বাহিরের রোয়াকে জ্যোৎস্নার মধ্যে দাঁড়াইয়া! কে ?—উত্তর নাই। সে তাড়াতাড়ি দুয়ার খুলিয়া বাহিরের রোয়াকে আসিয়া অবাক হইয়া গেল—কে একটি স্ত্রীলোক এত রাত্রে তাহার জানালার কাছে দেয়াল ঘেঁষিয়া বিষণ্ণভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

অপু আশ্চর্য্য হইয়া কাছে গিয়া বলিল—কে ওখানে ? পরে বিস্ময়ের সুরে বলিল—পটেশ্বরী! তুমি এখানে এত রাত্রে! কোথা থেকে—তুমি শ্বশুরবাড়ি ছিলে, এখানে কি ক'রে—

পটেশ্বরী নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল, কথা বলিল না—অপু চাহিয়া দেখিল, তাহার পায়ের কাছে একটা ছোট পুঁটুলি পড়িয়া আছে। বিস্ময়ের সুরে বলিল কেঁদো না পটেশ্বরী, কি হয়েছে বল। আর এখানে এ-ভাবে দাঁড়িয়েও তো—শুনি কি হয়েছে ? তুমি এখন আসছ কোথেকে বল তো ?

পটেশ্বরী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—রিষড়ে থেকে হেঁটে আসছি—অনেক রাত্তিরে বেরিয়েছি, আমি আর সেখানে যাব না—

—আচ্ছা, চলো চলো, তোমায় বাড়িতে দিয়ে আসি—কি বোকা মেয়ে! এত রাত্তিরে কি এ ভাবে বেরুতে আছে।···ছিঃ—আর এই কনকনে শীতে, গায়ে একখানা কাপড় নেই কিছু না—এ কি ছেলেমানুষি!

—আপনার পায়ে পড়ি মাস্টার মশাই, আপনি বাবাকে বলবেন, আর যেন সেখানে না পাঠায়—সেখানে গেলে আমি মরে যাব—পায়ে পড়ি আপনার—

বাড়ির কাছাকাছি গিয়া বলিল—বাড়িতে যেতে বড্ড ভয় করছে, মাস্টার মশায়—আপনি একটু বলবেন বাবাকে মাকে বুঝিয়ে—

সে এক কাণ্ড আর কি অত রাত্রে! ভাগ্যে রাত অনেক, পথে কেহ নাই।

অপু তাহাকে সঙ্গে লইয়া দীঘড়ুী-বাড়ি আসিয়া পটেশ্বরীর বাবাকে ডাকিয়া তুলিয়া সব কথা বলিল। পূর্ণ দীঘড়ুী বাহিরে আসিলেন, পটেশ্বরী আমগাছের তলায় বসিয়া পড়িয়া হাঁটুতে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেছে ও হাড়ভাঙা শীতে ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে না একখানা শীতবস্ত্র, না একখানা মোটা চাদর।

বাড়ির মধ্যে গিয়া পটেশ্বরী কাঁদিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিল—একটু পরে পূর্ণ দীঘড়ী তাহাকে ডাকিয়া বাড়ির মধ্যে লইয়া গিয়া দেখাইলেন পটেশ্বরীর হাতে, পিঠে ঘাড়ের কাছে প্রহারের কালশিরার দাগ, এক এক জায়গায় রক্ত ফুটিয়া বাহির হইতেছে—মাকে ছাড়া দাগগুলি সে আর কাহাকেও দেখায় নাই, তিনি আবার স্বামীকে দেখাইয়াছেন। ক্রমেই জানা গেল পটেশ্বরী নাকি রাত বারেটা হইতে পুকুরের ঘাটে শীতের মধ্যে বসিয়া ভাবিয়াছে কি করা যায়—দু ঘণ্টা শীতে ঠকঠক্ করিয়া কাঁপিবার পরও সে বাড়ি আসিবার সাহস সঞ্চয় করিতে না পারিয়া মাস্টার মহাশয়ের জানালায় শব্দ করিয়াছিল।

মেয়েকে আর সেখানে পাঠানো চলিতে পারে না এ কথা ঠিক। দীঘড়ী মশাই অপুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার কোন উকীল বন্ধু আছে কি-না ; এ সম্বন্ধে একটা আইনের পরামর্শ বিশেষ আবশ্যক—মেয়ের ভরণপোষণের দাবী দিয়া তিনি জামাইয়ের নামে নালিশ করিতে পারেন কি না। অপু দিন দুই শুধুই ভাবিতে লাগিল এক্ষেত্রে কি করা উচিত।

সুতরাং স্বভাবতই সে খুব আশ্চর্য্য হইয়া গেল, যখন মাঘীপূর্ণিমার দিন-পাঁচেক পরে সে শুনিল পটেশ্বরীর স্বামী আসিয়া পুনরায় তাহাকে লইয়া গিয়াছে।

কিন্তু তাহাকে আরও বেশী আশ্চর্য্য হইতে হইল, সম্পূর্ণ আর এক ব্যাপারে। একদিন সে স্কুল হইতে ছুটির পরে বাহিরে আসিতেছে, স্কুলের বেহারা তাহার হাতে একখানা চিঠি দিল—খুলিয়া পড়িল, স্কুলের সেক্রেটারী লিখিতেছেন, তাহাকে আর বর্তমানে আবশ্যক নাই—এক মাসের মধ্যে সে যেন অন্যত্র চাকুরি দেখিয়া লয়।

অপু বিস্মিত হইল—কি ব্যাপার! হঠাৎ এ নোটিশের মানে কি? সে তখনই হেডমাস্টারের কাছে গিয়া চিঠিখানি দেখাইল। তিনি নানা কারণে অপুর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। প্রথম, সেবাসমিতি দলগঠন অপুই করিয়াছিল, নেতৃত্বও করিত সে। ছেলেদের সে অত্যন্ত প্রিয়পাত্র, তাহার কথায় ছেলেরা ওঠে বসে। জিনিসটা হেডমাস্টারের চক্ষুশূল। অনেকদিন হইতেই তিনি সুযোগ খুঁজিতেছিলেন—ছিদ্রটা এত দিন পান নাই পাইলে কি আর একটা অনভিজ্ঞ ছোকরাকে জব্দ করিতে এতদিন লাগিত?

হেডমাস্টার কিছু জানেন না—সেক্রেটারীর ইচ্ছা, তাঁহার হাত নাই। সেক্রেটারী জানাইলেন, কথাটা এই যে, অপূর্ববাবুর নামে নানা কথা রটিয়াছে, দীঘড়ী-বাড়ীর মেয়েটির এই সব ঘটনা লইয়া। অনেকদিন হইতেই এ লইয়া তাঁহার কানে কোন কোন কথা গেলেও তিনি শোনেন নাই। কিন্তু সম্প্রতি ছেলেদের অভিভাবকদের মধ্যে অনেকে আপত্তি করিতেছেন যে, ও-রূপ চরিত্রের শিক্ষককে স্কুলে কেন রাখা হয়। অপুর প্রতিবাদ সেক্রেটারী কানে তুলিলেন না।

—দেখুন, ও-সব কথা আলাদা। আমাদের স্কুলের ও ছাত্রদের দিক থেকে এ-ব্যাপারটা অন্যভাবে আমরা দেখব কিনা! একবার যাঁর নামে কুৎসা রটেছে, তাঁকে আর আমরা শিক্ষক হিসাবে রাখতে পারি নে তা সে সত্যিই হোক, বা মিথ্যেই হোক।

অপুর মুখ লাল হইয়া গেল এই বিরাট অবিচারে। সে উত্তেজিত সুরে বলিল—বেশ তো মশায়, এ বেশ জাস্টিস্ হ'ল তো! সত্যি মিথ্যে না জেনে আপনারা একজনকে এই বাজারে অনায়াসে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিচ্ছেন—বেশ তো?

বাহিরে আসিয়া রাগে ও ক্ষোভে তাহার চোখে জল আসিয়া গেল। মনে ভাবিল এসব হেডমাস্টারের কারসাজি—আমি যাব তাঁর বাড়ি খোশামোদ করতে? যায় যাক্ চাকরি! কিন্তু এদের অদ্ভুত বিচার বটে - ডিফেন্ড্ করার একটা সুযোগ তো খুনী আসামীকেও দেওয়া হয়ে থাকে, তা-ও এরা আমায় দিলে না!

কয়দিন সে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, এখানকার চাকুরির মেয়াদ তো আর এই মাসটা—

তারপর কি করা যাইবে? স্কুলে এক নতুন মাস্টার কিছুদিন পূর্বে কোন এক মাসিক পত্রিকায় গল্প লিখিয়া দশটা টাকা পাইয়াছিলেন। গল্পটা সেই ভদ্রলোকের কাছে অপু অনেকবার শুনিয়াছে। আচ্ছা, সেও এখানে বসিয়া খাতায় একটা উপন্যাস লিখিতে শুরু করিয়াছিল—মনে মনে ভাবিল—দশ-বারো চ্যাপ্টার তো লেখা আছে, উপন্যাসখানা যদি লিখে শেষ করতে পারি, তার বদলে কেউ টাকা দেবে না? কেমন হচ্ছে কে জানে; এক-বার রামবাবুকে দেখাব।

নোটিশ-মত অপুর কাজ ছাড়িবার আর বিলম্ব নাই, একদিন পোস্টাফিসের ডাক্-ব্যাগ খুলিয়া খাম ও পোস্টকার্ডগুলি নাড়িতে-চাড়িতে একখানা বড়, চৌকা সবুজ রংএর মোটা খামের ওপর নিজের নাম দেখিয়া বিস্মিত হইল—কে তাহাকে এত বড় শৌখিন খামে চিঠি দিল। প্রণব নয়, অন্য কেহ নয়, হাতের লেখাটা সম্পূর্ণ অপরিচিত।

খুলিয়া দেখিলেই তো তাহার সকল রহস্য এখনই চলিয়া যাইবে, এখন থাক, বাসায় গিয়া পড়িবে এখন। এই অজানার আনন্দটুকু যতক্ষণ ভোগ করা যায়!

রান্না-খাওয়ার কাজ শেষ হইতে মার্টিন কোম্পানীর রাত দশটার গাড়ি আসিয়া পড়িল, বাজারের দোকানে দোকানে ঝাঁপ পড়িল। অপু পত্রখানা খুলিয়া দেখিল—দুখানা চিঠি, একখানা ছোট চার-পাঁচ লাইনের, আর একখানা মোটা সাদা কাগজে—পরক্ষণেই আনন্দে, বিস্ময়ে, উত্তেজনায় তার বুকের রক্ত যেন চলকাইয়া উঠিয়া গেল মাথায়—সর্বনাশ, কার চিঠি এ! চোখকে যেন বিশ্বাস করা যায় না—লীলা তাহাকে লিখিতেছে! সঙ্গের চিঠিখানা তার ছোট ভাইয়ের—সে লিখিতেছে, দিদির এ পত্রখানা তাহার পত্রের মধ্যে আসিয়াছে, অপুকে পাঠাইবার অনুরোধ ছিল দিদির, পাঠানো হইল।

অনেক কথা, ন' পৃষ্ঠা ছোট ছোট অক্ষরের চিঠি! খানিকটা পড়িয়া সে খোলা হাওয়ায় আসিয়া বসিল। কি অবর্ণনীয় মনোভাব,বোঝানো যায় না, বলা যায় না। আরম্ভটা এইরকম—

ভাই অপূর্ব,

অনেকদিন তোমার কোন খবর পাই নি—তুমি কোথায় আছ, আজকাল কি কর, জানবার ইচ্ছে হয়েছে অনেকবার কিন্তু কে বলবে, কার কাছেই বা খবর পাব? সেবার কলকাতায় গিয়ে বিনুকে একদিন তোমার পুরানো ঠিকানায় তোমার সন্ধানে পাঠিয়ে-ছিলাম—সে বাড়িতে অন্য লোক আজকাল থাকে, তোমার সন্ধান দিতে পারে নি, কি করেই বা পারবে? একথা বিনু বলে নি তোমায়?

আমি বড় অশান্তিতে আছি এখানে, কখনও ভাবি নি এমন আমার হবে। কখনও যদি দেখা হয় তখন সব বলব। এই সব অশান্তির মধ্যে যখন আবার মনে হয় তুমি হয়ত মলিন-মুখে কোথায় পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছ—তখন মনের যন্ত্রণা আরও বেড়ে যায়। এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন বিনুর পত্রে জানলাম বিজয়া দশমীর দিন তুমি ভবানীপুরের বাড়িতে গিয়েছিলে, তোমার ঠিকানাও পেলাম।

বর্ধমানের কথা মনে হয়? অত আদরের বর্ধমানের বাড়িতে আজকাল আর যাবার জো নেই। জ্যাঠামশায় মারা যাওয়ার পর থেকেই রমেন-দা বড় বাড়াবাড়ি ক'রে তুলেছিল। আজকাল সে যা করছে, তা তুমি হয়ত কখনও শোনও নি। মানুষের ধাপ থেকে সে যে কত নীচে নেমে গিয়েছে, আর যা কীর্ত্তিকারখানা, তা লিখতে গেলে পুঁথি হয়ে পড়ে। কোন মাড়োয়ারীর কাছে নিজের অংশ বন্ধক রেখে টাকা ধার করেছিল এখন তার পরামর্শে পার্টিশান স্যুট আরম্ভ করেছে—বিনুকে ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্যে। এ-সব তোমার মাথায় আসবে কোনও দিন?

কত রাত পর্য্যন্ত অপু চোখের পাতা বুজাইতে পারিল না। লীলা যাহা লিখিয়াছে তাহার অপেক্ষা বেশী যেন লেখে নাই। সারা পত্রখানিতে একটা শান্ত সহানুভূতি স্নেহ-প্রীতি, করুণা। এক মুহূর্ত্তে আজ দু বৎসরব্যাপী এই নিস্তর্নতা অপুর যেন কাটিয়া গেল—এইমাত্র সে ভাবিতেছিল সংসারে সে একা তাহার কেহ কোথাও নেই। লীলার পত্রে জগতের চেহারা যেন এক মুহূর্ত্তে বদলাইয়া গেল। কোথায় সে—কোথায় লীলা।··· বহুদূরের ব্যবধান ভেদ করিয়া তাহার প্রাণের উষ্ণ প্রেমময় স্পর্শ অপুর প্রাণে লাগিয়াছে—কিন্তু কি অপূর্ব্ব রসায়ন এ স্পর্শটা—কোথায় গেল অপুর চাকুরি যাইবার দুঃখ - কোথায় গেল গোটা-দুই বৎসরের পাষাণভারের মত নির্জ্জনতা নারীহৃদয়ের অপূর্ব্ব রসায়নের প্রলেপ তাহার সকল মনে, সকল অঙ্গে, কী যে আনন্দ ছড়াইয়া দিল! লীলা যে আছে,···সব সময় তাহার জন্য ভাবে—দুঃখ করে, জীবনে অপু আর কি চায়? সাক্ষাতের আবশ্যক নাই, জন্মজন্মান্তর ব্যাপিয়া এই স্পর্শটুকু অক্ষয় হইয়া বিরাজ করুক।···

লীলার পত্র পাইবার দিন-বারো পরে তাহার যাইবার দিন আসিয়া গেল।

ছেলেরা সভা করিয়া তাহাকে বিদায়-সম্বর্দ্ধনা দিবার উদ্দেশ্যে চাঁদা উঠাইতেছিল - হেডমাস্টার খুব বাধা দিলেন। যাহাতে সভা না হইতে পায় সেইজন্য দলের চাঁইদিগকে ডাকিয়া টেস্ট পরীক্ষার সময় বিপদে ফেলিবেন বলিয়া শাসাইলেন—পরিশেষে স্কুল-ঘরে সভার স্থানও দিতে চাহিলেন না, বলিলেন - তোমরা ফেয়ারওয়েল দিতে যাচ্ছ, ভাল কথা, কিন্তু এসব বিষয়ে আয়রন্ ডিসিপ্লিন চাই - যার চরিত্র নেই, তার কিছুই নেই, তার প্রতি কোনও সম্মান তোমরা দেখাও, এ আমি চাই নে, অন্তত স্কুল-ঘরে আমি তার জায়গা দিতে পারি নে।

সেদিন আবার বড় বৃষ্টি। মহেন্দ্র সাঁবুই-এর আটচালায় জনবিশেক উপরের ক্লাসের ছেলে হেডমাস্টারের ভয়ে লুকাইয়া হাতে লেখা অভিনন্দনপত্র পড়িয়া ও গাঁদাফুলের মালা গলায় দিয়া অপুকে বিদায়-সম্বর্দ্ধনা জানাইল, সভা ভঙ্গের পর জলযোগ করাইল। প্রত্যেকে পায়ের ধূলা লইয়া, তাহার বাড়ি আসিয়া বিছানাপত্র গুছাইয়া দিয়া, নিজেরা তাহাকে বৈকালে ট্রেনে তুলিয়া দিল।

অপু প্রথমে আসিল কলিকাতায়।

একটা খুব লম্বা পাড়ি দিবে—যেখানে সেখানে—যেদিকে দুই চোখ যায়—এতদিনে সত্যই মুক্তি। আর কোনও জালে নিজেকে জড়াইবে না—সব দিক হইতে সতর্ক থাকিবে—শিকলের বাঁধন অনেক সময় অলক্ষিতে জড়ায় কিনা পায়ে!

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে গিয়া সারা ভারতবর্ষের ম্যাপ ও য়্যাট্‌লাস কয়দিন ধরিয়া দেখিয়া কাটাইল—ড্যানিয়েলের ওরিয়েন্টাল সিনারি ও পিঙ্কার্টনের ভ্রমণ-বৃত্তান্তের নানাস্থান নোট করিয়া লইল—বেঙ্গল নাগপুর ও ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলের নানাস্থানের ভাড়া ও অন্যান্য তথ্য জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইল। সত্তর টাকা আছে, ভাবনা কিসের?

কিন্তু যাওয়ার আগে একবার ছেলেকে চোখের দেখা দেখিয়া যাওয়া দরকার না? সেই দিনই বৈকালের ট্রেনে সে শ্বশুরবাড়ি রওনা হইল। অপর্ণার মা জামাইকে এতটুকু তিরস্কার করিলেন না, এতদিন ছেলেকে না দেখিতে আসার দরুণ একটি কথাও বলিলেন না। বরং এত আদর-যত্ন করিলেন যে অপু নিজেকে অপরাধী ভাবিয়া সঙ্কুচিত হইয়া রহিল। অপু বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা কহিতেছে, এমন সময় তাহার খুড়শাশুড়ী একটি সুন্দর খোকাকে কোলে করিয়া সেখানে আসিলেন। অপু ভাবিল—বেশ খোকাটি তো! কাদের? খুড়শাশুড়ী বলিলেন—যাও তো খোকন, এবার তোমার আপনার লোকের কাছে। ধন্যি যাহোক, এমন নিষ্ঠুর বাপ কখনও দেখি নি। যাও তো একবার কোলে—

ছেলে তিন বৎসর প্রায় ছাড়াইয়াছে—ফুটফুটে সুন্দর গায়ের রং—অপর্ণার মত ঠোঁট ও মুখের নীচেকার ভঙ্গী, চোখ বাপের মত ডাগর ডাগর। কিন্তু সবসুদ্ধ ধরিলে অপর্ণার মুখের আদলই বেশী ফুটিয়া উঠে খোকার মুখে। প্রথমে সে কিছুতেই বাবার কাছে আসিবে না, অপরিচিত মুখ দেখিয়া ভয়ে দিদিমাকে জড়াইয়া রহিল—অপুর মনে ইহাতে আঘাত লাগিল। সে হাসিমুখে হাত বাড়াইয়া বার বার খোকাকে কোলে আনিতে গেল—ভয়ে শেষকালে খোকা দিদিমার কাঁধে মুখ লুকাইয়া রহিল। সন্ধ্যার সময় খানিকটা ভাব হইল। তাহাকে দু-একবার 'বাবা' বলিয়া ডাকিলও। একবার কি একটা পাখি দেখিয়া বলিল—ফাখি, ফাখি, উই এত্তা ফাখি নেবো বাবা—

'প'কে কচি জিব ও ঠোঁটের কি কৌশলে 'ফ' বলিয়া উচ্চারণ করে, কেমন অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। আর এত কথাও বলে খোকা!

কিন্তু বেশীর ভাগই বোঝা যায় না—উলটো-পালটা কথা, কোন্ কথার উপর জোর দিতে গিয়া কোন্ কথার উপর দেয়—কিন্তু অপুর মনে হয় কথা কহিলে খোকার মুখ দিয়া যেন মানিক ঝরে—সে যাহাই কেন বলুক না, প্রত্যেক ভাঙা, অশুদ্ধ, অপূর্ণ কথাটি অপুর মনে বিস্ময় জাগায়। সৃষ্টির আদিম যুগ হইতে কোন শিশু যেন কখনও 'বাবা' বলে নাই, 'জল' বলে নাই,—কোন্ অসাধ্যসাধনই না তাহার খোকা করিতেছে!

পথে বাবার সঙ্গে বাহির হইয়াই খোকা বকুনি শুরু করিল। হাত-পা নাড়িয়া কি বুঝাইতে চায়—অপু না বুঝিয়াই অন্যমনস্ক সুরে ঘাড় নাড়িয়া বলে—ঠিক ঠিক। তারপর কি হ'ল রে খোকা?

একটা বড় সাঁকো পথে পড়ে, খোকা বলে—বাবা যাব—ওই দেখব।

অপু বলে—আস্তে আস্তে নেমে যা—নেমে গিয়ে একটা কু-উ কর্‌বি—

খোকা আস্তে আস্তে ঢালু বাহিয়া নীচে নামে—জলনিকাশের পথটার ফাঁকে ওদিকের গাছপালা দেখা যাইতেছে—না বুঝিয়া বলে—বাবা, এই মধ্যে একতা বাগান—

—কু করো তো খোকা, একটা কু করো।

খোকা উৎসাহের সহিত বাঁশির মত সুরে ডাকে—কু-উ-উ—পরে বলে—তুমি কলুন বাবা?

অপু হাসিয়া বলে—কু-উ-উ-উ-উ—

খোকা আমোদ পাইয়া নিজে আবার করে—আবার বলে—তুমি কলুন?...বাড়ি ফিরিবার পথে বলে, খবিছাক এনো বাবা—দিদিমা খবিছাক আঁড়বে—খবিছাক ভালো—। সন্ধ্যাবেলা খোকা আরও কত গল্প করে। এখানকার চাঁদ গোল। মাসিমার বাড়ি একবার গিয়াছিল, সেখানকার চাঁদ ছোট—এতটুকু! অতটুকু চাঁদ কেন বাবা? শীঘ্রই অপু দেখিল খোকা দুষ্টুও বড়। অপু পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া গুণিতেছে, খোকা দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া সবাইকে বলে—দ্যাখ, কত তাকা!—আয় আয়—

পরে একটা টাকা তুলিয়া লইয়া বলে—এতা আমি কিছুতি দেবো না।—হাতে মুঠো বাঁধিয়া থাকে—আমি কাঁচের ভাঁতা কিনবো—অপু ভাবে খোকাটা দুষ্টুও তো হয়েছে—দা—দে—টাকা কি করবি?

—না কিছুতি দেবো না—হি-হি—ঘাড় দুলাইয়া হাসে।

অপুর টাকাটা হাত হইতে লইতে কষ্ট হয়—তবু লয়। একটা টাকার ওর কি দরকার? মিছামিছি নষ্ট।

কলিকাতা ফিরিবার সময়ে অপর্ণার মা বলিলেন—বাবা আমার মেয়ে গিয়েছে, যাক্—কিন্তু তোমার কষ্টই হয়েছে আমার বেশী! তোমাকে যে কি চোখে দেখেছিলাম বলতে

পারি নে, তুমি যে এ রকম পথে পথে বেড়াচ্ছ, এতে আমার বুক ফেটে যায়, তোমার মা বেঁচে থাকলে কি বিয়ে না করে পারতে? খোকনের কথাটাও তো ভাবতে হবে, একটা বিয়ে কর বাবা।

নৌকায় আবার পীরপুরের ঘাটে আসা। অপর্ণার ছোট খুড়তুত ভাই ননী তাহাকে তুলিয়া দিতে আসিতেছিল।

খররৌদ্রে বড়দলের নোনাজল চক্-চক্ করিতেছে। মাঝ নদীতে একখানা বাদাম-তোলা মহাজনী নৌকা, দূরে বড়দলের মোহনার দিকে সুন্দরবনের ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্ট সীমারেখা।

আশ্চর্য! এরই মধ্যে অপর্ণা যেন কত দূরের হইয়া গিয়াছে। অসীম জলরাশির প্রান্তের ওই অনতিস্পষ্ট বনরেখার মতই দূরের—অনেক দূরের।

অপুদের ডিঙিখানা দক্ষিণতীর ঘেঁষিয়া যাইতেছিল, নৌকার তলায় ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ঢেউ লাগিতেছিল, কোথাও একটা উঁচু ডাঙা, কোথাও পাড় ধসিয়া নদীগর্ভে পড়িয়া যাওয়ায় কাশঝোপের শিকড়গুলো বাহির হইয়া ঝুলিতেছে। একটা জায়গায় আসিয়া অপুর হঠাৎ মনে হইল, জায়গাটা সে চিনিতে পারিয়াছে—একটা ছোট খাল, ডাঙার উপরে একটা হিজল গাছ। এই খালটিতেই অনেকদিন আগে অপর্ণাকে কলিকাতা হইতে আনিবার সময় সে বলিয়াছিল—ও কলা-বৌ, ঘোমটা খোল, বাপের বাড়ির দ্যাশটা চেয়েই দ্যাখো—

তারপর স্টীমার চড়িয়া খুলনা, বাঁ দিকে সে একবার চাহিয়া দেখিয়া লইল। ওই যে ছোট্ট খড়ের ঘরটি—প্রথম যেখানে সে ও অপর্ণা সংসার পাতে।

সেদিনকার সে অপূর্ব আনন্দমুহূর্তটিতে সে কি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল যে এমন একদিন আসিবে, যেদিন শূন্যদৃষ্টিতে খড়ের ঘরখানার দিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সমস্ত ঘটনাটা মনে হইবে মিথ্যা স্বপ্ন?

নির্নিমেষ, উৎসুক, অবাক চোখে সেদিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে অপুর কেমন এক দুর্দমনীয় ইচ্ছা হইতে লাগিল একবার ঘরখানার মধ্যে যাইতে, সব দেখিতে। হয়তো অপর্ণার হাতের উনুনের মাটির ঝিঁকটা এখনও আছে—আর যেখানে বসিয়া সে অপর্ণার হাতের জলখাবার খাইয়াছিল। প্রথম যেখানটিতে অপর্ণা ট্রাঙ্ক হইতে আয়না চিরুনি বাহির করিয়া তাহার জন্য রাখিয়া দিয়াছিল···

ট্রেনে উঠিয়া জানালার ধারে বসিয়া থাকে। স্টেশনের পর স্টেশন আসে ও চলিয়া যায়, অপু শুধুই ভাবে বড়দলের তীর, চাঁদাকাঁটার বন, ভাঁটার জল কল্‌কল্ করিয়া নামিয়া যাইতেছে,···একটি অসহায় ক্ষুদ্র শিশুর অবোধ হাসি—অন্ধকার রাত্রে বিকীর্ণ জলরাশির ওপারে কোথায় দাঁড়াইয়া অপর্ণা যেন সেই মনসাপোতার বাড়ির পুরোতন দিনগুলির মত দুষ্টুমিভরা চোখে হাসিমুখে বলিতেছে—আর কক্ষনো যাবো না তোমার সঙ্গে। আর কক্ষনো না দেখে নিও।

ফাল্গুন মাস। কলিকাতায় সুন্দর দক্ষিণ হাওয়া বহিতেছে, সকালে একটু শীতও, বোর্ডিংয়ের বারান্দাতে অপু বিছানা পাতিয়া শুইয়া ছিল। খুব ভোরে ঘুম ভাঙিয়া বিছানায় শুইয়া শুইয়াই তাহার মনে হইল, আজ আর স্কুল নাই, টিউশনি নাই—আর বেলা দশটায় নাকে-মুখে গুঁজিয়া কোথাও ছুটিতে হইবে না—আজ সমস্ত সময়টা তাহার নিজের, তাহা লইয়া সে যাহা খুশি করিতে পারে—আজ সে মুক্ত!···মুক্ত···!···মুক্ত! —আর কাহাকেও গ্রাহ্য করে না সে! কথাটা ভাবিতেই সারা দেহ অপূর্ব উল্লাসে শিহরিয়া উঠিল

—বাঁধন-ছেঁড়া মুক্তির উল্লাস ! বহুকাল পর স্বাধীনতার আস্বাদন আজ পাওয়া গেল। ঐ আকাশের ক্রমবিলীয়মান নক্ষত্রটার মতই আজ সে দূরে পথের পথিক—অজানার উদ্দেশ্যে সে যাত্রার আরম্ভ হয়ত আজই হয়, কি কালই হয় !

পুলকিত মনে বিছানা হইতে উঠিয়া নাপিত ডাকাইয়া কামাইল, ফর্সা কাপড় পড়িল। পুরাতন শৌখিনতা আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠার দরুন দরজির দোকানে একটা মটকার পাঞ্জাবি তৈয়ারি করিতে দিয়াছিল, সেটা নিজে গিয়া লইয়া আসিল। ভাবিল—একবার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখে আসি নতুন বই কি এসেছে, আবার কতদিনে কলিকাতায় ফিরি, কে জানে ? বৈকালে মিউজিয়মে রকফেলার ট্রাস্টের পক্ষ হইতে মশক ও ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে বক্তৃতা ছিল। অপুও গেল। বক্তৃতাটি সচিত্র। একটি ছবি দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। মশকের জীবনেতিহাসের প্রথম পর্যায়ে সেটা থাকে কীট—তারপর হঠাৎ কীটের খোলস ছাড়িয়া সেটা পাখা গজাইয়া উড়িয়া যায়। ঠিক যে সময়ে কীটদেহটা অসাড়, প্রাণহীন অবস্থায় জলের তলায় ডুবিয়া যাইতেছে—নব-কলেবরধারী মশকটা পাখা ছাড়িয়া জল হইতে শূন্যে উড়িয়া গেল।

মানুষেরও তো এমন হইতে পারে ! জলের তলায় সন্তরণকারী অন্যান্য মশক কীটের চোখে তাদের সঙ্গী তো মরিয়াই গেল—তাদের চোখের সামনে দেহটা তলাইয়া যাইতেছে। কিন্তু জলের উর্ধ্বে যে জগতে মশক নবজন্ম লাভ করিল, এরা তো তার কোনও খবরই রাখে না, সে জগতে প্রবেশের অধিকার তখনও তারা তো অর্জন করে নাই—মৃত্যু দ্বারা, অন্ততঃ তাদের চোখে যা মৃত্যু তার দ্বারা। এই মশক নিম্নস্তরের জীব, তার পক্ষে যা বৈজ্ঞানিক সত্য, মানুষের পক্ষে তা কি মিথ্যা ?

কথাটা সে ভাবিতে ভাবিতে ফিরিল।

যাইবার আগে একবার পরিচিত বন্ধুদের সহিত দেখা করিতে বাহির হইয়া পরদিন সকালে সে সেই কবিরাজ বন্ধুটির দোকানে গেল। দোকানে তাহার দেখা পাওয়া গেল না, উড়িয়া ছোকরা-চাকরকে দিয়া খবর পাঠাইয়া পরে সে বাসার মধ্যে ঢুকিল।

সেই খোলার-বাড়ি—সেই বাড়িটাই আছে। সংকীর্ণ উঠানের একপাশে দুখানা বেলে-পাথরের শিল পাতা। বন্ধুটি নোড়া দিয়া কি পিষিতেছে, পাশে বড় একখানা খবরের কাগজের উপর একরাশ ধূসর রংয়ের গুঁড়া। সারা উঠান জুড়িয়া কুলায়-ডালায় নানা শিকড়-বাকড় রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া হইয়াছে।

বন্ধু হাসিয়া বলিল, এসো এসো, তারপর এতদিন কোথায় ছিলে ? কিছু মনে করো না ভাই, খারাপ হাত, মাজন তৈরি করছি—এই দ্যাখ না ছাপানো লেবেল—চন্দ্রমুখী মাজন, মহিলা হোম ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিন্ডিকেট—আজকাল মেয়েদের নাম না দিলে পাবলিকের সিমপ্যাথি পাওয়া যায় না, তাই ঐ নাম দিয়েছি। ব'স ব'স—ওগো, বার হয়ে এসো না। অপূর্ব এসেছে, একটু চা-টা করো।

অপু হাসিয়া বলিল, সিন্ডিকেটের সভ্য তো দেখছি আপাতত মোটে দুজন, তুমি আর তোমার স্ত্রী এবং খুব যে য়্যাকটিভ সভ্য তাও বুঝছি।

হাসিমুখে বন্ধু-পত্নী ঘর হইতে বাহিরে আসিলেন, তাঁহার অবস্থা দেখিয়া অপুর মনে হইল, অন্য শিলখানাতে তিনিও কিছু পূর্বে মাজন-পেষা-কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাহার আসিবার সংবাদ পাইয়াই শিল ছাড়িয়া ঘরের মধ্যে পলাইয়াছিলেন। হাত-মুখের গুঁড়া ধুইয়া ফেলিয়া সভ্য-ভব্য হইয়া বাহির হইলেও মাথার এলোমেলো উড়ন্ত চুলে কপালের পাশের ঘামে সে কথা জানাইয়া দেয়।

বন্ধু বলিল—কি করি বল ভাই, দিনকাল যা পড়েছে, পাওনাদারের কাছে দুবেলা

অপমান হচ্ছি, ছোট আদালতে নালিশ ক'রে দোকানের ক্যাশবাক্স সীল ক'রে রেখেছে। দিন একটা টাকা খরচ –বাসায় কোন দিন খাওয়া হয়, কোন দিন—

বন্ধু-পত্নী বাধা দিয়া বলিলেন, তুমি ও-কাঁদুনি গেয়ো অন্য সময়। এখন উনি এলেন এতদিন পর, একটু চা খাবেন, ঠাণ্ডা হবেন, তা না তোমার কাঁদুনি শুরু হ'ল।

—আহা, আমি কি পথের লোককে ধরে বলতে যাই ? ও আমার ক্লাসফ্রেণ্ড, ওদের কাছে দুঃখের কথাটা বললেও—ইয়ে, পাতো চায়ের প্যাকেট একটা খুলে নাও না ? আটা আছে নাকি ? আর দ্যাখ, না হয় ওকে খান-চারেক রুটি অন্তত—

—আচ্ছা, সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। পরে অপুর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—আপনি সেই বিজয়া দশমীর পর আর একদিনও এলেন না যে বড় ?

চা ও পরোটা খাইতে খাইতে অপু নিজের কথা সব বলিল শীঘ্রই বাহিরে যাইতেছে, সে কথাটাও বলিল। বন্ধু বলিল, তবেই দ্যাখো ভাই, তবু তুমি একা আর আমি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এই কলকাতা শহরের মধ্যে আজ পাঁচ-পাঁচটি বছর যে কি ক'রে দিন কাটাচ্ছি তা আর···এই সব নিয়ে একরকম চালাই, পয়সা-প্যাকেট চা আছে, খদিরাদি মোদক আছে। মাজনের লাভ মন্দ না, কিন্তু, কি জান, এই কৌটোটা পড়ে যায় দেড়-পয়সার ওপর, মাজনে, লেবেলে, ক্যাপসুলে তাও প্রায় দু'পয়সা—তোমার কাছে আর লুকিয়ে কি করব, স্বামী-স্ত্রীতে খাটি কিন্তু মজুরী পোষায় কই ? তবুও তো দোকানীর কমিশন ধরি নি হিসেবের মধ্যে। এদিকে চার পয়সার বেশী দাম করলে কম্পিট করতে পারব না।

খানিক পরে বন্ধু বলিল—ওহে তোমার বৌঠাকরুণ বলছেন, আমাদের তো একটা খাওয়া পাওনা আছে, এবার সেটা হয়ে যাক্ না কেন ?—বেশ একটা ফেয়ারওয়েল ফিস্ট হয়ে যাবে এখন, তবে উলটো, এই যা—

অপু মনে মনে ভারী কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিল বন্ধু-পত্নীর প্রতি। ইহাদের মলিন বেশ ও ছেলেমেয়েগুলির জীর্ণ চেহারা হইতে ইহাদের ইতিহাস সে ভালই বুঝিয়াছিল। কিছু ভালো খাবার আনাইয়া খাওয়ানো, একটু আমোদ আহ্লাদ করা—কিন্তু হয়ত সেটা দরিদ্র সংসারে সাহায্যের মত দেখাইবে। যদি ইহারা না লয় বা মনে কিছু ভাবে ?—ও-পক্ষ হইতে প্রস্তাবটা আসিতে সে ভারী খুশী হইল।

ভোজের আয়োজনে ছ-সাত টাকা ব্যয় করিয়া অপু বন্ধুর সঙ্গে ঘুরিয়া বাজার করিল। কই মাছ, গলদা-চিংড়ি, ডিম, আলু, ছানা, দই, সন্দেশ।

হয়তো খুব বড় ধরণের কিছু ভোজ নয়, কিন্তু বন্ধু-পত্নীর আদরে হাসিমুখে তাহা এত মধুর হইয়া উঠিল ! এমন কি এক সময়ে অপুর মনে হইল আসলে তাহাকে খাওয়ানোর জন্যই বন্ধু-পত্নীর এ ছল। লোকে ইষ্টদেবতাকেও এত যত্ন করে না বোধ হয়। পিছনে সব সময় বন্ধুর বৌটি পাখা হাতে বসিয়া তাহাদের বাতাস করিতেছিলেন, অপু হাত উঠাইতেই হাসিমুখে বলিলেন—ও হবে না, আপনি আর একটু ছানার ডালনা নিন—ও কি, মোচার চপ পাতে রাখলেন কার জন্যে ? সে শুনব না

এই সময় একটি পনেরো-ষোল বছরের ছেলে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। বন্ধু বলিল—এসো, এসো কুঞ্জ, এসো বাবা, এইটি আমার শালীর ছেলে, বাগবাজারে থাকে। আমার সে ভায়রা-ভাই মারা গেছে গত শ্রাবণ মাসে। পাটের প্রেসে কাজ করত, গঙ্গার ঘাটে রেললাইন পেরিয়ে আসতে হয়। তা রোজই আসে, সেদিন একখানা মালগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তা ভাবলে, আবার অতখানি ঘুরে যাব ? যেমন গাড়ির তলা দিয়ে গলে আসতে গিয়েছে আর অমনি গাড়িখানা দিয়েছে ছেড়ে। তারপর চাকায় কেটে-কুটে একেবারে আর কি—দু'টি মেয়ে, আমার শালী আর এই ছেলেটি, একরকম ক'রে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্যে চলছে।

উপায় কি ? ··তাই আজ ভাল খাওয়াটা আছে, কাল স্ত্রী বললে, যাও কুণ্ডুকে বলে এসো—ওরে বসে যা বাবা, থালা না থাকে পাতা একখানা পেতে। হাত-মুখটা ধুয়ে আয় বাবা—এত দেরি ক'রে ফেললি কেন ?

বেলা বেশী ছিল না। খাওয়া-দাওয়ার পর গল্প করিতে করিতে অনেক রাত হইয়া গেল। অপু বলিল, আচ্ছা, আজ উঠি ভাই, বেশ আনন্দ হ'ল আজ অনেকদিন পরে—

বন্ধু বলিল, ওগো, অপূর্বকে আলোটা ধরে গলির মুখটা পার ক'রে দাও তো ? আমি আর উঠতে পারি নে—

একটা ছোট্ট কেরোসিনের টেমি হাতে বৌটি অপুর পিছনে পিছনে চলিল।

অপু বলিল, থাক, বৌঠাকরুণ, আর এগোবেন না, এমন আর কি অন্ধকার, যান আপনি—

—আবার কবে আসবেন ?

· ঠিক নেই, এখন একটা লম্বা পাড়ি তো দি—

—কেন, একটা বিয়ে-থা করুন না ? পথে পথে সন্ন্যাসী হয়ে এ রকম বেড়ানো কি ভাল ? মাও তো নেই শুনেছি। কবে যাবেন আপনি ?·· যাবার আগে একবার আসবেন না, যদি পারেন।

—তা হয়ে উঠবে না বৌঠাকরুণ। ফিরি যদি আবার তখন বরং—আচ্ছা নমস্কার।

বৌটি টেমি হাতে গলির মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

পরদিন সে সকালে উঠিয়া ভাবিয়া দেখিল, হাতের পয়সা নানারকমে উড়িয়া যাইতেছে, আর কিছুদিন দেরি করিলে যাওয়াই হইবে না। এখানেই আবার চাকরির উমেদার হইয়া দোরে দোরে ঘুরিতে হইবে। কিন্তু আকাশপাতাল ভাবিয়াও কিছু ঠিক হইল না। একবার মনে হয় এটা ভাল, আবার মনে হয় ওটা ভাল। অবশেষে স্থির করিল স্টেশনে গিয়া সম্মুখে যাহা পাওয়া যাইবে, তাহাতেই উঠা যাইবে। জিনিস-পত্র বাঁধিয়া গুছাইয়া হাওড়া স্টেশনে গিয়া দেখিল, আর মিনিট পনেরো পরে চার নম্বর প্ল্যাটফর্ম হইতে গয়া প্যাসেঞ্জার ছাড়িতেছে। একখানা থার্ড ক্লাসের টিকিট কিনিয়া সোজা ট্রেনে উঠিয়া জানালার ধারের একটা জায়গায় সে নিজের বিছানাটি পাতিয়া বসিল।

অপু কি জানিত এই যাত্রা তাহাকে কোন্ পথে চালিত করিয়া লইয়া চলিয়াছে ? এই চারটা বিশ মিনিটের গয়া প্যাসেঞ্জার ? পরবর্তী জীবনে সে কতবার ভাবিয়াছে যে সে তো পাঁজি দেখিয়া যাত্রা শুরু করে নাই, কিন্তু কোন মহাশুভ মাহেন্দ্রক্ষণে সে হাওড়া স্টেশনে থার্ড ক্লাস টিকিট ঘরের ঘুলঘুলিতে ফিরিঙ্গি মেয়ের কাছে গিয়া একখানা টিকিট চাহিয়াছিল—দশ টাকার একখানা নোট দিয়া সাড়ে পাঁচ টাকা ফেরত পাইয়াছিল। মানুষ যদি তাহার ভবিষ্যৎ জানিতে পারিত !

অপু বর্তমানে এসব কিছুই ভাবিতেছিল না। এত বয়স হইল, কখনও সে গ্র্যান্ডকর্ড লাইনে বেড়ায় নাই, সেই ছেলেবেলায় দুটি বার ছাড়া ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলেও আর কখনও চড়ে নাই, রেলে চড়িয়া দূরদেশে যাওয়ার আনন্দে সে ছেলেমানুষের মতই উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল।

রাস্তার ধারে গাছপালা ক্রমশঃ কিরূপ বদলাইয়া যায়, লক্ষ্য করিবার ইচ্ছা অনেকদিন হইতে তাহার আছে, বর্ধমান পর্যন্ত দেখিতে দেখিতে গেল, কিন্তু তাহার পরই অন্ধকারে আর দেখা গেল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

পরদিন বৈকালে গয়ায় নামিয়া সে বিষ্ণুপাদমন্দিরে পিণ্ড দিল। ভাবিল, আমি এসব মানি বা না মানি, কিন্তু সবটুকু তো জানি নে? যদি কিছু থাকে, বাপমায়ের উপকারে লাগে! পিণ্ড দিবার সময়ে ভাবিয়া ভাবিয়া ছেলেবেলায় বা পরে যে যেখানে মারা গিয়াছে বলিয়া জানা ছিল, তাহাদের সকলেরই উদ্দেশে পিণ্ড দিল। এমন কি, পিসিমা ইন্দির ঠাকরুণকে সে মনে করিতে না পারিলেও দিদির মুখে শুনিয়াছে,—তাঁর উদ্দেশে—আতুরী ডাইনী বুড়ীর উদ্দেশেও।

বৈকালে বুদ্ধগয়া দেখিতে গেল। অপুর যদি কাহারও উপর শ্রদ্ধা থাকে তবে তাহার আবাল্য শ্রদ্ধা এই সত্যদ্রষ্টা মহাসন্ন্যাসীর উপর। ছেলের নাম তাই সে রাখিয়াছে অমিতাভ।

বামে ক্ষীণস্রোতা ফল্গু কটা রঙের বালুশয্যায় ক্লান্ত দেহ এলাইয়া দিয়াছে, ওপারে হাজারিবাগ জেলার সীমান্তবর্তী পাহাড়শ্রেণী, সারাপথে ভারী সুন্দর ছায়া, গাছপালা, পাখির ডাক, ঠিক যেন বাংলাদেশ। সোজা বাঁধানো রাস্তাটি ফল্গুর ধারে ধারে ডালপালার ছায়ায় ছায়ায় চলিয়াছে, সারাপথ অপু স্বপ্নাভিভূতের মত একার উপর বসিয়া রহিল। একজন হালফ্যাশানের কাপড়-পরা তরুণী মহিলা ও সম্ভবত তাঁহার স্বামী মোটরে বুদ্ধগয়া হইতে ফিরিতেছেন, অপু ভাবিল হাজার হাজার বছর পরেও এ কোন্ নূতন যুগের ছেলেমেয়ে—প্রাচীনকালের সেই পীঠস্থানটি এমন সাগ্রহে দেখিতে আসিয়াছিল? মনে পড়ে সেই অপূর্ব রাত্রি, নবজাত শিশুর চাঁদমুখ··· ছন্দক···গয়ার জঙ্গলে দিনের পর দিন সে কি কঠোর তপস্যা। কিন্তু এ মোটর গাড়ি? শতাব্দীর ঘন অরণ্য পার হইয়া এমন একদিন নামিয়াছে পৃথিবীতে, পুরাতনের সবই চূর্ণ করিয়া, উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া নবযুগের পত্তন করিয়াছে। রাজা শুদ্ধোধনের কপিলাবস্তুও মহাকালের স্রোতের মুখে ফেনার ফুলের মত কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, কোন চিহ্নও রাখিয়া যায় নাই—কিন্তু তাঁহার দিগ্বিজয়ী পুত্র দিকে দিকে যে বৃহত্তর কপিলাবস্তুর অদৃশ্য সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন--তাঁহার প্রভুত্বের নিকট এই আড়াই হাজার বৎসর পরেও কে না মাথা নত করিবে?

গয়া হইতে পরদিন সে দিল্লী এক্সপ্রেসে চাপিল—একেবারে দিল্লীর টিকিট কাটিয়া। পাশের বেঞ্চিতেই একজন বাঙালী ভদ্রলোক ও তাঁহার স্ত্রী যাইতেছিলেন! কথায় কথায় ভদ্রলোকটির সঙ্গে আলাপ হইয়া গেল। গাড়িতে আর কোন বাঙালী নাই, কথাবার্তার সঙ্গী পাইয়া তিনি খুব খুশী। অপুর কিন্তু বেশী কথাবার্তা ভাল লাগিতেছিল না। এরা এ-সময় এত বক-বক করে কেন? মারোয়াড়ী দুটি তো সাসারাম হইতে নিজেদের মধ্যে বকুনি শুরু করিয়াছে, মুখের আর বিরাম নাই।

খুশীভরা, উৎসুক, ব্যগ্র মনে সে প্রত্যেক পাথরের নুড়িটি, গাছপালাটি লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছিল। বামদিকের পাহাড়শ্রেণীর পিছনে সূর্য্য অস্ত গেল, সারা পশ্চিম আকাশটা লাল হইয়া আছে, আনন্দের আবেগে সে দ্রুতগামী গাড়ির দরজা খুলিয়া দরজার হাতল ধরিয়া দাঁড়াইতেই ভদ্রলোকটি বলিয়া উঠিলেন, উঁহু, পড়ে যাবেন, পাদানিতে স্লিপ করলেই—বন্ধ করুন মশাই।

অপু হাসিয়া বলিল, বেশ লাগে কিন্তু, মনে হয় যেন উড়ে যাচ্ছি।

গাছপালা, খাল, নদী, পাহাড়, কাঁকর-ভরা জমি, গোটা শাহাবাদ জেলাটা তাহার পায়ের তলা দিয়া পলাইতেছে। অনেক দূর পর্য্যন্ত শোণ নদের বালুর চড়া জ্যোৎস্নায় অদ্ভুত দেখাইতেছে। নীল নদ? ঠিক এটা যেন নীল নদ। ওপারে সাত-আট মাইল গাধার পিঠে চড়িয়া গেলে ফ্যারাও রামেসিসের তৈরী আবু সিম্বেলের বিরাট পাষাণ মন্দির—ধূসর অস্পষ্ট

কুয়াসায় ঘেরা মরুভূমির মধ্যে অতীতকালের বিস্মৃত দেবদেবীর মন্দির, এপিস, আইসিস, হোরাস, হাথর, রা—নীল নদ যেমন গতির মুখে উপলখণ্ড পাশে ঠেলিয়া রাখিয়া পলাইয়া চলে—মহাকালের বিরাট রথচক্র তাণ্ডব-নৃত্যছন্দে সব স্থাবর অস্থাবর জিনিসকে পিছু ফেলিয়া মহাবেগে চলিবার সময় এই বিরাট গ্রানাইট মন্দিরকে পথের পাশে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে, জনহীন মরুভূমির মধ্যে বিস্মৃত সভ্যতার চিহ্ন—মন্দিরটা, কোন বিস্মৃত ও বাতিল দেবদেবীর উদ্দেশ্যে গঠিত ও উৎসর্গীকৃত।

একটু রাত্রে ভদ্রলোকটি বলিলেন, এ লাইনে ভাল খাবার পাবেন না, আমার সঙ্গে খাবার আছে, আসুন খাওয়া যাক।

তাঁহার স্ত্রী কলার পাতা চিরিয়া সকলকে বেঞ্চির উপর পাতিয়া দিলেন—লুচি, হালুয়া ও সন্দেশ—সকলকে পরিবেশন করিলেন। ভদ্রলোকটি বলিলেন, আপনি খানকতক বেশী লুচি নিন, আমরা তো আজ মোগলসরাইয়ে ব্রেকজার্নি করব, আপনি তো সোজা দিল্লী চলেছেন।

এ-ও অপুর এক অভিজ্ঞতা। পথে বাহির হইলে এত শীঘ্রও এমন ঘনিষ্ঠতা হয়! এক গলির মধ্যে শহরে শত বর্ষ বাস করিলেও তো তাহা হয় না? ভদ্রলোকটি নিজের পরিচয় দিলেন নাগপুরের কাছে কোন গবর্নমেন্ট রিজার্ভ ফরেস্ট-এ কাজ করেন, ছুটি লইয়া কালীঘাটে শ্বশুরবাড়ি আসিয়াছিলেন, ছুটি অন্তে কর্মস্থানে চলিয়াছেন। অপুকে ঠিকানা দিলেন। বার বার অনুরোধ করিলেন, সে যেন দিল্লী হইতে ফিরিবার পথে একবার অতি অবশ্য অবশ্য যায়, বাঙালীর মুখ মোটে দেখিতে পান না—অপু গেলে তাঁহারা তো কথা কহিয়া বাঁচেন। মোগলসরাই-এ গাড়ি দাঁড়াইল। অপু মালপত্র নামাইতে সাহায্য করিল। হাসিয়া বলিল—আচ্ছা বৌঠাকরুণ, নমস্কার, শীগ্‌গিরই আপনাদের ওখানে উপদ্রব করছি কিন্তু।

দিল্লীতে ট্রেন পৌঁছাইল রাত্রি সাড়ে এগারোটায়।

গাজিয়াবাদ স্টেশন হইতেই সে বাহিরের দিকে ঝুঁকিয়া চাহিয়া দেখিল—যে-দিল্লীতে গাড়ি আসিতেছিল তাহা এস. কপুর কোম্পানীর দিল্লী নয়, লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লীর মেম্বারদের দিল্লী নয়, এসিয়াটিক পেট্রোলিয়মের এজেন্টের দিল্লী নয়—সে দিল্লী সম্পূর্ণ ভিন্ন—বহুকালের বহুযুগের নরনারীদের—মহাভারত হইতে শুরু করিয়া রাজসিংহ ও মাধবীকঙ্কণ,—সমুদয় কবিতা, উপন্যাস, গল্প, নাটক, কল্পনা ও ইতিহাসের মাল-মশলায় তাহার প্রতি ইটখানা তৈরি, তার প্রতি ধূলিকণা অপুর মনের রোমান্সে সকল নায়ক-নায়িকার পুণ্য-পাদপূত—ভীষ্ম হইতে আওরঙ্গজেব ও সদাশিব রাও পর্যন্ত গান্ধারী হইতে জাহানারা পর্যন্ত—সাধারণ দিল্লী হইতে সে দিল্লীর দূরত্ব অনেক!—দিল্লী হনোজ দূর অস্ত্, বহুদূরে বহুশতাব্দীর দূর পারে, সে দিল্লী কখনও কেহ দেখে নাই।

আজ নয়, মনে হয় শৈশবে মায়ের মুখে মহাভারত শোনার দিন হইতে ছিরের পুকুরের ধারের বাঁশবনের ছায়ায় কাঁচা শেওড়ার ডাল পাতিয়া 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা' ও 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' পড়িবার দিনগুলি হইতে, সকল ইতিহাস, যাত্রা, থিয়েটার, কত গল্প, কত কবিতা, এই দিল্লী, আগ্রা, সমগ্র রাজপুতানা ও আর্যাবর্ত—তাহার মনে একটি অতি অপরূপ, অভিনব, স্বপ্নময় আসন অধিকার করিয়া আছে—অন্য কাহারও মনে সে রকম আছে কিনা, সেটা প্রশ্ন নয়, তাহার মনে আছে এইটাই বড় কথা।

কিন্তু বাহিরে ঘন অন্ধকার, কিছু দেখা যায় না—অনেকক্ষণ চাহিয়া কেবল কতকগুলো সিগন্যালের বাতি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না, একটা প্রকাণ্ড ইয়ার্ড কেবিন, লেখা

আছে, 'দিল্লী জংশন ইস্ট'—একটা গ্যাসোলিনের ট্যাঙ্ক—তাহার পরই চারদিকে আলোকিত প্ল্যাটফর্ম—প্রকাণ্ড দোতলা স্টেশন – সেই পিয়ার্স সোপ, কিটিংস পাউডার, হল্‌স্ ডিসটেম্পার, লিপটনের চা। আবদুল আজিজ হাকিমের রোশনেসেকাৎ, উৎকৃষ্ট দাদের মলম।

নিজের ছোট ক্যান্‌ভাসের সুটকেস ও ছোট বিছানাটা হাতে লইয়া অপু স্টেশনে নামিল —রাত অনেক, শহর সম্পূর্ণ অপরিচিত, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, ওয়েটিংরুম দোতলায়, রাত্রি সেখানে কাটানোই নিরাপদ মনে হইল।

সকালে উঠিয়া জিনিসপত্র স্টেশনে জমা দিয়া সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। অর্ধমাইল-ব্যাপী দীর্ঘ শোভাযাত্রা করিয়া সুসজ্জিত হস্তীপৃষ্ঠে সোনার হাওদায় কোন শাহাজাদী নগর ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন কি? দুধারে আবেদনকারী ও ওমরাহের দল আভূমি তসলীম করিয়া অনুগ্রহ ভিক্ষার অপেক্ষায় করজোড়ে খাড়া আছে কি? নব আগন্তুক নরেন্দ্রনাথ পাৎশা বেগমের কোন্‌ সরাইখানায় ধূমপানরত বৃদ্ধ পারশ্যদেশীয় শেখের নিকট পথের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল?

কিন্তু এ যে একেবারে কলিকাতার মতই সব! এমন কি মণিলাল জুয়েলার্সের বিজ্ঞাপন পর্যন্ত। দুজন লোক কলিকাতা হইতে বেড়াতে আসিয়াছিল, টাঙাভাড়া সস্তা পড়িবে বলিয়া তাহাকে তাহারা সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিল। কুতুবের পথে একজন বলিল, মশাই, আরও বার-দুই দিল্লী এসেছি, কুতুবের মুরগীর কাটলেট খান নি কখনও, না? আঃ—সে যা জিনিস, চলুন, এক ডজন কাটলেট অর্ডার দিয়ে তবে উঠব কুতুবমিনারে।

বাল্যকালে দেওয়ানপুরে পড়িবার সময় পুরানো দিল্লীর কথা পড়িয়া তাহার কল্পনা করিতে গিয়া বার বার স্কুলের পাশের একটা পুরাতন ইটখোলার ছবি অপুর মনে উদয় হইত, আজ অপু দেখিল পুরাতন দিল্লী বাল্যের সে ইঁটের পাঁজাটা নয়। কুতুবমিনার নতুন দিল্লী শহর হইতে যে এতদূরে তাহা সে ভাবে নাই। তদুপরি সে দেখিয়া বিস্মিত হইল, এই দীর্ঘ পথের দুধারে মরুভূমির মত অনুর্বর কাঁটাগাছ ও ফণিমনসার ঝোপে ভরা রৌদ্র-দগ্ধ প্রান্তরের এখানে ওখানে সর্বত্র ভাঙা বাড়ি, মিনার, মসজিদ, কবর, খিলান, দেওয়াল। সাতটা প্রাচীন মৃত রাজধানীর মূক কঙ্কাল পথের দুধারে উঁচুনিচু জমিতে বাবলাগাছ ও ও ক্যাক্‌টাস গাছের ঝোপ-ঝাপের আড়ালে হৃতগৌরব নিস্তব্ধতায় আত্মগোপন করিয়া আছে —পৃথ্বীরায় পিথোরার দিল্লী, লালকোট, দাসবংশের দিল্লী, তোগলকদের দিল্লী, আলাউদ্দীন খিলজীর দিল্লী, শিরি ও জাহানপনাহ্‌, মোগলদের দিল্লী। অপু জীবনে এ রকম দৃশ্য দেখে নাই, কখনো কল্পনাও করে নাই, সে অবাক হইল, অভিভূত হইল, নীরব হইয়া গেল, গাইড-বুক উল্টাইতে ভুলিয়া গেল, ম্যাপের নম্বর মিলাইয়া দেখিতে ভুলিয়া গেল—মহাকালের এই বিরাট শোভাযাত্রা একটার পর একটা বায়োস্কোপের ছবির মত চলিয়া যাইবার দৃশ্যে সে যেন সম্বিৎহারা হইয়া পড়িল। আরও বিশেষ হইল এই জন্য যে, মন তাহার নবীন আছে। কখনও কিছু দেখে নাই, চিরকাল আঁস্তাকুড়ের আবর্জনায় কাটাইয়াছে অথচ মন হইয়া উঠিয়াছে সর্বগ্রাসী, বুভুক্ষু। তাই সে যাহা দেখিতেছিল, তাহা যেন বাহিরের চোখটা দিয়া নয়, সে কোন্‌ তীক্ষ্নদর্শী তৃতীয় নেত্র, যেটা না খুলিলে বাহিরের চোখের দেখাটা নিষ্ফল হইয়া যায়।

ঘুরিতে ঘুরিতে দুপুরের পর সে গেল কুতব হইতে অনেক দূরে গিয়াসুদ্দীন তোগলকের অসমাপ্ত নগর—তোগলকাবাদে। গ্রীষ্ম দুপুরের খররৌদ্রে তখন চারিধারের ঊষরভূমি আগুন-রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। দূর হইতে তোগলকাবাদ্‌ দেখিয়া মনে হইল যেন কোন দৈত্যের হাতে গাঁথা এক বিরাট পাষাণ-দুর্গ। তৃণ-বিরল ঊষরভূমি, পত্রহীন বাবলা ও কণ্টক-ময় ক্যাক্‌টাসের পটভূমিতে খররৌদ্রে সে যেন এক বর্বর অসুরবীর্য সু-উচ্চ পাষাণ দুর্গপ্রাচীর

হইতে সিন্ধু, কাথিয়াবাড়, মালব, পাঞ্জাব,—সারা আর্য্যাবর্ত্তকে ভ্রূকুটি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের প্রচেষ্টা নাই বটে, নিষ্ঠুর বটে, রক্ষ বটে, কিন্তু সবটা মিলিয়া এমন বিশালতার সৌন্দর্য্য, পৌরুষের সৌন্দর্য্য, বর্ব্বরতার সৌন্দর্য্য —যা মনকে ভীষণভাবে আকৃষ্ট করে, হৃদয়কে বজ্রমুষ্টিতে আঁকড়াইয়া ধরে। সব আছে, কিন্তু দেহে প্রাণ নাই, চারিধারে ধ্বংসস্তূপ, কাঁটাগাছ, বিশৃঙ্খলতা, বড় বড় পাথর গড়াইয়া উঠিবার পথ বুজাইয়া রাখিয়াছে—মৃতমুখের ভ্রূকুটি মাত্র।

সাধু নিজামউদ্দীনের অভিশাপ মনে পড়িল—ইয়ে বাসে গুজর, ইয়ে রাহে গুজর—

পৃথ্বীরায়ের দুর্গের চবুতরার উপর যখন সে দাঁড়াইয়া - হি-হি, কি মুশকিল, কি অদ্ভুতভাবে নিশ্চিন্দিপুরের সেই বনের ধারের ছিরে পুকুরটা এ দুর্গের সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে, বাল্যে তাহারই ধারের শেওড়াবনে বসিয়া 'জীবন-প্রভাত' পড়িতে পড়িতে কতবার কল্পনা করিত, পৃথ্বীরায়ের দুর্গ ছিরে পুকুরের উঁচু ও-দিকের পাড়টার মত বুঝি। এখনও ছবিটা দেখিতে পাইতেছে—কতকগুলি গুগুলি শামুক, ও-পারের বাঁশঝাড়। যাক্, চবুতরার উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে দূরে পশ্চিম আকাশের চারিধারের মহাশ্মশানের উপর ধূসর ছায়া ফেলিয়া সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কাহিনী আকাশের পটে আগুনের অক্ষরে লিখিয়া সূর্য্য অস্ত গেল। সে সব অতি পবিত্র, গোপনীয় মুহূর্ত্ত অপুর জীবনের - দেবতারা তখন কানে কানে কথা বলেন, তাহার জীবনে এরূপ সূর্য্যাস্ত আর কটা বা আসিয়াছে? ভয় ও বিস্ময় দুই-ই হইল, সারা গায়ে যেন কাঁটা দিয়া উঠিল, কি অপূর্ব্ব অনুভূতি! জীবনের চক্রবালনেমি এতদিন যে কত ছোট অপরিসর ছিল, আজকার দিনটির পূর্ব্বে তাহা জানিত না।

নিজামউদ্দীন আউলিয়ার মসজিদ প্রাঙ্গণে সম্রাট-দুহিতা জাহানারার তৃণাবৃত পবিত্র কবরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মসজিদ-দ্বারে ক্রীত দু-চার পয়সার গোলাপফুল ছড়াইতে ছড়াইতে অপুর অশ্রু বাধা মানিল না। ঐশ্বর্য্যের মধ্যে, ক্ষমতার দম্ভের মধ্যে লালিত হইয়াও পুণ্যবতী শাহাজাদীর এ দীনতা, ভাবুকতা, তাহার কল্পনাকে মুগ্ধ রাখিয়াছে চিরদিন। এখনও যেন বিশ্বাস হয় না যে, সে যেখানে দাঁড়াইয়া আছে সেটা সত্যই জাহানারার কবর-ভূমি। পরে সে মসজিদ হইতে একজন প্রৌঢ় মুসলমানকে ডাকিয়া আনিয়া কবরের শিরোদেশের মার্ব্বেল ফলকের সেই বিখ্যাত ফার্সী কবিতাটি দেখাইয়া বলিল, মেহেরবানি করকে পঢ়িয়ে, হাম লিখ লেঙ্গে।

প্রৌঢ়টি কিঞ্চিৎ বকশিশের লোভে খামখেয়ালী বাঙালী বাবুটিকে খুশী করার জন্য জোরে জোরে পড়িল—

বিজুস গ্যাহ্ কসে ন-পোশদ্ মজার ইমা-রা।
কি কবর্‌পোষ্-ই-গরীবান্ হামিন্ গীগ্যাহ্ বস অস্ত্।

পরে সে কবি আমীর খসরুর কবরের উপরও ফুল ছড়াইল।

পরদিন বৈকালে শাহজাহানের লালপাথরের কেল্লা দেখিতে গিয়া অপরাহ্নের ধূসর ছায়ায় দেওয়ান-ই-খাসের পাশের খোলা ছাদে একখানা পাথরের বেঞ্চিতে বহুক্ষণ বসিয়া রহিল। মনে হইল এসব স্থানের জীবনধারার কাহিনী কেহ লিখিতে পারে নাই। গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, কবিতায় যাহা পড়িয়াছে, সে সবটাই কল্পনা, বাস্তবের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। সে জেবউন্নিসা, সে উদিপুরী বেগম, সে মমতাজমহল, সে জাহানারা —আবাল্য যাহাদের সঙ্গে পরিচয়, সবগুলিই কল্পনা-সৃষ্ট প্রাণী, বাস্তবজগতের মমতাজ বেগম, উদিপুরী, জেবউন্নিসা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কে জানে এখানকার সে সব রহস্যভরা ইতিহাস? মূক যমুনা তাহার সাক্ষী আছে, গৃহভিত্তির প্রতি পাষাণখণ্ড

তাহার সাক্ষী আছে, কিন্তু তাহারা তো কথা বলিতে পারে না !

তিনদিন পর সে বৈকালের দিকে কাট্‌নী লাইনের একটা ছোট্ট স্টেশনে নিজের বিছানা ও সুটকেসটা লইয়া নামিয়া পড়িল। হাতে পয়সা বেশী ছিল না বলিয়া প্যাসেঞ্জার ট্রেনে এলাহাবাদ আসিতে বাধ্য হয়—তাই এত দেরি। কয়দিন স্নান নাই, চুল রুক্ষ, উস্ক-খুস্ক—জোর পশ্চিমা বাতাসে ঠোঁট শুকাইয়া গিয়াছে।

ট্রেন ছাড়িয়া চলিয়া গেল। ক্ষুদ্র স্টেশন, সম্মুখে একটা ছোট্ট পাহাড়। দোকান-বাজারও চোখে পড়িল না।

স্টেশনের বাহিরের বাঁধানো চাতালে একটু নির্জন স্থানে সে বিছানার বাণ্ডিলটা খুলিয়া পাতিল। কিছুই ঠিক নাই, কোথায় যাইবে, কোথায় শুইবে, মনে এক অপূর্ব অজানা আনন্দ।

শতরঞ্জির উপর বসিয়া সে খাতা খুলিয়া খানিকটা লিখিল, পরে একটা সিগারেট খাইয়া সুটকেসটা ঠেস দিয়া চুপচাপ বসিয়া রহিল। টোকা মাথায় একজন গোঁড় যুবককে কাঁচা শালপাতার পাইপ খাইতে খাইতে কৌতূহলী-চোখের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া অপু বলিল, উমেরিয়া হিঁয়াসে কেত্তা দূর হোগা ?

প্রথমবার লোকটা কথা বুঝিল না। দ্বিতীয়বারে ভাঙা হিন্দীতে বলিল, তিশ মীল্।

ত্রিশ মাইল রাস্তা ! এখন সে যায় কিসে ? মহা মুশকিল ! জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, ত্রিশ মাইল পথের দুধারে শুধু বন আর পাহাড়। কথাটা শুনিয়া অপুর ভারি আনন্দ হইল। বন, কি রকম বন ? খুব ঘন ? বাঘ পর্যন্ত আছে ? বাঃ—কিন্তু এখন কি করিয়া যাওয়া যায় ?

কথায় কথায় গোঁড় লোকটি বলিল, তিন টাকা পাইলে সে নিজের ঘোড়াটা ভাড়া দিতে রাজী আছে।

অপু রাজী হইয়া ঘোড়া আনিতে বলাতে লোকটা বিস্মিত হইল। আর বেলা কতটুকু আছে, এখন কি জঙ্গলের পথে যাওয়া যায় ? অপু নাছোড়বান্দা। সামনের এই সুন্দর জ্যোৎস্না ভরা রাত্রে জঙ্গলের পথে ঘোড়ায় চাপিয়া যাওয়ার একটা দুর্দমনীয় লোভ তাহাকে পাইয়া বসিল—জীবনে এ সুযোগ কটা আসে, এ কি ছাড়া যায় ?

গোঁড় লোকটি জানাইল, আরও একটাকা খোরাকি পাইলে সে তল্‌পি বহিতে রাজী আছে। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে অপু ঘোড়ায় চড়িয়া রওনা হইল—পিছনে মোট-মাথায় লোকটা।

স্নিগ্ধ রাত্রি—স্টেশন হইতে অল্পদূরে একটা বস্তি, একটি পাহাড়ী নালা, বাঁক ঘুরিয়াই পথটা শাল-বনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। চারিধারে জোনাকি পোকা জ্বলিতেছে—রাত্রির অপূর্ব নিস্তব্ধতা, ত্রয়োদশীর চাঁদের আলো শাল-পলাশের পাতার ফাঁকে ফাঁকে মাটির উপর যেন আলো-আঁধারের বুটি-কাটা জাল বুনিয়া দিয়াছে। অপু পাহাড়ী লোকটার নিকট হইতে একটা শালপাতার পাইপ ও সে-দেশী তামাক চাহিয়া লইয়া ধরাইল বটে, কিন্তু দু'টান দিতেই মাথা কেমন ঘুরিয়া উঠিল—শালপাতার পাইপটা ফেলিয়া দিল।

বন সত্যই ঘন—পথ আঁকা-বাঁকা, ছোট ঝরণা এখানে-ওখানে, উপল-বিছানো পাহাড়ী নদীর তীরে ছোট ফার্নের ঝোপ, কি ফুলের সুবাস, রাত্রিচর পাখির ডাক। নির্জনতা, গভীর নির্জনতা !

মাঝে-মাঝে সে ঘোড়াকে ছুটাইয়া দেয়, ঘোড়া-চড়া অভ্যাস তাহার অনেকদিন হইতে আছে। বাল্যকালে মাঠের ছুটা ঘোড়া ধরিয়া কত চড়িয়াছে, চাঁপদানীতেও ডাক্তারবাবুটির

ঘোড়ায় প্রায় প্রতিদিনই চড়িত।

সারারাত্রি চলিয়া সকাল সাড়ে সাতটায় উমেরিয়া পেঁছিল। একটা ছোট গ্রাম,—পোস্টাফিস, ছোট বাজার ও কয়েকটা গালার আড়ত। ফরেস্ট রেঞ্জার ভদ্রলোকটির নাম অবনীমোহন বসু। তিনি তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন - আসুন, আসুন, আপনি পত্র দিলেন না, কিছু না, ভাবলুম বোধ হয় এখনও আসবার দেরি আছে—এতটা পথ এলেন রাতারাতি ? ভয়ানক লোক তো আপনি !

পথেই একটা ছোট নদীর জলে স্নান করিয়া চুল আঁচড়াইয়া সে ফিট্‌ফাট হইয়া আসিয়াছে। তখনই চা খাবারের বন্দোবস্ত হইল। অপু লোকটিকে নিজের মনিব্যাগ শূন্য করিয়া চার টাকা দিয়া বিদায় দিল।

দুপুরের আহারের সময় অবনীবাবুর স্ত্রী দুজনকে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইলেন। অপু হাসিমুখে বলিল, এখানে আপনাদের জ্বালাতন করতে এলুম বৌঠাকরুণ !

অবনীবাবুর স্ত্রী হাসিয়া বলিলেন, - না এলে দুঃখিত হতাম আমরা কিন্তু জানি আপনি আসবেন। কাল ও'কে বলছিলাম আপনার আসবার কথা, এমন কি আপনার থাকবার জন্যে সাহেবের বাংলোটা ঝাঁট দিয়ে ধুয়ে রাখার কথাও হ'ল—ওটা এখন খালি পড়ে আছে কিনা।

—এখানে আর কোন বাঙালী কি অন্য কোন দেশের শিক্ষিত লোক নিকটে নেই ?

অবনীবাবু বলিলেন, আমার এক বন্ধু খুরিয়ার পাহাড়ে তামার খনির জন্যে প্রসপেকটিং করছেন -মিঃ রায়চৌধুরী, জিওলজিস্ট, বিলেতে ছিলেন অনেকদিন - তিনি ঐখানে তাঁবুতে আছেন—মাঝে মাঝে তিনি আসেন।

অল্প দিনেই ইঁহাদের সঙ্গে কেমন একটা সহজ মধুর সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিল যাহা কেবল এই সব স্থানে, এই সব অবস্থাতেই সম্ভব, কৃত্রিম সামাজিকতার হুমকি এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক বন্ধুত্বের দাবিকে ঘাড় গুঁজিয়া থাকিতে বাধ্য করে না বলিয়াই। একদিন বসিয়া বসিয়া সে খেয়ালের বশে কাগজে একটা কথকতার পালা লিখিয়া ফেলিল। সেদিন সকালে চা খাইবার সময় বলিল, দিদি, আজ ও-বেলা আপনাদের একটা নতুন জিনিস শোনাব।

অবনীবাবুর স্ত্রীকে সে দিদি বলিতে শুরু করিয়াছে। তিনি সাগ্রহে বলিলেন, কি, কি বলুন না ? আপনি গান জানেন —না ? আমি অনেকদিন ও'কে বলেছি আপনি গান জানেন।

—গানও গাইব, কিন্তু একটা কথকতার পালা শোনাব, আমার বাবার মুখে শোনা জড়-ভরতের উপাখ্যান।

দিদির মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি হাসিয়া স্বামীকে কহিলেন, দেখ্‌লে গো - দ্যাখ ! বলি নি আমি, গলার স্বর অমন, নিশ্চয়ই গান জানেন - খাট্‌ল না কথা ?

দুপুরবেলা দিদি তাহাকে তাস খেলার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করিলেন।

—লেখা এখন থাক্‌। তাস জোড়াটা না খেলে খেলে পোকায় কেটে দিলে- এখানে খেলার লোক মেলে না—যখন ও'র বন্ধু মিঃ রায়চৌধুরী আসেন তখন মাঝে-মাঝে খেলা হয়—আসুন আপনি। উনি, আর আপনি—

—আর একজন ?

—আর কোথায় ? আমি আর আপনি বসব—উনি, একা দু'হাত নিয়ে খেলবেন।

জ্যোৎস্না রাত্রে বাংলোর বারান্দাতে সে কথকতা আরম্ভ করিল। জড়ভরতের বাল্য-জীবনের করুণ কাহিনী নিজেরই শৈশব-স্মৃতির ছায়াপাতে, সত্য ও পূত হইয়া উঠে, কাশীর

দশাশ্বমেধ ঘাটে বাবার গলার স্বর কেমন করিয়া অলক্ষিতে তাহার গলায় আসে—শালবনের পত্রমর্ম্মরে, নৈশপাখির গানের মধ্যে রাজর্ষি ভরতের সরল বৈরাগ্য ও নিস্পৃহ আনন্দ যেন প্রতি সুরমূর্চ্ছনাকে একটি অতি পবিত্র মহিমাময় রূপ দিয়া দিল। কথকতা থামিলে সকলেই চুপ করিয়া রহিল। অপু খানিকটা পর হাসিয়া বলিল—কেমন লাগল?

অবনীবাবু একটু ধর্ম্মপ্রাণ লোক, তাঁহার খুবই ভাল লাগিয়াছে—কথকতা দু-একবার শুনিয়াছেন বটে; কিন্তু এ কি জিনিস! ইহার কাছে সে সব লাগে না।

কিন্তু সকলের চেয়ে মুগ্ধ হইলেন অবনীবাবুর স্ত্রী। জ্যোৎস্নার আলোতে তাঁহার চোখে ও কপালে অশ্রু চিক্-চিক্ করিতেছিল। অনেকক্ষণ তিনি কোন কথা বলিলেন না। স্বদেশ হইতে দূরে এই নিঃসন্তান দম্পতির জীবনযাত্রা এখানে একেবারে বৈচিত্র্যহীন, বহুদিন এমন আনন্দ তাঁহাদের কেহ দেয় নাই।

দিন দুই পরে অবনীবাবুর বন্ধু মিঃ রায়চৌধুরী আসিলেন, ভারী মনখোলা ও অমায়িক ধরণের লোক, বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, কানের পাশে চুলে পাক ধরিয়াছে, বলিষ্ঠ গঠন ও সুপুরুষ। একটু অতিরিক্ত মাত্রায় মদ খান। জব্বলপুর হইতে হুইস্কি আনাইয়াছেন কিরূপে কষ্ট স্বীকার করিয়া, খানিকক্ষণ তাহার বর্ণনা করিলেন। অবনীবাবুও যে মদ খান অপু তাহা ইতিপূর্ব্বে জানিত না। মিঃ রায়চৌধুরী অপুকে বলিলেন, আপনার গুণের কথা সব শুনলাম, অপূর্ব্ববাবু। সে আপনাকে দেখেই আমার মনে হয়েছে। আপনার চোখ দেখলে যে কোন লোক আপনাকে ভাবুক বলবে। তবে কি জানেন, আমরা হয়ে পড়েছি ম্যাটার-অব-ফ্যাক্ট। আজ আপনাকে আর একবার কথকতা করতে হবে, ছাড়চি নে আজ।

কথাবার্ত্তায়, গানে, হাসিখুশিতে সেদিন প্রায় সারারাত কাটিল। মিঃ রায়চৌধুরী চলিয়া যাইবার দিন তিনেক পরে একজন চাপরাসী তাঁহার নিকট হইতে অপুর নামে একখানা চিঠি আনিল। তাঁহার ওখানে একটা ড্রিলিং তাঁবুর তত্ত্বাবধানের জন্য একজন লোক দরকার। অপূর্ব্ববাবু কি আসিতে রাজী আছেন? আপাতত মাসে পঞ্চাশ টাকা ও বাসস্থান। অপুর নিকট ইহা একেবারে অপ্রত্যাশিত। ভাবিয়া দেখিল, হাতে আনা দশেক পয়সা মাত্র অবশিষ্ট আছে, উঁহারা অবশ্য যতই আত্মীয়তা দেখান, গান ও কথকতা করিয়া চিরদিন তো এখানে কাটানো চলিবে না? আশ্চর্য্যের বিষয়, এতদিন কথাটা আদৌ তাহার মনে উদয় হয় নাই যে কেন?

মিঃ রায়চৌধুরীর বাংলো প্রায় মাইল-কুড়ি দূরে। তিনদিন পরে ঘোড়া ও লোক আসিল। অবনীবাবু ও তাঁহার স্ত্রী অত্যন্ত দুঃখের সহিত তাহাকে বিদায় দিলেন। পথ অতি দুর্গম, উমেরিয়া হইতে তিন মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে গেলেই ঘন জঙ্গলের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে হয়। দুই-তিনটা ছোট ছোট পাহাড়ী নদী, আবার ছোট ছোট ফার্ন ঝোপ, ঝরণা—একটার জলে অপু মুখ ধুইয়া দেখিল জলে গন্ধকের গন্ধ। পাহাড়িয়া করবী ফুটিয়া আছে, বাতাস নবীন মাদকতায় ভরা, খুব স্নিগ্ধ, এমন কি যেন একটু গা সির্-সির্ করে—এই চৈত্র মাসেও।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া গেল। খনির কার্য্যকারিতা ও লাভালাভের বিষয় এখনও পরীক্ষাধীন, মাত্র খান চার-পাঁচ চওড়া খড়ের ঘর। দুইটা বড় বড় তাঁবু, কুলীদের থাকিবার ঘর, একটা অফিস ঘর। সবসুদ্ধ আট-দশ বিঘা জমির উপর সব। চারিধার ঘেরিয়া ঘন, দুর্গম অরণ্য, পিছনে পাহাড়, আবার পাহাড়।

মিঃ রায়চৌধুরী বলিলেন—খুব সাহস আছে আপনার তা আমি বুঝেছি যখন শুনলাম আপনি রাত্রে ঘোড়ায় চড়ে উমেরিয়া এসেছিলেন। ও পথে রাত্রে এদেশের লোকও যেতে সাহস পায় না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অপুর এক সম্পূর্ণ নতুন জীবন শুরু হইল এ-দিনটি হইতে। এমন এক জীবন, যাহা সে চিরকাল ভালবাসিয়াছে, যাহার স্বপ্ন দেখিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কোনদিন যে হাতের মুঠায় নাগাল পাওয়া যাইবে তাহা ভাবে নাই।

তাহাকে যে ছিল তাঁবুর তত্ত্বাবধানে থাকিতে হইবে, তাহা এখান হইতে আরও সতেরো-আঠারো মাইল দূরে। মিঃ রায়চৌধুরী নিজের একটা ঘোড়া দিয়া তাহাকে পরদিনই কর্ম্মস্থানে পাঠাইয়া দিলেন। নতুন স্থানে আসিয়া অপু অবাক্ হইয়া গেল। বন ভালবাসিলে কি হইবে, এ ধরণের বন কখনও দেখে নাই। নিবিড় বনানীর প্রান্তে উচ্চ তৃণ-ভূমি, তারই মধ্যে খড়ের বাংলোঘর, একটা পাতকুয়া, কুলীদের বাসের খুপড়ি, পিছনে ও দক্ষিণে পাহাড়, সেদিকের ঘন বন কত দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত তাহা চোখে দেখিয়া আন্দাজ করা যায় না—ক্রোশের পর ক্রোশ ধরিয়া পাহাড়, একটার পিছনে আর একটা, আর গভীর জনমানবহীন অরণ্য, সীমা নাই, কুল-কিনারা নাই। চারিদিকের দৃশ্য অতি গম্ভীর। তাঁবুর ঠিক পিছনেই পাহাড় শ্রেণীর একটা স্থান আবার অনাবৃত, বেজায় খাড়া ও উঁচু—বিরাটকায় নগ্ন গ্রানাইট্ চূড়াটা বৈকালের শেষ রোদে কখনও দেখায় রাঙা, কখনও ধূসর, কখনও ঈষৎ তাম্রাভ কালো রংয়ের—এরূপ গম্ভীর-দৃশ্য আরণ্যভূমির কল্পনাও জীবনে সে করে নাই কখনও!

অপুর সারাদিনের কাজও খুব পরিশ্রমের, সকালে স্নানের পর কিছু খাইয়াই ঘোড়ায় উঠিতে হয়, মাইল চারেক দূরের একটা জায়গায় কাজ তদারক করিবার পর প্রায়ই মিঃ রায়-চৌধুরীর ষোলো মাইল দূরবর্তী তাঁবুতে গিয়া রিপোর্ট করিতে হয় – তবে সেটা রোজ নয়, দু'দিন অন্তর অন্তর। ফিরিতে কোন দিন হয় সন্ধ্যা, কোন দিন বা রাত্রি এক প্রহর দেড় প্রহর। সবটা মিলিয়া কুড়ি-পঁচিশ মাইলের চক্র, পথ কোথাও সমতল, কোথাও ঢালু, কোথাও দুর্গম। ঢালুটাতে জঙ্গল আছে তবে তার তলা অনেকটা পরিষ্কার, ইংরাজীতে যাকে বলে open forest—কিন্তু পোয়াটাক পথ যাইতে না যাইতে সে মানুষের জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া ঘন অরণ্যের নির্জ্জনতার মধ্যে একেবারে ডুবিয়া যায়—সেখানে জন নাই, মানুষ নাই, চারিপাশে বড় বড় গাছ, ডালে পাতায় নিবিড় জড়াজড়ি, পথ নাই বলিলেও হয়, কখনও ঘোড়া চালাইতে হয় পাহাড়ী নদীর শুষ্ক খাত বাহিয়া, কখনও গভীর জঙ্গলের দুর্ভেদ্য বেত-বন ঠেলিয়া—যেখানে বন্যশূকর বা সম্বর হরিণের দল যাতায়াতের সুঁড়ি পথ তৈরি করিয়াছে সে পথে। কত ধরণের গাছ, লতা, গাছের ডালে এখানে-ওখানে বিচিত্র রঙের অর্কিড, নিচে ম্যাজোলিয়ার হলুদ ফুল ফুটিয়া প্রভাতের বাতাসকে গন্ধভরাক্রান্ত করিয়া তোলে। ঘোড়া চালাইতে চালাইতে অপুর মনে হয় সে যেন জগতে সম্পূর্ণ একা, সারা দুনিয়ার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নাই – শুধু আছে সে, আর তাহার ঘোড়াটি ও চারিপাশের এই অপূর্ব্বদৃষ্ট বিজন বন! আর কি নির্জ্জনতা! কলিকাতার বাসায় নিজের বন্ধ-দুয়ার ঘরটার কৃত্রিম নির্জ্জনতা নয়, এ ধরণের নির্জ্জনতার সঙ্গে তাহার কখনও পরিচয় ছিল না। এ নির্জ্জনতা বিরাট, অদ্ভুত, এমন কিছু, যাহা পূর্ব্ব হইতে ভাবিয়া অনুমান করা যায় না, অভিজ্ঞতার অপেক্ষা রাখে।

ভারী পছন্দ হয় এ জীবন, গল্পের বইয়ে-টইয়ে যে রকম পড়িত, এ যেন ঠিক তাহাই। খোলা জায়গা পাইলেই ঘোড়া ছাড়িয়া দেয়, গতির আনন্দে সারা দেহে একটা উত্তেজনা আসে। খানাখন্দ, শিলা, পাইওরাইটের স্তূপ কে মানে? নত শাল-শাখা এড়াইয়া দোদুল্যমান অজানা লতার পাশ কাটাইয়া পৌরুষ-ভরা উদ্দামতার আনন্দে তীরবেগে ঘোড়া উড়াইয়া চলে।

ঠিক এই সব সময়েই তাহার মনে পড়ে—প্রায়ই মনে পড়ে—শীলেদের অফিসের সেই তিনবৎসর-ব্যাপী বন্ধ, সংকীর্ণ, অন্ধকার কেরানী-জীবনের কথা। কখনও চোখ বুজিলে অফিসটা সে দেখিতে পায়, বাঁয়ে নৃপেন টাইপিস্ট বসিয়া খট-খট করিতেছে, রামধন নিকাশ-নবিস বসিয়া খাতাপত্র লিখিতেছে, সেই বাঁধানো মোটা ফাইলের দপ্তরটা—নিকাশনবিসের পিছনের দেওয়াল চুন-বালি খসিয়া দেখিতে হইয়াছে যেন একটি পূজা-নিরত পুরুতঠাকুর। রোজ সে ঠাট্টা করিয়া বলিত, 'ও রামধনবাবু, আপনার পুরুতঠাকুর আজ ফুল ফেলবেন না ?' উঃ সে কি বন্ধতা—এখন যেন সে-সব একটা দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়।

সারাদিনের পরিশ্রমের পর সে বাংলোয় ফিরিয়া পাতকুয়ার ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া একপ্রকার বন্য লেবুর রস মিশানো চিনির শরবত খায় গরমের দিনে, শরীর যেন জুড়াইয়া যায় - তার পরই রামচরিত মিশ্র আসিয়া রাত্রের খাবার দিয়া যায়—আটার রুটি, কুমড়া বা ঢ্যাড়সের তরকারী ও অড়হরের ডাল। বারো-তেরো মাইল দূরের এক বস্তি হইতে জিনিস-পত্র সপ্তাহ অন্তর কুলীরা লইয়া আসে—মাছ একেবারেই মেলে না, মাঝে-মাঝে অপু পাখি শিকার করিয়া আনে। একদিন সে বনের মধ্যে এক হরিণকে বন্দুকের পাল্লার মধ্যে পাইয়া অবাক হইয়া গেল—বড়শিঙ্গা কিংবা সম্বর হরিণ ভারী সতর্ক, মানুষের গন্ধ পাইলে তার ত্রিসীমানায় থাকে না—কিন্তু তাহার ঘোড়ার বারো-গজের মধ্যে এ হরিণটা আসিল কিরূপে ? খুশী ও আগ্রহের সহিত বন্দুক উঠাইয়া লক্ষ্য করিতে গিয়া সে দেখিল লতাপাতার আড়াল হইতে শুধু মুখটি বাহির করিয়া হরিণটিও অবাক চোখে তাহার দিকে চাহিয়া আছে—ঘোড়ায় চড়া মানুষ দেখি।। ভাবিতেছে হয়ত, এ আবার কোন্ জীব !… হঠাৎ অপুর বুকের মধ্যটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল—হরিণের চোখ দুটি যেন তাহার খোকার চোখের মত ! অমনি ডাগর ডাগর, অমনি অবোধ, নিষ্পাপ : সে উদ্যত বন্দুক নামাইয়া তখনি টোটাগুলি খুলিয়া লইল। এখানে যতদিন ছিল, আর কখনও শিকারের চেষ্টা করে নাই।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হয় সন্ধ্যার পরেই, তার পরে সে নিজের খড়ের বাংলোর কম্পাউণ্ডে চেয়ার পাতিয়া বসে।—অপূর্ব নিস্তব্ধতা ! অস্পষ্ট জ্যোৎস্না ও আঁধারে পিছনকার পাহাড়ের গম্ভীরদর্শন অনাবৃত গ্রানাইট প্রাচীরটা কি অদ্ভুত দেখায় ! শালকুসুমের সুবাসভরা অন্ধকার, মাথার উপরকার আকাশে অগণিত নৈশ নক্ষত্র। এখানে অন্য কোন সাথী নাই, তাহার মন ও চিন্তার উপর অন্য কাহারও দাবী-দাওয়া নাই, উত্তেজনা নাই, উৎকণ্ঠা নাই—আছে শুধু সে, আর এই বিশাল অরণ্য প্রকৃতির কর্কশ, বন্ধুর, বিরাট সৌন্দর্য আর আছে এই নক্ষত্রভরা নৈশ আকাশটা।

বাল্যকাল হইতেই সে আকাশ ও গ্রহ-নক্ষত্রের প্রতি আকৃষ্ট। কিন্তু এখানে তাদের এ কি রূপ ! কুলীরা সকাল সকাল খাওয়া সারিয়া ঘুমাইয়া পড়ে - রামচরিত মিশ্র মাঝে মাঝে অপুকে সাবধান করিয়া দেয়, তাম্বুকা বাহার মৎ বৈঠিয়ে বাবুজী—শেরকা বড়া ডর হ্যায় —পরে সে কাঠকুটা জ্বালিয়া প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড করিয়া গ্রীষ্মের রাত্রেও বসিয়া আগুন পোহায় —অবশেষে সেও যাইয়া শুইয়া পড়ে, তাহার অগ্নিকুণ্ড নিভিয়া যায়—স্তব্ধ রাত্রি, আকাশ অন্ধকার…পৃথিবী অন্ধকার…আকাশে বাতাসে অদ্ভুত নীরবতা, আবলুসের ডালপাতার ফাঁকে দু-একটা তারা যেন অসীম রহস্যভরা মহাব্যোমের বুকের স্পন্দনের মত দিপ্‌দিপ্ করে, বৃহস্পতি স্পষ্টতর হয়, উত্তর-পূর্ব কোণের পর্বতসানুর বনের উপরে কালপুরুষ উঠে, এখানে-ওখানে অন্ধকারের বুকে আগুনের আঁচড় কাটিয়া উল্কাপিণ্ড খসিয়া পড়ে। রাত্রি গভীর হইবার সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্রগুলা কি অদ্ভুতভাবে স্থান পরিবর্ত্তন করে ! আবলুস ডালের ফাঁকের তারাগুলো ক্রমশঃ নিচে নামে, কালপুরুষ ক্রমে পর্ব্বতসানুর দিক হইতে

মাথার উপরকার আকাশে সরিয়া আসে, বিশালকায় ছায়াপথটা তেরছা হইয়া ঘুরিয়া যায়, বৃহস্পতি পশ্চিম আকাশে ঢলিয়া পড়ে। রাত্রির পর রাত্রি এই গতির অপূর্ব লীলা দেখিতে দেখিতে এই শান্ত সনাতন জগৎটা যে কি ভয়ানক রুদ্র গতিবেগ প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে তাহার স্নিগ্ধতা ও সনাতনত্বের আড়ালে, সে সম্বন্ধে অপুর মন সচেতন হইয়া উঠিল—অদ্ভুতভাবে সচেতন হইয়া উঠিল। জীবনে কখনও তাহার এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় নাই বিশাল নক্ষত্র-জগৎটার সঙ্গে, এভাবে হইবার আশাও কখনও কি ছিল?

অপুর বাংলো-ঘরের পিছনে ও দক্ষিণে পাহাড়, পিছনকার পাহাড়তলী আধমাইলের কম, দক্ষিণের পাহাড় মাইল দুই দূরে। সামনের বহুদূরে বিস্তৃত উঁচুনীচু জমিটা শাল ও পপরেল চারা ও এক প্রকার অর্ধশুষ্ক তৃণে ভরা অনেক দূর পর্যন্ত খোলা। সারা পশ্চিম দিকচক্রবাল জুড়িয়া বহুদূরে বিন্ধ্য পর্বতের নীল অস্পষ্ট সীমারেখা, ছিন্দওয়ারা ও মহাদেও শৈলশ্রেণী—পশ্চিমা বাতাসের ধূলা-বালি যেদিন আকাশকে আবৃত না করে সেদিন বড় সুন্দর দেখায়। মাইল এগারো দূরে নর্মদা বিজন বনপ্রান্তরের মধ্যে দিয়া বহিয়া চলিয়াছে, খুব সকালে ঘোড়ায় উঠিয়া স্নান করিতে গেলে বেলা নয়টার মধ্যে ফিরিয়া আসা যায়।

দক্ষিণে পর্বতসানুর ঘন বন নিবিড়, জনমানবহীন, রুক্ষ ও গম্ভীর। দিনের শেষে পশ্চিম গগন হইতে অস্ত-সূর্যের আলো পড়িয়া পিছনের পাহাড়ের যে অংশটা খাড়া ও অনাবৃত, তাহার গ্রানাইট্ দেওয়ালটা প্রথমে হয় হলুদে, পরে হয় মেটে সিঁদুরের রং, পরে জরদা রঙের হইতে হইতে হঠাৎ ধূসর ও তারপরেই কালো হইয়া যায়। ওদিক দিগন্তলক্ষ্মীর ললাটে আলোর টিপের মত সন্ধ্যাতারা ফুটিয়া উঠে, অরণ্যানী ঘন অন্ধকারে ভরিয়া যায়, শাল ও পাহাড়ী বাঁশের ডালাপালায় বাতাস লাগিয়া একপ্রকার শব্দ হয় রামচরিত ও জহুরী সিং নেকড়ে বাঘের ভয়ে আগুন জ্বালে, চারিধারে শিয়াল ডাকিতে শুরু করে, বন-মোরগ ডাকে অন্ধকার আকাশে দেখিতে দেখিতে গ্রহ, তারা, জ্যোতিষ্ক, ছায়াপথ একে একে দেখা দেয়। পৃথিবী, আকাশ-বাতাস অপূর্ব রহস্যভরা নিস্তব্ধতায় ভরিয়া আসে, তাঁবুর পাশের দীর্ঘ ঘাসের বন দুলাইয়া এক একদিন বন্যবরাহ পলাইয়া যায়, দূরে কোথায় হায়েনা উন্মাদের মত হাসিয়া উঠে, গভীর রাত্রে কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ পাহাড়ের পিছন হইতে ধীরে ধীরে উঠিতে থাকে, এ যেন সত্যই গল্পের বইয়ে-পড়া জীবন।

এক এক দিন বৈকালে সে ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে যায়। শুধুই উঁচু-নীচু অর্ধশুষ্ক তৃণভূমি, ছোটবড় শিলাখণ্ড ছড়ানো, মাঝে মাঝে শাল ও বাদাম গাছ। আর এক জাতীয় বড় বন্য গাছের কি অপূর্ব আঁকাবাঁকা ডালপালা, চৈত্রের রৌদ্রে পাতা ঝরিয়া গিয়াছে, নীল আকাশের পটভূমিতে পত্রশূন্য ডালপালা যেন ছবির মত দেখা যায়। অপুর তাঁবু হইতে মাইল-তিনেক দূরে একটা ছোট পাহাড়ী নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে, অপু তাহার নাম রাখিয়াছে বক্রতোয়া। গ্রীষ্মকালে জল আদৌ থাকে না, তাহারই ধারে একটা শাল-ঝাড়ের নিচের একখানা পাথরের উপর সে এক একদিন গিয়া বসে, ঘোড়াটা গাছের ডালে বাঁধিয়া রাখে—স্থানটা ঠিক ছবির মত।

স্বর্ণাভ বালুর উপর অন্তর্হিত বন্যনদীর উপর-ঢাকা চরণ-চিহ্ন—হাত কয়েক মাত্র প্রশস্ত নদীখাত, উভয় তীরই পাষাণময়, ওপারে কঠিন ও দানাদার কোয়ার্টজাইট্ ও ফিকে হলুদে রঙের বড় বড় পাথরের চাঁইয়ে ভরা, অতীত কোন্ হিম-যুগের তুষার নদীর শেষ প্রবাহে ভাসিয়া আসিয়া এখানে হয়ত আটকাইয়া গিয়াছে, সোনালী রঙের নদী-বালু হয়ত সুবর্ণ-রেণু মিশানো, অস্ত সূর্যের রাঙা আলোয় অত চক্-চক্ করে কেন নতুবা? নিকটে সুগন্ধ-লতা-কস্তুরীর জঙ্গল, খরবৈশাখী রোদ্রে শুষ্ক শুঁটিগুলি ফাটিয়া মৃগনাভির গন্ধে

অপরাহ্নের বাতাস ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। বক্রতোয়া হইতে খানিকটা দূরে ঘন বনের মধ্যে পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট ঝরণা, যেন উঁচু চৌবাচ্চা ছাপাইয়া জল পড়িতেছে এমন মনে হয়। নিচের একটা খাতে গ্রীষ্মদিনেও জল থাকে। রাত্রে ওখানে হরিণদের দল জল খাইতে আসে শুনিয়া অপু কতবার দেড় প্রহর রাত্রে ঘোড়ায় চড়িয়া সেখানে গিয়াছে, কখনও দেখে নাই। গ্রীষ্ম গেল, বর্ষাও কাটিল, শরৎকালে বন্য শেফালিবনে অজস্র ফুল ফুটিল, বক্রতোয়ার শাল-ঝাড়টার কাছে বসিলে তখনও ঝরণার শব্দ পাওয়া যায়—এমন সময়ের এক জ্যোৎস্না-রাত্রে সে জহুরী সিংকে সঙ্গে লইয়া জায়গাটাতে গেল। দশমীর জ্যোৎস্না ডালে-পাতায়, পাহাড়ী বাদাম বনের মাথায়—স্নিগ্ধ বাতাসে শেফালির ঘন মিষ্ট গন্ধ। এই জ্যোৎস্না-মাখা বনভূমি, এই রাত্রির স্তব্ধতা, এই শিশিরার্দ্র নৈশ বায়ু—এরা যেন কত কালের কথা মনে করাইয়া দেয়, যেন দূরে কোনও জন্মান্তরের কথা।

হরিণের দল কিন্তু দেখা গেল না।

এই সব নির্জ্জন স্থানে অপু দেখিল মনের ভাব সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়। শহরে বা লোকালয়ে যে-মন আত্মসমস্যা লইয়া ব্যাপৃত থাকে, ambition লইয়া ব্যস্ত থাকে, এখানকার উদার নক্ষত্রখচিত আকাশের তলায় সে-সব আশা, আকাঙ্ক্ষা, সমস্যা অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। মন আরও ব্যাপক হয়, উদার হয়, দ্রষ্টা হয়, angle of vision একদম বদলাইয়া যায়। এই জন্য অনেক অনেক বই-ই গার্হস্থ্য সমাজে যা খুব ঘোরতর সমস্যামূলক ও প্রয়োজনীয় ও উপাদেয়—এখানকার নিঃসঙ্গ ও বিশ্বতোমুখী জীবনে তা অতি খেলো, রসহীন ও অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। এখানে ভাল লাগে সেই সব, যাহা শাশ্বত কালের। এই অনন্তের সঙ্গে যাহার যোগ আছে। অপুর সেই গ্রহবিজ্ঞানের বইখানা যেমন—এখন যেন তাদের নতুন অর্থ হয়। এত ভাবিতে শেখায়! চৈতন্যের কোন্ নতুন দ্বার যেন খুলিয়া যায়।

ফাল্গুন মাসে একজন ফরেস্ট সার্ভেয়ার আসিয়া মাইল দশেক দূরে বনের মধ্যে তাঁবু ফেলিলেন। অপু তাঁহার সহিত ভাব করিয়া ফেলিল। মাদ্রাজী ভদ্রলোক, বেশ লেখাপড়া জানা। অপু প্রায়ই সন্ধ্যাটা সেখানে কাটাইত, চা খাইত, গল্পগুজব করিত, ভদ্রলোক থিওডোলাইট্ পাতিয়া এ-নক্ষত্র ও-নক্ষত্র চিনাইয়া দিতেন, এক একদিন আবার দুপুরে নিমন্ত্রণ করিয়া একরকম ভাতের পিঠা খাওয়াইতেন, অপু সকালে উঠিয়া যাইত, দুপুরের পর খাওয়া সারিয়া ঘোড়ায় নিজের তাঁবুতে ফিরিত।

ফিরিবার পথে ডানদিকের পাহাড়ী ঢালুতে বহুদূর ব্যাপিয়া শীতের শেষে লোহিয়া ও বিজনির ফুলের বন। ঘোড়া থামাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিত, তাঁবুতে ফিরিবার কথা ভুলিয়া যাইত। যে কখনও এমন নির্জ্জন আরণ্যভূমিতে—যেখানে ক্রোশের পর ক্রোশ যাও লোক নাই, জল নাই, গ্রাম নাই, বস্তি নাই—সে-সব স্থানের মুক্ত আকাশের তলে কঠিন ব্যালাস্ট্ কি গ্রানাইটের রুক্ষ পর্ব্বত-প্রাচীরের ছায়ায়, নিম্নভূমিতে, ঢালুতে ঝাঁ-ঝাঁ দুপুরে রাশি রাশি অগণিত বেগুনি জরদা ও শ্বেতাভ হলুদ রঙের বন্য লোহিয়া ও বিজনির ফুলের বন না দেখিয়াছে—তাহাকে এ দৃশ্যের ধারণা করানো অসম্ভব হইবে। এমন কত শত বৎসর ধরিয়া প্রতি বসন্তে রাশি-রাশি ফুল ফুটিয়া ঝরিতেছে, কেহ দেখিবার নাই, শুধু ভোমরা ও মৌমাছিদের মহোৎসব।

একদিন অমর-কণ্টক দেখিতে যাইবার জন্য অপু মিঃ রায়চৌধুরীর নিকট ছুটি চাহিল।

মনটা ইহার আগে অত্যন্ত উতলা হইয়াছিল, কেন যে উতলা হইল, কারণটা কিছুতেই ভাল ধরিতে পারিল না। ভাবিল এই সময় একবার ঘুরিয়া আসিবে।

মিঃ রায়চৌধুরী শুনিয়া বলিলেন—যাবেন কিসে? পথ কিন্তু অত্যন্ত খারাপ, এখান থেকে প্রায় আশি মাইল দূরে হবে, এর মধ্যে ষাট মাইল ডেন্‌স্‌ ভার্জিন ফরেস্ট—বাঘ, ভালুক, নেকড়ের দল সব আছে। বিনা বন্দুকে যাবেন না, ঘোড়া সহিস নিয়ে যান—রাত হবার আগে আশ্রয় নেবেন কোথাও—সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়ার বাঘ, রসগোল্লাটির মত লুফে নেবে নইলে। ঐ জন্যে কত দিন আপনাকে বারণ করেছি এখানেও সন্ধ্যের পর তাঁবুর বাইরে বসবেন না—বা অন্ধকারে বনের পথে একা ঘোড়া চালাবেন না—তা আপনি বড্ড রেক্‌লেস।

তখন সে উৎসাহে পড়িয়া বিনা ঘোড়াতেই বাহির হইল বটে, কিন্তু দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার সময় সে নিজের ভুল বুঝিতে পারিল—ধারালো পাথরের নুড়িতে জুতার তলা কাটিয়া চিরিয়া গেল, অতদূর পথ হাঁটিবার অভ্যাস নাই, পায়ে এক বিরাট ফোস্কা উঠিয়াছে। পিছনে রামচরিত বোঁচকা লইয়া আসিতেছিল, সে সমানে পথ হাঁটিয়া চলিয়াছে, মুখে কথাটি নাই। বহু দূরের একটা পাহাড় দেখাইয়া বলিল, ওর পাশ দিয়া পথ। পাহাড়টা ধোঁয়া ধোঁয়া দেখা যায়, বোঝা যায় না, মেঘ না পাহাড়—এত দূরে। অপু ভাবিল পায়ে হাঁটিয়া অতদূর সে যাইবে ক'দিনে?

এ ধরণের ভীষণ আরণ্যভূমি, অপুর মনে হইল এ অঞ্চলে এতদিন আসিয়াও সে দেখে নাই। সে যেখানে থাকে, সেখানকার বন ইহার তুলনায় শিশু, নিতান্ত অবোধ শিশু। দুপুরের পর যে বন শুরু হইয়াছে তাহা এখনও শেষ হয় নাই, অথচ সন্ধ্যা হইয়া আসিল।

অন্ধকার নামিবার আগে একটা উঁচু পাহাড়ের উপরকার চড়াই পথে উঠিতে হইল—উঠিয়াই দেখা গেল—সর্ব্বনাশ, সামনে আবার ঠিক এমনি আর একটা পাহাড়। অপুর পায়ের ব্যথাটা খুব বাড়িয়াছিল, তৃষ্ণাও পাইয়াছিল বেজায়—অনেকক্ষণ হইতে জলের সন্ধান মেলে নাই, আবলুস গাছের তলা বিছাইয়া অম্লমধুর কেঁদফল পড়িয়া ছিল—সারা দুপুর তাহাই চুষিতে চুষিতে কাটিয়াছে কিন্তু জল অভাবে আর চলে না।

দূরে দূরে, উত্তরে ও পশ্চিমে নীল পর্ব্বতমালা। নিম্নের উপত্যকার ঘন বনানী সন্ধ্যার ছায়ায় ধূসর হইয়া আসিতেছে, সরু পথটা বনের মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া নামিয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয়, সম্মুখের পাহাড়টার ওপারে এক মাইলের মধ্যে বন-বিভাগের একটা ডাকবাংলো পাওয়া গেল। চারিধারে নিবিড় শালবন, মধ্যে ছোট্ট খড়ের ঘর। খাল ও বন বিভাগের লোকেরা মাঝে মাঝে রাত্রি কাটায়।

এ রাত্রির অভিজ্ঞতা ভারি অদ্ভুত ও বিচিত্র। বাংলোতে অপুরা একটি প্রৌঢ় লোককে পাইল, সে ইহারই মধ্যে ঘরে খিল দিয়া বসিয়া কি পড়িতেছিল, ডাকাডাকিতে উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল লোকটা মৈথিলী ব্রাহ্মণ, নাম আজবলাল ঝা। বয়স ষাট বা সত্তর হইবে। সে সেই রাত্রে নিজের ভাণ্ডার হইতে আটা ঘৃত বাহির করিয়া আনিয়া অপুর নিষেধ সত্ত্বেও উৎকৃষ্ট পুরি ভাজিয়া আনিল—পরে অতিথি-সৎকার সারিয়া সে ঘরের মধ্যে বসিয়া সুস্বরে সংস্কৃত রামায়ণ পড়িতে আরম্ভ করিল। কিছু পরেই অপু বুঝিল লোকটা সংস্কৃত ভাল জানে—নানা কাব্য উত্তমরূপে পড়িয়াছে। নানা স্থান হইতে শ্লোক মুখস্থ বলিতে লাগিল—কাব্যচর্চ্চায় অসাধারণ উৎসাহ, তুলসীদাসী রামায়ণ হইতে অনর্গল দোঁহা আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিল।

ক্রমে ওঝাজী নিজের কাহিনী বলিল। দেশ ছিল দ্বারভাঙা জেলায়। সেখানেই শৈশব কাটে, তের-বৎসর বয়সে উপনয়নের পর এক বেনিয়ার কাছে চাকরি লইয়া কাশী আসে। পড়াশুনা সেইখানেই—তারপরে কয়েক জায়গায় টোল খুলিয়া ছাত্র পড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিল—কোথাও সুবিধা হয় নাই। পেটের ভাত জুটে না, নানা স্থানে ঘুরিবার পর এই ডাকবাংলোয় আজ সাত-আট বছর বসবাস করিতেছে। লোকজন বড় এখানে কেহ আসে

না, কালেভদ্রে এক-আধ জন, সে-ই একা থাকে, মাঝে মাঝে তের মাইল দূরের বস্তি হইতে খাবার জিনিস ভিক্ষা করিয়া আনে, বেশ চলিয়া যায়। সে আছে আর আছে তার কাব্য-গ্রন্থগুলি—তার মধ্যে দুখানা হাতে-লেখা পুঁথি, মেঘদূত ও কয়েক সর্গ ভট্টি।

অপুর এত সুন্দর লাগিল এই নিরীহ, অদ্ভুত প্রকৃতির লোকটির কথাবার্ত্তা ও তাহার আগ্রহভরা কাব্যপ্রীতি—এই নির্জ্জন বনবাসেও একটা শান্ত সন্তোষ। তবে লোকটি যেন একটু বেশী বকে, বিদ্যাটি যেন বেশী জাহির করিতে চায়—কিন্তু এত সরলভাবে করে যে, দোষ ধরাও যায় না। অপু বলিল—পণ্ডিতজী, আপনাকে এখানে থাকতে দেয়, কেউ কিছু বলে না?

—না বাবুজী, নাগেশ্বরপ্রসাদ বলে একজন ইঞ্জিনীয়ার আছেন, তিনি আমাকে খুব মানেন, সেই জন্যে কেউ কিছু বলে না।

কথায় কথায় অপু বলিল—আচ্ছা পণ্ডিতজী, এ বন কি অমর-কণ্টক পর্য্যন্ত এমনি ঘন?

—বাবুজী, এই হচ্ছে প্রসিদ্ধ বিন্ধ্যারণ্য। অমর-কণ্টক ছাড়িয়ে বহুদূরে পর্য্যন্ত বন, এমনি ঘন—চিত্রকূট ও দণ্ডকারণ্য এই বনের পশ্চিমদিকে। এর বর্ণনা শুনুন তবে নৈষধচরিতে—দময়ন্তি রাজ্যভ্রষ্ট নলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পরে এই বনে পথ হারিয়ে ঘুরছিলেন—ঋক্ষবান্ পর্ব্বতের পাশের পথ দিয়ে তিনি বিদর্ভ দেশে যান। রামায়ণেও এই বনের বর্ণনা শুনবেন অরণ্যকাণ্ডে। শুনুন তবে।

অপু ভাবিল লোকটা বর্ত্তমানের কোনও ধার ধারে না, প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষায় একেবারে ডুবিয়া আছে—সব কথায় পুরাণের কথা আনিয়া ফেলে। লোকটিকে ভারি অদ্ভুত লাগিতেছিল—সারাজীবন এখানে-ওখানে ঘুরিয়া কিছুই করিতে পারে নাই—এই বনবাসে নিজের প্রিয় পুঁথিগুলি লইয়া বৎসরের পর বৎসর কাটাইয়া চলিয়াছে, কোন দুঃখ নাই, কষ্ট নাই। এ ধরণের লোকের দেখা মেলে না বেশী।

ওঝাজী সুস্বরে রামায়ণের বনবর্ণনা পড়িতেছিল। কি অদ্ভুতভাবে যে চারিপাশের দৃশ্যের সঙ্গে খাপ খায়। নির্জ্জন শালবনে অস্পষ্ট জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, কেন্দু ও চিরঞ্জী গাছের পাতাগুলি এক এক জায়গায় ঘন কালো দেখাইতেছে, বনের মধ্যে শিয়ালের দল ডাকিয়া উঠিয়া প্রহর ঘোষণা করিল।

কোথায় রেল, মোটর, এরোপ্লেন, ট্রেড-ইউনিয়ন? ওঝাজীর মুখে অরণ্যকাণ্ডের শ্লোক শুনিতে শুনিতে সে যেন অনেক দূরের এক সুপ্রাচীন জাতির অতীত সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে গিয়া পড়িল একেবারে। অতীতের গিরিতরঙ্গিণী-তীরবর্ত্তী তপোবন, হোমধূমপবিত্র গোধূলির আকাশতলে বিস্তৃত অগ্নিশালা, স্রুগভাণ্ড, অজিন, কুশ, সমিধ, জলকলস, চীর ও কৃষ্ণাজিন পরিহিত সজপা মুনিগণের বেদপাঠধ্বনি···শান্ত গিরিসানু···বনজ কুসুমের সুগন্ধ···গোদাবরীতটে পুন্নাগ নাগকেশরের বনে পুষ্প-আহরণরতা সুমুখী আশ্রম-বালকগণ···কৃশাঙ্গী রাজবধূগণ···ক্ষীণ-জ্যোৎস্নায় নদীজল আলো হইয়া উঠিয়াছে, তীরে স্থলবেতসের বনে ময়ূর ডাকিতেছে···

সে যেন স্পষ্ট দেখিল, এই নিবিড় অজানা অরণ্যানীর মধ্য দিয়া নির্ভীক, কবাটবক্ষ, ধনুষ্পাণি, প্রাচীন রাজপুত্রগণ সকল বিপদকে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন। দূরে নীল মেঘের মত পরিদৃশ্যমান ময়ূর-নিনাদিত ঘন বন, দুর্গম পথের নানা স্থানে শ্বাপদ রাক্ষসে পূর্ণ খন্দ, গুহা, গহ্বর, মহাগজ ও মহাব্যাঘ্র দ্বারা অধ্যুষিত···অজানা ও মৃত্যুসঙ্কুল—চারিধারে পর্ব্বতরাজির ধাতুরঞ্জিত শৃঙ্গসকল আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে—কুন্দগুল্ম, সিন্দুবার, শিরীষ, অর্জ্জুন, শাপ, নীপ, বেতস, তিনিশ ও তমাল তরুতে শ্যামায়মান গিরিসানু···শরধারা বিদ্ধ রুরু ও পৃষতমৃগ আগুনে ঝলসাইয়া খাওয়া, বিশাল

ইঙ্গুদী তরুমূলে সতর্ক রাত্রি যাপন···

ওঝাজী উৎসাহ পাইয়া অপুকে একটা পুঁটলি খুলিয়া একরাশ সংস্কৃত কবিতা দেখাইলেন গর্বের সহিত বলিলেন, বাবুজী, ছেলেবেলা থেকেই সংস্কৃত কবিতায় আমার হাত আছে, একবার কাশী-নরেশের সভায় আমার গুরুদেব ঈশ্বরশরণ আমায় নিয়ে যান। একজোড়া দোশালা বিদায় পেয়েছিলাম, এখনও আছে। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা। —তারপর তিনি অনেকগুলি কবিতা শুনাইলেন, বিভিন্ন ছন্দের সৌন্দর্য্য ও তাহাতে তাঁহার রচিত শ্লোকের কৃতিত্ব সরল উৎসাহে বর্ণনা করিলেন। এই ত্রিশ বৎসর ধরিয়া ওঝাজী বহু কবিতা লিখিয়াছেন, ও এখনও লেখেন, সবগুলি সযত্নে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াও দিয়াছেন, একটিও নষ্ট হইতে দেন নাই, তাহাও জানাইলেন।

একটা অদ্ভুত ধরণের দুঃখ ও বিষাদ অপুর হৃদয় অধিকার করিল। কত কথা মনে আসিল, তাহার বাবা এই রকম গান ও পাঁচালি লিখিত তাহার ছেলেবেলায়। কোথায় গেল সে সব? যুগ যে বদল হইয়া যাইতেছে, ইহারা তাহা ধরিতে পারে না। ওঝাজীর এত আগ্রহের সহিত লেখা কবিতা কে পড়িবে? কে আজকাল ইহার আদর করিবে? কোন্ আশা ইহাতে পুরিবে ওঝাজীর? অথচ কত ঐকান্তিক আগ্রহ ও আনন্দ ইহার পিছনে আছে। চাঁপদানীর পোস্টাফিসে কুড়াইয়া পাওয়া সেই ছোট মেয়েটির নাম-ঠিকানা-ভুল পত্রখানার মতই তাহা ব্যর্থ ও নিরর্থক হইয়া যাইবে!

সকালে উঠিয়া সে ওঝাজীকে একখানা দশটাকার নোট দিয়া প্রণাম করিল। নিজের একখানা ভাল বাঁধানো খাতা লিখিবার জন্য দিল—কাছে আর টাকা বেশী ছিল না, থাকিলে হয়ত আরও দিত। তাহার একটা দুর্ব্বলতা এই যে, যে একবার তাহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিয়াছে তাহাকে দিবার বেলায় সে মুক্তহস্ত, নিজের সুবিধা-অসুবিধা তখন সে দেখে না।

ডাকবাংলো হইতে মাইল খানেক পরে পথ ক্রমে উপরের দিকে উঠিতে লাগিল, ক্রমে আরও উপরে, উচ্চ মালভূমির উপর দিয়া পথ—শাল, বাঁশ, খয়ের ও আবলুসের ঘন অরণ্য—ডাইনে বামে উঁচুনীচু ছোট বড় পাহাড় ও টিলা—শালপুষ্পসুরভি সকালের হাওয়া যেন মনের আয়ু বাড়াইয়া দেয়। চতুর্থ দিন বৈকালে অমর-কণ্টক হইতে কিছু দূরে অপরূপ সৌন্দর্যভূমির সঙ্গে পরিচয় হইল—পথটা সেখানে নীচের দিকে নামিয়াছে, দুই দিকে পাহাড়ের মধ্যে সিকিমাইল চওড়া উপত্যকা, দুধারের সানুদেশের বন অজস্র ফুলে ভরা—পলাশের গাছ যেন জ্বলিতেছে। হাত দুই উঁচু পাথরের পাড়, মধ্যে গৈরিক বালু ও উপল-শয্যায় শিশু শোণ—নির্ম্মল জলের ধারা হাসিয়া খুশিয়া আনন্দ বিলাইতে বিলাইতে ছুটিয়া চলিয়াছে—একটা ময়ূর শিলাখণ্ডের আড়াল হইতে নিকটের গাছের ডালে উঠিয়া বসিল। অপুর পা আর নড়িতে চায় না—তার মুগ্ধ ও বিস্মিত চোখের সম্মুখে শৈশব কল্পনার স্বর্গকে কে আবার এভাবে বাস্তবে পরিণত করিয়া খুলিয়া বিছাইয়া দিল!

এত দূরবিসর্পিত দিগ্‌বলয় সে কখনও দেখে নাই, এত নির্জ্জনতার কখনও ধারণা ছিল না তাহার—বহুদূরে পশ্চিম আকাশের অনতিস্পষ্ট সুদীর্ঘ নীল শৈলরেখার উপরকার আকাশটাতে সে কি অপরূপ বর্ণসমুদ্র!

কি অপূর্ব্ব দৃশ্য চোখের সম্মুখে যে খুলিয়া যায়! এমন সে কখনও দেখে নাই—জীবনে কখনও দেখে নাই।

এ বিপুল আনন্দ তাহার প্রাণে কোথা হইতে আসে!

এই সন্ধ্যা, এই শ্যামলতা, এই মুক্ত প্রসারের দর্শনে যে অমৃত মাখানো আছে, সে মুখে তাহা কাহাকে বলিবে?···কে তাহার এ চোখ ফুটাইল, কে সাঁঝ-সকালের, সূর্য্যাস্তের, নীল বনানীর শ্যামলতার মায়া-কাজল তাহার চোখে মাখাইয়া দিল?

দূরবিসর্পিত চক্রবালরেখা দিগন্তের যতটুকু ঘেরিয়াছে, তাহারই কোন কোন অংশে, বহুদূরে নৈমির শ্যামলতা অনতিস্পষ্ট সান্ধ্যদিগন্তে বিলীন, কোন কোন অংশ ধোঁয়া ধোঁয়া দেখা-যাওয়া বনরেখায় পরিস্ফুট, কোন দিকে সাদা-সাদা বকের দল আকাশের নীলপটে ডানা মেলিয়া দূর হইতে দূরে চলিয়াছে···মন কোথাও বাধে না। অবাধ, উদার দৃষ্টি; পরিচয়ের গণ্ডি পার হইয়া যাইয়া অদৃশ্য অজানার উদ্দেশে ভাসিয়া চলে···

তাহার মনে হইল সত্য, সত্য, সত্য—এই শান্ত নির্জ্জন আরণ্যভূমিতে বনের ডালপালার আলোছায়ার মধ্যে পুষ্পিত কোবিদারের সুগন্ধে দিনের পর দিন ধরিয়া এক একটি নব জগতের জন্ম হয়—ঐ দূরে ছায়াপথের মত তাহা দূরবিসর্পিত, এটুকু শেষ নয়, এখানে আরম্ভও নয়—তাহাকে ধরা যায় না অথচ এই সব নীরব জীবনমুহূর্ত্তে অনন্ত দিগন্তের দিকে বিস্তৃত তাহার রহস্যময় প্রসার মনে মনে বেশ অনুভব করা যায়। এই এক বৎসরের মধ্যে মাঝে মাঝে সে তাহা অনুভব করিয়াছেও—এই অদৃশ্য জগৎটার মোহস্পর্শ মাঝে মাঝে বৈশাখী শালমঞ্জরীরা উন্মাদ সুবাসে, সন্ধ্যা-ধূসর অনতিস্পষ্ট গিরিমালার সীমারেখায়, নেকড়ে বাঘের ডাকে ভরা জ্যোৎস্নাস্নাত শুভ্র জনহীন আরণ্যভূমির গাম্ভীর্য্যে, অগণিত তারাখচিত নিঃসীম শূন্যের ছবিতে। বেকালে ঘোড়াটি বাঁধিয়া যখনই বক্রতোয়ার ধারে বসিয়াছে, যখনই অপর্ণার মুখ মনে পড়িয়াছে, কতকাল ভুলিয়া যাওয়া দিদির মুখখানা মনে পড়িয়াছে, একদিন শৈশব-মধ্যাহ্নে মায়ের-মুখে-শোনা মহাভারতের দিনগুলার কথা মনে পড়িয়াছে—তখনই সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইহাও মনে হইয়াছে যে, যে-জীবন যে-জগৎকে আমরা প্রতিদিনের কাজকর্ম্মে হাটে-ঘাটে হাতের কাছে পাইতেছি জীবন তাহা নয়, এই কর্ম্মব্যস্ত অগভীর একঘেয়ে জীবনের পিছনের একটি সুন্দর পরিপূর্ণ, আনন্দ-ভরা সৌম্য জীবন লুকানো আছে—সে এক শাশ্বত রহস্যভরা গহন গভীর জীবন-মন্দাকিনী, যাহার গতি কল্প হইতে কল্পান্তরে; দুঃখকে তাহা করিয়াছে অমৃতত্বের পাথেয়, অশ্রুকে করিয়াছে অনন্ত জীবনের উৎসধারা···

আজ তাহার বসিয়া বসিয়া মনে হয়, শীলেদের বাড়ি চাকুরি তাহার দৃষ্টিকে আরও শক্তি দিয়াছিল, অন্ধকার অফিস ঘরে একটুখানি জায়গায় দশটা হইতে সাতটা পর্য্যন্ত আবদ্ধ থাকিয়া একটুখানি খোলা জায়গার জন্য সে কি তীব্র লোলুপতা, বুভুক্ষা—দুই টিউশনির ফাঁকে গড়ের মাঠের দিকের বড় গির্জ্জাটার চূড়ার পিছনকার আকাশের দিকে তৃষিত চোখে চাহিয়া থাকার সে কি হ্যাংলামি! কিন্তু সেই বদ্ধ জীবনই পিপাসাকে আরও বাড়াইয়া দিয়াছিল, শক্তির অপচয় হইতে দেয় নাই, ধরিয়া বাঁধিয়া সংহত করিয়া রাখিয়াছিল। আজ মনে হয় চাঁপদানীর হেড মাস্টার যতীশবাবুও তাহার বন্ধু—জীবনের পরম বন্ধু—সেই নিষ্পাপ দরিদ্র ঘরের উৎপীড়িতা মেয়ে পটেশ্বরীও। ভগবান তাহাকে নিমিত্তস্বরূপ করিয়াছিলেন—তাহারা সকলে মিলিয়া চাঁপদানীর সেই কুলী-বস্তির জীবন হইতে তাহাকে জোর করিয়া দূরে করিয়া না দিলে আজও যে সেখানেই থাকিয়া যাইত। এমন সব অপরাহ্নে সেখানে বিশু স্যাকরার দোকানের সান্ধ্য আড্ডায় মহা খুশিতে আজও বসিয়া তাস খেলিত।

এ কথাও প্রায়ই মনে হয়, জীবনকে খুব কম মানুষেই চেনে। জন্মগত ভুল সংস্কারের চোখে সবাই জীবনকে বুঝিবার চেষ্টা করে, দেখিবার চেষ্টা করে, দেখাও হয় না, বোঝাও হয় না। তা ছাড়া সে চেষ্টাই বা ক'জন করে?···

অমর-কণ্টক তখনও কিছু দূরে। অপু বলিল, রামচরিত, কিছু শুকনো ডাল আর শালপাতা কুড়িয়ে আন, চা করি। রামচরিতের ঘোর আপত্তি তাহাতে। সে বলিল, হুজুর, এসব বনে বড় ভালুকের ভয়। অন্ধকার হবার আগে অমর-কণ্টকের ডাকবাংলোয় যেতে হবে। অপু বলিল, তাড়াতাড়ি চা হয়ে যাবে, যাও না তুমি। পরে সে বড় লোটাটায়

শোণের জল আনিয়া তিন টুকরা পাথরের উপর চাপাইয়া আগুন জ্বালিল। হাসিয়া বলিল, একটা ভজন গাও রামচরিত, যে আগুন জ্বলেছে, এর কাছে তোমার ভালুক এগোবে না, নির্ভয়ে গাও।

জ্যোৎস্না উঠিল। চারিধারে অদ্ভুত, গম্ভীর শোভা। কল্যকার কাব্যপুরাণের রেশ তাহার মন হইতে এখনও যায় নাই। বসিয়া বসিয়া মনে হইল সত্যই যেন কোন্ সুন্দরী চারুনেত্রা রাজবধূ—নব-পুষ্পিতা মল্লীলতার মত তন্বী লীলাময়ী—এই জনহীন নিষ্ঠুর আরণ্যভূমিতে পথ হারাইয়া বিপন্নার মত ঘুরিতেছেন—তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত স্বামী ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে—দূরে ঋক্ষবান্ পর্ব্বতের পার্শ্ব দিয়া বিদর্ভ যাইবার পথটি কে তাঁহাকে বলিয়া দিবে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

নন্-কো-অপারেশনের উত্তেজনাপূর্ণ দিনগুলি তখন বছর তিনেক পিছাইয়া পড়িয়াছে, এমন সময় একদিন প্রণব রাজসাহী জেল হইতে খালাস পাইল।

জেলে তাহার স্বাস্থ্যহানি হয় নাই, কেবল চোখের কেমন একটা অসুখ হইয়াছে, চোখ কর্‌কর্ করে, জল পড়ে। জেলের ডাক্তার মিঃ সেন চশমা লইতে বলিয়াছেন এবং কলিকাতার এক চক্ষুরোগবিশেষজ্ঞের নামে একটি পত্রও দিয়াছেন।

জেল হইতে বাহির হইয়া সে ঢাকা রওনা হইল এবং সেখান হইতে গেল স্বগ্রামে। এক প্রৌঢ়া খুড়ীমা ছাড়া তাহার আর কেহ নাই, বাপ মা শৈশবেই মারা গিয়াছেন, এক বোন ছিল, সেও বিবাহের পর মারা যায়।

সন্ধ্যার কিছু আগে সে বাড়ি পৌঁছিল। খুড়ীমা ভাঙা রোয়াকের ধারে কম্বলের আসন পাতিয়া বসিয়া মালা জপ করিতেছিলেন, তাহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। খুড়ীমার নিজের ছেলেটি মানুষ নয়, গাঁজা খাইয়া বেড়ায়, প্রণবকে ছেলেবেলা হইতে মানুষ করিয়াছেন, ভালওবাসেন, কিন্তু লেখাপড়া জানিলে কি হইবে, তাঁহার পুনঃ পুনঃ সদুপদেশ সত্ত্বেও সে কেবলই নানা হাঙ্গামায় পড়িতেছে, ইচ্ছা করিয়া পড়িতেছে।

এ বৃদ্ধবয়সে শুধু তাঁহারই মরণ নাই, ইত্যাদি নানা কথা ও তিরস্কার প্রণবকে রোয়াকের ধারে দাঁড়াইয়া শুনিতে হইল। বাগানের বড় কাঁঠাল গাছের একটা ডাল কে কাটিয়া লইয়া গিয়াছে, খুড়ীমা চৌকি দিয়া বেড়ান কখন, তিনি ও-সব পারিবেন না, তাঁহাকে যেন কাশী পাঠাইয়া দেওয়া হয়, কারণ কর্ত্তাদের অত কষ্টের বিষয়-সম্পত্তি চোখের উপর নষ্ট হইয়া যাইতেছে, এ দৃশ্য দেখাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

দিনচারেক বাড়ি থাকিয়া খুড়ীমাকে একটু শান্ত করিয়া চশমার ব্যবস্থার দোহাই দিয়া সে কলিকাতায় রওনা হইল। সোদপুরে খুড়ীমার একজন ছেলেবেলার-পাতানো গোলাপফুল আছেন, তাঁহারা প্রণবকে দেখিতে চান একবার, সেখানে যেন সে অবশ্য অবশ্য যায়, খুড়ীমার মাথার দিব্য। প্রণব মনে মনে হাসিল। বৎসর-চার পূর্ব্বে গোলাপ-ফুলের বড় মেয়েটির যখন বিবাহের বয়স হইয়াছিল, তখন খুড়ীমা ওই কথাই বলিয়াছিলেন, কিন্তু প্রণব যাওয়ার সময় করিয়া উঠিতে পারে নাই। তারপরই আসিল নন-কো-অপারেশনের ঢেউ, এবং নানা দুঃখ দুর্ভোগ। সেটির বিবাহ হইয়াছে, এবার বোধ হয় ছোটটির পালা।

কলিকাতায় আসিয়া সে প্রথমে অপুর খোঁজ করিল, পরিচিত স্থানগুলিতে গিয়া দেখিল, দু-একদিন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী খুঁজিল, কারণ যদি অপু কলিকাতায় থাকে তবে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে না আসিয়া থাকিতে পারিবে না। কোথাও তাহার সন্ধান মিলিল

না। চাঁপদানীতে যে অপু নাই তাহা তিন বৎসর আগে জেলে ঢুকিবার সময় জানিত, কারণ তাহারও প্রায় এক বৎসর আগে অপু সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছে।

একদিন সে মন্মথদের বাড়ি গেল। তখন রাত প্রায় আটটা, বাহিরের ঘরে মন্মথ বসিয়া কাগজপত্র দেখিতেছে, সে আজকাল এটর্নি, খুড়-শ্বশুরের বড় নামডাকে ও পশারের সাহায্যে নূতন বসিলেও দু'পয়সা উপার্জন করে। মন্মথ যে ব্যবসায়ে উন্নতি করিবে, তাহার প্রমাণ সেদিনই পাইল।

ঘণ্টাখানেক কথাবার্তার পরে রাত সাড়ে-সাতটার কাছাকাছি মন্মথ যেন একটু উসখুস করিতে লাগিল—যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। একটু পরেই একখানা বড় মোটরগাড়ি আসিয়া দরজায় লাগিল, একটি পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছরের যুবকের হাত ধরিয়া দু'জন লোক ঘরে প্রবেশ করিল। প্রণব দেখিয়াই বুঝিল, যুবকটি মাতাল অবস্থায় আসিয়াছে। সঙ্গের লোক দুইটির মধ্যে একজনের একটা চোখ খারাপ, ঘোলাটে ধরণের—বোধ হয় সে-চোখে দেখিতে পায় না, অপর লোকটি বেশ সুপুরুষ। মন্মথ হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, এই যে মল্লিক মশায়, আসুন, ইনিই মিঃ সেনশর্ম্মা? আসুন, নমস্কার। গোপালবাবু, বসুন এইখানে। আর ও'কে আমাদের কনডিশনস্ সব বলেছেন তো?

ধরণে প্রণব বুঝিল মল্লিক মশায় বড় পাকা লোক। উত্তর দিবার পূর্ব্বে তিনি একবার প্রণবের দিকে চাহিলেন। প্রণব উঠিতে যাইতেছিল, মন্মথ বলিল—না, না, বসো হে। ও আমার ক্লাসফ্রেন্ড, একসঙ্গে কলেজে পড়তুম—ও ঘরের লোক, বলুন আপনি! মল্লিক মশায় একটা পুঁটুলি খুলিয়া কি সব কাগজ বাহির করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে নিম্নস্বরে খানিকক্ষণ কি কথাবার্ত্তা হইল। সঙ্গের অন্য লোকটি দু-বার যুবকটির কানে-কানে ফিস্-ফিস্ করিয়া কি কি বলিল, পরে যুবক একটা কাগজে নাম সই করিল। মন্মথ দু'বার সইটা পরীক্ষা করিয়া কাগজখানা একটা খামের মধ্যে পুরিয়া টেবিলে রাখিয়া দিল ও একরাশ নোটের তাড়া মল্লিক মশায়কে গুণিয়া দিল। পরে দলটি গিয়া মোটরে উঠিল।

প্রণব অপুর মত নির্ব্বোধ নয়, সে ব্যাপারটা বুঝিল। যুবকটির নাম অজিতলাল সেনশর্ম্মা, কোনও জমিদারের ছেলে। যে জন্যই হউক, সে দুই হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট কাটিয়া দেড় হাজার টাকা লইয়া গেল এবং মল্লিক মশায় তাহার দালাল, কারণ, সকলকে মোটরে উঠাইয়া দিয়া তিনি আবার ফিরিয়া আসিলেন ও পুনরায় প্রণবের দিকে বিরক্তির দৃষ্টিতে চাহিয়া মন্মথের সঙ্গে নিম্নস্বরে কিসের তর্ক উঠাইলেন—সাড়ে সাত পার্সেণ্টের জন্য তিনি যে এতটা কষ্ট স্বীকার করেন নাই, এ কথা কয়েকবার শুনাইলেন। ঠিক সেই সময়েই প্রণব বিদায় লইল।

পরদিন মন্মথের সঙ্গে আবার দেখা। মন্মথ হাসিয়া বলিল—কালকের সেই কাপ্তেন-বাবুটি হে—আবার শেষরাত্রে তিনটের সময় মোটরে এসে হাজির। আবার চাই হাজার টাকা, —থোকে থার্টিফাইভ পার্সেণ্ট লাভ মেরে দিলুম। মল্লিক লোকটা ঘুঘু দালাল। বড়লোকের কাপ্তেন ছেলে যখন শেষরাতে হ্যাণ্ডনোট কাটছেন, তখন আমরা যা পারি ক'রে নিতে—আমার কি, লোকে যদি দেড়হাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট কেটে এক হাজার নেয় আমার তাতে দোষ কি? এই-সব চরিয়েই তো আমাদের খেতে হবে! কত রাত এমন আসে দ্যাখ না, টাকার যা বাজার কলকাতায়, কে দেবে?

প্রণব খুব আশ্চর্য্য হইল না। ইহাদের কার্য্যকলাপ সে কিছু কিছু জানে, এক অপ্রকৃতিস্থ মাতাল যুবকের নিকট হইতে ইহারা এক রাত্রিতে হাজার টাকা অসৎ উপায়ে উপার্জ্জন করিয়া বড় গলায় সেইটাই আবার বাহাদুরি করিয়া জাহির করিতেছে! হতভাগ্য যুবকটির জন্য প্রণবের কষ্ট হইল—মত্ত অবস্থায় সে যে কি সই করিল, কত টাকা তাহার

বদলে পাইল, হয়ত বা তাহা সে বুঝিতেও পারিল না।

কলিকাতা হইতে সে মামার বাড়ি আসিল। মাতৃসমা বড় মামীমা আর ইহজগতে নাই। গত বৎসর পূজার সময় তিনি—প্রণব তখন জেলে। সেখানেই সে সংবাদটা পায়। গঙ্গানন্দকাটির ঘাটে নৌকা ভিড়িতে তাহার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। কাল ট্রেনে সারা রাত ঘুম হয় নাই আদৌ, তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারিয়া দোতলার কোণের ঘরে বিশ্রামের জন্য যাইয়া দেখিল, বিছানার উপর একটি পাঁচ ছয় বৎসরের ছেলে চুপ করিয়া শুইয়া! দেখিয়া মনে হইল, একরাশ বাসি গোলাপফুল কে যেন বিছানার উপর উপুড় করিয়া ঢালিয়া রাখিয়াছে—হ্যাঁ, সে যাহা ভাবিয়াছে তাই—জ্বরে ছেলেটির গা যেন পুড়িয়া যাইতেছে, মুখ জ্বরের ধমকে লাল, ঠোঁট কাঁপিতেছে, কেমন যেন দিশেহারা ভাব। মাথার দিকে একখানা রেকাবিতে দুখানা আধ-খাওয়া ময়দার রুটি ও খানিকটা চিনি। প্রণব জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কাজল, না?

খোকা যেন হঠাৎ চমক ভাঙিয়া কতকটা ভয় ও কতকটা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, কোনও কথা বলিল না।

প্রণবের মনে বড় কষ্ট হইল—ইহাকে ইহারা এ-ভাবে একা উপরের ঘরে ফেলিয়া রাখিয়াছে! অসহায় বালক একলাটি শুইয়া মুখ বুজিয়া জ্বরের সঙ্গে যুঝিতেছে, পথ্য দিয়াছে কি—না, দুখানা ময়দার হাতে-গড়া রুটি ও খানিকটা লাল চিনি! আর কিছু জোটে নাই ইহাদের? জ্বরের ঘোরে তাহাই বালক যাহা পারিয়াছে খাইয়াছে। প্রণব জিজ্ঞাসা করিল—খোকা রুটি কেন, সাবু দেয় নি তোমায়?

খোকা বলিল—ছাবু নেই।

—নেই কে বললে?

—মা-মাসীমা বললে ছাবু নেই।

সে জ্বরে হাঁপাইতেছে দেখিয়া প্রণব ঠাণ্ডা জল আনিয়া তাহার মাথাটা বেশ করিয়া ধুইয়া দিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এরূপ করিতেই জ্বরটা একটু কমিয়া আসিল, বালক কতকটা সুস্থ হইল। দিশেহারা ও হাঁস-ফাঁস ভাবটা কাটিয়া গেল। প্রণব বলিল—বল তো আমি কে?

খোকা বলিল—জা-জা-জা-জানি নে তো?

প্রণব বলিল—আমি তোমার মামা হই খোকা। তোমার বাবা বুঝি আসে নি এর মধ্যে?

কাজল ঘাড় নাড়িয়া বলিল—ন-ন-না তো, বাবা কতদিন আসে নি।

প্রণব কৌতূহলের সুরে বলিল—তুমি এত তোৎলা হ'লে কি ক'রে, কাজল?

সে অপুর ছেলেকে খুব ছোটবেলায় দেখিয়াছিল। আজ দেখিয়া মনে হইল, অপুর ঠোঁটের সুকুমার রেখাটুকু ও গায়ের সুন্দর রংটি বাদে ইহার মুখের বাকী সবটুকু মায়ের মত।

কাজল ভাবিয়া ভাবিয়া বলিল—আমার বাবা আসবে না?

—আসবে না কেন? বাঃ!

—ক-ক-কবে আসবে?

—এই এল বলে। বাবার জন্যে মন কেমন করে বুঝি?

কাজল কিছু বলিল না।

অপুর উপরে প্রণবের খুব রাগ হইল। ভাবিল—আচ্ছা পাষণ্ড তো? মা-মরা কচি বাচ্চাটাকে বেঘোরে ফেলে রেখে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে বসে আছে! ওকে এখানে কে দেখে তার নেই ঠিক—দয়া মায়া নেই শরীরে?

শশীনারায়ণ বাঁড়ুয্যে প্রণবের নিকট জামাইয়ের যথেষ্ট নিন্দা করিলেন—বন্ধুর সঙ্গে

বিয়ের যোগাযোগটি তো ঘটিয়েছিলে, ভেবে দ্যাখো তো আজ পাঁচ বচ্ছরের মধ্যে নিজের ছেলেকে একবার চোখের দেখা দেখতে এল না, ত্রিশ-চাল্লিশ টাকা মাইনের চাকরি করছেন আর ঘুরে বেড়াচ্ছেন ভবঘুরের মত, চাল নেই চুলো নেই, কোন জন্মে যে করবেন সে আশাও নেই —ব'লো না, হাড়ে চটেছি আমি, এদিকে ছেলেটিও কি অবিকল তাই !···এই বয়েস থেকেই তেমনি নিৰ্ব্বোধ, অথচ যেমনি চঞ্চল তেমনি একগুঁয়ে। চঞ্চল কি একটু আধটু ? ঐটুকু তো ছেলে, একদিন করেছে কি, একদল গরুর গাড়ির গাড়োয়ানের সঙ্গে চলে গিয়েছে সেই পীরপুরের বাজারে—এদিকে আমরা খুঁজে পাই নে, চারিদিকে লোক পাঠাই—শেষে মাখন মুহুরীর সঙ্গে দেখা, সে ধরে নিয়ে আসে। খাওয়াও, দাওয়াও, মেয়ের ছেলে কখনও আপনার হয় না, যে পর সে-ই পর।

খোকা বাপের মত লাজুক ও মুখচোরা—কিন্তু প্রণবের মনে হইল, এমন সুন্দর ছেলে সে খুব কম দেখিয়াছে। সারা গা বহিয়া যেন লাবণ্য ঝরিতেছে, সদাসৰ্ব্বদা মুখ টিপিয়া কেমন এক করুণ, অপ্রতিভ ধরণের হাসি হাসে—মুখখানা এত লাজুক ও অবোধ দেখায় সে সময় !···কেমন যে একটা করুণা হয় ! এখানে কয়েক দিন থাকিয়া প্রণব বুঝিয়াছে, দিদিমা মারা যাওয়ার পর এ বাড়িতে বালককে যত্ন করিবার আর কেহ নাই—সে কখন খায়, কখন শোয়, কি পরে—এ সব বিষয়ে বাড়ির কাহারও দৃষ্টি নাই। শশীনারায়ণ বাঁড়ুয্যে তো নাতিকে দু'চক্ষে দেখিতে পারেন না, সৰ্ব্বদা কড়া শাসনে রাখেন। তাঁহার বিশ্বাস এখন হইতে শাসন না করিলে এ-ও বাপের মত ভবঘুরে হইয়া যাইবে, অথচ বালক বুঝিয়া উঠিতে পারে না, দাদামহাশয় কেন তাহাকে অমন উঠিতে-তাড়া বসিতে-তাড়া দেন—ফলে সে দাদা-মহাশয়কে যমের মত ভয় করে, তাঁহার ত্রিসীমানা দিয়া হাঁটিতে চায় না।

কলিকাতায় ফিরিয়া প্রণব দেবব্রতর সঙ্গে দেখা করিল। দেবব্রত একটু বিষণ্ণ—বিলাত যাইবার পূৰ্ব্বে সে একটি মেয়েকে নিজের চোখে দেখিয়া বিবাহের জন্য পছন্দ করিয়াছিল—কিন্তু তখন নানা কারণে সম্বন্ধ ভাঙিয়া যায়—সে আজ তিন বৎসর পূৰ্ব্বের কথা। এবার বিদেশ হইতে ফিরিয়া সে নিছক কৌতূহলের বশবৰ্ত্তী হইয়া সন্ধান লইয়া জানে মেয়েটির এখনও বিবাহ হয় নাই। মেয়েটির ডান পায়ের হাঁটুতে নাকি কি হইয়াছে, ডাক্তারে সন্দেহ করিতেছেন বোধ হয় তাহাতে চিরজীবনের জন্য ঐ পা খাটো হইয়া থাকিবে—এ অবস্থায় কে-ই বা বিবাহ করিতে অগ্রসর হইবে ? শুনিবামাত্র দেবব্রত ধরিয়া বসিয়াছে সে ঐ মেয়েকেই বিবাহ করিবে—মায়ের ঘোর আপত্তি, পিসেমহাশয়ের আপত্তি, মামাদের আপত্তি—সে কিন্তু নাছোড়বান্দা। হয় ঐ মেয়েকে বিবাহ করিবে, নতুবা দরকার নাই বিবাহে।

দেবব্রতর সঙ্গে প্রণবের খুব ঘনিষ্ঠ আলাপ ছিল না, অপুর সঙ্গে ইতিপূৰ্ব্বে বার দুই-তিন তাহার কাছে গিয়াছিল এই মাত্র। এবার সে যায় অপুর কোন সন্ধান দিতে পারে কিনা তাহাই জানিবার জন্য। কিন্তু এই বিবাহ-বিভ্রাটকে অবলম্বন করিয়া মাস-দুইয়ের মধ্যে দু'জনের একটা ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিল।

দেবব্রত এই সব গোলমালের দরুন পিশেমহাশয়ের বাসা ছাড়িয়া কলিকাতা হোস্টেলে উঠিয়াছিল—বৈকালে সেখানে একদিন প্রণব বেড়াইতে গিয়া শুনিল, দেবব্রতর মা এ বিবাহে মত দিয়াছেন। দেবব্রত বলিল—ঠিক সময় এসেছেন, আমি ভাবছিলুম আপনার কথা—কাল পিসেমশায় আর বড় মামা যাবেন মেয়েকে আশীৰ্ব্বাদ করতে, আপনিও যান ও'দের সঙ্গে। ঠিক বিকেল পাঁচটায় এখানে আসবেন।

মেয়ের বাড়ি গোয়াবাগানে। ছোট দোতলা বাড়ি, নিচে একটা প্রেস। মেয়ের বাপ গভর্ণমেণ্টের চাকরি করেন। মেয়েটিকে দেখিয়া খুব সুন্দরী বলিয়া মনে হইল না প্রণবের,

গায়ের রং যে ফর্সা তাও নয়, তবে মুখে এমন কিছু আছে যাতে একবার দেখিলে বার বার চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। ঘাড়ের কাছে একটা যৌতুকচিহ্ন, চুল বেশ বড় বড় ও কোঁকড়ানো। বিবাহের দিনও উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে ধার্য্য হইয়া গেল।

দেবব্রত সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ-ঘরের ছেলে। দুঃখ কষ্ট কাহাকে বলে জানে না, এ পর্য্যন্ত বরাবর যথেষ্ট পয়সা হাতে পাইয়াছে, তাহার পিসেমহাশয় অপুত্রক, তাঁহার সম্পত্তি ও কলিকাতার দু'খানা বাড়ি দেবব্রতই পাইবে। কিন্তু পয়সা অপব্যয় করার দিকে দেবব্রতর ঝোঁক নাই, সে খুব হিসাবী ও সতর্ক এ বিষয়ে। সাংসারিক বিষয়ে দেবব্রত খুব হুঁশিয়ার—পাটনায় যে চাকরিটা সে সম্প্রতি পাইয়াছে, সে শুধু তাহার যোগাড়-যন্ত্র ও সুপারিশ ধরিবার কৃতিত্বের পুরস্কার—নতুবা কুড়ি-বাইশ জন বিলাত-ফেরত অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ারের দরখাস্তের মধ্যে তাহার মত তরুণ ও অনভিজ্ঞ লোকের চাকুরি পাইবার কোন আশা ছিল না। শাঁখারিটোলায় দেবব্রতের পিসেমহাশয় তারিণী মিত্রের বাড়ি হইতেই দেবব্রত বিবাহ করিতে গেল। পিসিমার ইচ্ছা ছিল খুব বড় একটা মিছিল করিয়া বর রওনা হয়, কিন্তু পিসেমহাশয় বুঝাইলেন ও সব একালের ছেলে—বিশেষ করিয়া দেবব্রতর মত বিলাত-ফেরত ছেলে—পছন্দ করিবে না। মায়ের নিকট বিবাহ করিতে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিবার সময় দেবব্রতর চোখ ভিজিয়া উঠিল—স্বর্গগত স্বামীকে স্মরণ করিয়া দেবব্রতর মা-ও চোখের জল ফেলিলেন—সবাই বকিল, তিরস্কার করিল। একজন প্রতিবেশিনী হাসিয়া বলিলেন—দোর-ধরুণীর টাকা কৈ ?···

দেবব্রতর পিসিমা বলিলেন—আমার কাছে গুণে নিও মেজবৌ। ও-কি দোর-ধরা হ'ল ? আমার ছেলেবেলায় আমাদের বাঙাল দেশে নিয়ম ছিল দেখেছি, সাতজন এয়ো আর সাতজন কুমারী এই চৌদ্দজনকে দোর-ধরুণীর টাকা দিয়ে তবে বর বেরুতে পেত বাড়ি থেকে। একালে তো সব দাঁড়িয়েছে—

দেবব্রত একটুখানি দাঁড়াইল। ফিরিয়া বলিল—মা, শোন একটু।···

আড়ালে গিয়া চুপি চুপি বলিল—চাটুয্যে-বাড়ির মেয়েটা দোর ধরার জন্য দাঁড়িয়েছিল, আমি জানি, ছোট পিসিমা তাকে সরিয়ে দিয়েছেন—এ-সবেতে আমার মনে বড় কষ্ট হয়, মা। এই দশ টাকার নোটটা রাখো, তাকে তুমি দিও—কেন তাকে সরালে বল তো—আমি জানি অবিশ্যি কেন সরিয়েছে—কিন্তু এতে লোকের মনে কষ্ট হয় তাও ওরা বোঝে না !

মা বলিলেন—ও-কথা তোর ওদের বলবার দরকার নেই—টাকা দিলি আমি দেবো এখন। ছোট ঠাকুরঝির দোষ কি, বিধবা মেয়েকে কি বলে আজ সামনে রাখে বল না ? হিঁদুর নিয়মগুলো তো মানতে হবে, সবাই তো তোমার মত ব্রহ্মজ্ঞানী হয়নি এখনো। মেয়েটার দোষ দিইনে, তার আর বয়স কি—ছেলেমানুষ—সে না হয় অত বোঝে-সোঝে না, আমোদে নেচে দোর ধরবে বলে দাঁড়িয়েছে—তার বাপ-মায়ের তো এটা দেখতে হয়। শুভকাজের দিন বিধবা মেয়েকে কেন এখানে পাঠানো বাপু ? তা নয়—গরীব কিনা, পাঠিয়েছে—যা কিছু ঘরে আসে—। যাক্। আমি দেবো এখন—তা হ্যাঁ রে, পাঁচটা দিলেই তো হ'ত—এত কেন ?···

—না মা, ঐ থাক্, দিও। ছোটপিসিমাকে ব'লো বুঝিয়ে ওতে শুভকাজ এগোয় না, আরও পিছিয়ে যায়।

দু-তিনখানা বাড়ির মোড়ে চাটুয্যে-বাড়িটা। ইহারা সবাই ছাপাখানায় কাজ করে, বৃদ্ধ চাটুয্যে মহাশয়ও আগে কম্পোজিটরের কাজ করিতেন, আজকাল চোখে দেখেন না বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। আজকাল তাঁহার কাজ প্রতিবেশীর নিকট অভাব জানাইয়া আধুলি ধার করিয়া বেড়ানো। দেবব্রত ইঁহাদের সকলকেই অনেক দিন হইতে চেনে।

তাহার গোলাপফুল সাজানো মোটরখানা চাটুয্যে-বাড়ির সম্মুখে মোড় ঘুরিবার সময় দেবব্রত কেবলই ভাবিতেছিল, কোনও জানালার ফাঁক দিয়া তের বৎসরের বিধবা মেয়েটা হয়ত কৌতূহলের সহিত তাহাদের মোটর ও ফিটন গাড়ির সারির দিকে চাহিয়া আছে।

রাত্রের গোড়ার দিকেই বিবাহ ও বরযাত্রীভোজন মিটিয়া গেল।

দেবব্রত বাসরে গিয়া দেখিল, সেখানে অত্যন্ত ভিড়—বাসরের ঘর খুব বড় নয়—সামনের দালানেও স্থান নাই, অন্য অন্য ঘরের বাক্স তোরঙ্গ সব দালানে বাহির করা হইয়াছে, অথচ মেয়েদের ভিড় এত বেশী যে বসা তো দূরের কথা, সকলের দাঁড়াইবার জায়গাও নাই। সে বড় শালাকে বলিল—দেখুন, যদি অনুমতি করেন, একটু ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যে জাহির করি। এই ট্রাংকগুলো এখানে রাখার কোন মানে নেই—লোক ডাকিয়ে দেওয়ালের দিকে এক সারি এখানে, আর এক সারি ক'রে দিন সিঁড়ির ধাপে ধাপে—বুঝলেন না?···যাবার আসবারও কষ্ট হবে না অথচ এদের জায়গা হবে এখন। তাহার ছোট শালীরা ব্যাপারটা লইয়া তাহাকে কি একটা ঠাট্টা করিল। সবাই হাসিয়া উঠিল।

রাত্রি একটার পর কিন্তু যে-যাহার স্থানে চলিয়া গেল। দেবব্রত বাসর হইতে বাহির হইয়া দালানের একটা স্টীলের তোরঙ্গের উপর বসিয়া একটা সিগারেট ধরাইল। তাহার মনে আনন্দের সঙ্গে কেমন একটা উত্তেজনা। মনে মনে একটা তৃপ্তিও অনুভব করিল।··· জীবন এখন সুনির্দিষ্ট পথে চলিবে—লক্ষ্মীছাড়ার জীবন শেষ হইল। পাটনার চাকুরিতে একটা সুবিধা এই যে, জায়গা খুব স্বাস্থ্যকর, বাড়িভাড়া সস্তা, বছরে পঞ্চাশ টাকা করিয়া মাহিনা বাড়িবে—তবে প্রভিডেন্ট ফণ্ডের সুদ কিছু কম। সে ভাবিল—যাই তো আগে, ফৈজুদ্দীন হোসেনকে একটু হাতে রাখতে হবে, ওর হাতেই সব—অন্য ডিরেক্টর তো কাঠের পুতুল। ক্যান্টনমেন্টের ক্লাবে গিয়েই ভর্তি হয়ে যাবো—ওরা আবার ওসব দেখলে ভেজে কিনা!

নববধূ এখনও ঘুমায় নাই, দেবব্রত গিয়া বলিল—বাইরে এসো না সুনীতি, কেউ নেই। আসবে?

নববধূ চেলীর পুঁটুলি নয়, কিন্তু পায়ের জন্য তার উঠিতে কষ্ট হয়—দেবব্রত তাহাকে সযত্নে ধরিয়া দালানে আনিয়া তোরঙ্গটার উপর ধীরে ধীরে বসাইয়া দিল। নববধূ হাসিয়া বলিল—ওই দোরটা বন্ধ করে দাও—সিঁড়ির ওইটে—শেকল উঠিয়ে দাও—হ্যাঁ—ঠিক হয়েছে—নৈলে এক্ষুনি কেউ এসে পড়বে।

দেবব্রত পাশে বসিয়া বলিল—রাত জেগে কষ্ট হচ্ছে খুব—না?

—কি এমন কষ্ট, তা ছাড়া দুপুরবেলা আমি ঘুমিয়েছি খুব।

—আচ্ছা, তুমি কনে-চন্দন পরো নি কেন সুনীতি? এখানে সে চলন নেই?

মেয়েটি সলজ্জমুখে বলিল—মা পরাতে বলেছিলেন—

—তবে?

—জ্যাঠাইমা বললেন, তুমি নাকি পছন্দ করবে না।

দেবব্রত হাসিয়া উঠিয়া বলিল—কেন বল তো—বিলেত-ফেরত বলে? বা তো—

পরে সে বলিল—আমি সাত তারিখে পাটনায় যাব, বুঝলে, তোমাকে আর মাকে এসে নিয়ে যাব মাস দুই পরে, সুনীতি। তোমার বাবাকে বলে রেখেছি।

মেয়েটি নতমুখে বলিল—আচ্ছা একটা কথা বলব? কিছু মনে করবে না?···

—বল না, কি মনে করব?—

—আচ্ছা, আমার এই পা নিয়ে তুমি যে বিয়ে করলে, যদি পা না সারে? দ্যাখ, তোমার গা ছুঁয়ে সত্যি বলছি আমার ইচ্ছে ছিল না বিয়ের। মাকে কতবার বুঝিয়ে বলেছি, মা

এই তো আমার পায়ের দশা, পরের ওপর অনর্থক কেন বোঝা চাপানো সারাজীবন—তা মা বললেন তুমি নাকি খুব—তোমার নাকি খুব ইচ্ছে। আচ্ছা কেন বল তো এ মতি তোমার হ'ল ?

দেবব্রত বলিল—স্পষ্ট কথা বললে তুমিও কিছু মনে করবে না সুনীতি ? তাহলে বলি শোন, তোমার এই পায়ের দোষ যদি না হ'ত তবে আমি অন্য জায়গায় বিয়ে ক'রে ফেলতুম …যেদিন থেকে শুনেছি পায়ের দোষের জন্য তোমার বিয়ে এই তিন বছরের মধ্যে হয় নি—সেদিন থেকে আমার মন বলেছে ওখানেই বিয়ে করব, নয় তো নয়। অন্য জায়গায় বিয়ে করলে মনে শান্তি পেতাম না সুনীতি। সেই যে তোমাকে দেখে গিয়েছিলুম, তারপর বিয়ে তখন ভেঙে গেল, কিন্তু তোমার মুখখানা কতবার যে মনে হয়েছে !…কেন কে জানে—আমি কাব্যি করছি নে সুনীতি, ওসব আমার আসে না, আমি সত্য কথা বলছি।

তারপর সে আজ ওবেলায় চাটুয্যে-বাড়ির বিধবা মেয়েটির কথা বলিল। বলিল—দ্যাখ এও তো কাব্যের কথা নয়—আজ বিয়ের আসনে বসে কেবলই সেই ছোট মেয়েটার কথা মনে হয়েছে। ছোট পিসিমা তাকে তাড়িয়ে দিয়ে আজ আমার অর্দ্ধেক আনন্দ মাটি করেছেন সুনীতি—তোমার কাছে বলছি, আর কাউকে ব'লো না যেন ! এ কেউ বুঝবে না, আমার মা-ও বোঝেন নি।

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া রাত্রি দুইটা বাজিল।

কাজলের মুশকিল বাধে রোজ সন্ধ্যার সময়। খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে তাহার মাসীমা বলেন, ওপরে চলে যাও, শুয়ে পড় গিয়ে। কাজল বিপন্নমুখে রোয়াকের কোণে দাঁড়াইয়া শীতে ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতে থাকে। ওপরে কেউ নাই, মধ্যে একটা অন্ধকার সিঁড়ি, তাহার উপর দোতলার পাশের ঘরটাতে আলনায় একরাশ লেপকাঁথা বাঁধা আছে। আধ-অন্ধকারে সেগুলো এমন দেখায় !

আগে আগে দিদিমা সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া আসিতেন। দিদিমা আর নাই, মামীমারা খাওয়াইয়া দিয়াই খালাস। সেদিন সে সেজ দিদিমাকে বলিয়াছিল, তিনি ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, আমার তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, এখন তোমায় যাই শোওয়াতে। একা এটুকু আর যেতে পারেন না, সেদিন তো পীরপুরের হাটে একা পালিয়ে যেতে পেরেছিলে ? ছেলের ন্যাকরা দেখে বাঁচিনে।

নিরুপায় হইয়া ভয়ে ভয়ে সিঁড়ি বাহিয়া সে উপরে উঠে। কিন্তু ঘরে ঢুকিতে আর সাহস না করিয়া প্রথমটা দোরের কাছে দাঁড়াইয়া থাকে। কোণে কড়ির আলনার নীচে দাদামহাশয়ের একরাশ পুরানো হুঁকার খোল ও হুঁকা-দান। এককোণে মিটমিটে তেলের প্রদীপ, তাতে সামান্য একটুখানি আলো হয় মাত্র, কোণের অন্ধকার তাহাতে আরও যেন সন্দেহজনক দেখায়। এখানে একবার আসিলে আর কেহ কোথাও নাই, ছোট মামীমা নাই, ছোটদিদিমা নাই, দলু নাই, টাটি নাই—শুধু সে আর চারিপাশের এই-সব অজানা বিভীষিকা। কিন্তু এখানেই বা সে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবে—ছোট মাসীমা ও বিন্দু-ঝি এঘরে শোয়, তাহাদের আসিতে এখনও বহু দেরি. শীতের হাওয়ায় হাড়-কাঁপুনি ধরিয়া যায় যে। অগত্যা সে অন্যান্য দিনের মত চোখ বুজিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া নিজের বিছানার উপর উঠিয়াই ছোট লেপটা একেবারে মুড়ি দিয়া ফেলে। কিন্তু বেশীক্ষণ লেপমুড়ি দিয়া থাকিতে পারে না—ঘরের মধ্যে কোন কিছু নাই তো ? মুখ খুলিয়া একবার ভীতচোখে চারিধারে চাহিয়া দেখিয়া আবার লেপমুড়ি দেয়—আর যত রাজ্যের ভূতের গল্প কি ঠিক ছাই এই সময়টাতে মনে আসে।

দিদিমা থাকিতে এ-সব কষ্ট ছিল না। দিদিমা তাহাকে ঘুম না পাড়াইয়া নামিতেন না। কাজল উপরে আসিয়াই বিছানার উপরকার সাজানো লেপ-কাঁথার স্তূপের উপর খুশী ও আমোদের সহিত বার বার লাফাইয়া পড়িয়া চেঁচাইতে থাকিত—আমি জলে ঝাঁপাই—হি-হি—আমি জলে ঝাঁপাই—ও দিদিমা—হি-হি—

কোনোরকমে দিদিমা তাহার লাফানো হইতে নিবৃত্ত করিয়া শোয়াইতে কৃতকার্য হইলে সে দিদিমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিত,—এইবার এক্‌তা গ-গ-অ-প্প।—কথার শেষের দিকে পাতলা রাঙা ঠোঁট দুটি ফুলের কুঁড়ির মত এক জায়গায় জড় করিয়া না আনিলে কথা মুখ দিয়া বাহির হইত না। তাহার দিদিমা হাসিয়া বলিত—যে গুড় খাস, গুড় খেয়ে খেয়ে এমনি তোৎলা। গল্প বলব, কিন্তু তুমি পাশ ফিরে চুপটি ক'রে শোবে, নড়বেও না, চড়বেও না। কাজল ভ্রু কুঁচকাইয়া ঘাড় সামনের দিকে নামাইয়া থুৎনী প্রায় বুকের উপর লইয়া আসিত। পরে চোখের ভুরু উপরের দিকে উঠাইয়া হাসি-ভরা চোখে চুপ করিয়া দিদিমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। দিদিমা বলিত, দুষ্টুমি ক'রো না দাদাভাই, আমার এখন অনেক কাজ, তোমার দাদু আবার এখুনি পাশার আড্ডা থেকে আসবেন, তাঁকে খেতে দেব। ঘুমোও তো লক্ষ্মী ভাইটি! কাজল বলিত, ইল্লি!···দা-দা-দাদুকে খাবার দেবে তো ছোট মামীমা, তু-তুমি এখন যাবে বৈ কি?—এক্‌তা গ-গ-অ-প্প কর, হ্যাঁ দিদিমা—

এ ধরণের কথা সে শিখিয়াছে বড় মাসতুতো ভায়েদের কাছে। তাহার বড় মাসীমার ছেলে দলু কথায় কথায় বলে—ইল্লি! কাজলও শুনিয়া শুনিয়া তাহাই ধরিয়াছে।

তাহার পর দিদিমা গল্প করিতেন, কাজল জানালার বাহিরে তারাভরা, স্তব্ধ, নৈশ আকাশের দিকে চাহিয়া একবার মুখ ফুলাইত আবার হাঁ করিত, আবার ফুলাইত আবার হাঁ করিত। দিদিমা বলিত—আঃ, ছিঃ দাদু! ও-রকম দুষ্টুমি করলে ঘুমুবে কখন? এখুনি তোমার দাদু ডাকবেন আমায়, তখন তো আমায় যেতে হবে। চুপটি ক'রে শোও। নইলে ডাকব তোমার দাদুকে?

দাদামহাশয়কে কাজল বড় ভয় করে, এইবার সে চুপ হইয়া যাইত। কোথায় গেল সেই দিদিমা! সে আরও বছর দেড় আগে, তখন তাহার বয়স সাড়ে-চার বছর—একদিন ভারি মজার ব্যাপার ঘটিয়াছিল। সে রাত্রে ঘুমাইতেছিল, সকালে উঠিলে অরু চুপি চুপি বলিল—ঠাকুমা কাল রাতে মারা গিয়েছে, জানিস নে কাজল?

—কো-কোথায় গিয়েছে?

—মারা গিয়েছে, সত্যি আজ শেষরাত্রে নিয়ে গিয়েছে। তুই ঘুমুচ্ছিলি তখন।

—আবার ক-কবে আসবে?

অরু বিজ্ঞের সুরে বলিল—আর বুঝি আসে? তুই যা বোকা। ঠাকুরমাকে তো পোড়াতে নিয়ে চলে গেছে ওই দিকে।—সে হাত তুলিয়া নদীর বাঁকের দিকে দেখাইয়া দিল।

অরু ভারী চালবাজ। সব তাতেই ওই রকম চাল দেয়, ভারি তো এক বছরের বড়, দেখায় যেন সব জানে, সব বোঝে। ওই চালবাজির জন্যই তো কাজল অরুকে দেখিতে পারে না।

সে খুব বিস্মিতও হইল। দিদিমা আর আসিবে না! কেন?···কি হইয়াছে দিদিমার?···বা-রে!

কিন্তু সেই হইতে দিদিমাকে আর সে দেখিতে পায় নাই। গোপনে গোপনে অনেক কাঁদিয়াছে, কোথায় দিদিমা এরকম একরাত্রের মধ্যে নিরুদ্দেশ হইয়া যাইতে পারে, সে সম্বন্ধে অনেক ভাবিয়াছে, কিছু ঠিক করিতে পারে নাই।

আজকাল আর কেহ কাছে বসিয়া খাওয়ায় না, সঙ্গে করিয়া উপরে লইয়া আসে না, গল্প

করে না। একলাটি এই অন্ধকারের মধ্যে দিয়া আসিয়া উপরের ঘরে শুইতে হয়। সকলের চেয়ে মুশকিল হইয়াছে এইটাই বেশী কি-না।

বিংশ পরিচ্ছেদ

আরও এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। চৈত্র মাস যায় যায়।

অপু অনেকদিন পরে দেশে ফিরিতেছিল। গাড়ির মধ্যে একজন মুসলমান ভদ্রলোক লক্ষ্মৌ-এর খরমুজার গুণ বর্ণনা করিতেছিল, অনেকে মন দিয়া শুনিতেছিল—অপু অন্যমনস্ক ভাবে জানালার বাহিরে চাহিয়া ছিল। কতক্ষণে গাড়ি বাংলা দেশে আসিবে? সাতসমুদ্র তেরোনদী পারের রূপকথার রাজ্য বাংলা! আজ দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ বৎসর সে বাংলার শান্ত, কমনীয় রূপ দেখে নাই, এই বৈশাখে বাঁশের বনে বনে শুকনো বাঁশখোলার তলা-বিছাইয়া পড়িয়া-থাকা কাঞ্চনফুলে-ভরা সান-বাঁধানো পুকুরের ঘাটে সদ্যস্নাত নতমুখী তরুণীর মূর্ত্তি—কলিকাতার মেস-বাটী, দালানের রেলিং-এ কাপড় মেলিয়া দেওয়া, বাবুরা সব আফিসে, নিচের বালতিতে বৈকাল তিনটার সময় কলের মুখ হইতে জল পড়িতেছে···এ সব সুপরিচিত প্রিয় দৃশ্যগুলি আর একবার দেখিবার জন্য—উঃ, মন কি ছট্‌ফট্‌ই না করিয়াছে গত ছ'বছর! বাংলা ছাড়িয়া সে ভাল করিয়া বাংলাকে চিনিয়াছে, বুঝিয়াছে। কতক্ষণে বাংলাকে দেখা যাইবে আজ? সন্ধ্যা ঠিক সাতটার সময়।

রাণীগঞ্জ ছাড়িয়া অনেক দূরে আসিবার পরে, বালুময় মাঠের মধ্যে সিঙ্গারণ নদীর গ্রীষ্মের জল খররৌদ্রে শুকাইয়া গিয়াছে—দূরে গ্রামের মেয়েরা আসিয়া নদীখাতের বালু খুঁড়িয়া সেই জলে কলসী ভর্ত্তি করিয়া লইতেছে—একটি কৃষক-বধূ জল-ভরা কলসী কাঁখে রেলের ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া গাড়ি দেখিতেছে—অপু দৃশ্যটা দেখিয়া পুলকিত হইয়া উঠিল—সারা শরীরে একটা অপূর্ব্ব আনন্দ-শিহরণ! কতদিন বাংলার মেয়ের এ পরিচিত ভঙ্গীটি সে দেখে নাই! চোখ, মন জুড়াইয়া গেল।

বর্দ্ধমান ছাড়াইয়া নিদাঘ অপরাহ্ণের ঘন ছায়ায় একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়িল। একটা ছোট পুকুর ফুটন্ত পদ্মফুলে একেবারে ভরা, ফুলে পাতায় জল দেখা যায় না—ওপারে বিচালি-ছাওয়া গৃহস্থের বাটী, একটা প্রাচীন সজিনা গাছ জলের ধারে ভাঙিয়া পড়িয়া গলিয়া খসিয়া যাইতেছে, একটা গোবরগাদা—আজ সারাদিনের আগুন-বৃষ্টির পরে, বিহার ও সাঁওতালপরগণার বন্ধুর, আগুন-রাঙা ভূমিশ্রীর পরে, ছায়াভরা পদ্মপুকুরটা যেন সারা বাংলার কমনীয় রূপের প্রতীক হইয়া তাহার চোখে দেখা দিল।

হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেনটা আসিয়া দাঁড়াইতেই সে যেন খানিকটা অবাক হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—এত আলো, এত লোকজন, এত ব্যস্ততা, এত গাড়ি-ঘোড়া জীবনে যেন সে এই প্রথম দেখিতেছে, হাওড়া পুল পার হইবার সময় ওপারের আলোকোজ্জ্বল মহানগরীর দৃশ্যে সে যেন মুগ্ধ হইয়া গেল—ওগুলা কি? মোটর বাস? কই আগে তো ছিল না কখনও? কি বড় বড় বাড়ি কলিকাতায়, ফুটপাতে কি লোকজনের ভিড়! বাড়ির মাথায় একটা কিসের বিজ্ঞাপনের বিজলী আলোর রঙীন হরপ একবার জ্বলিতেছে, আবার নিভিতেছে—উঃ, কী কাণ্ড!

হ্যারিসন রোডের একটা বোর্ডিং-এ উঠিয়া একা একটা ঘর লইল—স্নানের ঘর হইতে সাবান মাখিয়া স্নান সারিয়া সারাদিনের ধুমধূলি ও গরমের পর ভারী আরাম পাইল। ঘরের আলোর সুইচ টিপিয়া ছেলেমানুষের মত আনন্দে আলোটাকে একবার জ্বালাইতে একবার নিভাইতে লাগিল—সবই নূতন মনে হয়। সবই অদ্ভুত লাগে।

পরদিন সে কলিকাতার সর্বত্র ঘুরিল—কোন পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের সহিত দেখা হইল না। বৌবাজারের সেই কবিরাজ বন্ধুটি বাসা উঠাইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, পূর্বপরিচিত মেসগুলিতে নূতন লোকেরা আসিয়াছে, কলেজ স্কোয়ারের সেই পুরাতন চায়ের দোকানটি উঠিয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যার সময় সে একটা নূতন বাংলা থিয়েটারে গেল শুধু বাংলা গান শোনার লোভে। বেশী দামের টিকিট কিনিয়া রঙ্গমঞ্চের ঠিক সম্মুখের সারির আসনে বসিয়া পুলকিত ও উৎসুক চোখে সে চারিদিকের দর্শকের ভিড়টা দেখিতেছিল। একটা অঙ্কের শেষে সে বাহিরে আসিল, ফুটপাতে একজন বুড়ী পান বিক্রী করিতেছে, অপুকে বলিল, বাবু, পান নেবেন না? নেন না! অপু ভাবিল, সবাই মিঠে পান কিনছে বড় আয়নাওয়ালা দোকান থেকে। এ বুড়ীর পান বোধ হয় কেউ কেনে না—আহা, নিই এর কাছ থেকে।

সকলেরই উপর কেমন একটা করুণার ভাব, সবারই উপর কেমন একটা ভালবাসা, সহানুভূতির ভাব—অপুর মনের বর্তমান অবস্থায় বুড়ী পানওয়ালী হাত পাতিয়া দশটা টাকা চাহিয়া বসিলেও সে তৎক্ষণাৎ তাহা দিতে পারিত।

দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে সে বাহির হইয়া বুড়ীটার কাছে পান কিনিতে যাইতেছে, এমন সময় পিছনের আসনের দিকে তাহার নজর পড়িল।

সে একটু আগাইয়া গিয়া কাঁধে হাত দিয়া বলিল—সুরেশ্বরদা, চিনতে পারেন?

কলিকাতায় প্রথম ছাত্র-জীবনের সেই উপকারী বন্ধু সুরেশ্বর, সঙ্গে একটি তরুণী মহিলা। সুরেশ্বর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—গুডনেস্ গ্রেসাস্! আমাদের সেই অপূর্ব না?

অপু হাসিয়া বলিল, কেন, সন্দেহ হচ্ছে নাকি? ওঃ কতদিন পরে আপনার সঙ্গে—, ওঃ?

—দেখে সন্দেহ হবার কথা বটে। মুখের চেহারা বদলেছে, রঙটা একটু তামাটে—যদিও you are as handsome as ever—ও, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই—ইনি আমার বেটার-হাফ। আর ইনি আমার বন্ধু অপূর্ববাবু—কবি, ভাবুক, লেখক, ভবঘুরে এ্যান্ড হোয়াট নট্—তারপর, কোথায় ছিলে এতদিন?

—কোথায় ছিলুম না তাই বরং জিজ্ঞেস করুন—in all sorts of places—তবে সভ্য জগৎ থেকে দূরে—ছ'বছর পর কাল কলকাতায় এসেছি। ও ড্রপ উঠল বুঝি, এখন থাক, বলব এখন।

—মোস্ট বাজে প্লে। তার চেয়ে চলো, তোমার সঙ্গে বাইরে যাই—

অপু বন্ধুকে সিগারেট দিয়া নিজে সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে বলিল—আপনার এ-সব দেখে একঘেয়ে হয়ে গিয়েছে, তাই ভাল লাগছে না বোধ হয়। আমার চোখ নিয়ে যদি দেখতেন, তবে ছ'বছর বনবাসের পর উড়িয়াদের রামযাত্রাও ভাল লাগত। জানেন সুরেশ্বরদা, সেখানে আমার ঘর থেকে কিছু দূরে এক জায়গায় একটা গিরগিটি থাকত—সেটা এবেলা-ওবেলা রঙ বদলাত, দু'টি বেলা তাই শখ ক'রে দেখতে যেতুম—তাই ছিল একমাত্র তামাশা, তাই দেখে আনন্দ পেতুম।

রাত সাড়ে ন'টায় থিয়েটার ভাঙিল। তারপর সে থিয়েটার-ঘর হইতে নিঃসৃত সুবেশ নরনারীর স্রোতের দিকে চাহিয়া রহিল—এই আলো, লোকজন, সাজানো দোকানপসার—এসব সে ছেলেমানুষের মত আনন্দে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল।

স্ত্রীকে মাণিকতলায় শ্বশুরবাড়িতে নামাইয়া দিয়া সুরেশ্বর অপুর সহিত কর্পোরেশন স্ট্রীটের এক রেস্তোরাঁয় গিয়া উঠিল। অপুর কথা সব শুনিয়া বলিল—এই পাঁচ বছর ওখানে ছিলে? মন-কেমন করত না দেশের জন্যে?

—Oh, at times I felt so terribly homesick—homesick for Bengal—শেষ দু-বছর দেশ দেখবার জন্য পাগল হয়েছিলুম— ।

ফুটপাত বাহিয়া কয়েকটি ফিরিঙ্গি মেয়ে হাসি কলরব করিতে করিতে পথ চলিতেছে, অপু সাগ্রহে সেদিকে চাহিয়া রহিল। মানুষের গলার সুর মানুষের কাছে এত কাম্যও হয়। রাস্তাভরা লোকজন, মোটর গাড়ি, পাশের একটি একতলা বাড়িতে সাজানো গোছানো ছোট্ট ঘরে কয়েকটি সাহেবের ছেলেমেয়ে ছুটোছুটি করিয়া খেলা করিতেছে—সবই অদ্ভুত সবই সুন্দর বলিয়া মনে হয়। আলোকোজ্জ্বল রেস্তোরাঁটায় অনবরত লোকজন ঢুকিতেছে, বাহির হইতেছে, মোটর হর্নের আওয়াজ, মোটর বাইকের শব্দ, একখানা রিকসা গাড়ি ঠুং ঠুং করিতে করিতে চলিয়া গেল—অপু চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল—যেন এসব সে কখনও দেখে নাই।

সুরেশ্বরকে বলিল—দেখুন জানালার ধারে এসে—ঐ যে নক্ষত্রটা দেখছেন, আজ ক'বছর ধ'রে ওটাকে উঠতে দেখেছি ঘন বন-জঙ্গল-ভরা পাহাড়ের মাথার ওপরে। আজ ওটাকে হোয়াইটওয়ে লেড্‌লর বাড়ির মাথার ওপরে উঠতে দেখে কেমন নতুন নতুন ঠেকছে। এই তো পৌনে দশটা রাত? এ সময় গত পাঁচ বৎসর শুধু, আমি জঙ্গল পাহাড়—আর তৌড়িয়ার ডাক, কখনো কখনো বাঘের ডাকও—। আর কি loneliness! শহরে বসে সে সব বোঝা যাবে না।

সুরেশ্বরও নিজের কথা বলিল। চট্টগ্রাম অঞ্চলে কোন কলেজের অধ্যাপক, বিবাহ করিয়াছে কলিকাতায়। সম্প্রতি শালীর বিবাহ উপলক্ষে আসিয়াছে। বলিল—দ্যাখ ভাই, তোমার ও জীবন একবার আস্বাদ করতে ইচ্ছে হয়—কিন্তু তখন কি জানতুম বিয়ে এমন জিনিস হয়ে দাঁড়াবে? যদি কিছু করতে চাও জীবনে, বিয়ে ক'রো না কখনও, বলে দিলুম। বিয়ে করো নি তো?

অপু হাসিয়া বলিল—ওঃ, আমি ভাবছি আপনার এ লেকচার যদি বৌদি শুনতেন!···

—না না, শোনো। সত্যি বলছি, সে উনিশ-শো পনেরো সালের সুরেশ্বর আর নেই আমি। সংসারের হাড়িকাঠে যৌবন গিয়েছে, শান্তি গিয়েছে, স্বপ্ন গিয়েছে, জীবনটা বৃথা খুইয়েছি—কত কি করবার ইচ্ছে ছিল—ও, যেদিন এম. এ. ডিপ্লোমাটা নিয়ে কনভোকেশন হল থেকে বেরুলাম, মনে আছে মাঘের শেষ, গোলদীঘির দেবদারু গাছে নতুন পাতা গজিয়েছে, সবে দখিনা হাওয়া শুরু হয়েছে, গাউন সমেত এক দোকানে গিয়ে ফটো ওঠালুম, কি খুশী! মনে হ'ল, সারা পৃথিবীটা আমার পায়ের তলায়! ফটোখানা আজও আছে—চেয়ে দেখে ভাবি, কি ছিলুম কি হয়ে দাঁড়িয়েছি! পাড়াগাঁয়ের কলেজে তিন-শো চব্বিশ দিন একই কথা আওড়াই, দলাদলি করি, প্রিন্সিপ্যালের মন যোগাই, স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করি, ছেলেদের ডাক্তার দেখাই, এর মধ্যে মেয়ের বিয়ের ভাবনাও ভাবি—না না, তুমি হেসো না, এসব ঠাট্টা নয়।

অপু বলিল—এত সেণ্টিমেণ্টাল হয়ে পড়লেন কেন হঠাৎ সুরেশ্বরদা—এক পেয়ালা কফি—

—না না, তোমাকে পেয়ে সব বললুম, কারুর কাছে বলি নে, কে বুঝবে, তারা সবাই দেখছে, দিব্যি চাকরি করছি, মাইনে বাড়ছে, তবে তো বেশই আছি। আমি যে মরে যাচ্ছি, তা কেউ বুঝবে না।

রেস্তোরাঁ হইতে বাহির হইয়া পরস্পর বিদায় লইল। অপু বলিল—জানেন তো বলেছে —In each of us a child has lived and a child has died—a child of promise, who never grew up—আচ্ছা, জীবনটা অদ্ভুত জিনিস সুরেশ্বরদা—অত সহজে তাকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আচ্ছা আসি, বড় আনন্দ পেলুম আজ। যখন প্রথম

কলকাতায় পড়তে আসি, জায়গা ছিল না, তখন আপনারা জায়গা দিয়েছিলেন, সে কথা ভুলি নি এখনও।

পরদিন দুপুর পর্যন্ত সে ঘুমাইয়া কাটাইল। বৈকালের দিকে ভবানীপুরে লীলার মামার বাড়ি গেল। অনেক দিন সে লীলার কোন সংবাদ জানে না—দূর হইতে লাল ইঁটের বাড়িটা চোখে পড়িতেই একটা আশা ও উদ্বেগে বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া উঠিল. লীলা এখানে আছে,—না নাই—যদি গিয়া দেখে সে আছে! সেই একদিন দেখা হইয়াছিল অপর্ণার মৃত্যুর পূর্ব্বে। আজ আট বৎসর হইতে চলিল—এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আর কোন দিন দেখা হয় নাই।

প্রথমেই দেখা হইল লীলার ভাই বিমলেন্দুর সঙ্গে। সে আর বালক নাই, খুব লম্বা হইয়া পড়িয়াছে, মুখের চেহারা অন্য রকম দাঁড়াইয়াছে। বিমলেন্দু প্রথমটা যেন অপুকে চিনিতে পারিল না, পরে চিনিয়া বৈঠকখানার পাশের ঘরে লইয়া বসাইল। দু পাঁচ মিনিট এ-কথা ও-কথার পরে অপু যতদূর সম্ভব সহজ স্বরে বলিল—তারপর তোমার দিদির খবর কি—এখানে না শ্বশুরবাড়ি?

বিমলেন্দু কেমন একটা আশ্চর্য্য সুরে বলিল—ও, ইয়ে আসুন আমার সঙ্গে—চলুন।

কেমন একটা অজানা আশঙ্কায় অপুর মন ভরিয়া উঠিল, ব্যাপার কি? একটু পরে গিয়া বিমলেন্দু রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া নীচু স্বরে বলিল—দিদির কথা কিছু শোনেন নি আপনি?

অপু উদ্বিগ্নমুখে বলিল—না—কি? লীলা আছে তো?

—আছেও বটে, নেইও বটে। সে সব অনেক কথা, আপনি ফ্যামিলির ফ্রেন্ড বলে বলছি। দিদি ঘর ছেড়েছে। স্বামী গোড়া থেকেই ঘোর মাতাল—অতি কু-চরিত্র। বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটের এক ইহুদী মেয়েকে নিয়ে বাড়াবাড়ি আরম্ভ ক'রে দিলে—তাকে নিজের বাসাতে রাত্রে নিয়ে যেতে শুরু করলে। দিদিকে জানেন তো? তেজী মেয়ে, এ সব সহ্য করার পাত্রী নয়—সেই রাত্রেই ট্যাক্সি ডাকিয়ে পদ্মপুকুরে চলে আসে নিজের ছোট মেয়েটাকে নিয়ে। মাস দুই পর একদিন দাদাবাবু এল, মেয়েকে সিনেমা দেখাবার ছুতো ক'রে নিয়ে গেল জব্বলপুরে…আর দিদির কাছে পাঠায় না। তারপর দিদি যা করেছে—সে যে আবার দিদি করতে পারত তা কখনও কেউ ভাবে নি। হীরক সেনকে মনে আছে? সেই যে ব্যারিস্টার হীরক সেন, আমাদের এখানে পার্টিতে দেখেছেন অনেকবার। সেই হীরক সেনের সঙ্গে দিদি একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। এক বৎসর কোথায় রইল—আজকাল ফিরে এসেছে, কিন্তু হীরক সেনকে ছেড়েছে। একা আলিপুরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকে। এ বাড়িতে তার নাম আর করার উপায় নেই। মা কাশীবাসিনী হয়েছেন, আর আসবেন না।

কথা শেষ করিয়া বিমলেন্দু নিজেকে একটু সংযত করার জন্যই বোধ হয় একটু চুপ করিয়া রহিল। পরে বলিল,—হীরক সেন কিছু না—এ শুধু তার একটা শোধ তোলা মাত্র, সেন তো শুধু উপলক্ষ। আচ্ছা, তবে আসি অপূর্ব্ববাবু, এখন কিছু দিন থাকবেন তো এখানে?—বিমলেন্দু চলিয়া যায় দেখিয়া অপু কথা খুঁজিয়া পাইল, তাড়াতাড়ি তাহার হাতখানা ধরিয়া অকারণে বলিল—শোনো, শোনো, লীলা আলিপুরে আছে তা হলে?

এ প্রশ্ন সে করিতে চাহে নাই, সে জানে এ প্রশ্নের কোন অর্থ নাই। কিন্তু এক সঙ্গে এত কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছিল—কোন্‌টা সে জিজ্ঞাসা করিবে?

বিমলেন্দু বলিল,—এতে আমাদের যে কি মর্ম্মান্তিক—বর্ত্তমানে আমাদের বাড়ির সেই নিস্তারিণী ঝিকে মনে আছে? সে দিদিকে ছেলেবেলায় মানুষ করেছে, পুজোর সময় বাড়ি গেলুম, সে ভেউ-ভেউ ক'রে কাঁদতে লাগল। সে-বাড়িতে দিদির নাম পর্য্যন্ত করার জো নেই। রমেনদা আজকাল বাড়ির মালিক, বুঝলেন না? দিদিও সুখে নেই, বলবেন না কাউকে,

আমি লুকিয়ে যাই, এত কাঁদে মেয়ের জন্যে। হীরক সেন দিদির টাকাগুলো দু হাতে উড়িয়েছে, আবার বলেছিল বিলেতে বেড়াতে নিয়ে যাবে। সেই লোভ দেখিয়েই নাকি টানে —দিদি আবার তাই বিশ্বাস করত। জানেন তো দিদিরও ঝোঁক আছে, চিরকাল।

বিমলেন্দু চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, অপু আবার গিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল— তুমি মাঝে মাঝে কোন্ সময়ে যাও?—বিমলেন্দু বলিল—রোজ যে যাই তা নয়, বিকেলে দিদি মোটরে বেড়াতে আসে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনের মাঠে, ঐখানে দেখা করি।

বিমলেন্দু চলিয়া গেলে অপু অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটিতে হাঁটিতে রসা রোডে আসিয়া পড়িল—কি ভাবিতে ভাবিতে সে শুধুই হাঁটিতে লাগিল। পথের ধারে একটা পার্ক, ছেলেমেয়েরা খেলা করিতেছে। দড়ি ঘুরাইয়া ছোট মেয়েরা লাফাইতেছে, সে পার্কটায় ঢুকিয়া একটা বেঞ্চের উপর বসিল। লীলার উপর রাগ বা অভিমান কোনটাই হইল না, সে অনুভব করিল, এত ভালবাসে নাই সে কোনদিনই লীলাকে। এই আট বৎসরে লীলা তো তাহার কাছে অবাস্তব হইয়া পড়িয়াছে, তাহার মুখ পর্যন্ত ভাল মনে হয় না, অথচ মনের কোন্ গোপন অন্ধকার কোণে এত ভালবাসা সঞ্চিত হইয়াছিল তাহার জন্য! ভাবিল, ওর দাদামশায়েরই যত দোষ, কে এ বিয়ে দিতে মাথার দিব্যি দিয়েছিল তাঁকে? বেচারী লীলা! সবাই মিলে ওর জীবনটা নষ্ট ক'রে দিলে!

কিছুদিন কলিকাতায় থাকিবার পরে সে বাসা বদলাইয়া অন্য এক বোর্ডিং-এ গিয়া উঠিল। পুরানো দিনের কষ্টগুলো আবার সবই আসিয়া জুটিয়াছে—একা এক ঘরে থাকিবার মত পয়সা হাতে নাই, অথচ দুই-তিনটি কেরানীবাবুর সঙ্গে এক ঘরে থাকা আজকাল তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব মনে হয়। লোক তাঁহারা ভালই, অপুর চেয়ে বয়স অনেক বেশী, সংসারী, ছেলেমেয়ের বাপ। ব্যবহারও তাঁহাদের ভাল। কিন্তু হইলে কি হয়, তাঁহাদের মনের ধারা যে-পথ অবলম্বনে গড়িয়া উঠিয়াছে অপু তাহার সহিত আদৌ পরিচিত নয়। সে নির্জনতা-প্রিয়, একা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে চায়, সেইটাই এখানে হইবার জো নাই। হয়ত সে বৈকালের দিকে বারান্দাটাতে সবে আসিয়া বসিয়াছে—কেশববাবু হুঁকা হাতে পিছন হইতে বলিয়া উঠিলেন—এই যে অপূর্ববাবু, একাটি বসে আছেন? চৌধুরী-ব্রাদার্স বুঝি এখনও অফিস থেকে ফেরেন নি? আজ শোনেন নি বুঝি মোহনবাগানের কাণ্ডটা? আরে রামোঃ —শুনুন তবে—

কলিকাতা তাহার পুরাতন রূপে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। সেই ধুলো, ধোঁয়া, গোলমাল, একঘেয়েমি, সংকীর্ণতা, সব দিনগুলো এক রকমের হওয়া—সেই সব।

সে চলিয়া আসিত না, কিংবা হয়ত আবার এতদিনে চলিয়া যাইত, মুশকিল এই যে, মিঃ রায়চৌধুরীও ওখানকার কাজ শেষ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া একটি জয়েন্টস্টক কোম্পানী গড়িবার চেষ্টায় আছেন, অপুকে তাঁহার অফিসে কাজ দিতে রাজী হইয়াছেন। কিন্তু অপু বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল, গত ছ'বছরের জীবনের পরে আবার কি সে অফিসের ডেস্কে বসিয়া কেরানীগিরি করিতে পারিবে? এদিকে পয়সা ফুরাইয়া আসিল যে! না করিলেই বা চলে কিসে?

সেখানে থাকিতে, এই ছয় বৎসরে যা হইয়াছিল, অপু বোঝে এখানে তা চব্বিশ বৎসরেও হইত না। আর্টের নতুন স্বপ্ন সেখানে সে দেখিয়াছে।

ওখানকার সূর্য্যাস্তের শেষ আলোয়, জনহীন প্রান্তরে, নিস্তব্ধ আরণ্যভূমির মায়ায়, অন্ধকার-ভরা নিশীথ রাত্রির আকাশের নীচে, শালমঞ্জরীর ঘন সুবাসভরা দুপুরের রোদে সে জীবনের গভীর রহস্যময় সৌন্দর্যকে জানিয়াছে।

কিন্তু কলিকাতার মেসে তাহা তো মনে আসে না—সে ছবিকে চিন্তায় ও কল্পনায় গড়িয়া

তুলিতে গভীরভাবে নির্জন চিন্তার দরকার হয়—সেইটাই তাহার হয় না এখানকার মেসজীবনে। সেখানে তাহার নির্জন প্রাণের গভীর, গোপন আকাশে সত্যের যে নক্ষত্রগুলি স্বতঃস্ফূর্ত ও জ্যোতিষ্মান্ হইয়া দেখা দিয়াছিল, এখানকার তরল জীবনানন্দের পূর্ণ জ্যোৎস্নায় হয়ত তাহারা চিরদিনই অপ্রকাশ রহিয়া যাইত।

মনে আছে, সে ভাবিয়াছিল, ঐ সৌন্দর্যকে, জীবনের ঐ অপূর্ব রূপকে সে যতদিন কালি-কলমে বন্দী করিয়া দশজনের চোখের সামনে না ফুটাইতে পারিবে—ততদিন সে কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না—

আর একদিন সেখানে সে কি অদ্ভুত শিক্ষাই না পাইয়াছিল।

ঘোড়া করিয়া বেড়াইতেছিল। এক জায়গায় বনের ধারে ঝোপের মধ্যে অনেক লতাগাছে গা লুকাইয়া একটা তেলাকুচা গাছ। তেলাকুচা বাংলার ফল—অপরিচিত মহলে একমাত্র পরিচিত বন্ধু, সেখানে দাঁড়াইয়া গাছটাকে দেখিতে বড় ভাল লাগিতেছিল।···তেলাকুচা লতার পাতাগুলো সব শুকাইয়া গিয়াছে, কেবল অগ্রভাগে ঝুলিতেছিল একটা আধ-পাকা ফল। তারপর দিনের পর দিন সে ঐ লতাটার মৃত্যু-যন্ত্রনা লক্ষ্য করিয়াছে। ফলটা যতই পাকিয়া উঠিতেছে, বোঁটার গোড়ায় যে অংশ সবুজ ছিল, সেটুকু যতই রাঙা সিঁদুরের রং হইয়া উঠিতেছে, লতাটা ততই দিন দিন হলুদে শীর্ণ হইয়া শুকাইয়া আসিতেছে।

একদিন দেখিল, গাছটা সব শুকাইয়া গিয়াছে, ফলটাও বোঁটা শুকাইয়া গাছে ঝুলিতেছে, তুলতুলে পাকা, সিঁদুরের মত টুকটুকে রাঙা—যে কোন পাখি, বানর কি কাঠাবেড়ালীর অতি লোভনীয় আহার্য। যে লতাটা এতদিন ধরিয়া ন' কোটি মাইল দূরের সূর্য হইতে তাপ সংগ্রহ করিয়া, চারিপাশের বায়ুমণ্ডল হইতে উপাদান লইয়া মৃত, জড়পদার্থ হইতে এ উপাদেয় খাবার তৈয়ারী করিয়াছিল, তাহার জীবনের উদ্দেশ্য শেষ হইয়া গিয়াছে—ঐ পাকা টক্‌টকে ফলটাই তাহার জীবনের চরম পরিণতি! ফলটা পাখিতে কাঠবেড়ালীতে খাইবে, এজন্য গাছটাকে তাহারা ধন্যবাদ দিবে না; তেলাকুচা লতাটা অজ্ঞাত, অখ্যাতই থাকিয়া যাইবে। তবুও জীবন তাহার সার্থক হইয়াছে—ঐ টুক্‌টুকে ফলটাতে ওর জীবন সার্থক হইয়াছে। যদি ফলটা কেউ না-ই খায়, তাহাতেও ক্ষতি নাই, মাটিতে ঝরিয়া পড়িয়া আরও কত তেলাকুচার জন্ম ঘোষণা করিবে, আরও কত লতা, কত ফুল-ফল, কত পাখির আহার্য।

মন তখন ছিল অদ্ভুত রকমের তাজা, সবল, গ্রহণশীল, সহজ আনন্দময়। তেলাকুচা-লতার এই ঘটনাটা তাহার মনে বড় ধাক্কা দিয়াছিল—সে কি ঐ সামান্য বন-ঝোপের তেলাকুচা-লতাটার চেয়েও হীন হইবে?···তাহার জীবনের কি উদ্দেশ্য নাই? সে জগতে কি কিছু দিবে না?

সেখানে কতদিন শালবনের ছায়ায় পাথরের উপর বসিয়া দুপুরে এ প্রশ্ন মনে জাগিয়াছে! ···কত নিস্তব্ধ তারাভরা রাত্রে গভীর বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাঁবুর বাহিরের ঘন নৈশ অন্ধকারের দিকে চাহিয়া চাহিয়া এই সব স্বপ্নই মনে জাগিত। বহু দূরে, দূর ভবিষ্যতে শিরীষফুলের পাপড়ির মত নরম ও কচি-মুখ কত শত অনাগত বংশধরদের কথা মনে পড়িত, খোকার মুখখানা কি অপূর্ব প্রেরণা দিত সে সময়!—ওদেরও জীবনে কত দুঃখরাত্রের বিপদ আসিবে, কত সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইবে—তখন যুগান্তের এপার হইতে দৃঢ়হস্ত বাড়াইয়া দিতে হইবে তোমাকে—তোমার কত শত বিনিদ্র রজনীর মৌন জনসেবা, হে বিস্মৃত পথের মহাজন পথিক, একদিন সার্থক হইবে—অপরের জীবনে।

দুঃখের নিশীথে তাহার প্রাণের আকাশে সত্যের যে নক্ষত্ররাজি উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে—তা সে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যাইবে, জীবনকে সে কি ভাবে দেখিল তাহা লিখিয়া রাখিয়া যাইবে—

নিজের প্রথম বইখানির দিনে দিনে প্রবর্ধমান পাণ্ডুলিপিকে সে সস্নেহ প্রতীক্ষার চোখে দেখে—বইয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত কথা তাহার আগ্রহভরা বক্ষস্পন্দনে আশা, আনন্দের সঙ্গীত জাগায়—মা যেমন শিশুকে চোখের সম্মুখে কান্নাহাসির মধ্য দিয়া বাড়িতে দেখেন, দুরু দুরু বক্ষে তাহার ভবিষ্যতের কথা ভাবেন—তেমনি।

বই-লেখার কষ্টটুকু করার চেয়ে বইয়ের কথা ভাবিতে ভাল লাগে। কাদের কথা বইয়ে লেখা থাকিবে?—কত লোকের কথা। গরীবদের কথা। ওদের কথা ছাড়া লিখিতে ইচ্ছা হয় না।

পথে ঘাটে, হাটে, গ্রামে, শহরে, রেলে কত অদ্ভুত ধরণের লোকের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়াছে জীবনে—কত সাধু-সন্ন্যাসী, দোকানী, মাস্টার, ভিখারী, গায়ক, পুতুল-নাচওয়ালা, আম-পাড়ানি, ফেরিওয়ালা, লেখক, কবি, ছেলে-মেয়ে—এদের কথা।

আজিকার দিন হইতে অনেক দিন পরে—হয়তো শত শত বৎসর পরে তাহার নাম যখন এ-বছরের-ফোটা-শালফুলের মঞ্জরীর মত—কিংবা তাহার ঘরের কোণের মাকড়সার জালের মত—কোথায় মিলাইয়া যাইবে, তখন তাহার কত অনাগত বংশধর কত সকালে সন্ধ্যায়, মাঠে, গ্রাম্য নদীতীরে, দুঃখের দিনে, শীতের সন্ধ্যায় অথবা অন্ধকার গহন নিস্তব্ধ দুপুর রাত্রে, শিশিরভেজা ঘাসের উপর তারার আলোর নীচে শুইয়া-শুইয়া তাহার বই পড়িবে—কিংবা বইয়ের কথা ভাবিবে।

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত আশঙ্কাও জাগে। যদি কেউ না পড়ে? আবার ভাবে, পৃথিবীর কোন্ অতীতে আদিম যুগের শিল্পীদল দুর্গম গিরিগুহার অন্ধকারে বৃষ, বাইসন, ম্যামথ আঁকিয়া গিয়াছিল—প্রাচীনদিনের বিস্মৃত প্রতিভা এতকাল পর তাহার দাবি আদায় করিতেছে—নতুবা ক্যাণ্টাব্রিয়া, দর্দঞ্ ও পিরেনিজের পর্বতগুহাগুলায় দেশবিদেশের মনীষী ও ভ্রমণকারীদের এত ভিড় কিসের? তেলাকুচা লতাটা শুকাইয়া গিয়াছে; কিন্তু সে জীবন দিয়া ফলটাকে মানুষ করিয়া গিয়াছে যে! আত্মদানের ফল বৃথা যাইবে না। কত গাছ গজাইবে ওর বীজে—

নিজের প্রথম বইখানি—মনে কত চিন্তাই আসে। অনভিজ্ঞ মন সবতাতেই অবাক হইয়া যায়, সবতাতেই গাঢ় পুলক অনুভব করে।

এই তাহার বই লেখার ইতিহাস।

কিন্তু প্রথম ধাক্কা খাইল বইখানার পাণ্ডুলিপি হাতে দোকানে দোকানে ঘুরিয়া। অজ্ঞাত-নামা লেখকের বই কেহ লওয়া দূরে থাকুন, ভাল করিয়া কথাও বলে না। একটা দোকানে খাতা রাখিয়া যাইতে বলিল। দিন পাঁচেক পরে তাহাদের একখানা পোস্টকার্ড পাইয়া অপু ভাল কাপড় পরিয়া, জুতা বুরুশ করিয়া বন্ধুর চশমা ধার করিয়া দুরু দুরু বক্ষে সেখানে গিয়া হাজির হইল। অত ভাল বই তাহার—পড়িয়া হয়ত উহারা অবাক হইয়া গিয়াছে।

দোকানের মালিক প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিল না, পরে চিনিয়া বলিল—ও! ওহে সতীশ, এঁর সেই খাতাখানা এঁকে দিয়ে দাও তো—বড় আলমারির দেরাজে দেখো।

অপুর কপাল ঘামিয়া উঠিল। খাতা ফেরত দিতে চায় কেন? সে বিবর্ণ মুখে বলিল—আমার বইখানা কি—

না। নতুন লেখকের বই নিজের খরচে তাহারা ছাপাইবে না। তবে যদি সে পাঁচ শত টাকা খরচ দেয়, তবে সে অন্য কথা। অপু অত টাকা কখনও এক জায়গায় দেখে নাই।

পরদিন সকালে বিমলেন্দু অপুর বাসায় আসিয়া হাজির। বৈকালে পাঁচটার সময় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনের মাঠে লীলা আসিবে, বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছে

তাহাকে লইয়া যাইতে।

বৈকালে বিমলেন্দু আবার আসিল। দু'জনে মাঠে ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করিবার পর বিমলেন্দু একটা হলদে রঙের মোটর দেখাইয়া বলিল, ঐ দিদি আসছে—আসুন, গাছতলায় গাড়ি পার্ক করবে, এখানে ট্র্যাফিক পুলিশে আজকাল বড় কড়াকড়ি করে।

অপুর বুক ঢিপ্-ঢিপ্ করিতেছিল। কি বলিবে, কি বলিবে সে লীলাকে?

বিমলেন্দু আগে আগে, অপু পিছনে পিছনে। লীলা গাড়ি হইতে নামে নাই, বিমলেন্দু গাড়ির জানালার কাছে গিয়া বলিল,—দিদি, অপূর্ববাবু এসেছেন, এই যে।—পরক্ষণেই অপু গাড়ির পাশে দাঁড়াইয়া হাসিমুখে বলিল—এই যে, কেমন আছ, লীলা?

সত্যই অপূর্ব্ব সুন্দর। অপুর মনে হইল, যে-কবি বলিয়াছেন, সৌন্দর্য্যই একটা মহৎ গুণ, যে সুন্দর তাহার আর কোন গুণের দরকার হয় না, তিনি সত্যদর্শী, অক্ষরে অক্ষরে তাঁহার উক্তি সত্য।

তবুও আগের লীলা নাই, একটু মোটা হইয়া পড়িয়াছে, মুখের সে তরুণ লাবণ্য আর কই? মুখের পরিণত সৌন্দর্য্য ঠিক তাহার মা মেজবৌরানীর এ বয়সে যাহা ছিল তাই, সেই ছেলেবেলায় বর্দ্ধমানের বাটীতে দেখা মেজবৌরানীর মুখের মত। উদ্দাম লালসামাখা সৌন্দর্য্য নয়—শান্ত, বরং যেন কিছু বিষন্ন।

বাড়ির বাহির হইয়া গিয়াছে যে-মেয়ে, তাহার ছবির সঙ্গে অপু কিছুতেই এই বিষন্ন-নয়না দেবীমূর্ত্তিকে খাপ খাওয়াইতে পারিল না। লীলা ব্যস্ত হইয়া হাসিমুখে বলিল—এসো, অপূর্ব্ব এসো। তুমি তো আমাদের ভুলেই গিয়েচ একেবারে। উঠে এসে বসো। চলো, তোমাকে একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসি। শোভা সিং, লেক—

লীলা মধ্যে বসিল, ও-পাশে বিমলেন্দু, এ-পাশে অপু, অপুর মনে পড়িল বাল্যকাল ছাড়া লীলার এত কাছে সে আর কখনও বসে নাই। বার বার লীলার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। এতকাল পরে লীলাকে আবার এত কাছে পাইয়াছে—বার বার দেখিয়াও যেন তৃপ্তি হইতেছিল না। লীলা অনর্গল বকিতেছিল, নানারকম মোটরগাড়ির তুলনামূলক সমালোচনা করিতেছিল, মাঝে মাঝে অপুর সম্বন্ধে এটা-ওটা প্রশ্ন করিতেছিল। লেক দেখিয়া অপু কিন্তু নিরাশ হইল। সে মনে মনে ভাবিল—এই লেক! এরই এত নাম! এ কলকাতার বাবুদের ভাল লাগতে পারে—ভারী তো! লীলা আবার এরই এত সুখ্যাতি করছিল—আহা, বেচারী কলকাতা ছেড়ে বিশেষ কোথাও তো যায় নি!—লীলা পাছে অপ্রতিভ হয় এই ভয়ে সে নিজের মতটা আর ব্যক্ত করিল না। একটা নারিকেল গাছের তলায় বেঞ্চি পাতা—সেখানে দু'জনে বসিল। বিমলেন্দু মোটর লইয়া লেক ঘুরিতে গেল। লীলা হাসিমুখে বলিল—তারপর, তুমি নাকি দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলে?

—তোমার শ্বশুরবাড়ির দেশে গিয়েছিলুম—জব্বলপুরের কাছে।—বলিয়া ফেলিয়া অপু ভাবিল কথাটা বলা ভাল হয় নাই, হয়তো লীলার মনে কষ্ট হইবে—ছিঃ—

কথাটা ঘুরাইয়া ফেলিয়া বলিল—আচ্ছা ঐ দ্বীপ-মতন ব্যাপারগুলো—ওতে যাবার পথ নেই···

—সাঁতার দিয়ে যাওয়া যায়। তুমি তো ভালো সাঁতার জানো—না? ও-সব কথা যাক—এতদিন কোথায় ছিলে, কি করছিলে বলো। তোমাকে দেখে আজ এত খুশী হয়েছি।···আমার বাসায় এসো আলিপুরে—চা খাবে। একটু তামাটে রঙ হয়েছে, কেন? ···রোদে ঘুরে ঘুরে বুঝি—আচ্ছা, আমার কথা তোমার মনে ছিল?

অপু একটু হাসিল। কোন নাটুকে ধরণের কথা সে মুখে বলিতে পারে না। আর এই সময়েই যত মুখচোরা রোগ আসিয়া জোটে! কতকাল পরে তো লীলাকে একা কাছে

পাইয়াছে—কিন্তু মুখে কথা যোগায় কৈ?…কত কথা লীলাকে বলিবে ভাবিয়াছিল—এখন লীলাকে কাছে পাইয়া সে-সব কথা মুখ দিয়া তো বাহির হয়ই না—বরং নিতান্ত হাস্যকর বলিয়া মনে হয়।

হঠাৎ লীলা বলিল—হ্যাঁ ভালো কথা, তুমি নাকি বই লিখেছ? একদিন আমাকে দেখাবে না, কি লিখলে? আমি জানি তুমি একদিন বড় লেখক হবে, তোমার সেই ছেলেবেলার গল্প লেখার কথা মনে আছে? তখন থেকেই জানি।

পরে সে একটা প্রস্তাব করিল। বিমলেন্দুর মুখে সে সব শুনিয়াছে, বইওয়ালারা বই লইতে চায় না—ছাপাইতে কত খরচ পড়ে? এ বই ছাপাইয়া বাহির করিবার সমুদয় খরচ দিতে সে রাজী।

অপ্রত্যাশিত আনন্দে অপুর সারা শরীরে যেন একটা বিদ্যুতের ঢেউ খেলিয়া গেল। সব খরচ! যত লাগে! তবুও আজ সে মুখে কিছু বলিল না।

অপুর মনে লীলার জন্য একটা করুণা ও অনুকম্পা জাগিয়া উঠিল, ঠিক পুরাতন দিনের মত। লীলারও কত আশা ছিল আর্টিস্ট হইবে, ছবি আঁকিবে, অনভিজ্ঞ তরুণ বয়সে তাহারই মত কত কি স্বপ্নের জাল বুনিত। এখন শুধু নতুন নতুন মোটরগাড়ি কিনিতেছে, সাহেবী দোকানে লেস কিনিয়া বেড়াইতেছে—পুরাতন দিনের যজ্ঞবেদীতে আগুন কই, নিভিয়া গিয়াছে। যজ্ঞ কিন্তু অসমাপ্ত। কৃপার পাত্র লীলা! অভাগিনী লীলা!

ঠিক সেই পুরাতন দিনের মত মনটি আছে কিন্তু। তাহাকে সাহায্য করিতে মায়ের-পেটের-মমতাময়ী-বোনের মতই হাত বাড়াইয়া দিয়াছে অমনি। আশৈশব তাহার বন্ধু… তাহার সম্বন্ধে অন্ততঃ ওর মনের তারটি খাঁটি সুরেই বাজিল চিরদিন। এখানেও হয়ত করুণা, মমতা, অনুকম্পা—ওদেরই বাড়িতে না তাহার মা ছিল রাঁধুনী, কে জানে হয়তো কোন্ শুভ মুহূর্তে তাহার হীনতা, দৈন্য, অসহায় বাল্যজীবন, বড়লোকের মেয়ে লীলার কোমল বাল্য-মনে ঘা দিয়াছিল, সহানুভূতি, করুণা, মমতা জাগাইয়াছিল। সকল সত্যকার ভালবাসার মশলা এরাই—এরা যেখানে নাই, ভালবাসা সেখানে মাদকতা আনিতে পারে, মোহ আনিতে পারে, কিন্তু চিরস্থায়িত্বের স্নিগ্ধতা আনে না।

সে ভাবিল, লীলার মনটা ভাল বলে সেই সুযোগে সবাই ওর টাকা নিচ্ছে। ও বেচারী এখনও মনে সেই ছেলেমানুষটি আছে—আমি ওকে exploit করতে পারব না। দরকার নেই আমার বই-ছাপানোয়।

এদিকে মুশকিল। হাতের টাকা ফুরাইল। চাকুরিও জোটে না।

মিঃ রায়চৌধুরী অনবরত ঘুরাইতে ও হাঁটাইতে লাগিলেন। অপু যেখানে ছিল সেখানে আবার এঁরা ম্যাঙ্গানিজের কাজ আরম্ভ করিয়াছেন, অপু ধরিয়া পড়িল তাহাকে আবার সেখানে পাঠানো হউক। অনেকদিন ঘোরানোর পর মিঃ রায়চৌধুরী একদিন প্রস্তাব করিলেন, সে আরও কম টাকা বেতনে সেখানে যাইতে রাজী আছে কি না? অপমানে অপুর চোখে জল আসিল, মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। একথা বলিতে উঁহারা আজ সাহস করিল শুধু এইজন্য যে, উঁহারা জানে যতই কমে হউক না কেন সে সেখানে ফিরিয়া যাইতে রাজী হইবে। অর্থের জন্য নয়—অর্থের জন্য এ অপমান সে সহ্য করিবে না নিশ্চয়।

কিন্তু…

শরতের প্রথম—নিচের অধিত্যকায় প্রথম আবলুস ফল পাকিতে শুরু করিয়াছে বটে, কিন্তু মাথার উপরে পর্বতসানুর উচ্চস্থানে এখনও বর্ষা শেষ হয় নাই। টেঁপারী বনে এখনও ফল পাকিয়া হলুদে হইয়া আছে, ভালুক-দল এখনও সন্ধ্যার পরে টেঁপারী খাইতে

নামে, টিয়া পাখির ঝাঁক সারাদিন কলরব করে, আরও উপরে যেখান হইতে বাদাম ও সেগুন বনের শুরু, সেখানে অজস্র সাদা মাঞ্জুফল, আরও উপরে রিঠাগাছে থোলো-থোলো ফুল ধরিয়াছে, এমন কি ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিলে দু-একটা রিঠাগাছে এখনও দু এক ঝাড় দেরিতে-ফোটা রিঠা ফুলও পাওয়া যাইতে পারে।

সেখানকার সেই বিরাট রুক্ষ অরণ্যভূমি, নক্ষত্রালোকিত আলো-আঁধার, উদার জনহীন, বিশাল তৃণভূমি সেই টানা একঘেয়ে পশ্চিমে হাওয়া, সেই অবাধ জ্যোৎস্না, স্বাধীনতা, প্রসারতা, সেই বিরাট নিস্তব্ধতা তাহাকে আবার ডাকিতেছে।

এক এক সময় তাহার মনে হয় কানাডায়, অস্ট্রেলিয়ায়, নিউজিল্যাণ্ডে, আফ্রিকায় মানুষ প্রকৃতির এই মুক্ত সৌন্দর্য্যকে ধ্বংস করিতেছে সত্য, গাছপালাকে দূর করিয়া দিতেছে বটে, কিন্তু প্রকৃতি একদিন প্রতিশোধ লইবে। ট্রপিকস্-এর অরণ্য আবার জাগিবে, মানুষকে তাহারা তাড়াইবে, আদিম অরণ্যানী আবার ফিরিবে। ধরাবিদ্রাবণকারী সভ্যতাদর্পী মানুষ যে স্থানে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে, পর্ব্বতমালার নাম দিয়াছে নিজের দেশের রাজার নামে, হ্রদের নাম দিয়াছে রাজমন্ত্রীর নামে; ওর শুশুক, পাখি, শিল, বল্‌গা-হরিণ, ভালুককে খুন করিয়াছে—তেল, বসা, চামড়ার লোভে, ওর মহিমময় পাইন অরণ্য ধূলিসাৎ করিয়া কাঠের কারখানা খুলিয়াছে, এ সবের প্রতিশোধ একদিন আসিবে।

এ যেন এমন একটা শক্তি যা বিপুল, বিশাল, বিরাট। অসীম ধৈর্য্যের ও গাম্ভীর্য্যের সহিত সে সংহত শক্তিতে চুপ করিয়া অপেক্ষা করিতেছে, কারণ সে জানে তাহার নিজ শক্তির বিপুলতা। অপু একবার ছিন্দওয়ারার জঙ্গলে একটা খনির সাইডিং লাইন তৈরি হওয়ার সময়ে আরণ্যভূমির তপস্যাস্তব্ধ, দূরদর্শী রুদ্রদেবের মত মৌন, এই গম্ভীর ভাব লক্ষ্য করিয়াছিল। ঐ শক্তিটা ধীরভাবে শুধু সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছে মাত্র।

অপুর কিন্তু চাকরি হইল না। এবার একা মিঃ রায়চৌধুরীর হাত নয়। জয়েণ্ট-স্টক কোম্পানীর অন্যান্য ডাইরেক্টররা নাকি রাজী হইল না। হয়ত বা তাহারা ভাবিল, এ-লোকটার সেখানে ফিরিবার এত আগ্রহ কেন? পুরানো লোক, চুরির সুলুক-সন্ধান জানে, সেই লোভেই যাইতেছে। তা ছাড়া ডাইরেক্টররাও মানুষ, তাহাদেরও প্রত্যেকেরই বেকার ভাগনে, ভাইপো, শালীর ছেলে আছে।

সে ভাবিল, চাকরি না হয়, বইখানা বাহির করিয়া দেখিবে চলে কিনা। মাসিক পত্রিকায় দু-একটা গল্পও দিল, একটা গল্পের বেশ নাম হইল, কিন্তু টাকা কেহ দিল না। হঠাৎ তাহার মনে হইল অপর্ণার গহনাগুলি শ্বশুরবাড়িতে আছে, সেগুলি সেখান হইতে এই সাত-আট বৎসর সে আনে নাই। সেগুলি বেচিয়া তো বই বাহির করার খরচ যোগাড় হইতে পারে! এই সহজ উপায়টা কেন এতদিন মাথায় আসে নাই?

সে লীলার কাছে আরও কয়েকবার গেল, কিন্তু কথাটা প্রকাশ করিল না। উপন্যাসের খাতাখানা লইয়া গিয়া পড়িয়া শোনাইল। লীলা খুব উৎসাহ দেয়। একদিন লীলা হিসাব করিতে বসিল বই ছাপাইতে কত লাগিবে। অপু ভাবিল—অন্য কেউ যদি দিত হয়ত নিতুম, কিন্তু লীলা বেচারীর টাকা নেব না।

একদিন সে হঠাৎ খবরের কাগজে তাহার সেই কবিরাজ বন্ধুটির ঔষধের দোকানের বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইল। সেইদিনই সন্ধ্যার পর সে ঠিকানা খুঁজিয়া সেখানে গেল, সুকিয়া স্ট্রীটের একটা গলিতে দোকান। বন্ধুটি বাহিরেই বসিয়া ছিল, দেখিয়া বলিয়া উঠিল—বাঃ তুমি! তুমি বেঁচে আছ দাদা?

অপু হাসিয়া বলিল—উঃ, কম খুঁজি নি তোমায়! ভাগ্যিস্ আজ তোমার শিল্পাশ্রমের

বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ল, তাই তো এলুম। তারপর কি খবর বল? দোকানের আসবাবপত্র দেখে মনে হচ্ছে, অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছ!

বন্ধু খানিকটা চুপ করিয়া রহিল। খানিকটা এ-গল্প ও-গল্প করিল। পরে বলিল—এসো, বাসায় এসো।

ছোট সাদা রঙের দোতলা বাড়ি, নীচের উঠানে একটা টিনের শেডের তলায় আট-দশটি লোক কি সব জিনিস প্যাক্ করিতেছে, লেবেল আঁটিতেছে, অন্যদিকে একটা কল ও চৌবাচ্চা, আর একটা টিনের শেডে গুদাম। উপরে উঠিয়াই একটা মাঝারি হলঘর, দু'পাশে দু'টা ছোট-ছোট ঘর, বেশ সাজানো। একটা সেঠ্ টমাসের বড় ক্লক ঘড়ি দালানে টকটক করিতেছে। বন্ধু ডাকিয়া বলিল—ওরে বিন্দু, শোন, তোর মাকে বল, এক্ষুনি দু'পেয়ালা চা দিতে।

অপু উৎসুকভাবে বলিল—তার আগে একবার-বৌঠাকরুণের সঙ্গে দেখাটা করি—বিন্দুকে বল তাঁকে এদিকে একবার আসতে বলতে? না কি, এখন অবস্থা ফিরেছে বলে তিনি আর আমার সঙ্গে দেখা করবেন না?

কবিরাজ বন্ধু ম্লানমুখে চুপ করিয়া রহিল—পরে নিম্নস্বরে অনেকটা যেন আপন মনেই বলিল—সে আর তোমার সঙ্গে দেখা করবে না ভাই। তাকে আর কোথায় পাবে? রমলা আর সে দুজনেই ফাঁকি দিয়েছে!

অপু অবাক মুখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

—এ মাঘে রমলা গেল, পরের শ্রাবণে সে গেল। ওঃ, সে কি সোজা কষ্ট গিয়েছে ভাই? তখন ওদিকে কাবুলীর দেনা, এদিকে মহাজনের দেনা—বাড়িতে যমে-মানুষে টানাটানি চলেছে। তোমার কথা কত বলত। এই শ্রাবণে পাঁচ বচ্ছর হয়ে গিয়েছে। তারপর বিয়ে করব, না, করব না,—আজ বছর তিনেক হ'ল বদ্যিবাটীতে—

তারপর বন্ধুর কথায় নতুন-বৌ চা ও খাবার লইয়া অপুর সামনেই আসিল। শ্যামবর্ণ, স্বাস্থ্যবতী, কিশোরী মেয়েটি, চোখ মুখ দেখিয়া মনে হয় খুব চট্‌পটে, চতুর। খাবার খাইতে গিয়া খাবারের দলা যেন অপুর গলায় আটকাইয়া যায়। বন্ধুটি নিজের কোন্ কালির বড়ি ও পাতা চায়ের প্যাকেটের খুব বিক্রি ও ব্যবসায়ের দিক হইতে এ-দুটি দ্রব্যের সাফল্যের গল্প করিতেছিল।

উঠিবার সময় বাহিরে আসিয়া অপু জিজ্ঞাসা করিল—নতুন বৌটি দেখতে তো বেশ, এ-দিকেও বেশ গুণবতী, না?

—মন্দ না। কিন্তু বড় মুখরা ভাই। আগের তাকে তো জানতে? সে ছিল ভাল মানুষ। এর পান থেকে চুন খসলেই —কি করি ভাই, আমার ইচ্ছে ছিল না যে আবার—

ফুটপাথে একা পড়িয়াই অপুর মনে পড়িল, পটুয়াটোলার সেই খোলার বাড়ির দরজার প্রদীপ হাতে হাস্যমুখী, নিরাভরণা, দরিদ্র গৃহলক্ষ্মীকে—আজ ছ'বছর কাটিয়া গেলেও মনে হয় যেন কালকার কথা!

একবিংশ পরিচ্ছেদ

কাজল বড় হইয়া উঠিয়াছে, আজকাল গ্রামের সীতানাথ পণ্ডিত সকালে একবেলা করিয়া পড়াইয়া যান, কিন্তু একটু ঘুমকাতুরে বলিয়া সন্ধ্যার পরে দাদামশাইয়ের অনেক বকুনি সত্ত্বেও সে পড়িতে পারে না, চোখের পাতা যেন জড়াইয়া আসে, অনেক সময় যেখানে-সেখানে ঘুমাইয়া পড়ে—রাত্রে কেহ যদি ডাকিয়া খাওয়ায়, তবেই খাওয়া হয়। তা ছাড়া, বেশী রাত্রে খাইতে হইলে দাদামশায়ের সঙ্গে বসিয়া খাইতে হয়—সে এক বিপদ।

দাদামশায়ের সহিত পারতপক্ষে কাজল খাইতে বসিতে চাহে না। বড় ভাত ফেলে, ছড়ায় —গুছাইয়া খাইতে জানে না বলিয়া দাদামশায় তাকে খাইতে বসিয়া সহবৎ শিক্ষা দেন।

কাজল আলুভাতে দিয়া শুকনা ভাত খাইতেছে—দাদামশায় হাঁকিয়া বলিলেন—ডাল দিয়ে মাখো—শুধু ভাত খাচ্ছো কেন?—মাখো—মেখে খাও—

তাড়াতাড়ি কম্পিত ও আনাড়ী হাতে ডাল মাখিতে গিয়া থালার কানা ছাড়াইয়া কিছু ডাল-মাখা ভাত মাটিতে পড়িয়া গেল। দাদামশায় ধমক দিয়া উঠিলেন—পড়ে গেল, পড়েগেল—আঃ, ছোঁড়া ভাতটা পর্যন্ত যদি গুছিয়ে খেতে জানে!—তোল্ তোল্—খুঁটে খুঁটে তোল্—

কাজল ভয়ে ভয়ে মাটি-মাখা ভাতগুলি থালার পাশ হইতে আবার থালায় তুলিয়া লইল।

—বেগুন পটোল ফেলছিস্ কেন?—ও খাবার জিনিস না?—সব একসঙ্গে মেখে নে—

খানিকটা পরে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, কাজল উচ্ছেভাজা খায় নাই—তখন অম্বল দিয়া খাওয়া হইয়া গিয়াছে—তিনি বলিলেন—উচ্ছেভাজা খাসনি? খাও—ও অম্বলমাখা ভাত ঠেলে রাখো। উচ্ছেভাজা তেতো বলিয়া কাজলের মুখে ভালো লাগে না—সে তাতে হাতও দেয় নাই। দাদামশায়ের ভয়ে অম্বল-মাখা ভাত ঠেলিয়া রাখিয়া তিক্ত উচ্ছেভাজা একটি একটি করিয়া খাইতে হইল—একখানি ফেলিবার জো নাই—দাদামশায়ের সতর্ক দৃষ্টি। ভাত খাইবে কি কান্নায় কাজলের গলায় ভাতের দলা আটকাইয়া যায়। খাওয়া হইয়া গেলে মেজ মামীমার কাছে গিয়া বলিয়া কহিয়া একটা পান লয়—পান খুলিয়া দেখে কি কি মশলা আছে, পরে মিনতির সুরে একবার মেজমামীমার কাছে, একবার ছোট মামীমার কাছে বলিয়া বেড়ায়—ইতি একটু কাৎ, ও মামীমা তোমার পায়ে পড়ি—একটু কাৎ দাও না—। কাঠ অর্থাৎ দারুচিনি। মামীমারা ঝংকার দিয়ে বলেন—রোজ রোজ ডালচিনি চাই—ছেলে আবার শৌখিন কত!...উঃ, তায় আবার জিব দেখা চাই—মুখ রাঙা হ'ল কিনা—

তবে পড়াশুনার আগ্রহ তাহার বেশী ছাড়া কম নয়। বিশ্বেশ্বর মুহুরীর হাতবাক্সে কেশরঞ্জনের উপহারের দরুন গল্পের বই আছে অনেকগুলি। খুনী আসামী কেমন করিয়া ধরা পড়িল, সেই সব গল্প। আর পড়িতে ইচ্ছা করে আরব্য উপন্যাস, কি ছবি! কি গল্প। দাদামশায়ের বিছানার উপর একদিন পড়িয়া ছিল—সে উল্টাইয়া দেখিতেছে, টের পাইয়া বিশ্বেশ্বর মুহুরী কাড়িয়া লইয়া বলিল, এঃ, আট বছরের ছেলের আবার নবেল পড়া? এইবার একদিন তোমার দাদামশায় শুনতে পেলে দেখো কি করবে।

কিন্তু বইখানা কোথায় আছে সে জানে—দোতলায় শোবার ঘরের সেই কাঁঠালকাঠের সিন্দুকটার মধ্যে—একবার যদি চাবিটা পাওয়া যাইত! সারারাত জাগিয়া পড়িয়া ভোরের আগেই তাহা হইলে তুলিয়া রাখে।

এ কয়েকদিন বৈকালে দাদামশায় বসিয়া বসিয়া তামাক খান, আর সে পণ্ডিতমশায়ের কাছে বসিয়া বসিয়া পড়ে। সেই সময় পণ্ডিতমশায়ের পেছনকার অর্থাৎ চণ্ডীমণ্ডপের উত্তরধারের সমস্ত ফাঁকা জায়গাটা অদ্ভুত ঘটনার রঙ্গভূমিতে পরিণত হয়, ঘটনাটাও হয়ত খুব স্পষ্ট নয়, সে ঠিক বুঝাইয়া বলিতে তো পারে না! কিন্তু দিদিমার মুখে শোনা নানা গল্পের রাজপুত্র ও পাত্রের পুত্রেরা নাম-না-জানা নদীর ধারে ঠিক অই সন্ধ্যাবেলাটাতেই পৌঁছায়—কোন্ রাজপুরীকে কাঁপাইয়া রাজকন্যাদের সোনার রথ বৈকালের আকাশপানে উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়—সে অন্যমনস্ক হইয়া দেওয়ালের পাশে ঝুঁকিয়া আকাশটার দিকে চাহিয়া থাকে, কেমন যেন দুঃখ হয়—ঠিক সেই সময় সীতানাথ পণ্ডিত বলেন—দেখুন, দেখুন, বাঁড়ুয্যেমশায়, আপনার নাতির কাণ্ডটা দেখুন, শ্লেটে খড়কে লিখতে দিলাম, তা গেল চুলোয়—হাঁ করে তাকিয়ে কি দেখছে দেখুন—এমন অমনোযোগী ছেলে যদি—

দাদামশায় বলেন—দিন না ধাঁ করে এক থাপ্পড় বসিয়ে গালে—হতভাগা ছেলে

কোথাকার—হাড় জ্বালিয়েছে, বাবা করবে না খোঁজ, আমার ঘাড়ে এ বয়সে যত ঝুঁকি।

তবে কাজল যে দুষ্টু হইয়া উঠিয়াছে, এ কথা সবাই বলে। একদণ্ড সুস্থির নয়, সর্বদা চঞ্চল, একদণ্ড চুপ করিয়া থাকে না, সর্বদা বকিতেছে। পণ্ডিতমশায় বলেন—দেখ্ তো দলু কেমন অংক কষে? ওর মধ্যে অনেক জিনিস আছে—আর তুই অংকে একেবারে গাধা। —পণ্ডিত পিছন ফিরিলেই কাজল মামাতো-ভাই দলুকে আঙুল দিয়া ঠেলিয়া চুপিচুপি বলে, —তো-তোর মধ্যে অনেক জিনিস আছে, কি জিনিস আছে রে, ভাত-ডাল খি-খিচুড়ি··· খিচুড়ি? হি-হি ইল্লি! খিচুড়ি খাবি, দলু?

দাদামশায়ের কাছে আবার নালিশ হয়।

তখন দাদামশায় ডাকিয়া শাস্তিস্বরূপ বানান জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করেন—বানান কর সূর্য্য। কাজল বানানটা জানে, কিন্তু ভয়জনিত উত্তেজনার দরুন হঠাৎ তাহার তোতলামিটা বেশী করিয়া দেখা দেয়—দু'একবার চেষ্টা করিয়াও 'দন্ত্য স' কথাটা কিছুতেই উচ্চারণ করিতে পারিবে না বুঝিয়া অবশেষে বিপন্নমুখে বলে—তা-তালব্য শয়ে দীর্ঘ-উকার—

ঠাস্ করিয়া চড় গালে। ফরসা গাল, তখনই দাড়িমের মত রাঙা হইয়া ওঠে, কান পর্যন্ত রাঙা হইয়া যায়। কাজলের ভয় হয় না, একটা নিষ্ফল অভিমান হয়—বাঃ রে, বানানটা তো সে জানে, কিন্তু মুখে যে আটকাইয়া যায় তা তার দোষ কিসের? কিন্তু মুখে অত কথা বলিয়া বুঝাইয়া প্রতিবাদ বা আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার মত এতটা জ্ঞান তাহার হয় নাই—সবটা মিলিয়া অভিমানের মাত্রাটাই বাড়াইয়া তোলে। কিন্তু অভিমানটা কাহার উপর সে নিজেও ভাল বোঝে না।

এই সময়ে কাজলের জীবনে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল।

সীতানাথ পণ্ডিতমহাশয় একটু-আধটু জ্যোতিষের চর্চা করিতেন। কাজলের পড়িবার সময় তাহার দাদামশায়ের সঙ্গে সীতানাথ পণ্ডিত সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন··পাঁজি দেখিয়া ঠিকুজি তৈয়ারী, জন্মের লগ্ন ও যোগ গণনা, আয়ুষ্কাল নির্ণয় ইত্যাদি। আজ বছরখানেক ধরিয়া কাজল প্রায়ই এসব শুনিয়া আসিতেছে—যদিও সেখানে সে কোন কথা বলে না।

কার্ত্তিক মাসের শেষ, শীত তখনও ভাল পড়ে নাই। বাড়ির চারিপাশে অনেক খেজুর-বাগান, শিউলিরা কার্ত্তিকের শেষে গাছ কাটিয়াছে। শীতের ঠাণ্ডা সান্ধ্য বাতাসে টাটকা খেজুর-রসের গন্ধ মাখানো থাকে।

কাজলদের পাড়ায় ব্রহ্মঠাকরুণ এই সময় কি রোগে পড়িলেন! ব্রহ্মঠাকরুণের বয়স কত তা নির্ণয় করা কঠিন—মুড়ি ভাজিয়া বিক্রয় করিতেন, পতি-পুত্র কেহই ছিল না—কাজল অনেকবার মুড়ি কিনিতে গিয়াছে তাঁহার বাড়ি। অত্যন্ত খিটখিটে মেজাজের লোক, বিশেষ করিয়া ছেলেপিলেদের দুচক্ষু পাড়িয়া দেখিতে পারিতেন না—দূরে দূরে করিতেন, উঠানে পা দিলে পাছে গাছটা ভাঙে, উঠানটা খুঁড়িয়া ফেলে - এই ছিল তাঁহার ভয়। কাজলকে বাড়ির কাছাকাছি দেখিলে বলিতেন—একটা যেন মগ—মগ একটা —বাড়ি যা বাপু—কাঁড়-টাঁড়র খোঁচা মেরে বসবি—যা বাপু এখান থেকে। ঝালের চারাগুলো মাড়াস নে—

সেদিন দুপুরের পর তাহার মামাতো-বোন অরু বলিল—বেহ্ম-ঠাকুমা মর-মর হয়েছে, সবাই দেখতে যাচ্ছে—যাবি কাজল?

ছোট্ট একতলা বাড়ির ঘর, পাড়ার অনেকে দেখিতে আসিয়াছে—মেজেতে বিছানা পাতা, কাজল ও অরু দোরের কাছে দাঁড়াইয়া উঁকি মারিয়া দেখিল। ব্রহ্মঠাকরুণকে আর চেনা যায় না, মুখের চেহারা যেমন শীর্ণ তেমনি ভয়ঙ্কর, চক্ষু কোটরগত, তাহার ছোট-মামা

কাছে বসিয়া আছে, হারু কবিরাজ দাওয়ায় বসিয়া লোকজনের সঙ্গে কি কথা বলিতেছে।

বৈকালে দু-তিনবার শোনা গেল ব্রহ্মঠাকরুণের রাত্রি কাটে কিনা সন্দেহ।

কাজল কিছু বিস্মিত হইল। এমন দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্রহ্মঠাকরুণ, যাঁহাকে গামছা পরিয়া উঠানে গোবরজল ছিটাইতে দেখিয়া সে তখনই ভাবিত—তাহার দাদামশায়ের মত লোক পর্য্যন্ত যাঁহাকে মানিয়া চলে—তাহার এ কি দশা হইয়াছে আজ!···এত অসহায়, এত দুর্ব্বল তাঁহাকে কিসে করিয়া ফেলিল?

ব্রহ্মঠাকরুণ সন্ধ্যার আগে মারা গেলেন। কাজলের মনে হইল পাড়াময় একটা নিস্তব্ধতা—কেমন একটা অবোধ্য বিভীষিকার ছায়া যেন সারা পাড়াকে অন্ধকারের মত গ্রাস করিতে আসিতেছে···সকলেরই মুখে যেন একটা ভয়ের ভাব।

শীতের সন্ধ্যা ঘনাইয়াছে। পাড়ার সকলে ব্রহ্মঠাকরুণের সৎকারের ব্যবস্থা করিতে তাঁহার বাড়ির উঠানে সমবেত হইয়াছে। কাজলের দাদামশায়ও গিয়াছেন। কাজল ভয়ে ভয়ে খানিকটা দূরে অগ্রসর হইয়া দেখিতে গেল কিন্তু ব্রহ্মঠাকরুণের বাড়ি পর্য্যন্ত যাইতে পারিল না—কিছু দূরে একটা বাঁশঝাড়ের নীচে দাঁড়াইয়া রহিল। সেখান হইতে উঠানটা বা বাড়িটা দেখা যায় না—কথাবার্ত্তার শব্দও কানে আসে না। বাতাস লাগিয়া বাঁশঝাড়ের কঞ্চিতে কঞ্চিতে শব্দ হইতেছে···চারিধার নির্জ্জন···কাজলের বুক দুরু দুরু করিতেছিল···একটা অদ্ভুত ধরনের ভাবে তাহার মন পূর্ণ হইল—ভয় নয়, একটা বিস্ময়-মাখানো রহস্যের ভাব···অন্ধকারে গা লুকাইয়া দু-একটা বাদুড় আকাশ দিয়া উড়িয়া চলিয়াছে···অন্যদিন এমন সময়ে বাদুড় দেখিলেই কাজল বলিয়া উঠে—বাদুড় বাদুড় মেথর, যা থাবি তা তেঁতর—

আজ উড়নশীল বাদুড়ের দৃশ্য তাহার মনে কৌতুক না জাগাইয়া সেই অজানা রহস্যের ভাবই যেন ঘনীভূত করিয়া তুলিল!—

ব্রহ্মঠাকরুণ মারা গেলেন বটে—কিন্তু মৃত্যুকে কাজল এই প্রথম চিনিল। দিদিমা মারা গিয়াছিলেন কাজলের পাঁচবছর বয়সে—তাহাও গভীর রাতে কাজল তখন ঘুমাইয়া ছিল—কিছু দেখে নাই—বোঝেও নাই। এবার মৃত্যুর বিভীষিকা, এই অপূর্ব্ব রহস্য তাহার শিশুমনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। একা একা বেড়ায়, তেমন সঙ্গী-সেজুড় নাই—আর ঐ সব কথা ভাবে। একদিন তাহার মনে হইল যদি সেও ব্রহ্মঠাকরুণের মত মরিয়া যায়! ···হাত-পায়ে যেন সে বল হারাইয়া ফেলিল,—সত্য, সে-ও হয়তো মারা যাইবে!···

দিনের পর দিন ভয়টা বাড়িতে লাগিল। একলা শুইয়া শুইয়া কথাটা ভাবে—নদীর বাঁধা ঘাটের পৈঠায় সন্ধ্যার সময় বসিয়া ঐ কথাই মনে ওঠে।···এই বড়দলের তীরে দিদিমার মত, ব্রহ্মঠাকরুণের মত তার দেহও একদিন পুড়াইতে—

কথাটা ভাবিতেই ভয়ে সর্ব্বশরীর যেন অবশ হইয়া আসে···

কাজল তাহার জন্মের সালটা জানিত; কিছুদিন আগে তাহার দাদামশায় সীতানাথ পণ্ডিতের কাছে কাজলের ঠিকুজি করাইয়াছিলেন—সে সে-সময় সেখানে ছিল। কিন্তু তারিখটা জানে না—তবে মাঘ মাসের শেষের দিকে, তা জানে।

একদিন সে দুপুরে চুপি চুপি কাছারিঘরে ঢুকিল। তাকের উপরে রাশীকৃত পুরানো পাঁজি সাজানো থাকে। চুপি চুপি সবগুলি নামাইয়া ১৩৩০ সালের পাঁজিখানা বাছিয়া লইয়া মাঘ মাসের শেষের দিকের তারিখগুলো দেখিতে লাগিল—কি সে বুঝিল সে-ই জানে—তাহার মনে হইল ২৫-শে মাঘ বড় খারাপ দিন। ঐ দিন জন্মিলে আয়ু কম হয়, খুব কম। তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল—ঐ দিনটাতেই হয়তো সে জন্মিয়াছে।···ঠিক।···

বড়মামীকে বৈকালে জিজ্ঞাসা করিল—আমি জন্মেছি কত তারিখে মামীমা? বড়

মামীমার তো তাহা ভাবিয়া ঘুম নাই। তিনি জানেন না। বড় মামাতো ভাই পটলকে জিজ্ঞাসা করিল—আমি কবে জন্মেছি জানিস্ পটলদা?···পটলের বয়স বছর দশেক, সে কি করিয়া জানিবে? দাদামশায়ের কাছে ঠিকুজি আছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা হয় না। একদিন সীতানাথ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন—কেন, সে খোঁজে তোমার কি দরকার? সে থাকিতে না পারিয়া সোজাসুজি বলিয়াই ফেলিল— আ-আমি ক-কতদিন বাঁচব, পণ্ডিতমশায়?···

সীতানাথ পণ্ডিত অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন- এমন কথা কোন ছেলের মুখে কখনও তিনি শুনেন নাই। শশীনারায়ণ বাঁড়ুয্যেকে ডাকিয়া কহিলেন—শুনেছেন ও বাঁড়ুয্যেমশায়, আপনার নাতি কি বলছে?

শশীনারায়ণ শুনিয়া বলিলেন—এদিকে তো বেশ ইঁচড়-পাকা? দু'মাসের মধ্যে আজও তো দ্বিতীয় নামতা রপ্ত হ'ল না—বলো বারো পোনেরং কত?

কাজলের ভয়কে কেহই বুঝিল না। কাজল ধমক খাইল বটে, কিন্তু ভয় কি তাহাতে যায়? এক এক সময়ে তাহার মন হাঁপাইয়া ওঠে—কাহাকেও বলিতে পারে না, বুঝাইতে পারে না···এখন সে কি করে? এখানে তাহার কথা কেহ শুনিবে না, রাখিবে না তাহা সে বোঝে। তাহার বাবাকে বলিতে পারিলে হয়তো উপায় হইত।

বর্ষাকালের শেষের দিকে সে দু-একবার জ্বরে পড়ে। জ্বর আসিলে উপরের ঘরে একলাটি একটা কিছু টানিয়া গায়ে দিয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাকে। কাহারও পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া বলে ও মামীমা জ্বর এয়েচে আমার—একটা লে-এ-এ-প বে-বের করে দাও না?—ইচ্ছা করে কেহ কাছে বসে, কিন্তু বাড়ির এত লোক সবাই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। জ্বরের প্রথম দিকে কিন্তু চমৎকার লাগে, কেমন যেন একটা নেশা, সব কেমন অদ্ভুত লাগে। ঐ জানালার গরাদেতে একটা ডেও-পিঁপড়ে বেড়াইতেছে, চুনে-কালিতে মিশাইয়া জানালার কবাটে একটা দাড়িওয়ালা মজার মুখ। জানালার বাহিরের নারিকেল গাছে নারিকেলসুদ্ধ একটা কাঁদি ভাঙিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। নিচে তাহার ছোট মামাতো বোন অরু, 'ভাত ভাত' করিয়া চিৎকার শুরু করিয়াছে- বেশ লাগে। কিন্তু শেষের দিকে বড় কষ্ট, গা জ্বালা করে, হাত-পা ব্যথা করে, সারা শরীর ঝিম্ ঝিম্ করে, মাথা যেন ভার বোঝা, এ সময় কেহ কাছে আসিয়া যদি বসে!

কাছারির উত্তর গায়ে পথের ধারে এক বুড়ীর খাবারের দোকান, বারো মাস খুব সকালে উঠিয়া সে তেলেভাজা বেগুনি ফুলুরি ভাজে। কাজল তাহার বাঁধা খরিদ্দার। অনেকবার বকুনি খাইয়াও সে এ লোভ সামলাইতে সমর্থ হয় নাই। সারিবার দিন দুই পরেই কাজল সেখানে গিয়া হাজির। অনেকক্ষণ সে বসিয়া বসিয়া ফুলুরিভাজা দেখিল, পুঁইপাতার বেগুনি, জবাপাতার তিল-পিটুলি। অবশেষে সে অপ্রতিভ মুখে বলে—আমায় পুঁইপাতার বেগুনি দাও না দিদিমা? দেবে? এই নাও পয়সাটা।

বুড়ী দিতে চায় না, বলে—না খোকা বাবা, সেদিন জ্বর থেকে উঠেছ, তোমার বাড়ির লোকে শুনলে আমায় বকবে—কিন্তু কাজলের নির্বন্ধাতিশয্যে অবশেষে দিতে হয়।

একদিন বিশ্বেশ্বর মুহুরীর কাছে ধরা পড়িয়া যায়। বুড়ীর দোকান হইতে বাহির হইয়া জবাপাতার তিল-পিটুলির ঠোঙা-হাতে খাইতে খাইতে পুকুর পাড় পর্যন্ত গিয়াছে—বিশ্বেশ্বর আসিয়া ঠোঙাটি কাড়িয়া লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল আচ্ছা পাজি ছেলে তো? আবার ঐ তেলে-ভাজা খাবারগুলো রোজ রোজ খাওয়া?

কাজল বলিল—আমি খা-খা-খাচ্ছি তা তো-তোমার কি?

বিশ্বেশ্বর মুহুরী হঠাৎ আসিয়া তাহার কান ধরিয়া একটা ঝাঁকুনি দিয়া বলিল—আমার

কি, বটে ?

রাগে অপমানে কাজলের মুখ রাঙা হইয়া গেল। ইহাদের হাতে মার খাওয়ার অভিজ্ঞতা তাহার এই প্রথম। সে ছেলেমানুষি সুরে চিৎকার করিয়া বলিল—মুখপুড়ি, হতচ্ছাড়া তু-মি মাল্লে কেন ?

বিশ্বেশ্বর তাহার গালে জোরে এক চড় বসাইয়া দিয়া বলিল—আমি কেন, এসো তো কর্ত্তার কাছে একবার—এসো।

কাজল পাগলের মত যা তা বলিয়া গালি দিতে লাগিল। চড়ের চোটে তখন তাহার কান মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে, এবং বোধ হয় এ অপমানের কোনও প্রতিকার এখানকার কাহারও নিকট হইতে হইবার আশা নাই, মুহূর্ত্ত-মধ্যে ঠাওরাইয়া বুঝিয়া চিৎকার করিয়া বলিল—আমার বা-বাবা আসুক, বলে দেব, দেখো—দেখো তখন—

বিশ্বেশ্বর হাসিয়া বলিল—আচ্ছা যাও, তোমার বাবার ভয় আমি একেবারে গর্ত্তের মধ্যে যাব আর কি ? আজ পাঁচ বছরের মধ্যে খোঁজ নিলে না, ভারী তো—। হয়ত একথা বলিতে বিশ্বেশ্বর সাহস করিত না, যদি সে না জানিত তাহার এ জামাইটির প্রতি কর্ত্তার মনোভাব কিরূপ।

কাজল রাগের মাথায় ও কতকটা পাছে বিশ্বেশ্বর দাদামশায়ের কাছে ধরিয়া লইয়া যায় সেই ভয়ে, পুকুরের দক্ষিণ-পাড়ের নারিকেল বাগানের দিকে ছুটিয়া যাইতে যাইতে বলিতে লাগিল—দেখো না, দেখো তুমি, বাবা আসুক না—পরে পিছন দিকে চাহিয়া খুব কড়া কথা শুনানো হইতেছে, এমন সুরে বলিল—তোমার পেটে খি-খিচুড়ি আছে, খি-খিচুড়ি খাবে—খিচুড়ি ?

নদীর বাঁধাঘাটে সেদিন সন্ধ্যাবেলা বসিয়া বসিয়া সে অনেকক্ষণ দিদিমার কথা ভাবিল। দিদিমা থাকিলে বিশ্বেশ্বর মুহুরী গায়ে হাত তুলিতে পারিত ? সে জবাপাতার বেগুনি খায় তো ওর কি ?

ঐ একটা নক্ষত্র খসিয়া পড়িল। দিদিমা বলিত নক্ষত্র খসিয়া পড়িলে সে সময় পৃথিবীতে কেউ না কেউ জন্মায়। মরিয়া কি নক্ষত্র হয় ? সে যদি মারা যায়, হয়তো অমনি আকাশের গায়ে নক্ষত্র হইয়া ফুটিয়া থাকিবে।

আরও মাস কয়েক পরে, ভাদ্রমাসের শেষের দিকে। দাদামশায়ের বৈকালিক মিছরির পানা খাওয়ার শ্বেত পাথরের গেলাসটা তাহার বড় মামীমা মাজিয়া ধুইয়া উপরের ঘরের বাসনের জলচৌকিতে রাখিতে তাহার হাতে দিল। সিঁড়িতে উঠিবার সময় কেমন করিয়া গেলাস হাত হইতে পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল ভাঙিয়া। কাজলের মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল, তাহার ক্ষুদ্র হৃৎপিণ্ডের গতি যেন মিনিটখানেকের জন্য বন্ধ হইয়া গেল, যাঃ, সর্বনাশ! দাদামশায়ের মিছরিপানার গেলাসটা যে! সে দিশেহারা অবস্থায় টুকরাগুলো তাড়াতাড়ি খুঁটিয়া খুঁটিয়া তুলিল। পরে অন্য জায়গায় ফেলিলে পাছে কেহ টের পায়, তাই তাড়াতাড়ি আরব্য উপন্যাস যাহার মধ্যে আছে সেই বড় কাঠের সিন্দুকটার পিছনে গোপনে রাখিয়া দিল। এখন সে কি করে! কাল যখন গেলাসের খোঁজ পড়িবে বিকালবেলা, তখন সে কি জবাব দিবে ?

কাহারও কাছে কোন কথা বলিল না, বাকী দিনটুকু ভাবিয়া ভাবিয়া কিছু ঠিক করিতেও পারিল না। এক জায়গায় বসিতে পারে না, উদ্বিগ্ন মুখে ছটফট করিয়া বেড়ায়—ঐ রকম একটা গেলাস আর কোথাও পাওয়া যায় না ? একবার সে এক খেলুড়ে বন্ধুকে চুপি চুপি বলিল,—ভাই তো-তোদের বাড়ি একটা পাথরের গে-গেলাস আছে ?

কোথায় সে এখন পায় একটা শ্বেত পাথরের গেলাস ? রাত্রে একবার তাহার মনে হইল সে বাড়ি ছাড়িয়া পলাইয়া যাইবে। কলিকাতা কোন্ দিকে ? সে বাবার কাছে চলিয়া যাইবে কলিকাতায়—কাল বৈকালের পূর্ব্বেই।

কিন্তু রাত্রে পালানো হইল না। নানা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সে সকালে ঘুম ভাঙিয়া উঠিল, দুই-তিন বার কাঠের সিন্দুকটার পিছনে সন্তর্পণে উঁকি মারিয়া দেখিল, গেলাসের টুকরাগুলো সেখান হইতে কেহ বাহির করিয়াছে কিনা। বড় মামীমার সামনে আর যায় না, পাছে গেলাসটা কোথায় জিজ্ঞাসা করিয়া বসে। দুপুরের কিছু পরে বাড়ির রাস্তা দিয়া কে একজন সাইকেল চড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া সে নাটমন্দিরের বেড়ার কাছে ছুটিয়া দেখিতে গেল—কিন্তু সাইকেল দেখা তাহার হইল না, নদীর বাঁধাঘাটে একখানা কাহাদের ডিঙিনৌকা লাগিয়াছে, একজন ফর্সা চেহারার লোক একটা ছড়ি ও ব্যাগ হাতে ডিঙি হইতে নামিয়া ঘাটের সিঁড়িতে পা দিয়া মাঝির সঙ্গে কথা কহিতেছে—কাজল অবাক হইয়া ভাবিতেছে, লোকটা কে, এমন সময় লোকটা মাঝির সঙ্গে কথা শেষ করিয়া এদিকে মুখ ফিরাইল। সঙ্গে সঙ্গে কাজল অল্পক্ষণের জন্য চোখে যেন ধোঁয়া দেখিল, পরক্ষণেই সে নাটমন্দিরের বেড়া গলাইয়া বাহিরের নদীর ধারে রাস্তাটা বাহিয়া বাঁধাঘাটের দিকে ছুটিল। যদিও অনেক বছর পরে দেখা, তবুও কাজল চিনিয়াছে লোকটিকে তাহার বাবা।

অপু খুলনার স্টীমার ফেল করিয়াছিল। নতুবা সে কাল রাত্রেই এখানে পৌঁছিত। সে মাঝিদের জিজ্ঞাসা করিতেছিল, পরশু ভোরে নৌকা এখানে আনিয়া তাহাকে বরিশালের স্টীমার ধরাইয়া দিতে পারিবে কিনা। কথা শেষ করিয়াই ফিরিয়া চাহিয়া সে দেখিল একটি ছোট সুশ্রী বালক ঘাটের দিকে দৌড়িয়া আসিতেছে। পরক্ষণেই সে চিনিল। আজ সারা পথ নৌকায় সে ছেলের কথা ভাবিয়াছে, না জানি সে কত বড় হইয়াছে, কেমন দেখিতে হইয়াছে, তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে, না মনে রাখিয়াছে! ছেলের আগেকার চেহারা তাহার মনে ছিল না। এই সুন্দর বালকটিকে দেখিয়া সে যুগপৎ প্রীত ও বিস্মিত হইল—তাহার সেই তিন বছরের ছোট্ট খোকা এমন সুদর্শন লাবণ্যভরা বালকে পরিণত হইল কবে ?

সে হাসিমুখে বলিল—কি রে খোকা, চিনতে পারিস্ ?

কাজল ততক্ষণে আসিয়া অসীম নির্ভরতার সহিত তাহার কোমর জড়াইয়া ধরিয়াছে—ফুলের মত মুখটি উঁচু করিয়া হাসি-ভরা চোখে বাবার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—না বৈ কি ? আমি বেড়ার ধার থেকে দেখেই ছুটে দিইছি—এতদিন আস নি কে-কেন বাবা ?

একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। এতদিন তো ভুলিয়া ছিল, কিন্তু আজ এইমাত্র—হঠাৎ দেখিবামাত্রই—অপুর বুকের মধ্যে একটা গভীর স্নেহসমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠিল। কি আশ্চর্য্য, এই ক্ষুদ্র বালকটি তাহারই ছেলে, জগতে নিতান্ত অসহায় হাত-পা হারা, অবোধ—জগতে সে ছাড়া ওর আর কেউ তো নাই! কি করিয়া এতদিন সে ভুলিয়া ছিল!

কাজল বলিল—ব্যাগে কি বাবা ?

—দেখবি ? চল দেখাব এখন। তোর জন্যে কেমন পিস্তল আছে, একসঙ্গে দুম্ দুম্ আওয়াজ হয়, ছবির বই আছে দুখানা। কেমন একটা রবারের বেলুন—

—তো-তো-তোমাকে একটা কথা বলব বাবা ? তো-তোমার কাছে একটা পাথরের গে-গেলাস আছে ?

—পাথরের গেলাস ? কেন রে, পাথরের গেলাস কি হবে ?

কাজল চুপি চুপি বাবাকে গেলাস ভাঙার কথা সব বলিল। বাবার কাছে কোন ভয় হয় না। অপু হাসিয়া ছেলের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল—আচ্ছা চল্, কোনো ভয় নেই।

সঙ্গে সঙ্গে কাজলের সব ভয়টা কাটিয়া গেল, একজন অসীম শক্তিধর বজ্রপাণি দেবতা যেন হঠাৎ বাহুদ্বয় মেলিয়া তাহাকে আশ্রয় ও অভয়দান করিয়াছে—মাভৈঃ।

রাত্রে কাজল বলিল—আমি তোমার সঙ্গে যাব বাবা।

অপুর অনিচ্ছা ছিল না, কিন্তু কলিকাতায় এখন নিজেরই অচল। সে ভুলাইবার জন্য বলিল—আচ্ছা হবে, হবে। শোন্ একটা গল্প বলি খোকা। কাজল চুপ করিয়া গল্প শুনিল। বলিল—নিয়ে যাবে তো বাবা? এখানে সবাই বকে, মারে বাবা! তুমি নিয়ে চল, তোমার কত কাজ করে দেব।

অপু হাসিয়া বলে—কাজ করে দিবি? কি কাজ করে দিবি রে খোকা?

তারপর সে ছেলেকে গল্প শোনায়, একবার চাহিয়া দেখে, কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। খানিক রাত্রি পর্যন্ত সে একখানা বই পড়িল, পরে আলো নিভাইবার পূর্বে ছেলেকে ভাল করিয়া শোয়াইতে গেল। ঘুমন্ত অবস্থায় বালককে কি অদ্ভুত ধরণের অবোধ, অসহায়, দুর্বল ও পরাধীন মনে হইল অপুর! কি অদ্ভুত ধরণের অসহায় ও পরাধীন! সে ভাবে, এই যে ছেলে, পৃথিবীতে এ তো কোথাও ছিল না, যাচিয়াও তো আসে নাই—অপর্ণা ও সে, দু'জনে যে উহাকে কোন্ অনন্ত হইতে সৃষ্টি করিয়াছে—তাহার পর সংসারে আনিয়া অবোধ নিষ্পাপ বালককে, একা এভাবে সংসারে ছাড়িয়া দিয়া পালানো কি অপর্ণাই সহ্য করিবে? কিন্তু এখন কোথায়ই বা লইয়া যায়?

প্রাচীন গ্রীসের এক সমাধির উপরে সেই যে স্মৃতিফলকটির কথা সে পড়িয়াছিল ফ্রেডারিক হ্যারিসনের বই-এ—

This child of ten years
Philip, his father laid here,
His great hope, Nikoteles.

সে দূরে কালের ছোট্ট বালকটির সুন্দর মুখ, সুন্দর রং, দেব-শিশুর মত সুন্দর দশ বৎসরের বালক নিকোটিলিস্‌কে আজ রাত্রে সে যেন নির্জন প্রান্তরে খেলা করিতে দেখিতে পাইতেছে—সোনালী চুল, ডাগর ডাগর চোখ। তাহার স্নেহস্মৃতি গ্রীসের সে নির্জন প্রান্তরের সমাধিক্ষেত্রের বুকে অমর হইয়া আছে। শতশতাব্দী পূর্বে সেই বিরহী পিতৃহৃদয়ের সঙ্গে সে যেন আজ নিজের নাড়ির যোগ অনুভব করিল। মনে হইল, মানুষ সব কালে, সব অবস্থায় এক, এক। কিংবা—দেবতার মন্দির-দ্বারে আরোগ্যকামী বহু যাত্রী জড়ো হইয়াছে নানা দিক্‌দেশ হইতে—ছোট ছেলেটির গরীব বাবা তাহাকে আনিয়াছে—ছেলেটি অসুখে ভোগে, রুগ্ণ, স্বপ্নে দেবতা আসিয়া বলিলেন—যদি তোমার রোগ সারিয়ে দিই, আমায় কি দেবে ইউফোনিস্? উঃ, সত্যি! অসুখ সারিলে সে বাঁচে! ছেলেটি উৎসাহের সুরে বলিল—দশটা মার্বেল আমার আছে, সব কটাই দিয়ে দেব—দেবতা খুশীর সুরে বলিলেন—স—ব ক—টা! বলো কি?—বেশ বেশ, রোগ সারিয়ে দেব তোমার।

বাৎসল্যরসের এমন গভীর অনুভূতি জীবনে তাহার এই প্রথম…

অনেক দিন পরে উপরের ঘরটাতে শুইল। সেই তাহার ফুলশয্যার খাটটাতে। কাজল পাশেই ঘুমাইতেছে—কিন্তু রাত পর্যন্ত তাহার নিজের ঘুম আসিল না। জানালার বাহিরে চাহিয়া চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিল। গত পাঁচ ছয় বৎসর বিদেশে সম্পূর্ণ অন্য ধরণের জীবনযাত্রা ও নবতর অনুভূতিরাজির ফলে পুরাতন দিনের অনেক অনুভূতিই অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে—এখানকার তো আরও, কারণ আট নয় বৎসর এখানকার জীবনের সঙ্গে কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নাই। তাই আজ এই চিলে-কোঠার বহু-পরিচিত ঘরটা, এই পালংকটা, ঐ সুপারি বনের সারি—এসব যেন স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে। ঠিক আবার পুরানো দিনের

মত জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, ঠিক সেই সব দিনের মত নাটমন্দির হইতে নৈশ কীর্ত্তনের খোলের আওয়াজ আসিতেছে—কিন্তু সে অপু নাই—বদলাইয়া গিয়াছে—বেমালুম বদলাইয়া গিয়াছে।

স্ত্রীর গহনা বেচিয়া বই ছাপাইয়া ফেলিল পূজার পরেই।

কেবল হার ছড়াটা বেচিতে পারিল না। অপর্ণার অন্যান্য গহনার অপেক্ষা সে এই হার ছড়াটার সঙ্গে বেশী পরিচিত। তাই হারটা সামনে খুলিয়া খানিকক্ষণ ভাবিল, অপর্ণার সেই হাসি-হাসি মুখখানা যেন ঝাপসা-মত মনে পড়ে—প্রথমটাতে হঠাৎ যেন খুব সুস্পষ্ট মনে আসে—আধ সেকেন্ড কি সিকি সেকেন্ড মাত্র সময়ের জন্য—তারপরই ঝাপসা হইয়া যায়। ঐ আধ সেকেন্ডের জন্য মনে হয়, সে-ই সেরকম ঘাড় বাঁকাইয়া মুখে হাসি টিপিয়া সামনে দাঁড়াইয়া আছে।

ছাপানো বই-এর প্রথম কপিখানা দপ্তরীর বাড়ি হইতে আনাইয়া দেখিয়া সে দুঃখ ভুলিয়া গেল। কিছু না, সব দুঃখ দূর হইবে। এই বই-এ সে নাম করিবে।

আজ বিশ বৎসরের দূর জীবনের পার হইতে সে নিশ্চিন্দিপুরের পোড়ো ভিটাকে অভিনন্দন পাঠাইল মনে মনে। যেখানেই থাকি, ভুলি নি। যাহাদের বেদনার রঙে তাহার বইখানা রঙীন, কত স্থানে, কত অবস্থায় তাহাদের সঙ্গে পরিচয়, হয়ত কেউ বাঁচিয়া আছে, কেউ বা নাই। তাহারা আজ কোথায় সে জানে না, এই নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার-শান্তির মধ্য দিয়া সে মনে মনে সকলকেই আজ তাহার ধন্যবাদ জানাইতেছে।

মাসকয়েকের জন্য একটা ছোট অফিসে একটা চাকরি জুটিয়া গেল তাই রক্ষা। এক জায়গায় আবার ছেলে পড়ায়। এসব না করিলে খরচ চলে বা কিসে, বই-এর বিজ্ঞাপনের টাকাই বা আসে কোথা হইতে। আবার সেই সাড়ে নটার সময় আপিসে দৌড়, সেখান হইতে বাহির হইয়া একটা গলির মধ্যে একতলা বাসার ছোট্ট ঘরে দুটি ছেলে পড়ানো। বাড়ির কর্ত্তার কিসের ব্যবসা আছে, এই ঘরে তাঁহাদের প্যাকবাক্স ছাদের কড়ি পর্য্যন্ত সাজানো। তাহারই মাঝখানে ছোট তক্তপোশে মাদুর পাতিয়া ছেলে-দুটি পড়ে—সন্ধ্যার পরে অপু যখনই পড়াইতে গিয়াছে, তখনই দেখিয়াছে কয়লার ধোঁয়ায় ঘরটা ভরা।

শীতকাল কাটিয়া পুনরায় গ্রীষ্ম পড়িল। বই-এর অবস্থা খুব সুবিধা নয়, নিজে না খাইয়া বিজ্ঞাপনের খরচ যোগায়, তবু বই-এর কাটতি নাই! বইওয়ালারা উপদেশ দেয়, এডিটারদের কাছে, কি বড় বড় সাহিত্যিকদের কাছে যান, একটু যোগাড়যন্ত্র ক'রে ভাল সমালোচনা বার করুন, আপনাকে চেনে কে, বই কি হাওয়ায় কাটবে মশাই! অপু সে সব পারিবে না, নিজের লেখা বই বগলে করিয়া দোরে দোরে ঘুরিয়া বেড়ানো তাহার কর্ম্ম নয়। এতে বই কাটে ভাল, না কাটে সে কি করিবে?

অতএব জীবন পুরাতন পরিচিত পথ ধরিয়াই বহিয়া চলিল—আপিস আর ছেলে-পড়ানো। রাত্রে আর একটা নতুন বই লেখে। ও যেন একটা নেশা, বই বিক্রি হয়-না-হয়, কেউ পড়ে-না-পড়ে, তাহাকে যেন লিখিয়া যাইতেই হইবে।

মেসে লেখার অত্যন্ত অসুবিধে হইতেছে দেখিয়া সে একটা ছোট একতলা বাড়ির নীচেকার একটা ঘর আট টাকায় ভাড়া লইয়া সেখানে উঠিয়া গেল। মেসের বাবুরা লোক বেশ ভালই—কিন্তু তাহাদের মানসিক ধারা যে-পথ অবলম্বনে চলে অপুর পথ তা নয়—তাঁহাদের মূর্খতা, সংস্কার, সীমাবদ্ধতা ও সর্ব্বরকমের মানসিক দৈন্য অপুকে পীড়া দেয়। খানিকক্ষণ মিষ্টালাপ হয়তো এদের সঙ্গে চলিতে পারে—কিন্তু বেশীক্ষণ আড্ডা দেওয়া অসম্ভব—বরং কারখানার ননী মিস্ত্রী, কি চাঁপাদানীর বিশু স্যাকরার আড্ডার লোকজনকে

ভালই লাগিত—কারণ তাহারা যে জগৎটাতে বাস করিত—অপুর কাছে সেটা একেবারেই অপরিচিত—তাহাদের মোহ ছিল, সেই অজানা ও অপরিচয়ের মোহ, কাশীর কথক ঠাকুর কি অমরকণ্টকের আজবলাল ঝা-কে যে কারণে ভাল লাগিয়াছিল। কিন্তু এরা সে ধরণের অনন্যসাধারণ নয়, নিতান্তই সাধারণ ও নিতান্ত ক্ষুদ্র। কাজেই বেশীক্ষণ থাকিলেই হাঁপ ধরে। অপুর নতুন ঘরটাতে দরজা জানালা কম, দক্ষিণ দিকের ছোট জানালাটা খুলিলে পাশের বাড়ির ইঁট-বার করা দেওয়ালটা দেখা যায় মাত্র। ভাবিল—তবুও তো একা থাকতে পারব—লেখাটা হবে।

বাড়ি বদল করার দিনটা জিনিসপত্র সরাইতে ও ঘর গুছাইতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। হাত-পা ধুইয়া ঠাণ্ডা হইয়া বসিল।

আজ রবিবার ছেলে-পড়ানো নাই। বাপ্‌! নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। সেই অতটুকু ঘর, কয়লার ধোঁয়া আর রাজ্যের প্যাকবাক্সের টার্পিন তেলের মত গন্ধ। আজ কয়েক দিন হইল কাজলের একখানা চিঠি পাইয়াছে, এই প্রথম চিঠি, কাটাকুটি বানান ভুলে ভর্তি। আর একবার পত্রখানা বাহির করিয়া পড়িল—বার-পনেরো হইল এইবার লইয়া। বাবার জন্য তাহার মন কেমন করে, একবার যাইতে লিখিয়াছে, একখানা আরব্য উপন্যাস ও একটা লণ্ঠন লইয়া যাইতে লিখিয়াছে, যেন বেশী দেরি না হয়! অপু ভাবে ছেলেটা পাগল, লণ্ঠন কি হবে? লণ্ঠন?...দ্যাখ তো কাণ্ড। উঠিয়া ঘরে আলো জ্বালিয়া ছেলের পত্রের জবাব লিখিল। সে আগামী শনিবার তাহাকে দেখিতে যাইতেছে। সোম ও মঙ্গলবার ছুটি, ট্রেনে স্টীমারে বেজায় ভিড়। খুলনার স্টীমার এবারও ফেল করিল। শ্বশুরবাড়ি পেঁছিতে বেলা দুপুর গড়াইয়া গেল।

নৌকা হইতেই দেখে কাজল ঘাটে তাহার অপেক্ষায় হাসিমুখে দাঁড়াইয়া—নৌকা থামিতে-না-থামিতে সে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। মুখ উঁচু করিয়া বলিল—বাবা,—আমার আরব্য উপন্যাস?—অপু সে-কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছে। কাজল কাঁদ-কাঁদ সুরে বলিল—হুঁ-উঁ বাবা, এত ক'রে লিখলাম, তুমি ভুলে গেলে—লণ্ঠন?...

অপু বলিল,—আচ্ছা তুই পাগল নাকি—কি করবি?—

কাজল বলিল—সে লণ্ঠন নয় বাবা!...হাতে ঝুলনো যায়, রাঙা কাচ, সবুজ কাচ বের করা যায় এমনি ধারা। হুঁ-উঁ, তুমি আমার কোন কথা শোনো না। একটা আর্শি আনবে বাবা?

—আর্শি?—কি করবি আর্শি?

—আমি আর্শিতে ছিঁয়া দেখবো—

অপর্ণার দিদি মনোরমা অনেকদিন পরে বাপের বাড়ি আসিয়াছেন। বেশ সুন্দরী, অনেকটা অপর্ণার মত মুখ। ছোট ভগ্নীপতিকে পাইয়া খুব আহ্লাদিত হইলেন, স্বর্গগত মা ও বোনের নাম করিয়া চোখের জল ফেলিলেন। অপু তাহার কাছে সত্যকার স্নেহ-ভালবাসা পাইল। সন্ধ্যাবেলা অপু বলিল—আসুন দিদি, ছাদের উপর ব'সে আপনার সঙ্গে একটু গল্প করি।

ছাদ নির্জন, নদীর ধারেই, অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যায়।

অপু বলিল—আমার বিয়ের রাতের কথা মনে হয় মনোরমাদি?

মনোরমা মৃদু হাসিয়া বলিলেন—সেও যেন এক স্বপ্ন। কোথা থেকে কি যেন সব হয়ে গেল ভাই—এখন ভেবে দেখলে—সেদিন তাই এই ছাদের উপর বসে অনেকক্ষণ ধরে ভাবছিলুম—তোমাকেও তো আমি সেই বিয়ের পর আর কখনও দেখি নি। এবার এসেছিলুম ভাগ্যিস, তাই দেখাটা হ'ল।

হাসির ভঙ্গি ঠিক অপর্ণার মত, মুখের কত কি ভাব, ঠিক তাহারই মত—বিস্মৃতির জগৎ হইতে সে-ই যেন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।

মনোরমা অনুযোগ করিয়া বলিলেন—তুমি তো দিদি বলে খোঁজও কর না ভাই। এবার পুজোর সময় বরিশালে যেও—বলা রইল, মাথার দিব্যি। আর তোমার ঠিকানাটা আমায় লিখে দিও তো!

কোথা হইতে কাজল আসিয়া বলিল—বাবা একটা অর্থ জান?···

—অর্থ? কি অর্থ?

কাজলের মুখ তাহার অপূর্ব সুন্দর মনে হয়—কেমন একধরণের ঘাড় একধারে বাঁকাইয়া চোখে খুশীর হাসি হাসিয়া কথাটা শেষ করে, আবার তখন বোকার মতই হাসে—হঠাৎ যেন মুখখানা করুণ ও অপ্রতিভ দেখায়। ঠিক এই সময়েই অপুর মনে ওই স্নেহের বেদনাটা দেখা দেয় - কাজলের ঐ ধরণের মুখভঙ্গিতে।

-- বল দেখি, বাবা, 'এখান থেকে দিলাম সাড়া, সাড়া গেল সেই বামুনপাড়া?' কি অর্থ? অপু ভাবিয়া ভাবিয়া বলিল—পাখি।

কাজল জেলেমানুখি হাসির খই ফুটাইয়া বলিল—ইল্লি! পাখি বুঝি? শাঁক তো—শাঁকের ডাক। তুমি কিচ্ছু জানো না বাবা।

অপু বলিল—ছিঃ বাবা, ও-রকম ইল্লি-টিল্লি বলো না, বলতে নেই ও-কথা, ছিঃ।

—কেন বলতে নেই বাবা?···

-- ও ভাল কথা নয়।

আসিবার আগের দিন রাত্রে কাজল চুপি চুপি বলিল—এবার আমায় নিয়ে যাও বাবা, আমার এখানে থাকতে একটুও ভাল লাগে না।

অপু ভাবিল—নিয়েই যাই এবারে, এখানে ওকে কেউ দেখে না, তাছাড়া লেখাপড়াও এখানে থাকলে যা হবে!

পরদিন সকালে ছেলেকে লইয়া সে নৌকায় উঠিল। অপর্ণার তোরঙ্গ ও হাতবাক্সটা এখানে আট-নয় বৎসর পড়িয়া আছে, তাহার বড় শালী সঙ্গে দিয়া দিলেন। ইহাদের তুলিয়া দিতে আসিয়া ঘাটে দাঁড়াইয়া চোখের জল ফেলিলেন। অপুকে বার বার বরিশালে যাইতে অনুরোধ করিলেন। সকালের নবীন রোদ ভাঙা নাটমন্দিরের গায়ে পড়িয়াছে। নদীজল হইতে একটা আমিষ গন্ধ আসিতেছে। শ্বশুর মহাশয়ের তামাক-খাওয়ার কয়লা পোড়ানোর জন্য শুকনা ডালপালায় আগুন দেওয়া হইয়াছে নদীর ধারটাতেই। কুণ্ডলী পাকাইয়া ধোঁয়ার রাশ উপরে উঠিতেছে। সকালের বাতাসটা বেশ ঠাণ্ডা। আজ বহু বৎসর আগে যেদিন বন্ধু প্রণবের সঙ্গে বিবাহের নিমন্ত্রণে এ বাটী আসিয়াছিল তখন সে কি ভাবিয়াছিল এই বাড়িটার সহিত তাহার জীবনে এমন একটি অদ্ভুত যোগ সাধিত হইবে? আজও সেদিনটার কথা বেশ স্পষ্ট মনে আছে, আগের দিন একটা গ্রামোফোনের গান শুনিয়াছিল —'বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি।' শুনিয়া গানটা মুখস্থ করিয়াছিল ও সারাপথে ও স্টীমারে আপন মনে গাহিয়াছিল। এখনও গুনু গুনু করিয়া গানটা গাহিলে সেই দিনটা আবার ফিরিয়া আসে।

ছেলেকে সঙ্গে লইয়া অপু প্রথমে মনসাপোতা আসিল। বছর ছয়-সাত এখানে আসা ঘটে নাই। এই সময়ে দিনকয়েকের ছুটি আছে, এইবার একবার না দেখিয়া গেলে আর আসা ঘটিবে না অনেকদিন।

ঘরদোরের অবস্থা খুব খারাপ। অপুর মনে পড়িল, ঠিক এই অপরিষ্কার ভাঙা ঘরে

এই বালকের মাকে সে একদিন আনিয়া তুলিয়াছিল। তেলিদের বাড়ি হইতে চাবি আনিয়া ঘরের তালা খুলিয়া ফেলিল। খড় নানাস্থানে উড়িয়া পড়িয়াছে, ইঁদুরের গর্ত্ত, পাড়ার গরু-বাছুর উঠিয়া দাওয়া ভাঙিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, উঠানে বনজঙ্গল।

কাজল চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া অবাক হইয়া বলিল, বাবা, এইটে তোমাদের বাড়ি?

অপু হাসিয়া বলিল—তোমাদেরও বাড়ি বাবা। আমার বাড়ির কোঠা দেখেছ জন্মে অবধি, তাতে তো চলবে না, পৈতৃক সম্পত্তি তোমার এই।

সকালে উঠিয়া একটি খবরে সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। নিরুপমা আর নাই। সে গত পৌষ মাসে তীর্থ করিতে গিয়াছিল, পথে কলেরা হয়, সেখানেই মারা যায়। নিরুপমার জ্যাঠা বৃদ্ধ সরকার মহাশয় বলিতেছেন—আর দাদাঠাকুর, তোমরা লেখাপড়া শিখে দেশে তো আর আসবে না? মেয়েটার কথা মনে হলে আর অন্ন মুখে ওঠে না। হ'ল কি জান, বললে কুড়ুলের পাটে মেলা দেখতে যাব। তার তো জানো পুজো-আচ্চা এক বাতিক ছিল। পাড়ার সবাই যাচ্ছে, আমি বলি, তা যাও। ওমা, তিনদিন পর সকালে খবর এল নিরু মা মর-মর, শান্তিপুরের পথে একটা দোকানে কি সমাচার, না কলেরা। গেলুম সবাই ছুটে। পৌঁছুতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। আমরা যখন গেলুম তখন বাক্‌রোধ হয়ে গিয়েছে, চিনতে পারলে, চোখ দিয়ে হু-হু জল পড়তে লাগল। দাদাঠাকুর—মা আমার পাড়াসুদ্ধ সবারই উপকার ক'রে বেড়াত তুমি সবই জান—আর অসুখ দেখে সেই পাড়ার লোকেই···যারা সঙ্গে ছিল, পথের ধারের একটা দোচালা ভাঙা ঘরে মাকে আমার ফেলে সবাই পালিয়েছে। পাশের দোকানীটা লোক ভাল—সে-ই একটু দেখাশুনো করেছে। চিকিৎসে হয় নি, পত্তরও হয় নি, বেঘোরে নিরু-মাকে হারালুম।

সরকার-বাড়ি হইতে ফিরিতে একটু বেলা হইয়া গেল। উঠানে পা দিয়া ডাকিল ও খোক—কাযল দুপুরে ঘুমাইতেছিল, কখন ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়াছে এবং তেলি-বাড়ি হইতে আঁকশি যোগাড় করিয়া আনিয়া উঠানের গাছের চাঁপা ফুল পাড়িবার জন্য নিচের একটা ডালে আঁকশি বাধাইয়া টানাটানি করিতেছে।

দৃশ্যটা তাহার কাছে অদ্ভুত মনে হইল। অপর্ণার পোঁতা সেই চাঁপাফুল গাছটা। কবে তাহার ফুল ধরিয়াছে, কবে গাছটা মানুষ হইয়াছে, গত সাত বৎসরের মধ্যে অপুর সে খোঁজ লওয়ার অবকাশ ছিল না—কিন্তু খোকা কেমন করিয়া—

সে বলিল—খোকা ফুল পাড়ছিস্ তো, গাছটা কে পুঁতেছিল জানিস্?

কাজল বাবার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—তুমি এসো না বাবা, ঐ ডালটা চেপে ধরো না! মোটে দুটো পড়েছে।

অপু বলিল—কে পুঁতেছিল জানিস গাছটা? তোর মা!

কিন্তু মা বলিলে কাজল কিছুই বোঝে না। জ্ঞান হইয়া অবধি সে দিদিমা ছাড়া আর কাহাকেও চিনিত না, দিদিমাই তাহার সব। মা একটা অবাস্তব কাল্পনিক ব্যাপার মাত্র। মায়ের কথায় তার মনে কোনও বিশেষ সুখ বা দুঃখ জাগায় না।

অনেকদিন পরে মনসাপোতা আসা। সকলেই বাড়িতে ডাকে, নানা সদুপদেশ দেয়। ক্ষেত্র কপালী অপুকে ডাকিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিল, দুধ পাঠাইয়া দিল—ঘর ছাইবার জন্য ভড়েরা এক গাড়ি উলুখড় দিতে চাহিল।

রাত্রে আবার কি কাজে সরকার-বাড়ির সামনের পথ দিয়া আসিতে হইল। বাড়িটার দিকে যেন চাওয়া যায় না। গোটা মনসাপোতাটা নিরুদির অভাবে ফাঁকা হইয়া গিয়াছে তাহার কাছে। নিরুদি, আজ খোকাকে নিয়ে এসেছি, তুমি এসে ওকে দেখবে না, আদর করবে না, খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত ক'রে দেবে না?

রাত্রে অপু আর কিছুতেই ঘুমাইতে পারে না। চোখের সামনে নিরুপমার সেই হাসি-হাসি মুখ, সেই অনুযোগের সুর। আর একটি বার দেখা হয় না তাহার সঙ্গে ?

কাজলকে সে কলিকাতায় লইয়া আসিল পরদিন বৈকালের ট্রেনে। সন্ধ্যার পর গাড়িখানা শিয়ালদহ স্টেশনে ঢুকিল। এত আলো, এত বাড়ি-ঘর, এত গাড়িঘোড়া—কি কান্ড এ সব ! কাজল বিস্ময়ে একেবারে নিৰ্ব্বাক হইয়া গেল। সে শুধু বাবার হাত ধরিয়া চারিদিকে ডাগর চোখে চাহিতে চাহিতে চলিল।

হ্যারিসন রোডের বড় বড় বাড়িগুলা দেখাইয়া একবার সে বলিল—ওগুলো কাদের বাড়ি, বাবা ? অত বাড়ি ?

বাবার বাসাটায় ঢুকিয়া কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া সে গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া বড় রাস্তার গাড়িঘোড়া দেখিতে লাগিল। অবাক-জলপান জিনিসটা কি ? বাবার দেওয়া দুটো পয়সা কাছে ছিল, এক পয়সার অবাক-জলপান কিনিয়া খাইয়া সে সত্যই অবাক হইয়া গেল। মনে হইল, এমন অপূৰ্ব্ব জিনিস সে জীবনে আর কখনও খায় নাই। চাল-ছোলা ভাজা সে অনেক খাইয়াছে। কিন্তু কি মশলা দিয়া ইহারা তৈরী করে এই অবাক-জলপান ?

অপু তাহাকে ডাকিয়া বাসার মধ্যে লইয়া গেল—ওরকম একলা কোথাও যাস্ নে খোকা। হারিয়ে যাবি কি, কি হবে। যাওয়ার দরকার নেই।

কাজলের দুঃস্বপ্ন কাটিয়া গিয়াছে। আর দাদামশায়ের বকুনি খাইতে হইবে না, একা গিয়া দোতলার ঘরে রাত্রিতে শুইতে হইবে না, মামীমাদের ভয়ে পাতের প্রত্যেক ভাতটি খুঁটিয়া গুছাইয়া খাইতে হইবে না। একটি ভাত পাতের নিচে পড়িয়া গেলে বড় মামীমা বলিত—পেয়েছ পরের, দেবার ফেল আর ছড়াও; বাবার অন্ন তো খেতে হ'ল না কখনো !

ছেলেমানুষ হইলেও সব সময় এই বাবার খোঁটা কাজলের মনে বাজিত।

অপু বাসায় আসিয়া দেখিল, কে একখানা চিঠি দিয়াছে তাহার নামে—অপরিচিত হস্তাক্ষর। আজ পাঁচ-ছয় দিন পত্রখানা আসিয়া চিঠির বাক্সে পড়িয়া আছে। খুলিয়া পড়িয়া দেখিল একজন অপরিচিত ভদ্রলোক তাহাকে লিখিতেছেন, তাহার বই পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, শুধু তিনি নহেন, তাঁহার বাড়িসুদ্ধ সবাই—প্রকাশকের নিকট হইতে ঠিকানা জানিয়া এই পত্র লিখিতেছেন, তিনি তাহার সহিত দেখা করিতে চাহেন।

দু-তিনবার চিঠিখানা পড়িল। এতদিন পরে বোঝা গেল যে, অন্ততঃ একটি লোকেরও ভাল লাগিয়াছে তাহার বইখানা।

পরের প্রশংসা শুনিতে অপু চিরকালই ভালবাসে, তবে বহু দিন তাহার অদৃষ্টে সে জিনিসটা জোটে নাই—প্রথম যৌবনের সেই সরল হামবড়া ভাব বয়সের অভিজ্ঞতার ফলে দূর হইয়া গিয়াছিল, তবুও সে আনন্দের সহিত বন্ধুবান্ধবের নিকট চিঠিখানা দেখাইয়া বেড়াইল।

পরের দিন কাজল চিড়িয়াখানা দেখিল, গড়ের মাঠ দেখিল। মিউজিয়ামে অধুনালুপ্ত সেকালের কচ্ছপের প্রস্তরীভূত বৃহৎ খোলা দুটি দেখিয়া সে অনেকক্ষণ অবাক্ হইয়া চাহিয়া চাহিয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিল। পরে অপু ফিরিয়া যাইতেছে, কাজল বাবার কাপড় ধরিয়া টানিয়া দাঁড় করাইয়া বলিল—শোন বাবা !—কচ্ছপ দুটোর দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—আচ্ছা এ দুটোর মধ্যে যদি যুদ্ধ হয় তবে কে জেতে বাবা ! অপু গম্ভীর মুখে ভাবিয়া ভাবিয়া বলে—ওই বাঁ দিকেরটা জেতে।—কাজলের মনের দ্বন্দ্ব দূর হয়।

কিন্তু গোলদীঘিতে মাছের ঝাঁক দেখিয়া সে সকলের অপেক্ষা খুশী। এত বড় বড় মাছ আর এত একসঙ্গে ! মেলা ছেলেমেয়ে মাছ দেখিতে জুটিয়াছে বেকালে, সেও বাবার কথায় এক পয়সার মুড়ি কিনিয়া জলে ছড়াইয়া দিয়া অধীর আগ্রহে মাছের খেলা দেখিতে লাগিল।

তুমি ছিপে ধরবে বাবা ? কত বড় বড় মাছ ?

অপু বলিল—চুপ্ চুপ্ ও মাছ ধরতে দেয় না।

ফুটপাতে একজন ভিখারী বসিয়া। কাজল ভয়ের সুরে বলিল—শিগগির একটা পয়সা দাও বাবা, নইলে ছুঁয়ে দেবে।—তাহার বিশ্বাস, কলিকাতার যেখানে যত ভিখারী বসিয়া আছে ইহাদের পয়সা দিতেই হইবে, নতুবা ইহারা আসিয়া ছুঁইয়া দিবে, তখন তোমার বাড়ি ফিরিয়া স্নান করিতে হইবে সন্ধ্যাবেলা, কাপড় ছাড়িতে হইবে—সে এক মহা হাঙ্গামা।

বর্ষাকালের মাঝামাঝি অপুর চাকরিটি গেল। অর্থের এমন কষ্ট সে অনেক দিন ভোগ করে নাই। ভাল স্কুলে দিতে না পারিয়া সে ছেলেকে কর্পোরেশনের ফ্রি স্কুলে ভর্তি করিয়া দিল। ছেলেকে দুধ পর্যন্ত দিতে পারে না, ভাল কিছু খাওয়াইতে পারে না। বইয়ের বিশেষ কিছু আয় নাই। হাত এদিকে কপর্দকশূন্য।

কাজলের মধ্যে অপু একটা পৃথক জগৎ দেখিতে পায়। দুটো টিনের চাক্তি, গোটা দুই মার্বেল, একটা কল-টেপা খেলনা, মোটরগাড়ি, খান দুই বই—ইহাতে যে মানুষ কিসে এত আনন্দ পায়—অপু তাহা বুঝিতে পারে না। চঞ্চল ও দুষ্ট ছেলে—পাছে হারাইয়া যায়, এই ভয়ে অপু তাহাকে মাঝে মাঝে ঘরে চাবি দিয়া রাখিয়া নিজের কাজে বাহির হইয়া যায়—এক একদিন চার পাঁচ ঘণ্টাও হইয়া যায়—কাজলের কোনো অসুবিধা নাই—সে রাস্তার ধারের জানালাটায় দাঁড়াইয়া পথের লোকজন দেখিতেছে—না হয়, বাবার বইগুলো নাড়িয়া চাড়িয়া ছবি দেখিতেছে মোটের উপর আনন্দেই আছে।

এই বিরাট নগরীর জীবনস্রোত কাজলের কাছে অজানা দুর্বোধ্য। কিন্তু তাহার নবীন মন ও নবীন চক্ষু যে-সকল জিনিস দেখে ও দেখিয়া আনন্দ পায় বয়স্ক লোকের ক্লান্ত দৃষ্টিতে তাহা অতি তুচ্ছ। হয়তো আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলে—দ্যাখো বাবা, ওই চিলটা একটা কিসের ডাল মুখে ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল, সামনের ছাদের আলসেতে লেগে ডালটা ওই দ্যাখো বাবা রাস্তায় পড়ে গিয়েচে—

বাবার সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইয়া এত ট্রাম, মোটর, লোকজনের ভিড়ের মাঝখানে কোথায় একটা কাক ফুটপাতের ধারে ড্রেনের জলে স্নান করিতেছে তাই দেখিয়া তাহার মহা আনন্দ—তাহা আবার বাবাকে না দেখাইলে কাজলের মনে তৃপ্তি হইবে না। সব বিষয়েই বাবাকে আনন্দের ভাগ না দিতে পারিলে, কাজলের আনন্দ পূর্ণ হয় না। খাইতে খাইতে বেগুনিটা, কি তেলে-ভাজা কচুরিখানা এক কামড় খাইয়া ভাল লাগিলে বাকী আধখানা বাবার মুখে গুঁজিয়া দিবে—অপুও তাহা খাইয়া ফেলে—ছিঃ, আমার মুখে দিতে নেই—একথা বলিতে তার প্রাণ কেমন করে—কাজেই পিতৃত্বের গাম্ভীর্যভরা ব্যবধান অকারণে গড়িয়া উঠিয়া পিতা-পুত্রের সহজ সরল মৈত্রীকে বাধাদান করে নাই, কাজল জীবনে বাবার মত সহচর পায় নাই—এবং অপুও বোধ হয় কাজলের মত বিশ্বস্ত ও একান্ত নির্ভরশীল তরুণ বন্ধু খুব বেশী পায় নাই জীবনে।

আর কি সরলতা!—পথে হয়ত দুজনে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, কাজল বলিল—শোনো বাবা, একটা কথা—শোনো, চুপি চুপি বলব—পরে পথের এদিক ওদিক চাহিয়া লাজুক মুখে কানে কানে বলে—ঠাকুর বড় দুটোখানি ভাত দ্যায় হোটেলে—আমার খেয়ে পেট ভরে না—তুমি বলবে বাবা ? বললে আর দুটো দেবে না ?

দিনকতক গলির একটা হোটেলে পিতাপুত্রে দুজনে খায়—হোটেলের ঠাকুর হয়ত শহরের ছেলের হিসেবে ভাত দেয় কাজলকে—কিন্তু পাড়াগাঁয়ের ছেলে কাজল বয়সের অনুপাতে দুটি বেশী ভাতই খাইয়া থাকে।

অপু মনে মনে হাসিয়া ভাবে—এই কথা আবার কানে কানে বলা !··· রাস্তার মধ্যে ওকে চেনেই বা কে আর শুনছেই বা কে !···ছেলেটা বেজায় বোকা।

আর একদিন কাজল লাজুক মুখে বলিল—বাবা একটা কথা বলব ?

—কি ?

—নাঃ বাবা—বলব না—

—বল্ না কি ?

কাজল সরিয়া আসিয়া চুপি চুপি লাজুক সুরে বলিল—তুমি মদ খাও বাবা ?

অপু বিস্মিত হইয়া বলিল—মদ ?···কে বলেছে তোকে ?

—সেই যে সেদিন খেলে ? সেই রাস্তার মোড়ে একটা দোকান থেকে ? পান কিনলে আর সেই যে—

অপু প্রথমটা অবাক হইয়া গিয়াছিল—পরে বুঝিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল,—দূর বোকা—সে হলো লেমনেড্—সেই পানের দোকানে তো ?···তোর ঠাণ্ডা লেগেছিল বলে তোকে দিই নি।···খাওয়াব তোকে একদিন, ও একরকম মিষ্টি শরবৎ। দূর—

কাজলের কাছে অনেক ব্যাপার পরিষ্কার হইয়া গেল। কলিকাতায় আসিয়া সে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছিল যে এখানে মোড়ে মোড়ে মদের দোকান—পান ও মদ একসঙ্গে বিক্রয় হয় প্রায় সর্বত্র। সোডা লেমনেড্ সে কখনো দেখে নাই ইহার আগে, জানিত না—কি করিয়া সে ধরিয়া লইয়াছে বোতলে ওগুলো মদ। তাই তো সেদিন বাবাকে খাইতে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছিল—এত দিন লজ্জায় বলে নাই। সেই দিনই অপু তাহাকে লেমনেড্ খাওয়াইয়া তাহার ভ্রম ঘুচাইয়া দিল।

এই অবস্থায় একদিন সে বিমলেন্দুর পত্র পাইল, একবার আলিপুরে লীলার ওখানে পত্রপাঠ আসিতে। লীলার ব্যাপার সুবিধা নয়। তাহারও আর্থিক অবস্থা বড় শোচনীয়। নিজের যাহা কিছু ছিল গিয়াছে, আর কেহ দেয়ও না, বাপের বাড়িতে তাহার নাম করিবার পর্যন্ত উপায় নাই। ইদানীং তাহার মা কাশী হইতে তাহাকে টাকা পাঠাইতেন। বিমলেন্দু নিজের খরচ হইতে বাঁচাইয়া কিছু টাকা দিদির হাতে দিয়া যাইত। তাহার উপর মুশকিল এই যে লীলা বড়মানুষের মেয়ে, কষ্ট করা অভ্যাস নাই, হাত ছোট করিতে জানে না।

এই রকম কিছুদিন গেল। লীলা যেন দিন দিন কেমন হইয়া যাইতেছিল। অমন হাস্য-মুখী লীলা, তাহার মুখে হাসি নাই, মনমরা বিষণ্ণ ভাব। শরীরও যেন দিন দিন শুকাইয়া যাইতে থাকে। গত বর্ষাকাল এই ভাবেই কাটে, বিমলেন্দু পূজার সময় পীড়া-পীড়ি করিয়া ডাক্তার দেখায়। ডাক্তার বলেন, থাইসিসের সূত্রপাত হইয়াছে, সতর্ক হওয়া দরকার।

বিমলেন্দু লিখিয়াছে—লীলার খুব জ্বর। ভুল বকিতেছে, কেহই নাই, সে একা ও একটি চাকর সারারাত জাগিয়াছে, আত্মীয়স্বজন কেহ ডাকিলে আসিবে না, কি করা যায় এ অবস্থায়! অপু এখানে আজকাল তত আসিতে পারে না, অনেকদিন লীলাকে দেখে নাই। লীলার মুখ যেন রাঙা, অস্বাভাবিকভাবে রাঙা ও উজ্জ্বল দেখাইতেছে।

বিমলেন্দু শুষ্কমুখে বলিল—কাল রঘুয়ার মুখে খবর পেয়ে এসে দেখি এই অবস্থা। এখন কি করি বলুন তো ? বাড়ির কেউ আসবে না, আমি কাউকে বলতেও যাব না, মাকে একখানা টেলিগ্রাম করে দেব ?

অপু বলিল—মা যদি না আসেন ?

—কি বলেন ? এক্ষুনি ছুটে আসবেন—দিদি-অন্ত প্রাণ তাঁর। তিনি যে আজ চার

বছর কলকাতামুখো হন নি, সে এই দিদির কাণ্ডই তো। মুশকিল হয়েছে কি জানেন, কাল রাত্তও বকেছে, শুধু খুকী, খুকী, অথচ তাকে আনানো অসম্ভব।

অপু বলিল—আর এক কাজ করতে হবে, একজন নার্স আমি নিয়ে আসি ঠিক করে। মেয়েমানুষের নার্সিং পুরুষকে দিয়ে হয় না। বসো তোমরা।

দুই তিন দিনে সবাই মিলিয়া লীলাকে সারাইয়া তুলিল। জ্ঞান হইলে সে একদিন কেবল অপুকে ঘরের মধ্যে দেখিতে পাইয়া কাছে ডাকিয়া ক্ষীণ সুরে বলিল—কখন এলে অপূর্ব ?

রোগ হইতে উঠিয়াও লীলার স্বাস্থ্য ভাল হইল না। শুইয়া আছে তো শুইয়াই আছে, বসিয়া আছে তো বসিয়াই আছে। মাথার চুল উঠিয়া যাইতে লাগিল। আপন মনে গুম্ হইয়া বসিয়া থাকে, ভাল করিয়া কথাও বলে না, হাসেও না। কোথাও নড়িতে চড়িতে চায় না। ইতিমধ্যে কাশী হইতে লীলার মা আসিলেন। বাপের বাড়ি থাকেন, রোজ মোটরে আসিয়া দু'তিন ঘণ্টা থাকেন—আবার চলিয়া যান। ডাক্তার ব'লিয়াছে, স্বাস্থ্যকর জায়গায় না লইয়া গেলে রোগ সারিবে না।

দুপুর বেলাটা - কিন্তু একটু মেঘ করার দরুন রৌদ্র নাই কোথাও। অপু লীলার বাসায় গিয়া দেখিল লীলা জানালার ধারে বসিয়া আছে। সে সব সময় আসিতে পারে না, কাজলকে একা বাসায় রাখিয়া আসা চলে না। ভারী চঞ্চল ও রীতিমত নির্বোধ ছেলে। তাহা ছাড়া রান্নাবান্না ও সমুদয় কাজ করিতে হয় অপুর, কাজলকে দিয়া কুটাগাছটা ভাঙিবার সাহায্য নাই, সে খেলাধুলা লইয়া সারাদিন মহাব্যস্ত—অপু তাহাকে কিছু করিতে বলেও না, ভাবে—আহা, খেলুক একটু। পুওর মাদারলেস্ চাইল্ড!

লীলা ম্লান হাসিয়া বলিল—এস।

—এরা কোথায় ? বিমলেন্দু কোথায় ? মা এখনও আসেন নি ?

—বসো। বিমলেন্দু এই কোথায় গেল। নার্স তো নিচে, বোধ হয় খেয়ে একটু ঘুমুচ্ছে।

—তারপর কোথায় যাওয়া ঠিক হ'ল—সেই ধরমপুরেই ? সঙ্গে যাবেন কে—

—মা আর বিমল।

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ করিয়া রহিল। পরে লীলা তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল—আচ্ছা অপূর্ব, বর্ধমানের কথা মনে হয় তোমার ?

অপু ভাবিল, আহা, কি হয়ে গিয়েচে লীলা!

মুখে বলিল—মনে থাকবে না কেন খুব মনে আছে।

লীলা অন্যমনস্কভাবে বলিল—তোমরা সেই ওদিকের একটা ঘরে থাকতে—সেই আমি যেতুম—

—তুমি আমাকে একটা ফাউন্টেন পেন দিয়েছিলে মনে আছে লীলা ? তখন ফাউন্টেন পেন নতুন উঠেচে।—মনে নেই তোমার ?

লীলা হাসিল।

অপু হিসাব করিয়া বলিল—তা ধর প্রায় আজ বিশ-বাইশ বছর আগেকার কথা।

লীলা খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—অপূর্ব, কেউ মোটরটা কিনবে বলতে পারো, তোমার সন্ধানে আছে ?

লীলার অত সাধের গাড়িটা···এত কষ্টে পড়িয়াছে সে!—

লীলা বলিল—আমি সে সব গ্রাহ্য করি নে, কিন্তু মা-ও ভাবেন—যাক্ সে সব কথা। তুমি আমাকে কোথাও নিয়ে যাবে অপূর্ব ?

—কোথায় ?

—যেখানে হোক্। তোমার সেই পোর্তো প্রাতায় - মনে নেই, সেই যে সমুদ্রের মধ্যে কোন্ ডুবোজাহাজ উদ্ধার করে বলেছিলে সোনা আনবে? সেই যে 'মুকুলে' পড়ে বলেছিলে ?

কথাটা অপুর মনে পড়িল। হাসিয়া বলিল, হঁ্যা সেই—ঠিক। উঃ সে কথা মনে আছে তোমার!

—আমি বলেছিলাম, কেমন ক'রে যাবে ? তুমি বলেছিলে, জাহাজ কিনে সমুদ্রে যাবে।

অপু হাসিল। শৈশবের সাধ-আশার নিষ্ফলতা সম্বন্ধে সে কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল, লীলাও এ ধরণের নানা আশা পোষণ করিত, বিদেশে যাইবে, বড় আর্টিস্ট হইবে ইত্যাদি—ওর সামনে আর সে কথা বলার আবশ্যক নাই।

কিন্তু লীলাই আবার খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—যাবে না ? যাও যাও—পরে হি-হি করিয়া হাসিয়া কেমন একটা অদ্ভুত সুরে বলিল - সমুদ্র থেকে সোনা আনবে তো তোমরাই···পোর্তো প্লাতা থেকে, না ?···দ্যাখো, এখনও ঠিক মনে ক'রে রেখেছি—রাখি নি ? হি-হি—একটু চা খাবে ?

লীলার মুখের শীর্ণ হাসি ও তাহার বুদ্ধিনাশীহারা উদ্‌ভ্রান্ত আলুগা ধরণের কথাবার্ত্তা অপুর বুকে তীক্ষ্ন তীরের মত বিঁধিল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝিল এত ভালবাসে নাই সে লীলাকে আর কোনো দিন আজ যত বাসিয়াছে।

—দুপুর বেলা চা খাব কি ? সেজন্য ব্যস্ত হয়ো না লীলা।

লীলা বলিল—তোমার মুখে সেই পুরনো গানটা শুনি নি অনেকদিন - সেই 'আমি চঞ্চল হে'—গাও তো ?

মেঘলা দিনের দুপুর। বাহিরের দিকে একটা সাহেব-বাড়ির কম্পাউণ্ডে গাছের ডালে অনেকগুলি পাখি কলরব করিতেছে। অপু গান আরম্ভ করিল, লীলা জানালার ধারেই বসিয়া বাহিরের দিকে মুখ রাখিয়া গানটা শুনিতে লাগিল। লীলার মনে আনন্দ দিবার জন্য অপু গানটা দু-তিনবার ফিরাইয়া ফিরাইয়া গাহিল। গান শেষ হইয়া গেল, তবু লীলা জানালার বাহিরেই চাহিয়া আছে, অন্যমনস্কভাবে যেন কি জিনিস লক্ষ্য করিতেছে।

খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল। দুজনেই চুপ করিয়া ছিল। হঠাৎ লীলা বলিল—একটা কথার উত্তর দেবে ?

লীলার গলার স্বরে অপু বিস্মিত হইল। বলিল—কি কথা ?···

—আচ্ছা, বেঁচে লাভ কি ?

অপু এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না—বলিল—এ কথার কি—এ কথা কেন ?

—বল না ?···

—না লীলা। এ ধরণের কথাবার্ত্তা কেন ? এর দরকার নেই।

—আচ্ছা, একটা সত্যি কথা বলবে ?··

—কি বল ?···

—আচ্ছা, আমাকে লোকে কি ভাবে ?

সেই লীলা! তাহার মুখে এ রকম দুর্ব্বল ধরণের কথাবার্ত্তা, সে কি কখনও স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল! অপু এক মুহূর্ত্তে সব বুঝিল—অভিমানিনী তেজস্বিনী লীলা আর সব সহ্য করিতে পারে, লোকের ঘৃণা তাহার অসহ্য। গত কয়েক বৎসরে ঠিক তাহাই জুটিয়াছে তাহার কপালে। এতদিন সেটা বোঝে নাই—সম্প্রতি বুঝিয়াছে—জীবনের উপর টান হারাইতে বসিয়াছে।

অপুর গলায় যেন একটা ডেলা আটকাইয়া গেল। সে যতদূর সম্ভব সহজ সুরে বলিল —এ ধরণের কথা সে এ পর্যন্ত কোনো দিন লীলার কাছে বলে নাই, কোনো দিন না— দ্যাখো লীলা, অন্য লোকের কথা জানি নে, তবে আমার কথা শুনবে? আমি তোমাকে আমার চেয়ে অনেক বড় তো ভাবিই—অনেকের চেয়ে বড় ভাবি—তোমাকে কেউ চেনে নি, চিনলে না, এই কথা ভাবি।—আজ নয় লীলা, এতটুকু বেলা থেকে তোমায় আমি জানি, অন্য লোক ভুল করতে পারে, কিন্তু আমি—

লীলা যেন অবাক্ হইয়া গেল, কখনও সে এ রকম দেখে নাই অপুকে। সে জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল—সত্যি বলছ?—কিন্তু অপুর মুখ দেখিয়া হয়ত বুঝিল প্রশ্নটা অনাবশ্যক। পরক্ষণেই খেয়ালী অপু আর একটা কাজ করিয়া বসিল—এটাও সে ইহার আগে কখনো করে নাই। লীলার খুব কাছে সরিয়া গিয়া তার ডান হাতখানা নিজের দুহাতের মধ্যে লইয়া লীলাকে নিজের দিকে টানিয়া তার মুখ ফিরাইল। পরে গভীর স্নেহে তার উত্তপ্ত ললাটে, কানের পাশের চূর্ণ কুন্তলে হাত বুলাইতে বুলাইতে দৃঢ়স্বরে বলিল— তুমি আমি ছেলেবেলার সাথী, লীলা—আমরা কেউ কাউকে ভুলব না—কোনো অবস্থাতেই না। এতদিন ভুলি নি-ও কখনো লীলা।

লীলার সারাদেহ শিহরিয়া উঠিল···যাহা আজ অপুর মুখে, কথার সুরে ডাগর চোখের অকপট দৃষ্টিতে পাইল—জীবনে কোনোদিন কাহারও কাছ হইতে তাহা সে কখনও পায় নাই—আজ সে দেখিল অপুকে চিরকাল ভালবাসিয়া আসিয়াছে—বিশেষ করিয়া অপুর মাতৃবিয়োগের পর লালদীঘির সামনের ফুটপাতে তাকে যেদিন শুষ্কমুখে নিরাশ্রয় ভাবে বেড়াইতে দেখিয়াছিল—সেদিনটি হইতে।

···অপুর চমক ভাঙিল—লীলা কখন তাহার বক্ষে মুখ লুকাইয়াছিল তাহার অশ্রু-প্লাবিত পাণ্ডুর মুখখানি।···

অপু বাহিরে চলিয়া আসিল। সে অনুভব করিতেছিল, লীলার মত সে কাহাকেও ভাল-বাসে না—সেই গভীর অনুকম্পামিশ্রিত ভালবাসা, যা মানুষকে সব ভুলাইয়া দেয়, আত্ম-বিসর্জনে প্রণোদিত করে।

লীলাকে যে করিয়া হউক সে সুখী করিবে। লীলাকে এতটুকু কষ্টে পড়িতে দিবে না, নিজেকে ছোট ভাবিতে দিবে না। যাহার ইচ্ছা লীলাকে ছাড়ুক, সে লীলাকে ছাড়িতে পারিবে না। সে লীলাকে কোথাও লইয়া যাইবেই—এ অবস্থায় কলিকাতায় থাকিলে লীলা বাঁচিবে না। বিশ্ব একদিকে—লীলার মুখের অনুরোধ আর একদিকে।

সারাপথ ভাবিতে ভাবিতে ফিরিল।

দিন তিনেক পরে।

বেলা আটটা। অপু সকালে স্নান সারিয়া কাজলকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইবে—এমন সময়ে মিঃ লাহিড়ীর ছোট নাতি অরুণ ঘরে ঢুকিল। এককোণে ডাকিয়া লইয়া চুপি চুপি উত্তেজিত সুরে বলিল—শিগ্‌গির আসুন, দিদি কাল রাত্রে বিষ খেয়েছে।

বিষ! সর্ব্বনাশ!—লীলা বিষ খাইয়াছে!

কাজলকে কি করা যায়?—খোকা তুই—বরং—ঘরে থাক একা। আমি একটা কাজে যাচ্ছি। দেরি হবে ফিরতে।

কিন্তু কাজলের চোখে ধূলা দেওয়া অত সহজ নয়। কেন বাবা? কি কাজ? কোথায়? কত দেরি হইতে পারে?···কোনোমতে ভুলাইয়া তাহাকে রাখিয়া দুজনে ট্যাক্সি ধরিয়া লীলার বাসায় আসিল। আরও দুখানা মোটর দাঁড়াইয়া আছে! ঢুকিতেই লীলাদের বাড়ির ডাক্তার

বন্ধু কেদারবাবুর সঙ্গে দেখা। অরুণ ব্যস্তসমস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—কি অবস্থা এখন ?

কেদারবাবু বলিলেন—অবস্থা তেমনি। আর একটা ইন্‌জেক্‌শান করেছি। হিল্‌কক্ সাহেব এলে যে বুঝতে পারি। অপুর প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন—বড্ড স্যাড্ ব্যাপার - বড্ড স্যাড্। জিনিসটা ? মরফিয়া। রাত্রে কখন খেয়েছে, তা তো বোঝা যায় নি, আজ সকালে তাও বেলা হলে তবে টের পাওয়া গেল। কর্ণেল হিল্‌কক্‌কে আনতে লোক গিয়েছে —তিনি না আসা পর্যন্ত—

অরুণের সঙ্গে সঙ্গে উপরের সেই ঘরটাতে গেল—মাত্র দিন তিনেক আগে যেটাতে বসিয়া সে লীলাকে গান শুনাইয়া গিয়াছে। প্রথমটা কিন্তু সে ঘরে ঢুকিতে পারিল না, তাহার হাত কাঁপিতেছিল, পা কাঁপিতেছিল। ঘরটা অন্ধকার, জানালার পর্দাগুলো বন্ধ, ঘরে বেশী লোক নাই, কিন্তু বারান্দাতে আট-দশজন লোক। সবাই পদ্মপুকুরের বাড়ির।— সবাই চুপি চুপি কথা কহিতেছে, পা টিপিয়া টিপিয়া হাঁটিতেছে। কিছু বিশেষ অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটিয়াছে এখানে, এমন বলিয়া কিন্তু অপুর মনে হইল না। অথচ একজন—যে পৃথিবীর সুখকে এত ভালবাসিত, আকাঙ্ক্ষা করিত, আশা করিত—উপেক্ষায় মুখ বাঁকাইয়া পৃথিবী হইতে ধীরে ধীরে বিদায় লইতেছে।

সেদিনকার সেই জানালার পাশের খাটেই লীলা শুইয়া। সংজ্ঞা নাই, পাণ্ডুর, কেমন যেন বিবর্ণ—ঠোঁট ঈষৎ নীল। একখানা হাত খাটের বাহিরে ঝুলিতেছিল, সে তুলিয়া দিল। গায়ে রেশমের বরফি-কাটা বিলাতী লেপ। কি অপূর্ব যে দেখাইতেছে লীলাকে! মরণা-হত মৃত্যুপাণ্ডুর মুখের সৌন্দর্য যেন এ পৃথিবীর নয়—কিংবা হরিদ্রাভ হাতীর দাঁতের খোদাই মুখ যেন। দেবীর মত সৌন্দর্য্য আরও অপার্থিব হইয়া উঠিয়াছে।

তাহার মনে হইল লীলা ঘামিতেছে। তবে বোধ হয় আর ভয় নাই, বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। চুপি চুপি বলিল—ঘামছে কেন ?

ডাক্তারবাবু বলিলেন—ওটা মরফিয়ার সিম্‌টম্।

মিনিট-দশ কাটিল। অপু বাহিরের বারান্দাতে আসিয়া দাঁড়াইল। পাশের ঘরে লোকেরা একবার ঢুকিতেছে, আবার বাহির হইতেছে, অনেকেই আসিয়াছে, কেবল মিঃ লাহিড়ী ও লীলার মা নাই। মিঃ লাহিড়ী দার্জ্জিলিং-এ, লীলার মা মাত্র কাল এখান হইতে বর্দ্ধমানে কি কাজে গিয়াছেন। লীলা সত্যই অভাগিনী!

এমন সময় নীচে একটা গোলমাল। একখানা গাড়ির শব্দ উঠিল। ডাক্তার সাহেব আসিয়াছেন—তিনি উপরে উঠিয়া আসিলেন, পিছনে কেদারবাবু ও বিমলেন্দু। অনেকেই ঘরে ঢুকিতে যাইতেছিল, কেদারবাবু নিষেধ করিলেন। মিনিট সাতেক পরে ডাক্তার সাহেব চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন—Too late, কোনও আশা নাই।

আরও আধঘণ্টা। এত লোক!—অপু ভাবিল, ইহারা এতকাল কোথায় ছিল ? আজ too late! Too late!

লীলা মারা গেল বেলা দশটায়। অপু তখন খাটের পাশেই দাঁড়াইয়া। এতক্ষণ লীলা চোখ বুজিয়াই ছিল, সে সময়টা হঠাৎ চোখ মেলিয়া চাহিল—তারাগুলা বড় বড়, তাহার দিকেও চাহিল, অপুর দেহে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল—লীলা তাহাকে চিনিয়াছে বোধ হয়।

... কিন্তু পরক্ষণেই দেখিল—দৃষ্টি অর্থহীন, আভাহীন, উদাসীন, অস্বাভাবিক। তারপরই লীলা যেন চোখ তুলিয়া কড়িকাঠে, সেখান হইতে আরও অস্বাভাবিকভাবে মাথার শিয়রে কার্নিসের বিটের দিকে ইচ্ছা করিয়াই কি দেখিবার জন্য চোখ ঘুরাইল—স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ ওরকম চোখ ঘুরাইতে পারে না।

তারপরেই সবাই ঘরের বাহির হইয়া আসিল। কেবল বিমলেন্দু ছেলেমানুষের মত

চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অপুও ফিরিল। হায়রে পাপ, হায় পুণ্য! কে মানদণ্ডে তৌল করিবে? মূর্খ··· মূর্খ···মূর্খ···মূর্খ···লীলার বিচার করিবে কে? এই সব মূর্খের দল? দুঃখের মধ্যে তাহার হাসি আসিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

কাজল এই কয়মাসেই বেশ লেখাপড়া শিখিয়াছে। বাড়িতেই পড়ে—অনেক সময় নিজের বই রাখিয়া বাবার বইগুলির পাতা উল্টাইয়া দেখে। আজকাল বাবা কি কাজে প্রায় সর্বদাই বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়, এই জন্য বাবার কাজও সে অনেক করে।

বাসায় অনেকগুলো বিড়াল জুটিয়াছে। সে যখন প্রথম আসিয়াছিল তখন ছিল একটা মাত্র বিড়াল—এখন জুটিয়াছে আরও গোটা তিন। কাজল খাইতে বসিলেই পাতের কাছে সবগুলো আসিয়া জোটে। তাহারা ভাত খায় না, খায় শুধু মাছ। কাজল প্রথমে ভাবে কাহাকেও সে এক টুকরাও দিবে না—করুক মিউ মিউ। কিন্তু একটু পরে একটা অল্প বয়সের বিড়ালের উপর বড় দয়া হয়। এক টুকরো তাহাকে দিতেই অন্য সবগুলো করুণসুরে ডাক শুরু করে—কাজল ভাবে—আহা, ওরা কি বসে বসে দেখবে—দিই ওদেরও একটু একটু। একে ওকে দিতে কাজলের মাছ প্রায় সব ফুরাইয়া যায়। বাঁড়ুয্যেদের ছেলে অনু একটা বিড়ালছানাকে রাস্তার উপর দিয়া যে ইঞ্জিন যায়, ওরই তলায় ফেলিয়া দিয়াছিল—ভাগ্যে সেটা মরে নাই—যে ইঞ্জিন চালায়, সে ততক্ষণাৎ থামাইয়া ফেলে। কাজল আজকাল একটা কেরোসিন কাঠের বাক্সে বিড়ালগুলির থাকিবার জায়গা করিয়া দিয়াছে।

রাত্রে শুইয়াই কাজল অমনি বলে,—গল্প বল বাবা। আচ্ছা বাবা, ওই যে রাস্তায় ইঞ্জিন চালায় যারা, ওরা কি যখন হয় থামাতে পারে, যেদিকে ইচ্ছে চালাতে পারে? সে মাঝে মাঝে গলির মুখে দাঁড়াইয়া বড় রাস্তার স্টীম রোলার চালাইতে দেখিয়াছে। যে লোকটা চালায় তাহার উপর কাজলের মনে মনে হিংসা হয়। কি মজা ওই কাজ করা! যখন খুশি চালানো, যতদূর হয়, যখন খুশি থামানো। মাঝে মাঝে সিটি দেয়, একটা চাকা বসিয়া বসিয়া ঘোরায়। সব চুপ করিয়া আছে, সামনের একটা ডাণ্ডা যেই টেপে অমনি ঘটাং ঘটাং বিকট শব্দ।

এই সময়ে অপুর হঠাৎ অসুখ হইল। সকালে অন্য দিনের মত আর বিছানা হইতে উঠিতেই পারিল না—বাবা সকালে উঠিয়া মাদুর পাতিয়া বসিয়া তামাক খায়, কাজলের মনে হয় সব ঠিক আছে—কিন্তু আজ বেলা দশটা বাজিল, বাবা এখনও শুইয়া—জগৎটা যেন আর স্থিতিশীল নয়, নিত্য নয়·সব কি যেন হইয়া গিয়াছে। সেই রোদ উঠিয়াছে, কিন্তু রোদের চেহারা অন্য রকম, গলিটার চেহারা অন্য রকম, কিছু ভাল লাগে না, বাবার অসুখ এই প্রথম, বাবাকে আর কখনো সে অসুস্থ দেখে নাই·কাজলের ক্ষুদ্র জগতে সব যেন ওলট-পালট হইয়া গেল। সারা দিনটা কাটিল, বাবার সাড়া নাই, সংজ্ঞা নাই—জ্বরে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া। কাজল পাঁউরুটি কিনিয়া আনিয়া খাইল। সন্ধ্যা কাটিয়া গেল। কাজল পরমানন্দ পানওয়ালার দোকান হইতে তেল পুরিয়া আনিয়া লণ্ঠন জ্বালিল। বাবা তখনও সেই রকমই শুইয়া। কাজল অস্থির হইয়া উঠিল—তাহার কোনও অভিজ্ঞতা নাই এ সব বিষয়ে, কি এখন সে করে? দু-একবার বাবার কাছে গিয়া ডাকিল, জ্বরের ঘোরে বাবা একবার বলিয়া উঠিল—স্টোভটা নিয়ে আয়, ধরাই খোকা—স্টোভটা—

অর্থাৎ সে স্টোভটা ধরাইয়া কাজলকে রাঁধিয়া দিবে।

কাজল ভাবিল, বাবাও তো সারাদিন কিছু খায় নাই—স্টোভ ধরাইয়া বাবাকে সাবু তৈরি করিয়া দিবে। কিন্তু স্টোভ সে ধরাইতে জানে না, কি করে এখন? স্টোভটা ঘরের মেঝেতে লইয়া দেখিল তেল নাই। আবার পরমানন্দের দোকানে গেল। পরমানন্দকে সব কথা খুলিয়া বলিল। পাশেই একজন নতুন-পাশকরা হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের ডিস্পেন্সারী। ডাক্তারটি একেবারে নতুন, একা ডাক্তারখানায় বসিয়া কড়ি-বরগা গুণিতেছিলেন, তিনি তাহাদের সঙ্গে বাসায় আসিলেন, অপুকে ডাকিয়া তাহার হাত ও বুক দেখিলেন, কাজলকে ঔষধ লইবার জন্য ডাক্তারখানায় আসিতে বলিলেন। অপু তখন একটু ভাল সে ব্যস্তসমস্ত হইয়া ক্ষীণসুরে বলিল—ও পারবে না, রাত্তিরে এখন থাক্, ছেলেমানুষ, এখন থাক্ -

এই সবের জন্য বাবার উপর রাগ হয় কাজলের। কোথায় সে ছেলেমানুষ, সে বড় হইয়াছে। কোথায় সে না যাইতে পারে, বাবা পাঠাইয়া দেখুক দিকি সে কেমন পারে না? বিশেষতঃ অপরের সামনে তাহাকে কচি বলিলে, ছেলেমানুষ বলিলে, আদর করিলে বাবার উপর তাহার ভীষণ রাগ হয়।

বাবার সামনে স্টোভ ধরাইতে গেলে কাজল জানে বাবা বারণ করিবে,—বলিবে—'উঁহু, করিস নে খোকা, হাত পুড়িয়ে ফেলবি। সে সরু বারান্দাটার এক কোণে স্টোভটা লইয়া গিয়া কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও সেটা জ্বালিতে পারিল না। অপু একবার বলিল—কি কচ্ছিস্ ও খোকা, কোথায় গেলি ও খোকা? আঃ, বাবার জ্বালায় অস্থির।··· ঘরে আসিয়া বলিল—বাবা কি খাবে? মিছরী আর বিস্কুট কিনে আনবো? অপু বলিল—না না, সে তুই পারবি নে। আমি খাবো না কিছু। লক্ষ্মী বাবা, কোথাও যেও না ঘর ছেড়ে, রাত্তিরে কি কোথাও যায়? হারিয়ে যাবি—

হ্যাঁ, সে হারাইয়া যাইবে! ছাড়িয়া দিলে সে সব জায়গায় যাইতে পারে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র একা যাইতে পারে, বাবার কথা শুনিলে তাহার হাসি পায়।

পরদিন সকালে উঠিয়া কাজল প্রথমে ঔষধ আনিল। বাবার জন্য ফুটপাতের দোকান হইতে খেজুর ও কমলালেবু কিনিল। একটু দূরের দুধের দোকান হইতে জ্বাল-দেওয়া গরম দুধও কিনিয়া আনিল। দুধের ঘটি হাতে ছেলে ফিরিলে অপু বলিল—কথা শুনবি নে খোকা? দুধ আনতে গেলি রাস্তা পার হয়ে সেই আমহার্স্ট স্ট্রীটের দোকানে? এখন গাড়ি ঘোড়ার বড় ভিড়—যেও না বাবা··· দে বাকী পয়সা।

খুচরা পয়সা না থাকায় ছেলেকে সকালে ঔষধের দামের জন্য একটা টাকা দিয়াছিল, কাজল টাকাটা ভাঙাইয়া এগুলি কিনিয়াছে, নিজে মাত্র এক পয়সার বেগুনি খাইয়াছিল (তেলভাজা খাবারের উপর তাহার বেজায় লোভ), বাকী পয়সা বাবার হাতে ফেরত দিল।

অপু বলিল—একখানা পাঁউরুটি নিয়ে আয়, ওই দুধের আমি অতটা তো খাবো না, তুই অর্দ্ধেকটা রুটি দিয়ে খা—

—না বাবা, এই তো কাছেই হোটেল, আমি ওখানে গিয়ে—

—না, না, সেও তো রাস্তা পার হয়ে, আপিসের সময় এখন মোটরের ভিড়, এ-বেলা ওই খাও বাবা, আমি তোমাকে ওবেলা দুটো রেঁধে দেবো।

কিন্তু দুপুরের পর অপুর আবার খুব জ্বর আসিল। রাত্রের দিকে এত বাড়িল, আর কোনও সংজ্ঞা রহিল না। কাজল দোরে চাবি দিয়া ছুটিয়া আবার ডাক্তারের কাছে গেল। ডাক্তার আবার আসিলেন, মাথায় জলপটির ব্যবস্থা দিলেন, ঔষধও দিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—এখানে আর কেউ থাকে না? তোমরা দুজন মোটে?···অসুখ যদি বাড়ে, তবে বাড়িতে টেলিগ্রাম ক'রে দিতে হবে। দেশে কে আছে?

—দেশে কেউ নেই। আমার মা তো নেই।···আমি আর বাবা শুধু—

—মুশকিল। তুমি ছেলেমানুষ কি করবে? হাসপাতালে দিতে হবে তা হলে, দেখি আজ রাতটা—

কাজলের প্রাণ উড়িয়া গেল। হাসপাতাল! সে শুনিয়াছে সেখানে গেলে মানুষ আর ফেরে না! বাবার অসুখ কি এত বেশী যে, হাসপাতালে পাঠাইতে হইবে?

ডাক্তার চলিয়া গেল। বাবা শুইয়া আছে—শিয়রের কাছে আধভাঙা ডালিম, গোটা-কতক লেবুর কোয়া। পালংশাকের গোড়া বাবা খাইতে ভালবাসে, বাজার হইতে সেদিন পালংশাকের গোড়া আনিয়াছিল, ঘরের কোণে চুপড়িতে শুকাইতেছে—বাবা যদি আর না ওঠে? না রাঁধে? কাজলের গলায় কিসের একটা ডেলা ঠেলিয়া উঠিল। চোখ ফাটিয়া জল আসিল—ছোট বারান্দাটার এক কোণে গিয়া সে আকুল হইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। ভগবান বাবাকে সারাইয়া তোল, পালংশাকের গোড়া বাবাকে খাইতে না দেখিলে সে বুক ফাটিয়া মরিয়া যাইবে—ভগবান বাবাকে ভাল করিয়া দাও।

মেঝেতে তাহার পড়িবার মাদুরটা পাতিয়া সে শুইয়া পড়িল। ঘরে লণ্ঠনটা জ্বালিয়া রাখিল—একবার নাড়িয়া দেখিল কতটা তেল আছে, সারারাত জ্বলিবে কি না। অন্ধকারে তাহার বড় ভয়—বিশেষ বাবা আর নড়ে না, চড়ে না, কথাও বলে না।

দেয়ালে কিসের সব যেন ছায়া! কাজল চক্ষু বুজিল।

মাস দেড় হইল অপু সারিয়া উঠিয়াছে। হাসপাতালে যাইতে হয় নাই, এই গলিরই মধ্যে বাঁড়ুযোরা বেশ সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ, তাঁহাদের এক ছেলে ভাল ডাক্তার। তিনি অপুর বাড়ি-ওয়ালার মুখে সব শুনিয়া নিজে দেখিতে আসেন—ইনজেকশনের ব্যবস্থা করেন, শুশ্রূষার লোক দেন, কাজলকে নিজের বাড়ি হইতে খাওয়াইয়া আনেন। উঁহাদের বাড়ির সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ আলাপ হইয়া গিয়াছে।

চৈত্রের প্রথম। চাকুরি অনেক খুঁজিয়াও মিলিল না। তবে আজকাল লিখিয়া কিছু আয় হয়।

সকালে একদিন অপু মেঝেতে মাদুর পাতিয়া বসিয়া বসিয়া কাজলকে পড়াইতেছে, এক-জন কুড়ি-বাইশ বছরের চোখে-চশমা ছেলে দোরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আজ্ঞে আসতে পারি?—আপনারই নাম অপূর্ববাবু? নমস্কার—

—আসুন, বসুন বসুন। কোত্থেকে আসছেন?

—আজ্ঞে, আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। আপনার বই পড়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলুম। আমার অনেক বন্ধুবান্ধব সবাই এত মুগ্ধ হয়েছে, তাই আপনার ঠিকানা নিয়ে—

অপু খুব খুশী হইল—বই পড়িয়া এত ভাল লাগিয়াছে যে, বাড়ি খুঁজিয়া দেখা করিতে আসিয়াছে একজন শিক্ষিত তরুণ যুবক! এ তার জীবনে এই প্রথম।

ছেলেটি চারিদিকে চাহিয়া বলিল—আজ্ঞে, ইয়ে, এই ঘরটাতে আপনি থাকেন বুঝি?

অপু একটু সংকুচিত হইয়া পড়িল, ঘরের আসবাবপত্র অতি হীন, ছেঁড়া মাদুরে পিতা-পুত্রে বসিয়া পড়িতেছে। খানিকটা আগে কাজল ও সে দুজনে মুড়ি খাইয়াছে, মেঝের খানিকটাতে তার চিহ্ন। সে ছেলের ঘাড়ে সব দোষটা চাপাইয়া দিয়া সলজ্জ সুরে বলিল—তুই এমন দুষ্টু হয়ে উঠেছিস খোকা, রোজ রোজ তোকে বলি খেয়ে অমন করে ছড়াবি নে—তা তোর—আর বাটিটা অমন দোরের গোড়ায়—

কাজল এ অকারণ তিরস্কারের হেতু না বুঝিয়া কাঁদ-কাঁদ মুখে বলিল—আমি কই বাবা, তুমিই তো বাটিটাতে মুড়ি—

—আচ্ছা, আচ্ছা, থামু, লেখ, বানানগুলো লিখে ফেল।

যুবকটি বলিল—আমাদের মধ্যে আপনার বই নিয়ে খুব আলোচনা—আজ্ঞে হ্যাঁ। ওবেলা বাড়িতে থাকবেন ? 'বিভাবরী' কাগজের এডিটার শ্যামাচরণবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, আমি—আরও তিন-চার জন সেই সঙ্গে আসব।—তিনটে ? আচ্ছা, তিনটেতেই ভাল।

আরও খানিক কথাবার্তার পর যুবক বিদায় লইলে অপু ছেলের দিকে চাহিয়া বলিল,—উস্-সু-সু-সু, খোকা ?

ছেলে ঠোঁট ফুল্যাইয়া বলিল—আমি আর তোমার সঙ্গে কথা কব না বাবা—

—না বাপ আমার, লক্ষ্মী আমার, রাগ ক'রো না। কিন্তু কি করা যায় বল তো ?

—কি বাবা ?

—তুই এক্ষুনি ওঠ, পড়া থাক এবেলা, এই ঘরটা ঝেড়ে বেশ ভাল ক'রে সাজাতে হবে—আর ওই তোর ছেঁড়া জামাটা তক্তপোশের নিচে লুকিয়ে রাখ দিকি!—ওবেলা 'বিভাবরী'র সম্পাদক আসবে

—'বিভাবরী' কি বাবা ?

—'বিভাবরী' কাগজ রে পাগল, কাগজ—দৌড়ে যা তো, পরেশের বাসা থেকে বালতিটা চেয়ে নিয়ে আয় তো!

বৈকালের দিকে ঘরটা একরকম মন্দ দাঁড়াইল না। তিনটার পরে সবাই আসিলেন। শ্যামাচরণবাবু বলিলেন—আপনার বইটার কথা আমার কাগজে যাবে আসছে মাসে। ওটাকে আমিই আবিষ্কার করেছি মশাই! আপনার লেখা গল্পটল্প ? দিন না।

পরের মাসে 'বিভাবরী' কাগজে তাহার সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার গল্পটাও বাহির হইল। শ্যামাচরণবাবু ভদ্রতা করিয়া পঁচিশটা টাকা গল্পের মূল্যস্বরূপ লোক মারফৎ পাঠাইয়া দিয়া আর একটা গল্প চাহিয়া পাঠাইলেন।

অপু ছেলেকে প্রবন্ধটি পড়িতে দিয়া নিজে চোখ বুজিয়া বিছানায় শুইয়া শুনিতে লাগিল। কাজল খানিকটা পড়িয়া বলিল—বাবা, এতে তোমার নাম লিখেছে যে! অপু হাসিয়া বলিল—দেখেছিস খোকা, লোক কত ভাল বলছে আমাকে? তোকেও একদিন ওই রকম বলবে, পড়াশুনো করবি ভাল ক'রে, বুঝলি ?

দোকানে গিয়া শুনিল 'বিভাবরী'তে প্রবন্ধ বাহির হইবার পর খুব বই কাটিতেছে—তাহা ছাড়া তিন বিভিন্ন স্থান হইতে তিনখানি পত্র আসিয়াছে। বইখানার অজস্র প্রশংসা!

একদিন কাজল বসিয়া পড়িতেছে, সে ঘরে ঢুকিয়া হাত দুখানা পিছনের দিকে লুকাইয়া বলিল,—খোকা, বল তো হাতে কি? কথাটা বলিয়াই মনে পড়িয়া গেল, শৈশবে একদিন তাহার বাবা—সেও এমনি বৈকাল বেলাটা—তাহার বাবা এইভাবেই, ঠিক এই কথা বলিয়াই খবরের কাগজের মোড়কটা তাহার হাতে দিয়াছিল! জীবনের চক্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া কি অদ্ভুত ভাবেই আবর্ত্তিত হইতেছে, চিরযুগ ধরিয়া! কাজল ছুটিয়া গিয়া বলিল,—কি বাবা, দেখি ?—পরে বাবার হাত হইতে জিনিসটা লইয়া দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া উঠিল। অজস্র ছবিওয়ালা আরব্য উপন্যাস! দাদামশায়ের বইয়ে তো এত রঙীন ছবি ছিল না? নাকের কাছে ধরিয়া দেখিল কিন্তু তেমন পুরনো গন্ধ নাই, সেই এক অভাব।

অনেক দিন পরে হাতে পয়সা হওয়াতে সে নিজের জন্যও একরাশ বই ও ইংরেজী ম্যাগাজিন কিনিয়া আনিয়াছে।

পরদিন সে বৈকালে তাহার এক সাহেব বন্ধুর নিকট হইতে একখানি চিঠি পাইয়া গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে গেল। সাহেবের বাড়ি কানাডায়, চল্লিশ-

বিয়াল্লিশ বয়স, নাম এ্যাশ্‌বার্টন। হিমালয়ের জঙ্গলে গাছপালা খুঁজিতে আসিয়াছে, ছবিও আঁকে। ভারতবর্ষে এই দুইবার আসিল। স্টেট্‌স্‌ম্যানে তাহার লেখা হিমালয়ের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা পড়িয়া অপু হোটেলে গিয়া মাস-দুই পূর্ব্বে লোকটির সঙ্গে আলাপ করে। এই দু মাসের মধ্যে দুজনের বন্ধুত্ব খুব জমিয়া উঠিয়াছে।

সাহেব তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। ফ্লানেলের ঢিলা সুট পরা, মুখে পাইপ, খুব দীর্ঘাকার, সুশ্রী মুখ, নীল চোখ, কপালের উপরের দিকের চুল খানিকটা উঠিয়া গিয়াছে। অপুকে দেখিয়া হাসিমুখে আগাইয়া আসিল, বলিল —দেখ, কাল একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল। ও-রকম কোনদিন হয় নি। কাল একজন বন্ধুর সঙ্গে মোটরে কলকাতার বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলুম। একটা জায়গায় গিয়ে বসেছি, কাছে একটা পুকুর, ও-পারে একটা মন্দির, এ-ধারে বাঁশগাছ, আর তালগাছ, এমন সময়ে চাঁদ উঠল, আলো আর ছায়ার কি খেলা! দেখে আর চোখ ফেরাতে পারি নি। মনে হল, Ah, this is the East!··· The eternal East, অমন দেখিনি কখনও।

অপু হাসিয়া বলিল,—and pray, who is the Sun?···

এ্যাশবার্টন হো-হো করিয়া হাসিয়া বলিল,—না, শোন, আমি কাশী যাচ্ছি, তোমাকে না নিয়ে আমি যাব না কিন্তু। আসছে হপ্তাতেই যাওয়া যাক্‌ চলো।

কাশী! সেখানে সে কেমন করিয়া যাইবে! কাশীর মাটিতে সে পা দিতে পারিবে না। শত-সহস্র-স্মৃতি-জড়ানো কাশী, জীবনের ভাণ্ডারের অক্ষয় সঞ্চয়—ও কি যখন-তখন গিয়া নষ্ট করা যায়! সেবার পশ্চিম যাইবার সময় মোগলসরাই দিয়া গেল, কিন্তু কাশী যাইবার অত ইচ্ছা সত্ত্বেও যাইতে পারিল না কেন?···কেন, তাহা অপরকে সে কি করিয়া বুঝায়!···

বন্ধু বলিল, তুমি জাভায় এসো না আমার সঙ্গে? বরোবুদুরের স্কেচ আঁকব, তা ছাড়া মাউণ্ট শ্যালাকের বনে যাব। ওয়েস্ট জাভাতে বৃষ্টি কম হয় বলে ট্রপিক্যাল ফরেস্ট তত জমকালো নয়, কিন্তু ইস্ট জাভার বন দেখলে তুমি মুগ্ধ হবে, তুমি তো বন ভালবাস, এস না!···

বন্ধুর কাছে লীলাদের বাড়ি অনেকদিন আগে দেখা বিয়াত্রিচে দান্তের সেই ছবিটা। অপু বলিল—বাতিচেলির, না?

—না। আগে বলত লিওনার্দোর—আজকাল ঠিক হয়েছে আম্বোজো ডা প্রেডিস-এর, বাতিচেলির কে বলল?

লীলা বলিয়াছিল। বেচারী লীলা!

সপ্তাহের শেষে কিন্তু বন্ধুটির আগ্রহ ও অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাহাকে কাশী রওনা হইতে হইল। কাশীতে পরদিন বেলা বারোটার সময় পৌঁছিয়া বন্ধুকে ক্যাণ্টনমেণ্টের এক সাহেবী হোটেলে তুলিয়া দিল ও নিজে এক্কা করিয়া শহরে ঢুকিয়া গোধুলিয়ার মোড়ের কাছে 'পার্ব্বতী আশ্রমে' আসিয়া উঠিল।

গোধুলিয়ার মোড় হইতে একটু দূরে সেই বালিকা বিদ্যালয়টা আজও আছে। ইহারই একটু দূরে তাহাদের সেই স্কুলটা! কোথায়? একটা গলির মধ্যে ঢুকিল। এখানেই কোথায় যেন ছিল। একটা বাড়ি সে চিনিল। তাহার এক সহপাঠী এই বাড়িতে থাকিত—দু-একবার তাহার সঙ্গে এখানে আসিয়াছিল। বাসা নয়, নিজেদের বাড়ি। একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া শসা কিনিতেছিল—সে জিজ্ঞাসা করিল—এই বাড়িতে প্রসন্ন বলে একটা ছেলে আছে, জানেন?—ভদ্রলোক বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—প্রসন্ন? ছেলে?···অপু সামলাইয়া বলিল—ছেলে না, মানে এই আমাদের বয়সী। কথাটা বলিয়া সে অপ্রতিভ

হইল—প্রসন্ন বা সে আজ কেহই ছেলে নয়—আর তাহাদের ছেলে বলা চলে না—একথা মনে ছিল না। প্রসন্নর ছেলে-বয়সের মূর্ত্তি'ই মনে আছে কি না! প্রসন্ন বাড়ি নাই, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল সে আজকাল চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ের বাপ।

স্কুলটা কোথায় ছিল সে চিনিতে পারিল না। একজন লোককে বলিল—মশায়, এখানে 'শুভংকরী পাঠশালা' বলে একটা স্কুল কোথায় ছিল জানেন?

—শুভংকরী পাঠশালা? কৈ না, আমি তো এই গলিতে দশ বছর আছি—

—তাতে হবে না, সম্ভবত বাইশ-তেইশ বছর আগেকার কথা।

—ও, বসাক মশায়, বসাক মশায়, আসুন একবারটি এদিকে। ও'কে জিজ্ঞেস করুন, ইনি চল্লিশ বছরের খবর বলতে পারবেন।

বসাক মশায় প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন—বিলক্ষণ! তা আর জানি নে! ঐ হরগোবিন্দ শেঠের বাড়িতে স্কুলটা ছিল। ঢুকেই নিচু-মত তো! দুধারে উঁচু রোয়াক।

অপু বলিল—হাঁ হাঁ ঠিক। সামনে একটা চৌবাচ্চা—

—ঠিক ঠিক—আমাদের আনন্দবাবুর স্কুল। আনন্দবাবু মারাও গিয়েছেন আজ আঠার-উনিশ বছর। স্কুলও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছে। আপনি এসব জানলেন কি করে?

—আমি পড়তুম ছেলেবেলায়। তারপর কাশী থেকে চলে যাই।

একটা বাড়ি খুঁজিয়া বাহির করিল। তাদের বাড়ির মোড়েই। ইহারা তখন শোলার ফুল ও টোপর তৈরী করিয়া বেচিত। অপু বাড়িটার মধ্যে ঢুকিয়া গেল। গৃহিণীকে চিনিল—বলিল, আমায় চিনতে পারেন? ঐ গলির মধ্যে থাকতুম ছেলেবেলায়—আমার বাবা মারা গেলেন?—গৃহিণী চিনিতে পারিলেন। বসিতে দিলেন, বলিলেন—তোমার মা কেমন আছেন?

অপু বলিল—তাহার মা বাঁচিয়া নাই।

—আহা! বড় ভালমানুষ ছিল! তোমার মার হাতে সোডার বোতল খুলতে গিয়ে হাত কেটে গিয়েছিল মনে আছে?

অপু হাসিয়া বলিল—খুব মনে আছে, বাবার অসুখের সময়!

গৃহিণীর ডাকে একটি বত্রিশ-তেত্রিশ বছরের বিধবা মেয়ে আসিল। বলিলেন—একে মনে আছে?…

—আপনার মেয়ে না? উনি কি জন্যে রোজ বিকেলে জানলার ধারে খাটে শুয়ে কাঁদতেন! তা মনে আছে।

—ঠিক বাবা,—তোমার সব মনে আছে দেখছি। আমার প্রথম ছেলে তখন বছরখানেক মারা গিয়েছে—তোমরা যখন এখানে এলে। তার জন্যেই কাঁদত। আহা, সে ছেলে আজ বাঁচলে চল্লিশ বছর বয়েস হ'ত।

একবার মণিকর্ণিকার ঘাটে গেল। পিতার নশ্বর দেহের রেণু-মেশানো পবিত্র মণিকর্ণিকা।

বৈকালে বহুক্ষণ দশাশ্বমেধ ঘাটে বসিয়া কাটাইল।

ঐ সেই শীতলা মন্দির—ওরই সামনে বাবার কথকতা হইত সে-সব দিনে—সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃদ্ধ বাঙাল কথক ঠাকুরের কথা মনে হইয়া অপুর মন উদাস হইয়া গেল। কোন্ জাদুবলে তাহার বালকহৃদয়ের দুর্লভ স্নেহটুকু সেই বৃদ্ধ চুরি করিয়াছিল—এখন এতকাল পরেও তাহার উপর অপুর সে স্নেহ অক্ষুণ্ণ আছে—আজ তাহা সে বুঝিল।

পরদিন সকালে দশাশ্বমেধ ঘাটে সে স্নান করিতে নামিতেছে, হঠাৎ তাহার চোখে পড়িল

একজন বৃদ্ধা একটা পিতলের ঘটিতে গঙ্গাজল ভর্ত্তি করিয়া লইয়া স্নান সারিয়া উঠিতেছেন—চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়া সে চিনিল—কলিকাতার সেই জ্যাঠাইমা! সুরেশের মা!···বহুকাল সে আর জ্যাঠাইমাদের বাড়ি যায় নাই, সেই নববর্ষের দিনটার অপমানের পর আর কখনও না। সে আগাইয়া গিয়া পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—চিনতে পারেন জ্যাঠাইমা? আপনারা কাশীতে আছেন নাকি আজকাল? বৃদ্ধা খানিকক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—নিশ্চিন্দিপুরের হরি ঠাকুরপোর ছেলে না? —এসো, এসো, চিরজীবী হও বাবা—আর বাবা চোখেও ভাল দেখি নে—তার ওপর দেখ এই বয়সে একা বিদেশে পড়ে থাকা—ভারী ঘটিটা কি নিয়ে উঠতে পারি? ভাড়াটেদের মেয়ে জলটুকু বয়ে দেয়—তো তার আজ তিনদিন জ্বর—

—ও, আপনিই বুঝি একলা কাশীবাস—সুনীলদাদারা কোথায়?

বৃদ্ধা ভারী ঘটিটা ঘাটের রাণার উপর নামাইয়া বলিলেন—সব কলকাতায়, আমায় দিয়েছে ভেন্ন করে বাবা। ভাল ঘর দেখে বিয়ে দিলুম সুনীলের, গুপ্তিপাড়ার মুখুয্যে—ওমা, বৌ এসে বাবা সংসারের হ'ল কাল—সে সব বলব এখন বাবা···তিন-এর-এক ব্রজেশ্বরের গলি—মন্দিরের ঠিক বাঁ গায়ে—এখানে থাকি, কারুর সঙ্গে দেখাশুনো হয় না। সুরেশ এসেছিল, পুজোর সময় দু'দিন ছিল। থাকতে পারে না—তুমি এসো বাবা আমার বাসায় আজ বিকেলে, অবিশ্যি, অবিশ্যি।

অপু বলিল—দাঁড়ান জ্যাঠাইমা, চট ক'রে ডুব দিয়ে নি, আপনি ঘটিটা ওখানে রাখুন, পৌঁছে দিচ্ছি।

—না বাবা, থাক, আমিই নিয়ে যাচ্ছি, তুমি বললে এই যথেষ্ট হ'ল—বেঁচে থাকো।

তবুও অপু শুনিল না, স্নান সারিয়া ঘটি হাতে জ্যাঠাইমার সঙ্গে তাঁহার বাসায় গেল। ছোট্ট একতলা ঘরে থাকেন—পশ্চিম দিকের ঘরে জ্যাঠাইমা থাকেন, পাশের ঘরে আর একজন প্রৌঢ়া থাকেন—তাঁহার বাড়ি ঢাকা। অন্য ঘরগুলি একটি বাঙালী গৃহস্থ ভাড়া লইয়াছেন, যাঁদের ছোট মেয়ের কথা জ্যাঠাইমা বলিতেছিলেন।

তিনি বলিলেন—সুনীল আমার তেমন ছেলে না। ঐ যে হাড়হাবাতে ছোটলোকের ঘরের মেয়ে এনেছিলাম, সংসারটা সুদ্ধ উচ্ছন্ন দিলে। কি থেকে শুরু হ'ল শোন। ও বছর শেষ মাসে নবান্ন করেছি, ঠাকুরঘরের বারকোশে নবান্ন মেখে ঠাকুরদের নিবেদন করে রেখে দিইছি। দুই নাতিকে ডাকছি, ভাবলাম ওদের একটু একটু নবান্ন মুখে দি। বৌটা এমন বদমায়েস, ছেলেদের আমার ঘরে আসতে দিলে না। শিখিয়ে দিয়েছে, ও-ঘরে যাস নি, নবান্নর চাল খেলে নাকি ওদের পেট কামড়াবে। তাই আমি বললাম, বলি হ্যাঁ গা বৌমা, আমি কি ওদের নতুন চাল খাইয়ে, মেরে ফেলবার মতলব করছি? তা শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে, সেকেলে লোক ছেলেপিলে মানুষ করার কি বোঝে? আমার ছেলে আমি যা ভাল বুঝব করব, উনি যেন তার ওপর কথা না কইতে আসেন। এই সব নিয়ে ঝগড়া শুরু, তারপর দেখি ছেলেও তো বৌমার হয়ে কথা বলে। তখন আমি বললাম, আমাকে কাশী পাঠিয়ে দাও, আমি আর তোমার সংসারে থাকব না। বৌ রাত্রে কানে কি মন্তর দিয়েছে, ছেলে দেখি তাতেই রাজী। তাহলেই বোঝ বাবা, এত ক'রে মানুষ ক'রে শেষে কিনা আমার কপালে—জ্যাঠাইমার দুই চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

অপু জিজ্ঞাসা করিল—কেন, সুরেশদা কিছু বললেন না?

—আহা, সে আগেই বলি নি? সে শ্বশুরবাড়ির বিষয় পেয়ে সেখানেই বাস করছে, সেই রাজসাহী না দিনাজপুর। সে একখানা পত্তর দিয়েও খোঁজ করে না, মা আছে কি মলো। তবে আর তোমাকে বলছি কি? সুরেশ কলকাতায় থাকলে কি আর কথা ছিল বাবা?

অপুকে খাইতে দিয়া গল্প করিতে করিতে তিনি বলিলেন, ও, ভুলে গিয়েছি তোমাকে বলতে, আমাদের নিশ্চিন্দিপুরের ভুবন মুখুয্যের মেয়ে লীলা যে কাশীতে আছে, জান না ?

অপু বিস্ময়ের সুরে বলিল—লীলাদি ! নিশ্চিন্দিপুরের ? কাশীতে কেন ?

জ্যাঠাইমা বলিলেন—ওর ভাশুর কি চাকরি করে এখানে। বড় কষ্ট মেয়েটার, স্বামী তো আজ ছ'সাত বছর পক্ষাঘাতে পঙ্গু, বড় ছেলেটা কাজ না পেয়ে বসে আছে, আরও চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে সবসুদ্ধ, ভাশুরের সংসারে ঘাড় গুঁজে থাকে। যাও না, দেখা ক'রে এসো আজ বিকেলে, কালীতলার গলিতে ঢুকেই বাঁদিকের বাড়িটা।

বাল্যজীবনের সেই রানুদির বোন লীলাদি ! নিশ্চিন্দিপুরের মেয়ে। বৈকাল হইতে অপুর দেরি সহিল না, জ্যাঠাইমার বাড়ি হইতে বাহির হইয়াই সে কালীতলার গলি খুঁজিয়া বাহির করিল—সরু ধরণের তেতলা বাড়িটা। সিঁড়ি যেমন সংকীর্ণ, তেমনি অন্ধকার, এত অন্ধকার যে পকেট হইতে দেশলাই-এর কাঠি বাহির করিয়া না জ্বালাইয়া সে এই বেলা দুইটার সময়ও পথ খুঁজিয়া পাইতেছিল না !

একটা ছোট দুয়ার পার হইয়া সরু একটা দালান। একটি দশ বারো বছরের ছেলের প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল, এখানে কি নিশ্চিন্দিপুরের লীলাদি আছেন ? আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি বলো গিয়ে। অপুর কথা শেষ না হইতে পাশের ঘর হইতে নারী-কণ্ঠের প্রশ্ন শোনা গেল, কে রে খোকা ? সঙ্গে সঙ্গে একটি পাতলা গড়নের গৌরবর্ণ মহিলা দরজার চৌকাঠে আসিয়া দাঁড়াইলেন, পরনে আধ-ময়লা শাড়ি, হাতে শাঁখা, বয়স বছর সাঁইত্রিশ, মাথায় একরাশ কালো চুল। অপু চিনিল, কাছে গিয়া পায়ের ধুলো লইয়া প্রণাম করিয়া হাসিমুখে বলিল, চিনতে পার লীলাদি ?

পরে তাহার মুখের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে এবং চিনিতে পারে নাই দেখিয়া বলিল, আমার নাম অপু, বাড়ি নিশ্চিন্দিপুরে ছিল আগে—

লীলা তাড়াতাড়ি আনন্দের সুরে বলিয়া উঠিল—ও ! অপু, হরিকাকার ছেলে ! এসো এসো ভাই, এসো। পরে সে অপুর চিবুক স্পর্শ করিয়া আদর করিল এবং কি বলিতে গিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

অদ্ভুত মুহূর্ত্ত ! এমন সব অপূর্ব্ব সুপবিত্র মুহূর্ত্তও জীবনে আসে ! লীলাদির ঘনিষ্ঠ আদরটুকু অপুর সারা শরীরে একটা স্নিগ্ধ আনন্দের শিহরণ আনিল। গ্রামের মেয়ে, তাহাকে ছোট দেখিয়াছে, সে ছাড়া এত আপনার জনের মত অন্তরঙ্গতা কে দেখাইতে পারে ? লীলাদি ছিল তাহাদের ধনী প্রতিবেশী ভুবন মুখুয্যের মেয়ে, বয়সে তাহার অপেক্ষা অনেক বড়, অল্প বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, তারপরেই শ্বশুরবাড়ি চলিয়া আসিয়াছিল ও সেইখানেই থাকিত। শৈশবে অল্পদিন মাত্র উভয়ের সাক্ষাৎ কিন্তু আজ অপুর মনে হইল লীলাদির মত আপনার জন সারা কাশীতে আর কেহ নাই। শৈশব-স্বপ্নের সেই নিশ্চিন্দিপুর, তারই জলে বাতাসে দু'জনের দেহ পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়াছে একদিন।

তারপর লীলা অপুর জন্য আসন আনিয়া পাতিয়া দিল, দালানেই পাতিল, ঘরদোর বেশী নাই, বিশেষ করিয়া পরের সংসার, নিজের নহে। সে নিজে কাছে বসিল, কত খোঁজ-খবর লইল। অপুর বারণ সত্ত্বেও ছেলেকে দিয়া জলখাবার আনাইল, চা করিয়া দিল।

তারপর লীলা নিজের অনেক কথা বলিল। বড় ছেলেটি চৌদ্দ বছরের হইয়া মারা গিয়াছে, তাহার উপর সংসারের এই দুর্দ্দশা। উনি পক্ষাঘাতে পঙ্গু, ভাশুরের সংসারে চোর হইয়া থাকা, ভাশুর লোক মন্দ নন, কিন্তু বড়জা—পায়ে কোটি কোটি দণ্ডবৎ। দুর্দ্দশার একশেষ। সংসারের যত উঞ্ছ কাজ সব তাহার ঘাড়ে, আপন জন কেহ কোথাও নাই, বাপের বাড়িতে এমন কেহ নাই যাহার কাছে দুই দিন গিয়া আশ্রয় লইতে পারে। সতু

মানুষ নয়, লেখাপড়া শেখে নাই, গ্রামে মুদির দোকান করে, পৈতৃক সম্পত্তি একে একে বেচিয়া খাইতেছে—তাহার উপর দুইটি বিবাহ করিয়াছে, একরাশ ছেলেপিলে। তাহার নিজেরই চলে না, লীলা সেখানে আর কি করিয়া থাকে।

অপু বলিল—দুটো বিয়ে কেন?

—পেটে বিদ্যে না থাকলে যা হয়। প্রথম পক্ষের বৌয়ের বাপের সঙ্গে কি ঝগড়া হ'ল, তাকে জব্দ করার জন্যে আবার বিয়ে করলে। এখন নিজেই জব্দ হচ্ছেন, দুই বৌ ঘাড়ে—তার ওপর দুই বৌয়ের ছেলেপিলে। তার ওপর রাণুও ওখানেই কিনা!

—রাণুদি? ওখানে কেন?

—তারও কপাল ভাল নয়। আজ বছর সাত-আট বিধবা হয়েছে, তার আর কোনও উপায় নেই, সতুর সংসারেই আছে। শ্বশুরবাড়িতে এক দেওর আছে, মাঝে মাঝে নিয়ে যায়, বেশির ভাগ নিশ্চিন্দিপুরেই থাকে।

অপু অনেকক্ষণ ধরিয়া রাণুদির কথা জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিতেছিল, কিন্তু কেন প্রশ্নটা করিতে পারে নাই সে-ই জানে। লীলার কথায় পরে অপু অন্যমনস্ক হইয়া গেল। হঠাৎ লীলা বলিল—দ্যাখ্ ভাই অপু, নিশ্চিন্দিপুরের সেই বাঁশবাগানের ভিটে এত মিষ্টি লাগে, কি মধু যে মাখানো ছিল তাতে! ভেবে দ্যাখ্, মা নেই, বাবা নেই, কিছু তো নেই—তবুও তার কথা ভাবি। সেই বাপের ভিটে আজ দেখি নি এগারো বছর। সেবার সতুকে চিঠি লিখলাম, উত্তর দিলে এখানে কোথায় থাকবে, থাকবার ঘরদোর নেই, পুবের দালান ভেঙে পড়ে গিয়েছে, পশ্চিমের কুঠুরী দুটোও নেই, ছেলেপিলে কোথায় থাকবে,—এই সব একরাশ ওজর। বলি থাক তবে, ভগবান যদি মুখ তুলে চান কোনদিন, দেখব—নয় তো বাবা বিশ্বনাথ তো চরণে রেখেইছেন—

আবার লীলা ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

অপু বলিল, ঠিক বলেছ লীলাদি, আমারও গাঁয়ের কথা এত মনে পড়ে। সত্যিই, কি মধুমাখানো ছিল, তাই এখন ভাবি।

লীলা বলিল, পদ্মপাতায় খাবার খাস নি কতদিন বল দিকি? এ সব দেশে শালপাতায় খাবার খেতে খেতে পদ্মপাতার কথা ভুলেই গিয়েছি, না? আবার এক একদিন এক একটা দোকানে কাগজে খাবার দেয়! সেদিন আমার মেজ ছেলে এনেছে, আমি বলি দূর দূর, ফেলে দিয়ে আয়, কাগজে আবার মিষ্টি খাবার কেউ দেয় আমাদের দেশে?

অপুর সারা দেহ স্মৃতির পুলকে যেন অবশ হইয়া গেল। লীলাদি মেয়েমানুষ কিনা, এত খুঁটিনাটি জিনিসও মনে রাখে। ঠিকই বটে, সেও পদ্মের পাতায় কতকাল খাবার খায় নাই, ভুলিয়াই গিয়াছিল কথাটা। তাহাদের দেশে বড় বড় বিল, পদ্মপাতা সস্তা, শালপাতার রেওয়াজ ছিল না। নিমন্ত্রণ বাড়িতেও পদ্মপাতাতে ব্রাহ্মণভোজন হইত, লীলাদির কথায় আজ আবার সব মনে পড়িয়া গেল।

লীলা চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তুই কতদিন যাস নি সেখানে অপু? তেইশ বছর? কেন, কেন? আমি না হয় মেয়েমানুষ—তুই তো ইচ্ছে করলেই যেতে—

—তা নয় লীলাদি, প্রথমে ভাবতুম বড় হয়ে যখন রোজগার করব, মাকে নিয়ে আবার নিশ্চিন্দিপুরের ভিটেতে গিয়ে বাস করব, মার বড় সাধ ছিল। মা মারা যাওয়ার পরেও ভেবেছিলুম, কিন্তু তার পরে—ইয়ে—

স্ত্রীবিয়োগের কথাটা অপু বয়োজ্যেষ্ঠা লীলাদির নিকট প্রথমটা তুলিতে পারিল না। পরে বলিল। লীলা বলিল, বৌ কতদিন বেঁচে ছিলেন?

অপু লাজুক সুরে বলিল—বছর চারেক—

—তা এ তোমার অন্যায় কাজ ভাই—তোমার এ বয়সে বিয়ে করবে না কেন?··· তোমাকে তো এতটুকু দেখেছি, এখনও বেশ মনে হচ্ছে—ছোট্ট, পাতলা টুকটুকে ছেলেটি—একটি কঞ্চি হাতে নিয়ে আমাদের ঘাটের পথের বাঁশতলাটায় বেড়িয়ে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছ—কালকের কথা যেন সব—না না, ও কি, ছিঃ—বিয়ে কর ভাই। খোকাকে কলকাতায় রেখে এলে কেন—দেখতাম একবারটি।

লীলাও উঠিতে দেয় না—অপুও উঠিতে চায় না। লীলার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিল—ছেলেমেয়েগুলিকে আদর করিল। উঠিবার সময় লীলা বলিল—কাল আসিস অপু, নেমন্তন্ন রইল—এখানে দুপুরে খাবি। পরদিন নেমন্তন্ন রাখিতে গিয়া কিন্তু অপু লীলাদির পরাধীনতা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিল—সকাল হইতে সমুদয় সংসারের রান্নার ভার একা লীলাদির উপর। কৈশোরে লীলাদি দেখিতে ছিল খুব ভাল—এখন কিন্তু সে লাবণ্যের কিছুই অবশিষ্ট নাই—চুল দু-চার গাছা এরই মধ্যে পাকিয়াছে, শীর্ণ মুখ, শিরা-বাহির হওয়া হাত, আধময়লা শাড়ি পরনে, রাঁধিবার আলাদা ঘরদোর নাই, ছোট দালানের অর্দ্ধেকটা দরমার বেড়া দিয়া ঘেরা, তারই ও-ধারে রান্না হয়। লীলাদি সমস্ত রান্না সারিয়া তার জন্য মাছের ডিমের বড়া ভাজিতে বসিল, একবার কড়াখানা উনুন হইতে নামায়, আবার তোলে, আবার নামায়, আবার ভাজে। আগুনের তাতে মুখ তার রাঙা দেখাইতেছিল—অপু ভাবিল কেন এত কষ্ট করছে লীলাদি, আহা রোজ রোজ ওর এই কষ্ট, তার ওপর আমার জন্যে আর কেন কষ্ট করা?

বিদায় লইবার সময় লীলা বলিল—কিছুই করতে পারলুম না ভাই—এলি যদি এত কাল পরে, কি করি বল, পরের ঘরকন্না, পরের সংসার, মাথা নিচু ক'রে থাকা, উদয়াস্ত খাটুনিটা দেখলি তো? কি আর করি, তবুও একটা ধরে আছি। মেয়েটা বড় হয়ে উঠল, বিয়ে তো দিতে হবে? ঐ বটঠাকুর ছাড়া আর ভরসা নাই। সন্ধ্যেবেলাটা বেশ ভাল লাগে—দশাশ্বমেধ ঘাটে সন্ধ্যের সময় বেশ কথা হয়, পাঁচালী হয়, গান হয়—বেশ লাগে! দেখিস্ নি? আসিস না আজ ওবেলা—বেশ জায়গা, আসিস্, দেখিস্ এখন। এসো, এসো, কল্যাণ হোক।—তারপর সে আবার কাঁদিয়া ফেলিল—বলিল—তোদের দেখলে যে কত কথা মনে পড়ে—কি সব দিন ছিল—

এবার অপু অতিকষ্টে চোখের জল চাপিল।

আর একটি কর্ত্তব্য আছে তাহার কাশীতে—লীলার মায়ের সঙ্গে দেখা করা। বাঙালীটোলার নারদ ঘাটে তাঁর নিজেদের বাড়ি আছে—খুঁজিয়া বাড়ি বাহির করিল। মেজ-বৌরানী অপুকে দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। চোখের জল ফেলিলেন।

কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময় ঘরে একটি ছোট মেয়ে ঢুকিল—বয়স ছয়-সাত হইবে, ফ্রকপরা কোঁকড়া কোঁকড়া চুল—অপু তাহাকে দেখিয়াই বুঝিতে পারিল—লীলার মেয়ে। কি সুন্দর দেখিতে! এত সুন্দরও মানুষ হয়? স্নেহে, স্মৃতিতে, বেদনায় অপুর চোখে জল আসিল—সে ডাক দিল—শোন খুকী মা, শোন তো।

খুকী হাসিয়া পলাইতেছিল, মেজ-বৌরানী ডাকিয়া আনিয়া কাছে বসাইয়া দিলেন। সে তার দিদিমার কাছেই কাশীতে থাকে আজকাল। গত বৈশাখ মাসে তাহার বাবা মারা গিয়াছেন—লীলার মৃত্যুর পূর্ব্বে। কিন্তু লীলাকে সে-সংবাদ জানানো হয় নাই। দেখিতে অবিকল লীলা—এ বয়সে লীলা যা ছিল তাই। কেমন করিয়া অপুর মনে পড়িল শৈশবের একটি দিনে বর্দ্ধমানে লীলাদের বাড়িতে সেই বিবাহ উপলক্ষে মেয়ে-মজলিসের কথা—লীলা যেখানে হাসির কবিতা আবৃত্তি করিয়া সকলকে হাসাইয়াছিল—সে-ই লীলাকে সে প্রথম দেখে এবং লীলা তখন দেখিতে ছিল ঠিক এই খুকীর মত অবিকল।

মেজ-বৌরানী বলিলেন—মেয়ে তো ভাল, কিন্তু বাবা, ওর কি আর বিয়ে দিতে পারব ? ওর মার কথা যখন সকলে শুনবে—আর তা না জানে কে—ওই মেয়ের কি আর বিয়ে হবে বাবা ?

অপুর দুর্দমনীয় ইচ্ছা হইল একটি কথা বলিবার জন্য—সেটা কিন্তু সে চাপিয়া রাখিল। মুখে বলিল—দেখুন, বিয়ের জন্য ভাবচেন কেন ? লেখাপড়া শিখুক, বিয়ে নাই বা হ'ল, তাতে কি ? মনে ভাবিল—এখন সে কথা বলব না, খোকা যদি বাঁচে, মানুষ হয়ে ওঠে—তবে সে কথা তুলব। যাইবার সময় অপু লীলার মেয়েকে আবার কাছে ডাকিল। এবার খুকী তাহার কাছে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া ডাগর ডাগর উৎসুক চোখে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সেদিনের বাকী সময়টুকু অপু বন্ধুর সঙ্গে সারনাথ দেখিয়া কাটাইল। সন্ধ্যার দিকে একবার কালীতলার গলিতে লীলাদির বাসায় বিদায় লইতে গেল—কাল সকালেই এখান হইতে রওনা হইবে। নিশ্চিন্দিপুরের মেয়ে, শৈশব-দিনের এক সুন্দর আনন্দ-মুহূর্ত্তের সঙ্গে লীলাদির নাম জড়ানো—বার বার কথা কহিয়াও যেন তাহার তৃপ্তি হইতেছিল না।

আসিবার সময় অপু মুগ্ধ হইল লীলাদির আন্তরিকতা দেখিয়া। তাহাকে আগাইয়া দিতে আসিয়া সে নিচে নামিয়া আসিল, আবার চিবুক ছুঁইয়া আদর করিল, চোখের জল ফেলিল, যেন মা, কি মায়ের পেটের বড় বোন। কতকগুলো কাঠের খেলনা হাতে দিয়া বলিল—খোকাকে দিস্—তার জন্যে কাল কিনে এনেছি।

অপু ভাবিল—কি চমৎকার মানুষ লীলাদি !···আহা পরের সংসারে কি কষ্টটাই না পাচ্ছে। মুখে কিছু বললুম না—তোমায় আমি বাপের ভিটে দেখাব লীলাদি, এই বছরের মধ্যেই।

ট্রেনে উঠিয়া সারাপথ কত কি কথা তাহার মনে যাওয়া-আসা করিতে লাগিল। রাজঘাটের স্টেশনে ট্রেনে উঠিল আজ কতকাল পরে ! বাল্যকালে এই স্টেশনেই সে প্রথম জলের কল দেখে, কাশী নামিয়াই ছুটিয়া গিয়াছিল আগে জলের কলটার কাছে। চেঁচাইয়া বলিয়াছিল, দেখো দেখো মা, জলের কল।—সে সব কি আজ ?

আজ কতদিন হইতে সে আর একটি অদ্ভুত জিনিস নিজের মনের মধ্যে অনুভব করিতেছে, কি তীব্রভাবেই অনুভব করিতেছে ! আগে তো সে এরকম ছিল না ? অন্ততঃ এ ভাবে তো কই কখনও এর আগে—সেটা হইতেছে ছেলের জন্য মন-কেমন করা।

কত কথাই মনে হইতেছে এই কয়দিনে—পাশের বাড়ির বাঁড়ুয্যে-গৃহিণী কাজলকে বড় ভালবাসে—সেখানেই তাহাকে রাখিয়া আসিয়াছে। কখনও মনে হইতেছে, কাজল যে দুষ্টু ছেলে, হয়ত গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া ছিল, কোনও বদ্‌মাইস লোকে ভুলাইয়া কোথায় লইয়া গিয়াছে কিংবা হয়ত চুপ চুপি বাড়ি হইতে বাহির হইয়া রাস্তা পার হইতে যাইতেছিল, মোটর চাপা পড়িয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে কি বাঁড়ুয্যেরা একটা তার করিত না ? হয়ত তার করিয়াছিল, ভুল ঠিকানায় গিয়া পেঁছিয়াছে। উহাদের আলিসাবিহীন নেড়া ছাদে ঘুড়ি উড়াইতে উঠিয়া পড়িয়া যায় নাই তো ? কিন্তু কাজল তো কখনও ঘুড়ি ওড়ায় না ? একটু আনাড়ি, ঘুড়ি ওড়ানো কাজ একেবারে পারে না। না—সে উড়াইতে যায় নাই, তবে হয়ত বাঁড়ুয্যেবাড়ির ছেলেদের দলে মিশিয়া উঠিয়াছিল, আশ্চর্য্য কি !

আর্টিস্ট বন্ধুর কথার উত্তরে সে খানিকটা আগে বলিয়াছিল—সে জাভা, বালি, সুমাত্রা দেখিবে, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ দেখিবে, আফ্রিকা দেখিবে—ওদের বিষয় লইয়া উপন্যাস লিখিবে। সাহেবরা দেখিয়াছে তাদের চোখে—সে নিজের চোখে দেখিতে চায়, তার মনের রঙে কোন্ রঙ ধরায়—ইউগাণ্ডার দিক্‌দিশাহীন তৃণভূমি, কেনিয়ার অরণ্য। বুড়ো বেবুন রাত্রে কর্কশ চীৎকার করিবে, হায়েনা পচা জীবজন্তুর গন্ধে উন্মাদের মত আনন্দে হি-হি করিয়া হাসিবে, দুপুরে অগ্নিবর্ষী খররৌদ্রে কম্পমান উত্তাপতরঙ্গ মাঠে প্রান্তরে,

জনহীন বনের ধারে কতকগুলি উঁচুনীচু সদাচঞ্চল বাঁকা রেখার সৃষ্টি করিবে। সিংহেরা দল পাকাইয়া ছোট কণ্টকবৃক্ষের এতটুকু ক্ষুদ্র ছায়ায় গোলাকারে দাঁড়াইয়া অগ্নিবৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করে—পার্ক ন্যাশনাল আলবার্তে wild celery-র বন…

কিন্তু খোকা যে টানিতেছে আজকাল, কোনও জায়গায় যাইতে মন চায় না খোকাকে ফেলিয়া। কাজল, খোকা, কাজল, খোকা, খোকন, ও ঘুড়ি উড়াইতে পারে না, কিছু বুঝিতে পারে না, কিছু পারে না, বড় নির্বোধ। কিন্তু ওর আনাড়ি মুঠাতে বুকের তার আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। টানিতেছে, প্রাণপণে টানিতেছে—ছোট্ট দুর্ব্বল হাত দু'টি নির্দ্দয়ভাবে মুচড়াইয়া সরাইয়া লওয়া? সর্ব্বনাশ! ধামা-চাপা থাকুক বিদেশযাত্রা।

ট্রেন হু-হু চলিতেছে···মাঝে মাঝে আম বন, জলার ধারে লালহাঁস বসিয়া আছে, আখের ক্ষেতে জল দিতেছে, গম কাটিতেছে। রেলের ধারের বস্তিতে উদুখলে শস্য কুটিতেছে, মহিষের পাল চরিয়া ফিরিতেছে। বড় বড় মাঠে দুপুর গড়াইয়া গিয়া ক্রমে রোদ পড়িয়া আসিল। দূরে দূরে চক্রবালসীমায় এক-আধটা পাহাড় ঘন নীল ও কালো হইয়া উঠিতেছে।

কি জানি কেন আজ কত কথাই মনে পড়িতেছে, বিশেষ করিয়া নিশ্চিন্দিপুরের কথা। হয়ত এতকাল পরে লীলাদির সঙ্গে দেখা হওয়ার জন্যই। ঠিক তাই। বহু দূরে আর একটি সম্পূর্ণ অন্য ধরণের জীবন-ধারা, বাঁশবনের আমবনের ছায়ায় পাখির কলকাকলীর মধ্য দিয়া, জানা-অজানা বনপুষ্পের সুবাসের মধ্য দিয়া সুখে-দুঃখে বহুকাল আগে বহিত—এককালে যার সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল তার—আজ তা স্বপ্ন—স্বপ্ন, কতকাল আগে দেখা স্বপ্ন! গোটা নিশ্চিন্দিপুর, তার ছেলেবেলাকার দিদি, মা ও রানুদি, মাঠ বন, ইছামতী সব অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, ধোঁয়া ধোঁয়া মনে হয়, স্বপ্নের মতই অবাস্তব। সেখানকার সব কিছুই অস্পষ্ট স্মৃতিতে মাত্র আসিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

এই তো ফাল্গুন-চৈত্র মাস—সেই বাঁশপাতা ও বাঁশের খোলার রাশি—শৈশবের ভাঙা জানালাটার ধারে বসিয়া বসিয়া কতকাল আগের সে সব কল্পনা, আনন্দপূর্ণ দিনগুলি, শীত-রাত্রির সুখস্পর্শ কাঁথার তলা,—অনন্ত কালসমুদ্রে সে সব ভাসিয়া গিয়াছে, কত কাল আগে।···

কেবল স্বপ্নে, এক একদিন যেন বাল্যের সেই রূপো চৌকিদার গভীর রাত্রের ঘুমের মধ্যে কড়া হাঁক দিয়া যায়—ও রায় ম—শ—য়—য়, সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুরে ফিরিয়া আসে, আবার বাড়ির পাশেই সেই পোড়ো ভিটাতে বহুকাল আগের বসন্ত নামে, প্রথম চৈত্রের নানা জানা-অজানা ফুলে বনভূমি ভরিয়া যায়, তাহাদের পুরানো কোঠাবাড়ির ভাঙা জানালার ধারে অতীত দিনের শত সুখদুঃখে পরিচিত পাখির দল কলকণ্ঠে গান গাহিয়া উঠে, ঠাকুরমাদের নারিকেল গাছে কাঠঠোকরার শব্দ বিচিত্র গোপনতায় তন্দ্রারত হইয়া পড়ে···স্বপ্নে দশ বৎসরের শৈশবটি আবার নবীন হইয়া ফিরিয়া আসে···

এতদিন সে বাড়িটা আর নাই···কতকাল আগে ভাঙিয়া-চুরিয়া ইট কাঠ স্তূপাকার হইয়া আছে—তাহাও হয়তো মাটির তলায় চাপা পড়িতে চলিল—সেই শৈশবের জানালাটার কোনও চিহ্ন নাই—দীর্ঘদিনের শেষে সোনালী রোদ যখন বনগাছের ছায়া দীর্ঘতর করিয়া তোলে, ফিঙে-দোয়েল ডাক শুরু করে—তখন আর কোনও মুগ্ধ শিশু জানালার ধারে বসিয়া থাকে না—হাত তুলিয়া অনুযোগের সুরে বলে না—আজ রাত্রে যদি মা ঘরে জল পড়ে, কাল কিন্তু ঠিক রাণুদিদির বাড়ি গিয়ে শোবো—রোজ রোজ রাত জাগতে পারি নে বলে দিচ্ছি।

অপুর একটা কথা মনে হইয়া হাসি পাইল!

গ্রাম ছাড়িয়া আসিবার বছরখানেক আগে অপু একরাশ কড়ি পাইয়াছিল। তাহার বাবা শিষ্যবাড়ি হইতে এগুলি আনেন। এত কড়ি কখনও অপু ছেলেবেলায় একসঙ্গে দেখে নাই। তাহার মনে হইল সে হঠাৎ অত্যন্ত বড়লোক হইয়া গিয়াছে—কড়ি খেলায় সে যতই হারিয়া

থাক তাহার অফুরন্ত ঐশ্বর্যের শেষ হইবে না। একটা গোল বিস্কুটের ঠোঙায় কড়ির রাশি রাখিয়া দিয়াছিল। সে ঠোঙাটা আবার তোলা থাকিত তাদের বনের ধারের দিকের ঘরটায় উঁচু কুলঙ্গিটাতে।

তারপর নানা গোলমালে খেলাধুলোয় অপুর উৎসাহ গেল কমিয়া, তারপরই গ্রাম ছাড়িয়া উঠিয়া আসিবার কথা হইতে লাগিল। অপু আর একদিনও ঠোঙার কড়িগুলি লইয়া খেলা করিল না, এমন কি দেশ ছাড়িয়া চলিয়া আসিবার সময়েও গোলমালে, ব্যস্ততায়, প্রথম দূর বিদেশে রওনা হইবার উত্তেজনার মুহূর্তে সেটার কথাও মনেও উঠে নাই। অত সাধের কড়ি-ভড়া-ঠোঙাটা সেই কড়িকাঠের নিচেকার বড় কুলুঙ্গিটাতেই রহিয়া গিয়াছিল।

তারপর অনেককাল পরে সে কথা অপুর মনে হয় আবার। তখন অপর্ণা মারা গিয়াছে। একদিন অন্যমনস্কভাবে ইডেন গার্ডেনের কেয়াঝোপে বসিয়া ছিল, গঙ্গার ও-পারের দিকে সূর্যাস্ত দেখিতে দেখিতে কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে।

আজও মনে হইল।

কড়ির কৌটা!···একবার সে মনে মনে হাসিল···বহুকাল আগে নিশ্চিন্ত হইয়া লুপ্ত হইয়া যাওয়া ছেলেবেলার বাড়ির উত্তর দিকের ঘরের কুলুঙ্গিতে বসানো সেই টিনের ঠোঙাটা! —দূরে সেটা যেন শূন্যে কোথায় এখনও ঝুলিতেছে, তাহার শৈশবজীবনের প্রতীকস্বরূপ··· অস্পষ্ট, অবাস্তব, স্বপ্নময় ঠোঙাটা সে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে, পয়সায় চার গণ্ডা করিয়া মাকড়সার ডিমের মত সেই যে ছোট ছোট বিস্কুট, তারই ঠোঙাটি—উপরে একটা বিবর্ণ-প্রায় হাঁ-করা রাক্ষসের মুখের ছবি···দূরের কোন্ কুলুঙ্গিতে বসানো আছে···তার পিছনে বাঁশবন, শিমুলবন, তার পিছনে সোনাডাঙার মাঠ, ঘুঘুর ডাক···তাদেরও পিছনে তেইশ বছর আগেকার অপূর্ব মায়ামাখানো নিঝুম চৈত্র-দুপুরের রৌদ্রভরা নীলাকাশ···

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

চৈত্র মাসের প্রথমে একটা বড় পার্টিতে সে নিমন্ত্রিত হইয়া গেল। খুব বড় গাড়িবারান্দা, সামনের 'লনে' ছোট ছোট টেবিল ও চেয়ার পাতা, খানিকটা জায়গা সামিয়ানা টাঙানো। নিমন্ত্রিত পুরুষ মহিলাগণ যাঁহার যেখানে ইচ্ছা বেড়াইতেছেন! একটা মার্ব্বেলের বড় চৌবাচ্চায় গোটাকতক কুমুদ ফুল, ঠিক মাঝখানে একটা মার্ব্বেলের ফোয়ারা—গৃহকর্ত্রী তাহাকে লইয়া গিয়া জায়গাটা দেখাইলেন, সেটা নাকি তাঁদের 'লিলি পণ্ড'। জয়পুর হইতে ফোয়ারাটা তৈয়ারী করাইয়া আনিতে কত খরচ পড়িয়াছে, তাহাও জানাইলেন।

পার্টির সকল আমোদ-প্রমোদের মধ্যে একটি মেয়ের কণ্ঠ-সঙ্গীত সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক মনে হইল। ব্রিজের টেবিলে সে যোগ দিতে পারিল না, কারণ ব্রিজখেলা সে জানে না, গান শেষ হইলে খানিকটা বসিয়া বসিয়া খেলাটা দেখিল। চা, কেক, স্যান্ডউইচ, সন্দেশ, রসগোল্লা, গল্প-গুজব, আবার গান! ফিরিবার সময় মনটা খুব খুশী ছিল। ভাবিল—এদের পার্টিতে নেমন্তন্ন পেয়ে আসা একটা ভাগ্যের কথা। আমি লিখে নাম করেছি, তাই আমার হ'ল। যার তার হোক্ দিকি? কেমন কাটল সন্ধ্যেটা। আহা, খোকাকে আনলে হ'ত, ঘুমিয়ে পড়বে এই ভয়ে আনতে সাহস হ'ল না যে।—খান-দুই কেক খোকার জন্য চুপিচুপি কাগজে জড়াইয়া পকেটে পুরিয়া রাখিয়াছিল, খুলিয়া দেখিল সেগুলি ঠিক আছে কি না।

খোকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ডাকিয়া উঠাইতে গিয়া বলিল, ও খোকা, খোকা, ওঠ, খুব ঘুমুচ্ছিস্ যে—হি হি—ওঠ্ রে। কাজলের ঘুম ভাঙিয়া গেল। যখনই সে বোঝে বাবা আদর করিতেছে, মুখে কেমন ধরণের মধুর দুষ্টামির হাসি হাসিয়া ঘাড় কাৎ করিয়া কেমন

এক অদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া আদরের প্রতীক্ষায় থাকে, আর এত আদর খাইতেও পারে।

অপু বলিল, শোন্ খোকা গল্প করি,—ঘুমুস্ নে—

কাজল হাসিমুখে বলে, বলো দিকি বাবা একটা অর্থ ?

হাত কন্ কন্ মানিকতলা, এ ধন তুমি পেলে কোথা,
রাজার ভাণ্ডারে নেই, বেনের দোকানে নেই—

অপু মনে মনে ভাবে—খোকা, তুই—তুই আমার সেই বাবা। ছেলেবেলায় চলে গিয়েছিলে, তখন তো কিছু বুঝি নি, বুঝতামও না—শিশু ছিলাম। তাই আবার আমার কোলে আদর কাড়াতে এসেছ বুঝি ? মুখে বলে, কি জানি, জাঁতি বুঝি ?

—আহা-হা, জাঁতি কি আর দোকানে পাওয়া যায় না ! তুমি বাবা কিচ্ছু জান না—

—ভাল কথা, কেক্ এনেছি, দ্যাখ্, বড়লোকের বাড়ির কেক্, ওঠ্,—

—বাবা তোমার নামে একখানা চিঠি এসেছে, ঐ বইখানা তোলো তো।···

আর্টিস্ট বন্ধুটির পত্র। বন্ধু লিখিয়াছে,—সমুদ্রপারের বৃহত্তর ভারতবর্ষ শুধু কুলী-আমদানীর সার্থকতা ঘোষণা করিয়া নীরব থাকিয়া যাইবে ? তোমাদের মত আর্টিস্ট লোকের এখানে আসার যে নিতান্ত দরকার। চোখ থাকিয়াও নাই-শতকরা নিরানব্বই জনের, তাই চক্ষুষ্মান মানুষদের একবার এ-সব স্থানে আসিতে বলি। পত্রপাঠ এসো, ফিজিতে মিশনারীরা স্কুল খুলিতেছে, হিন্দী জানা ভারতীয় শিক্ষক চায়। দিনকতক মাস্টারী তো করো, তারপর একটা কিছু ঠিক হইয়া যাইবে, কারণ চিরদিন মাস্টারী করিবার মত শান্ত ধাত তোমার নয়, তা জানি। আসিতে বিলম্ব করিও না।

পত্র পাঠ শেষ করিয়া সে খানিকক্ষণ কি ভাবিল, ছেলেকে বলিল, আচ্ছা খোকা, আমি তোকে ছেড়ে কোথাও যদি চলে যাই, তুই থাকতে পারবি নে ? যদি তোকে মামার বাড়ি রেখে যাই ?—

কাজল কাঁদ কাঁদ মুখে বলিল, হ্যাঁ তাই যাবে বৈকি ! তুমি ভারী দেরি কর, কাশীতে বলে গেলে তিন দিন হবে, ক'দিন পরে এলে ? না বাবা—

অপু ভাবিল, অবোধ শিশু ! এ কি কাশী ? এ বহুদূরে, দিনের কথা কি এখানে ওঠে ?—থাক, কোথায় যাইবে সে ? কাহার কাছে রাখিয়া যাইবে খোকাকে ? অসম্ভব !

কাজল ঘুমাইয়া পড়িলে ছাদে উঠিয়া সে অনেকক্ষণ একা বসিয়া রহিল।

দূরে বাড়িটার মাথায় সার্কুলার রোডের দিকে ভাঙা চাঁদ উঠিতেছে, রাত্রি বারোটার বেশী—নিচে একটা মোটর লরী ঘস্ ঘস্ আওয়াজ করিতেছে। এই রকম সময়ে এই রকম ভাঙা চাঁদ উঠিত দূরে জঙ্গলের মাথায় পাহাড়ের একটা জায়গায়, যেখানে উটের পিঠের মত ফুলিয়া উঠিয়াই পরে বসিয়া গিয়া একটা খাঁজের সৃষ্টি করিয়াছে—সেই খাঁজটার কাছে, পাহাড়ী ঢালুতে বাদাম গাছের বনে দিনমানে পাকা পাতায় বনশীর্ষ যেখানে রক্তাভ দেখায়। এতক্ষণে বন-মোরগেরা ডাকিয়া উঠিত, কক্, কক্, কক্—

সে মনে মনে কল্পনা করিবার চেষ্টা করিল, সার্কুলার রোড নাই, বাড়িঘর নাই, মোটর লরীর আওয়াজ নাই, ব্রিজের আড্ডা নাই, 'লিলি পণ্ড' নাই, তার ছোট্ট খড়ের বাংলো ঘর-খানায় রামচরিত মিশ্র মেজেতে ঘুমাইতেছে, সামনে পিছনে ঘন অরণ্যভূমি, নির্জন, নিস্তব্ধ, আধ-অন্ধকার রাত্রি। ক্রোশের পর ক্রোশ যাও, শুধু উঁচু নীচু ডাঙ্গা, শুকনা ঘাসের বন, সাজা ও আবলুসের বন, শালবন, পাহাড়ী চামেলি ও লোহিয়ার বন—বনফুলের অফুরন্ত জঙ্গল। সঙ্গে সঙ্গে মনে আসিল সেই মুক্তি, সেই রহস্য, সে সব অনুভূতি, ঘোড়ার পিঠে মাঠের পর মাঠ উদ্দাম গতিতে ছুটিয়া চলা, সেই দৃঢ়-পৌরুষ জীবন, আকাশের সঙ্গে, ছায়াপথের সঙ্গে, নক্ষত্রজগতের সঙ্গে প্রতি সন্ধ্যায় প্রতি রাত্রে যে অপূর্ব মানসিক সম্পর্ক।

এই কি জীবন সে যাপন করিতেছে এখানে? প্রতিদিন একই রকম একঘেয়ে নীরস, বৈচিত্র্যহীন—আজ যা, কালও তা। অর্থহীন কোলাহলে ও সার্থকতাহীন ব্রিজের আড্ডার আবহাওয়ায়, টাকা রোজগারের মৃগতৃষ্ণিকায় লুব্ধ জীবন-নদীর শুভ্র, সহজ, সাবলীল ধারা যে দিনে দিনে শুকাইয়া আসিতেছে, এ কি সে বুঝিয়াও বুঝিতেছে না?

ঘুমের ঘোরে কাজল বিছানার মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাকে এক পাশে সরাইয়া শোয়াইল। একেই তো সুন্দর, তার উপর কি যে সুন্দর দেখাইতেছে খোকাকে ঘুমন্ত অবস্থায়!

কাশী হইতে ফিরিবার সপ্তাহ খানেকের মধ্যে অপু 'বিভাবরী', ও 'বঙ্গ-সুহৃৎ' দুখানা পত্রিকার তরফ হইতে উপন্যাস লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিল। দুখানাই প্রসিদ্ধ মাসিক পত্র, দুখানারই গ্রাহক সারা বাংলা জুড়িয়া এবং পৃথিবীর যেখানে যেখানে বাঙালী আছে, সর্ব্বত্র। 'বিভাবরী' তাহাকে সম্প্রতি আগাম কিছু টাকা দিল—'বঙ্গ-সুহৃৎ'-এর নিজেদের বড় প্রেস আছে—তাহারা নিজের খরচে অপুর একখানা ছোট গল্পের বই ছাপাইতে রাজী হইল। অপুর বইখানির বিক্রয়ও হঠাৎ বাড়িয়া গেল, আগে যে সব দোকানে তাহাকে পুছিতও না—সে সব দোকান হইতে বই চাহিয়া পাঠাইতে লাগিল। এই সময়ে একটি বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক ফার্মের নিকট হইতে একখানা পত্র পাইল, অপু যেন একবার গিয়া দেখা করে।

অপু বৈকালের দিকে দোকানে গেল। তাহারা বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ নিজেদের খরচে ছাপাইতে ইচ্ছুক—অপু কি চায়? অপু ভাবিয়া দেখিল। প্রথম সংস্করণ হু-হু কাটিতেছে—অপর্ণার গহনা বিক্রয় করিয়া বই ছাপাইয়াছিল, লাভটা তার সবই নিজের। ইহাদের দিলে লাভ কমিয়া যাইবে বটে, কিন্তু দোকানে ছুটাছুটি, তাগাদা—এসব হাঙ্গামাও কমিবে। তা ছাড়া নগদ টাকার একটা মোহ আছে, সাত পাঁচ ভাবিয়া সে রাজী হইল। ফার্মের কর্ত্তা তখনই একটা লেখাপড়া করিয়া লইলেন—আপাততঃ ছ'শো টাকায় কথাবার্ত্তা মিটিল, শ'-দুই সে নগদ পাইল।

দু'শো টাকা খুচরা ও নোটে। এক গাদা টাকা। হাতে ধরে না। কি করা যায় এত টাকায়? পুরানো দিন হইলে সে ট্যাক্সি করিয়া খানিকটা বেড়াইত, রেস্টুরেন্টে খাইত, বায়োস্কোপ দেখিত। কিন্তু আজকাল আগেই খোকার কথা মনে হয়। খোকাকে কি আনন্দ দেওয়া যায় এ টাকায়? মনে হয় লীলার কথা। লীলা কত আনন্দ করিত আজ!

একটা ছোট গলি দিয়া যাইতে যাইতে একটা শরবৎ-এর দোকান। দোকানটাতে পান বিড়ি বিস্কুট বিক্রী হয়, আবার গোটা দুই তিন সিরাপের বোতলও রহিয়াছে। দিনটা খুব গরম, অপু শরবৎ খাওয়ার জন্য দোকানটাতে দাঁড়াইল। অপুর একটু পরেই দু'টি ছেলেমেয়ে সেখানে কি কিনিতে আসিল। গলিরই কোন গরীব ভাড়াটে গৃহস্থ ঘরের ছোট ছেলে মেয়ে—মেয়েটি বছর সাত, ছেলেটি একটু বড়। মেয়েটি আঙুল দিয়া সিরাপের বোতল দেখাইয়া বলিল—ওই দ্যাখ দাদা সবুজ—বেশ ভালো, না? ছেলেটি বলিল—সব মিশিয়ে দ্যায়। বরফ আছে, ওই যে—

—ক' পয়সা নেয়?

—চার পয়সা।

অপুর জন্য দোকানী শরবৎ মিশাইতেছে, বরফ ভাঙিতেছে, ছেলেমেয়ে দু'টি মুগ্ধনেত্রে দেখিতে লাগিল। মেয়েটি অপুর দিকে চাহিয়া বলিল—আপনাকে ওই সবুজ বোতল থেকে দেবে না?

যেন সবুজ বোতলের মধ্যে শচীদেবীর পায়স পোরা আছে।

অপুর মন করুণার্দ্র হইল। ভাবিল—এরা বোধ হয় কখনও কিছু দেখে নি—এই রং-করা

টক চিনির রসকে কি ভাবছে, ভালো সিরাপ কি জানে না। বলিল—খুকী, খোকা, শরবং খাবে? খাও না—ওদের দু'গ্লাস শরবং দাও তো—

প্রথমটা তারা খাইতে রাজী হয় না, অনেক করিয়া অপু তাহাদের লজ্জা ভাঙিল। অপু বলিল—ভালো সিরাপ তোমার আছে? থাকে তো দাও, আমি দাম দোব। কোন জায়গা থেকে এনে দিতে পার না?

বোতলে যাহা আছে তাহার অপেক্ষা ভাল সিরাপ এ অঞ্চলে নাকি কুত্রাপি মেলা সম্ভব নয়। অবশেষে সেই শরবংই এক এক বড় গ্লাস দুই ভাই-বোন মহাতৃপ্তি ও আনন্দের সহিত খাইয়া ফেলিল, সবুজ বোতলের সেই টক চিনির রসই।

অপু তাহাদের বিস্কুট ও এক পয়সা মোড়কের বাক্সে চকলেট্ কিনিয়া দিল—দোকানটাতে ভালো কিছু যদি পাওয়া যায় ছাই। তবুও অপুর মনে হইল পয়সা তার সার্থক হইয়াছে আজ।

বাসায় ফিরিয়া তাহার মনে হইল বড় সাহিত্যের প্রেরণার মূলে এই মানব-বেদনা। ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত রশিয়ার প্রজাস্বত্ব আইন, 'সার্ফ' নীতি; জার-শাসিত রাশিয়ার সাইবেরিয়া, শীত, অত্যাচার, কুসংস্কার, দারিদ্র্য—গোগোল, ডস্টয়েভ্স্কি, গোর্কি, টলস্টয় ও শেকভের সাহিত্য সম্ভব করিয়াছে। সে বেশ কল্পনা করিতে পারে, দাসব্যবসায়ের দুর্দিনে, আফ্রিকার এক মরুবেষ্টিত পল্লী-কুটির হইতে কোমল-বয়স্ক এক নিগ্রো বালক পিতামাতার স্নেহকোল হইতে নিষ্ঠুরভাবে বিচ্যুত হইয়া বহু দূরে বিদেশের দাসের হাটে ক্রীতদাসরূপে বিক্রিত হইল, বহুকাল আর সে বাপ-মাকে দেখিল না, ভাই-বোনদের দেখিল না—দেশে দেশে তাহার অভিনব জীবনধারার দৈন্য, অত্যাচার ও গোপন অশ্রুজলের কাহিনী, তাহার জীবনের সে অপূর্ব ভাবানুভূতির অভিজ্ঞতা সে যদি লিখিয়া রাখিয়া যাইতে পারিত! আফ্রিকার নীরব নৈশ আকাশ তাহাকে প্রেরণা দিত, তাম্রবর্ণ মরুদিগন্তের স্বপ্নমায়া তাহার চোখে অঞ্জন মাখাইয়া দিত; কিন্তু বিশ্বসাহিত্যের দুর্ভাগ্য, তাহারা নীরবে অত্যাচার সহ্য করিয়া বিশ্ব হইতে বিদায় লইল।

দিন-দুই পরে একদিন সন্ধ্যার পর গড়ের মাঠ হইতে একা বেড়াইয়া ফিরিবার মুখে হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল'র দোকানের সামনে একটুখানি দাঁড়াইয়াছে—একজন আধাবয়সী লোক কাছে আসিয়া বলিল—বাবু, প্রেমারা খেলবেন? খুব ভাল জায়গা। আমি নিয়ে যাব, এখান থেকে পাঁচ মিনিট। ভদ্র জায়গা, কোন হাঙ্গামায় পড়তে হবে না। আসবেন?

অপু বিস্মিত মুখে লোকটার মুখের দিকে চাহিল। আধময়লা কাপড় পরণে, খোঁচা খোঁচা কড়া দাড়ি-গোঁফ, ময়লা দেশী টুইলের সার্ট, কব্জির বোতাম নাই—পানে ঠোঁট দুটো কালো। দেখিয়াই চিনিল—সে ছাত্র-জীবনের পরিচিত বন্ধু হরেন—সেই যে ছেলেটি একবার তাহাদের কলেজ হইতে বই চুরি করিয়া পালাইতে গিয়া ধরা পড়ে। বহুকাল আর দেখা-সাক্ষাৎ নাই—অপু লেখাপড়া ছাড়িয়া দিবার পর আর কখনো নয়। লোকটাও অপুকে চিনিল, থতমত খাইয়া গেল। অপুও বিস্মিত হইয়াছিল—এইসব ব্যাপারের অভিজ্ঞতা তাহার নাই—জীবনে কখনও না—তবুও সে বুঝিয়াছিল তাহার এই ছাত্রজীবনের বন্ধুটি কোন্ পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে কিছু উত্তর করিবার পূর্বে হরেন আসিয়া তাহার হাত দু'টি ধরিল—বলিল, মাপ কর ভাই, আগে টের পাই নি। বহুকাল পরে দেখা—থাক কোথায়?

অপু বলিল—তুমি থাক কোথায়—এখানেই আছে—কত দিন?···

—এই নিকটেই। তালতলা লেন—আসবে···অনেক কথা আছে—

—আজ আর হবে না, আসছে সোমবার পাঁচটার সময় যাব। নম্বরটা লিখে নিই।

—সে হবে না ভাই—তুমি আর আসবে না—তোমার দেখা আরে পাবার ভরসা রাখি নে। আজই চলো।

অতি অপরিচ্ছন্ন বাসা। একটি মাত্র ছোট ঘর।

অপু ঘরে ঢুকিতেই একটা কেমন ভ্যাপ্‌সা গন্ধ তাহার নাকে গেল। ছোট্ট ঘর, জিনিসপত্রে ভর্ত্তি, মেঝেতে বিছানা-পাতা, তাহারেই একপাশে হরেন অপুর বসিবার জায়গা করিয়া দিল। ময়লা চাদর, ময়লা কাঁথা, ময়লা বালিশ, ময়লা কাপড়, ছেঁড়া মাদুর—কলাইকরা গ্লাস, থালা, কালি-পড়া হারিকেন লণ্ঠন, কাঁথার আড়াল হইতে তিন-চারটি শীর্ণ কালো কালো ছোট হাত পা বাহির হইয়া আছে—একটি সাত আট বছরের মেয়ে ওদিকের দালানে দুয়ারের চৌকাঠের উপর বসিয়া। দালানের ওপাশটা রান্নাঘর—হরেনের স্ত্রী সম্ভবতঃ রাঁধিতেছে।

হরেন মেয়েটিকে বলিল—ওরে টেঁপি, তামাক সাজ তো—

অপু বলিল—ছোট ছেলেমেয়েকে দিয়ে তামাক সাজাও কেন? নিজে সাজো—ও শিক্ষা ভালো নয়—

হরেন স্ত্রীর উদ্দেশে চীৎকার করিয়া বলিল—কোথায়-রৈলে গো, এদিকে এসো, ইনি আমার কলেজ-আমলের সকলের চেয়ে বড় বন্ধু, এত বড় বন্ধু আর কেউ ছিল না—এঁর কাছে লজ্জা করতে হবে না—একটু চা-টা খাওয়াও—এসো এদিকে।

তারপর হরেন নিজের কাহিনী পাড়িল। কলেজ ছাড়িয়াই বিবাহ হয়—তারপর এই দুঃখদুর্দশা—বড় জড়াইয়া পড়িয়াছে—বিশেষতঃ এই সব লেণ্ডি-গেণ্ডি। কত রকম করিয়া দেখিয়াছে—কিছুতেই কিছু হয় না। স্কুলমাস্টারী, দোকান, চালানী ব্যবসা, ফটোগ্রাফের কাজ, কিছুই বাকী রাখে নাই—আজকাল যাহা করে তা তো অপু দেখিয়াছে। বাসায় কেহ জানে না—উপায় কি?—এতগুলি মুখে অন্ন তো—এই বাজার ইত্যাদি।

হরেনের কথাবার্ত্তার ধরণ অপুর ভাল লাগিল না। চোখেমুখে কেমন যেন একটা—ঠিক বোঝানো যায় না—অপুর মনে হইল হরেন এই সব নীচ ব্যবসায়ে পোক্ত হইয়া গিয়াছে।

হরেনের স্ত্রীকে দেখিয়া অপুর মন সহানুভূতিতে আর্দ্র হইয়া উঠিল। কালো, শীর্ণ চেহারা, হাতে গাছকতক কাচের চুড়ি। মাথায় সামনের দিকে চুল উঠিয়া যাইতেছে, হাতে কাপড়ে বাটনার হলুদ-মাখা! সে এমন আনন্দ ও ক্ষিপ্রতার সহিত চা আনিয়া দিল যে, সে মনে করে যেন এত দিনে স্বামীর পরমহিতৈষী বন্ধুর সাক্ষাৎ যখন পাওয়া গিয়াছে—দুঃখ বুঝি ঘুচিল। উঠিবার সময় হরেন বলিল—ভাই বাড়ি-ভাড়া কাল না দিলে অপমান হ'ব—পাঁচটা টাকা থাকে তো দাও তো!

অপু টাকাটা দিয়া দিল। বাহির হইতে যাইতেছে, বড় ছেলেটিকে তার মা যেন কি শিখাইয়া দিল, সে দরজার কাছে আসিয়া বলিল—ও কাকাবাবু, আমার দু'খানা ইস্কুলের বই এখনও কেনা হয় নি—কিনে দেবেন? বই না কিনলে মাস্টার মারবে—

হরেন ভানের সুরে বলিল—যা যা আবার' বই—হ্যাঃ, ইস্কুলও যত—ফি বছর বই বদলাবে—যা এখন—

অপু তাহাকে বলিল—এখন তো আর কিছুই হাতে নেই খোকা, পকেট একেবারে খালি।

হরেন অনেক দূর পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে আসিল। সে চাষবাস করিবার জন্য উত্তরপাড়ার জমি দেখিয়া আসিয়াছে, দুই হাজার টাকা হইলে হয়—অপূর্ব্ব কি টাকাটা ধার দিতে

পারিবে ? না হয়, আধাআধি বখরা—খুব লাভের ব্যবসা।

প্রথম দিনের সাক্ষাতেই এ সব ?

কেমন একটা অপ্রীতিকর মনোভাব লইয়া অপু বাসায় ফিরিল। শেষে কিনা জুয়ার দালালী ? প্রথম যৌবনে ছিল চোর, আরও কত কি করিয়াছে, কে খোঁজ রাখে ? এ আর ভাল হইল না !

দিন তিনেক পর একদিন সকালে হরেন আসিয়া হাজির অপুর বাসায়। নানা বাজে কথার পর উত্তরপাড়ার জমি লওয়ার কথা পাড়িল। টিউবওয়েল বসাইতে হইবে। কারণ জলের সুবিধা নাই—অপূর্ব কত টাকা দিতে পারে ? উঠিবার সময় বলিল—ওহে, তুমি মানিককে কি বই কিনে দেবে বলেছিলে, আমায় বলছিল ! অপু ভাবিয়া দেখিল এরূপ কোন কথা মানিককে সে বলে নাই—যাহা হউক, না হয় দিয়া দিবে এখন। মানিককে বইয়ের দরুন টাকা হরেনের হাতে দিয়া দিল।

তাহার পর হইতে হরেনের যাতায়াত শুরু হইল একটু ঘন ঘন। বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝে মানিকও আসিতে লাগিল। কখনও সে আসিয়া বলে, তাহারা বায়স্কোপ দেখিতে যাইবে, টাকা দিন কাকাবাবু। কখনও তাহার জুতা নাই, কখনও ছোট খোকার জামা নাই—কখনও তাহার বড় দিদি, ছোট দিদির বায়না। ইহারা আসিলেই দু-তিন টাকার কমে অপুর পার হইবার উপায় নাই। হরেনও নানা ছুতায় টাকা চায়, বাড়ি ভাড়া—স্ত্রীর অসুখ।

একদিন কাজলের একটা সেলুলয়েডের ঘর-সাজানো জাপানী সামুরাই পুতুল খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। তার দিন-দুই আগে মানিকের সঙ্গে তার ছোট বোন টেঁপি আসিয়াছিল—অনেকক্ষণ পুতুলটা নাড়াচাড়া করিতেছিল, কাজল দেখিয়াছে। তারপর দিন-দুই আর সেটার খোঁজ নাই, কাজল আজ দেখিল পুতুলটা নাই। ইহার দিন পনেরো পরে হরেনের বাসায় চায়ের নিমন্ত্রণে গিয়া অপু দেখিল, কাজলের জাপানী পুতুলটা একেবারে সামনেই একটা হ্যারিকেন লণ্ঠনের পাশে বসানো। পাছে ইহারা লজ্জায় পড়ে তাই সেদিকটা পিছু ফিরিয়া বসিল ও যতক্ষণ রহিল, লণ্ঠনটার দিকে আদৌ চাহিল না। ভাবিল—যাক গে, খুকী লোভ সামলাতে না পেরে এনেছে, খোকাকে আর একটা কিনে দেবো।

উঠিয়া আসিবার সময় মানিক বলিল—মা বললেন, তোর কাকাবাবুকে বল—একদিন আমাদের কালীঘাট দেখিয়ে আনতে—সামনের রবিবারে চলুন কাকাবাবু, আমাদের ছুটি আছে, আমিও যাব।

অপুর বেশ কিছু খরচ হইল রবিবারে। ট্যাক্সিভাড়া, জলখাবার, ছেলেপিলেদের খেলনা ক্রয়, এমন কি বড় মেয়েটির একখানা কাপড় পর্যন্ত। কাজলও গিয়াছিল, সে এই প্রথম কালীঘাট দেখিয়া খুব খুশী।

সেদিন নিজের অলক্ষিতে অপুর মনে হইল তাহার কবিরাজ বন্ধুটি ও তাহার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কথা—তাদের প্রথম জীবনের সেই দারিদ্র্য—সেই পরিশ্রম—কখনও বিশেষ কিছু তো চাহে নাই কোনদিন—বরং কিছু দিতে গেলে ক্ষুন্ন হইত। কিন্তু আন্তরিক স্নেহটুকু ছিল তাহার উপর। এখনও ভাবিলে অপুর মন উদাস হইয়া পড়ে।

বাড়ি ফিরিয়া দেখিল, একটি সতের-আঠারো বছরের ছোকরা তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। দেখিতে শুনিতে বেশ, সুন্দর চোখ-মুখ, একটু লাজুক, কথা বলিতে গেলে মুখ রাঙা হইয়া যায়।

অপু তাহাকে চিনিল—চাঁপদানীর পূর্ণ দিঘড়ীর ছেলে রসিকলাল—যাহাকে সে টাইফয়েড হইতে বাঁচাইয়াছিল। অপু বলিল—রসিক, তুমি আমার বাসা জানলে কি ক'রে ?

—আপনার লেখা বেরুচ্চে 'বিভাবরী' কাগজে—তাদের অফিস থেকে নিয়েছি—

—তারপর, অনেককাল পর দেখা—কি খবর বলো ?

—শুনুন, দিদিকে মনে আছে তো ? দিদি আমায় পাঠিয়ে দিয়েচে—বলে দিয়েচে যদি কলকাতায় যাস, তবে মাস্টার মশায়ের সঙ্গে দেখা করিস। আপনার কথা বড্ড বলে, আপনি একবার আসুন না চাঁপদানীতে !

—পটেশ্বরী ? সে এখনও মনে ক'রে রেখেছে আমার কথা ?

রসিক সুর নিচু করিয়া বলিল—আপনার কথা এমন দিন নেই—আপনি চলে এসেচেন আট দশ বছর হ'ল—এই আট দশ বছরের মধ্যে আপনার কথা বলে নি—এমন একটা দিনও বোধ হয় যায় নি। আপনি কি কি খেতে ভালবাসতেন—সে সব দিদির এখন মুখস্থ। কলকাতায় এলেই আমায় বলে মাস্টার মশায়ের খোঁজ করিস না রে ? আমি কোথায় জানব আপনার খোঁজ—কলকাতা শহর কি চাঁপদানী ? দিদি তা বোঝে না। তাই এবার 'বিভাবরী'তে আপনার লেখা—

—পটেশ্বরী কেমন আছে ? আজকাল আর সে সব শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার—

—শাশুড়ী মারা গিয়েচে, আজকাল কোন অত্যাচার নেই, দু'তিনটি ছেলেমেয়ে হয়েছে, —সে-ই আজকাল গিন্নী, তবে সংসারের বড় কষ্ট। আমাকে বলে দেয় বোতলের চাট্‌নি কিনতে—দশ আনা দাম—আমি কোথা থেকে পাব—তাই একটা ছোট বোতল আজ এই দেখুন কিনে নিয়ে যাচ্ছি ছ' আনায়। টে'পারির আচার। ভালো না ?

—এক কাজ করো। চলো আমি তোমাকে আচার কিনে দিচ্ছি, আমের আচার ভালবাসে ? চলো দেশী চাট্‌নি কিনি। ভিনিগার দেওয়া বিলিতি চাট্‌নি হয়তো পছন্দ করবে না।

—আপনি কবে আসবেন ? আপনার সঙ্গে দেখা হয়েচে অথচ আপনাকে নিয়ে যাই নি শুনলে দিদি আমাকে বাড়িতে তিষ্ঠুতে দেবে না কিন্তু, আজই আসুন না ?—

—সে এখন হবে না, সময় নেই। সুবিধে মত দেখব।

অপু অনেকগুলি ছেলেমেয়ের খেলনা, খাবার চাটনি কিনিয়া দিল। রসিককে স্টেশনে তুলিয়া দিয়া আসিল। রসিক বলিল—আপনি কিন্তু ঠিক যাবেন একদিন এর মধ্যে—নৈলে ওই বললুম যে—

কি চমৎকার নীল আকাশ আজ ! গরম আজ একটু কম।

চৈত্র দুপুরের এই ঘন নীল আকাশের দিকে চাহিলেই আজকাল কেন শৈশবের কথাই তাহার মনে পড়ে ?

একটা জিনিস সে লক্ষ্য করিয়াছে। বাল্যে যখন অন্য কোনও স্থানে সে যায় নাই—যখন যাহা পড়িত—মনে মনে তাহার ঘটনাস্থলের কল্পনা করিতে গিয়া নিশ্চিন্দিপুরেরই বাঁশবন, আমবাগান, নদীর ঘাট, কুঠির মাঠের ছবি মনে ফুটিয়া উঠিত—তাও আবার তাদের পাড়ার ও তাদের বাড়ির আশে-পাশের জায়গার। তাদের বাড়ির পিছনের বাঁশবন তো রামায়ণ মহাভারত মাখানো ছিল—দশরথের রাজপ্রাসাদ ছিল তাদের পাড়ার ফণি মুখুয্যেদের ভাঙা দোতলা বাড়িটা—মাধবীকঙ্কণে পড়া একলিঙ্গের মন্দির ছিল ছিরে পুকুরের পশ্চিমদিকের সীমানার বড় বাঁশঝাড়টার তলায়—বঙ্গবাসীতে পড়া জোয়ান-অব-আর্ক মেষপাল চরাইত নদীপারের দেয়াড়ের কাশবনের চরে, শিমুল গাছের ছায়ায়···তারপর বড় হইয়া কত নতুন স্থানে একে একে গেল, মনের ছবি ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইতে লাগিল—ম্যাপ চিনিল, ভূগোল পড়িল, বড় হইয়া যে সব বই পড়িল তাদের ঘটনা নিশ্চিন্দিপুরের মাঠে, বনে, নদীর

পথেঘাটে নাই, কিন্তু এতকালের পরেও বাল্যের যে ছবিগুলি একবার অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল তা অপরিবর্ত্তিতই আছে—এতকাল পরেও যদি রামায়ণ-মহাভারতের কোনও ঘটনা কল্পনা করে—নিশ্চিন্দিপুরের সেই অস্পষ্ট, বিস্মৃতপ্রায় স্থানগুলিই তার রথীভূমি হইয়া দাঁড়ায়—অনেককাল পর সেদিন আর একবার পুরনো বইয়ের দোকানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মাধবীকঙ্কণ ও জীবনসন্ধ্যা পড়িতেছিল—কি অদ্ভুত!—পাতায় পাতায় নিশ্চিন্দিপুর মাখানো, বাল্যের ছবি এখনও সেই অস্পষ্ট-ভাবে-মনে-হওয়া জঙ্গলে-ভরা পোড়ো পুকুরটার পশ্চিম সীমানার বাঁশঝাড়ের তলায়!···

এবার মাঝে মাঝে দু-একটি পূর্ব্ব-পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে অপুর দেখা হইতে লাগিল প্রায়ই। কেহ উকিল, কেহ ডাক্তার—জানকী মফঃস্বলের একটা গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেডমাস্টার, মন্মথ এটর্নির ব্যবসায়ে বেশ উপার্জ্জন করে। দেবব্রত একবার ইতিমধ্যে সস্ত্রীক কলিকাতা আসিয়াছিল, স্ত্রীর পা সারিয়া গিয়াছে, দু'টি মেয়ে হইয়াছে। চাকরিতে সে বেশ নাম করিয়াছে, তবে চেষ্টায় আছে কন্ট্রাক্টারী ব্যবসায় স্বাধীনভাবে আরম্ভ করিতে। দেওয়ান-পুরের বাল্যবন্ধু সেই সমীর আজকাল ইনসিওরেন্সের বড় দালাল। সে চিরকাল পয়সা চিনিত, হিসাবী ছিল—আজকাল অবস্থা ফিরাইয়া ফেলিয়াছে। কষ্টদুঃখ করিতে করিতে একবারও সে ইহাদিগকে হিংসা করে না। তারপর এবার জানকীর সঙ্গে একদিন কলিকাতায় দেখা হইল। মোটা হইয়া গিয়াছে বেজায়, মনের তেজ নাই, গৃহস্থালির কথাবার্ত্তা—অপুর মনে হইল সে যেন একটা বন্ধ ঘরের জানালা বন্ধ করিয়া বসিয়া আছে।

তাহার এটর্নি বন্ধু মন্মথ একদিন বলিল—ভাই, সকাল থেকে ব্রিফ নিয়ে বসি, সারাদিনের মধ্যে আর বিশ্রাম নেই—খেয়েই হাইকোর্ট, পাঁচটায় ফিরে একটা জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজারী করি ঘণ্টা-তিনেক—তারপর বাড়ি ফিরে আবার কাজ—খবরের কাগজখানা পড়বার সময় পাই নে, কিন্তু এত টাকা রোজগার করি, তবু মনে হয়, ছাত্রজীবনই ছিল ভাল। তখন কোন একটা জিনিস থেকে বেশী আনন্দ পেতুম—এখন মনে হয়, আই হ্যাভ লস্ট দি সস্ অফ্ লাইফ—

অপু নিজের কথা ভাবিয়া দেখে। কৈ, এত বিরুদ্ধ ঘটনার ভিতর দিয়াও তাহার মনের আনন্দ—কেন নষ্ট হয় নাই? নষ্ট হয় তো নাই-ই, কেন তাহা দিনে দিনে এমন অদ্ভুত ধরণের উচ্ছ্বসিত প্রাচুর্য্যে বাড়িয়া চলিয়াছে? কেন পৃথিবীটা, পৃথিবী নয়—সারা বিশ্বটা, সারা নাক্ষত্রিক বিশ্বটা এক অপরূপ রঙে তাহার কাছে রঙীন? আর দিনে দিনে এ কি গহন গভীর রহস্য তাহাকে মুগ্ধ করিয়া প্রতি বিষয়ে অতি তীব্রভাবে সচেতন করিয়া দিতেছে?···

সে দেখিতে পায় তার ইতিহাস, তার এই মনের আনন্দের প্রগতির ইতিহাস, তার ক্রমবর্দ্ধমান চেতনার ইতিহাস।

এই জগতের পিছনে আর একটা যেন জগৎ আছে। এই দৃশ্যমান আকাশ, পাখির ডাক, এই সমস্ত সংসার-জীবন-যাত্রা—তারই ইঙ্গিত আনে মাত্র—দূরে দিগন্তের বহুদূর ওপারে কোথায় যেন সে জগৎটা—পিঁয়াজের একটা খোসার মধ্যে যেমন আর একটা খোসা তার মধ্যে আর একটা খোসা, সেটাও তেমনি এই আকাশ, বাতাস, সংসারের আবরণে কোথাও যেন ঢাকা আছে, কোন্ জীবন-পারের মনের পারের দেশে। স্থির সন্ধ্যায় নির্জ্জনে একা কোথাও বসিয়া ভাবিলেই সেই জগৎটা একটু একটু নজরে আসে।

সেই জগৎটার সঙ্গে যোগ-সেতু প্রথম স্থাপিত হয় তার বাল্যে—দিদি যখন মারা যায়। তারপর অনিল—মা—অপর্ণা—সর্ব্বশেষে লীলা। দুস্তর অশ্রুর পারাবার সারাজীবন ধরিয়া পাড়ি দিয়া আসিয়া আজ যেন বহু দূরে সে দেশের তালীবনরেখা অস্পষ্ট নজরে আসে।

আজ গোলদীঘির বেঞ্চিখানায় বসিয়া তাই সে ভাবিয়া দেখিল, অনেক দিন আগে তার বন্ধু অনিল যে-কথা বলিয়াছিল, এ জেনারেশনের হাত হইতে কাজের ভার লওয়া—আর সবাই তা লইয়াছে, তার সকল সহপাঠীই এখন জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, দিকে দিকে জীবনের সকল কর্ম্মক্ষেত্রে তারা নামিয়া পড়িয়াছে, কেবল ভবঘুরে হইয়াছে সে ও প্রণব। কিন্তু সত্য কথা সে বলিবে ?···মন তার কি বলে ?

তার মনে হয় সে যাহা পাইয়াছে জীবনে, তাহাতেই তার জীবন হইয়াছে সার্থক। সে চায় না অর্থ, চায় না—কি সে চায় ?

সেটাও তো খুব স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। সে কি অপরূপ জীবন-পুলক এক একদিন দুপুরের রোদে ছাদটাতে সে অনুভব করে, তাকে অভিভূত, উত্তেজিত করিয়া তোলে, আকাশের দিকে উৎসুক চোখে চাহিয়া থাকে, যেন সে দৈব্যবাণীর প্রত্যাশা করিতেছে।···

কাজল কি একটা বই আগ্রহের সঙ্গে পড়িতেছে—অপু ঘরে ঢুকিতেই চোখ তুলিয়া ব্যগ্র উৎসাহের সুরে উজ্জ্বলমুখে বলিল—ওঃ, কি চমৎকার গল্পটা বাবা !—শোনো না বাবা—এখানে বসো—। পরে সে আরও কি সব বলিয়া যাইতে লাগিল। অপু অন্যমনস্ক মনে ভাবিতেছিল—বিদেশে যাওয়ার ভাড়া সে যোগাড় করিতে পারে—কিন্তু খোকা—খোকাকে কোথায় রাখিয়া যায় ?···মামার বাড়ি পাঠাইয়া দিবে ? মন্দ কি ?···কিছু দিন না হয় সেখানেই থাকুক—বছর দুই তিন তারপর সে তো ঘুরিয়া আসিবেই। তাই করিবে ?··· মন্দ কি ?

কাজল অভিমানের সুরে বলিল—তুমি কিচ্ছু শুনচ না বাবা—

—শুনব না কেন রে, সব শুনছি। তুই বলে যা না ?

—ছাই শুনছো, বল দিকি শ্বেতপুরী কোন্ বাগানে আগে গেল ?

অপু বলিল—কোন্ বাগানে ?—আচ্ছা একটু আগে থেকে বল্ তো খোকা—ওটা ভাল মনে নেই ! খোকা অতশত ঘোরপ্যাঁচ বুঝিতে পারে না,—সে আবার গোড়া হইতে গল্প-বলা শুরু করিল—বলিল—এইবার তো রাজকন্যে শেকড় খুঁজতে যাচ্ছে, কেমন না ? মনে আছে তো ?—(অপু এক বর্ণও শোনে নাই) তারপর শোনো বাবা—

কাজলের মাথার চুলের কি সুন্দর ছেলেমানুষি গন্ধ !—দোলা, চুষিকাটি, ঝিনুকবাটি, মায়ের কোল—এই সব মনে করাইয়া দেয়—নিতান্ত কচি। সত্যি ওর দিকে চাহিয়া দেখিলে আর চোখ ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না—কি হাসি, কি চোখ দুটি—মুখ কি সুন্দর—এইটুকু এক রত্তি ছেলে—যেন বাস্তব নয়, যেন এ পৃথিবীর নয়—কোন্ সময় জ্যোৎস্নাপরী আসিয়া ওকে যেন উড়াইয়া লইয়া কোনও স্বপ্নপারের দেশে লইয়া যাইবে—দিনরাত কি চঞ্চলতা, কি সব অদ্ভুত খেয়াল ও আবদার—অথচ কি অবোধ ও অসহায় !—ওকে কি করিয়া প্রতারণা করা যাইবে ?—ও তো একদণ্ড ছাড়িয়া থাকিতে পারে না—ওকে কি বলিয়া ভুলানো যায় ? অপু মনে মনে সেই ফন্দিটাই ভাবিতে লাগিল।

ছেলেকে বলিল—চিনি নিয়ে আয় তো খোকা—একটু হালুয়া করি।

কাজল মিনিট দশেক মাত্র বাহিরে গিয়াছে—এমন সময় গলির বাহিরে রাস্তায় কিসের একটা গোলমাল অপুর কানে গেল। বাহির হইয়া ঘরের দোরে দাঁড়াইল—গলির ভিতর হইতে লোক দৌড়াইয়া বাহিরের দিকে ছুটিতেছে—একজন বলিল—একটা কে লরি চাপা পড়েছে—

অপু দৌড়িয়া গলির মুখে গেল। বেজায় ভিড়, সবাই আগাইতে চায়, সবাই ঠেলাঠেলি করিতেছে। অপুর পা কাঁপিতেছিল, জিভ শুকাইয়া আসিয়াছে। একজন কে বলিল—কে

চাপা পড়েছে মশাই—

—ওই যে ওখানে একটি ছেলে—আহা মশায়, তখনই হয়ে গিয়েছে—মাথাটা আর নেই—

অপু রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল—বয়স কত?

—বছর নয় হবে—ভদ্রলোকের ছেলে, বেশ ফর্সা দেখতে—আহা!—

অপু এ প্রশ্নটা কিছুতেই মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিল না—তাহার গায়ে কি ছিল। কাজল তার নতুন তৈরী খদ্দরের শার্ট পরিয়া এইমাত্র বাহির হইয়া গিয়াছে—

কিন্তু এই সময়ে হঠাৎ অপু হাতে পায়ে অদ্ভুত ধরণের বল পাইল—বোধ হয় যে খুব ভালবাসে, সে ছাড়া এমন বল আর কেহ পায় না এমন সময়ে। খোকার কাছে এখনি যাইতে হবে —যদি একটুও বাঁচিয়া থাকে—সে বোধ হয় জল খাইবে, হয়ত ভয় পাইয়াছে—

ওপারের ফুটপাতে গ্যাসপোস্টের পাশে ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, পুলিশ আসিয়াছে—ট্যাক্সিতে ধরাধরি করিয়া দেহটা উঠাইতেছে! অপু ধাক্কা মারিয়া সামনের লোকজনকে হঠাইয়া খানিকটা জায়গা ফাঁকা করিয়া ফেলিল। কিন্তু ফাঁকায় আসিয়া সামনে ট্যাক্সিটার দিকে চাহিয়াই তাহার মাথাটা ঘুরিয়া উঠিল যে, পাশের লোকের কাঁধে নিজের অজ্ঞাতসারে ভর না দিলে সে হয়তো পড়িয়াই যাইত। ট্যাক্সির সামনে যে ভিড় জমিয়াছে তারই মধ্যে দাঁড়াইয়া ডিঙি মারিয়া কাণ্ডটা দেখিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে—কাজল। অপু ছুটিয়া গিয়া ছেলের হাত ধরিল—কাজল ভীত অথচ কৌতূহলী চোখে মৃতদেহটা দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল—অপু তাহাকে হাত ধরিয়া লইয়া আসিল।—কি দেখছিলি ওখানে?···আয় বাসায়—

অপু অনুভব করিল তাহার মাথা যেন ঝিম্‌ঝিম করিতেছে—সারা দেহে যেন এইমাত্র কে ইলেক্‌ট্রিক ব্যাটারির শক্‌ লাগাইয়া দিয়াছে।

গলির পথে কাজল একটু ইতস্তত করিয়া অপ্রতিভের সুরে বলিল—বাবা, গোলমালে আমায় যে সিকিটা দিয়েছিলে চিনি আনতে, কোথায় পড়ে গিয়েচে খুঁজে পাই নি।

—যাক্‌ গে। চিনি নিয়ে চলে আসতে পারতিস কোন্‌কালে—তুই বড় চঞ্চল ছেলে খোকা।

দিন দুই পরে সে কি কাজে হ্যারিসন রোড দিয়ে চিৎপুরের দিকে ট্রামে চড়িয়া যাইতেছিল, মোড়ের কাছে শীলেদের বাড়ির রোকড়নবিশ রামধনবাবুকে ছাতি মাথায় যাইতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি ট্রাম হইতে নামিল, কাছে গিয়া বলিল, কি রামধনবাবু, চিনতে পারেন? রামধনবাবু হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন, আরে অপূর্ববাবু যে? তারপর কোথা থেকে আজ এতকাল পরে! ওঃ আপনি একটু অন্যরকম দেখতে হয়ে গিয়েছেন, তখন ছিলেন ছোকরা—

অপু হাসিয়া বলিল—তা বটে। এদিকেও চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ হ'ল—কতকাল আর ছোকরা থাকব—আপনি কোথায় চলেছেন?

—আপিস যাচ্ছি, বেলা প্রায় এগারোটা বাজে—না? একটু দেরি হয়ে গেল। একদিন আসুন না? কতদিন তো কাজ করেছেন, আপনার পুরনো আপিস, হঠাৎ চাকরিটা দিলেন ছেড়ে, তা নইলে আজ এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার হ'তে পারতেন, হরিচরণবাবু মারা গিয়েছেন কিনা।

সত্যিই বটে বেলা সাড়ে দশটা। রামধনবাবু পুরনো দিনের মত ছাতি মাথায়, লংক্লথের ময়লা ও হাত-ছেঁড়া পাঞ্জাবি গায়ে, ক্যাম্বিসের জুতা পায়ে দিয়া, অপু দশ বৎসর

পূর্ব্বে যে আপিসটাতে কাজ করিত, সেখানে গুটি গুটি চলিয়াছেন।

অপু জিজ্ঞাসা করিল, রামধনবাবু, কতদিন কাজ হ'ল ওদের ওখানে আপনার সবসুদ্ধ ?

রামধনবাবু পুরনো দিনের মত গর্ব্বিতসুরে বললেন, এই সাঁইত্রিশ বছর যাচ্ছে। কেউ পারবে না বলে দিচ্ছি,—এক কলমে এক সেরেস্তায়। আমার দ্যাখ্‌তায় পাঁচ পাঁচটা ম্যানেজরে বদল হ'ল—কত এল, কত গেল—আমি ঠিক বজায় আছি। এ শর্ম্মার চাকরি ওখান থেকে কেউ নড়াতে পারছেন না—যিনিই আসুন। হাসিয়া বলিলেন—এবার মাইনে বেড়েছে, এই প'য়তাল্লিশ হ'ল।

অপুর মাথা কেমন ঘুরিয়া উঠিল—সাঁইত্রিশ বছর একই অন্ধকার ঘরে একই হাতবাক্সের উপর ভারী খেরো-বাঁধানো রোকড়ের খাতা খুলিয়া কালি ও স্টিলপেনের সাহায্যে শীলেদের সংসারের চালডালের হিসাব লিখিয়া চলা—চারিধারে সেই একই দোকান-পসার, একই পরিচিত গলি, একই সহকর্ম্মীর দল, একই কথা আলোচনা—বারোমাস, তিনশো তিরিশদিন।—সে ভাবিতে পারে না—এই বদ্ধজল, পঙ্কিল, পচা পানা পুকুরের মত গতিহীন, প্রাণহীন, ক্ষুদ্র জীবনের কথা ভাবিলেও তাহার গা কেমন করিয়া উঠে।

বেচারী রামধনবাবু—দরিদ্র, বৃদ্ধ, ও'র দোষ নাই, তাও সে জানে। কলিকাতার বহু শিক্ষিতসমাজে, আড্ডায়, ক্লাবে সে মিশিয়াছে। বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়ে জীবন—অর্থহীন, ছন্দহীন, ঘটনাহীন, দিনগুলি! শুধু টাকা, টাকা—শুধু খাওয়া, পানাসক্তি, ব্রিজখেলা, ধূমপান, একই তুচ্ছ বিষয়ে একঘেয়ে অসার বকুনি—তরুণ মনের শক্তিকে নষ্ট করিয়া দেয়, আনন্দকে ধ্বংস করে, দৃষ্টিকে সংকীর্ণ করে, শেষে ঘোর কুয়াশা আসিয়া সূর্য্যালোককে রুদ্ধ করিয়া দেয়—ক্ষুদ্র, পঙ্কিল, অকিঞ্চিৎকর জীবন কোন রকমে খাত বাহিয়া চলে!···সে শক্তিহীন নয়—এই পরিণাম হইতে সে নিজকে বাঁচাইবে।

তারপর সে রামধনবাবুর অনুরোধে ও কতকটা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া শীলেদের বাড়ি গেল। সেই আপিস, ঘরদোর, লোকের দল বজায় আছে। প্রবোধ মুহুরী বড়লোক হইবার জন্য কোন লটারীতে প্রতি বৎসর একখানি টিকিট কিনিতেন, বলিতেন—ও পাঁচটা টাকা বাজে খরচের সামিল ধরে রেখেছি দাদা। যদি একবার লেগে যায়, তবে সুদে আসলে সব উঠে আসবে। তাহা আজও আসে নাই, কারণ তিনি আজও দেবোত্তর এস্টেটের হিসাব কষিতেছেন।

খুব আদর-অভ্যর্থনা করিল সকলে। মেজবাবু কাছে বসাইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। বেলা এগারোটা বাজে, তিনি এই মাত্র ঘুম হইতে উঠিয়াছেন—বিলিয়ার্ড ঘরের সামনের বারান্দাতে চাকর তাঁহাকে এখনি তৈল মাখাইবে, বড় রুপার গুড়গুড়িতে রেশমের গলাবন্ধ-ওয়ালা নলে বেহারা তামাক দিয়া গেল।

এ বাড়ির একটি ছেলেকে অপু পূর্ব্বে দিনকতক পড়াইয়াছিল, তখন সে ছোট ছিল, বেশ সুন্দর দেখিতে ছিল—ভারী পবিত্র মুখশ্রী, স্বভাবটিও ছিল ভারী মধুর। সে এখন আঠার উনিশ বছরের ছেলে, কাছে আসিয়া পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল—অপু দেখিয়া ব্যথিত হইল, সে এই সকালেই অন্ততঃ দশটা পান খাইয়াছে—পান খাইয়া খাইয়া ঠোঁট কালো—হাতে রুপার পানের কৌটা—পান জর্দ্দা। এবার টেস্ট পরীক্ষায় ফেল মারিয়াছে, খানিকক্ষণ কেবল নানা ফিল্মের গল্প করিল, বাস্টার কিটনকে মাস্টারমশায়ের কেমন লাগে?···চার্লি চ্যাপলিন? নর্ম্মা শিয়ারার—ও সে অদ্ভুত!

ফিরিবার সময় অপুর মনটা বেদনায় পূর্ণ হইয়া গেল। বালক, ওর দোষ কি? এই আবহাওয়ায় খুব বড় প্রতিভাও শুকাইয়া যায়—ও তো অসহায় বালক—

রামধনবাবু বলিলেন, চললেন অপূর্ব্ববাবু? নমস্কার। আসবেন মাঝে মাঝে।

গলির বাহিরে সেই পচা খড় বিচালি, পচা আপেলের খোলা, শুঁটকি মাছের গন্ধ

রাত্রিতে অপুর মনে হইল সে একটা বড় অন্যায় করিতেছে, কাজলের প্রতি একটা গুরুতর অবিচার করিতেছে। ওরও তো সেই শৈশব। কাজলের এই অমূল্য শৈশবের দিনগুলিতে সে তাহাকে এই ইট, কংক্রিট, সিমেণ্ট ও বার্ড-কোম্পানীর পেটেণ্ট স্টোনে বাঁধানো কারাগারে আবদ্ধ রাখিয়া দিনের পর দিন তাহার কাঁচা, উৎসুক, স্বপ্নপ্রবণ শিশুমন তুচ্ছ বৈচিত্র্যহীন অনুভূতিতে ভরাইয়া তুলিতেছে—তাহার জীবনে বন-বনানী নাই, নদী-মর্মর নাই, পাখির কলস্বর, মাঠ, জোৎস্না, সঙ্গী-সাথীদের সুখদুঃখ—এসব কিছুই নাই, অথচ কাজল অতি সুন্দর ভাবপ্রবণ বালক—তাহার পরিচয় সে অনেকবার পাইয়াছে।

কাজল দুঃখ জানুক, জানিয়া মানুষ হউক। দুঃখ তার শৈশবের গল্পে পড়া সেই সোনা-করা জাদুকর! ছেঁড়া-খোঁড়া কাপড়, ঝুলি ঘাড়ে বেড়ায়, এই চাপ-দাড়ি, কোণে-কাঁদাড়ে ফেরে, কারুর সঙ্গে কথা কয় না, কেউ পোছে না, সকলে পাগল বলে, দূর দূর করে, রাতদিন হাপর জ্বালায়, রাতদিন হাপর জ্বালায়।

পেতল থেকে, রাং থেকে, সীসে থেকে ও-লোক কিন্তু সোনা করিতে জানে, করিয়াও থাকে।

এই দিনটিতে বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে সর্বপ্রথম এতকাল পরে একটা চিন্তা মনে উদয় হইল। নিশ্চিন্দিপুর একবারটি ফিরিলে কেমন হয়? সেখানে আর কেউ না থাক, শৈশব-সঙ্গিনী রাণুদিদি তো আছে। সে যদি বিদেশে চলিয়া যায়, তার আগে খোকাকে তার পিতামহের ভিটাটা দেখাইয়া আনাও তো একটা কর্ত্তব্য?

পরদিনই সে কাশীতে লীলাদিকে পঁচিশটা টাকা পাঠাইয়া লিখিল, সে খোকাকে লইয়া একবার নিশ্চিন্দিপুর যাইতেছে, খোকাকে পিতামহের গ্রামটা দেখাইয়া আনিবে। পত্রপাঠ যেন লীলাদি তার দেওরকে সঙ্গে লইয়া সোজা নিশ্চিন্দিপুর চলিয়া যায়।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

ট্রেনে উঠিয়াও যেন অপুর বিশ্বাস হইতেছিল না, সে সত্যই নিশ্চিন্দিপুরের মাটিতে আবার পা দিতে পারিবে—নিশ্চিন্দিপুর, সে তো শৈশবের স্বপ্নলোক! সে তো মুছিয়া গিয়াছে, মিলাইয়া গিয়াছে, সে শুধু একটা অনতিস্পষ্ট সুখস্মৃতি মাত্র, কখনও ছিল না, নাই-ও।

মাঝেরপাড়া স্টেশনে ট্রেন আসিল বেলা একটার সময়। খোকা লাফ দিয়া নামিল, কারণ প্লাটফর্ম খুব নিচু। অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে স্টেশনটার, প্লাটফর্মের মাঝখানে জাহাজের মাস্তুলের মত উঁচু যে সিগন্যালটা ছেলেবেলায় তাহাকে তাক লাগাইয়া দিয়াছিল সেটা আর এখন নাই। স্টেশনের বাহিরে পথের উপর একটা বড় জাম গাছ, অপুর মনে আছে এটা আগে ছিল না। ওই সেই বড় মাদার গাছটা, যেটার তলায় অনেককাল আগে তাহাদের এদেশ ছাড়িবার দিনটাতে মা খিচুড়ি রাঁধিয়াছিলেন। গাছের তলায় দুখানা মোটর-বাস যাত্রীর প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া, অপুরা থাকিতে থাকিতে দুখানা পুরনো ফোর্ড ট্যাক্সিও আসিয়া জুটিল। আজকাল নাকি নবাবগঞ্জ পর্য্যন্ত বাস ও ট্যাক্সি হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল—জিনিসটা অপুর কেমন যেন ভাল লাগিল না। কাজল নবীন যুগের মানুষ, সাগ্রহে বলিল—মোটর কার্টে ক'রে যাব বাবা? অপু ছেলেকে জিনিসপত্রসমেত ট্যাক্সিতে উঠাইয়া দিল, বটের ঝুরি দোলানো স্নিগ্ধ ছায়াভরা সেই প্রাচীন দিনের পথটা দিয়া সে নিজে মোটরে চড়িয়া যাইতে পারিবে না কখনই। এ দেশের সঙ্গে পেট্রোল গ্যাসের গন্ধ কি খাপ খায়?

চৈত্রমাসের শেষ। বাংলায় সত্যিকার বসন্ত এই সময়েই নামে। পথ চলিতে চলিতে পথের ধারের ফুলেভরা ঘেঁটুবনের সৌন্দর্যে সে মুগ্ধ হইয়া গেল। এই কম্পমান চৈত্রদুপুরের রৌদ্রের সঙ্গে, আকন্দ ফুলের গন্ধের সঙ্গে শৈশব যেন মিশানো আছে—পশ্চিম বাংলার পল্লীতে এ কমনীয় বসন্তের রূপ সে তো ভুলিয়াই গিয়াছিল।

এই সেই বেত্রবতী! এমন মধুর স্বপ্নভরা নামটি কোন্ নদীর আছে পৃথিবীতে? খেয়া পার হইয়া আবার সেই আষাঢ়ুর বাজার। ভিড়োল ডানলপ টায়ারের বিজ্ঞাপন-ওয়ালা পেট্রোলের দোকান নদীর উপরেই। বাজারেরও চেহারা অনেক বদল হইয়া গিয়াছে। তেইশ বছর আগে এত কোঠাবাড়ি ছিল না। আষাঢ়ু হইতে হাঁটিয়া যাওয়া সহজ, মাত্র দু মাইল, জিনিসপত্রের জন্যে একটা মুটে পাওয়া গেল, মোটরবাস ও ট্যাক্সির দরুণ ভাড়াটিয়া গরুর গাড়ি আজকাল নাকি এদেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। মুটে বলিল—ধঞ্চেপলাশগাছির ওই কাঁচা রাস্তাটা দিয়ে যাবেন তো বাবু? ধঞ্চেপলাশগাছি!···নামটাই তো কতকাল শোনে নাই, এতদিন মনেও ছিল না। উঃ, কতকাল পরে এই অতি সুন্দর নামটা সে আবার শুনিতেছে।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে এমন সময়ে পথটা সোনাডাঙ্গা মাঠের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল—পাশেই মধুখালির বিল—পদ্মবনে ভরিয়া আছে। এই সেই অপূর্ব সৌন্দর্যভূমি, সোনাডাঙ্গার স্বপ্নমাখানো মাঠটা—মনে হইল এত জায়গায় তো বেড়াইল, এমন অপরূপ মাঠ ও বন কই কোথাও তো দেখে নাই! সেই বনঝোপ, ঢিবি, বন, ফুলে ভর্তি বাবলা—বৈকালের এ কী অপূর্ব রূপ!

তারপরই দূর হইতে ঠাকুরঝি-পুকুরের সেই ঠ্যাঙাড়ে বটগাছটার উঁচু ঝাঁকড়া মাথাটা নজরে পড়িল—যেন দিক্‌সমুদ্রে ডুবিয়া আছে—ওর পরেই নিশ্চিন্দিপুর।—ক্রমে বটগাছটা পিছনে পড়িল—অপুর বুকের রক্ত চল্‌কাইয়া যেন মাথায় উঠিতে চাহিতেছে, সারা দেহ এক অপূর্ব অনুভূতিতে যেন অবশ হইয়া আসিতেছে। ক্রমে মাঠ শেষ হইল, ঘাটের পথের সেই আমবাগানগুলো—সে রুমাল কুড়াইবার ছলে পথের মাটি একটু তুলিয়া মাথায় ঠেকাইল। ছেলেকে বলিল—এই হ'ল তোমার ঠাকুরদাদার গাঁ, খোকা, ঠাকুরদাদার নামটা মনে আছে তো—বল তো বাবা, কি?

কাজল হাসিয়া বলিল—শ্রীহরিহর রায়, আহা, তা কি আর মনে আছে!

অপু বলিল, শ্রী নয় বাবা, ঈশ্বর বলতে হয়, শিখিয়ে দিলাম যে সেদিন?

রাণুদিদির সঙ্গে দেখা হইল পরদিন বৈকালে।

সাক্ষাতের পূর্ব-ইতিহাসটা কৌতুকপূর্ণ, কথাটা রানীর মুখেই শুনিল।

রানী অপু আসিবার কথা শুনে নাই, নদীর ঘাট হইতে বৈকালে ফিরিতেছে, বাঁশবনের পথে কাজল দাঁড়াইয়া আছে, সে একা গ্রামে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে।

রানী প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল—অনেককাল আগেকার একটি ছবি অস্পষ্ট মনে পড়িল—ছেলেবেলায় ওই ঘাটের ধারের জঙ্গলে-ভরা ভিটাটাতে হরিকাকারা বাস করিত, কোথায় যেন তাহারা উঠিয়া গিয়াছিল তারপরে। তাদের বাড়ির সেই অপু না? ছেলেবেলার সেই অপু? পরক্ষণেই সামলাইয়া লইয়া সে কাছে গিয়া ছেলেটির মুখের দিকে চাহিল—অপুও বটে, নাও বটে। যে বয়সে সে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল তার সে সময়ের চেহারাখানা রানীর মনে আঁকা আছে, কখনও ভুলিবে না—সেই বয়স, সেই চেহারা, অবিকল। রানী বলিল—তুমি কাদের বাড়ি এসেছ খোকা?

কাজল বলিল—গাঙ্গুলীদের বাড়ি—

রানী ভাবিল, গাঙ্গুলীরা বড়লোক, কলিকাতা হইতে কেহ কুটুম্ব আসিয়া থাকিবে, তাদেরই ছেলে। কিন্তু মানুষের মতও মানুষ হয়? বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করিয়া উঠিয়াছিল একেবারে। গাঙ্গুলীবাড়ির বড় মেয়ের নাম করিয়া বলিল—তুমি বুঝি কাদুপিসির নাতি?

কাজল লাজুক চোখে চাহিয়া বলিল—কাদুপিসি কে জানি না তো? আমার ঠাকুরদাদার এই গাঁয়ে বাড়ি ছিল—তাঁর নাম ঈশ্বর হরিহর রায়—আমার নাম শ্রীঅমিতাভ রায়।

বিস্ময়ে ও আনন্দে রানীর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না অনেকক্ষণ। সঙ্গে সঙ্গে একটা অজানা ভয়ও হইল। রুদ্ধনিশ্বাসে বলিল—তোমার বাবা···খোকা?···

কাজল বলিল—বাবার সঙ্গেই তো কাল এলাম! গাঙ্গুলীবাড়িতে এসে উঠলাম রাত্রে। বাবা ওদের বাইরের ঘরে বসে গল্প করচে, মেলা লোক দেখা করতে এসেচে কিনা তাই।···

রানী দুই হাতের তালুর মধ্যে কাজলের সুন্দর মুখখানা লইয়া আদরের সুরে বলিল—খোকন, খোকন, ঠিক বাবার মত দেখতে—চোখ দুটি অবিকল! তোমার বাবাকে এ পাড়ায় ডেকে নিয়ে এস খোকন। বলগে রাণুপিসি ডাকচে।

সন্ধ্যার আগেই ছেলের হাত ধরিয়া অপু রানীদের বাড়ি ঢুকিয়া বলিল—কোথায় গেলে রাণুদি, চিনতে পার?

রাণু ঘরের ভিতর হইতে ছুটিয়া আসিল, অবাক্ হইয়া খানিকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, বলিল—মনে করে যে এলি এতকাল পরে?—তা ও-পাড়ায় গিয়ে উঠলি কেন? গাঙ্গুলীরা আপনার লোক হ'ল তোর?···পরে লীলাদির মত সেও কাঁদিয়া ফেলিল।

কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! অপুও অবাক্ হইয়া দেখিতেছিল, চৌদ্দ বছরের সে বালিকা রাণুদি কোথায়! বিধবার বেশ, বাল্যের সে লাবণ্যের কোনও চিহ্ন না থাকিলেও রানী এখনও সুন্দরী, কিন্তু এ যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত, শৈশবসঙ্গিনী রাণুদির সঙ্গে ইহার মিল কোথায়? এই সেই রাণুদি!···

সে কিন্তু সকলের অপেক্ষা আশ্চর্য্য হইল ইহাদের বাড়িটার পরিবর্ত্তন দেখিয়া। ভুবন মুখুয্যেরা ছিলেন অবস্থাপন্ন গৃহস্থ, ছেলেবেলার সে আট-দশটা গোলা, প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপ, গরুবাছুর, লোকজনের কিছুই নাই। চণ্ডীমণ্ডপের ভিটা মাত্র পড়িয়া আছে, পশ্চিমের কোঠা ভাঙিয়া কাহারা ইট লইয়া গিয়াছে। বাড়িটার ভাঙা, ধসা, ছন্নছাড়া চেহারা, এ কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন!

রানী সজলচোখে বলিল—দেখছিস্ কি, কিছু নেই আর। মা বাবা মারা গেলেন, টুনু, খুড়ীমা এঁরাও গেলেন, সতুর মা-ও মারা গেল, সতু মানুষ হ'ল না তো, এতদিন বিষয় বেচে বেচে চালাচ্ছে। আমারও—

অপু বলিল—হ্যাঁ, লীলাদির কাছে সব শুনলাম সেদিন কাশীতে—

—কাশীতে! দিদির সঙ্গে দেখা হয়েছে তোর? কবে—কবে?···

পরে অপুর মুখে সব শুনিয়া সে ভারী খুশী হইল। দিদি আসিতেছে তাহা হইলে? কতকাল দেখা হয় নাই।

রানী বলিল—বৌ কোথায়? বাসায়—তোর কাছে?

অপু হাসিয়া বলিল—স্বর্গে!

—ও আমার কপাল। কত দিন? বিয়ে করিস নি আর?···

সেই দিনই আবার বৈকালে চড়ক। আর তেমন জাঁকজমক হয় না, চড়ক গাছ পুঁতিয়া কেহ ঘুরপাক খায় না। সে বাল্যমন কোথায়, মেলা দেখার অধীর আনন্দে ছুটিয়া যাওয়া—সে মনটা আর নাই, কেবল সে-সব অর্থহীন আশা, উৎসাহ, অপূর্ব্ব অনুভূতির স্মৃতিটা মাত্র আছে। এখন যেন সে দর্শক আর বিচারক মাত্র, চব্বিশ বৎসরে মনটা কেমন বদলাইয়া গিয়াছে,

বাড়িয়াছে—তাহারই একটা মাপ-কাটি আজ খুঁজিয়া পাইয়া দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। চড়কতলায় পুরানো আমলের কত পরিচিত বন্ধু নাই, নিবারণ গোয়ালা লাঠি খেলিত, ক্ষেত্র কাপালী বহুরূপীর সাজ দিত, হারাণ মাল বাঁশের বাঁশি বাজাইয়া বিক্রয় করিত, ইহারা কেহ আর নাই, কেবল পুরাতনের সঙ্গে একটা যোগ এখনও আছে। চিনিবাস বৈরাগী এখনও তেলে-ভাজা খাবারের দোকান করে।

আজ চল্লিশ বছর আগে এই চড়কের মেলার পরদিনই তারা গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল—তারপর কত ঘটনা, কত দুঃখ বিপদ, কত নতুন বন্ধুবান্ধব সব, গোটা জীবনটাই—কিন্তু কেমন করিয়া এই পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়াও সেই দিনটির অনুভূতিগুলির স্মৃতি এত সজীব, টাটকা, তাজা অবস্থায় আজ আবার ফিরিয়া আসিল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। চড়কের মেলা দেখিয়া হাসিমুখে ছেলেমেয়েরা ফিরিয়া যাইতেছে, কারও হাতে বাঁশের বাঁশি, কারও হাতে মাটির রং করা ছোবা পালকি। একদল গেল গাঙ্গুলী-পাড়ার দিকে, একদল সোনাডাঙ্গা মাঠের মাটির পথ বাহিয়া, ছাতিমবনের তলায় ধুলজুড়ি মাধবপুরের খেয়াঘাটে—চব্বিশ বছর আগে যাহারা ছিল ছোট, এই রকম মেলা দেখিয়া ভেঁপু বাজাইতে বাজাইতে তেলেভাজা, জিবেগজা হাতে ফিরিয়া গিয়াছিল, তাহারা অনেকদিন বড় হইয়া নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রে ঢুকিয়া পড়িয়াছে—কেউ বা মারা গিয়াছে, আজ তাদের ছেলে-মেয়েদের দল ঠিক আবার তাহাই করিতেছে, মনে মনে আজিকার এই নিষ্পাপ, দায়িত্বহীন জীবনকোরকগুলিকে সে আশীর্ব্বাদ করিল।

বৈশাখের প্রথমেই লীলা তার দেওরের সঙ্গে নিশ্চিন্দিপুরে আসিল। দুই বোনে অনেকদিন পরে দেখা, দুই জনে গলা জড়াইয়া কাঁদিতে বসিল। অপুকে লীলা বলিল—তোর মনে যে এত ছিল, তা তখন কি জানি? তোর কল্যাণেই বাপের ভিটে আবার দেখলুম, কখনও আশা ছিল না যে আবার দেখব। খোকার জন্য কাশী হইতে একরাশ খেলনা ও খাবার আনিয়াছে, মহা খুশীর সহিত পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া সকলের সঙ্গে দেখাশুনা করিল।

অপু বৈকালে ছেলেকে লইয়া নৌকায় খাবরাপোতার ঘাট পর্য্যন্ত বেড়াইতে গেল। তেঁতুলতলার ঘাটের পাশে দক্ষিণদেশের ঝিনুকতোলা বড় নৌকা বাঁধা ছিল, হাওয়ায় আলকাতরা ও গাবের রস মাখানো বড় ডিঙিগুলার শৈশবের সেই অতি পুরাতন বিস্মৃত গন্ধ …নদীর উত্তর পাড়ে ক্রমাগত নলবন, ওকড়ো ও বন্যেবুড়োর গাছ, ঢালু ঘাসের জমি জলের কিনারা ছুঁইয়া আছে, মাঝে মাঝে ঝিঙে পটলের ক্ষেতে উত্তুরে মজুরেরা টোকা মাথায় নিড়ান দেয়, এক এক স্থানে নদীর জল ঘন কালো, নিথর, কলার পাটির মত সমতল—যেন মনে হয়, নদী এখানে গহন, গভীর, অতলস্পর্শ,—ফুলে ভরা উলুখড়ের মাঠ, আকন্দবন, ডাঁশা খেজুরের কাঁদি দুলানো খেজুর গাছ, উইঢিবি, বকের দল, উঁচু শিমুল ডালে চিলের বাসা—সবাইপুরের মাঠের দিক হইতে বড় এক ঝাঁক শামকুট পাখি মধুখালি বিলের দিকে গেল—একটি বাবলাগাছে অজস্র বনধুঁধুল ফল দুলিতে দেখিয়া খোকা আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ওই দেখ বাবা, ওই যে কলকাতায় আমাদের গলির মোড়ে বিক্রী হয় গায়ে সাবান মাখবার জন্যে, কত ঝুলচে দেখ, ও কি ফল বাবা?

অপু কিন্তু নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া ছিল। কতকাল সে এ সব দেখে নাই!…পৃথিবীর এই মুক্ত রূপ তাহাকে যে আনন্দ দেয়, সে আনন্দ উগ্রবীর্য্য সুরার মত নেশার ঘোর আনে তাহার শিরায় রক্তে, তাহা অভিভূত করিয়া ফেলে, আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তাহা অবর্ণনীয়। ইহাদের যে গোপন বাণী শুধু তাহারই মনের কানে কানে, মুখে তাহা বলিয়া বুঝাইবে সে কাহাকে?

দূরে গ্রামের জাওয়া-বাঁশের বন অস্ত-আকাশের রাঙা পটে অতিকায় লায়ার পাখির পুচ্ছের মত খাড়া হইয়া আছে, একধারে খুব উঁচু পাড়ে সারিবাঁধা গাঙ্‌শালিকের গর্ত্ত, কি অপূর্ব্ব শ্যামলতা, কি সান্ধ্য-শ্রী !

কাজল বলিল—বেশ দেশ বাবা—না ?

—তুই এখানে থাক খোকা—আমি যদি রেখে যাই এখানে, থাকতে পারবি নে ? তোর পিসিমার কাছে থাকবি, কেমন তো ?

কাজল বলিল—হ্যাঁ, ফেলে রেখে যাবে বৈ কি ? আমি তোমার সঙ্গে যাব বাবা।

অপু ভাবিতেছিল শৈশবে এই ইছামতী ছিল তার কাছে কি অপূর্ব্ব কল্পনায় ভরা ! গ্রামের মধ্যের বর্ষাদিনের জলকাদা-ভরা পথঘাট, বাঁশপাতা-পচা আঁটাল মাটির গন্ধ থেকে নিস্কৃতি পাইয়া সে মুক্ত আকাশের তলে নদীর ধারটিতে আসিয়া বসিত। কত বড় নৌকা ওর ওপর দিয়া দূরে দূর দেশে চলিয়া যাইত। কোথায় ঝালকাটি, কোথায় বরিশাল, কোথায় রায়মঙ্গল—অজানা দেশের অজানা কল্পনায় মুগ্ধ মনে কতদিন সে না ভাবিয়াছে, সেও একদিন ওই রকম নেপাল মাঝির বড় ডিঙিটা করিয়া নিরুদ্দেশ বাণিজ্যযাত্রায় বাহির হইয়া যাইবে।

ইছামতী ছিল পাড়াগাঁয়ের গরীব ঘরের মা। তার তীরের আকাশ-বাতাসের সঙ্গীত মায়ের মুখের ঘুম-পাড়ানি গানের মত শত স্নেহে তার নবমুকুলিত কচি মনকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছিল, তার তীরে সে সময়ের কত আকাঙ্ক্ষা, বৈচিত্র্য, রোমান্স,—তার তীর ছিল দূরের অদেখা বিদেশ, বর্ষার দিনে এক ইছামতীর কূলে-কূলে ভরা ঢলঢল গৈরিক রূপে সে অজানা মহাসমুদ্রের তীরহীন অসীমতার স্বপ্ন দেখিত—ইংরাজি বই-এ পড়া Cape Nun-এর ওদিকের দেশটা···যে দেশ হইতে লোক আর ফেরে না—He who passes Cape Nun, will either return or not—মুগ্ধচোখে কূলছাপানো ইছামতী দেখিয়া তখন সে ভাবিত—ওঃ, কত বড় আমাদের এই গাঙটা ! ··

এখন সে আর বালক নাই, কত বড় বড় নদীর দুকূল-ছাপানো লীলা দেখিয়াছে—গঙ্গা, শোণ, বড়দল, নর্ম্মদা—তাদের অপূর্ব্ব সন্ধ্যা, অপূর্ব্ব বর্ণসম্ভার দেখিয়াছে—সে বৈচিত্র্য, সে প্রখরতা ইছামতীর নাই, এখন তার চোখে ইছামতী ছোট নদী। এখন সে বুঝিয়াছে তার গরীব ঘরের মা উৎসব-দিনের যে বেশভূষায় তার শৈশব-কল্পনাকে মুগ্ধ করিয়া দিত, এসব বনেদী বড় ঘরের মেয়েদের হীরামুক্তার ঘটা, বারানসী শাড়ির রংচং-এর কাছে তার মায়ের সেই কাচের চুড়ি, শাঁখা কিছুই নয়।

কিন্তু তা বলিয়া ইছামতীকে সে কি কখনো ভুলিবে ?

দুপুরে সে ঘরে থাকিতে পারে না। এই চৈত্রদুপুরের রোদের উষ্ণ নিঃশ্বাস কত পরিচিত গন্ধ বহিয়া আনে—শুকনো বাঁশের খোলার, ফুটন্ত ঘেঁটুবনের, ঝরা পাতার, সোঁদা সোঁদা রোদপোড়া মাটির, নিম ফুলের, আরও কত কি কত কি,—বাল্যে এই সব দুপুর তাকে ও তাহার দিদিকে পাগল করিয়া দিয়া টো টো করিয়া শুধু মাঠে, বাগানে, বাঁশতলায়, নদীর ধারে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইত—আজও সেই রকমই পাগল করিয়া দিল। গ্রামসুদ্ধ সবাই দুপুরে ঘুমায়—সে একা একা বাহির হয়—উদ্‌ভ্রান্তের মত মাঠের ঘেঁটুফুলেভরা উঁচু ডাঙায়, পথে পথে নিঝুম দুপুরে বেড়াইয়া ফেরে—কিন্তু তবু মনে হয়, বাল্যের স্মৃতিতে যতটা আনন্দ পাইতেছে, বর্ত্তমানের আসল আনন্দ সে ধরণের নয়—আনন্দ আছে, কিন্তু তাহার প্রকৃতি বদলাইয়া গিয়াছে। তখনকার দিনে দেবদেবীরা নিশ্চিন্দিপুরে বাঁশবনের ছায়ায় এই সব দুপুরে নামিয়া আসিতেন। এক একদিন সে নদীর ধারের সুগন্ধ তৃণ-ভূমিতে চুপ

করিয়া হাতে মাথা রাখিয়া শুইয়া থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কিছুই করে না, রৌদ্রভরা নীল আকাশটার দিকে চাহিয়া শুধু চুপ করিয়া থাকে—কিছু ভাবেও না···সবুজ ঘাসের মধ্যে মুখ ডুবাইয়া মনে মনে বলে—ওগো মাতৃভূমি, তুমি ছেলেবেলায় যে অমৃতদানে মানুষ করেছিলে, সেই অমৃত হ'ল আমার জীবন-পথের পাথেয়—তোমার বনের ছায়ায় আমার সকল স্বপ্ন জন্ম নিয়েছিল একদিন, তুমি আবার শক্তি দাও, হে শক্তিরূপিনী!

দুঃখ হয় কলিকাতার ছাত্রটির জন্য। এদের বাপের বাড়ি বৌবাজারে, মামার বাড়ি পটুয়াটোলায়, পিসির বাড়ি বাগবাজারে—বাংলাদেশকে দেখিল না কখনও। এরা কি মাধবপুর গ্রামের উলুখড়ের মাঠের ও-পারের আকাশে রং-ধরা দেখিল? শুভ্র শরৎ-দুপুরের ঘন বনানীর মধ্যে ঘুঘুর ডাক শুনিয়াছে? বন-অপরাজিতা ফুলের নীরব মহোৎসব এদের শিশু-আত্মায় তার আনন্দের স্পর্শ দিয়াছে কোনও কালে? ছোট মাটির ঘরের দাওয়ায় আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া নারিকেল-পত্রশাখায় জ্যোৎস্নার কাঁপন দেখে নাই কখনও—এরা অতি হতভাগ্য।

রানীর যত্নে আদরে সে মুগ্ধ হইয়া গেল। সতুদের বাড়ির সে-ই আজকাল কর্ত্রী, নিজের ছেলেমেয়ে হয় নাই, ভাইপোদের মানুষ করে। অপুকে রানী বাড়িতে আনিয়া রাখিল—কাজলকে দু'দিনে এমন আপন করিয়া লইয়া ফেলিয়াছে যে, সে পিসিমা বলিতে অজ্ঞান। রানীর মনে মনে ধারণা, অপু শহরে থাকে যখন, তখন খুব চায়ের ভক্ত,—দু'টি বেলা ঠিক সময়ে চা দিবার জন্য তাহার প্রাণপণ চেষ্টা। চায়ের কোন সরঞ্জাম ছিল না, লুকাইয়া নিজের পয়সায় সতুকে দিয়া নবাবগঞ্জের বাজার হইতে চায়ের ডিস্ পেয়ালা আনাইয়া লইয়াছে—অপু চা তেমন খায় না কখনও, কিন্তু এখানে সে সেকথা বলে না। ভাবে—যত্ন করচে রাণুদি, করুক না। এমন যত্ন আর জুটবে কোথাও? তুমিও যেমন!

দুপুরে একদিন খাইতে বসিয়া অপু চুপ করিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া আছে। রানীর দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—একটা বড় চমৎকার ব্যাপার হ'ল—দেখো, এই টকে-যাওয়া এঁচড়-চচ্চড়ি কতকাল খাই নি—নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে আর কখনও নয়—তাই মুখে দিয়েই ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল রাণুদি—

রাণুদি বোঝে এসব কথা—তাই রাণুদির কাছে বলিয়াও সুখ।

এ কয়দিন আকাশটা ছিল মেঘ-মেঘ। কিন্তু হঠাৎ কখন মেঘ কাটিয়া গিয়াছে সে জানে না—বৈকালে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া সে অবাক চোখে চুপ করিয়া বাহিরের রোয়াকে বসিয়া রহিল—বাল্যের সেই অপূর্ব বৈকাল—যাহার জন্য প্রথম প্রথম বিরহী বালক-মন কত হাঁপাইয়াছে বিদেশে, ক্রমে একটা অস্পষ্ট মধুর স্মৃতিমাত্র মনে আঁকিয়া রাখিয়া সেটা কবে মন হইতে বেমালুম অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল—

মনে পড়ে ছেলেবেলায় এই সব সময়ে ঘুম ভাঙিয়া তাহার মনটা কেমন অকারণে খারাপ হইত—এক একদিন কেমন কান্না আসিত, বিছানায় বসিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিত—তাহার মা ঘাট হইতে আসিয়া বলিত—ও-ওই উড়ে গেল—ও-ও-ওই!···কেঁদো না খোকা, বাইরে এসে পাখি দেখসে। আহা হা, তোমার বড় দুখ্খু খোকন—তোমার নাতি মরেছে, পুতি মরেছে, সাত ডিঙে ধন সমুদ্দুরে ডুবে গিয়েছে, তোমার বড় দুখ্খু—কেঁদো না কেঁদো না, আহা হা!···

রানী পাতকুয়া হইতে জল তুলিয়া লইয়া যাইতেছে, অপু বলিল—মনে পড়ে রাণুদি, এই উঠোনে এমন সব বিকেলে বৌ-চুরি খেলা খেলতুম কত, তুমি, আমি, দিদি, সতু, নেড়া—?

রাণু বলিল—আহা, তাই বুঝি ভাবচিস্ বসে বসে! কত মালা গাঁথতুম মনে আছে

বকুলতলায় ? সারাদিন বকুলতলাতেই পড়ে আছি আমি, দুগ্‌গো—আজকাল ছেলেমেয়েরা আর মালা গাঁথে না, বকুল ফুলও আর তেমন পড়ে থাকে না—কালে কালে সবই যাচ্ছে।

কিছু পরে জল লইয়া ফিরিবার সময়ে বলিল—এক কাজ কর না কেন অপু, সতু তো তোদের নীলমণি জ্যাঠার দরুণ জমাটা ছেড়ে দেবে, তুই কেন গিয়ে বাগানটা নিগে যা না ? তোদেরই তো ছিল—ও যা, নিজের জমি-জমাই বিক্রী ক'রে ফেললে সব, তা আবার জমার বাগান রাখবে—নিবি তুই ?

অপু বলিল,—মায়ের বড় ইচ্ছে ছিল, রাণুদি। মরবার কিছুদিন আগেও বলত, বড় হ'লে বাগানখানা নিস অপু। আমার আপত্তি নেই, যা দাম হবে আমি দেব।

প্রতি সন্ধ্যায় সতুদের রোয়াকে মাদুর পাতা হয়, রানী, লীলা, অপু, ছেলেপিলেদের মজলিস বসে। সতুও যোগ দেয়, তবে তামাকের দোকান বন্ধ করিয়া আসিতে তাহার রাত হইয়া যায়। অপু বলে—আচ্ছা আজকাল তোমরা ঘাটের পথে ষাঁড়াতলায় পিঠে দাও না রাণুদি ? কই সেই ষাঁড়াগাছটা তো নেই সেখানে ?

রানী বলে—সেটা মরে গিয়েছে—তার পাশেই একটা চারা, দেখিস নি সিঁদুর দেওয়া আছে ?···

নানা পুরানো কথা হয়। অপু জিজ্ঞাসা করে—ছেলেবেলায় একবার পঙ্গপালের দল এসেছিল, মনে আছে লীলাদি ?···গ্রামের একটি বিধবা যখন নববধূরূপে এ গ্রামে প্রথম আসেন, অপু তখন ছেলেমানুষ। তিনিও সন্ধ্যার পরে এ বাড়িতে আসেন। অপু বলে—খুড়ীমা, আপনি নতুন এসে কোথায় দুধে-আলতার পাথরে দাঁড়িয়েছিলেন মনে আছে আপনার ?

বিধবাটি বললেন—সে সব কি আর এ জন্মের কথা, বাবা ? সে সব কি আর মনে আছে ?

অপু বলে—আমি বলি শুনুন, আপনাদের দক্ষিণের উঠোনে যে নিচু গোয়ালঘরটা ছিল, তারই ঠিক সামনে।

বিধবা মেয়েটি আশ্চর্য্য হইয়া বলেন—ঠিক ঠিক, এখন মনে পড়েছে, এত দিনের কথা তোমার মনে আছে বাবা !

তাঁদেরই বাড়ির আর এক বিবাহে কোথা হইতে তাঁদের এক কুটুম্বিনী আসেন, খুব সুন্দরী—এতকাল পরে তাঁর কথা উঠে। সবাই তাঁকে দেখিয়াছিল সে সময়, কিন্তু নামটা কাহারও মনে নাই এখন। অপু বলে—দাঁড়াও রাণুদি, নাম বলছি—তার নাম সুবাসিনী।

সবাই আশ্চর্য্য হইয়া যায়। লীলা বলে—তোর তখন বয়স আট কি নয়, তোর মনে আছে তার নাম ?—ঠিক, সুবাসিনীই বটে। সবারই মনে পড়ে নামটা।

অপু মৃদু মৃদু হাসিমুখে বলে—আরও বলছি শোনো, ডুরে শাড়ি পরত, রাঙা জমির ওপর ডুরে দেওয়া—না ?

বিধবা বধূটি বলেন,—ধন্যি বাপু যা হোক, রাঙা ডুরে পরত ঠিকই, বয়েস ছিল বাইশ-তেইশ। তখন তোমার বয়েস বছর আষ্টেক হবে। ছাব্বিশ-সাতাশ বছর আগেকার কথা যে !

অপুর খুব মনে আছে, অত সুন্দরী মেয়ে তাদের গাঁয়ে আসে নাই ছেলেবেলায়। সে বলিল—রাঙা শাড়ি পরে আমাদের উঠোনের কাঁঠালতলায় জল সইতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, ছবিটা দেখতে পাচ্ছি এখনও।

এখানকার বৈকালগুলি সত্যই অপূর্ব্ব। এত জায়গায় তো সে বেড়াইল, মাসখানেক এখানে থাকিয়া মনে হইল এমন বৈকাল সে কোথাও দেখে নাই। বিশেষ করিয়া বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের মেঘহীন এই বৈকালগুলিতে সূর্য্য যেদিন অস্ত যাইবার পথে মেঘাবৃত না হয়, শেষ রাঙা আলোটুকু পর্য্যন্ত বড় গাছের মগডালে, বাঁশঝাড়ের আগায় হাল্‌কা সিঁদুরের রং

মাখাইয়া দেয়, সেদিনের বৈকাল। এমন বিল্বফুলের অপূর্ব্ব সুরভি-মাখানো, এমন পাখি-ডাকা উদাস বৈকাল—কোথায় এর তুলনা? এত বেলগাছও কি এ দেশটায়, ঘাটে, পথে, এ-পাড়া, ও-পাড়া সর্ব্বত্র বিল্বফুলের সুগন্ধ।

একদিন—জ্যৈষ্ঠের প্রথমটা, বৈকালে আকাশ অন্ধকার করিয়া ঈশান কোণ হইতে কাল-বৈশাখীর মেঘ উঠিল, তার পরেই খুব ঝড়, এ বছরের প্রথম কালবৈশাখী। অপু আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিল—তাদের পোড়োভিটার বাঁশবনের মাথার উপরকার দৃশ্যটা কি সুপরিচিত! বাল্যে এই মাথাদুলানো বাঁশঝাড়ের উপরকারের নীলকৃষ্ণ মেঘসজ্জা মনে কেমন সব অনতিস্পষ্ট আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগাইত, কত কথা যেন বলিতে চাহিত, আজও সেই মেঘ, সেই বাঁশবন, সেই বৈকাল সবই আছে, কিন্তু সে অপূর্ব্ব জগৎটা আর নাই। এখন যা আনন্দ সে শুধু স্মৃতির আনন্দ মাত্র। এবার নিশ্চিন্দিপুর ফিরিয়া অবধি সে ইহা লক্ষ্য করিতেছে—এই বন, এই দুপুর, এই গভীর রাত্রে চৌকিদারের হাঁকুনি, কি লক্ষ্মীপেঁচার ডাকের সঙ্গে এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন মাখানো ছিল, দিগন্তরেখার ওপারের এক রহস্যময় কল্পলোক তখন সদা-সর্ব্বদা হাতছানি দিয়া আহ্বান করিত—তাদের সন্ধান আর মেলে না।

সে পাখির দল মরিয়া গিয়াছে, তেমন দুপুর আর হয় না; যে চাঁদ এমন বৈশাখীরাত্রে খড়ের ঘরের দাওয়ার ধারের নারিকেল-পত্রশাখায় জ্যোৎস্নার কম্পন আনিয়া এক ক্ষুদ্র কল্পনা-প্রবণ গ্রাম্য বালকের মনে মূল্যহীন, কারণহীন আনন্দের বান ডাকাইত, সে সব চাঁদ নিভিয়া গিয়াছে। সে বালকটিই বা কোথায়? পঁচিশ বৎসর আগেকার এক দুপুরে বাপমায়ের সঙ্গে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল, আর ফেরে নাই, জাওয়া-বাঁশের বনের পথে তার ছোট ছোট পায়ের দাগ অস্পষ্ট হইয়া মুছিয়া গিয়াছে বহুদিন।

তার ও তার দিদির সে সব আশা পূর্ণ হইয়াছিল কি?

হায় অবোধ বালক-বালিকা!

রোজ রোজ বৈকালে মেঘ হয়, ঝড় ওঠে। অপু বলে—রাণুদি, আম কুড়িয়ে আনি? রানী হাসে। অপু ছেলেকে লইয়া নতুন-কেনা বাগানে আসিয়া দাঁড়ায়—সবাইকে আম কুড়াইতে ডাকে, কাহাকেও বাধা দেয় না। বাল্যের সেই পটুলে, তেঁতুলতলী, নেকো, বাঁশতলা,—ঘন মেঘের ছায়ায় জেলেপাড়ার তো আবালবৃদ্ধবনিতা ধামা হাতে আম কুড়াইতে আসে। অপু ভাবে, আহা, জীবনে এই এদের কত আনন্দের কত সার্থকতার জিনিস। চারিধারে চাহিয়া দেখে, সমস্ত বাগানের তলাটা ধাবমান, কৌতুকপর, চীৎকাররত বালক-বালিকাতে ভরিয়া গিয়াছে!

দিদি দুর্গা, ছোট্ট মেয়েটি, এই কাজলের চেয়ে কিছু বড়, পরের বাগানে আম কুড়াইবার অপরাধে বকুনি-খাওয়া কৃত্রিম উল্লাসভরা হাসিমুখে একদিন ওই ফণিমনসার ঝোপের পাশের বেড়াটা গলিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল—বহুকালের কথাটা।

অপু কি করিবে আমবাগানে? এই সব গরীব ঘরের ছেলেমেয়েরা সাধ মিটাইয়া আম কুড়াইবে এ বাগানে, কেহ তাহাদের বারণ করিবার থাকিবে না, বকিবার থাকিবে না, অপমান করিবার থাকিবে না, ফণিমনসার ঝোপের আড়ালে অপমানিতা ছোট্ট খুকীটি ধুলোমাখা আঁচল গুছাইয়া লইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু তৃপ্তির হাসি হাসিবে···

এত দিন সে এখানে আসিলেও নিজেদের ভিটাটাতে ঢুকিতে পারে নাই, যদিও বাহির হইতে সেটা প্রতিদিনই দেখিত; কারণ ঘাটের পথটা তার পাশ দিয়াই। বৈকালের দিকে সে একদিন একা চুপি চুপি বনজঙ্গল ঠেলিয়া সেখানে ঢুকিল। বাড়িটা আর নাই, পড়িয়া ইট স্তূপাকার হইয়া আছে—লতাপাতা, শ্যাওড়াবন, বনচালতার গাছ, ছেলেবেলাকার মত কালমেঘের জঙ্গল। পিছনের বাঁশঝাড়গুলো এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বাড়িয়া চারিধারে

ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

কোনও ঘরের চিহ্ন নাই, বন জঙ্গল, রাঙা রোদ বাঁশের মগডালে। পশ্চিমের পাঁচিলের গায়ে সেই কুলুঙ্গিটা আজও আছে, ছেলেবেলায় যে কুলুঙ্গিটাতে সে ভাঁটা, বাতাবীলেবুর বল, কড়ি রাখিত। এত নিচু কুলুঙ্গিটা তখন কত উঁচু বলিয়া মনে হইত, তাহার মাথা ছাড়াইয়া উঁচু ছিল, ডিঙ্গাইয়া দাঁড়াইলে তবে নাগাল পাওয়া যাইত! ঠেসদেওয়ালের গায়ে ছুরি দিয়া ছেলেবেলায় একটা ভূত আঁকিয়াছিল, সেটা এখনও আছে। পাশেই নীলমণি জ্যাঠামশায়ের পোড়োভিটা—সেও ঘন বনে ভরা, চারিধার নিঃশব্দ, নির্জন—এ পাড়াটাই জনহীন হইয়া গিয়াছে, এধার দিয়া লোকজনের যাতায়াত বড় কম। এই সে স্থানটি, কতকাল আগে যেখানে দিদি ও সে একদিন চড়ুইভাতি করিয়াছিল! কণ্টকাকীর্ণ শেঁয়াকুল বনে দুর্গম দুর্ভেদ্য হইয়া পড়িয়াছে সারা জায়গাটা! পোড়ো ভিটার সে বেলগাছটা—একদিন যার তলায় ভীষ্মদেব শরশয্যা পাতিতেন তাহার নয় বৎসরের শৈশবে—সেটা এখনও আছে, পুষ্পিত শাখা-প্রশাখার অপূর্ব সুবাসে অপরাহ্নের বাতাস স্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

পাঁচিলের ঘুলঘুলিটা কত নিচু বলিয়া মনে হইতেছে, এইটাতেই অপু আশ্চর্য হইল—বার বার কথাটা তার মনে হইতেছিল। কত ছোট ছিল সে তখন! খোকার মত অতটুকু বোধ হয়।

কাঁচাকলায়ের ডালের মত সেই কি লতার গন্ধ বাহির হইতেছে! কতদিন গন্ধটা মনে ছিল না, বিদেশে আর সব কথা হয়ত মনে পড়িতে পারে, কিন্তু পুরাতন দিনের গন্ধগুলি তো মনে পড়ে না!

এ অভিজ্ঞতাটা অপুর এতদিন ছিল না। সেদিন বাঁওড়ের ধারে বেড়াইতে গিয়া পাকা বটফলের গন্ধে অনেকদিনের একটা স্মৃতি মনে উদয় হইয়াছিল—ছোট্ট কাচের পরকলা বসানো মোমবাতির সেকেলে লণ্ঠন হাতে তাহার বাবা শশী যোগীর দোকানে আলকাতরা কিনিতে আসিয়াছে—সেও আসিয়াছে বাবার কাঁধে চড়িয়া বাবার সঙ্গে—কাচের লণ্ঠনের ক্ষীণ আলো, আধ-অন্ধকার বাঁশবন, বাঁওড় হইতে নাল ফুল তুলিয়া বাবা তাহার হাতে দিয়াছে—কোন্ শৈশবের অস্পষ্ট ছবিটা, অবাস্তব, ধোঁয়া-ধোঁয়া! পাকা বটফলের গন্ধে কতকাল পরে তাহার সেই অত্যন্ত শৈশবের একটা সন্ধ্যা আবার ফিরিয়ে আসিয়াছিল সেদিন।

পোড়োভিটার সীমানায় প্রকাণ্ড একটা খেজুর গাছে কাঁদি কাঁদি ডাঁশা খেজুর ঝুলিতেছে—এটা সেই চারা খেজুর গাছটা, দিদি যার ডাল কাটারি দিয়া কাটিয়া গোড়ার দিকে দড়ি বাঁধিয়া খেলাঘরের গরু করিত—কত বড় ও উঁচু হইয়া গিয়াছে গাছটা!

এইখানে খিড়কীদোরটা ছিল; চিহ্নও নাই কোনও। এইখানে দাঁড়াইয়া দিদির চুরি-করা সেই সোনার কৌটাটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল একদিন। কত সুপরিচিত জিনিস এই দীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে আজও আছে! রাঙী গাইয়ের বিচালি খাওয়ার মাটির নাদাটা কাঁঠালতলায় বাঁশপাতা ও মাটি বোঝাই হইয়া এখনও পড়িয়া আছে। ছেলেবেলায় ঠেসদেওয়াল গাঁথার জন্য বাবা মজুর দিয়া এক জায়গায় ইট জড় করিয়া রাখিয়াছিলেন···অর্থাভাবে গাঁথা হয় নাই। ইটগুলো এখনও বাঁশবনের ছায়ায় তেমনি পড়িয়া আছে। কতকাল আগে মা তাকের উপর জলদানে-পাওয়া মেটে কলসী তুলিয়া রাখিয়াছিল, সংসারের প্রয়োজনের জন্য—পড়িয়া মাটিতে অর্ধপ্রোথিত হইয়া আছে। সকালের অপেক্ষা সে যেন অবাক হইয়া গেল পাঁচিলের সেই ঘুলঘুলিটা আজও নতুন, অবিকৃত অবস্থায় দেখিয়া—বালিচুন একটুও খসে নাই, যেন কালকের তৈরী—এই জঙ্গল ও ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কি হইবে ও কুলুঙ্গিতে?

খিড়কীদোরের পাশে উঁচু জমিটাতে মায়ের হাতে পোঁতা সজনে গাছ এখনও আছে। যাইবার বছরখানেক আগে মাত্র মা ডালটা পুঁতিয়াছিল—এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে গাছটা

বাড়িয়া বুড়ো হইয়া গিয়াছে—ফল খাইতে আর কেহ আসে নাই—জঙ্গলে ঢাকিয়া পড়িয়া আছে এতকাল—অপরাহ্ণের রাঙা রোদ গাছটার গায়ে পড়িয়া কি উদাস, বিষাদমাখা দৃশ্যেটা ফুটাইয়াছে যে! ছায়া ঘন হইয়া আছে, কাঁচাকলায়ের ডালের মত সেই লতাটার গন্ধ আরও ঘন হয়—অপুর শরীর যেন শিহরিয়া ওঠে—এ গন্ধ তো শুধু গন্ধ নয়—এই অপরাহ্ণে, এই গন্ধের সঙ্গে জড়ানো আছে মায়ের কত রাত্রের আদরের ডাক, দিদির কত কথা, বাবার পদাবলী গানের সুর, বাল্যের ঘরকন্নার সুধাময় দারিদ্র্য—কত কি—কত কি—

ঘন বনে ঘুঘু ডাকে, ঘুঘু—ঘু—

সে অবাক্ চোখে রাঙ্গারোদ-মাখানো সজনে গাছটার দিকে আবার চায়···

মনে হয় এ বন, এ স্তূপাকার ইটের রাশি, এ সব স্বপ্ন—এখনি মা ঘাট হইতে সন্ধ্যায় গা ধুইয়া ফিরিয়া ফরসা কাপড় পরিয়া ভিজা কাপড়খানা উঠানের বাঁশের আলনায় মেলিয়া দিবে, তারপর প্রদীপ হাতে সন্ধ্যা দিতে দিতে তাহাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া বিস্মিত অনুযোগের সুরে বলিয়া উঠিবে—এত সন্ধ্যে ক'রে বাড়ি ফিরলি অপু ?

ভিটার চারিদিকে খোলামকুচি, ভাঙা কলসী, কত কি ছড়ানো—ঠাকুরমায়ের পোড়ো-ভিটাতে তো পা রাখিবার স্থান নাই, বৃষ্টির ধোয়াতে কতদিনের ভাঙা খাপরা খোলামকুচি বাহির হইয়াছে। এগুলি অপুকে বড় মুগ্ধ করিল, সে হাতে করিয়া তুলিয়া দেখিতে লাগিল। কতদিনের গৃহস্থ-জীবনের সুখ-দুঃখ এগুলোর সঙ্গে জড়ানো! মা পিছনের বাঁশবনে এক জায়গায় সংসারের হাঁড়িকুড়ি ফেলিত, সেগুলি এখনও সেইখানেই আছে! একটা আস্কে-পিঠে গড়িবার মাটির মুচি এখনও অভগ্ন অবস্থায় আছে। অপু অবাক হইয়া ভাবে, কোন্ আনন্দ-ভরা শৈশবসন্ধ্যার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ ছিল না জানি! উঠানের মাটির খোলামকুচির মধ্যে সবুজ কাচের চুড়ির একটা টুকরা পাওয়া গেল। হয়ত তার দিদির হাতের চুড়ির টুকরা।—এ ধরনের চুড়ি ছোট মেয়েরাই পরে—টুকরাটা সে হাতে তুলিয়া লইল। এক জায়গায় আধখানা বোতল-ভাঙা—ছেলেবেলায় এ ধরনের বোতলে মা নারিকেল তৈল রাখিত—হয়ত সেটাই!

একটা দৃশ্য তাকে বড় মুগ্ধ করিল। তাদের রান্নাঘরের ভিটার ঠিক যে কোণে মা রাঁধিবার হাঁড়িকুড়ি রাখিত—সেখানে একখানা কড়া এখনও বসানো আছে, মরিচা ধরিয়া বিকৃত হইয়া গিয়াছে, আটা খসিয়া গিয়াছে, কিন্তু মাটিতে বসিয়া যাওয়ার দরুন একটুও নড়ে নাই।

তাহারা যেদিন রান্না-খাওয়া সারিয়া এ গাঁ ছাড়িয়া রওনা হইয়াছিল—আজ চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে, মা এঁটো কড়াখানাকে ওইখানেই বসাইয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল—কে কোথায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ওখানা ঠিক আছে এখনও।

কত কথা মনে ওঠে। একজন মানুষের অন্তরতম অন্তরের কাহিনী কি অন্য মানুষ বোঝে! বাহিরের মানুষের কাছে একটা জঙ্গলে-ভরা পোড়োভিটা মাত্র—মশার ডিপো। তুচ্ছ জিনিস। কে বুঝিবে চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বের এক দরিদ্রঘরের অবোধ বালকের জীবনের আনন্দ-মুহূর্ত্তগুলির সহিত এ জায়গার কত যোগ ছিল?

ত্রিশ, পঞ্চাশ, একশো, হাজার, তিন হাজার বছর কাটিয়া যাইবে—তখন এ গ্রাম লুপ্ত হইবে, ইছামতীই চলিয়া যাইবে, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সভ্যতা, নতুন ধরণের রাজনৈতিক অবস্থা —যাদের বিষয় এখন কল্পনা করিতেও কেহ সাহস করে না, তখন আসিবে জগতে! ইংরেজ জাতির কথা প্রাচীন ইতিহাসের বিষয়ীভূত হইয়া দাঁড়াইবে, বর্ত্তমান বাংলা ভাষাকে তখনও হয়ত আর কেহ বুঝিবে না, একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়া সম্পূর্ণ অন্য ধরণের ভাষা এদেশে প্রচলিত হইবে।

তখনও এই রকম বৈকাল, এই রকম কালবৈশাখী নামিবে তিন হাজার বর্ষ পরের বৈশাখ-

দিনের শেষে ! তখনও এই রকম পাখি ডাকিবে, এই রকম চাঁদ উঠিবে। তখন কি কেহ ভাবিবে তিন হাজার বছর পূর্বের এক বিস্মৃত বৈশাখী বৈকালের এক গ্রাম্য বালকের ক্ষুদ্র জগৎটি, এই রকম বৃষ্টির গন্ধে, ঝোড়ো হাওয়ায় কি অপূর্ব আনন্দে দুলিয়া উঠিত—এই স্নিগ্ধ অপরাহ্ণ তার মনে কি আনন্দ, আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিত ! তিন হাজার বছরের প্রাচীন জ্যোৎস্না একদিন কোন্ মায়াস্বপ্ন তাহার শৈশব-মনে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল ? নিঃশব্দে শরৎ-দুপুরে বনপথে ক্রীড়ারত সে ক্ষুদ্র নয় বৎসরের বালকের মনের বিচিত্র অনুভূতিরাজির ইতিহাস কোথায় লেখা থাকিবে ? কোথায় লেখা থাকিবে বিস্মৃত অতীতে তার সে সব আনন্দ-ভরা জীবনযাত্রা, বিদেশ হইতে বহুদিন পরে বাড়ি ফিরিয়া মায়ের হাতে বেলের শরবৎ খাওয়ার সে মধুময় চৈত্র অপরাহ্ণটি, বাঁশবনের ছায়ায় অপরাহ্ণের নিদ্রা ভাঙিয়া পাপিয়ার সে মনমাতানো ডাক, কোথায় লেখা থাকিবে বর্ষাদিনের বৃষ্টি-সিক্ত রাত্রিগুলির সে-সব আনন্দ-কাহিনী !

দূর ভবিষ্যতের যেসব তরুণ বালকবালিকার মনে এইসব কালবৈশাখী নব আনন্দের বার্তা আনিবে, কোন্ পথে তারা আসিবে ?

বাহির হইয়া আবার সে ফিরিয়া চাহিল।

সারা ভিটার উপর আসন্ন সন্ধ্যা এক অদ্ভুত, করুণামাখা ছায়া ফেলিয়াছে। মনে হয়, বাড়িটার এই অপূর্ব বৈকাল কাহার জন্য বহুকাল অপেক্ষা করিয়া ক্লান্ত, জীর্ণ, অবসন্ন ও অনাসক্ত হইয়া পড়িয়াছে—আর সাড়া দেয় না, প্রাণ আর নাই।

বার বার করিয়া ঘুলঘুলিটার কথাই মনে পড়িতেছিল। ঘুলঘুলি দুটা এত ভাল আছে এখনও, অথচ মানুষেরাই গেল চলিয়া !

সে নিশ্চিন্দিপুরও আর নাই। এখন যদি সে এখানে আবার বাসও করে, সে অপূর্ব আনন্দ আর পাইবে না—এখন সে তুলনা করিতে শিখিয়াছে, সমালোচনা করিতে শিখিয়াছে, ছেলেবেলায় যারা ছিল সাথী—এখন তাদের সঙ্গে আর অপুর কোনোদিকেই মিশ খায় না—তাদের সঙ্গে কথা কহিয়া আর সে সুখ নাই, তারা লেখাপড়া শিখে নাই, এই পঁচিশ বৎসরে গ্রাম ছাড়িয়া অনেকেই কোথাও যায় নাই—সবারই পৈতৃক কিছু জমিজমা আছে, তাহাই হইয়াছে তাদের কাল। তাদের মন, তাদের দৃষ্টি পঁচিশ বৎসর পূর্বের সেই বাল্যকালের কোঠায় আজও নিশ্চল।…কোনদিক হইতেই অপুর আর কোন যোগ নাই তাহাদের সহিত। বাল্যে কিন্তু এসব দৃষ্টি খোলে নাই—সব জিনিসের উপর একটা অপরিসীম নির্ভরতার ভাব ছিল—সব অবস্থাকেই মানিয়া লইত বিনা বিচারে। সত্যকার জীবন তখনই যাপন করিয়াছিল নিশ্চিন্দিপুরে।

তাহা ছাড়া বাল্যের সুপরিচিত ও অতি প্রিয় সাথীদের অনেকে বাঁচিয়া নাই। বোষ্টম দাদু নাই, জ্যাঠাইমা—রাণুদির মা নাই, আশালতাদি বিবাহের পর মরিয়া গিয়াছে, পটু এদেশ হইতে উঠিয়া গিয়া অন্য কোথাও বাস করিতেছে, নেড়া, রাজু রায়, প্রসন্ন গুরুমশায় কেহই আর নাই—স্বামী মারা যাওয়ার পরে গোকুলের বউ খুড়িমাকে তাহার ভাই আসিয়া লইয়া গিয়াছে—দশ-বারো বৎসর তিনি এখানে আসেন নাই, বাঁচিয়া আছেন কিনা কেহ জানে না।

তবু মেয়েদের ভাল লাগে। রাণুদি, ও বাড়ির খুড়িমা, রাজলক্ষ্মী, লীলাদি, এরা স্নেহে, প্রেমে, দুঃখে, শোকে যেন অনেক বাড়িয়াছে, এতকাল পরে অপুকে পাইয়া ইহারা সকলেই খুশী, কথায় কাজে এদের ব্যবহার মধুর ও অকপট। পুরাতন দিনের কথা এদের সহিত কহিয়া সুখ আছে—বহুকালের খুঁটিনাটি কথাও মনে রাখিয়াছে—হয়তো বা জীবনের পরিধি উহাদের সংকীর্ণ বলিয়াই, ক্ষুদ্র বলিয়াই এতটুকু তুচ্ছ জিনিসও আঁকড়াইয়া রাখিয়াছে।

আজ সে একথা বুঝিয়াছে, জীবনে অনবরত বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে লড়াই করিয়া চলিতে

হইয়াছিল বলিয়াই আজ সে যাহা পাইয়াছে—এখানে পৈতৃক জমিজমার মালিক হইয়া নির্ভাবনায় বসিয়া থাকিলে তাহা পাইত না। আজ যদি সে বিদেশে যায়, সমুদ্রপারে যায়—যে চোখ লইয়া সে যাইবে, নিশ্চিন্দিপুরে গত পঁচিশ বৎসর নিষ্ক্রিয় জীবন যাপন করিলে সে চোখ খুলিত না। একদিন নিশ্চিন্দিপুরকে যেমন সে সুখ-দুঃখ দ্বারা অর্জ্জন করিয়াছিল—আজ তেমনি সুখ-দুঃখ দিয়া বাহিরকে অর্জ্জন করিয়াছে।

নদীতে গা ধুইতে গিয়া নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় এই সব কথাই সে ভাবিতেছিল। সারাদিনটা আজ গুমট গরম, প্রতিপদ তিথি—কাল গিয়াছে পূর্ণিমা। আজ এখনি জ্যোৎস্না উঠিবে।

এই নদীতে ছেলেবেলায় যে-সব বধূরা জল লইতে আসিত, তারা এখন প্রৌঢ়া, কত নাইও—মরিয়া হাজিয়া গিয়াছে, যে-সব কোকিল সেই ছেলেবেলাকার রামনবমী দিনের পুলক-মুহূর্ত্তগুলি ভরাইয়া দুপুরে কু কু ডাক দিত, কচিপাতা-ওঠা বাঁশবনে তাদের ছেলেমেয়েরা আবার তেমনি গায়।

শুধু তাহার দিদি শুইয়া আছে। রায়পাড়ার ঘাটের ওধারে ওই প্রাচীন ছাতিম গাছটার তলায় তাহাদের গ্রামের শ্মশান, সেখানে। সে-দিদির বয়স আর বাড়ে নাই, মুখের তারুণ্য বিলুপ্ত হয় নাই—তার কাচের চুড়ি, নাটাফলের পুঁটুলি অক্ষয় হইয়া আছে এখনও। প্রাণের গোপন অন্তরে যেখানে অপুর শৈশবকালের কাঁচা শিশুমনটি প্রবুদ্ধ জীবনের শত জ্ঞান অভিজ্ঞতা, উচ্চাশা ও কর্ম্মস্তূপের নিচে চাপা পড়িয়া মরিয়া আছে—সেখানে সে চিরবালিকা, শৈশব-জীবনের সে সমাধিতে জনহীন অন্ধকার রাত্রে সে-ই আসিয়া নীরবে চোখের জল ফেলে—শিশু প্রাণের সাথীকে আবার খুঁজিয়া ফেরে।

আজ চব্বিশ বৎসর ধরিয়া সাঁঝ-সকালে তার আশ্রয়স্থানটিতে সোনার সূর্য্যকিরণ পড়ে। বর্ষাকালের নিশীথে মেঘ ঝর-ঝর জল ঢালে, ফাল্গুনে দিনে ঘেঁটফুল, হেমন্ত দিনে ছাতিমফুল ফোটে। জ্যোৎস্না উঠে। কত পাখি গান গায়। সে এ সবই ভালবাসিত। এ সব ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই কোথাও।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে সে একবার কলিকাতায় আসিল—ফিরিতে কুড়ি-পঁচিশ দিন দেরি হইয়া গেল—আষাঢ় মাসের শেষ, বর্ষা ইতিমধ্যে খুব পড়িয়াছিল, সম্প্রতি দু-একদিন একটু ধরণ, কখনও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, দিন ঠাণ্ডা, কোনদিন বা সারাদিন খর রৌদ্র।—

এই ক'দিনে দেশের চেহারা বদলাইয়াছে, গাছপালা আরও ঘন সবুজ, উঁচু গাছের মাথা হইতে কচি মাকাললতা লম্বা হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে—বাল্যের অতীব পরিচিত দৃশ্য, এখনও বউ-কথা-কও ডাকে, কিন্তু কোকিল ও পাপিয়া আর নাই—এখনও বনে সোঁদালি ফুলের ঝাড় অজস্র, কচি পট্‌পটি ফলের থোলো বাঁধিয়াছে গাছে গাছে—কটুগন্ধ ঘেঁটকোল রোজ বেলাশেষে কোন্ ঝোপঝাপের অন্ধকারে ফোটে, ঘাটের পথে ফিরিবার সময় মেয়েরা নাকে কাপড় চাপা দেয়—কি পরিচিত, কি অপূর্ব্ব ধরণের পরিচিত সবই, অথচ বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছিল সবটা এতদিন। বাহিরের মাঠ সবুজ হইয়াছে নবীন আউশ ধানে—এই সময় এক-দিন সে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আর একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভ করিল।

খুব রৌদ্র, দুপুর ঘুরিয়া গিয়াছে, বেলা তিনটার কম নয়, অপু কি কাজে গ্রামের পিছন-দিকের বনের পথ ধরিয়া যাইতেছিল। দুধারে বর্ষার বনঝোপ ঘন সবুজ, বাঁশবনে একটা

কঞ্চি হইতে হলদে পাখি উড়িয়া আর একটা কঞ্চিতে বসিতেছে।

একটা জায়গায় ঘনবনের মধ্যে সঁড়ি পথ, বড়গাছের পাতার ফাঁক দিয়া ঝলমলে পরিপূর্ণ রৌদ্র পড়িয়া কচি, সবুজ পাতার রাশি স্বচ্ছ দেখাইতেছে, কেমন একটা অপূর্ব্ব সুগন্ধ উঠিতেছে বনঝোপ হইতে —সে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল সেদিকে চাহিয়াই।···তাহার সেই অপূর্ব্ব শৈশব-জগৎটা!—

ঠিক এইরকম সঁড়ি বনের পথ বাহিয়া এমনি রৌদ্রালোকিত ঘুঘুডাকা দীর্ঘ শ্রাবণ দিনে, দুপুর ঘুরিয়া বৈকাল আসিবার পূর্ব্ব সময়টিতে সে ও দিদি চৌশালিকের বাসা, পাকা মাকালফল, মিষ্টি রাংচিতার ফল খুঁজিয়া বেড়াইত—দুপুর রোদের গন্ধমাখানো, কত লতা দোলানো, সেই রহস্যভরা, করুণ, মধুর আনন্দলোকটি!···মাইল বাহিয়া এ গতি নয়, সেখানে যাওয়ার যানবাহন নাই—পৃথিবীর কোথায় যেন একটি পথ আছে যাহা সময়ের বীথিতল বাহিয়া মানুষকে লইয়া চলে তার অলক্ষিতে। ঘন ঝোপের ভিতর উঁকি মারিতেই চক্ষের নিমেষে তাহার ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বের শৈশবলোকটিতে আবার সে ফিরিয়া গেল, যখন এই বন, এই নীল আকাশ, উজ্জ্বল আনন্দভরা এই রৌদ্রমাখানো শ্রাবণ দুপুরটাই ছিল জগতের সবটুকু—বাহিরের বিশ্বটা ছিল অজানা, সে সম্বন্ধে কিছু জানিতও না, ভাবিতও না—রঙে রঙে রঙীন রহস্যঘন সেই তার প্রাচীন দিনের জগৎটা!···

এ যেন নবযৌবনের উৎস-মুখ, মন বার বার এর ধারায় স্নান করিয়া হারানো নবীনত্বকে ফিরিয়া পায়—গাছপালার সবুজ, রৌদ্রলোকের প্রাচুর্য্য, দুর্গাটুনটুনির অবাধ কাকলী—ঘন সঁড়ি পথের দূরপারে শৈশবসঙ্গিনী দিদির ডাক যেন শোনা যায়।···

কতক্ষণ সে অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—বুঝাইবার ভাষা নাই, এ অনুভূতি মানুষকে বোবা করিয়া দেয়! অপুর চোখ ঝাপসা হইয়া আসিল—কোন দেবতা তার প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন? তার নিশ্চিন্দিপুর আসা সার্থক হইল।

আজ মনে হইতেছে যৌবন তার স্বর্গের দেবতাদের মত অক্ষয়, অনন্ত সে জগৎটা আছে —তার মধ্যেই আছে। হয়তো কোনও বিশেষ পাখির গানের সুরে, কি কোনও বনফুলের গন্ধে শৈশবের সে হারানো জগৎটা আবার ফিরিবে। অপুর কাছে সেটা একটা আধ্যাত্মিক অনুভূতি, সৌন্দর্য্যের প্লাবন বহাইয়া ও মুক্তির বিচিত্র বার্ত্তা বহন করিয়া তা আসে, যখনই আসে। কিন্তু ধ্যানে তাকে পাইতে হয়, শুধু অনুভূতিতেই সে রহস্য-লোকের সন্ধান মিলে!

তার ছেলে কাজল বর্ত্তমানে সেই জগতের অধিবাসী। এজন্য ওর কল্পনাকে অপু সঞ্জীবিত রাখিতে প্রাণপণ করে—শক ও হূণের মত বৈষয়িকতা ও পাকাবুদ্ধির চাপে সে-সব সোনার স্বপ্নকে রূঢ়হস্তে কেহ পাছে ভাঙিয়া দেয়—তাই সে কাজলকে তার বৈষয়িক শ্বশুর মহাশয়ের নিকট হইতে সরাইয়া আনিয়াছে—নিশ্চিন্দিপুরের বাঁশবনে, মাঠে, ফুলে ভরা বনঝোপে, নদী-তীরের উলুখড়ের নির্জ্জন চরে সেই অদৃশ্য জগৎটার সঙ্গে ওর সেই সংযোগ স্থাপিত হউক—যা একদিন বাল্যে তার নিজের একমাত্র পার্থিব ঐশ্বর্য্য ছিল···

নিশ্চিন্দিপুর
১৭ই আষাঢ়

ভাই প্রণব,

অনেকদিন তোমার কোনো সংবাদ পাই নি, কোনো সন্ধানও জানতুম না, হঠাৎ সেদিন কাগজে দেখলুম তুমি আদালতে কম্যুনিজম নিয়ে এক বক্তৃতা দিয়েছ, তা থেকেই তোমার বর্ত্তমান অবস্থা জানতে পারি।

তুমি জান না বোধ হয় আমি অনেকদিন পর আমার গ্রামে ফিরেছি। অবশ্য দু'দিনের

জন্য, সে-সব কথা পরে লিখব। খোকাকেও এনেছি। সে তোমায় বড় মনে রেখেছে, তুমি ওর মাথায় জল দিয়ে বাতাস করে জ্বর সারিয়েছিলে সে-কথা ও এখনও ভোলে নি।

দেখ প্রণব, আজকাল আমার মনে হয়,—অনুভূতি, আশা, কল্পনা, স্বপ্ন—এসবই জীবন! এবার এখানে এসে জীবনটাকে নতুন চোখে দেখতে পাই, এমন সুবিধে ও অবকাশ আর কোথাও হয় নি—এক নাগপুরে ছাড়া! কত আনন্দের দিনের যাওয়া-আসা হ'ল জীবনে। যেদিনটিতে ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে প্রথম কুঠির মাঠ দেখতে যাই সরস্বতী পুজোর বিকেলে—যেদিন আমি ও দিদি রেলরাস্তা দেখতে ছুটে যাই—যেদিন বিয়ের আগের রাত্রে তোমার মামার বাড়ির ছাদটিতে বসে ছিলুম সন্ধ্যায়,—জন্মাষ্টমীর তিমিরভরা বর্ষণসিক্ত রাত জেগে কাটিয়েছিলুম আমি ও অপর্ণা মনসাপোতার খড়ের ঘরে, জীবনের পথে এরাই তো আনন্দের অক্ষয় পাথেয় যে আনন্দ অর্থের উপর নির্ভর করে না, ঐশ্বর্য্যের ওপর নির্ভর করে না, মান-সম্মান বা সাফল্যের উপরও নির্ভর করে না, যা সূর্য্যের কিরণের মত অকৃপণ, অপক্ষপাতী, উদার—ধনী-দরিদ্র বিচার করে না, উপকরণের স্বল্পতা বা বাহুল্যের উপর নির্ভর করে না। বড়-লোকের মেয়েরা নতুন মোটর কিনে যে আনন্দ পায়, মা অবিকল সেই আনন্দই পেতেন যদি নেমন্তন্ন থেকে আমি ভাল ছাঁদা বেঁধে আনতে পারতুম, আমার দিদি সেই আনন্দই পেত যদি বনঝোপে কোথাও পাকা ফলে ভরা মাকাললতা কি বৈঁচিগাছের সন্ধান পেত।

জীবনে সর্ব্বপ্রথম যেবার একা বিদেশে গেলুম পিসিমার বাড়ি সিদ্ধেশ্বরী কালীর পুজো দিতে, বছর নয়েক বয়স তখন—হাজার বছর যদি বাঁচি, কে ভুলে যাবে সেদিনের সে আনন্দ ও অনুভূতির কথা? বহু পয়সা খরচ ক'রে মেরু পর্যটকেরা তুষারবর্ষী শীতের রাত্রে, উত্তর-হিমকটিবন্ধের বরফ-জমা নদী ও অন্ধকার আরণ্যভূমির নিস্তব্ধতার মধ্যে, Northern light জ্বলা আকাশের তলায়, অবাস্তব, হলুদরঙের চাঁদের আলোয়, শুভ্রতুষারাবৃত পাইন ও সিলভার স্প্রুসের অরণ্যে নেকড়ে বাঘের ডাক শুনে সে আনন্দ পান না—আমি সেদিন খালি পায়ে বালুমাটির পথে শিমুল সোঁদালি বনের ছায়ায় ছায়ায় ভিন্-গাঁয়ে যেতে যেতে যে আনন্দ পেয়েছিলুম। আমি তো বড় হয়ে জীবনে কত জায়গায় গেলুম, কিন্তু জীবনের উষার মুক্তির প্রথম আস্বাদের সে পাগল-করা আনন্দের সাক্ষাৎ আর পাই নি—তাই রেবাতটের সেই বেতস তরুতলেই অবুঝ মন বার বার ছুটে ছুটে যায় যদি, তাকে দোষ দিতে পারি কৈ? ···

আজ একথা বুঝি ভাই যে, সুখ ও দুঃখ দুই-ই অপূর্ব্ব। জীবন খুব বড় একটা রোমান্স—বেঁচে থেকে একে ভোগ করাই রোমান্স—অতি তুচ্ছতম, হীনতম, একঘেয়ে জীবনও রোমান্স। এ বিশ্বাসটা এতদিন আমার ছিল না—ভাবতুম লাফালাফি ক'রে বেড়ালেই বুঝি জীবন সার্থক হয়ে গেল—তা নয়, দেখলুম ভাই।

এর সুখ, দুঃখ, আশা, নিরাশা—আত্মার যে কি বিচিত্র, অমূল্য য়্যাডভেঞ্চার—তা বুঝে দেখতে ধ্যানদৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা আছে, তা আসে এই রহস্যমাখা যাত্রাপথের অমানবীয় সৌন্দর্য্যের ধারণা থেকে।···

শৈশবের গ্রামখানাতে ফিরে এসে জীবনের এই সৌন্দর্য্যরূপটাই শুধু চোখে দেখছি। এতদিনের জীবনটা এক চমকে দেখবার এমন সুযোগ আর হয় নি কখনও। এত বিচিত্র অনুভূতি, এত পরিবর্ত্তন, এত রস—অনেকক্ষণ শুয়ে শুয়ে চারিধারের রৌদ্রদীপ্ত মধ্যাহ্নের অপূর্ব্ব শান্তির মধ্যে কত কথাই মনে আসে, কত বছর আগেকার সে শৈশব-সুরটা যেন কানে বাজে, এক পুরনো শান্ত দুপুরের রহস্যময় সুর···কত দিগন্তব্যাপী মাঠের মধ্যে এই শান্ত দুপুরে কত বটের তলা, রাখালের বাঁশির সুরের ওপারের যে দেশটি অনন্ত তার কথাই মনে ওঠে।

কিছুতেই আমাদের দেশের লোকে বিস্মিত হয় না কেন বলতে পার, প্রণব? বিস্মিত

হবার ক্ষমতা একটা বড় ক্ষমতা। যে মানুষ কোনও কিছু দেখে বিস্মিত হয় না, মুগ্ধ হয় না, সে তো প্রাণহীন। কলকাতায় দেখেছি কি তুচ্ছ জিনিস নিয়েই সেখানকার বড় বড় লোক দিন কাটায়। জীবনকে যাপন করা একটা আর্ট—তা এরা জানে না বলেই অল্প বয়সে আমাদের দেশে জীবনের ব্যবসায়ে দেউলে হয়ে পড়ে।

দিনের মধ্যে খানিকটা অনন্ত নির্জনে বসে একে ভাবতে হয়—উঃ, সে দেখেছিলুম নাগপুরে ভাই—সে কী অবর্ণনীয় আনন্দ পেতুম। বৈকালটিতে যখন কোনো শালবনের ছায়ায় পাথরের ওপর গিয়ে বসতুম—লোকাতীত যে বড় জীবন শত শত জন্মমৃত্যুর দূরে পারে অক্ষুন্ন, তার অস্তিত্বকে মন যেন চিনে নিত···ডি সিটারের, আইনস্টাইনের বিশ্বটার চেয়েও তো বড়।

এখানে এসেও তাই মনে হচ্ছে প্রণব।···এখানে বুঝেছি জগতে কত সামান্য জিনিসথেকে কত গভীর আনন্দ আসতে পারে। তুচ্ছ টাকা, তুচ্ছ যশমান। আমার জীবনে এরাই হোক অক্ষয়। এত ছায়া, এত ডাঁশা খেজুরের আতাফুলের সুগন্ধ, এত স্মৃতির আনন্দ কোথায় আর পাব? হাজার বছর কাটিয়ে দিতে পারি এখানে, তবু এ পুরানো হবে না যেন।

লীলাকে জানতে? আমার মুখে দু'একবার শুনেছ। সে আর নেই। সে সব অনেক কথা। কিন্তু যখনই তার কথা ভাবি, অপর্ণার কথা ভাবি, তখন মনে হয় এদের দু'জনের সঙ্গ পেয়ে আমার জীবন ধন্য হয়ে গিয়েছে—বাইবেলে পড়েছ তো—And I saw a new Heaven and a New Earth—এরা জীবন দিয়ে আমার সে চোখ খুলে দিয়েছে।

হ্যাঁ, তোমায় লিখি। আমি বাইরে যাচ্ছি। খুব সম্ভব যাব ফিজি ও সামোয়া—এক বন্ধুর কাছ থেকে ভরসা পেয়েছি। কাজলকে কোথায় রেখে যাই এই ছিল সমস্যা। তোমার মামার বাড়ি রাখব না—তোমার মেজমামীমা লিখেছেন কাজলের জন্যে তাঁদের মন খারাপ, সে চলে গিয়ে বাড়ি অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। হোক অন্ধকার, সেখানে আর নয়। আমার এক বাল্যসঙ্গিনী এখানে আছেন। তাঁর কাছেই ওকে রেখে যাব। এঁর সন্ধান না পেলে বিদেশে যাওয়া কখনও ঘটে উঠত না, খোকাকে যেখানে-সেখানে ফেলে যেতে পারতুম না তো!

আজ আবার ত্রয়োদশী তিথি, মেঘশূন্য আকাশ সুনীল। খুব জ্যোৎস্না উঠবে—ইচ্ছে হয় তোমায় নিয়ে দেখাই এ-সব, তোমার ঋণ শোধ দিতে পারব না জীবনে ভাই—তুমিই অপর্ণাকে জুটিয়ে দিয়েছিলে—কত বড় দান যে সে জীবনের, তা তুমিও হয়তো বুঝবে না।

তোমারই চিরদিনের বন্ধু
অপূর্ব

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

দুপুরে একদিন রাণু বলিল, অপু তোর কিছু দেনা আছে—

—কি দেনা রাণুদি?

—মনে আছে আমার খাতায় একটা গল্প শেষ করিস নি?

রাণু একটা খাতা বাহির করিয়া আনিল। অপু খাতাটা চিনিতে পারিল না। রাণু বলিল—এতে একটা গল্প আধখানা লিখেছিলি মনে আছে ছেলেবেলায়? শেষ লিখে দে এবার। ···অপু অবাক্ হইয়া গেল। বলিল—রাণুদি, সেই খাতাখানা এতকাল রেখে দিয়েছ তুমি?

রাণু মৃদু মৃদু হাসিল।

—বেশ দাও। এখন আমার লেখা কাগজে বেরুচ্ছে, তোমার খাতাখানায় গল্পটা অর্ধেক রাখব না। কিন্তু কি ভেবে খাতাখানা রেখেছিলে রাণুদি এতদিন?

—শুনিবি ? একদিন তোর সঙ্গে দেখা হবেই, গল্প শেষ ক'রে দিবিই জানতুম !

অপু মনে ভাবিল—তোমাদের মত বাল্যসঙ্গিনী জন্ম জন্ম যেন পাই রাণুদি। মুখে বলিল—সত্যি ? দেখি—দেখি খাতাটা !

খাতা খুলিয়া বাল্যের হাতের লেখাটা দেখিয়া কৌতুক বোধ করিল। রাণীকে দেখাইয়া হাসিয়া বলিল—একটা পাতে সাতটা বানান ভুল ক'রে বসে আছি দ্যাখো।

সে এই মঙ্গলরূপিনী নারীকেই সারাজীবনদেখিয়া আসিয়াছে—এই স্নেহময়ী, করুণাময়ী নারীকে—হয়তো ইহা সম্ভব হইয়াছে এই জন্য যে, নারীর সঙ্গে তার পরিচয় অল্পকালের ও ভাসা ভাসা ধরণের বলিয়া—অপর্ণা দু'দিনের জন্য তার ঘর করিয়াছিল—লীলার সহিত যে পরিচয় তাহা সংসারের শত সুখ দুঃখ ও সদাজাগ্রত স্বার্থদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া নহে—পটেশ্বরী, রাণুদি, নিৰ্ম্মলা, নিরুদি, তেওয়ারী-বধূ—সবাই তাই। তাই যদি হয়, অপু দুঃখিত নয়—তাই ভালো, এই স্রোতের শেওলার মত ভাসিয়া বেড়ানো। ভবঘুরে পথিক-জীবনে সহচর-সহচরীগণের যে কল্যাণপাণি ক্ষুধার সময় তাহাকে অমৃত পরিবেশন করিয়াছে—তাহাতেই সে ধন্য, আরও বেশী মেশামেশি করিয়া তাহাদের দুর্ব্বলতাকে আবিস্কার করিবার শখ তাহার নাই—সে যাহা পাইয়াছে, চিরকাল সে নারীর নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে ইহার জন্য।

ভাদ্রের শেষে আর একবার কলিকাতায় আসিয়া খবরের কাগজে একদিন পড়িল, ফিজি-প্রত্যাগত কয়েকজন ভারতীয় আর্য্যমিশনে আসিয়া উঠিয়াছেন। তখনই সে আর্য্যমিশনে গেল। নিচে কেহ নাই, জিজ্ঞাসা করিলে একজন উপরের তলায় যাইতে বলিল।

ত্রিশ-বত্রিশ বৎসরের একজন যুবক হিন্দীতে তাহার আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিল। অপু বলিল—আপনারা এসেছেন শুনে দেখা করতে এলুম। ফিজির সব খবর বলবেন দয়া ক'রে ? আমার খুব ইচ্ছে সেখানে যেতে।

যুবকটি একজন আর্য্যসমাজী মিশনারী। সে ইস্ট আফ্রিকা, ট্রিনিডাড, মরিশস—নানা স্থানে প্রচার-কার্য্য করিয়াছে। অপুকে ঠিকানা দিল, পোস্ট বক্স ১১৭৫, লউটোকা, ফিজি। বলিল, অযোধ্যা জেলায় আমার বাড়ি—এবার যখন ফিজি যাব একসঙ্গেই যাব।

অপু যখন আর্য্যমিশন হইতে বাহির হইল, বেলা তখন সাড়ে দশটা।

বাসায় আসিয়া টিঁকিতে পারিল না। কাজল সেখানে নাই, ঘরটার সৰ্ব্বত্র কাজলের স্মৃতি, ওই জানালাতে কাজল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রাস্তার লোক দেখিত, দেওয়ালের ঐ পেরেকটা সে-ই পুঁতিয়াছিল একটা টিনের ভেঁপু ঝুলাইয়া রাখিত, ওই কোণটাতে টুলটার উপর বসিয়া পা দুলাইয়া দুলাইয়া মুড়ি খাইত—অপুর যেন হাঁফ ধরে—ঘরটাতে সত্যিই থাকা যায় না।

বৈকালে খানিকটা বেড়াইল। বাকী চারশ' টাকা আদায় হইল। আর কিছুদিন পর কলিকাতা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে—কত দূরে, সপ্তসিন্ধু পারের দেশ !···কে জানে আর ফিরিবে কিনা ! ভিটা-লেভু, ভ্যানি লেভু, নিউ হেব্রিডিস্, সামোয়া !—অৰ্দ্ধচন্দ্রাকৃতি প্রবালবাঁধে-ঘেরা নিস্তরঙ্গ ঘন নীল উপসাগর, একদিকে সিন্ধু সীমাহারা, অকূল !—দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত—অন্যদিকে ঘরোয়া ছোট্ট পুকুরের মত উপসাগরটির তীরে নারিকেলপত্র নিৰ্ম্মিত ছোট ছোট কুটির—মধ্যে লৌহপ্রস্তরের পাহাড়ের সূক্ষ্মাগ্র নাসা উভয়কে দ্বিধাবিভক্ত করিতেছে—রৌদ্রালোকপ্লাবিত সাগরবেলা। পথিক-জীবনের যাত্রা আবার নতুন দেশের নতুন আকাশতলে শুরু হইবার দিন ঘনাইয়া আসিতেছে !

পুরাতন দিনের সঙ্গে যে-সব জায়গার সম্পর্ক—আর একবারে সে-সব দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইল···

মায়ের মৃত্যুর পূর্ব্বে যে ছোট একতলা ঘরটাতে থাকিত অভয় নিয়োগী লেনের মধ্যে—

সেটার পাশ দিয়াও গেল। বহুকাল এইদিকে আসে নাই।

গলির মুখে একটা গ্যাসপোস্টের কাছে সে চুপ করিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল—

একটি ছিপ্‌ছিপে চেহারার উনিশ কুড়ি বছরের পাড়াগাঁয়ের যুবক সামনের ফুটপাতে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—কিছু মুখচোরা, কিছু নির্বোধ—বোধ হয় নতুন কলিকাতায় আসিয়াছে—বোধ হয় পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই—ক্ষুধাশীর্ণ মুখ—অপু ওকে চেনে—ওর নাম অপূর্ব রায়।—তেরো বছর আগে ও এই গলিটার মধ্যে একতলা বাড়িটাতে থাকিত। এক মুঠো হোটেলের রান্না ভাত-ডালের জন্য হোটেলওয়ালার কত মুখ-নাড়া সহ্য করিত—মায়ের সঙ্গে দেখা করিবার প্রত্যাশায় পাঁচিলের গায়ে দাগ কাটিয়া ছুটির আর কতদিন বাকি হিসাব রাখিত। দাগগুলি জামরুল গাছটার পাশে লোনাধরা পাঁচিলের গায়ে আজও হয় তো আছে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে গ্যাস জ্বলিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে যুবকের ছবি মিলাইয়া গেল।…

বাসার নির্জন ছাদে একা আসিয়া বসিল। মনে কি অদ্ভুত ভাব!—কি অদ্ভুত অনুভূতি!—নবমীর জ্যোৎস্না উঠিয়াছে—কেমন সব কথা মনে উঠে—বিচিত্র সব কথা—বসিয়া বসিয়া ভাবে, এই রকম জ্যোৎস্না আজ উঠিয়াছে তাদের মনসাপোতার বাড়িতে, নাগেপুরের বনে তার সেই বাংলোর সামনের মাঠে, বাল্যে সেই একটিবার গিয়াছিল লক্ষ্মণ মহাজনের বাড়ি, তাদের উঠানে। পাশে সেই পুকুর-পাড়টাতে, নিশ্চিন্দিপুরের পোড়ো-ভিটাতে, অপর্ণা ও সে শ্বশুরবাড়ির যে ঘরটাতে শুইত—তারই জানালার গায়ে—চাঁপদানীতে পটেশ্বরীদের বাড়ির উঠানে—দেওয়ানপুরের বোর্ডিংয়ের কম্পাউণ্ডে, জীবনের সহিত জড়ানো এই সব স্থানের কথা ভাবিতেই জীবনের বিচিত্রতা, প্রগাঢ় রহস্য তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল…

এবার কলিকাতা হইতে বাড়ি ফিরিবার সময় মাঝেরপাড়া স্টেশনে নামিয়া অপু আর হাঁটিয়া বাড়ি যাইতে পারিল না—খোকাকে আজ দেড়মাস দেখে নাই—ছ'ক্রোশ রাস্তা পায়ে হাঁটিয়া বাড়ি পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইবে—খোকার জন্য মন এত অধীর হইয়া উঠিয়াছে যে, এত দেরি করা একেবারে অসম্ভব।—বাবার কথা মনে হইল—বাবাও ঠিক তাকে দেখিবার জন্য, দিদিকে দেখিবার জন্য এমনি ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন—প্রবাস হইতে ফিরিবার পথে, তাদের বাল্যে। আজকাল পিতৃহৃদয়ের এসব কাহিনী সে বুঝিয়াছে—কিন্তু তখন তো হাঁটিয়া যাওয়া ছাড়া পন্থা ছিল না, এখন আর সেদিন নাই, মোটরবাসে এক ঘণ্টার মধ্যেই নিশ্চিন্দিপুর। যা একটু দেরি সে কেবল বেত্রবতীর খেয়াঘাটে।

গ্রামে পৌঁছিতে অপুর প্রায় বেলা তিনটা বাজিয়া গেল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মাদুর পাতিয়া রাণুদিদের রোয়াকে ছেলেকে লইয়া বসিল। লীলা আসিল, রাণু আসিল, ও-বাড়ির রাজলক্ষ্মী আসিয়া বসিল। রাণুদের বাড়ির চারিধারে হেমন্ত অপরাহ্ণ ঘনাইয়াছে—নানা লতাপাতায় সুগন্ধ উঠিতেছে…

কি অদ্ভুত ধরণের সোনালী রোদ এই হেমন্ত বৈকালের! আকাশ ঘন নীল—তার তলে রাণুদিদের বাড়ির পিছনের বাঁশঝাড়ে সোনালী সড়কির মত বাঁশের সুচালো ডগায় রাঙ্গা রোদ মাখানো, কোনটার উপর ফিঙে পাখি বসিয়া আছে—বাদুড়ের দল বাসায় ফিরিতেছে।…পাঁচিলের পাশের বনে এক-একটা আমড়া গাছে থোলো থোলো কাঁচা আমড়া।

সন্ধ্যার শাঁক বাজিল। জগতের কি অপূর্ব রূপ!…আবার অপুর মনে হয়, এদের পেছনে কোথায় আর একটা অসাধারণ জগৎ আছে—ওই বাঁশবনের মাথার উপরকার সিঁদুরে মেঘভরা আকাশ, বাঁশের সোনালী সড়কির আগায় বসা ফিঙে-পাখির দুলুনি—সেই অপূর্ব, অচিন্ত্য জগৎটার সীমানায় মনকে লইয়া গিয়া ফেলে। সন্ধ্যার শাঁক কি তাদের পোড়ো

ভিটাতেও বাজিল ? পূজোর সময় বাবার খরচপত্র আসিত না, মা কত কষ্ট পাইত—দিদির চিকিৎসা হয় নাই।—সে সব কথা মনে আসিল কেন এখন ?

অন্য সবাই উঠিয়া যায়। কাজল পড়িবার বই বাহির করে। রাণু রান্নাঘরে রাঁধে, কুটনো কোটে। অপুকে বলে—এইখানে আয় বসবি, পিঁড়ি পেতে দি—

অপু বলে, তোমার কাছে বেশ থাকি রাণুদি! গাঁয়ের ছেলেদের কথাবার্ত্তা ভাল লাগে না।

রাণু বলে—দু'টি মুড়ি মেখে দি—খা বসে বসে। দুধটা জ্বাল দিয়েই চা ক'রে দিচ্ছি।

—রাণুদি সেই ছেলেবেলাকার ঘটিটা তোমাদের—না ?

রাণু বলে—আমার ঠাকুরমা জগন্নাথ থেকে এনেছিলেন তাঁর ছেলেবয়সে। আচ্ছা অপু, দুগ্‌গোর মুখ তোর মনে পড়ে ?

অপু হাসিয়া বলে—না রাণুদি। একটু যেন আবছায়া—তাও সত্যি কিনা বুঝিনে। রাণু দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আহা! সব স্বপ্ন হয়ে গেল! অপু ভাবে, আজ যদি সে মারা যায়, খোকাও বোধ হয় তাহার মুখ এমনি ভুলিয়া যাইবে। রাণুর মেয়ে বলিল—ও মামা, আমাদের বাড়ির ওপর দিয়ে আজ এইলোপেলেন্ গিইল।

কাজল বলিল—হ্যাঁ বাবা, আজ দুপুরে। এই তেঁতুল গাছের ওপর দিয়ে গেল।

অপু বলিল—সত্যি রাণুদি ?

—হ্যাঁ তাই। কি ইংরেজি বুঝিনে—উড়ো জাহাজ যাকে বলে—কি আওয়াজটা!—

নিশ্চিন্দিপুরের সাত বছরের মেয়ে আজকাল এরোপ্লেন দেখিতে পায় তাহা হইলে ?

পরদিন সন্ধ্যার পর জ্যোৎস্না-রাত্রে অভ্যাস মত নদীর ধারে মাঠে বেড়াইতে গেল।

কতকাল আগে নদীর ধারের ওইখানটিতে একটা সাঁইবাবলাতলায় বসিয়া এইরকম বৈকালে সে মাছ ধরিত—আজকাল সেখানে সাঁইবাবলার বন, ছেলেবেলার সে গাছটা আর চিনিয়া লওয়া যায় না।

ইছামতী এই চঞ্চল জীবনধারার প্রতীক। ওর দু'পাড় ভরিয়া প্রতি চৈত্র বৈশাখে কত বনকুসুম, গাছপালা, পাখি-পাখালী, গাঁয়ে গাঁয়ে গ্রামের হাট—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কত ফুল ঝরিয়া পড়ে, কত পাখির দল আসে যায়, ধারে ধারে কত জেলেরা জাল ফেলে, তীরবর্ত্তী গৃহস্থবাড়িতে হাসি-কান্নার লীলাখেলা হয়, কত গৃহস্থ আসে, কত গৃহস্থ যায়—কত হাসিমুখ শিশু মায়ের সঙ্গে নাহিতে নামে, আবার বৃদ্ধাবস্থায় তাহাদের নশ্বর দেহের রেণু কলস্বনা ইছামতীর স্রোতোজলে ভাসিয়া যায়—এমন কত মা, কত ছেলেমেয়ে, তরুণ-তরুণী মহাকালের বীথিপথে আসে যায়—অথচ নদী দেখায় শান্ত, স্নিগ্ধ, ঘরোয়া, নিরীহ।…

আজকাল নির্জ্জনে বসিলেই তাহার মনে হয়, এই পৃথিবীর একটা আধ্যাত্মিক রূপ আছে, এর ফুলফল, আলোছায়ার মধ্যে জন্মগ্রহণ করার দরুন এবং শৈশব হইতে এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বন্ধনে আবদ্ধ থাকার দরুন, এর প্রকৃত রূপটি আমাদের চোখে পড়ে না। এ আমাদের দর্শন ও শ্রবণগ্রাহ্য জিনিসে গড়া হইলেও আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও ঘোর রহস্যময়, এর প্রতি রেণু যে অসীম জটিলতায় আচ্ছন্ন—যা কিনা মানুষের বুদ্ধি ও কল্পনার অতীত, এ সত্যটা হঠাৎ চোখে পড়ে না। যেমন সাহেব বন্ধুটি বলিত, "ভারতবর্ষের একটা রূপ আছে, সে তোমরা জান না। তোমরা এখানে জন্মেছ কিনা, অতি পরিচয়ের দোষে সে চোখ ফোটে নি তোমাদের।"

আকাশের রং আর এক রকম—দূরের সে গহন হিরাকসের সমুদ্র ঈষৎ কৃষ্ণাভ হইয়া উঠিয়াছে—তার তলায় সারা সবুজ মাঠটা, মাধবপুরের বাঁশবনটা কি অপূর্ব্ব, অদ্ভুত, অপার্থিব ধরণের ছবি ফুটাইয়া তুলিতেছে!…ও যেন পরিচিত পৃথিবীটা নয়, অন্য কোন

অজানা জগতের, কোনও অজ্ঞাত দেবলোকের···

প্রকৃতির একটা যেন নিজস্ব ভাষা আছে। অপু দেখিয়াছে, কতদিন বক্রতোয়ার উপল-ছাওয়া-তটে শাল-ঝাড়ের নিচে ঠিক দুপুরে বসিয়া—দূরে নীল আকাশের পটভূমিতে একটা পত্রশূন্য প্রকাণ্ড কি গাছ—সেদিকে চাহিলেই এমন সব কথা মনে আসিত যা অন্য সময় আসার কল্পনাও করিতে পারিত না—পাহাড়ের নিচে বনফুলের জঙ্গলেরও একটা কি বলিবার ছিল যেন। এই ভাষাটা ছবির ভাষা—প্রকৃতি এই ছবির ভাষায় কথা বলেন—এখানেও সে দেখিল গাছপালায়, উইঢিবির পাশে শুকনো খড়ের ঝোপে, দূরের বাঁশবনের সারিতে—সেই সব কথাই বলে—সেই সব ভাবই মনে আনে। প্রকৃতির এই ছবির ভাষাটা সে বোঝে। তাই নির্জ্জন মাঠে, প্রান্তরে বনের ধারে একা বেড়াইয়া সে যত প্রেরণা পায়—যে পুলক অনুভব করে তা অপূর্ব্ব—সত্যিকারের Joy of life—পায়ের তলায় শুকনো লতা-কাটি, দেয়াড়ের চরে রাঙা-রোদ মাখানো কষাড় ঝোপ, আকন্দের বন, ঘেঁটুবন—তার আত্মাকে এরা ধ্যানের খোরাক যোগায়, এ যেন অদৃশ্য স্বাতী নক্ষত্রের বারি, তারই প্রাণে মুক্তার দানা বাঁধে।

সন্ধ্যার পূরবী কি গৌরীরাগিণীর মত বিষাদ-ভরা আনন্দ, নির্লিপ্ত ও নির্ব্বিকার—বহুদূরের ওই নীল কৃষ্ণাভ মেঘরাশি, ঘন নীল, নিথর, গহন আকাশটা মনে যে ছবি আঁকে, যে চিন্তা যোগায়, তার গতি গোমুখী-গঙ্গার মত অনন্তের দিকে, সে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কথা বলে, মৃত্যুপারের দেশের কথা কয়,—ভালবাসা—বেদনা—ভালবাসিয়া হারানো—বহুদূরের এক প্রীতিভরা পুনর্জ্জন্মের বাণী···

এই সব শান্ত সন্ধ্যায় ইছামতীর তীরের মাঠে বসিলেই রক্তমেঘস্তূপ ও নীলাকাশের দিকে চাহিয়া চারিপাশের সেই অনন্ত বিশ্বের কথাই মনে পড়ে। মনে পড়ে বাল্যে এই কাঁটাভরা সাঁইবাবলার ছায়ায় বসিয়া বসিয়া মাছ ধরিতে ধরিতে সে দূর দেশের স্বপ্ন দেখিত—আজকাল চেতনা তাহার বাল্যের সে ক্ষুদ্র গণ্ডি পার হইয়া ক্রমেই দূর হইতে দূরে আলোকের পাখায় চলিয়াছে। এই ভাবিয়া এক এক সময় সে আনন্দ পায়—কোথাও না যাক্—যে বিশ্বের সে একজন নাগরিক, তা ক্ষুদ্র, দীন বিশ্ব নয়। লক্ষ কোটি আলোক-বর্ষ যার গণনার মাপকাঠি, দিকে দিকে অন্ধকারে ডুবিয়া ডুবিয়া নক্ষত্রপুঞ্জ, নীহারিকাদের দেশ, অদৃশ্য ঈথারের বিশ্ব যেখানে মানুষের চিন্তাতীত, কল্পনাতীত দূরত্বের ক্রমবর্দ্ধমান পরিধিপানে বিস্তৃত—সেই বিশ্বে সে জন্মিয়াছে···

ঐ অসীম শূন্যে কত জীবলোকে ভরা—কি তাদের অদ্ভুত ইতিহাস! অজানা নদীতটে প্রণয়ীদের কত অশ্রুভরা আনন্দতীর্থ—সারা শূন্য ভরিয়া আনন্দস্পন্দনের মেলা—ঈথারের নীল সমুদ্র বাহিয়া বহু দূরের বৃহত্তর বিশ্বের সে-সব জীবনধারার ঢেউ প্রাতে, দুপুরে, রাতে, নির্জ্জনে একা বসিলেই তাহার মনের বেলায় আসিয়া লাগে—অসীম আনন্দ ও গভীর অনুভূতিতেই মন ভরিয়া উঠে—পরে সে বুঝিতে পারে শুধু প্রসারতার দিকে নয়—যদিও তা বিপুল ও অপরিমেয়—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চেতনা-স্তরের আর একটা Dimension যেন তার মন খুঁজিয়া পায়—এই নিস্তব্ধ শরত-দুপুরে যখন অতীতকালের এমনি এক মধুর মুগ্ধ শৈশব-দুপুরের ছায়াপাতে স্নিগ্ধ ও করুণ হইয়া উঠে তখনই সে বুঝিতে পারে চেতনার এ স্তর বাহিয়া সে বহুদূরে যাইতে পারে—হয়ত কোন অজ্ঞাত সৌন্দর্য্যময় রাজ্যে, দৈনন্দিন ঘটনার গতানুগতিক অনুভূতিরাজি ও একঘেয়ে মনোভাব যে রাজ্যের সন্ধান দিতে পারিতই না কোনদিন।···

নদীর ধারে আজিকার এই আসন্ন সন্ধ্যায় মৃত্যুর নব রূপ সে দেখিতে পাইল। মনে হইল যুগে যুগে এ জন্মমৃত্যুচক্র কোন্ বিশাল-আত্মা দেব-শিল্পীর হাতে আবর্ত্তিত হইতেছে—তিনি জানেন কোন্ জীবনের পর কোন্ অবস্থার জীবনে আসিতে হয়, কখনও বা সঙ্গতি,

কখনও বা বৈষম্য—সবটা মিলিয়া অপূর্ব রসসৃষ্টি—বৃহত্তর জীবনসৃষ্টির আর্ট—

ছ'হাজার বছর আগে হয়ত সে জন্মিয়াছিল প্রাচীন ঈজিপ্টে—সেখানে নলখাগড়া প্যাপিরাসের বনে, নীলনদের রৌদ্রদীপ্ত তটে কোন্ দরিদ্রঘরের মা বোন্ বাপ ভাই বন্ধুবান্ধবদের দলে কবে সে এক মধুর শৈশব কাটাইয়া গিয়াছে—আবার হয়ত জন্ম নিয়াছিল রাইন নদীর ধারে—কর্ক-ওক্ বার্চ ও বীচ্ বনের শ্যামল ছায়ায় বনেদী ঘরের প্রাচীন প্রাসাদে, মধ্যযুগের আড়ম্বরপূর্ণ আবহাওয়ায়, সুন্দরমুখ সখীদের দলে। হাজার বছর পর আবার হয়ত সে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবে—তখন কি মনে পড়িবে এবারকারের এই জীবনটা ?—কিংবা কে জানে আর হয়তো এ পৃথিবীতে আসিবে না—ওই যে বটগাছের সারির মাথায় সন্ধ্যার ক্ষীণ প্রথম তারকাটি—ওদের জগতে অজানা জীবন-ধারার মধ্যে হয়ত এবার নবজন্ম ! কতবার যেন সে আসিয়াছে···জন্ম হইতে জন্মান্তরে, মৃত্যু হইতে মৃত্যুর মধ্য দিয়া···বহু, বহু দূরে অতীতে ও ভবিষ্যতে বিস্তৃত সে পথটা যেন বেশ দেখিতে পাইল···কত নিশ্চিন্দিপুর, কত অপর্ণা, কত দুর্গা দিদি—জীবনের ও জন্মমৃত্যুর বীথিপথ বাহিয়া ক্লান্ত ও আনন্দিত আত্মার যে কি অপরূপ অভিযান—শুধু আনন্দে, যৌবনে, জীবনে, পুণ্যে ও দুঃখে, শোকে ও শান্তিতে।···এই সবটা লইয়া যে আসল বৃহত্তর জীবন—পৃথিবীর জীবনটুকু যার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র—তার স্বপ্ন যে শুধুই কল্পনা-বিলাস এ যে হয় না তা কে জানে—বৃহত্তর জীবনচক্র কোন দেবতার হাতে আবর্ত্তিত হয় কে জানে ?···হয়ত এমন সব প্রাণী আছেন যাঁরা মানুষের মত ছবিতে, উপন্যাসে, কবিতায় নিজেদের শিল্পসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন না—তাঁরা এক এক বিশ্ব সৃষ্টি করেন—তার মানুষের সুখে-দুঃখে উত্থানে-পতনে আত্মপ্রকাশ করাই তাঁদের পদ্ধতি—কোন্ মহান্ বিবর্তনের জীব তাঁর অচিন্তনীয় কলাকুশলতাকে গ্রহে গ্রহে নক্ষত্রে নক্ষত্রে এ-রকম রূপ দিয়াছেন—কে তাঁকে জানে ?···

একটি অবর্ণনীয় আনন্দে, আশায়, অনুভূতিতে, রহস্যে মন ভরিয়া উঠিল। প্রাণবন্ত তার আশা, সে অমর ও অনন্ত জীবনের বাণী বেলতার রৌদ্রদগ্ধ শাখাপত্রের তিক্ত গন্ধ আনে —নীলশূন্যে বালিহাঁসের সাঁই সাঁই রব শোনায়। সে জীবনের অধিকার হইতে তাহাকে কাহারও বঞ্চনা করিবার শক্তি নাই—তার মনে হইল সে দীন নয়, দুঃখী নয়, তুচ্ছ নয়— ওটুকু শেষ নয়, এখানে আরম্ভও নয়। সে জন্মজন্মান্তরের পথিক আত্মা, দূর হইতে কোন্ সুদূরের নিত্য নূতন পথহীন পথে তার গতি, এই বিপুল নীল আকাশ, অগণ্য জ্যোতির্লোক, সপ্তর্ষিমণ্ডল, ছায়াপথ, বিশাল অ্যান্ড্রোমিডা নীহারিকার জগৎ, বহির্ষদ পিতৃলোক—এই শত, সহস্র শতাব্দী তার পায়ে-চলার পথ—তার ও সকলের মৃত্যুদ্বারা অস্পষ্ট যে বিরাট জীবনটা নিউটনের মহাসমুদ্রের মত সকলেরই পুরোভাগে অক্ষুণ্ণভাবে বর্ত্তমান—নিঃসীম সময় বাহিয়া সে গতি সারা মানবের যুগে যুগে বাধাহীন হউক।···

অপু তাহাদের ঘাটের ধারে আসিল। ওইখানটিতে এমন এক সন্ধ্যার অন্ধকারে বনদেবী বিশালাক্ষী স্বরূপ চক্রবর্তীকে দেখা দিয়াছিলেন কতকাল আগে !

আজ যদি আবার তাহাকে দেখা দেন !

—তুমি কে ?

—আমি অপু।

—তুমি বড় ভাল ছেলে। তুমি কি বর চাও ?

—অন্য কিছুই চাই নে, এ গাঁয়ের বনঝোপ, নদী, মাঠ, বাঁশবাগানের ছায়ায়, অবোধ, উদ্‌গ্রীব, স্বপ্নময় আমার সেই সে দশ বৎসর বয়সের শৈশবটি—তাকে আর একটিবার ফিরিয়ে দেবে দেবী ?

"You enter it by the Ancient way
Through Ivory Gate and Golden"···

ঠিক দুপুরে বেলা।

রাণী কাজলকে আটকাইয়া রাখিতে পারে না···বেজায় চঞ্চল। এই আছে, কোথা দিয়া সে কখন বাহির হইয়া গিয়াছে—কেহ বলিতে পারে না।

সে রোজ জিজ্ঞাসা করে—পিসিমা, বাবা কবে আসবে? কতদিন দেরি হবে?

অপু যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছিল—রাণুদি, খোকাকে তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি, ওকে এখানে রাখবে, ওকে ব'লো না আমি কোথা যাচ্ছি। যদি আমার জন্য কাঁদে, ভুলিয়ে রেখো—তুমি ছাড়া ওকাজ আর কেউ পারবে না।

রাণু চোখ মুছিয়া বলিয়াছিল—ওকে এ-রকম ফাঁকি দিতে তোর মন সরছে? বোকা ছেলে তাই বুঝিয়ে গেলি—যদি চালাক হ'ত?

অপু বলিয়াছিল, দেখ আর একটা কথা বলি। ওই বাঁশবনের জায়গাটা—তোমায় চল দেখিয়ে রাখি—একটা সোনার কৌটো মাটিতে পোঁতা আছে আজ অনেকদিন—মাটি খুঁড়লেই পাবে। আর যদি না ফিরি আর খোকা যদি বাঁচে—বৌমাকে কৌটোটা দিও সিঁদুর রাখতে। খোকাও কষ্ট পেয়ে মানুষ হোক—এত তাড়াতাড়ি স্কুলে ভর্ত্তি করার দরকার নেই। যেখানে যায় যেতে দিও—ছেলে যখন ঘাটে যাবে, তুমি নিজে নাইতে নিয়ে যেও—সাঁতার জানে না, ছেলেমানুষ ডুবে যাবে। ও একটু ভীতু আছে, কিন্তু সে ভয় এ-নেই তা-নেই বলে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা ক'রো না—কি আছে কি নেই তা বলতে কেউ পারে না রাণুদি। কোনোদিকেই গোঁড়ামি ভাল নয়—তা ওর ওপর চাপাতে যাওয়ারও দরকার নেই। যা বোঝে বুঝুক, সেই ভাল।

অপু জানিত, কাজল শুধু তার কল্পনা-প্রবণতার জন্য ভীতু। এই কাল্পনিক ভয় সকল আনন্দ রোমান্স ও অজানা কল্পনার উৎস-মুখ। মুক্ত প্রকৃতির তলায় খোকার মনের সব বৈকাল ও রাত্রিগুলি অপূর্ব্ব রহস্যে রঙীন হইয়া উঠুক—মনে প্রাণে এই তাহার আশীর্ব্বাদ।

ভবঘুরে অপু আবার কোথায় চলিয়া গিয়াছে। হয়ত লীলার মুখের শেষ অনুরোধ রাখিতে কোন্ পোর্তো প্লাতার ডুবো জাহাজের সোনার সন্ধানেই বা বাহির হইয়াছে। গিয়াছেও প্রায় ছ'সাত মাস হইল।

সতুও অপুর ছেলেকে ভালবাসে। সে ছেলেবয়সের সেই দুষ্টু সতু আর নাই, এখন সংসারের কাছে ঠেকিয়া সম্পূর্ণ বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। এখন সে আবার খুব হরিভক্ত। গলায় মালা, মাথায় লম্বা চুল। দোকান হইতে ফিরিয়া হাত মুখ ধুইয়া রোয়াকে বসিয়া খোল লইয়া কীর্ত্তন গায়। নীলমণি রায়ের দরুন জমার বাগান বিক্রয় করিয়া অপুর কাছে সত্তর টাকা প্যাইয়াছিল—তাহা ছাড়া কাটিহার তামাকের চালান আনিবার জন্য অপুর নিকট আরও পঞ্চাশটি টাকা ধার স্বরূপ লইয়াছিল। এটা রাণীকে লুকাইয়া—কারণ রাণী জানিতে পারিলে মহা অনর্থ বাধাইত—কখনই টাকা লইতে দিত না।

কাজলের ঝোঁক পাখির উপর। এত পাখি সে কখনও দেখে নাই—তাহার মামার বাড়ির দেশে ঘিঞ্জি বসতি, এত বড় বন, মাঠ নাই—এখানে আসিয়া সে অবাক্ হইয়া গিয়াছে। রাত্রে শুইয়া শুইয়া মনে হয় পিছনের সমস্ত মাঠ, বন রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে দৈত্যদানো, ভূত ও শিয়ালের ভিড়ে ভরিয়া গিয়াছে—পিসিমার কাছে আরও ঘেঁষিয়া শোয়। কিন্তু দিনমানে আর ভয় থাকে না, তখন পাখির ডিম ও বাসা খুঁজিয়া বেড়াইবার খুব সুযোগ। রাণু বারণ করিয়াছে—গাঙের ধারের পাখির গর্ত্তে হাত দিও না কাজল, সাপ থাকে। শোনে না, সেদিনও গিয়াছিল পিসিমাকে লুকোইয়া, কিন্তু অন্ধকার হইয়া গেলেই তার যত ভয়।

দুপুরে সেদিন পিসিমাদের বাড়ির পিছনে বাঁশবনে পাখির বাসা খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল। সবে শীতকাল শেষ হইয়া রৌদ্র বেজায় চড়িয়াছে, আকাশে বাতাসে বনে কেমন

গন্ধ। বাবা তাহাকে কত বনের গাছ, পাখি চিনাইয়া দিয়া গিয়াছে, তাই সে জানে কোথায় বনমরিচার লতায় থোকা থোকা সুগন্ধ-ফুল ধরিয়াছে. কেলেকোঁড়ার লতার কচি ডগা ঝোপের মাথায় মাথায় সাপের মত দুলিতেছে।

কখনও সে ঠাকুরদাদার পোড়ো ভিটাটাতে ঢোকে নাই। বাহির হইতে তাহার বাবা তাহাকে দেখাইয়াছিল, বোধ হয় ঘন বন বলিয়া ভিতরে লইয়া যায় নাই। একবার ঢুকিয়া দেখিতে খুব কৌতূহল হইল।

জায়গাটা খুব উঁচু ঢিবিমত। কাজল এদিক ওদিক চাহিদা ঢিবিটার উপরে উঠিল—তার পরে ঘন কুঁচকাঁটা ও শ্যাওড়া বনের বেড়া ঠেলিয়া নিচের উঠানে নামিল। চারিধারে ইট, বাঁশের কঞ্চি, ঝোপঝাপ। পাখি নাই এখানে? এখানে তো কেউ আসে না—কত পাখির বাসা আছে হয়ত—কে বা খোঁজ রাখে?

বসন্তবৌরী ডাকে—টুক্‌লি, টুক্‌লি—তাহার বাবা চিনাইয়াছিল, কোথায় বাসাটা? না, এমনি ডালে বসিয়া ডাকিতেছে?

মুখ উঁচু করিয়া খোকা ঝিক্‌ড়ে গাছের ঘন ডালপালার দিকে উৎসুক চোখে দেখিতে লাগিল।

এক ঝলক হাওয়া যেন পাশের পোড়ো ঢিবিটার দিক হইতে অভিনন্দন বহন করিয়া আনিল—সঙ্গে সঙ্গে ভিটার মালিক ব্রজ চক্রবর্ত্তী, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়, ঠাকুরদাদা হরিহর রায়, ঠাকুরমা সর্ব্বজয়া, পিসিমা দুর্গা—জানা অজানা সমস্ত পূর্ব্বপুরুষ দিবসের প্রসন্ন হাসিতে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—এই যে তুমি—আমাদের হয়ে ফিরে এসেছ, আমাদের সকলের প্রতিনিধি যে আজ তুমি—আমাদের আশীর্ব্বাদ নাও, বংশের উপযুক্ত হও।

আরও হইল। সোঁদালী বনের ছায়া হইতে জল আহরণরত সহদেব, ঠাকুরমাদের বেলতলা হইতে শরশয্যাশায়িত ভীষ্ম, এ ঝোপের ও ঝোপের তলা হইতে বীর কর্ণ, গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন, অভাগিনী ভানুমতী, কপিধ্বজ রথে সারথি শ্রীকৃষ্ণ, পরাজিত রাজপুত্র দুর্য্যোধন, তমসাতীরের পর্ণকুটিরে প্রীতিমতী, তাপসবধূ বেষ্টিতা অশ্রুমুখী ভগবতী দেবী জানকী, স্বয়ংবর সভায় বরমাল্যহস্তে ভ্রাম্যমাণা আনতবদনা সুন্দরী সুভদ্রা, মধ্যাহ্নের খররৌদ্রের মাঠে মাঠে গোচারণরত সহায়-সম্পদহীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পুত্র ত্রিজট—হাতছানি দিয়া হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—এই যে তুমি, এই যে আবার ফিরে এসেছ! চেন না আমাদের? কত দুপুরে ভাঙা জানালাটায় বসে বসে আমাদের সঙ্গে মুখোমুখি যে কত পরিচয়! এসো ···এসো···এসো···

সঙ্গে সঙ্গে রাণুর গলা শোনা গেল—ও খোকা, ওরে দুষ্টু ছেলে, এই এক গলা বনের মধ্যে ঢুকে তোমার কি হচ্ছে জিজ্ঞেস করি—বেরিয়ে আয় বলছি। খোকা হাসিমুখে বাহির হইয়া আসিল। সে পিসিমাকে মোটেই ভয় করে না। সে জানে পিসিমা তাকে খুব ভালবাসে—দিদিমার পরে এক বাবা ছাড়া তাকে এমন ভাল আর কেউ বাসে নাই।

হঠাৎ সেই সময় রাণুর মনে হইল অপু ঠিক এমনি দুষ্টু মুখের ভঙ্গি করিত ছেলেবেলায় —ঠিক এমনটি।

যুগে যুগে অপরাজিত জীবন-রহস্য কি অপূর্ব্ব মহিমাতেই আবার আত্মপ্রকাশ করে!

খোকার বাবা একটু ভুল করিয়াছিল।

চব্বিশ বৎসরের অনুপস্থিতির পর অবোধ বালক অপু আবার নিশ্চিন্দিপুরে ফিরিয়া আসিয়াছে।

'অপরাজিত' সম্পূর্ণ

কেদার রাজা

এক

দুপুর বেলায় নীলমণি চাটুজ্জে বাড়ি ফেরবার পথে গ্রামের মুদির দোকানে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ গো ছিবাস, কেদার রাজাকে দেখেছিলে আজ সারাদিন ?

ছিবাস আলকাতরার পিপে থেকে আলকাতরা বার করতে করতে জিজ্ঞেস করলে, কেন চাটুজ্জে মশায়, তেনার খবরে কি দরকার ?

নীলমণি বললেন, আরে, খাজনার অংশ নিয়ে গোলমাল বেধেছে খুব। বাটুল নাপিতের দরুন আমার অংশে আমি চার আনা করে বছরশাল খাজনা পাই, তা গাঁয়ের শুদ্দুর ভদ্দর কে না জানে ? এ বছরের খাজনা কেদার রাজা দিব্যি আদায় করে নিয়ে বসে আছে। দ্যাখো তো কি উৎপাত !

ছিবাস মুদীর মন তখন ছিল আলকাতরার পিপের মুখের ফাঁদলের দিকে। সে আপন মনে কি বললে, ভাল বোঝা গেল না। নীলমণি ছিবাসের সহানুভূতি না পেয়ে বোকার মত মুখখানা করে বাঁড়ুজ্জে পাড়ার দিকে অগ্রসর হলেন—উদ্দেশ্য, বৃদ্ধ বিশেশ্বর বাঁড়ুজ্জের বাড়ির সান্ধ্য পাশার আড্ডায় গিয়ে একবার খোঁজ নেওয়া।

পথেই একজন মধ্যবয়স্ক লোকের সঙ্গে দেখা।

নীলমণি চাটুজ্জে বললেন, আরে এই যে কেদার খুড়ো, তোমাকেই খুঁজছি।

লোকটি বললে, কেন বলো তো হে ?

নীলমণি যতটা জোরের সঙ্গে ছিবাসের দোকানে কথা বলেছিলেন, এখানে কিন্তু তাঁর গলা দিয়ে অত জোরের সুর বের হ'ল না।

—সেই বাটুল নাপিতের ভিটের খাজনা বাবদ কয়েক আনা পয়সা—

—সে পয়সা তুমি কোত্থেকে পাবে খুড়ো ?

নীলমণি ভ্রূ কুঁচকে বললে, কেন পাবো না ?

—ও তোমার নীলাম-খরিদা জমি নয়।

নীলমণি রাগের সুরে বললেন, নেই বললে সাপের বিষ থাকে না তো জমি কোন্ ছার। তবে সেটেলমেন্টের কাগজপত্রে তাই বলে বটে।

—ভুল বলে নীলমণি খুড়ো।

—সেটেলমেন্টের পড়চা ভুল বলে ?

নীলমণির বড় ছেলে হাজুকে এই সময় সাইকেলে চড়ে সতেজে যেতে দেখা গেল।

নীলমণি হেঁকে বললেন, ও অজিত—ও অজিত—

ছেলেটি সাইকেল থেকে নেমে বললে, বাবা, তুমি এখানে ?

—দরকার আছে, তুই একবার তোর দাদুর সঙ্গে যা দিকি ওর বাড়ি। খুড়ো, আমাদের অংশের খাজনা ক' আনা পয়সা অজিতের সঙ্গে দিয়ে দাও গিয়ে—

—কোথা থেকে দেবো এখন ? আজ পাঠিও না, যদি কাগজ-পত্র দেখে মনে হয় তোমার জমি ওর মধ্যে আছে—

নীলমণি বাধা দিয়ে বললেন, আলবাৎ আছে, হাজার বার আছে, ওর বাবা আছে—

লোকটা বললে, চটো কেন নীলু খুড়ো, থাকে পাবে। তবে এখন হাতে টানাটানি—

—টানাটানি তা আমার কি ? আমার তো না হলে চলে না। ওসব শুনলে আমার কাছারীর খাজনা মাপ করবে কি জমিদারে ?

গ্রামের পথ। চেঁচামেচি শুনে দু-চার জন লোক জড় হয়ে পড়ল।

—কি, কি, খুড়ো কি ?

—এই দ্যাখো না ক্যাদার খুড়োর কাণ্ডটা—নিজের অংশ আমার অংশ গিলে খেয়ে বসে আছে, এখন উপুড় হাত করবার নামটি নেই।

লোকে কিন্তু এ ঝগড়ায় উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিলে না, দু-একবার ঘাড় নেড়ে সরে পড়ল অনেকে। যারা দাঁড়িয়ে রইল, তারাও নীলমণি চাটুজ্জের পক্ষে কথা না বলে বরং এমন সব মতামত প্রকাশ করলে, যা কি না তাঁর বিরুদ্ধেই যায়।

নীলমণি অগত্যা অন্য দিকে চলে গেলেন। দু-একজন লোকে বললে, পথের মধ্যে এ রকম চেঁচামেচি কি ভাল ? ছিঃ—সামান্য কয়েক আনা পয়সার জন্যে—আর ও'র সঙ্গে ? কেউ সহানুভূতির সঙ্গে বলেন, ক্যাদার জ্যাঠা আপনি বাড়ি যান চলে—

তিনিও চলে গেলেন।

নবাগত দু-একজন লোক জিজ্ঞেস করলে জনতাকে—কি হয়েছে, কি ?

—ওই নীলু খুড়ো ক্যাদার রাজাকে পথের মধ্যে ধরেছে, আমার খাজনা শোধ করো, ভারি তো খাজনা, ক'আনা পয়সা—হুঃ—

—ক্যাদার রাজা কি বললে ?

—বলবে আর কি, সবাই জানে ওর অবস্থা কি। দিতে পারে যে দেবে এখুনি ? পয়সা ট্যাঁকে করে এনেছে নাকি।

—কেদার রাজা এসব গোলমালের ভেতর থাকতে চান না, কখনও পছন্দ করেন না। নির্ব্বিবাদী লোক। নীলু খুড়োর যা লোভ !

জনতা ক্রমে ভেঙে গেল।

যাঁর নাম কেদার রাজা, তিনি নিজের বাড়ি ঢুকলেন যখন, তখন বেলা প্রায় একটা। কেদারের স্ত্রী লক্ষ্মীমণি ছিলেন অপূর্ব্ব সুন্দরী, ইদানীং তাঁর সে চোখ-ধাঁধানো রূপের সামান্য কিছু অবশেষ যা ছিল তাতেও অপরিচিত চোখ তাঁর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকত। তাঁর মৃত্যু হয়েছে আজ এই বছর দুই।

বাড়িতে আছে শুধু মেয়ে শরৎসুন্দরী। মেয়ে মায়ের অতটা রূপ পায় নি বটে, তবুও এ গ্রামের মধ্যে তার মত সুন্দরী মেয়ে আর নেই।

—এত বেলা অবধি কোথা ছিলে ?···তোমায় নিয়ে আর পারিনে—তেল মাখো, নেয়ে এসো।

কেদার রাজা একটু অপ্রতিভ মুখে ঘরে ঢুকলেন। মেয়ে ভাত রেঁধে বসে আছে, তিনি আগে খেয়ে না নিলে সে-ও খেতে পারে না—হয়তো তার কষ্টই হচ্ছে। মুখ ফুটে তো কিছু বলতে পারে না ! না, বড় অন্যায় হয়ে গিয়েছে।

শরৎ বাবাকে তেল দিয়ে গেল। বললে, এত বেলায় আর নদীতে যেও না। জল তুলে দিচ্ছি, বাড়িতেই নাও।

এই কষ্টের ওপর আবার শরৎকে জল তুলতে হবে কুয়ো থেকে ? কেদার প্রতিবাদ করে বললে, না, আমি নদীতেই যাই। ডুব দিয়ে না নাইলে কি আর নাওয়া হ'ল ! চললাম, দে গামছাখানা—

শরৎ পাথরের খোরায় বাবার ভাত বাড়তে গেল। কাঁসার জিনিসপত্র ছিল বড় সিন্দুক বোঝাই—সব গিয়েছে একে একে—অভাবের তাড়নায় বিক্রী হয়ে, নয় তো বাঁধা দিয়ে। আর উদ্ধার করা যায় নি।

শরৎ বাবার খাবার জায়গা করে অপেক্ষা করতে লাগল। কেউ নেই কেদার রাজার

সংসারে—এই বিধবা মেয়ে শরৎ ছাড়া। মানে, এখন এই গ্রামের বাড়িতে নেই। কেদার রাজার একমাত্র পুত্র বহুদিন যাবৎ নিরুদ্দেশ। কোন সন্ধানই তার পাওয়া যায় নি গত দশ বৎসরের মধ্যে।

কেদার স্নান সেরে এসে খেতে বসলেন। পাথরের খোরায় বুকড়ি কালো আউশ চালের ভাত ও ডাঁটা চচ্চড়ি। খোরার পাশে একটা ছোট কাঁসার বাটিতে কাঁচা কলাইয়ের ডাল। কেদার নাক সিঁটকে বললে, কি ছাই-রাই-ই রাঁধিস রোজ, তোর রান্না নিত্যি খাওয়া এক ঝকমারি।

শরৎ চুপ করে রইল।

নীরবে কয়েক গ্রাস উদরস্থ করে ক্ষুধার প্রথম দিকের জ্বালাটা খানিকটা মিটিয়ে কেদার মেয়ের দিকে তিরস্কারসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, আহা, কি ভাল রাঁধবার ছিরি বা! আর এই একঘেয়ে ডাঁটা চচ্চড়ি, এ রোজ রোজ তুই পাস কোথায় বাপু!

—আমার কি দোষ, আমি কি বাজারে যাই না কি? যা পাই হাতের কাছে তাই রাঁধি। কে এনে দিচ্ছে বল না—

কেদার মেয়ের দিকে চেয়ে বললেন, তার মানে?

তার মানে কি শরৎ বাবাকে ভাল ভাবেই বুঝিয়ে বলতে পারত, ঝগড়ায় সে-ও কম যায় না—কিন্তু বাবার মেজাজ সে উত্তমরূপে জানে, এখুনি রাগ করে ভাতের থালা ফেলে উঠে যাবেন এখন। সুতরাং চুপ করেই গেল সে।

কেদার পাতের চারিদিকে ডাল-মাখা ভাত ফেলে ছড়িয়ে ছেলেমানুষের মত অগোছালো ভাবে আহার সম্পন্ন করে অপ্রসন্ন মুখে উঠে যাবার উদ্যোগ করতে শরৎ বললে—বসো বাবা, উঠো না, কিছু তো খেলে না, একটু তেঁতুল দিয়ে খেয়ে নাও—

কেদার রেগে বললেন, তোর মুণ্ডু দিয়ে খাবো অকর্ম্মার ঢেঁকি কোথাকার—অমন ছাই না রাঁধলেই না—

শরৎও প্রত্যুত্তরে বললে, তাই খাও, আমার মুণ্ডু খাও না—আমার হাড় জুড়ুক, আর সহ্যি হয় না—

মাঝে মাঝে পিতাপুত্রীতে এমন দ্বন্দ্ব বাধা এদের সংসারে সাধারণ ব্যাপারের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কেদার খারাপ জিনিস খেতে পারেন না, অথচ এদিকে সংসারের সচ্ছলতার যে রূপ, তাতে আউশ চালের ভাত জোটানোই দুষ্কর। এক পোয়া সর্ষের তেল কলুবাড়ি থেকে ধারে আসে, মাথায় মাখা সমেত সেই তেলে তিন দিন চালাতে হয়—সুতরাং তরকারিতে জল-আছড়া দিয়ে রান্না ছাড়া অন্য উপায় নেই। তরকারি মুখরোচক হয় কোথা থেকে?

অথচ শরৎ বাবাকে সে কথা বলতে পারে না। বড়ই রূঢ় শোনায় সেটা। বাবার অর্থ উপার্জ্জনের অক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয় তাতে। এক যদি তিনি নিজে বুঝতেন, তবে সব মিটেই যেত। কিন্তু বাবা ছেলেমানুষের মত অবুঝ, তিনি দেখেও কিছু দেখেন না, বুঝেও বোঝেন না—প্রৌঢ় পিতার এই বালস্বভাবের প্রতি স্নেহ ও করুণা-বশতঃই শরৎ কিছু বলতে পারে না তাঁকে।

তার পর সে বাবার পাতেই খেতে বসে গেল।

দিবানিদ্রা কেদার রাজার অভ্যাস নেই, দুপুরে খাওয়ার পর তিনি আটদশগাছা ছিপ—নানা আকারের, পুঁটি মাছ থেকে রুই কাৎলা ধরা পর্য্যন্ত, সুতো—বঁড়শি বাঁধা, মাছধরা ভাঁড়, চারকাঠি, মশলা প্রভৃতি মাছ ধরবার সরঞ্জাম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নিষ্কর্ম্মার কর্ম্ম।

ওপাড়ার গণেশ মুচি একাজে তাঁর সহকর্মী ও বন্ধু। গণেশ এসে বললে, বাবাঠাকুর, তৈরী ?

—সব ঠিক আছে, কোথায় যাবি, গড়ের পুকুরে না নদীতে ?

—চারকাঠি বেঁধেছ কোথায়?

কেদার রাজা চোখে-মুখে স্বীয় কর্মদক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার আত্মপ্রসাদসূচক একখানি হাস্য বিস্তার করে বললেন, ওরে বেটা, আজ ত্রিশ বছর বর্শেলগিরি করছি এটুকু আর বুঝিনে ? ঘোলার শেষের গাঙ, সেখানে চারকাঠি না বেঁধে বাঁধব কি না পুকুরে ?···হ্যা-হ্যা হ্যা—

গণেশ কেদার রাজার ছিপ ও সরঞ্জাম বয়ে নিয়ে চলল নিজের ছিপগুলোর সঙ্গে।

গড়ের পুকুরের ধারে বেতস ও কণ্টকগুল্মের দুর্ভেদ্য জঙ্গল। গত বর্ষার জলে সে জঙ্গল বেড়ে মধ্যেকার অন্ধকার সুঁড়ি পথটাকে প্রায় ঢেকে দিয়েছে—তার মধ্যে দিয়ে দুজনে সন্তর্পণে চলল, পায়ের পাতায় কাঁটা না মাড়িয়ে ফেলে।

পাড়ের ওপারে যেখানে জঙ্গলটা একটু পাতলা হয়ে এসেচে, সেখানে পেঁছে গণেশ বললে, আমার কিন্তু বাবাঠাকুর, জোড়া দেউলের নীচে চারকাঠি পোঁতা, দেখে যাবো না একবারটি ?

কেদার বললেন, উঃ, ব্যাটা বড় চালাক তো ! ওখানে পুঁতেছিস্ তা আমাকে বলিস নি মোটেই ? চল দেখি—

গড়ের দীঘির বাঁ পাড়ে জঙ্গলের মধ্যে থেকে সেকালের ভাঙা প্রকাণ্ড দেউলের চূড়া যেখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, তারই নীচে দীঘির জলে গণেশ গিয়ে নামল।

দীঘিটা এত বড় যে এপার থেকে ওপারের গাছপালা যেন মনে হয় ছোট। অনেকগুলো দেউল এখানে আছে গড়ের দীঘির গভীর জঙ্গলের মধ্যে—কোনো কোনো মন্দিরের গায়ে কালো স্লেট পাথরের ওপর মন্দির-নির্মাতার নাম ও সন তারিখ লেখা। একটার ওপর সন লেখা আছে ১০২৪। এ থেকে দেউলগুলির প্রাচীনত্ব অনুমান করা কঠিন হবে না।

গণেশ বললে, ভাল মাছ লেগেছে বাবাঠাকুর, এখানেই বসবা এসো—

—আরে না না, চল গাঙে—এখেনে আবার মাছ—

—আপনি নেমে দ্যাখোই না—আমি কি মস্করা করছি তোমার সঙ্গে ?

দুজনে পুকুরের ধারেই মাছ ধরতে বসে গেল। কেদার রাজা যা হুকুম করেন, গণেশ মুচি তখনই তা তামিল করে, যদিও কার্যতঃ সে কেদার রাজার ইয়ার।

—তামাক সাজ গণ্শা, আর পাতা ভেঙে নিয়ে বসবার জায়গা করে দে দিকি !

গণেশ পাড়ের ওপরকার জঙ্গল থেকে বন-ডুমুরের বড় বড় কচি পাতা ভেঙে এনে বিছিয়ে দিলে। গণেশ নিজে কিন্তু সেখানে বসল না—বললে, আমি এই বাঁধাঘাটের সানে গিয়ে বসি বাবাঠাকুর—

একটু দূরে প্রাচীন দিনের প্রকাণ্ড বাঁধাঘাট যেখানে ছিল, এখন সেখানে পুকুরপাড়ে সোপানশ্রেণীর চিহ্ন দেখা যায় মাত্র। ঘাট ব্যবহার করা চলে না, তবে ভাঙা চাতালে বসে মাছ ধরা চলতে পারে এই পর্যন্ত।

দীঘির চার ধারে বড় বড় বট, শিমুল, ছাতিম গাছের বহুকালের বন। ঘাটের ওপরকার বৃদ্ধ বট গাছটা দীঘির ঘাটের বাঁধা সোপানশ্রেণীর ফাটলে ফাটলে শিকড় চালিয়ে যদি তার কয়েকটা ধাপকে না ধরে রাখতো, তবে প্রাচীন দিনের ঘাটের একখানা ইঁটও আজ খুঁজে পাওয়া যেতো কি না সন্দেহ। এর প্রধান কারণ এই সব ধ্বংসস্তূপের পোড়ো ইঁট দিয়ে এ গ্রামের বহু গৃহস্থের বাড়ি তৈরি হয়ে আসছে আজ একশো বছর ধরে।

ঘণ্টা-দুই পরে নিবিড় ছায়া নামল দীঘিটার চার পাশ ঘিরে। চার ধারেই বন, বেলা তিনটে বাজতে না বাজতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে এ বিচিত্র কথা কিছু নয়। কেদার হেঁকে বললেন, ওরে গণ্শা শীত শীত করছে, একটু ভাল করে তামাক সাজ্, ইদিকে আয় তো—

গণেশের ছিপের ফাৎনা বড় মাছে দু-দুবার নিতলি করে নিয়ে গেছে সবে মাত্র, তার এখন ছিপ ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছে না থাকলেও কেদারের আদেশ সে অমান্য করতে পারল না। বিরক্ত মুখে উঠে এসে বললে—কিছু হচ্ছে-টচ্ছে বাবাঠাকুর ?

—তোর কি হল ?

—অই অমনি—তেমন কিছু নয় !

বড় মাছের ঘাই মারার কথা গণেশ বললে না, কোনো বর্শেলই বলে না, যদি বাবাঠাকুর এখান থেকে উঠে গিয়ে ওখানে বসে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে কেদারের ছিপে দৈবক্রমে একটা বড় রুই মাছ টোপ গিলে ফাৎনা ডুবিয়ে একেবারে নিতলি হয়ে গেল। বহু ধস্তাধস্তি করে সুতো লম্বা করে ছেড়ে মাছটাকে অনেক খেলিয়ে কেদার সেটা ডাঙায় তুললেন।

গণেশ ছুটে এসেছিল তাঁকে সাহায্য করতে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গণেশের সাহায্য তাঁর দরকার হ'ল না। কেদার হাঁপিয়ে পড়েছিলেন মাছটার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে, তিনি বললেন—তোল্ রে গণ্শা, ক'সের বলে মনে হয় দ্যাখ তো ?

গণেশ কানকো ধরে মাছটাকে তুলে বার দুই ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, তা তিনসের চোদ্দ-পোয়া হবে বাবাঠাকুর, আপনাদের বরাত—আমার ছিপে ঘাই মেরেই পুকুরের মাছ নিউদ্দিশ হয়ে গেল—

নিরুদ্দেশ হওয়ার তুলনাটি কেদারের ভাল লাগল না, হঠাৎ মনে পড়ে গেল তাঁর পুত্রের কথা। আজ দশ বৎসর···হাঁ, প্রায় দশ বৎসর যাবৎ সে-ও নিরুদ্দেশ।···কোথায় আছে, আদৌ বেঁচে আছে কি না, কে বলবে ? সচ্ছল অবস্থার লোক যারা, তারা এ অবস্থায় খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়, কত খোঁজখবর করে। দরিদ্র কেদারের সে সব করবার সঙ্গতি কৈ ? —নীরবে ও নিশ্চেষ্ট ভাবে সব সয়ে থাকতে হয়েছে।

কি করবেন উপায় নেই।

কেদার নিজের অলক্ষিতে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, নিয়ে চল্ রে গণেশ, পৌঁছে দে মাছটা বাড়িতে। একেবারে কেটে দিয়ে তুইও কিছু নিয়ে যা—চল্।

সন্ধ্যার অন্ধকার গড়ের পুকুরের বনে দিব্যি ঘনিয়েছে—হেমন্তের প্রথম, ছাতিম ফুলের উগ্র গন্ধে ভরা অন্ধকার বনপথ বেয়ে দুজনে বাড়ির দিকে ফিরলে।

দুই

শরৎ বাবার সন্ধ্যা-আহ্নিকের জায়গা করে বসে ছিল, কিন্তু কেদার এখনও ফেরেন নি। বাইরের দোরের কাছে খুটখাট্ শব্দ শুনে শরৎ ডেকে বললে, কে ? বাবা নাকি ?

শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। শরৎ চেঁচিয়ে বললে, দেখে আসি আবার কে, বাবার এখনও দেখা নেই—কোথায় গিয়ে বসে আছে তার ঠিক কি ? হাড় ভাজাভাজা হয়ে গেল আমার—

দরজার কাছে কেউ কোথাও নেই। শরৎ মুখ বাড়িয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাড়ির রোয়াকে এসে বসল।

খানিকটা পরে আবার বাইরের দরজায় খুট্‌খুট্ শব্দ। এবার যেন বেশ একটু জোরে

জোরে। শরৎ এবার পা টিপে টিপে উঠে গিয়ে বাইরের দরজার খিলটা খুলে ফেলল। বাইরে বেশ অন্ধকার, কিন্তু কোথায় কে ?

শরতের ভয় ভয় করতে লাগল। তবুও সে খুব সাহসী মেয়ে—এই জঙ্গলের মধ্যে পোড়ো বাড়ির ধ্বংসস্তূপ চারিদিকে, কত কাণ্ড সেখানে ঘটে—একা শরৎ কত রাত্রি পর্য্যন্ত বাবার ভাত নিয়ে বসে থাকে। ভয় করলে চলে না তার। মাঝে মাঝে দু-একটা ঘটনাও ঘটে।

ঘটনা অন্য বেশী কিছু নয়, খুট্‌খাট্‌ শব্দ, একা রান্নাঘরে যখন শরৎ রাঁধছে—বিশেষ করে সন্ধ্যাবেলা, তখন কে কোথায় ফিস্‌ফিস্‌ করে কি যেন বলে ওঠে—বেশ কি একটা কথা বললে সেটা বোঝা যায়, কিন্তু কথাটা কি, তা বোঝা যায় না।

এ-সব গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে শরতের।

শরৎ বাপের বাড়িতেই আছে আজীবন, মধ্যে বিয়ের পর বছর-তিনেক শ্বশুরবাড়ি ছিল। শিবনিবাসে ওর শ্বশুরবাড়ি, রাণাঘাটের কাছে। স্বামী মারা যাওয়ার পর আর সেখানে যায় নি, তার কারণ মায়ের মৃত্যুর পর পিতার সংসারে লোক নেই, কে এই বয়সে তাঁকে দুটি রেঁধে দেয়, কে একটু জল দেয়—এই ভাবনা শরতের সব চেয়ে বড় ভাবনা। শরতের শ্বশুরবাড়ির অবস্থা নিতান্ত খারাপ নয়, অন্ততঃ এখানকার চেয়ে অনেক ভাল—কিন্তু দরিদ্র পিতাকে একা ফেলে রেখে সে সেখানে গিয়ে থাকতে পারে কি করে ?

তার শ্বশুর বলে পাঠিয়েছিলেন, এখানে যদি না আস বৌমা, তা হলে ভবিষ্যতে তোমার প্রাপ্য অংশ সম্বন্ধে আমি দায়ী থাকব না।

শরৎ তার উত্তরে বলে দেয়—আপনার সম্পত্তি আপনি যা খুশি করবেন, আমার কি বলার আছে সে সম্বন্ধে ? বাবাকে ফেলে আমার স্বর্গে গিয়েও সুখ হবে না।

আজ বছর দুই আগে মা মারা যান, এই দু-বছরের মধ্যে শ্বশুর সাত বার লোক পাঠিয়েছিলেন।

শরৎ জানে, বাবার অবর্ত্তমানে এ-গাঁয়ে তার চলা-চল্‌তির মহা অসুবিধে। বাবা সামান্য কিছু খাজনা আদায় করেন, দু-তিন বিঘে ধান করেন,—কষ্টেসৃষ্টে একরকম চলে। কিন্তু সে একা থাকলে এ দুটি আয়ের পথও বন্ধ। গ্রামে লোক নেই, থাকলেও সবাই নিজেরটা নিয়ে ব্যস্ত, শরতের মুখের দিকে চেয়ে কেউ নিজের কাজের ক্ষতি করে শরতের কাজ করে দেবে—তেমন প্রকৃতির লোক এ গাঁয়ে নেই।

সব জেনে শুনেও শরৎ এখানেই রয়ে গিয়েছে। তার অদৃষ্টে যা ঘটে ঘটুক।

সন্ধ্যার পর দেড় ঘণ্টা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে।

কেদারের সংকোচমিশ্রিত কাশির আওয়াজ এই সময় বাইরের উঠানে পাওয়া গেল।

শরৎ বললে, কে ? বাবা ?

—হ্যাঁ—ইয়ে—এই যে আমি—

শরৎ ঝাঁঝালো গলায় বলে উঠল—হ্যাঁ, তুমি যে তা তো বেশ বুঝলাম। এত রাত পর্য্যন্ত এই জঙ্গলের মধ্যে একা মেয়েমানুষ বসে আছি, তা তোমার কি একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই—জিজ্ঞেস করি ?

কেদার কৈফিয়তের সুরে বলতে গেলেন, তাঁর নিজের কোন দোষ নেই—তিনি এক ঘণ্টা আগেই আসতেন। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট পঞ্চানন বিশ্বাস তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল একটা গুরুতর বিষয়ের পরামর্শের জন্যে—সেখানেই দেরি হয়ে গেল।

শরৎ বললে—তোমার সঙ্গে কিসের পরামর্শ ? ভারি পরামর্শদাতা তুমি কি না ? তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করলে তাদের কাজ আটকে গিয়েছে ভারি—

কেদার নীরবে হাত পা ধুয়ে ঘরে উঠলেন, মেয়ের সঙ্গে বেশি তর্কাতর্কি করে ঝগড়া

বাধাতে তিনি এখন ইচ্ছুক নন—নির্বিরোধী লোক কেদার।

মেয়ে আহ্নিকের জায়গা করে বসে আছে দেখে কেদার একটু বিপদে পড়লেন—সেদিকে চেয়ে বললেন—সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে এখন আবার—

—তোমার যত সব ছুতো—সন্ধ্যে উৎরে গেলে বুঝি আহ্নিক করে না? তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, পরকালের কাজটা এখন থেকে করো একটু—

কেদার অপ্রসন্ন মুখে আহ্নিক করতে বসলেন।

বাইরে থেকে কে ডাকল—ও শরৎদি—আলো ধরো, উঠোনে যে জঙ্গল করে রেখেছ—

হাসতে হাসতে একটি ষোল-সতেরো বছরের শ্যামবর্ণ মেয়ে ঘরে ঢুকল। কেদারকে দেখে সংকোচের সঙ্গে গলার সুর নীচু করে শরৎকেই বললে, জ্যাঠামশায় ফিরেছেন কখন? আমি ভাবলাম বুঝি একা—

—বাবার কথা আর বলিস্ নে ভাই—তিনটের সময় বেরিয়েছিলেন, আর এই এখন এসে আহ্নিক করতে বসলেন—

নবাগত মেয়েটি হাসিহাসি মুখে চুপ করে রইল।

কেদার দায়-সারাগোছের অবস্থায় সন্ধ্যাহ্নিক সাঙ্গ করে বললেন, আছে নাকি কিছু?

—হ্যাঁ, বোসো। বাতাবী লেবু খাবে? মিষ্টি লেবু, ফকিরচাঁদের মা দিয়ে গেল আজ ওবেলা। আর এই নারকোলের নাড়ু দুটোও দিয়ে গেল, জল খেয়ে নাও—

জলযোগান্তে কেদার একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, তা হলে রাজলক্ষ্মী তো আছিস মা, আমি ততক্ষণ একটুখানি—বরং—ওই হরি বাঁড়ুজ্জের ওখান থেকে—

—না, যেতে হবে না বাবা। বোসো। রাজলক্ষ্মী দুপুর রাত পর্যন্ত আমায় আগলে বসে থাকবার জন্যে এসেছে নাকি? ও এখুনি চলে যাবে—

—আমি যাবো আর আসবো মা—এই আধ ঘণ্টার মধ্যে—

—না, তোমার আধ ঘণ্টা আমি খুব ভাল জানি—যেতে হবে না, বোসো তুমি। তার চেয়ে বসে একটা গল্প করো—

রাজলক্ষ্মীও আবদারের সুরে বললে, হ্যাঁ জ্যাঠামশাই, বলুন না একটা গল্প। আপনার মুখে কতকাল গল্প শুনি নি। সেই আগে আগে বলতেন—

অগত্যা কেদারকে বসতে হ'ল। খাপছাড়া ভাবে একটা গল্পের খানিকটা বলে তিনি কেমন উসখুস করতে লাগলেন। মন ঠিক গল্পে নেই তাঁর, এটা বেশ বোঝা যায়। শরৎ বললে—কোথায় যাবে বাবা? বিশ্বেসকাকার ওখানে কি বড্ড বেশি দরকার তোমার?

কেদার উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলেন, বিশেষ জরুরী, দুবার লোক পাঠিয়েছে—জমিজমা নিয়ে একটা গোলমাল বেধেছে, তাই আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চায় কি না? তাই—

শরৎ মুখে কিছু বললে না। পঞ্চানন বিশ্বাস ঘুণ বিষয়ী ব্যক্তি, সে লোক তার বাবার মত ঘোর অবৈষয়িক লোকের সঙ্গে পরামর্শ করবার আগ্রহে দু-দুবার লোক পাঠিয়েছিল, একথা বিশ্বাস করা শক্ত। তা নয়, আসলে বাবা বারুইপাড়ার কৃষ্ণযাত্রার দলের আখড়ায় গিয়ে এখন বেহালা বাজাবেন, এই তাঁর বৈষয়িক কাজ। যদি কেউ লোক পাঠিয়ে থাকে, সেখান থেকেই পাঠানো সম্ভব।

রাজলক্ষ্মী বললে, দিদি, উনি যান তো একটু ঘুরে আসুন—

শরৎ বললে, হ্যাঁ উনি গেলে রাত এগারোটার কম ফিরবেন না, আমি একা কি করে এখানে বসে থাকি বল্ তো? থাকবি তুই আমার সঙ্গে—বাবা না আসা পর্যন্ত? বলছিস্ তো খুব যেতে—

কেদার বিব্রত ভাবে বলে উঠলেন, আরে না-না, ওর থাকার দরকার হবে না, আমি যাব আর আসব, এই ধর গিয়ে ঘণ্টাখানেক, দেরি কিসের? যাই তা হলে—?

শরৎ বললে, ন'টার মধ্যে যদি না ফিরে আস, তবে আমি কি রকম রাগ করি দেখো এখন আজ—রাজলক্ষ্মী এখন রইল, তুমি এলে তবে যাবে—

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে বললে, বেশ ভালই তো জ্যাঠামশাই, যান আপনি—আমি ততক্ষণ দিদির কাছে থাকি। আসবেন তো শীগ্গিরই—?

কেদার আর দ্বিরুক্তি না করে বেরিয়ে গেলেন। শরৎ ঠিক বুঝতে পারে নি, কৃষ্ণযাত্রার দলে বেহালা বাজাতে তিনি যাচ্ছিলেন না।

কেদারের বাড়িটার ধারে ধারে অনেক দূর পর্যন্ত ভাঙা ও পুরোনো বাড়ি, সবগুলো ভাঙা নয়, তবে পরিত্যক্ত এবং সাপখোপের বাস হয়ে আছে বর্ত্তমানে। চার-পাঁচ রশি কি তা ছাড়িয়েও একটা পুরোনো আমলের উঁচু সদর দেউড়ির ভগ্নাবশেষ আজও বর্ত্তমান। এটা পার হয়ে দুধারে সেকালের আমলের নীচু লম্বা কুঠুরির সারি, কোন কালে এর নাম ছিল কাছারিবাড়ি, এখনও সেই নাম চলে আসছে। এর অর্দ্ধেকখানি এখন মাটির ভেতর বসে গিয়েছে, দেওয়াল সেকালে হয়তো চূণকাম করা ছিল, এখন শেওলা ছাতা ধরে সবুজ রং দাঁড়িয়েছে। কোনও একটা ঘরেও ছাদ নেই—মেজেতে বনজঙ্গল, শালকাঠের বড় বড় কড়ি আর ভাঙা ইঁটের স্তূপের ওপর বড় গাছ—এমন কি দেউড়ির ঠিক পাশেই এক কাছারিবাড়ির একটা অংশে প্রকাণ্ড এক তিন-পুরুষে বটগাছ—যার বয়স কোনক্রমেই একশ বছরের কম হবে না, বেশিও হতে পারে।

কাছারিবাড়ি পার হয়ে আর একটা দেউড়ি—এর নাম নহবৎখানা—বর্ত্তমানে—কিছুই অবশিষ্ট নেই—দুটি মাত্র উঁচু থাম ও তাদের মাথায় একটা ফাটা খিলান ছাড়া। থামের এক-পাশে এক সারি সিঁড়ি খানিকটা ভেঙে পড়ে গিয়েছে—বিছুটি গাছের জঙ্গলে থাম আর সিঁড়ির ধাপগুলো ঢেকে রেখেছে। হঠাৎ কোন নবাগত লোক এসব জায়গায় সন্ধ্যার পর এলে তার দস্তুরমত ভয় হওয়ার কথা, কিন্তু কেদার নির্বিকার ভাবে এসব পার হয়ে গিয়ে বড় একটা খালের মধ্যে নামলেন।

এই খালটাকে এখানে গড়ের খাল বলে, কিন্তু এতে জল নেই, খানিকটা খুব নাবাল জমি মাত্র, পশ্চিম কোণের এক জায়গায়—সদর দেউড়ি থেকে প্রায় এক মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে—এই খালের খানিকটায় জল আছে—কচুরি পানায় ভর্ত্তি।

পূর্ব্বদিকের বাহু ধরে এলে গড়ের খালের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত বিরাট ধ্বংসস্তূপে সম্পূর্ণরূপে জঙ্গলাবৃত, দিনমানে বাঘ লুকিয়ে থাকতে পারে এমন ঘন কাঁটা আর বেত বন, বন্যশূকরের ভয়ে সে দিকে বড় কেউ একটা যায় না।

গড়ের এই দিকটায় বিস্তর বড় বড় ছাতিম গাছ—মানুষের হাতে পোঁতা গাছ নয়, বন্য বৃক্ষের বীজের বিস্তারে উৎপন্ন।

সেখানে এখনও একটু জল আছে, সেখানকার উঁচু পাড়ে বসে দেখলে এই অংশের দৃশ্য মনে কেমন এক ধরনের ভয়-মিশ্রিত সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে। কেদার অবিশ্যি এসবের দিকে নজর না দিয়েই খালের নাবাল জমি পেরিয়ে ওধারে গিয়ে উঠলেন এবং আরও খানিকটা হেঁটে ছিবাস মুদির দোকানে উপস্থিত হলেন।

ছিবাস মুদির চালাঘরে ঝাঁপ পড়ে গিয়েছে, কারণ এমন গাঁয়ে এই রাতে খরিদ্দার কেউ আসবে না—কিন্তু ঘরের ভেতরে চার-পাঁচ জন লোক বসে। ছিবাস বললে, আসুন বাবাঠাকুর, আপনার জন্য সব বসে—বলি, বলে গেলেন আসচেন তা দেরি হচ্চে কেন—আসুন বসুন—

এখানে এখন গান-বাজনা হবে—শরৎসুন্দরী ঠিকই আন্দাজ করেছিল, তবে বারুইপাড়ার কৃষ্ণযাত্রার দলে নয়, এই যা তফাৎ। সবাই সরে বসে কেদারকে বসবার জায়গা করে দিলে।

কেদার মহানন্দে বেহালা ধরলেন, তাঁর বেহালা বাজানোর নাম আছে এ গ্রামে। অনেকক্ষণ ধরে গান-বাজনা চলল, আরও দু-তিনজন লোক এসে গান-বাজনায় যোগ দিলে—তবে গ্রামের ভদ্রলোক কেউ আসে নি।

কেদার বেহালায় কসরৎ দেখালেন প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে, তার পর আবার গান শুরু হল। রাত আন্দাজ এগারটার সময় কি তারও বেশী যখন, গানের আড্ডা তখন ভাঙল।

একজন বললে, বাবাঠাকুর, আলো এনেছেন কি, না হয় চলুন আলো ধরে দিয়ে আসি খাল পার করে—

কেদারের হুঁশ হল এতক্ষণ পরে, বাইরে এসে বললেন, তাই তো, চাঁদ অস্ত গেল কখন? বড্ড অন্ধকার দেখছি যে—

পঞ্চমীর চাঁদের অবিশ্যি যতক্ষণ থাকা সাধ্য ততক্ষণ সে বেচারী আকাশে ছিল, তার কোন কসুর নেই। কেদার রাজার জন্যে দুপুর রাতে পর্যন্ত অপেক্ষা করা তার সাধ্যাতীত।

দাসু কুমোর বললে—আমার সঙ্গে যদি কেউ আসে আমি বাবাঠাকুরকে খাল পার করে দিয়ে আসি—

দু-তিনজন যেতে রাজী হল—একা রাত্রে কেউ ওদিকে যেতে রাজী হয় না, গড়ের মধ্যে আছে অনেক রকম গোলমাল। এ অঞ্চলে সবাই তা জানে। কেদার কিন্তু নির্ভীক লোক, তিনি কোন লোক সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজী নন—দরকার নেই কিছু। তিনি এমনিই বেশ যাবেন।

তবুও জন চারেক লোক পাঁকাটির মশাল জ্বালিয়ে তাঁকে গড়ের খাল পার করে দিয়ে এল। এত রাত হয়েছে কেদার সেটা পূর্বে বুঝতে পারেন নি, তা হলে এত দেরি করতেন না, ছিঃ, কাজ বড় খারাপ হয়ে গিয়েছে!

কেদার বাড়ি ঢুকে দেখলেন মেয়ে খিল বন্ধ করে ঘরের মধ্যে শুয়ে। মেয়েকে একা এত রাত পর্যন্ত এই বনে ঘেরা নির্জন বাড়িতে ফেলে বাইরে ছিলেন বলে মনে মনে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেন, তবে কিনা এ অনুতাপ তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। আর মজা এই যে প্রতিরাত্রে ফিরবার সময়েই এই অনুতাপ মনের মধ্যে হঠাৎ আবির্ভূত হয়, এর আসা আর যাওয়া দুই-ই অদ্ভুত ধরনের আকস্মিক, ন্যায়শাস্ত্রের 'বেগবেগা' জাতীয় পদার্থ, আসবার সময় যত বেগে আসে, ঠিক তত বেগেই নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়—মনে এতটুকু চিহ্নও রেখে যায় না।

শরৎ উঠে বাবাকে দোর খুলে দিলে, ভাত বেড়ে খেতে দিলে। তার মনে রাগ অভিমান কিছুই নেই—সে জানে এতে কোনো ফলও নেই—বাবা যা করবেন তা ঠিকই করবেন। ও'র ঘাড়ে ভূত আছে, সে-ই ও'কে চরিয়ে নিয়ে বেড়ায়, উনি কি করবেন?

কিন্তু কেদারের ঘাড়ে সত্যিই ভূত চেপে আছে বটে। খাওয়াদাওয়ার পরে অত গভীর রাত্রেও বাবাকে বেহালার লাল খেরোর খোল খুলতে দেখে সে আর কথা না বলে থাকতে পারলে না। বাবা এখন আবার বেহালা বাজাতে বসলেই হয়েছে!

কেদার ব্যাপারটাকে সহজ করবার চেষ্টা করলেন। বেহালা যে তিনি ঠিক বাজাতে চাইছেন এখন তা নয়, তবে একটা সুর মাথার মধ্যে বড় ঘুরছে—সেইটে একবারটি সামান্য একটু ভেঁজে নিতে চান।

শরৎ বললে, না বাবা, তোমার ঘুম না আসতে পারে, তোমার খিদে নেই, তেষ্টা নেই, শরীরের ক্লান্তি নেই, ঘুম নেই—সব জয় করে বসে না হয় আছ, কিন্তু আমি এই সারাদিন খাটছি, তুমি এখন রাতদুপুরে বেহালা নিয়ে কোঁকর কোঁকর জুড়ে দিলে কানের কাছে আমার চোখে ঘুম আসবে?

কেদার বললেন, আমি—তা—না হয় দেউড়িতে গিয়ে বসি মা—তুই ঘুমো—

—না তা হবে না। আমি মাথা কুটে মরবো, এই এত রাত্রে অন্ধকারে সাপখোপের মধ্যে তুমি এখন জঙ্গলের মধ্যে দেউড়িতে বসে বেহালা বাজাবে? রাখ ওসব—

কেদার অগত্যা বেহালা রেখে দিলেন। মেয়েমানুষদের নিয়ে মহা মুশকিল। এরা না বোঝে সঙ্গীতের কদর, না বোঝে কিছু। তাঁর মাথায় সত্যিই একটা চমৎকার সুর খেলছিল, এই দুপুর নিস্তব্ধ নির্জন রাত্রি, সুরটা বেহাগ—রক্তমাংসের শরীরে এ সময় তারের ওপর ছড় চালানোর প্রবল লোভ সামলানো যায়?

মেয়েমানুষ কি বুঝবে?

কেদার বিকেলবেলা গোঁয়োখালির হাটে যাবার পথে সাধু সেকরার দোকানে একবারটি ঢুকলেন, উদ্দেশ্য তামাক খাওয়াও বটে, অন্য একটি উদ্দেশ্যও ছিল না যে এমন নয়। সাধু সেকরার বয়েস হয়েছে, নিজে সে একটি হরিনামের ঝুলি নিয়ে একটা জলচৌকিতে বসে মালাজপ করে, তার বড় ছেলে নন্দ দোকান চালায়। ব্রাহ্মণসজ্জনে সাধুর বড় ভক্তি—কেদারকে দেখে সে হাত জোড় করে বললে—আসুন, ঠাকুরমশায়, প্রণাম হই—ওরে টুলটা বার করে দে—ব্রাহ্মণের হুঁকোতে জল ফেরা—

কেদার বললেন—তার পর, ভাল আছ সাধু? তোমার কাছে এসেছিলাম একটা কাজে—আমার কিছু টাকার দরকার—তোমার এ বছরের খাজনাটা এই সময়—

সাধুর অবস্থা ভালই, কিন্তু মুখে মিষ্ট হলেও পয়সাকড়ি সম্বন্ধে সে বেজায় হুঁশিয়ার। কেদারকে যা হয় কিছু বুঝিয়ে দেওয়া কঠিন নয় তা সে বিলক্ষণ জানে—সে বিনীত ভাবে হাত জোড় করে বললে, বড্ড কষ্ট যাচ্ছে ঠাকুরমশায়, ব্যবসার অবস্থা যে কি যাচ্ছে, সোনার দর এই উঠচে এই নামচে, সোনার দর না জোয়ারের জল! আর চলে না ঠাকুরমশাই—এই সময়টা একটু রয়ে বসে নিতে হচ্ছে—আপনি রাজা লোক, আপনার খেয়েই মানুষ—

কেদার চক্ষুলজ্জায় পড়ে আর খাজনা চাইতে পারলেন না। হাটে ঢুকে আরও দু-এক-জনের কাছে প্রাপ্য খাজনা চাইলেন—সকলেই তাদের দুঃখের এমন বিস্তারিত ফর্দ দাখিল করলে যে কেদার তাদের কাছেও জোর করে কিছু বলতেই পারলেন না।

হাটের জিনিসপত্রও সুতরাং বেশী কিছু কেনা হ'ল না—হাতে পয়সাকড়ি বিশেষ নেই।

সতীশ কলুর দোকানে ধারে তেল নিয়েছিলেন ওমাসে—এখনও একটি পয়সা শোধ দিতে পারেন নি, অথচ সর্ষের তেল না নিয়ে গেলে রান্না হবার উপায় নেই, মেয়ে বলে দিয়েছে।

সতীশ বললে, আসুন দাদাঠাকুর, তেল দেবো নাকি?

সতীশের দোকানে কোণের দিকে যে ঘাপটি মেরে বৃদ্ধ জগন্নাথ চাটুজ্জে বসেছিলেন, তা প্রথমটা কেদার দেখতে পান নি, এখন মুশকিল জগন্নাথ চাটুজ্জে লোক ভাল নয়, গাঁয়ের গেজেট, তার সামনে সতীশকে ধারের কথা বলতে কেদারের বাধল—অথচ না বললেও নয়। জগন্নাথ উঠলে না হয় বলবেন এখন। জগন্নাথ চাটুজ্জে হেঁকে বললেন, ওহে কেদার রাজা, এস এস, এদিকে এস ভায়া—তামাক খাও—

কেদার বললেন, জগন্নাথ দাদা যে! ভাল সব?

—ভাল আর কই, আবার শুনেছ তো ওপাড়ার নীলমণি গোঁসাইয়ের বাড়ির ব্যাপার? শোন নি? তা শুনবে আর কোথা থেকে—শুধু মাছ ধরা নিয়ে আছ বই তো নয়—সরে এস ইদিকে বলি—ঘোর কলি হে ভায়া ঘোর কলি, জাতপাত আর রইল না গাঁয়ের বামুনের—

জগন্নাথ চাটুজ্জের কথা শোনবার কোন আগ্রহ ছিল না কেদারের—পরের বাড়ির কুৎসা ছাড়া তিনি থাকেন না। কিন্তু এঁকে এখান থেকে সরাবার উপায় না দেখলে তো তেল

নেওয়া হয় না। কেদার অগত্যা জগন্নাথের কাছে গেলেন। জগন্নাথ গলার স্বর নীচু করে বললেন, কাল রাত্তিরে নীলু গোঁসাইয়ের মেয়েটা আফিম খেয়েছিল, জানো না ?

কথাটা প্রথম থেকেই কেদারের ভাল লাগল না। তবুও তিনি বললেন, আফিম ? কেন ?···

জগন্নাথ চোখ মুখ ঘুরিয়ে হাসি-হাসি মুখে বললেন, আরে, এর আবার কেন কি কেদার রাজা ! বিধবা মেয়ে, সোমত্ত মেয়ে, বাপের বাড়ি পড়ে থাকে—কোনো ঘটনা-টটনা ঘটে থাকবে। কথায় বলে—

কেদারের নিজের বাড়িতেও ওই বয়সের বিধবা মেয়ে, গল্প শুনবেন কি, জগন্নাথ চাটুজ্জের কথার গূঢ় ইঙ্গিত, শ্লেষ ও ব্যঞ্জনা শুনে কেদার ভেতরে ভেতরে ভয়ে ও সংকোচে আড়ষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করলেন। তেল কিনতে এসে এমন বিপদে পড়বেন জানলে তিনি না হয় আজ তৈলবিহীন রান্নাই খেতেন।

জগন্নাথ চাটুজ্জে বললেন, আমি শুনলাম কি করে বলি শোনো তবে। কাল আমি ক্ষেত্র ডাক্তারের বাড়িতে ডাক্তারের স্ত্রীর ব্রত উদ্‌যাপনে নেমন্তন্ন খেতে যাই, তাদের পরিবেশনের লোক হয় না, আমি আবার খাওয়ার পরে নিজে পরিবেশন করতে লাগলুম। রাত প্রায় বারোটা হয়ে গেল। তখন ক্ষেত্র ডাক্তার বললে, এখানেই আমার বাইরের ঘরে বিছানা পেতে দিক, এখানেই শুয়ে থাকুন—এত রাত্তিরে আর বাড়ি যায় না—

শুয়ে আছি, রাত প্রায় তিনটের সময় নীলু গোঁসাইয়ের বড় ছেলে ধীরেন এসে ডাক্তারকে ডাকলে। আমি জেগে আছি, সব শুনছি শুয়ে শুয়ে। ধীরেন কাঁদকাঁদ হয়ে বললে, শীগগির যেতে হবে ক্ষেত্রবাবু, মীনা আফিম খেয়েছে—

ডাক্তার বললে, কতক্ষণ খেয়েছে ? ধীরেন বললে, কখন যে খেয়েছিল তা তো জানা যায় না। নিজের ঘরে খিল দিয়ে শুয়েছিল, এখন গোঙানি ও কাতরানির শব্দ শুনে সবাই গিয়ে দেখে, এই ব্যাপার।

সেই রাত্রে ক্ষেত্র ডাক্তার ছুটে যায়। কত করে তখন বাঁচায়। তা ওরা ভাবে যে কাক-পক্ষীতে বুঝি টের পেলে না, কিন্তু আমি যে ক্ষেত্র ডাক্তারের বাইরের ঘরে শুয়ে তা তো কেউ জানে না। সোমত্ত বিধবা মেয়ে মীনা, কি জানি ভেতরের ব্যাপারটা কি—কাল পড়েছে খারাপ কিনা—বলে আগুন আর ঘি—আরে উঠলে যে, বোসো।

বারে বারে বিধবা মেয়ের উল্লেখ কেদারের ভাল লাগছিল না—তা ছাড়া জগন্নাথ চাটুজ্জে কি ভেবে কি কথা বলছে তা কেউ বলতে পারে না। লোক সুবিধের নয় আদৌ। সর্ষের তেলের মায়া ছেড়ে দিয়েই কেদার উঠে পড়লেন, জগন্নাথ চাটুজ্জের সামনে তিনি ধারের কথা বলতে পারবেন না সতীশকে।

জগন্নাথ চাটুজ্জে বললেন, তা হ'লে নিতান্তই উঠলে কেদার রাজা, বাড়ি থাকো কখন হে —একবার তোমাদের বাড়িতে যাব যে—ভাবি যাব, কিন্তু গড়ের খাল পার হতে ভয় হয়, আর যে বনজঙ্গল গড়ের দিকটাতে ! তা ছাড়া আবার সেই তিনি আছেন—

জগন্নাথ চাটুজ্জে হাত জোড় করে কার উদ্দেশে দু-তিনবার প্রণাম করলেন।

কেদার বলে উঠলেন, আরে ও কখনো কেউ দেখে নি, এই তো শরৎ রোজ সন্ধ্যের সময় উত্তর দেউলে পিদিম দিতে যায়—একাই তো যায়—কিছু তো কখনো কই—

ঝোঁকের মাথায় কথাটা বলে ফেলেই কেদার বুঝলেন কথাটা বলা তাঁর উচিত হয় নি—। জগন্নাথ চাটুজ্জের পেটে কোন কথা থাকে না—এর কথা ওর কাছে বলে বেড়ানোই তাঁর স্বভাব—এ অবস্থায়—মেয়ের কথা তোলাই এখানে ভুল হয়েছে—

কিন্তু জগন্নাথ অন্য দিক দিয়ে গেলেন পাশ কাটিয়ে। বললেন, তুমি বলছো কেদার

রাজা কিছু নেই, আমরা বাপ-দাদাদের মুখ থেকে শুনে আসছি চিরকাল—নেই বলে উড়িয়ে দিলেই—অবিশ্যি তোমার মেয়ে ঐ নিবান্দা পুরীর মধ্যে একা থাকে, সাহস বলিহারি যাই—আমাদের বাড়ির এরা হলে দিনমানেই থাকতে পারত না—

এদের কথাবার্ত্তার এই অংশটা সতীশ কলুর কানে গিয়েছিল, সে খদ্দেরকে তেলশমেপে দিতে দিতে বললে, এখন অবেলায় ও কথাডা বন্ধ করুন বাবাঠাকুর, দরকার কি ওসব কথায় ? চেরকাল শুনে আসছি, বাপ পিতেমো পজ্জন্ত বলে গিয়েছে—গড়ের বাড়িই পড়ে আছে কতকাল অমনি হয়ে তার ঠিক ঠিকানা নেই—আমার বয়েস এই তিন কুড়ি চার যাচ্ছে, আমি তো ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি ঠিক অমনি ধারা—কেদার দাদাঠাকুরের বয়েস আমার চেয়ে কত কম—আমি ওনাকে এট্টুকখানি দেখেছি—

জগন্নাথ চাটুজ্জে বললেন, আরে তোমার তো মোটে চৌষট্টি সতীশ, আমার ঠাকুরদা মারা গিয়েছিলেন আমার ছেলেবেলায়, তিনি বলতেন তাঁর ছেলেবেলায় তিনিও গড়বাড়ি অমনি ধারা জঙ্গল আর ইটের ঢিবি দেখে আসছেন, তাঁর মুখেও আমি উত্তর দেউলের ওকথা শুনেছি —কেদার রাজা কি জানে ? ও কত ছোট আমাদের চেয়ে।

কেদার বলে উঠলেন, ছোট বড় নই দাদা, এই তিপ্পান্ন যাচ্ছে—

জগন্নাথ বললেন,—আর আমার এই খাটি ষাট কি একষট্টি—তা হলে হিসেব করে দেখো কতদিন হ'ল, আমার যখন পনেরো তখন ঠাকুরদা মারা যান, তখন তাঁর বয়েস নব্বুইয়ের কাছাকাছি—এখন হিসেব করে দেখ ঠাকুরদাদার ছেলেবেলা, সে কত দিনের কথা—কত দিনের হিসেব পেলে দেখো—

কেদার তেলের আশা ত্যাগ করে উঠে পড়লেন—কোনো উপায় নেই। কারো সামনে তিনি ধারের কথা বলতে পারবেন না—বিশেষ করে জগন্নাথ চাটুজ্জের সামনে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়েছে। গেঁয়োখালির হাট থেকে ফিরবার পথে গড়ের সদর দেউড়ির দিকে গেলে ঘুর হয় বলে পূর্ব্বদিক দিয়েই ঢুকলেন কেদার—যে দিকটাতে খালে এখনও জল আছে। এদিকটাতেই বড় বড় ছাতিম গাছ আর ঘন বন। এক জায়গায় মাত্র হাঁটু জল খালে, কার্ত্তিক মাসে কচুরি পানার নীলাভ ফুল ফুটে সমস্ত খালটা ছেয়ে ফেলেছে—এতটুকু ফাঁক নেই কোথাও—অন্ধকার সন্ধ্যাতেও শোভা যেন আরো খুলেছে।

খাল পেরিয়ে উঠে গড়ের মধ্যে ঢুকেই ছাতিম বনের ওপারে ডান দিকে এক জায়গায় ধ্বংসস্তূপের থেকে একটু দূরে গোলাকৃতি গম্বুজের মত ছাদওয়ালা ছোট গোছের মন্দির—এরই নাম এ গাঁয়ে উত্তর দেউল। কেন এ নাম তা কেউ জানে না, সবাই শুনে আসছে চিরকাল, তাই বলে।

উত্তর দেউলের পাশ দিয়ে ছোট্ট পায়ে-চলার পথ বাদুড়নখী কাঁটার ঝোপের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। ছাতিম ফুলের গন্ধের সঙ্গে মিশেছে বাদুড়নখী ও জংলী বনমরচে ফুলের ঘন সুবাস। বন বাঁ-ধারে বেশ ঘন আর অন্ধকার। গড়ের এখানকার দৃশ্যটি সত্যিই ভারী সুন্দর।

কেদার একবার গম্বুজাকৃতি মন্দিরটার দিকে চাইলেন। আজ কেন যেন তাঁর গা ছমছম করতে লাগল। অন্ধকার ঘরটার মধ্যে সামান্য মৃদু প্রদীপের আলো—শরৎ এই সন্ধ্যার সময় প্রতিদিনের মত সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছে—এটা কেদার রাজার বংশের নিয়ম, আজন্ম দেখে আসছেন তিনি, উত্তর দেউলে বাতি দিয়ে এসেছেন চিরকাল কেদারের মা, ঠাকুরমা এবং সম্ভবত প্রপিতামহী। কেদারের আমলেও দেওয়া হয়।

তিন

শরৎ বাবাকে বললে, তুমি আজও তো কোথাও খাজনা আদায় করতে বেরুলে না—কি করে কি হবে আমি জানি নে। ঘরে কাল থেকে চাল বাড়ন্ত, কোনো কাজের কথা বললে, সে তোমার কানে যায় না, আমি বলে-বলে হার মেনে গিয়েছি—

কেদার বললেন, তা যাবো তো ভাবছি। তুই না বললেও কি আর আমি বাড়ি বসে থাকতাম? একটু বেলা হোক—

শরৎ গৃহকর্ম্মে মন দিলে। কেদার মোটা চাদরখানা গায়ে দিয়ে কিছুক্ষণ পরে বেরুবার উদ্যোগ করতেই শরৎ বললে, না খেয়ে বেরিও না বাবা—আহ্নিক করে একটু জল মুখে দিয়ে যাও—

কিছু খেতে অবিশ্যি কেদারের অনিচ্ছা ছিল না, কিন্তু তৎপূর্ব্বে যে আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানটির কথা শরৎ উল্লেখ করলে, তাঁর যত আপত্তি সেখানে। এত সকালে তিনি আর ও হাঙ্গামার মধ্যে যেতে রাজী নন। সুতরাং তিনি বললেন, আমি এখন আর খাবো না, এসে বরং—সবাই বেরিয়ে যাবে কিনা এর পরে—

তাঁদের গ্রামের পাশে রাজীবপুর চাষাদের গাঁ। এখানে কেদারের তিন-চারটি প্রজা আছে। আজ কয়েক মাস যাবৎ কেদার তাদের কাছে খাজনার তাগাদা করে আসছেন, কিন্তু জোর করে কাউকে কিছু বলতে পারেন না বলে একটি পয়সাও আদায় হয়নি।

প্রথমেই কেদার গেলেন একঘর মুসলমান প্রজার বাড়ি। দুখানি মাত্র খড়ের ঘর, উঠোনে ধানের মরাই আছে বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে তাতে ধান নেই। আরও দিন পনেরো পরে মাঠ থেকে ধান আসবে। মুরগী চরছে ধানের মরাইয়ের তলায়।

বছর দুই আগে এই বাড়ির মালিকের মৃত্যু হয়েছিল। ছেলে আর ছেলের বৌ ছিল—গত চৈত্র মাসে ছেলেটির সর্পাঘাতে মৃত্যু ঘটে—এখন শুধু আছে বিধবা পুত্রবধূ আর একটি মাত্র শিশু পৌত্র। সামান্য জমার জমির ধান আর রবিশস্য থেকে কোনো রকমে সংসার চলে এদের।

কেদার উঠোনে গিয়ে দাঁড়িয়ে হেঁকে বললেন, বলি, ও আবদুলের মা, কোথায় গেলে? বাড়িতে কেউ ছিল না সম্ভবতঃ। দু-একবার ডেকে কারো সাড়া না পেয়ে কেদার ধানের মরাইয়ের ছায়ায় একখানা কাঠ পেতে বসে পড়লেন। একটু পরে একটি অল্পবয়সী বৌ কলসীকক্ষে উঠানে পা দিতেই কেদারকে দেখে জিব কেটে একহাতে ঘোমটা টেনে ক্ষিপ্রপদে উঠোন পার হয়ে ঘরে উঠল।

একটু পরে বৌটি একখানা পিঁড়ি নিয়ে এসে কেদারের বসবার জায়গা থেকে হাত দশেক দূরে মাটির ওপর রেখে চলে গেল। কেদার সেখানা টেনে এনে তাতে বসলেন।

মেয়েটি আরও প্রায় কুড়ি মিনিট পরে ঘোমটা দিয়ে ঘরের বার হয়ে ছাঁচতলায় নেমে দাঁড়াল। কোনো কথা বললে না।

কেদার বললেন, আর বছরের দরুণ এক টাকা পাঁচ আনা আর এ বছরের সমস্ত খাজনা—মোট সাড়ে চার টাকা তোমার কাছে বাকি, টাকাটা আজ দিয়ে দাও—বুঝলে?

মেয়েটি নম্রসুরে বললে, বাপজী—

কেদার চমকে উঠলেন। কখনো বৌটি তাঁর সঙ্গে কথা বলে নি—তা ছাড়া ওর মুখের ডাকটি তাঁর বড় ভাল লাগল। শরতের চেয়েও বৌটির বয়েস কম।

কেদার বললেন—কি ?

—টাকা তো যোগাড় করতে পারি নি আজও, কলাই বিক্রী না করে টাকা দিতে পারবো না।

কেদার দ্বিরুক্তি না করে সেখান থেকে উঠলেন। ওর মুখের 'বাপজী' ডাকের পর আর কখনো তাকে কড়া তাগাদা করা চলে ?

আর এক বাড়ি গিয়ে দেখলেন, তাদের বাড়িসুদ্ধ সব ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়ে। শুধু রোগের সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে সেখান থেকে তিনি বিদায় নিলেন।

পথে বেলা বেশি হয়েছে। এক দিনের পক্ষে যথেষ্ট বিষয়কর্ম করা হ'ল—বেশি খাটতে তিনি রাজী নন—বাড়ির দিকে ফিরবার জন্যে সড়কে উঠেছেন, এমন সময় একজন বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হ'ল।

বৃদ্ধ লোকটির পরনে আধময়লা থান, গায়ে চাদর, হাতে একটা বড় ক্যাম্বিসের ব্যাগ। তাঁকে দেখে লোকটি জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁ মশাই, গড়শিবপুর যাবো কি এই পথে ?

—গড়শিবপুরে কোথায় যাবেন ?

—ওখানকার রাজবাড়ির অতিথিশালা আছে—শুনলাম, সকলে বললে। অনেক দূর থেকে আসছি, অতিথিশালায় গিয়ে আজ আর কাল থাকবো।

—গড়শিবপুরের রাজবাড়ি ? কে বলে দিয়েছে ? আচ্ছা, চলুন নিয়ে যাই, আমার সঙ্গে চলুন—

কেদারের বাড়ির অতিথিশালা পূর্ব্বপুরুষদের আমল থেকেই আছে—সেই নামডাকেই এখনও গ্রামে অপরিচিত বিদেশী লোক এলে কেদারের বাড়ি অতিথি হতে আসে। নিজে খেতে না পেলেও পূর্ব-আভিজাত্যের গৌরব স্মরণ করে কেদার তাদের থাকবার খাবার বন্দোবস্ত করে দিয়ে আসছেন বরাবর। কখনও তাদের ফিরিয়ে দেন নি এ-পর্য্যন্ত। থাকবার জায়গার অসুবিধা বলে কেদার কাছারীবাড়ির উঠানে অতিথির জন্যে একখানা ছোট্ট দো-চালা খড়ের ঘর তৈরী করে দিয়েছেন অনেক দিন থেকে। খড় পুরানো হয়ে জল পড়তে শুরু করলে কেদার নিজেই চালে উঠে নতুন খড়ের খোঁচ দেন। এই ঘরখানার নামই অতিথিশালা। কেদারকে বিপন্ন হয়ে পড়তে হয় যখন হঠাৎ অতিথি এসে জোটে অতিথিশালায়, হয়তো নিজের ঘরেই সেদিন চাল বাড়ন্ত—কিন্তু অতিথিকে যোগান দিতেই হবে। অনেক সময় গ্রামের লোক দুষ্টুমি করেও কেদারের অতিথিশালায় অতিথি পাঠিয়ে দেয়, সকলেই জানে কেদারের অবস্থা—মজা দেখবার লোভ সামলানো যায় না সব সময়।

সাধারণ অতিথিকে দিতে হয় এক বোঝা কাঠ ও এক সের চাল, সামান্য কিছু নুন আর তেল। তরকারী হিসাবে দু-একটা বেগুন। এর বেশী কিছু দেবার নিয়ম নেই পূর্ব্বকাল থেকেই—কেদারও তাই দিয়ে আসছেন।

তবে ভদ্র-অতিথি এলে অন্যরকম ব্যবস্থা। নিয়ম আছে দুধ, ঘি, সৈন্ধব লবণ, মিছরিভোগ, আতপ চাল, মুগের ডাল ইত্যাদি তাকে যোগাতে হবে। কেদারের বর্ত্তমান অবস্থায় সে-সব কোথায় পাওয়া যাবে—কাজেই নিজের ঘরে রেঁধে তাদের খাওয়াতে হয়—যতই অসুবিধা হোক, উপায় নেই। মাসের ভিতর পাঁচদিনও শরৎকে অতিথিসেবা করতেই হয়। আজ কেদার একটু অসুবিধায় পড়লেন।

ঘরে এমন কিছু নেই যা অতিথিশালায় পাঠাতে পারেন। লোকটি কি শ্রেণীর তা এখনও তিনি বুঝতে পারেন নি, সাধারণ শ্রেণীর বলেই মনে হচ্ছে। অন্ততঃ আধসের চালও তো দিতে হয়, কি করা যাবে সে-সম্বন্ধে পথ হাঁটতে হাঁটতে কেদার সেই কথাই ভাবতে লাগলেন।

বৃদ্ধ বললে, কতদূরে মশাই গড়শিবপুর ?

—এই বেশী নয়, ক্রোশখানেক হবে। আপনাদের বাড়ি কোথায় ?

—বাড়ি অনেকদূর, মেহেরপুরের কাছে, নদে জেলায়।

—কোথায় যাবেন ?

—দেশ বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি। যেদিকে যখন ইচ্ছে, তখন সেদিকেই যাব—

—আপনারা ?

—ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ গোত্র, অভিনন্দ ঠাকুরের সন্তান, খড়দ মেল—আমার নাম শ্রীগোপেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

কেদারের বয়স হয়েছে, সুতরাং তিনি জানেন ব্রাহ্মণদের পরিচয় দেবার এই প্রথাই ছিল আগের কালে। তাঁর ছেলেবেলায় তিনি দেখে এসেছেন বটে। এমন লোককে অতিথিশালায় পাঠিয়ে দেওয়া যায় না, নিজের ঘরে রেঁধে খাওয়াতে হয়।

গ্রামের মধ্যে ঢুকে ব্রাহ্মণ বললে, রাজবাড়ি দেখিয়ে দিয়ে আপনি চলে যান, আমার সঙ্গে অনেকদূর তো এলেন—আর কষ্ট করতে হবে না আপনার—

—চলুন, আমিও সেই বাড়ি যাব, সেই বাড়ির লোক—

—আপনি রাজবাড়ির লোক বুঝি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—আমি—ইয়ে—

গড়ের খাল পেরিয়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বিস্ময়ের চোখে দু-ধারের জঙ্গলে ভরা ধ্বংসস্তূপগুলির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে বললে—রাজবাড়ি কতদূর ?

কেদার কৌতুকের সঙ্গে বললেন, দেখতেই পাবেন, চলুন না—

দেউড়ির ধ্বংসস্তূপ পার হয়ে নিজের চালাঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে কেদার বললেন, এই রাজবাড়ি—আসুন—

বৃদ্ধ কেদারের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চাইলে।

কেদার হাসিমুখে বললেন, আমিই রাজবাড়ির রাজা—আমারই নাম কেদার রাজা—

ইতিমধ্যে শরৎ বার হয়ে বাবাকে কি বলতে এল, সকালে উঠে সে স্নান সেরে নিয়েছে, ভিজে চুলের রাশি পিঠময় ছড়ানো, গায়ের রঙের সুগৌর দীপ্তি রোদে দশগুণ বেড়েছে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অবাক হয়ে এই সুন্দরী মেয়েটির দিকে চেয়ে রইল।

কেদার বললেন, আমার মেয়ে, ওর নাম শরৎসুন্দরী। প্রণাম করো মা, ব্রাহ্মণ অতিথি—

শরৎসুন্দরী বাবাকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করলে, তার পর, নিয়ে তো এলে, এখন উপায় ? ঘরে তো এক দানা চাল নেই। বেলাও হয়েছে, কি করি বলো ?

কেদার বললেন, যা হয় করো মা তুমি। আমি কিছু জানি নে—ওবেলা আমি বরং—

শরৎসুন্দরী রাগ করে নিজের গালে চড় মারতে লাগল। ফর্সা গাল রাঙা হয়ে গেল। মেয়ে এরকম প্রায়ই করে থাকে বেশী রাগ হলে—কেদার অপ্রতিভ মুখে বললেন, ও কি করো মা, ছেলেমানুষি ! না—ছিঃ—অমন করতে নেই।

শরৎ জলভরা চোখে রাগের ও ক্ষোভের সুরে বললে, আমার ইচ্ছে করে গলায় দড়ি দিয়ে কি মাথায় ইঁট ভেঙে মরি, আমার এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না বাবা। বেলা দুপুরের সময় তুমি এখন নিয়ে এলে ভদ্রলোক অতিথি, নিজেদের নেই খাবার যোগাড়—কি করবো—বলো বুঝিয়ে আমায়। নিত্যি তোমার এই কাণ্ড—কত বার না তোমায় বলেছি ?

কেদার চুপ করে রইলেন, বোবার শত্রু নেই। শরৎ তাঁর সামনে থেকে চলে গেলে তিনি অতিথির সঙ্গে এসে বসে গল্প করতে লাগলেন, কারণ শরৎ যে একটা যা হয় কিছু ব্যবস্থা করে ফেলবেই এ বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না। শরৎ রাগী তেজী মেয়ে বটে, কিন্তু

সব কাজে ওর ওপর বড় নির্ভর করা চলে অনায়াসে। খুব স্থিরবুদ্ধি মেয়ে।

শরৎ কোথা থেকে কি করলে তিনি জানেন না, আহারের সময় অতিথির সঙ্গে খেতে বসে দেখলেন, ব্যবস্থা নিতান্ত মন্দ হয় নি। এত বেলায় মাছও যোগাড় করে ফেলেছে মেয়ে।

আহারাদির পর কেদার বললেন, আচ্ছা গোপেশ্বরবাবু, চলুন একটু বিশ্রাম করবেন—

তারপর তিনি অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে অতিথিশালার দো-চালা ঘরখানাতে এলেন। এখানে একখানা কাঁঠাল কাঠের সেকেলে ভারি তক্তপোশ পাতা আছে অতিথির জন্যে। পাতার জন্যে একখানা পুরানো মাদুর ছাড়া অন্য কিছু নেই চৌকিখানার ওপর—দেবার সঙ্গতিও নেই তাঁর।

বৃদ্ধ বললেন, বসুন আপনিও। একটু গল্পগুজব করি আপনার সঙ্গে।

—আপনার গান-বাজনা আসে ?

—সামান্য এক-আধটু। সে কিছুই নয়—

কেদার উৎসাহে উঠে পড়লেন চৌকি ছেড়ে। গানবাজনা জানে এ ধরণের লোকের সঙ্গ তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। এরকম লোকের সঙ্গে দেখা হওয়া ভাগ্যের কথা।

বললেন, কি বাজনা আসে আপনার ?

—কিছু না, তবলা বাজাতে পারি এক-আধটু—

—তা হলে আজ ওবেলা আপনাকে যেতে দেবো না গোপেশ্বরবাবু—আমাদের আড্ডায় আজ সন্ধ্যাবেলা আপনাকে নিয়ে একটু আমোদ করা যাবে—

—তা আপনি যখন বলছেন, আমায় থাকতে হবে রাজামশায়। আপনার অবস্থা এখন যাই হোক, আপনি গড়শিবপুরের রাজবংশের বড় ছেলে, এখানকার রাজা। আমি সব শুনেছি আসবার পথে। আপনার অনুরোধ না রেখে উপায় কি বলুন। আর আমার কোনো তাড়া নেই, দেশ দেখতেই তো বেরিয়েছি—

—পায়ে হেঁটে ?

—পয়সাকড়ি কোথায় পাবো বলুন। পায়ে হেঁটে যত দূর হয় দেখছি। কখনো দূরে দেশে যাই নি, কিছু দেখি নি ছেলেবেলা থেকে, অথচ বেড়াবার শখ ছিল। ভাবলুম বয়েস ভাঁটিয়ে গেল, এইবার বেরুনো যাক, হেঁটেই দেশ দেখবো। পয়সা কোন দিনই হবে না আমাদের হাতে। তা ধরুন ইতিমধ্যে নদীয়া জেলা সেরে ফেলেছি, এবার আপনাদের জেলায়—

—আপনার বয়েস হয়েছে, এরকম হেঁটে পারেন এখনও ?

—বয়েস হলেও মনটা তো এখনও কাঁচা। কখনও কিছু দেখি নি বলেই যা দেখছি তাই ভাল লাগে। ভাল লাগলে হাঁটতে কষ্ট বোধ হয় না। কিন্তু আপনাকে দেখে আজ এত অবাক হয়ে গিয়েছি আমি, আর আপনাকে এত ভাল লেগেছে যে কি বলবো। সত্যিকার রাজদর্শন ভাগ্য ছাড়া হয় না, আমার তাই হল আজ। আমিও আমুদে লোক রাজামশায়, আমোদ ভালবাসি বলেই বেরিয়েছি এই বয়সে।

—বেশ তো, এখানে দুচারদিন থেকে যান। আমোদ করা যাবে এখন। আপনার মত লোক পেলে—

—কি জানেন, অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে নেনজার হয়ে পড়লুম রাজামশাই। দেশ ভ্রমণের শখ ছিল এস্তক লাগাৎ। কিন্তু যেতে পারিনে কোথাও—মনটা মাঝে মাঝে এমন হাঁপাতো ! এই আমার বাষট্টি-তেষট্টি বছর বয়েস হয়েছে—আর বছর মেয়ে দুটিকে পাত্রস্থ করার পরে সংসারের ঝঞ্চাট অনেকটা মিটলো। তাই বলি কখনও কোথাও

যাই নি—বেড়িয়ে আসি একবার। এক বছর পথে পথে থাকবো—

—লাগছে ভাল এরকম হেঁটে বেড়ানো?

—আহা, বড্ড ভাল লাগছে রাজামশায়। নদীর ধার, বটগাছের তলা, মাঠে যবের ক্ষেত, মেয়েদের ক্ষার-কাচা পিঁড়ির ওপরে, হয়তো কোন পুকুরের পাড়—যা দেখি তাতেই অবাক হয়ে থাকি। বড় ভাল লেগেছে আমার। যেখানে নদে জেলা শেষ হ'ল সেখানে একটা বড় শিমুল গাছ আছে রাস্তার ধারে। জেলার শেষ কখনো দেখি নি—হাঁ করে জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম কতক্ষণ। বেশ রদ্দুর তখন মাঠে, আকাশে বড় বড় চিল উড়ছে, কেউ কোনদিকে নেই। আমার এক বন্ধু ছিল, মারা গিয়েছে অনেক কাল, নাম ছিল কেশব—সেও দেশ দেখতে ভালবাসতো বড়। তার কথা মনে পড়লো—

কেদার বিস্ময়ে ও কৌতূহলের সঙ্গে বৃদ্ধের গল্প শুনছিলেন। তিনিও বেশীদূরে কোথাও যান নি, অবস্থার জন্যেও বটে—তাছাড়া সংসার ফেলে নড়তে পারেন না। তাঁর বড় ইচ্ছে হ'ল মনে, নদে জেলা যেখানে শেষ হয়েছে, সেই শিমুল গাছের তলাটাতে গিয়ে একবার দাঁড়ান। কখনও তিনি দেখেন নি জেলা কি করে শেষ হয়। বৃদ্ধের বর্ণনা শুনে মনে মনে অনেক দূরের সেই অদেখা শিমুল গাছের তলায় চলে গিয়েছে তাঁর মন।

জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা গোপেশ্বরবাবু, সেই যেখানে শিমুল গাছ, তার এপারে ওপারে তো দুই জেলা? একহাত তফাতেই নদীয়া, এধারে আবার যশোর। ধরুন আমার যদি একখানা বেগুনের ক্ষেত থাকে সেখানে, একটা বেগুন গাছ থাকবে নদে জেলায়, আর দুহাত তফাতের বেগুন গাছটা হবে যশোর জেলায়! ভারি মজা তো? সেখানে এমন জমি আছে?

বৃদ্ধ হেসে বললে, কেন থাকবে না? ওদিকের জমি হবে কেষ্টনগর সদরের তৌজিভুক্ত, আর এদিকের জমি হবে যশোর বনগাঁ মহকুমায়—

—বাঃ বাঃ চমৎকার!

কেদারের মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো বিস্ময়ে ও কৌতূহলে। তাঁর ইচ্ছে হ'ল জায়গাটা এখান থেকে কতদূর হবে জিজ্ঞেস করে নেন। কিন্তু পরক্ষণে মনে পড়লো বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবার যো নেই তাঁর, শরৎকে একা এই বনের মধ্যে রেখে একদিনও তাঁর নড়বার উপায় আছে কোথাও? ছেলেমানুষ শরৎ···

জেলার সীমা দেখা তাঁর ভাগ্যে নেই।···

সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধকে নিয়ে কেদার ছিবাস মুদির দোকানে গিয়ে হাজির হলেন। রাত দশটা পর্যন্ত সেখানে পুরোদমে গান-বাজনা চললো। সকলেই বৃদ্ধের হাতে তবলা বাজানোর প্রশংসা করলে। খুব দ্রুত এবং খুব মিঠে হাত। সেই আড্ডাতেই আবার এসে জুটলো জগন্নাথ চাটুজ্জে। কোন দিন আসে না, আজ কি ভেবে এসে পড়েছে কে জানে।

জগন্নাথ চাটুজ্জে মন দিয়ে খানিকক্ষণ গোপেশ্বরের বাজনা শুনে কেদারের কানে কানে বললে, ওহে কেদার রাজা, এ ভদ্রলোকটি বেশ গুণী দেখছি। এঁকে জোটালে কোথা থেকে হে?

কেদার পরিচয় দিলেন। জগন্নাথ শুনে খুব খুশী। তাঁর ইচ্ছে কেদারের বাড়িতে এসে লোকটির সঙ্গে কাল সকালে আরও আলাপ জমান। কেদার বললেন, তা বেশ তো দাদা, আসুন না সকালে—

বাড়ি ফিরতে রাত এগারোটা হয়ে গেল। রাত্রের আহারের ব্যবস্থা শরৎ ভালই করেছে। মেয়ের ওপর ভার দিয়ে কেদার নিশ্চিন্ত থাকেন কি সাধে? কোথা থেকে সে কি করে, কেদার কোনদিন খবর রাখেন নি। সে রাগ করুক, ঝাল করুক, সংসারের কাজকর্ম সব ঠিকমত করে যাবে, সে বিষয়ে তার ত্রুটি ধরবার উপায় নেই। ঠিক ওর মায়ের মত।

কেদার বোধ হয় একটু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন কি ভেবে।

গোপেশ্বর চাটুজ্জে কেদারের সঙ্গে বাড়ির চারদিক বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখলেন। গড়ের এপারে ওপারে যে সব প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ বনের আড়ালে আত্মগোপন করে রয়েছে, তার সবগুলির ইতিহাস কেদারেরও জানা নেই।

একটা পাথরের হাত-পা ভাঙা মূর্ত্তির চারিদিকে নিবিড় বেতবন।

গোপেশ্বর বললেন, এ কি মূর্ত্তি ?

কেদার বলতে পারলেন না। বিভিন্ন মূর্ত্তি চিনবার বিদ্যা নেই তাঁর। বাপ-পিতামহের আমল থেকে শুনে আসছেন এখানে যে মূর্ত্তি আছে, অনেক দিন আগে মুসলমানদের আক্রমণে তার হাত পা নষ্ট হয়—কেউ বলে কালাপাহাড়ের আক্রমণে ;—এ সব কিছু নয়, আসল কথা কেউ কিছু জানে না। বিস্মৃত অতীত কোন ইতিহাস লিখে রেখে যায় নি গ্রামের মাটির বুকে—সময় যে কি সুদূরপ্রসারী অতীত ও ভবিষ্যৎ রচনা করে মানুষের স্মৃতিতে, সে গহন রহস্য এসব গ্রামের লোকের কল্পনাহীন মনে কখনও তার উদার ছায়াপাত করে নি, পঞ্চাশ বছর আগে কি ঘটেছিল গ্রামে, তাও তারা যখন জানে না—তখন ঐতিহাসিক অতীতের কাহিনী তাদের কাছে শুনবার আশা করা যায় কি করে ?

গড়ের বাইরে এসে কেদার একটা প্রাচীন বটগাছ দেখালেন। কেদারের বাড়ি থেকে জায়গাটা অনেক দূরে। গাছটার তলায় প্রাচীন আমলের বড় বড় শিবলিঙ্গ, গৌরীপট্ট, মকরমুখ পয়োনালা ইত্যাদি এখানে ওখানে পড়ে আছে স্মরণাতীত কাল থেকে—গ্রামের কেউ বলতে পারে না সে-সব কোথা থেকে এল। বৃদ্ধ গোপেশ্বর চাটুজ্জে এসব দেখে সেই ধরণের আনন্দ পেল, অধিকতর সচ্ছল অবস্থার ভ্রমণকারী দিল্লী আগ্রার মুঘলের কীর্ত্তি দেখে যে আনন্দ পায়।

কেদারকে বললে, রাজা মশায়, যা দেখলাম আপনার এখানে, জীবনে কখনও দেখি নি। দেখবার আশাও করি নি—এসব জিনিস কতকালের, যুধিষ্ঠির ভীম অর্জ্জুনের সময়কার বোধ হয়। পাণ্ডবদের রাজ্য ছিল এখানে—না ?

সেই রাত্রে বৃদ্ধের জ্বর হ'ল। পরদিন সকালে কেদার অতিথিশালায় এসে দেখলেন বিছানা থেকে উঠবার ক্ষমতা নেই বৃদ্ধের। সারাদিন জ্বর ছাড়ল না—সন্ধ্যার পরে তার ওপর আবার ভীষণ কম্প দিয়ে জ্বর এল। কেদার পড়ে গেলেন মুশকিলে। তাঁর বাইরে যাওয়া একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। সর্ব্বদা রোগীর কাছে থাকতে হয়, কখনও তিনি কখনও শরৎ।

সাতদিন এভাবে কাটল। কেদার পাশের গ্রাম থেকে সাতকড়ি ডাক্তারকে এনে দেখালেন, বৃদ্ধের জ্ঞান নেই—তার বাড়ির ঠিকানাটা জেনে নিয়ে একখানা চিঠি দেবেন তার আত্মীয়-স্বজনকে, তার সুযোগ পেলেন না কেদার। শরৎ যথেষ্ট সেবা করলে এই বিদেশী অতিথির। ঠিক সময়ে দুটি বেলা বৃদ্ধের পথ্য প্রস্তুত করে নিজের হাতে তাকে খাইয়ে আসা, বাপের স্নানাহারের সুযোগ দেবার জন্যে নিজে রোগীর পাশে বসে থাকা, নিজের বাবার অসুখ হলেও শরৎ বোধ হয় এর চেয়ে বেশী করতে পারত না।

ন'দিনের পর বৃদ্ধের জ্বর ছেড়ে গেল। পথ্য পেয়ে আরও এক সপ্তাহ বৃদ্ধ রয়ে গেল অতিথিশালায়—কেদার কিছুতেই ছাড়লেন না, এ অবস্থায় তিনি অতিথিকে পথে নামতে দিতে পারেন না। বাড়িতে চিঠি দিতে চাইলে বৃদ্ধ ঘোর আপত্তি তুললে। বললে, কেন মিছে ব্যস্ত করা তাদের ? স্ত্রী নেই, মেয়ে নেই—থাকবার মধ্যে আছে ছেলে দুটি আর ছেলের বৌয়েরা—তাদের অবস্থা ভালও নয় বিশেষ, তাদের বিব্রত করতে চাই নে।

পরের সপ্তাহে বৃদ্ধ বিদায় নিয়ে চলে গেল। শরৎ পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করতে

বৃদ্ধের চোখে জল দেখা দিল। শরতের মাথায় হাত দিয়ে বললে, এমন সেবা আমার আপনার লোক কখনো করে নি। আমার পয়সা নেই, পয়সা থাকলে হয়তো তারা করতো। তুমি যে বড় বংশের মেয়ে তা তোমার অন্তর দেখেই বোঝা যায়। তুমি আমার যা করলে, কখনো তা পাই নি কারো কাছ থেকে। তোমায় আর কি বলে আশীর্ব্বাদ করবো মা, ভগবান যেন তোমায় দেখেন।

কেদার বললেন, আপনি কি এখন বাড়ি যাবেন ?

—না রাজামশায়—বেরিয়ে পড়েছি যখন, তখন ভাল করে সব দেখে নিই। অনেক কিছু দেখলাম আরও অনেক কিছু দেখব। আপনাকে আর মাকে যা দেখলাম এই তো আমার কাছে একেবারে নতুন। বাড়ি থেকে না বেরুলে কি আপনাদের মত মানুষের দর্শন পেতাম ? ফেরবার পথে আপনাদের সঙ্গে দেখা না করে যাবো না।

অনেক দিন পরে বাড়ি থেকে বেরুবার অবকাশ পেলেন। বৃদ্ধের অসুখ সেরে গেলেও রুগ্ন অতিথিকে একা ফেলে কেদার কোথাও যেতে পারতেন না বড় একটা। সর্ব্বদা কাছে বসে কথাবার্ত্তা বলতেন। আজ একটা বড় দায়িত্বের বোঝা যেন ঘাড় থেকে নেমে গেল।

ছিবাস মুদির দোকানের আড্ডায় জগন্নাথ চাটুজ্জে বললে—আরে এই যে কেদার রাজা, এসো এসো—কি হ'ল, অতিথি চলে গেল? যাক্, বাঁচা গিয়েছে—আচ্ছা অতিথি জুটিয়েছিলে বটে! বাপরে, একেবারে একটি মাসের মত জুড়ে বসলো—যাবার নামটি করে না।

কেদার হেসে বললেন, কি করে যায় বলো—বেচারী এসেই পড়ে গেল অসুখে। লোক বড় ভাল, তার কোনো ত্রুটি নেই। তার পর, জগন্নাথ-খুড়ো—এখানে কি মনে করে? তোমাকে তো দেখিনে এখানে আসতে ?

জগন্নাথ বললে, মাঝে মাঝে আসি আজকাল। একা বাড়ি বসে থাকি আর ওই একটু সতীশের দোকান নয় তো পঞ্চানন বিশ্বেসের বাড়ি—কোথায় যাই বলো আর ? একটু বেহালা ধরো দিকি হে বাবাজী—তোমার বাজনা শুনি নি অনেক দিন।···

শরৎ সন্ধ্যাবেলায় উত্তর দেউলে প্রতিদিনের মত প্রদীপ দিতে গেল। দীঘির পশ্চিম পাড় ঘুরে সেই বড় বড় ছাতিম গাছতলা দিয়ে প্রায় তিন রশি পথ যেতে হয়—বড্ড বন এখানটাতে। বাদুড়নখীর জঙ্গলে শুকনো বাদুড়নখী ফল আঁকড়ে ধরে রোজ শরতের পরনের কাপড়। রোজ ছাড়াতে হয়।

যে গম্বুজাকৃতি মন্দিরটার নাম 'উত্তর দেউল', সেটা একেবারে এই পায়ে চলা সরু পথের পাশেই, গড়ের খালের ধারের ধ্বংসস্তূপ থেকে একটু দূরে, স্বতন্ত্র ভাবে দণ্ডায়মান। বাদুড়নখীর কাঁটাজাল ভেঙে পথটা এসে একেবারে মন্দিরের ভাঙা পৈঠায় উঠেছে। মাটি থেকে খুব উঁচু রোয়াক, তার ওপর গোল গম্বুজাকৃতি মন্দির—দুটি কুঠুরি পাশাপাশি। কি উঁচু ছাদ!—শরতের মনে হয় মন্দিরের মধ্যে ঢুকতেই। চামচিকের বাসা—দোর খুলতেই খোলা দরজা দিয়ে একপাল চামচিকে উড়ে পালালো। ভেতরের কুঠুরিতে বেশ অন্ধকার। গা ছমছম করে সাহসিকার, তবুও তো ওর হাতে মাটির প্রদীপ মিট্‌মিট্ জ্বলছে, আঁচল দিয়ে আড়াল করে আনতে হয়েছে পাছে বাতাসে নেবে। আলো হাতে ভয় কিসের ?

হঠাৎ যেন পাশের কুঠুরিতে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল অন্ধকারে। শরতের বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করে উঠল—তবুও সে সাহসে ভর করে কড়া-সুরে হেঁকে বললে—কে ওখানে ?

ওর হাত কাঁপছে !···

কোনো সাড়া না পেয়ে শরৎ সাহসে ভর করে আর একবার ডেকে বলল—কে পাশের

ঘরে ? সামনে এসো না দেখি ?

ওর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন পাশের কুঠুরির ওদিকের কবাটবিহীন দোরে দিয়ে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল—বাইরের চাতালে তার পায়ের শব্দ বেশ স্পষ্ট শোনা গেল।

শরৎ মন্দিরের মেঝেতে মাটির পিলসুজে বসানো প্রদীপটা জ্বালাতে জ্বালাতে আপন মনে বকতে লাগল—দোগেছের শ্মশান তোমাদের ভুলে রয়েছে ? মুখপোড়া বাঁদরের দল—বাড়িতে মা-বোন নেই ?

ওর আগের ভয়টা একেবারে সম্পূর্ণ কেটেছে। ব্যাপারটা অপ্রাকৃতের শ্রেণী থেকে সম্পূর্ণ বাস্তবের গণ্ডির মধ্যে এসে পোঁচেছে। দু-পাঁচ মাস অন্তর, কখনো বা উপরি উপরি দু-তিন মাস ধরে—এক-একদিন এরকম কাণ্ড উত্তর দেউলে সন্ধ্যাবেলা আলো দিতে এসে ঘটেই থাকে। গ্রামের বদমাইশ কোনো ছেলে-ছোকরার কাণ্ড। এমন কি, কার কাণ্ড শরৎ খানিকটা মনে মনে সন্দেহও করতে পারে—তবে সেটা অবিশ্যি সন্দেহ মাত্রই।

শরৎ এসবে ভয় খায় না, ভয় খেতে গেলে তার চলেও না। দরিদ্রের ঘরে সুন্দরী হয়ে যখন জন্মেছে, তখন এ রকম অনেক উপদ্রব সহ্য করতে হবে, সে জানে। বাবার তো সে-সব জ্ঞান নেই, সেই যে বেরিয়েছেন কখন তিনি ফিরবেন তার ঠিকানা আছে ? একাই এই নিবান্দা পুরীর মধ্যে যখন থাকা, তখন ভয় করে কি হবে ? আসুক না কার কত সাহস, বঁটি নেই ঘরে ? বঁটি দিয়ে নাক যদি কেটে দুখানা না করে দিই তবে আমি গড়শিবপুরের রাজবংশের মেয়ে নই ! পাজি, বদমাইশ সব কোথাকার !

প্রদীপ দেখিয়ে যখন সে মন্দিরের বাইরে এসে দাঁড়ালে—তখন সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ভাল করে নেমেছে। ওই দীঘির পাড়ের ছাতিমবনটা বড্ড অন্ধকার হয়ে পড়ে এ সময়—ওখানটাতে ভয় যে না করে এমন নয়। শরৎ যে-প্রদীপটা হাতে করে এনেছিল, সেই প্রদীপটা প্রাণপণে আঁচল দিয়ে বাঁচিয়ে বাদুড়নখীর কাঁটাজঙ্গলের পথ বেয়ে চলে গেল—শুকনো ফলের থোলো নাড়া পেয়ে ঝম্‌ঝম্ করছে—দু-একবার ওর কাপড় পেছন থেকে টেনেও ধরলে বাদুড়নখী ফলের বাঁকা ঠোঁট—দু-একবার ও ছাড়িয়েও নিলে।

বাড়ি পোঁছে যদি রাজলক্ষ্মীকে দেখতে পেতো, খুব খুশী হ'ত সে, কিন্তু সে পোড়ারমুখী আসে নি। শরৎ রান্নাঘরে ঢুকে উনুন জেবলে রান্না চড়িয়ে দিলে।

গোপেশ্বর চাটুজ্জে ছিল এতদিন, শরতের বেশ লাগতো। বাপের বয়সী বৃদ্ধকে সেবা করে আনন্দ পেতো সে—কেদার সে-রকম নন, তিনি সেবা তেমন কখনও চান না। তা ছাড়া নির্জন পুরীতে দু-একজন মানুষের মুখ যদি দেখা যায়, সে ভালই।

শরৎ সেবা করতে ভালবাসে, পছন্দ করে। জীবনে যেটা সে চেয়েছিল, তাই তার হ'ল না। স্বামীর কথা তার ভাল মনে হয় না, সেদিক থেকে অর মন শূন্য—সে মন্দিরের সোপান-বেদীতে কোনো দেবতা নেই—তাদের গড়ের উত্তর দেউলের মতই।

সেজন্যে শরৎ স্বাধীন আছে এখনও— সম্পূর্ণ স্বাধীন। মনের দিগন্তে এতটুকু মেঘ নেই কোনোদিকে।

বেশী রাত এখনও হয় নি, শরৎ ডাল সবে নামিয়েছে—এমন সময় কেদার বাড়ি এলেন।

শরৎ হাসিমুখে বললে, এত সকালে যে বাড়ি ফিরলে ? আবার যাবে বুঝি ?

কেদার শান্তভাবে বললেন, না আর যাবো না—তবে—

—না বাবা, আজ আর যেও না—

কেদার একটু অবাক হয়ে মেয়ের মুখের দিকে চাইলেন। ওর গলার সুরের মধ্যে বোধ হয় কি পেলেন।

—কেন বলো তো মা ?

—এমনি বলছি—থাকো না বাড়িতে। সকাল সকাল খেয়ে নাও—রান্না হয়ে গেল, একটু চা করে দেবো নাকি ?

কেদার চা খেতে তেমন অভ্যস্ত নন, মেয়েও এত আদর করে তাঁকে চা খেতে বলে না কোনোদিন। ইতস্ততঃ করে বললেন, তা কর না হয়—খাওয়া যাক। তুইও খা একটু—

—আজ একটা গল্প করো না বসে আমার কাছে ? করবে ? ভাল কথা, সন্ধ্যে-আহ্নিকটা সেরে নাও দিকি ? জায়গা করে দিই।

মেয়ে মুশকিলে ফেললে দেখা যাচ্ছে। কেদার একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন। তিনি আসলে এসেছিলেন খানিকটা রজন সংগ্রহ করতে বেহালার ছড়ে দেবার জন্যে। ছিবাস মুদির আড্ডায় রজন ছিল, ফুরিয়ে গিয়েছে কিংবা হারিয়ে গিয়েছে। এত রাত্রে এ গ্রামের আর কোথাও ও জিনিস পাওয়া গেলে কেদার কখনই বিপদের মুখে পা দিতেন না। করাই বা যায় কি ? অগত্যা কেদার সন্ধ্যা-আহ্নিকে বসলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সাঙ্গও করে ফেললেন। তার পর তিনি ভাবছেন এখন কি ভাবে বাইরে যাওয়া যায়। শরৎ আবার আবদারের সুরে বললে—বাবা, বল একটা গল্প—আজ তোমাকে যেতে দেবো না—

কেদারের বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। আজ শরৎ যেন ছেলেমানুষের মত হয়েছে। কতদিন শরতের গলায় এমন আবদারের সুর তিনি শোনেন নি। এমনি অন্ধকার রাত্রে তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মীমণি বাপের বাড়ি থেকে ফিরে এসেছিল গরুর গাড়ি করে। শরৎ তখন ছ-মাসের শিশু। কেদার চিরদিনই এক রকম বাইরে বাইরে ফেরেন—বাড়িতে কেদারের আপন বৃদ্ধা জ্যাঠাইমা ছিলেন—তিনি কানে অত্যন্ত কম শুনতেন। লক্ষ্মীমণি ও তার বাপের বাড়ির গাড়োয়ান অনেক ডাকাডাকি করেও বৃদ্ধার ঘুম ভাঙাতে পারে নি। অগত্যা তার ঘরের দাওয়াতেই বসে ছিল কেদারের আগমনের অপেক্ষায়।···

রাত এগারটার সময় কেদার গানবাজনার আড্ডা থেকে বাড়ি ফিরে দেখেন এই কাণ্ড। কেদারের মনে আছে, লক্ষ্মীমণি অন্ধকারের মধ্যে তাঁর কোলে ছ-মাসের মেয়েকে তুলে দিয়েই কৌতুকে আমোদে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল।

—কেমন, বড্ড যে মেয়েকে ঘেন্না করতে !···মেয়ে যেন হয় না, হলে গড়ের পুকুরে ডুবিয়ে মারব !···ইস, মার না দেখি ডুবিয়ে ?

সেই নবযৌবনা রূপবতী স্ত্রীর মুখের হাসি আজও মাঝে মাঝে যেন কানে বাজে···তখন পৃথিবী ছিল তরুণ, তিনি ছিলেন তরুণ, লক্ষ্মীমণি ছিল তরুণী। আর একজন এসেছিল তারপর···কিন্তু থাক, তার কথা কেদার এখন ভাববেন না।

সেই মেয়ে শরৎ—সেই ছোট্ট শিশু ! কি সুখে তাকে রেখেছেন কেদার ?

শরৎ চা করে এনে দিলে।

—শুধু চা খেও না, দাঁড়াও কি আছে দেখি।

—দুটো বড়ি ভেজে কেন দাও না, সে বেশ লাগে আমার—

শরৎ একটু আচারনিষ্ঠ মেয়ে, ভাতের শকড়ি কড়াতে সে বড়ি ভেজে এখন চায়ের সঙ্গে দিতে রাজী নয় বাবাকে। বাবা নিতান্ত নাস্তিক, তাঁর না আছে ধর্ম্ম—না আছে কর্ম্ম—বাবার ওসব ম্লেচ্ছাচার শরৎ পছন্দ করে না আদৌ।

—বড়ি আবার এখন কি খাবে, হেঁসেলের জিনিস—দুটি মুড়ি মেখে দিই তার চেয়ে।

কেদার অগত্যা মুড়ির বাটি নিয়ে বসলেন।

না, আজ আর আড্ডায় যাওয়া গেল না। শরৎ তাঁর মনকে বড় অন্যমনস্ক করে দিয়েছে। ভাল রজন নিতে এসেছিলেন তিনি !

—আচ্ছা বাবা, উত্তর দেউলের কথা যে লোক বলে—তুমি কিছু জানো ?

—বলে, শুনে আসছি এই পর্যন্ত, নিজে কিছু দেখিও নি, কিছু শুনিও নি। তবে বাবার মুখেও শুনেছি, ঠাকুরদাদাও বলতেন—আমাদের বংশেও প্রবাদ চলে আসছে চিরদিন থেকে—

—বল না বাবা, কি কথা—

—তুমি তো জানো, সবই তো শুনে আসছ আজন্ম। থাক ও কথা এখন এই রাত্তির বেলা। কেন বল-তো মা, উত্তর দেউলের কথা উঠল কেন মনে হঠাৎ ?

—কিছু না, এমনি বলছি—

—আজ পিদিম দিয়ে এসেছ তো ?

—ওমা, তা আবার দেবো না ! কবে না দিই। এমনি মনে হ'ল তাই বলছি—

আজকার সন্ধ্যার ব্যাপারটা বাবার কাছে বলা উচিত কি না শরৎ অনেকবার ভেবেছে। শেষ পর্যন্ত সে ঠিক করে ফেলেছে বাবাকে কিছু বলবে না। বাবা ঐ এক ধরনের লোক, বালকের মত আমোদপ্রিয়, সরল লোক—সংসারের কোন কিছু গায়ে মাখেন না—মাখা অভ্যেসও নেই। তিনি শুনবেন, শুনে ভয় পাবেন, উদ্বিগ্ন হবেন—কিন্তু কোন প্রতিকার করতে পারবেন না। দুদিন পরে আবার সব ভুলে যাবেন। তাঁকে বলে কোনও লাভ নেই।

তা ছাড়া একথা প্রকাশ হলেও এ-সব পাড়াগাঁয়ে অনেক ক্ষতি আছে। কে কি ভাবে নেবে তার ঠিক কি ? এ থেকে কত কথা হয়তো ওঠাবে লোকে। বাবা পেটে কথা রাখতে পারেন না, এখুনি গিয়ে ছিবাস কাকার দোকানে গল্প করবেন এখন। দরকার কি সে-সব গোলমালে ?

কেদার অবশেষে একটা গল্প বললেন—মেয়ের আবদার রাখার জন্যেই। এ গল্প এদেশে অনেকে জানে। তাঁর নিজের বংশের ইতিহাসেরই হয়তো—কেদার কিছু খোঁজ রাখেন না। কোন পাঁজি-পুঁথিতে কিছু লেখা নেই।

গড়ের বড় দীঘিটার নাম কালো পায়রার দীঘি। এ বাদে আরও দুটো দীঘি আছে ছাতিমবনের ওপারে—একটার নাম রাণীদীঘি—একটার নাম চালধোয়া পুকুর। ও দুটো পুকুরেই অনেক পদ্মবন আছে—কালো পায়রার দীঘি অর্থাৎ যেটাতে কেদার প্রায়ই গণেশ মুচির সঙ্গে মাছ ধরে থাকেন—সেটাতে কোন ফুল নেই পাটা-শেওলার দাম ছাড়া।

বহুকাল আগে—কতকাল আগে কেদারের কোন ধারণাই নেই—তাঁর কোন পূর্বপুরুষের সঙ্গে মুসলমান ফৌজদারের দ্বন্দ্ব বাধে। চাকদহের নিকট যশড়া ও হাট জগদলের যে যুদ্ধের প্রবাদ আজও ছড়ার আকারে এই সব গ্রাম-অঞ্চলে প্রচলিত, কেদার শুনেছেন সে ছড়ার মধ্যে উল্লিখিত রাজা দেব রায় ও ভূমিপাল রায় তাঁরই বংশের পূর্বপুরুষ।

হাট জগদলে পানি প্যালাম না
তীর খেয়ে ভিরমি নেগেচে—
দেবরায়ের সেপাই যে ভাই যমদূতের চ্যালা
ভুঁইপালের তীরন্দাজে দেয় বড় ঠ্যালা—
(ও ভাই) হাট জগদলে পানি প্যালাম না
তীর খেয়ে ভিরমি নেগেচে—

বিপদে পড়ে রাজা দেব রায় গৌড়ে যান দরবার করতে, বাড়িতে বলে গিয়েছিলেন যদি মঙ্গলের সংবাদ থাকে তবে সঙ্গের শ্বেত পারাবত উড়িয়ে দেবেন, কিন্তু যদি অশুভ কিছু ঘটে, তবে কৃষ্ণ পারাবত উড়ে আসবে। সংবাদ শুভ হলেও কার ভুলক্রমে কৃষ্ণ পারাবত উড়িয়ে দেওয়া হয়। মহারাণী অন্তঃপুরিকাদের নিয়ে গড়ের মধ্যের বড় দীঘির জলে আত্মবিসর্জন করে বংশের সম্মান রক্ষা করেন।

রাজা জয়ী হয়ে ফিরে এসে যখন দেখলেন তাঁর অসতর্কতার পরিণাম—তিনি আর রাজকর্ম্ম পরিচালনা করেন নি, ভাইয়ের হাতে রাজ্যভার তুলে দিয়ে তিনি নাকি উত্তর দেউলে বারাহী দেবীর বেদীমূলে বসে প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করেন।

এ অঞ্চলে প্রবাদ, উত্তর দেউলে এক বিশালকান্তি পুরুষকে কখনো কখনো নাকি দেখা গিয়েছে—হাতে তাঁর বেত্রদণ্ড, মুখে তর্জ্জনী স্থাপন করে তিনি চিত্রার্পিতের মত উত্তর দেউলের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু এসব শোনা-কথা মাত্র। কেউ এমন কথা বলতে পারে না যে, সে নিজের চোখে কিছু দেখেছে।

অথচ গ্রাম্য লোক ভয় পায়, সন্ধ্যার পর উত্তর দেউলের ওদিকে কেউ বড় একটা যাতায়াত করে না।

কেদারও কিছু জানেন না, অপর পাঁচ জনে যা জানে, তিনি তার বেশী কিছু জানেন না, জানবার কোন চেষ্টাও করেন নি। আর কে-ই বা বলবে ?

শরৎ বললে, বাবা, এসব কত দিনের কথা ?

—তা কি করে বলবো রে পাগলী ? আমি কি দেখেছি ?

—রাণীর নাম কি ছিল বাবা ?

—কি করে বলবো মা ?...ইয়ে তা হলে আমি এখন—

—আচ্ছা বাবা, তিনি আমার সম্পর্কে কেউ নিশ্চয় হতেন—আমাদেরই বংশের তো—

কেদার একটু ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন—এখনও যদি ছিবাস মুদির দোকানে গিয়ে পেঁছুতে পারেন—রাত বেশী হয় নি এখনও।

তিনি অধীর ভাবে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই হবেন বৈকি—তোমার ঠাকুরমা-টাকুরমা হতেন আর কি—

শরৎ হেসে বললে, ঠাকুরমা কি বাবা, সে হ'ল কোন্ যুগের কথা—তোমার মা-ই তো আমার ঠাকুরমা হতেন।

কেদারের মন এখন অত কুলজী-নির্ণয়ের দিকে নেই। তিনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—আচ্ছা, তুমি ততক্ষণ রান্নাটা নামিয়ে রাখো—আমি আসছি চট্ করে—

—এত রাত্তিরে তোমায় বাবা আর যেতে হবে না। না, থাকো আজ—

—কেন, তোর ভয় করছে নাকি মা ?

—হ্যাঁ তাই। থাকো আজকে—

কেদার একটু আশ্চর্য্য হলেন, শরৎ কোনোদিন এমন করে বাধা দেয় না। গল্প-টল্প শুনে ভয় পেয়েছে ছেলেমানুষ। থাক, আজ আর তিনি যাবেন না। রজন্ আনতে বাড়ি এসে যে ভুল তিনি করে ফেলেছেন, তার আর চারা নেই।

শরৎ বললে, বাবা, সেই কলসীটার কথা মনে আছে ?

—হ্যাঁ খুব আছে। কলসীটা কোথায় রে ?

—রাজলক্ষ্মীদের বাড়িতে চেয়ে নিয়েছিল দেখবার জন্যে। সেখানেই আছে।

—নিয়ে এসে রেখে দিও, নিজের জিনিস বাড়িতে রাখাই ভালো।

আজ বছর ছ'সাত আগে একটা মাটির কলসী গড়ের খাতের মধ্যে এক জায়গায় পাওয়া যায়—কলসীটার ওপরে নানারকম ছক্ কাটা, নক্সা আঁকা—কেদারই কলসীটা প্রথমে দেখতে পান, টাকাকড়ি পোঁতা আছে হয়তো পূর্ব্বপুরুষের—প্রথমটা ভেবেছিলেন। কিন্তু শেষে কলসীটা খুঁড়ে বের করে আধ খুঁচিটাক কড়ি পান তার মধ্যে।

গ্রামের হীরু ও সাধন কুমোর দেখে বলেছিল—এ পোড়ের কলসী আজকাল আর হয় না,

এমন ধরনের আঁকাজোকা কলসীর গায়ে। এসব বাবাঠাকুর অনেক কাল আগের জিনিস। এ পোড়ই আলাদা—খুব ওস্তাদ কুমোর না হলে এমন পোড় হবে না বাবাঠাকুর।

গড়ের খালের খুব নিচের দিকে, যেখানে জল প্রায় মজে এসেছে, সেখানে একদিন মাছ ধরতে বসে কেদার কলসীটা দেখতে পেয়েছিলেন। ওঃ, টাকার কলসী পেয়ে গিয়েছেন বলে কি খুশি কেদারের! শরতের মা লক্ষ্মীমণি তখনও বেঁচে।

লক্ষ্মী ছুটে এল—কি গা কলসীটাতে?

এর আগে কেদার বলে গিয়েছিলেন যে একটা কলসীর কানা বেরিয়েছে গড়ের খালের পাড়ে। অনেক নিচের দিকে পাড়ের।

কেদার হাসতে হাসতে বললেন, এক হাঁড়ি মোহর—নেবে এসো—

লক্ষ্মীর বয়স তখন প'য়ত্রিশ-ছত্রিশের কম নয়, কিন্তু দেখাতো প'চিশ বছরের যুবতীর মত। গায়ের রঙের জলুস এই দু-বছর আগেও মরণের দিনটি পর্য্যন্ত ছিল অম্লান। এই মেয়ে হয়েছে ওর মায়ের মত অবিকল—কিন্তু লক্ষ্মীর মত অত জলুস নেই গায়ের রঙের—তার কারণ কেদার নিজে তত ফর্সা নন—শ্যামবর্ণ।

লক্ষ্মী এসে হাসিমুখে কড়িগুলো নিয়ে গেল। বললে, জানো না লক্ষ্মীর কড়ি, পয়মন্ত কড়ি—আমাদের বংশের কেউ হয়তো পুঁতে রেখে থাকবে কতকাল আগে—যত্ন করে তুলে রেখে দিই—

কেদার জিজ্ঞেস করলেন মেয়েকে—ভালো কথা, কলসীর সেই কড়িগুলো কোথায় আছে?

—লক্ষ্মীর হাঁড়ির মধ্যে মা-ই তো রেখে গিয়েছিল, সেখানেই আছে।

কেদারের মনটা আজ হঠাৎ কেমন আর্দ্র হয়ে উঠেছে, আশ্চর্য্যের ব্যাপার বটে! তিনি একটু ব্যস্ত হয়ে বললেন, দেখে এসো না মা, আছে তো ঠিক—যাও না—

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে শরৎ মুখের হাসি গোপন করলে, আহা, হাসিও পায়, দুঃখও হয় বাবার জন্যে। মা মারা যাবার পরে বাবা মায়ের কোন জিনিস ফেলতে পারেন না, মায়ের ভাঙা চিরুনিখানা পর্য্যন্ত। তবে সব সময় তো খেয়াল থাকে না, ভোলা মহেশ্বরের মত বাইরে বাইরে ঘোরেন কিন্তু মাঝে মাঝে হয়তো মনে পড়ে যায়। শরতের বয়স হ'ল প'চিশ-ছাব্বিশ—সে সব বোঝে।

বাবাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যেই বিশেষ করে শরৎ উঠে গেল লক্ষ্মীর হাঁড়ি দেখতে—সে ভালরকমই জানে—কড়িগুলো আছে ওর মধ্যে। কিন্তু বাবার ছেলেমানুষের মত স্বভাব, যখন যা ধরবেন তাই।

সে দেখে ফিরে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে কেদার জিজ্ঞেস করলেন, রয়েছে দেখলি?

শরৎ আশ্বাস দেওয়ার সুরে বললে, হ্যাঁ বাবা, রয়েছে।

—আর সেই কলসীটা কালই নিয়ে আয় ওদের বাড়ি থেকে। সেখানে এত দিন ফেলে রাখে? তোর জিনিসপত্রের যত্ন নেই।

—তুমি ভেবো না বাবা, কালই আনবো।

আজ বাবার হঠাৎ খেয়াল চেপেছে তাই, নইলে আজ পাঁচ-ছ বছরের মধ্যে কোনো দিন কলসীটার কথা বাবা তো এক দিনও বলেন নি। আজও তো সে-ই আগে তুলেছিল ওকথা, তাই এখন বাবার বড্ড দরদ কলসীর ওপর, কড়ির ওপর। কেদার নিশ্চিন্ত হয়ে এক ছিলিম তামাক ধরালেন। কলসীর কথা ওঠাতে তাঁর মনে পড়লো, বনে-জঙ্গলে ঘোরেন তিনি এই বিশাল গড়ের হাতার মধ্যে, খালের এপারে বা ওপারে জলের মধ্যে আরও দু-একটা জিনিস দেখেছেন, যার অর্থ তিনি করতে পারেন নি।

যেমন একবার, আজ দশ-পনেরো বছর আগে, গড়ের বাইরে যে বড় মজা দীঘির নামে চালধোয়া পুকুর, তার ধারে কি করতে গিয়ে কেদার একটা বাঁধা-ঘাটের চিহ্ন দেখতে পান। কত কাল আগের বাঁধাঘাট কে বলবে? কয়েকটা মাত্র ধাপ তার অবশিষ্ট আছে—বাকীটা হয়তো মাটির মধ্যে পোঁতা।

একবার তিনি কিছু পুরোনো ইট বিক্রি করেন, গড়ের খালের এপারের একটা বড় পাঁচিলের ইট। বহুকাল থেকে স্তূপাকার হয়ে পড়ে ছিল—তার ওপরে গজিয়েছিল বন-গাছের জঙ্গল। ইটের ঢিবি খুঁড়তে খুঁড়তে যখন সব ইটের স্তূপ শেষ হয়ে গেল—তখন সমতল মাটির আরও হাত-তিনেক নিচে আর কতকগুলো ইটের সন্ধান পাওয়া গেল। সে জায়গাটা খুঁড়ে দেখা গেল মাটির নিচে একটা মন্দিরের খানিকটা অংশ যেন চাপা পড়ে আছে।

তখন সে ইটগুলোও খুঁড়ে তোলবার জন্যে বন্দোবস্ত করা হ'ল। আরও হাত-দুই খুঁড়ে খুব বড় একটা পাথরের মাথা বেরিয়ে পড়ল। আর খোঁড়া হয় নি—এখন সে-সব আবার বনে ঢেকে গিয়েছে। কেদারের মনে হয়েছিল, ওখানে একটা মন্দির ছিল বহুকাল আগে—কতকাল আগে তা অবিশ্যি তিনি আন্দাজ করতে পারেন নি। অনেকগুলো নক্সাকাটা ইট বেরিয়েছিল ওখান থেকে। কিসের মন্দির তাও কেউ জানে না।

ওই বাড়ির চারিপাশে তাঁদের পূর্বপুরুষদের কত দীঘি, দেউল, ঘরবাড়ি ভেঙেচুরে আত্ম-গোপন করে আছে আজ কত কাল কত যুগ ধরে, দুর্ভেদ্য বেতবনের আড়ালে, জগডুম্বুর গাছের আঁকাবাঁকা শেকড়ের নিচে; দুশো বছরের সঞ্চিত চামচিকের নাদির মধ্যে থেকে বিরাট শিবলিঙ্গ কোথাও মাথাটি মাত্র জাগিয়ে আছেন—হস্তপদভগ্ন বারাহী দেবীর পাষাণ মূর্ত্তি ছাতিমবনের নিবিড় ছায়ায় অনাদৃত অবস্থায় পড়ে আছে কতকাল।

শরৎ এসব জানে। নিজের চোখেও দেখে আসছে আবাল্য, রাজলক্ষ্মীর ঠাকুরদাদা বৃদ্ধ শ্রীনাথ চাটুজ্জের মুখে সে অনেক কথা শুনেছে, যা তার বাবাও কোনদিন বলেন নি। শ্রীনাথ চাটুজ্জে অনেক খবর রাখতেন।

—ভাত দিই বাবা, রাত হয়ে গিয়েছে অনেক—

—কেমন গল্প শুনলি, হল তো?

—উত্তর দেউলের কথা ভুলে গিয়েছ দিব্যি।

—ভুলবো কেন, ওই যে বললাম—

—দেবীমূর্ত্তির কথা বললে না যে—

—সেও তো শোনা কথা। কালাপাহাড় না কে···দেবীর মূর্ত্তি ভেঙেচুরে মন্দির থেকে ফেলে দেয় টান মেরে—।

—ভাদ্র মাসের অমাবস্যোতে দেবীমূর্ত্তি নাকি—

—কে দেখতে গিয়েছে মা? চোখে কেউ দেখেছে? ওসব গুজব। পাষাণের অতবড় মূর্ত্তিটা অমনি জাগ্রত হয়ে ঠেলে উঠে চলতে শুরু করে—হ্যাঃ—

শরৎ সাহসিকা মেয়ে, তবুও বাবার কথায় যে ছবি তার মনে জাগলো—তাতে সে শিউরে উঠলো, কারণ সে শুনে এসেছে সে-সময় যে সঞ্চরণশীল জাগ্রত পাষাণ মূর্ত্তির সামনে পড়ে, তার সেদিন বড়ই দুর্দ্দিন।

না, ওসব কথায় তার ভয় হয়; তাড়াতাড়ি সে বাবাকে বললে, থাক থাক বাবা, ওসব কথায় আর দরকার নেই। তোমার কি, রাতদুপুরে পর্য্যন্ত ফেলে রেখে যাবে, মরতে আমিই মরি আর কি।

মশা বিন্‌বিন্ করছে জঙ্গলের মধ্যে। খালি গায়ে ঘরের মধ্যে বসা কষ্ট। কলাবাদুড়

ঝুলছে তালকাঠের আড়া থেকে। বাইরের বাতাসে কি বনফুলের সুগন্ধ!

কেদার আহারে বসে অভ্যাসমত এ-তরকারী ও-তরকারীর দোষ খুঁত বার করতে করতে খেতে লাগলেন। কাঁচকলা রান্না বড় শক্ত কথা, বেগুনের তরকারীতে অত ঝাল দেওয়া সে কোথা থেকে শিখেছে ইত্যাদি। খেয়ে উঠে তামাক সাজতে গিয়ে কেদার দেখলেন তামাক একদম ফুরিয়ে গিয়েছে। মেয়ে আজকাল অত্যন্ত অমনোযোগী, কাজকর্ম্মে আর আগের মত মন নেই—যদি থাকতো তবে তামাক ফুরিয়ে যাওয়ার একদিন আগে লক্ষ্য করে নি কেন? এখন তিনি তামাক কোথায় পান এত রাতে?

শরৎ বললে, আচ্ছা বাবা, তোমার তামাক খেতে পেলেই তো হ'ল? কলকেটা দাও—

—কোথায় পাবি তামাক?

—তোমার সে খোঁজে দরকার কি? দেখি কলকেটা—

অসময়ের জন্যে সে প্রতিদিনের তামাক থেকে একটু একটু নিয়ে একটা ঘুলঘুলির মধ্যে লুকিয়ে রাখে। বাবার কাণ্ড তার জানতে বাকী নেই, এই রকম রাতদুপুরে তামাক ফুরিয়ে যাবে হঠাৎ। বকুনি খেতে হবে সে-সময় তাকেই। বকুনির চেয়েও তার দুঃখ হয় যখন বাবার কোনো জিনিসের অভাব ঘটে—কোনো কিছুর জন্যে তিনি কষ্ট পান।

শরৎ তামাক সেজে এনে দিলে। কেদার তামাক পেয়েই সন্তুষ্ট, মেয়েকে আর বিশেষ জেরা করলেন না এ নিয়ে। রাত অনেক হয়েছে—আর এখন শয্যা আশ্রয় করলেই তিনি বাঁচেন। শরৎ সারাদিন খাটে, রাত্রে বিছানায় একবার শুয়ে পড়লে তার জ্ঞান থাকে না। আর এক ছিলিম তামাক চেয়ে রাখলে হ'ত ওর কাছ থেকে, কিন্তু কেদার ভরসা পেলেন না।

গভীর রাত্রে ঘুমের ঘোরে শরতের মনে হয়, আর সে ভাঙাচোরা গড় নেই, কি সুন্দর রাজবাড়ি, পদ্মদীঘিতে শ্বেতপদ্ম ফুটে জল আলো করেছে—দেউড়িতে দেউড়িতে পাহারা পড়ছে, ছাদে লাল সাদা নিশান উড়ছে—গড়ের এপারে ওপারে কত বাড়ি, কত অতিথিশালা, কত হাতী-ঘোড়ার আস্তাবল···উত্তর দেউলে প্রকাণ্ড বারাহী মূর্ত্তির পুজো হচ্ছে, ধূপ-ধুনো-গুগ্গুলের সুবাসে চারিদিক আমোদ করছে, কাড়া-নাকাড়ার বাদ্যিতে কান পাতা যায় না।

যেন এক রাণী এসে তার শিয়রে দাঁড়িয়েছেন, ও'র সুন্দর মুখে প্রসন্ন হাসি, কপালে চওড়া করে সিঁদুর পরা, রূপের দীপ্তিতে ঘর আলো হয়ে উঠেছে···তিনি সস্নেহ সুরে যেন বলছেন—খুকী, আমার বংশের মেয়ে তুই, বংশের মান বাঁচাবার জন্যে আমি দীঘির জলে ডুবে মরেছিলাম, তুইও বংশের মর্য্যাদা বজায় রাখিস্, পবিত্র রাখিস্ নিজেকে।

ঘুমের মধ্যেও শরতের সর্ব্বাঙ্গ যেন শিউরে ওঠে।

কেদার পাশের গ্রাম থেকে খাজনা আদায় করে ফিরছেন, এমন সময় ছিবাস মুদি রাস্তায় তাঁকে ডাকলে—চলুন আমার দোকানে—দাদাঠাকুর, একটু তামাক খেয়ে যাবেন—

রাস্তার ধুলোতে কিসের দাগ দেখে কেদার বললে, এ কিসের দাগ হে ছিবাস?

—এ মটোর গাড়ির চাকার দাগ—প্রভাস বাড়ি এসেছে যে মটোরে চড়ে—

—বেশ, বেশ। তা গাড়ি তো দেখতে হয় ছিবাস—

—কখনো দেখেন নি বুঝি দাদাঠাকুর? আমি সেবার যোগে গঙ্গাচানে গিয়ে নবদ্বীপে দেখে এইচি—

—দূর, মটোর গাড়ি দেখবো না কেন, সেদিনও তো কেষ্টনগরে সদর খাজনা দাখিল করতে গিয়ে চার-পাঁচখানা দেখে এলাম। বড়লোকেরা কেনে, কেষ্টনগরে বড়লোকের অভাব আছে নাকি? তবে আমাদের গাঁয়ে মটোর গাড়ি নতুন কথা কি না—

—তা হবে না কেন দাদাঠাকুর। আজকাল প্রভাসের বাবার অবস্থা কি! কলকাতায় দুখানা বাড়ি, কারবার চলছে তোড়ে—রমারম টাকা আসছে। বলে লক্ষ্মী যখন যারে দ্যান, ছাপ্পড় ফুঁড়ে টাকা আসে—ওদেরই তো এখন দিন—এ কি আর আপনি আমি?

—তা ভালোই তো। গাঁয়ে সবাই গরীব, দু-একজন যদি বড় হয়, অন্ততঃ গাঁয়ের রাস্তা-ঘাটগুলো তো ভাল হবে। দুদিন মটোরে করে এলেই তখন রাস্তার দিকে নজর পড়বে—

—হ্যাঁ, দুদিন মটোরে এসেই তোমার গাঁয়ের রাস্তা অমনি পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে গ্যাংট্যাং রোড করে ফেলছে। তুমিও যেমন পাগল দাদাঠাকুর! ছাড়ান দ্যাও ওসব কথা।

প্রভাস যে মোটরখানা এনেছে, সাতকড়ি চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপের সামনে সেখানা কাঁঠালতলার ছায়ায় দাঁড় করানো। চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপে আট-দশ জন লোকের ভিড়।

কেদার সামনের রাস্তায় কালো চকচকে গাড়িখানার পাশে দাঁড়িয়ে ভাল করে জিনিসটা দেখতে লাগলেন। কেমন একটা গরম গন্ধ, কিসের গন্ধ কেদার ঠিক বুঝতে পারেন না। ঝকঝক করছে পেতলের না কিসের ডাণ্ডা, হ্যাণ্ডেল—আরও কি সব যন্ত্রপাতি।

বেশ জিনিস।

এত কাছে দাঁড়িয়ে কেদার কখনও মোটর গাড়ি দেখেন নি। রাস্তায় যেতে যেতে গাড়িখানার ওধারে আরও দু-একজন পথচলতি চাষাভুষো লোক দাঁড়িয়ে গেল গাড়ি দেখতে।

কেদার তাদের দিকে চেয়ে হাসিমুখে বললেন, কালে কালে কত কাণ্ডই দেখা গেল—হ্যাঁ—কি বলো মোড়লের পো? তাই না কি, বলো ঠিক করে? দশ বছর আগে দেখেছিলে কেউ?

একজন চাষীলোক স্টিয়ারিংয়ের চাকা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, এখানডাতে চাকা একটা আবার কেন, হ্যাদে ও দা'ঠাউর?

কেদার বিজ্ঞভাবে বললেন, ও হ'ল হ্যাণ্ডোলর চাকা। ওটা ঘোরায়।

লোকটির নিকট সব ব্যাপারটা এক মুহূর্ত্তে পরিষ্কার হয়ে গেল। সে হাসিমুখে বললে, দেখুন দিখি দা'ঠাউর, বললেন আপনি, তবে আমি বোঝলাম। না বলে দিলে কি আমরা বুঝতি পারি?

সে কি বুঝলে তা অবিশ্যি সে-ই জানে।

এই সময় কেদারকে দেখতে পেয়ে কে চণ্ডীমণ্ডপ থেকে ডেকে উঠল—ও কেদার রাজা, ওহে ও কেদার রাজা—শোন শোন, এদিকে এস না একবার—

প্রভাসকে ঘিরে গ্রামের অনেকগুলি ভদ্রলোক বসে। জগন্নাথ চাটুজ্জেও আছে ওদের মধ্যে, কেদারকে ডাক দিয়েছে সে-ই।

চণ্ডীমণ্ডপের মালিক সাতকড়ি চৌধুরী বললেন, কেদার-দা যে! আরে এস, এস—বসতে দাও হে—কেদার-দা'কে বসাও—

জগন্নাথ বললে, আরে ভায়া কেদার রাজা, এসে পড়েছ ঠিক সময়ে—তোমার কথাই হচ্ছিল।

কেদার বিস্ময়ের সুরে বললেন—আমার কথা!

তাঁর কথা কোথাও মজলিসে আলোচিত হবার মত গুণ তাঁর কি আছে? কেদার ভেবে পেলেন না। কখনও আলোচিত হয়ও নি।

জগন্নাথ বললে, তোমার কথা কেন, সকলেরই কথা। প্রভাস, চিনতে পেরেছ কেদার ভায়াকে? রাজবাড়ির কেদার-রাজা। এ হ'ল প্রভাস—আমাদের গাঁয়ের রাসু বিশ্বেসের নাতি—

কেদার বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি। তবে সেই ছেলেবেলায় হয়তো দু-একবার দেখে থাকব, বাবাজি তো আসে না গাঁয়ে বড় একটা—কাজেই এখানীং দেখি নি আর।

প্রভাসের বয়স ত্রিশ-বত্রিশ, মাথায় কোঁকড়া চুলে টেরি কাটা, গায়ে সাদা আদ্দির পাঞ্জাবী, জরিপাড় ধুতি পরনে। সকলেই জানে প্রভাস চরিত্রহীন ও বওয়াটে, কিন্তু বড়লোকের ছেলের কাছে স্বার্থ অনেকের অনেক রকম, মুখে কিছু বলতে সাহস করে না।

সাতকড়ি চৌধুরী বললেন—প্রভাসকে আমরা ধরেছি, আমাদের পুবপাড়ার ইস্কুলটার সম্বন্ধে কিছু বিবেচনা করুক। ওদের হাত ঝাড়লে পব্বোত।

কেদার এক পাশে গিয়ে বসলেন। ব্যাপারটা কিছুক্ষণ পরে বুঝলেন, এ গ্রামের প্রাইমারী ইস্কুলের বাড়িটা পাকা করে দেবার জন্যে সবাই প্রভাসকে ধরেছে, শ-চার-পাঁচ টাকা ব্যয় করলে আপাততঃ বাড়িটা এক রকম দাঁড়িয়ে যায়।

প্রভাস বলছিল—তা যখন আপনারা বলছেন, তখন দিয়ে দেব, তবে টাকা আপাততঃ এখন আনি নি, আপনারা যদি কেউ আমার সঙ্গে কলকাতায় গিয়ে—

—আহা সে-জন্যে ভাবনা কি? তুমি যখন হয় পাঠিয়ে দিও। তুমি বললেই আমরা কাজ আরম্ভ করে দিই। তোমার ভরসা পেলে আমরা করতে পারিনে এমন কি কাজ আছে? কি বল হে জগন্নাথ খুড়ো?

জগন্নাথ চাটুজ্জে সাতকড়ির কথায় কোনও উত্তর না দিয়ে কেদারের দিকে চেয়ে বললেন, তোমার কথা কি হচ্ছিল বলি। ইস্কুলটার জন্যে তোমার গড়বাড়ির পুরোনো ইট কিছু দিতে হবে।

কেদার দ্বিরুক্তি না করে বললেন—নিও।

—ঠিক তো?

—নিশ্চয়।

—তা হলে সব কথা তো মিটে গেল হে সাতু, কেদার রাজার ইট আর প্রভাসের টাকা, ইস্কুল বাড়ি তো পাকা হয়ে রয়েছে। এক ছিলিম তামাক খাও—বসো কেদার রাজা।

প্রভাস উঠতে চাইলে—কিন্তু সাতকড়ি চৌধুরী বাধা দিলেন। চা হচ্ছে বাড়ির মধ্যে তার জন্যে, না খেয়ে যাবার যো নেই।

কেদারের একটু চা খাবার ইচ্ছে ছিল না এমন নয়, সুতরাং তিনিও চেপে বসলেন। জগন্নাথ চাটুজ্জে তাঁর সঙ্গে তার নিজের সংসারের ঝঞ্ঝাটের গল্প শুরু করলে। মেজ ছেলেটার জ্বর হচ্ছে আজ এক মাস, রোজ বিকেলে জ্বর আসে, কত রকম কি করলেন, কিছুতেই জ্বর যাচ্ছে না। ও-পাড়ার যতীশ চক্কত্তির সঙ্গে জমি নিয়ে বিবাদ চলেছে গেঁয়োহাটিতে। জগন্নাথ বলে জমি আমার, যতীশ বলে আমার। প্রজারা ফলে খাজনা বন্ধ করেছে, দু-পক্ষের কাউকেই খাজনা দেয় না।

কেদার বললেন, কেন জমির পড়চা দেখলেই তো মিটে যায়—কার জমি লেখাই তো আছে—

—আরে তা কি আর দেখা হয় নি ভাবছ কেদার রাজা? পড়চা দৃষ্টে জমি সনাক্ত করতে হবে না?

—পড়চা দেখে যদি জমি সনাক্ত করতে না পারো, তা হলে আমীন ডেকে মীমাংসা করে নাও। সেটেলমেণ্টের ম্যাপ আছে, তাই দেখে আগে মেপে নেবার চেষ্টা কর না কেন?

—তুমি একদিন এসো না ভায়া। তুমি ম্যাপ দেখে একটা মীমাংসা দাও না করে? জমিজমার কাজ তুমি তো খুব ভাল বোঝ।

—কেদার-দা সত্যিই ভাল জানে জমিজমা-সংক্রান্ত কাজ—কিন্তু মন এদিকে দিতে চায় না

একেবারেই। নিজের অনেক জমি ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বেহাতি হয়ে গেল, দেখেও দেখে না, ঐ হয়েছে ওর দোষ।

একথা বললেন সাতকড়ি চৌধুরী। অনেক দিন আগে তাঁর নিজের জমিজমার দলিল-সংক্রান্ত কি একটা জটিল ব্যাপারের ভাল মীমাংসা করে দেন কেদার, সেই থেকে কেদারের বৈষয়িক কাজকর্মের প্রতি সাতকড়ি চৌধুরীর যথেষ্ট শ্রদ্ধা।

এই সময়ে চা এল। এখানে আর কেউ চা খায় না বলে বোধ হয় চা এসেছে শুধু প্রভাসের জন্যেই। শুধু চা নয়, খানকতক গরম পরোটা আর একটু আলু-চচ্চড়িও এসেছে। সকলেই নানা অনুযোগ অনুরোধ করে প্রভাসকে খাওয়াতে লাগল। কেদার চা খাবেন কি না এ কথা কেউ জিজ্ঞেস করলে না, সুতরাং চা পানের ইচ্ছা আপাততঃ কেদারকে দমন করতে হ'ল।

প্রভাস চা পান শেষ করে উঠে পড়ল। সকলে গিয়ে তাকে তার মোটরে উঠিয়ে দিলে।

সাতকড়ি বললেন, এখন যাবে কোথায় প্রভাস?

—এখন একবার রাণীনগর যাবো কাকা, হারাণ কাপালীর কাছে একখানা তিনশো টাকার হ্যান্ডনোট আছে, তামাদির মুখে দাঁড়িয়েছে, বাবা বলে দিয়েছেন একবার গিয়ে তাগাদা দিতে।

—ওবেলা একবার এসো। গড়ের ইট কেদার-দা দিতে চেয়েছেন, তোমায় দেখিয়ে আনবো। কি বলো জগন্নাথ খুড়ো? তুমি টাকা দেবে, ইটগুলো তুমি দেখে নাও। এই, সব সরে যা গাড়ির কাছ থেকে, তোদের এত ভিড় কেন?

প্রভাসের গাড়ির চারিধারে বহু ছেলেমেয়ে এসে জড়ো হয়েছিল। সকলকে সরিয়ে সাবধান করে দু-চারবার হর্ন দিয়ে প্রভাস গাড়ি ছেড়ে দিলে।···

জগন্নাথ চাটুজ্জে পথের বাঁকে দ্রুতবিলীয়মান গাড়িখানার দিকে চেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—সব টাকা রে বাপু, টাকা। ওর ঠাকুর-দা এই গাঁয়ের পুবপাড়ার কামারের দোকান করতো, হেঁই-ও হেঁই-ও করে হাতুড়ী পেটাতো, আমরা ছেলেবেলায় দেখেছি। সাতু বাবাজি, রাসু বিশ্বেসকে মনে আছে নিশ্চয়ই।

সাতকড়ি চৌধুরীর বয়স আসলে চল্লিশের বেশী নয়। তার চেয়ে অন্তত পঁচিশ বছর বেশী বয়সের লোক জগন্নাথ চাটুজ্জে তাঁকে নিজের দলে টানবার চেষ্টা করছে দেখে তিনি ক্ষুণ্নমুখে বললেন—আমার কি করে মনে থাকবে জগন্নাথ খুড়ো, আমি দেখিই নি···

কেদার বললেন, তোমার যে কান্ড জগন্নাথ-দাদা। ও দেখবে কোথা থেকে? আমারই ভাল মনে হয় না।

জগন্নাথ বললেন—তা সে যাই হোক, মোটের ওপর পয়সা করেছে বটে। ব্যবসা না করলে কি আর বড়লোক হওয়া যায়? ওই রাসু কামারের ছেলে—আমরা রাসু কামার বলেই জানতাম ছেলেবেলায়—সেই রাসুর ছেলে হারাণ কলকাতায় গিয়ে ঘোড়ার গাড়ি সারানোর ছোট্ট দোকান খুললে বৌবাজারে। ক্রমে দোকানের উন্নতি হতে লাগল—মাথা খুলে গেল, তখন পুরোনো গাড়ি কিনে তাই সারিয়ে বেচতে লাগল। তার পর দ্যাখো আজকাল ওদের অবস্থা। কলকাতায় চারখানা বাড়ি।

সাতকড়ি চৌধুরী বললেন, আজকাল প্রভাসই কর্তা। ও-ই বলছিল ওর বাবা বাতে পঙ্গু, উঠে হেঁটে বেড়াতে পারে না। প্রভাসই দেখাশুনো করে।

একজন কে বললে—তবে প্রভাস নাকি বাপের পয়সা বিস্তর উড়িয়েছে।

জগন্নাথ চাটুজ্জে বললেন—তা ওড়াবে না কেন? হারাণ বিশ্বেস কম টাকা করে নি তো? ছেলে যদি না ওড়াবে তবে ওড়াবে কে বলো না? ঘোর বওয়াটে আর মাতাল—

সাতকড়ি চারিদিকে চেয়ে বললেন, থাক, থাক, ওকথা থাক খুড়ো। সে-সব কথায় দরকার কি তোমার আমার? যার ছাগল তার লেজের দিকে সে কাটুক না—বাদ দাও। ওরা হল আজকাল বড়লোক, এদিগরে সাত-আটখানা গাঁয়ের মহাজন হ'ল ওরা। ওদেরই খাতির। টাকার দরকার হলে হারাণ বিশ্বেসের কাছে—কলকাতায় গিয়ে হ্যাণ্ডনোট' লিখে কর্জ্জ না করলে যখন উপায় নেই, তখন তার ছেলে কি করে না করে সে-সব কথার আলোচনা রাস্তায় দাঁড়িয়ে না'করাই ভালো।

বেলা বেড়েছে। কেদার বাড়ির দিকে রওনা হলেন। পথে প্রভাসের গাড়ির সঙ্গে আবার দেখা—বেজায় ধুলো উড়িয়ে আসছে, কেদার এক পাশে দাঁড়ালেন। ধুলোর পাহাড় সৃষ্টি করে হর্ন বাজিয়ে মোটরখানা সবেগে পাশ কাটিয়ে চলে গেল, পেট্রল ও গ্যাসের গন্ধ ছড়িয়ে। কেদার ধুলোর মধ্যে চোখ মিট্ মিট্ করতে করতে প্রশংসমান দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে রইলেন।

সকালে উঠেই সেদিন কেদার খাজনা আদায় করতে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছেন, এমন সময় জগন্নাথ চাটুজ্জে এসে ডাকলে, ওহে কেদার রাজা, বাড়ি আছ নাকি ভায়া?

কেদার বললেন, এসো জগন্নাথ দাদা, বসো। কি মনে করে?

—ওরা সব আসছে, ইট কোথা থেকে নেবে দেখিয়ে দেবে চলো।

কেদার বললে, ও আর দেখিয়ে দেওয়া কি, তুমি তো জানো—যেখান থেকে হোক—

জগন্নাথ জিভ কেটে বললে, তা কি হয় ভায়া? তোমার জিনিস না বলে দিলে কি আমরা নিতে পারি? চলো তুমি। প্রভাস নিজে আসবে এখুনি—আরও সব আসছে।

—ততক্ষণ বসবে এসো দাদা। ওরে শরৎ, তোর জ্যাঠামশায়ের জন্যে বসবার কিছু দে।

শরৎ একখানা পিঁড়ি পেতে দিয়ে বললে, জ্যাঠামশায় তো এদিকে আসা ছেড়েই দিয়েছেন আজকাল। বসুন ভাল হয়ে। চা খাবেন?

জগন্নাথ চাটুজ্জে এক গাল হেসে বললে, তা মা, দে না হয় করে।

নিজের বাড়িতে জগন্নাথের চা খাওয়ার পাট নেই কোন কালে, তবে পরের বাড়িতে হলে কোন কিছু খাওয়াতেই আপত্তি নেই জগন্নাথের।

কেদার বললেন, তারপর, তোমাদের ইস্কুলের বাড়ি আরম্ভ হবে কবে?

—জিনিসপত্র যোগাড় হলেই হবে। প্রভাস টাকা দিলেই আমরা কাজ আরম্ভ করে দিই। একটু তামাক সাজো ভালো করে ভায়া। চা-টা তোমার এখানেই খাওয়া যাক।

কিছুক্ষণ পরে শরৎ এসে দু-পেয়ালা চা সামনে রাখল। সে সকালেই স্নান সেরে নিয়েছে, পরনে সরুপাড় ফর্সা ধুতি, একরাশ ভিজে এলো চুল পিঠে ফেলা—গায়ের রং ফুটেছে স্নান করে—লম্বা পাতলা দেহ, সুন্দর ভুরু, বড় বড় চোখ—প্রতিমার মত সুশ্রী।

চা নামিয়ে বললে, জ্যাঠামশায়, বসুন, একটা জিনিস খাওয়াবো। খাবেন তো?

—কি মা?

—সে এখন বলছি নে। আনি আগে, তখন দেখবেন?

শরৎ একটা পাথরের খোড়া ভর্তি বাসি পায়েস এনে জগন্নাথের সামনে রাখলে। হাসিমুখে বললে, খান। বাবা বড় ভালবাসেন বলে কাল রাত্রে করেছিলুম—তা আজ সকালে অনেকখানি রয়েছে দেখলাম। বাবা চেয়েছিলেন খেতে কিন্তু ওঁকে এখন আর দেবো না, দুপুরে ভাতের সঙ্গে দেবো বলে রাখলাম খানিকটা।

এমন সময় গ্রামের আরও অনেকের সঙ্গে প্রভাসকে দূরে আসতে দেখে কেদার বললেন, ও শরৎ, আরও সবাই আসছে। চা আর হবে নাকি?

শরৎ বললে, ক' পেয়ালা ?

—চার-পাঁচ পেয়ালার মত হোক না হয়।

—তা হবে না, দুধ নেই। কাল রাত্রে একটু দুধ রেখেছিলাম, তাই দিয়ে তোমাদের করে দিলাম। এক পেয়ালার মত একটুখানি পড়ে আছে।

—তবে প্রভাসের জন্যে শুধু এক পেয়ালা করে দে। ও গাঁয়ে কখনো আসে না, ওকে দেওয়া উচিত আগে। আর সব তো ঘরের লোক।

ওরা কিন্তু কেউই বাড়ির কাছে এল না। অতিথিশালার কাছে এসে সাতকড়ি চৌধুরী ডাক দিয়ে বললেন,—ও কেদার দাদা, এসো এদিকে প্রভাস এসেছেন—আর কে বসে ওখানে—জগন্নাথ খুড়ো ?

কেদার বললেন, তুমি বসে পায়েস খাও দাদা, আমি যাই দেখি।

সাতকড়ি বললেন, কোথা থেকে ইট দেবে হে ? চলো নিয়ে।

—চলো, কালো পায়রার দীঘির পাড়ে জঙ্গলে অনেক ইট আছে। দুটো মন্দিরের ভাঙা ইটের রাশি। তাই নিও—কি বলো ?

প্রভাস চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল বিস্ময়ের দৃষ্টিতে। সে এ-গ্রামে ইতিপূর্বে কয়েকবার এলেও কেদারের বাড়ি কখনো আসে নি বা গড়ের মধ্যেও কখনো ঢোকে নি। এত বড় বড় ভাঙা ঘরদোর ও মন্দির যে এখানে আছে সে তা জানতো না। আগে জানলে সে ক্যামেরাটা নিয়ে আসতো কলকাতা থেকে।

কেদার তাকে বললেন, চলো প্রভাস, ওখানে জগন্নাথদা বসে আছেন, তুমিও একটু চা খাবে এসো। এসো সাতু ভায়া, তুমিও এসো।

উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে চা পান করতে অভ্যস্ত নয় কেউই, সাতকড়িও না। সুতরাং প্রভাস ছাড়া আর কেউ চা খেতে গেল না।

সাতকড়ি বললেন, ঘুরে এসো প্রভাস, দেরি না হয়—আমরা এখানেই আছি।

প্রভাসকে ঘরের দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে বসিয়ে কেদার মেয়েকে চা দিতে বললেন। শরৎ এসে চা দিয়ে যাবে, কিন্তু অপরিচিত প্রভাসের সামনে হঠাৎ আসতে সঙ্কোচ বোধ করে পেয়ালা হাতে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে দেখে কেদার বললেন, ওকে দেখে লজ্জা করতে হবে না, বুঝলি মা। ও আমাদের গাঁয়ের ছেলে—এখনই না হয় থাকে কলকাতায়। ও পর নয়। দিয়ে যাও চা।

শরৎ এসে প্রভাসের সামনে চা রাখলে। প্রভাস শরৎকে কখনো দেখে নি বলা বাহুল্য—চা দেবার সময় সে মৃদু কৌতুহলের সঙ্গে প্রথমটা একবার শরতের দিকে চাইলে···কিন্তু শরৎকে দেখবার পরক্ষণেই প্রভাসের চোখমুখ যেন অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মুখের চেহারা যে বদলে গেল অতি অল্পক্ষণের জন্যে, এ যে-কেউ দেখলেই বলতে পারতো।

প্রভাস আশা করে নি এত সুন্দরী মেয়েকে আজ সকালে এই ভাঙা-ইটের-স্তূপে-ঘেরা জঙ্গলাবৃত ক্ষুদ্র বাড়িতে এ ভাবে দেখতে পাবে। এত রূপ আছে, এই সব পাড়াগাঁয়ে !

প্রভাস থতমত খেয়ে চায়ের পেয়ালাটা হাতে তুলে নিলে।

কেদার বললেন, তোমাদের কলকাতায় কোথায় থাকা হয় বাবাজি ?

প্রভাস অন্যমনস্ক হয়ে কি যেন ভাবছিল, কেদারের প্রশ্নে যেন চমকে উঠে বললে, আমায় বলছেন ? আপার সারকুলার রোড।

—তোমার বাবার শরীর কেমন ?

—আছে ভাল, তবে উঠতে হাঁটতে পারেন না। বয়েস তো হ'ল কম নয়। সাহেব ডাক্তার দেখছে—তবে এ বয়েসের রোগ—

—তোমার একটি ছোট ভাই আছে শুনেছিলাম, সে কি করে ?

—সেও দোকানে বেরোয়। খুব ছোট নয়, তার বয়েস এই সাতাশ বছর হল।

জগন্নাথ চাটুজ্জে বললে, বাবাজি বিয়ে করেছ কোথায় ?

—কই, আমি বিয়ে তো করি নি এখনও।

কেদার জানতেন না যে প্রভাস অবিবাহিত। প্রভাসের সম্বন্ধে এ কথা তিনি কারো মুখে শোনেন নি।

তিনি বিস্ময়ের সুরে বললেন, বিয়ে করো নি! তা তো জানতাম না।

জগন্নাথ চাটুজ্জে বললেন, আমিও জানতাম না। বাবাজির বয়েস অবিশ্যি এখনও—বয়েসটা কত হ'ল বাবাজি ?

—আজ্ঞে, একত্রিশ যাচ্ছে।

—ওঃ, একত্রিশ। যথেষ্ট সময় আছে। তোমাদের এখনো যথেষ্ট—

—সে জন্যে নয় কাকাবাবু, বিয়ে আমার করবার ইচ্ছে নেই।

—বলো কি বাবাজি! তোমাদের রাজার মত সম্পত্তি, বাড়িঘর, বিয়ে করবে না কি রকম ?

প্রভাস হাসি-হাসি মুখে চুপ করে রইল।

জগন্নাথ চাটুজ্জে বললে, রাসু-দাদা কিছু বলেন না এ নিয়ে ?

—অনেক বড় বড় সম্বন্ধ এনেছেন। হুগলী বালিতে একবার পঁচিশ হাজার টাকা দেবে আর হীরে জহরতের জড়োয়া—বাবা কিছুতেই ছাড়বেন না। বাবাকে বললাম, অমন সম্বন্ধ এর পরে জোটবার অভাব হবে না, যদি আমি বিয়েই করি। বাবা তাদের জানিয়ে দিলেন, কিন্তু তবুও তারা পীড়াপীড়ি করতে লাগল এমন যে, আমি ওয়ালটেয়ার পালিয়ে গেলাম—সেখানে আমাদের বাড়ি আছে কি না! বছর পাঁচ-ছয় হ'ল বাবা হাইকোর্টের সেলে কিনেছিলেন।

কেদার বললেন, কি জায়গাটা বললে বাবাজি—কোথায় সেটা ?

—ওয়ালটেয়ার। সমুদ্রের ধারে।

সমুদ্র কোন্ দিকে কত দূরে, কেদারের সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব ছিল, কিন্তু জগন্নাথ চাটুজ্জের জামাই রেলে কাজ করে, সে গত পুজোর সময় সস্ত্রীক পাশ নিয়ে পুরী গিয়েছিল। জগন্নাথ চাটুজ্জের জানা আছে মাত্র এইটুকু যে পুরী নামক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানটি সমুদ্রের ধারে—সে সমুদ্র যত দূরেই হোক বা যে দিকেই হোক। সুতরাং সে জিজ্ঞেস করলে—পুরীর কাছে বাবাজি ?

—না, পুরী থেকে অনেক নিচে।

বলা বাহুল্য, পুরীর নিচে বা ওপরে কি ভাবে আর একটা জায়গা থাকতে পারে এ কথা জগন্নাথ বা কেদার কারো কাছেই তেমন পরিস্ফুট হ'ল না। সে দিক থেকে বরং সমস্যা জটিলতর হয়ে দাঁড়াতো এদের কাছে, কিন্তু শরৎ দোরের কাছে দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তা শুনছিল, সে তার বাবার মুখের দিকে চেয়ে বললে—পুরীর আরও দক্ষিণে হ'ল তা হলে—না বাবা ?

কেদার বিপন্নমুখে বললেন, হাঁ—দক্ষিণে ?—তাই—ইয়ে দক্ষিণেই তো তা হলে গিয়ে—

প্রভাস হঠাৎ শরতের মুখের দিকে একটু বিস্ময়-মিশ্রিত প্রশংসার দৃষ্টিতে চেয়েই তখনই আবার চোখ ফিরিয়ে নিয়ে জগন্নাথের দিকে চেয়ে বললে, ঠিক বলেছেন উনি। দক্ষিণেই হ'ল।

এবার সকলে পুকুরের পাড়ের জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলো ইট দেখবার জন্যে। ছাতিম-বনের

তলায় এদিক ওদিক ছড়ানো ভাঙা ঘরবাড়ি ও প্রাচীন দেউলগুলির ধ্বংসস্তূপ সকলকেই বিস্ময়াবিষ্ট করে তুললো। বেতের দুর্ভেদ্য ঝোপের আড়ালে কতদূরে পর্যন্ত ছড়ানো বড় বড় ইটের স্তূপ, পাথরের কড়ি, পাথরের চৌকাঠ, নক্সা করা প্রাচীন ইট, ভাঙা থামের মাথা, সকলেরই মনে বর্ত্তমানের বহুদূরে পিছনকারে এক লুপ্ত বিস্মৃত অতীতের রহস্যময় বার্ত্তা ক্ষণকালের জন্যে বহন করে নিয়ে এল—যাতে জগন্নাথ চাটুজ্জের মত কল্পনাশূন্য নিরেট ব্যক্তিকেও বলতে শোনা গেল—বাস্তবিক! এসব দেখলে মন কেমন করে—কি বলো সত্যি বাবাজি?

সাতকড়ি ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বললেন, তা আর করে না?

কিন্তু সকলের চেয়ে বিস্ময়ান্বিত হয়েছে প্রভাস—তা তার মুখ দেখেই বেশ বোঝা গেল।

প্রভাস এ-সব কোনোদিন দেখে নি—বা তাদের গ্রামে যে এরকম আছে তা শুনলেও সেটা যে এই ধরণের ব্যাপার তা জানত না।

সে বিস্ময়ের সুরে বললে, ওঃ এ তো অনেক কাল আগেকার! এ-সব কীর্ত্তি ছিল কাদের?

সাতকড়ি বললেন, এই আমার কেদার দাদার পূর্ব্বপুরুষের—আবার কার? এঁরাই গড়শিবপুরের রাজবংশ। কেন তুমি জানতে না বাবাজি? যাক্ দেখে নাও দিকি ক'গাড়ি ইট হবে বা কোন্ দিক থেকে খুঁড়বে।

প্রভাস চুপ করে রইল। জগন্নাথ চাটুজ্জে বললে, যেখান থেকে হয় হাজার দশেক ইট আপাততঃ নাও না। কেদার ভায়ার কোনো আপত্তি নেই তো?

কেদার নির্ব্বিকার মানুষ—কোনো প্রকার ভাব বা অনুভূতির বালাই নেই তাঁর। তিনি বললেন, না আমার আপত্তি কি? ইট তো পড়েই রয়েছে।

সাতকড়ি বললেন, কিন্তু এ ইটের দাম কিছু দিতে পারবো না কেদার দাদা, তা আগে থেকেই বলে রাখছি।

কেদার ক্ষুদ্র মনের পরিচয় কোনোদিন দেন নি—তিনি দিলদরিয়া মেজাজের মানুষ সবাই জানে। বললেন, কিছু বলবার দরকার নেই সে-সব। নিয়ে যাও না ভায়া—আমি কি তোমায় বলেছি দামদস্তুরের কথা?

ইতিপূর্ব্বেও কেদারের অবৈষয়িকতা ও ঔদার্য্যের সুযোগ নিয়ে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের বহু লোক গড়ের ধ্বংসস্তূপ থেকে বিনামূল্যে গাড়ি গাড়ি ইট নিয়ে গিয়েছে ঘরবাড়ি তৈরী বা মেরামতের জন্যে—অর্থকষ্ট যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও কেদার কারো কাছে মূল্য চাইতে পারেন নি বা কাউকে বিমুখও করেন নি কোনোদিন, অথচ যেখানে পুরোনো ইটের হাজার-করা দর পাঁচ টাকা করে ধরলেও কেদার ইট বিক্রি করেই অন্ততঃ দেড় হাজার টাকা নিট্ দাম আদায় করতে পারতেন।

কিন্তু তা কখনো করবেন না কেদার। রাজবংশের ছেলে হয়ে পূর্ব্বপুরুষের ভিটের ইট বিক্রী করে টাকা রোজগার? ছিঃ?···এমনি দেবেন। লোকের উপকার হয়, হোক না।

সাতকড়ি বললেন, তা হলে প্রভাস বাবাজি, কাল থেকে লোক লাগিয়ে দিই—কি বল?

প্রভাস বললে, বেশ, নিয়ে যান—আমি তো বলেছি কাজ আরম্ভ করুন।

ক্ষণকালের সে ভাবান্তর কেটে গিয়েছে সকলের মন থেকেই। এরা অন্য ধাতের মানুষ, প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বাস্তব ছাড়া অন্য কোনো জগতের সঙ্গে এদের বিশেষ পরিচয় নেই।

কেদার দেখিয়ে দিলেন কোন্ পথে ইটের গাড়ি আসতে পারে, কারণ তিনি ভিন্ন গড়ের জঙ্গলের আন্ধি-সান্ধি বড় কেউ একটা জানে না।

কাজ মিটে গেল। সাতকড়ি বললেন, চলো সবাই জঙ্গলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে যাই—মশার কামড়ে মলাম।

বনের মধ্যে একটু যেন ভিজে ভিজে এখনও গাছপালা—বেলা বেশী হয়েছে বটে, কিন্তু ঘন ছাতিম-বনের আবরণ ভেদ করে সূর্য্যকিরণ এখনও বনের তলায় পড়ে নি। কি একটা বনফুলের সুমিষ্ট গন্ধ ঠাণ্ডা বাতাসে।

প্রভাস সমস্ত পথ ঘোর অন্যমনস্ক ভাবে চলে এল। সে আজ যেন কেমন হয়ে গিয়েছে।

গড়বাড়ি থেকে বার হয়ে গ্রামে ঢুকবার মুখে সে কেদারকে বললে, আপনি বাড়ি থাকেন না কোথাও চাকরি করেন?

কেদার বললেন, না বাবাজি, চাকরি-টাকরি কখনো আমাদের বংশে করে নি কেউ। বাড়িই থাকি।

—আসুন না একবার কলকাতায়? আমাদের বাড়ি রয়েছে—দয়া করে সেখানে গিয়ে—

—আমার কখনো কোথাও যাওয়া হয় না—বাড়ি ফেলে, তা ছাড়া মেয়েটা একলা বাড়িতে—ইয়ে হ্যাঁ। এই সব কারণে যেতে পারি নে কোথাও। আর ধরো গিয়ে আমার বাড়ি একেবারে গাঁয়ের বাইরে। মানুষজন নেই। ফেলে যাই কি করে?

এ কথার প্রভাস বিশেষ কোনো জবাব দিলে না।

কেদার আবার বললেন, তুমি এখন ক-দিন থাকবে?

প্রভাস বললে, না আমি কালই যাবো বোধ হয়। কলকাতায় অনেক কাজ রয়েছে পড়ে। পরশু তারিখের একটা পোস্ট-ডেটেড্ চেক্ রয়েছে মোটা টাকার—আমি না গেলে সেখানো ব্যাঙ্কে প্রেজেণ্ট করা হবে না।

কেদার আদৌ বুঝলেন না জিনিসটা কি। ব্যাঙ্ক জিনিসটা তিনি জানেন, শুনেছেন বটে—কিন্তু পোস্ট-ডেটেড্ চেক্ কথার অর্থ কি, বা সে কি ব্যাপার—এ সব সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান নেই তাঁর। তিনি শুধু বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে বললেন, ও! ঠিক ঠিক।

ওরা চলে গেল সবাই। কেদার এত বেলায় অন্য কোথাও যাওয়া উচিত না বিবেচনা করে বাড়ির দিকেই ফিরছেন এমন সময় গেঁয়োহাটির ক্ষেত্র কাপালির সঙ্গে দেখা। সে গড়ের খাল পার হয়ে তাঁর বাড়ির দিক থেকেই আসছে। কেদার বললেন, কি হে ক্ষেত্র, আমার ওখানে গিয়েছিলে নাকি?

—প্রাতপেন্নাম দা-ঠাকুর। মোদের গাঁয়ে ওবেলা যাতি হবে একেবারে ভুলে গিয়ে বসে আছো। দা-ঠাকুর আমাদের একেবারে বোম্ ভোলানাথ। মনে নেই আজ আমাদের যাত্তারার দলের আখড়াই? আপনি গিয়ে বেয়ালা না ধরলি আসর জমবে, না আসরে ঢোলক বাজবে? চলো দা-ঠাকুর—তোমার বাড়ি গিয়েছিলাম, তা মা-ঠাকরুণ বললেন তিনি কোথায় গিয়েছেন বেরিয়ে।

—ভালই তো—তা ক্ষেত্র, তুমিও দুটো খেয়ে যাও আমার বাড়ি, চলো না? বেলা হয়ে গিয়েছে, চলো।

ক্ষেত্র কাপালি রাজী হ'ল না। সে চলে গেল, যাবার সময় কেদারকে তাদের গ্রামে যেতে বলে গেল বার বার করে।

কেদার বাড়ি ফিরে দেখলেন শরৎ রান্না সেরে বসে আছে। বললে, বাবা, নেয়ে নাও, ভাত হয়ে গিয়েছে কতক্ষণ। ওরা সব চলে গেল, ইট নিয়েছে?

—হ্যাঁ। ইট কাল গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে যাবে।

—গেঁয়োহাটির ক্ষেত্র এসেছিল তোমার খোঁজে। দেখা হয়েছে?

—এই তো গেল। ওবেলা ওদের আখড়াই বসবে তাই ডাকতে এসেছিল কিনা? খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নেবো—তার পর যাবো ওদের গাঁয়ে। তেল দাও।

ঘুমিয়ে উঠে বেলা তিনটের সময় কেদার গেঁয়োহাটি রওনা হবার উদ্যোগ করছেন, এমন

সময় ভাঙা দেউড়ির রাস্তায় প্রভাসকে আসতে দেখে হঠাৎ বড় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

—আরে, এসো এসো বাবাজি এসো! কি মনে করে?…

প্রভাস একা এসেছে। ওবেলার সাজ আর এবেলা নেই গায়ে—সাদা সিল্কের একটা শার্ট পরেছে, হাতে ও গলায় সোনার বোতাম, পরনে জরিপাড় ধুতি, পায়ে নতুন ফ্যাশনের খাঁজকাটা জুতো। হাতের পাঁচ আঙ্গুলের মধ্যে তিন আঙ্গুলে পাথর-বসানো আংটি রোদ পড়ে চিক্‌চিক্‌ করছে।

—ও শরৎ, মা এদিকে এসো—প্রভাসকে একটা বসার জায়গা দাও। চা খাবে তো প্রভাস? হ্যাঁ, খাবে বৈকি, বোসো বোসো।

প্রভাস বললে, আপনাদের এখানে মোটর আসবার রাস্তা নেই। গাড়িখানা গড়ের খালের ওপারে দাঁড় করিয়ে রেখেছি।

শরৎ একটা আসন বার করে প্রভাসকে বসতে দিয়ে রান্নাঘরের দিকে সম্ভবতঃ চা করতে গেল। প্রভাস বসে চারিদিকে তাকিয়ে বললে, আমি এর আগে কখনো গড়বাড়িতে আসি নি, খুব কাণ্ড ছিল তো এক সময়! দেখে শুনে সত্যিই অবাক হয়ে যাবার কথা বটে। কি ছিল, তাই ভাবি! মন কেমন যেন হয়ে যায়। না, কাকা?

কেদার এ ধরণের কথা অনেক লোকের মুখ থেকে অনেক বার শুনেছেন, শুনে আসছেন তাঁর বাল্যকাল থেকে। এই সব ইট-পাথরের ঢিবি আর জঙ্গলের মধ্যে লোকে কি যে দেখতে পায়, তিনি ভেবেই পান না। পয়সা থাকলেই বোধ হয় মানুষের মনে এ-সব অদ্ভুত ও আজগুবী মনোবৃত্তির সৃষ্টি হয়—কে জানে? কেদারের কৌতুক হয় এ ধরণের কথা শুনলে। থাকে সব কলকাতায় বড় বড় বাড়িতে, ইলেকট্রির আলো আর পাখার তলায়, এই সব পাড়াগাঁয়ে এসে যা দেখে তাই ভাল লাগে—আসল কথাটা হ'ল এই। একবার অনেক দিন আগে মহকুমার হাকিম এসেছিলেন এই গ্রামে কি একটা মোকদ্দমার তদারক করতে। যেমন সকলেই আসে, তিনি এলেন গড়শিবপুরের রাজবাড়ি দেখতে। কেদারের ডাক পড়ল। কেদার তো সংকোচে জড়সড় হয়ে হাকিমের সামনে হাজির হলেন। হাকিম-হুকুমকে বিশ্বাস নেই, কাঁচা-খেকো দেবতা সব।

হাকিম জিজ্ঞেস করলেন, আপনি গড়শিবপুরের রাজবংশের লোক?

—আজ্ঞে, হুজুর।

—আপনাকে দেখে আমার মনের মধ্যে কি হচ্ছে জানেন? আপনি কে আর আমি কে! আপনি এ পরগনার রাজা—আর আমি—আপনার একজন কর্ম্মচারীর সমান।

কেদার সম্ভ্রম দেখিয়ে নীরব রইলেন। বড়লোক খেয়াল-খুশিতে অনেক কিছু বলে—সব কথার জবাব দিতে নেই।

শরৎ তখন মাত্র পনেরো বছরের মেয়ে, উদ্ভিন্ন-যৌবনা, অপূর্ব্ব সুন্দরী। হাকিম তাকে কাছে ডেকে আদর করে বললেন, মাকে আমি নিয়ে যেতাম, যদি আজ রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হতাম, আমার সে সৌভাগ্য নেই। আমার ছেলেটি এবার বি-এ পাশ করেছে। কিন্তু বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণের সঙ্গে তো আপনি কাজ করবেন না। মা আমার রাজবংশের মেয়ে বটে! ওর সেবা পাবো, সে ভাগ্য কি আর করেছি?

শরৎ মুখ নীচু করে রইল লজ্জায় ও সংকোচে।

দশ-এগারো বছর আগেকার কথা।

শরৎ প্রভাসের সামনে চা এনে দিলে। সে খুব সরুপাড় একখানা ধুতি পরেছে, হাতে দু-গাছা সোনার চুড়ি—মায়ের হাতের বালা ভেঙে ক-গাছা চুড়ি হয়েছিল, এই দু-গাছা তার মধ্যে অবশিষ্ট আছে। জড়িয়ে এলো-খোঁপা বাঁধা, দেখলে ওকে উনিশ-কুড়ি বছরের

বেশি বলে কিছুতেই মনে হয় না, এমনি লাবণ্যভরা মুখশ্রী।

প্রভাসের দিকে চেয়ে বললে, দেখুন তো আর চিনি দেব কি না—

প্রভাস চায়ে চুমুক দিয়ে একটু সংকোচের সুরে বললে, আজ্ঞে না। আমি চিনি কম খাই—

কেদার বললেন, তার পর, কি মনে করে বাবাজি ?

প্রভাস যেন আমতা আমতা করে উত্তর দিলে—ইয়ে—এই কিছু না—এই দিক দিয়ে যাচ্ছিলাম কি না !···তাই—

—বেশ বেশ। বোসো বাবাজি—

প্রভাস চা পান করে বসে রইল বটে, তবে একটু উশখুশ করতে লাগল। বসে থাকাটা তার পক্ষে যেন বড়ই অস্বাচ্ছন্দ্যকর হয়ে উঠছে। অথচ মুখেও কোনো কথা যোগায় না। এমন অবস্থায় সে কখনো পড়ে নি।

কেদার বললেন, তুমি কালই তো কলকাতায় যাবে—না ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কাল দুপুরে রওনা হবো খেয়ে-দেয়ে।

আবার সে একটু উশখুশ করতে লাগল।

তার এ ভাবটা বুদ্ধিমতী শরতের চোখ এড়ালো না। তার মনে হ'ল প্রভাস কিছু বলবার জন্যে এসেছে—কিন্তু তা বলতে পারছে না। সে একটু বিস্ময়মিশ্রিত কৌতূহলের দৃষ্টিতে প্রভাসের দিকে চেয়ে রইল।

পরক্ষণেই প্রভাস পকেট থেকে একটা ছোট মখমলের বাক্স সসংকোচে বার করে বললে, এইটে এনেছিলাম দিদির জন্যে—

কেদার বিস্ময়ের স্বরে বললেন, কি ওটা ?

—এই গিয়ে—একটা আংটি—

—শরতের জন্যে এনেছ ?

—হ্যাঁ—ভাবলাম, কখনো আসিনে—যখন আলাপ হয়েই গেল আপনাদের সঙ্গে, তাই—

কেদার হাত বাড়িয়ে মখমলের বাক্স হাতে নিয়ে বললেন, দেখি ? বাঃ বাক্সটি বেশ ! আংটিটা—এ যে দেখছি বেশ দামী জিনিস ! এ তুমি আনলে কোথা থেকে ?

—ওবেলা মোটরে চলে গিয়েছিলাম রাণাঘাট। সেখানে থেকে কিনে এনেছি—আমার জানাশুনো দোকান, এ জিনিস বাইরে শো-কেসে সাজিয়ে রাখে না। আমাকে চেনে বলে বার করে দিলে।

—কত দাম নিয়েছে ?

প্রভাস সলজ্জভাবে বললে, সে কথা আর কেন জিজ্ঞেস করছেন কাকাবাবু। দাম আর কি, অতি সামান্য—আপনাদের দেওয়ার মত কিছু না—

কেদার আংটিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, আমার মনে হচ্ছে তুমি বেশ পয়সা খরচ করেছ। এ পাথরখানা তো বেশ দামী, হীরে বোধ হয়—না ?

প্রভাস একটু উৎসাহের সুরে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। দেড় রতি ওজন, আসল পাথর। তবে দামদস্তুরের কথা এখনও সেক্‌রার সঙ্গে কিছু হয় নি—

কেদার বাক্সটা প্রভাসের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, কেন এত খরচপত্র করতে গেলে অনর্থক ? এ তুমি নিয়ে যাও বাবাজি। এ দরকার নেই।

প্রভাসের মুখে যেন কে কালি লেপে দিল। সে ভয়ে ভয়ে বললে—এনেছিলাম দিদিকে দেবো বলে—খুব আশা করেছিলাম—যদি অপরাধ না নেন—

—না বাবাজি—শরৎ বিধবা মানুষ, ও আংটি-টাংটি পরে না তো। ও বড় গোঁড়া ধরণের

মেয়ে। এতদিন চুল কেটে ফেলতো, শুধু আমার ভয়ে পারে না।

প্রভাস কিছু কথা খুঁজে না পেয়ে চুপ করে রইল। কেদারের মনে কেমন একটু সহানুভূতি জাগলো প্রভাসের প্রতি—বেচারী যেন বড়ই লজ্জিত ও অপ্রতিভ হয়ে পড়েছে আংটির বাক্স ফেরত দেওয়ায়। নাঃ, এদের সব ছেলেমানুষি কাণ্ড!

মেয়ের দিকে চাইতে গিয়ে কেদার দেখলেন শরৎ কখন সেখান থেকে সরে গিয়েছে। ডাকলেন—ও শরৎ, শোনো মা—

শরৎ ঘরের ভেতর থেকে জবাব দিলে—কি বাবা?

—হ্যাঁরে, প্রভাস একটা আংটি দিতে চাচ্ছে তোকে—কি করবি? রাখবি?

শরৎ আড়াল থেকেই বললে—আমি কি জানি? তুমি যা ভাল বোঝো।···আংটি আমি তো পরি নে—তবে উনি যখন হাতে করে এনেছেন থাক জিনিসটা।

কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে শরৎ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে বললে—দেখি?

প্রভাস জিনিসটা কেদারের হাতে দিলে—তিনি মেয়ের হাতে তুলে দিলেন সেটা। প্রভাস শরতের দিকে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে চেয়ে দেখল—কিন্তু শরৎ তখন বাক্সটি খুলে আংটি নেড়েচেড়ে দেখছে—তার চোখ অন্যদিকে ছিল না।

কেদার হাসিমুখে বললেন—পছন্দ হয়েছে তোর? তা পছন্দ হবার জিনিস বটে। আমি শুধু বলছি প্রভাসকে যে এত খরচ করবার কি দরকার ছিল? এখান থেকে সাত ক্রোশ তফাৎ রাণাঘাটের বাজার। মটোর গাড়ি আছে তাই যেতে পেরেছিলে বাবাজি।

প্রভাসের মুখ উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল, সে বললে, দিদিকে একটা সামান্য জিনিস দিলাম—এতে খরচপত্রের কি আর—কিছুই না। অতি সামান্য জিনিস—

শরৎ বললে, বসুন আপনি। আমি খাবার করছি, খেয়ে যাবেন। ততক্ষণ বাবা একটু গল্প করো না প্রভাসবাবুর সঙ্গে।

কেদার আসলে খুব সন্তুষ্ট নন, তিনি একটু বিরক্তই হয়েছেন প্রভাস আসাতে। বেলা পড়ে আসছে, এখন তাঁর বেরুবার সময়—গেঁয়োহাটির আখড়াইয়ের আসরে বেহালা না বাজালে আখড়াই জমবে না, ক্ষেত্র কাপালি বলে গিয়েছে ওবেলা।

আর ঠিক এই সময়ে এসে কিনা জুটলো প্রভাস!

একে তো মেয়ে বাড়ি থেকে বেরুতে দেয় না, তার ওপর যদি প্রতিবেশীরা পর্য্যন্ত বাদ সাধে, তবে তিনি বাঁচেন কি করে!

শরৎ ঘরের মধ্যে চলে গিয়েছে খাবার করতে—কেদার আর কিছুক্ষণ বসে প্রভাসের সঙ্গে অন্যমনস্কভাবে একথা ওকথা বললেন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল তাঁর মন নেই কথাবার্ত্তার দিকে—গেঁয়োহাটিতে একটা ছিটের বেড়ার দেওয়াল দেওয়া চালাঘরে এতক্ষণ কত লোক জুটেছে—সবাই তাঁর আগমন-পথের দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে—তিনি না গেলে আখড়াইয়ের আসর একেবারে মাটি।

বেলা বেশ পড়ে এসেছে। এখান থেকে দেড় ক্রোশ রাস্তা গেঁয়োহাটি—অনেক দূরে।

হঠাৎ তিনি উঠে পড়ে বললেন, মা, প্রভাস বাবাজি রইলেন বসে। তুমি খাবার করে খাইয়ে দিও। আমার বিশেষ দরকার আছে—গেঁয়োহাটিতে খাজনার তাগাদা আছে। প্রভাসের দিকে চেয়ে বললেন—বোস তুমি বাবাজি, কিছু মনে কোরো না—

মেয়েকে কোনো রকম প্রতিবাদের সুযোগ না দিয়েই তিনি দাওয়া থেকে নেমে উঠোন পার হয়ে ভাঙা দেউড়ির দিকে হন্ হন্ করেই হাঁটতে শুরু করলেন। অনেক সময় এ-রকম ক্ষেত্রে মেয়ে ছুটে এসে পথ আটকায়—পূর্ব্বের অভিজ্ঞতা থেকে কেদার এ জানেন কি না।

শরৎ রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বললে, যেও না বাবা—শোনো বাবা—খেয়ে যাও খাবার

—শোনো ও বাবা—

সঙ্গে সঙ্গে সে খুন্তি হাতে রান্নাঘর থেকে বার হয়ে এসে নিচু চালের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে চেয়ে দেখলে, কেদার ভাঙা দেউড়ির পথে অদৃশ্য হয়েছেন।

তার লজ্জা করতে লাগল, প্রায় অপরিচিত প্রভাস যে বসে সামনে—নইলে সে এতক্ষণ দেখিয়ে দিতো বাবা জোরে হেঁটে কতদূরে পালান। গড়ের খালে নামবার আগেই সে ছুটে গিয়ে ধরে ফেলতো বাবার হাত।

—ছিঃ, কি অন্যায় বাবার!

প্রভাসের দিকে চেয়ে বললে, একটু বসুন, কেমন তো? আমি মোহনভোগ চড়িয়ে এসেছি কড়ায়—আসছি নামিয়ে—

প্রভাস খানিকক্ষণ একা বসে থাকবার পরে শরৎ কাঁসার কানা-উঁচু রেকাবিতে মোহন-ভোগ এনে ওর সামনে রাখলে, আর এক গেলাস জল।

—কেমন হয়েছে বলুন তো প্রভাসদা?

শরতের স্বর সম্পূর্ণ নিঃসংকোচ—আত্মীয়তার সহজ হৃদ্যতায় মধুর ও কোমল।

প্রভাস একটু অবাক হয়ে গেল ওর 'দাদা' ডাকে।

শরতের মুখের দিকে চেয়ে বললে, আপনি কি করে জানলেন আমি আপনার চেয়ে বড়?

শরৎ মৃদু হাসিমুখে জবাব দিলে—আমি জানি।

—কি করে জানলেন?

—বারে, ভুলে গেলেন? ওবেলা তো জগন্নাথ জ্যেঠাকে বললেন এখানে বসে আপনার বয়সের কথা।

এইবার প্রভাসের মনে পড়ল। ওবেলা এ-কথা উঠেছিল বটে। সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, বেশ হ'ল, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল—

শরৎ সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বললে, কেমন হয়েছে মোহনভোগ বললেন না যে?

—খু-ব ভাল হয়েছে। সত্যি বলছি চমৎকার হয়েছে—

—মা খুব ভাল করতে পারতেন, তেমনটি আমার হাতে হয় না।

—আমার একটা অনুরোধ রাখুন। আংটিটা পরুন আমার সামনে—

শরৎ বাক্সটা খুলে আংটিটা হাতে নিয়ে আঙুলে পরে বললে, বেশ হয়েছে। এই দেখুন—

প্রভাস আনন্দে গলে গিয়ে বললে, কি চমৎকার মানিয়েছে আপনার আঙুলে।

শরৎ ছেলেমানুষের মত খুশিতে নিজের আঙুলের দিকে বার বার চেয়ে দেখতে লাগল।

প্রভাস বললে, আচ্ছা, আপনি একা থাকেন, কাকা বেরিয়ে গেলে ভয় করে না আপনার?

—ভয় করলেই বা করছি কি বলুন—উপায় তো নেই। বাবা লুকিয়ে পর্যন্ত পালিয়ে যান, পাছে আমি আটকে রাখি। ওঁর ছেলেমানুষি স্বভাব—দেখে আসছি এতটুকু বেলা থেকে। মা বেঁচে থাকতেও ঠিক অমনি করতেন—

—আচ্ছা, আপনি কখনো কলকাতা দেখেছেন?

শরৎ ঠোঁট উল্টে হেসে বললে, কলকাতা! উঃ—তা আর জানি নে! কখনো জীবনে গোয়াড়ি কেষ্টনগর কি নবদ্বীপ দেখলাম না, তার কলকাতা। আমি এই গড়ের খালের জঙ্গলে কাটালাম সারা জীবনটা প্রভাসদা—সত্যি বলছি ভাল লাগে না।

প্রভাস যেন বড় উৎফুল্ল হয়ে উঠল—পরক্ষণেই আবার সে ভাবটা চেপে সহজ তাচ্ছিল্যের সুরে বললে, এ আর কি কঠিন আপনার কলকাতা দেখা! যেদিন মন করবেন, সেদিনই হতে পারে।

শরৎ হর্ষদীপ্ত স্বরে বললে, আপনি নিয়ে যাবেন প্রভাসদা?

প্রভাস সোৎসাহে বললে, কেন নিয়ে যাব না? বলুন না আপনি কবে যাবেন? মোটর তো রয়েছে—টানা মোটরে বেড়িয়ে আসবেন কলকাতা।

—খুব ভাল কথা প্রভাসদা। যাব এর মধ্যে একদিন। একঘেয়েমি বরদাস্ত হয় না আর।

প্রভাস একহাত জমি শরতের দিকে এগিয়ে বসল উৎসাহের ঝোঁকে। বললে—আপনাকে আজ নতুন দেখছি চটে, কিন্তু মনে হয় যেন আপনার সঙ্গে আমার আলাপ আজকের নয়, অনেক পুরোনো।

কি জানি কেন, এ কথা শরতের কানে ভাল শোনালো না—সে নিজেকে কিছু দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল। প্রভাসের কথার কোন উত্তর সে দিলে না।

প্রভাস বোধ হয় শরতের এ ভাব লক্ষ্য করলে। সে সুর বদলে বললে—আপনার বাবা বড় ভাল লোক, ওঁকে আমার নিজের বাবার মত ভাবি।

বাবার প্রশংসা শুনে শরতের মন আহলাদে পূর্ণ হয়ে গেল। তার বাবাকে গ্রামের কেউ প্রশংসা করে না, অন্ততঃ সে তো বড়-একটা শোনে নি কখনো কারো মুখে, এক রাজলক্ষ্মী ছাড়া। কিন্তু রাজলক্ষ্মী বালিকা মাত্র, তার মতামতের মূল্য কি?

শরৎ বললে, বাবার মত মানুষ একালে হয় না। একেবারে সাদাসিদে, কিছুই বোঝেন না ঘোরপ্যাঁচ, গাঁয়ের লোক কত রকম কি বলে, মজা দেখবার জন্যে ওঁকে নাচিয়ে দিয়ে কত রকম কি করে—সে-সব দিকে খেয়াল নেই। দেখুন প্রভাসদা, আমাদের অতিথিশালা- আছে বলে গাঁয়ের লোক ইচ্ছে করে বাইরের লোক এনে বাবার ঘাড়ে চাপাবে। আমাদের অবস্থা অথচ সবাই জানে—কিন্তু বাবাকে জব্দ করা তো চাই। আমার এত দুঃখু হয় সময়ে সময়ে!

—আপনি বলেন না কেন কাকাকে বুঝিয়ে?

—আমার কথা উনি শোনেন, না কখনো শুনেছেন? মাকেই বড় গেরাহ্যি করতেন, আর আমি! যা খেয়াল ধরবেন, তাই করবেন।

—আচ্ছা, আজ উঠি তা হলে। আর এক দিন আসবো এখন। কলকাতা যাওয়ার কথা মনে আছে তো? একদিন নিয়ে যেতে আসবো কিন্তু।

প্রভাস চলে গেলে শরৎ গৃহকর্ম্ম শেষ করে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালল। চারিদিকে বন-বাদাড়ে ঘেরা উঠোন, বেশ একটু শীত পড়েছে—হেমন্ত কাল শেষ হতে চলেছে।

শরৎ উত্তর দেউলে প্রদীপ দিয়ে এসে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকলো। বাবা কত রাত্রে ফিরবেন, ঠিক নেই—সে রান্না শেষ করে বসে থাকবে। একলা থেকে থেকে ভাল লাগে না সত্যই—এই নিবান্দা পুরীতে, এই বন-বাদাড়ের মধ্যে।

তার মন চায় একটু মানুষ জনের সঙ্গ, কারো সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা কওয়া যায়, কেউ একটা মজার গল্প বলে। তবুও কলকাতা থেকে প্রভাসদা এসেছিল, খানিকটা সময় কাটলো।

এই সময় যদি একবার রাজলক্ষ্মী আসতো!

রান্না করতে করতে রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে গল্প করা যেতো তা হলে। মুখটি বুজে কি করে মানুষ থাকতে পারে সারাদিন?

রান্না চড়িয়ে শরৎ আপন মনে গুনগুন করে গান গাইতে লাগল—

দাদা, কে বা কার পর কে কার আপন!
কালশয্যা পরে
মোহনিদ্রা ঘোরে
দেখি পরস্পরে অসার আশার স্বপন—

এই গ্রামেই বারোয়ারির যাত্রায় শোনা গান। শরতের গলার সুর এক সময়ে খুব ভাল ছিল—এখন আর কিশোরীর বীণানিন্দিত সুকণ্ঠ নেই—তবুও সে বেশ ভালই গায়। তবে রাজলক্ষ্মী ছাড়া তার গান আর কেউ শোনে নি কখনও, এই যা দুঃখ। এমন কি কেদারও শোনেন নি।

এক বার সে বাইরে বেরুলো—বেশ জ্যোৎস্না আজ। শীতের আমেজ দিয়েছে বাতাসে—বাইরে এলে গা সির-সির করে। ছাতিম-বনে আর ছাতিম-ফুলের সুগন্ধ নেই—উত্তর দেউলে প্রদীপ দিতে গিয়ে সে দেখেছে।

মনে কত সব অস্পষ্ট ইচ্ছা জাগে, কত কি করবার ইচ্ছে হয়, কত কি দেখবার ইচ্ছে হয়, এই বনের মধ্যে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এই অবস্থায় থেকে মন হাঁপিয়ে ওঠে। অথচ এও সে জানে অন্য কোথাও গিয়ে সে বেশী দিন থাকতে পারবে না।

তাদের গড়ের খালের দু-পাশে বনে ভরা, ঘরবাড়ি ভাঙা ইটের আর কাঠের স্তূপ। কিন্তু শরতের সমস্ত অস্তিত্ব এই ভিটেটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। উত্তর দেউলে যখন সে প্রদীপ দেখাতে যায়—তখন বাদুড়নখীর জঙ্গল, ছাতিমগাছের সারি, অন্ধকার কালো পায়রার দীঘি, ভাঙা মন্দির—এরা যেন তার জীবনে একটা স্থায়ী শান্ত অস্তিত্বের বাণী বহন করে আনে, যে অস্তিত্বটা শরতের কাছে একান্ত সত্য ও বাস্তব।

নীল আকাশের তলায় দুপুরের ঝম্‌ঝম্‌ রোদে কালো পায়রার দীঘিতে সে কতদিন নেমেছে ক্ষার কাচতে, কিংবা কুলের থলে মেলে দিয়েছে উঠানের মাচানের ওপর—বাবা হয়তো ঘরে ঘুমিয়ে, কিংবা হয়তো বাড়ি নেই—সেই সময় কতবার তার মনে হয়েছে নানা অদ্ভুত কথা—বহুদূরের কোনো নাম-না-জানা দেশ থেকে সে জন্মেছে এসে এই গড়বাড়ির রাজবংশে—যে রাজবংশে সে আর তার বাবা চলে গেলে বাতি দিতে আর কেউ থাকবে না। সে রাজবংশের মেয়ে—রূপকথার রাজকন্যা, রুক্ষ চুলে তেলের অভাব তখন তার মনে থাকে না, ভাঁড়ারের চালডালের দৈন্য, ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলি বাঁশের আড়ার ওপর—এসব সে ভুলে যায়।

সে রাজার মেয়ে—রাজকন্যা।

ঐ নীল আকাশ, ঐ ছাতিম-বনের সারি, ঘুঘু-কোকিলের দল, সারা দেশ, সারা পৃথিবী তার অস্তিত্বের দিকে সসম্ভ্রমে চেয়ে আছে কিসের অপেক্ষায়—গভীর রহস্যভরা তার মহিমান্বিত অস্তিত্বের দিকে।

আবার এক এক সময় ভুল ভেঙে যায়।

সে তখন বড় ছোট হয়ে পড়ে।

যখন রাজলক্ষ্মীদের বাড়ি চুপি চুপি কাঠা হাতে চাল ধার করতে যেতে হয়, কলুর তাগাদাকে হজম করতে হয়, পয়সার অভাবে ঘর্মাক্ত মুখে হেঁইও হেঁইও করে সাবানদেওয়া ময়লা কাপড়ের রাশি কাচতে হয় নির্জন দীঘির ঘাটে—তখন সে হয় নিতান্ত গরীবের ঘরের মেয়ে, হয়তো বাগ্‌দী কিংবা দুলে—তার কোনো লজ্জা নেই, সংকোচ নেই, অপমান নেই—নিজের জন্যে নয়, নিজের কষ্ট সে কোনোদিন গ্রাহ্য করেও নি, কিন্তু বাবার জন্যে সে করতে পারে না এমন কাজই নেই···বাবার এতটুকু কষ্ট সে দেখতে পারবে না কোনোদিন···

তার নিঃসন্তান মাতৃত্বের সবটুকু স্নেহ গিয়ে পড়েছে বাবার ওপরে। বাবা বুদ্ধ হয়ে পড়েছেন, সব জিনিস হয়তো ঠিক মত বুঝতে পারেন না—তাঁকে আগলে বেড়ানো উচিত সব সময়।

মা যখন নেই, তখন তাকেই করতে হবে বাবার সব কাজ। তাঁর সব সুখ-সুবিধে তাকেই

দেখতে হবে। বাবাকে ফেলে তার মরেও সুখ নেই।

এ অভাবের সংসারে সে যে কত জায়গা থেকে জিনিসপত্র জুটিয়ে আনে, বাবা কি তার কোনো খবর রাখেন ?

তিনি দুবেলা ঠিক খাবার সময় এসে বললেন—শরৎ ভাত হয়েছে ? ভাত দে মা। চাল যে কতদিন বাড়ন্ত থাকে, তেল নুনের অভাবে রান্না হয় না—বাবা কখনো রেখেছেন সে সন্ধান ?

রাজকন্যার গর্ব তখন খসে পড়ে, রাজকন্যা তখন এক গরীব গৃহস্থের ছেঁড়াশাড়ী-পরা মেয়ে হয়ে কাঠা হাতে তেলের বাটি হাতে ছোটে ধর্ম্মদাস কাকাদের বাড়ি, রাজলক্ষ্মীদের বাড়ি···সাজিয়ে বানিয়ে কত মিষ্টি মিষ্টি মিথ্যে কথা সেখানে বলে, মানকে জলে ভাসিয়ে দেয়, চক্ষুলজ্জাকে আমল দিতে চায় না।

যখন আরও বয়স কম ছিল, মাঝে মাঝে কিন্তু সত্যিকার রাজকন্যা হতে তার ইচ্ছে জাগতো মনে। গড়বাড়ির পুকুরপাড়, বন, জংলী লতায় ঢাকা ইটের স্তূপ চাঁদের আলোয় ফুটফুট করছে, তার স্বাস্থ্য-ভরা দেহের প্রতি পদক্ষেপে গর্ব ও আনন্দ, প্রাণে অফুরন্ত গানের ঝঙ্কার, মুকুলিত প্রথম যৌবনের অপরিসীম স্বপ্ন তার চোখের চাউনিতে—তখন একদিন এক দেশের রাজপুত্র এলেন ঘোড়ায় চেপে. তার রূপের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ছে যে—না এসে কে থাকতে পারবে ?

—বিয়ে তোমায় আমি করবো না রাজপুত্তুর—

—ওমা, সে কি সর্ব্বনাশ ! তুমি বলো কি রাজকন্যে, আমার ঘোড়ার দিকে চেয়ে দেখ, ঘেমে উঠেছে। কদ্দুর থেকে ছুটে আসছি যে তোমার জন্যে—আর তুমি বলো কি না—

—বাজে কথা বলে লাভ কি রাজপুত্তুর। ফিরে যাও—

—কেন বলো না ? কি হয়েছে ?

—আমরা মস্ত বড় বংশ, তার ওপরে ব্রাহ্মণ—তোমার কোন্ দেশে ঘর, কি বংশ তার নেই ঠিকানা—আমায় কত হীরেমোতির গহনা দিতে হবে জানো ? আমার বাবাকে এক গাদা টাকা দিতে হবে জানো ?···বাবা দোকান করবেন।

—এই কথা ! কত টাকা দিতে হবে তোমার বাবাকে ? কিসের দোকান করবেন তিনি ?

—দাও দু হাজার পাঁচ হাজার। চাল-ডাল-ঘি-তেলের প্রকাণ্ড মুদিখানার দোকান—ছিবাস কাকার দোকানের চেয়ে অনেক, অনেক বড়—বাবার কষ্ট যে দূর করবে, সে আমায় নিয়ে যাবে—

কেদার এসে ডাক দিলেন—ও মা, ওঠ্—ও শরৎ—উঠে পড়ো—

আঁচল বিছিয়ে কখন শরৎ উনুনের সামনে রান্নায় পিঁড়ির পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বাবার ডাকে সে ধড়মড় করে উঠে পড়ল।

—নাঃ, তুই কোন্ দিন পুড়ে মরবি দেখছি, আচ্ছা, রাঁধতে রাঁধতে অমন করে উনুনের সামনে শোয় ? যদি আঁচলখানা উড়ে পড়তো আগুনে ? ঘুম ধরলে তোর আর জ্ঞানকাণ্ড থাকে না—

শরৎ একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিল, ঘুমজড়িত কণ্ঠে বললে, কি হয়েছে ?···আঁচল উড়ে পড়তো তো বেশ ভালই হ'ত। তোমার হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে স্বর্গে চলে যেতাম—বাবাঃ—রাত্তিরে একটু ঘুমুবারও যো নেই—বেশ যাও—

কথা শেষ করেই শরৎ আবার তখুনি মেঝের ওপর শুয়ে পড়ল।

কেদার জানেন, মেয়ের ঘুমের ঘোর এখনও কাটে নি—এই রকমই হয় প্রায় প্রতিদিন, তিনি দেখে এসেছেন। ভারী ঘুমকাতুরে মেয়ে।

তিনি আবার ডাক দিলেন—ও শরৎ—মা আমার ওঠো—এই যে আমি বাড়ি এইচি—ও মা—ওঠো, লক্ষ্মী-মা আমার—বুঝলি? উঠে চোখে জল দে দিকি? ঘুম কেটে যাবে এখন—

শরৎ এবার সত্যিই উঠল।

কেদার বললেন, যা চোখে জল দিয়ে আয়—তোর যা ঘুম। রাত আর এমন কি হয়েছে? এই তো সবে রাতে দশটার গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল, যখন গড়ের খাল পার হই।

শরৎ বাবাকে খাবার ঠাঁই করে দিয়ে ভাত বাড়তে বসল।

খানিকটা পরে খাওয়াদাওয়া সেরে কেদার তামাক খেতে খেতে বললেন—ভাল কথা, প্রভাস কখন গেল রে? বেশ ছেলেটি। ওকে এবার একদিন নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে হবে। তোরও একটা কিছু দেওয়া উচিত।

—কি দেব বাবা? আমিও তা ভেবেছি।

—একটা কিছু বুনে-টুনে দে না। আসন-টাসন গোছের। শুধু হাতে কারো কাছে কিছু নিতে নেই তো? দিস্ একটা কিছু করে। আংটিটা কই দেখি?

শরৎ মৃদু হাসিমুখে বললে, সে নেই বাবা।

কেদার অবাক হয়ে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, নেই! কি হ'ল?

শরৎ মুখ নিচু করে হাসি-হাসি মুখেই বললে, সে বাবা আমি দীঘির জলে ফেলে দিয়ে এসেছি। রাগ করো নি বাবা!

—সে কি রে? কখন?

—উত্তর দেউলে পিদিম দিতে যাওয়ার সময়। কি হবে বাবা বিধবা মানুষের হীরের আংটি পরে?

কেদার মেয়ের সঙ্গে তর্ক করলেন না। মেয়েকে চিনতে তাঁর বাকী নেই। সুতরাং তিনি চুপ করে রইলেন। কেবল তাঁর মনে দুঃখ হচ্ছিল অমন দামী আংটিটা যদি রাখবিই নে বাপু, তবে সে বেচারীর কাছ থেকে নেওয়া কেন?

এমন খামখেয়ালি মেয়ে!

দুপুরে রাজলক্ষ্মী এল শরতের কাছে। কেদার খেয়ে হাট করতে বেরিয়ে গিয়েছেন—আজ গেঁয়োহাটির হাটবার।

রাজলক্ষ্মী দেখতে বেশ মেয়েটি। নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে, কখনো শহরের মুখ দেখে নি, তবে শহরের কথা অনেক জানে। তার দুই মামাতো ভগ্নীপতি এখানে মাঝে মাঝে আসে। কলকাতায় কাজ করে তারা—শহরের অনেক গল্প সে শুনেছে ওদের মুখে।

রাজলক্ষ্মী বললে, হাঁ শরৎদি, প্রভাসবাবু বুঝি কাল বিকেলে তোমাদের বাড়ি এসেছিল? কি বললে?

—বলবে আর কি, বৈকেলে এসেছিল, সন্দের আগে চলে গেল। গল্পগুজব করলে বসে—চা করে দিলাম। বেশ লোক প্রভাসদা। আমাদের বলেছে এক দিন কলকাতায় নিয়ে যাবে—বাবাকে আর আমাকে।

—কবে শরৎ দিদি?

—তার কিছু ঠিক আছে? তবে প্রভাসদা বলেছে যেদিন আমি মনে করবো সেদিনই নিয়ে যাবে।

—রেলে?

—না, মটোর গাড়িতে। এখান থেকে সমস্ত পথ মটোরে যাবে—কেমন মজা হবে, কি বলিস? তুই চড়েছিস্ কখনো মটোর গাড়িতে?

রাজলক্ষ্মী উদাস নয়নে অন্য দিকে চেয়েছিল। শরৎদিদির কথায় তার মনে কত অদ্ভুত ছবি জেগে উঠেছে। আজ বছর দুই আগে পিসেমশায় একটি বিয়ের সম্বন্ধ এনেছিলেন তার জন্য—ছেলেটি কলকাতায় চাকরি করতো। চল্লিশ টাকা মাইনে। বেড়ে নাকি হতে পারে একশো টাকা। তাদের পৈতৃক বাড়ি কোন্নগর, চাকরি উপলক্ষে কলকাতায় আছে অনেক দিন।

সম্বন্ধটা রাজলক্ষ্মীর মনে ধরেছিল। ছেলেটিও দেখতে নাকি ভালই ছিল। কি দেনা-পাওনার গণ্ডগোলে সম্বন্ধ ভেঙে গিয়েছে।

মাস দুই ধরে কথাবার্তা চলবার ফলে রাজলক্ষ্মীর মন অনেকবার নানা রঙীন স্বপ্ন বুনেছিল সেটাকে ঘিরে। কখনো যে কলকাতা সে দেখে নি এবং হয়তো দেখবেও না কখনো ভবিষ্যতে—সেই কলকাতা শহরের একটা বাড়ির দোতলার ঘরে খাট টেবিল চেয়ার সাজানো তাদের ঘরকন্না, দালানের এক কোণে ছোট্ট একটি খাঁচায় টিয়া কি ময়না পাখী, মাটি-দেওয়া টিনের টবে তুলসী গাছ, একটা ঘেরাটোপ-মোড়া সেলাইয়ের কল টেবিলের এক পাশে—নিস্তব্ধ দুপুরে বসে সে হয়তো কিছু একটা বুনছে কি সেলাই করছে—উনি গিয়েছেন আপিসে—বাসায় শ্বশুর-শাশুড়ী বা ও ধরণের কোনো ঝামেলা নেই—সে আছে একাই—নিজেকে কত মনে মনে সেই কল্পনীয় ঘরকন্নাটিতে ডুবিয়ে দিয়েছে সে, সে ঘরের খুঁটিনাটি কত কি পরিচিত হয়ে উঠেছিল তার মনের মধ্যে—দেখলেই যেন চিনে নিতে পারতো ঘরটা—কিন্তু কোথায় কি হয়ে গেল, সে ঘরে গিয়ে ওঠা তার আর ঘটে উঠল না।

শরৎ দিদির কথায় সে অল্পক্ষণের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, শেষের দিকের প্রশ্নের মানে সে ভাল করে না বুঝে শূন্যদৃষ্টিতে শরতের মুখের দিকে চেয়ে বললে—কি বললে শরৎদি? মজা?···ও, মজা হবে না আবার? খুব হবে। সত্যি কথা বলতে কি, এখান থেকে যেখানে বেরুবে সেখানেই ভাল লাগবে। একঘেয়ে দিন যেন আর কাটতে চায় না। অসহ্য হয়ে উঠছে দিন দিন। দুপুরে যে তোমার এখেনে নিশ্চিন্দি হয়ে বসবো তার উপায় নেই। এতক্ষণ কাকীমা ঘুম থেকে উঠলেন, যদি দেখেন এখনও এঁটো বাসন মাজা হয় নি, রান্নাঘর ধোয়া হয় নি, তবে সন্দে পর্যন্ত বকুনি চলবে।

শরৎ হাসিমুখে বললে, তা হলে তুই ঝগড়া করে এসেছিস্ বাড়ি থেকে, ঠিক বললাম। হ্যাঁ কি না বল্?

রাজলক্ষ্মী চুপ করে রইল।

শরৎ বললে, তাই বুঝলাম এতক্ষণ পরে। নইলে ঠিক দুপুর বেলা তুমি আসবার মেয়েই আর কি! ভাত খেয়ে এসেছিস না আসিস নি, সত্যি কথা বল্—আমার মাথার দিব্যি—আমার মরা মুখ দেখিস—

—না তা নয়। তেমন ঝগড়া নয়। ভাত খেয়েছি বৈকি—

—সত্যি বলছিস্?

—মিথ্যে কথা বলবো না শরৎদি, তুমি যখন অমন দিব্যি দিলে। না, সে খাওয়ার কথা নিয়ে নয়—ঝগড়া নিয়েও নয়, সত্যিই এত একঘেয়ে হয়ে উঠেছে এখানে—ইচ্ছে হয় যেদিকে দু-চোখ যায় ছুটে যাই—

—সত্যি, যা বলিল ভাই, আমারও বড় একঘেয়ে লাগে। সেই সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত একই হাঁড়ি-হেঁসেল নিয়ে নাড়ছি, আর একই দীঘির ঘাটে সতেরো বার দৌড়ুচ্ছি, তার পর কেবল নেই আর নেই—

কিন্তু তরুণী রাজলক্ষ্মীর মন যা চায়, যে জন্যে ব্যাকুল—শরৎ তা ঠিক বুঝতে পারে নি। রাজলক্ষ্মীও ঠিকমত বোঝাতে পারে না, তাই নিয়েই তো আজ বাড়িতে কাকীমার

বকুনি খেতে হ'ল। সে সব্বর্দা নাকি থাকে অন্যমনস্ক, কি তাকে বলা হয় নাকি তার কানে যায় না—ইত্যাদি, তার বিরুদ্ধে বাড়ির লোকের অভিযোগ। শরৎ বুঝতে পারে না ওর দুঃখ। ঘরকন্না করে করে শরতের মন বসে গিয়েছে এই সংসারেই, যেমন তাদের বংশের পুরোনো আমলের পাথরের থাম আর ভাঙা মুর্ত্তিগুলো ক্রমশঃ মাটির ওপর চেপে বসতে বসতে ভেতরে সেঁধিয়ে যাচ্ছে!

উঠোনের রোদ এইসময় একটু পড়ল। রাজলক্ষ্মী বললে—চলো শরৎ-দি, একটু গিয়ে দীঘির ঘাটে বসি, বেশ ছায়া আছে গাছের—বেশ লাগে।

শরৎ বললে, আমায় তো যেতেই হবে এঁটো বাসন মাজতে। চল্ ওখানে বসে গল্প করিস্—আমার কি হয়েছে জানিস—মুখ বুজে থেকে থেকে আরও মারা গেলুম। আচ্ছা তুই বল্ রাজলক্ষ্মী, ভাল লাগে সকাল থেকে রাত দশটা অবধি? কার সঙ্গে দুটো কথা কই যে!—বাবা তো সব সময়েই বাইরে—

—তুমি তো আবার এমন জায়গায় থাকো যে গাঁয়ের কেউ আসতে পারে না।—এত দূরে আর এই বনের মধ্যিখানে। জানো শরৎ-দি, গাঁয়ের বৌ-ঝি এদিকে আসতে ভয় পায়, সাধনের বৌ সেদিন বলছিল গড়বাড়িতে নাকি ভূত আছে—

—সাধনের বৌয়ের মুন্ডু—দূরে!

—তোমার নাকি সয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া সে ভূতে তোমায় কিছু বলবে না। তুমি তো এই বংশের মেয়ে—রাজার মেয়ে। আমাদের মত গরীব-গুরবো লোকদেরই বিপদ—হি—হি—

—মরবি কিন্তু মার খেয়ে আমার কাছে—

কালো পায়রা দীঘির সান-বাঁধানো ভাঙা ঘাটের নিচু ধাপে বড় বড় গাছের ছায়া এসে পড়েছে পুকুরের জলে আর ঘাটের রানাতে। ঘাটে ছাতিম আর অন্য অন্য গাছের ছায়া। বাঁ-দিকে দূরে উত্তর দেউল, যদিও এখান থেকে দেখা যায় না—সামনে সেই ইটের ঢিবিটা। প্রভাস যেখান থেকে ইট নিয়ে গিয়েছে গ্রামের স্কুলের জন্যে। সামনে প্রকাণ্ড দীঘিটার নিথর কালো জল—জলের ওপর এখানে-ওখানে পানকলস আর কলমির দাম, কোণের দিকে রাঙা নাললতার পাতা ভাসছে, যদিও এখন ওর ফুল নেই।

শরৎ এ সময় রোজ বসে একাই বাসন মাজে। আজ রাজলক্ষ্মীকে পেয়ে ভারি খুশী হয়েছে সে।

এই ঘাটে বসে শরৎ কত স্বপ্ন দেখেছে—রোজ এই বাসন মাজবার সময়টি একা বসে বসে। নীল আকাশের তলায় ঠিক দুপুরের অলস স্তব্ধতাভরা ছাতিম-বন, ভাঙা ইটের রাশ আর কালো পায়রা দীঘির নিথর কালো জল—হয়তো কখনো কাক ডাকে কা-কা—কিংবা যেমন আজকাল ঘুঘু সারাদুপুর ধরে ডাকের বিরাম বিশ্রাম দেয় না। কি ভালই যে লাগে!

জীবনের যে একঘেয়েমির কথা রাজলক্ষ্মী বললে, শরৎ তা কখনো হয়তো সেভাবে বোঝে নি। এই গ্রামে এই গড়বাড়ির ইটের ভগ্নস্তূপের মধ্যে সে জন্মেছে—এরই বাইরের অন্য কোন জীবনের সে কল্পনা করতে পারে না। অন্ততঃ করতে পারতো না এতদিন।

কিন্তু কি জানি, সম্প্রতি তার মনে কোথা থেকে বাইরের হাওয়া এসে লেগেছে—কালো দীঘির নিস্তরঙ্গ শান্ত বক্ষ চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

প্রথমে এল তাদের অতিথিশালায় সেই বুড়ো বামুন, তার বাবার কাছে যে জেলার সীমানা দেখবার অপূর্ব্ব গল্প করেছিল। যা ছিল স্থাণুবৎ অচল, অনড়—সেই নির্ব্বিকার অতি শান্ত অস্তিত্বের মূলে কোথায় যেন সে কি নাড়া দিয়ে গেল। তার এবং তার বাবার।

বামুনজ্যাঠা কত গল্প করতো তার রান্নাঘরে পিঁড়ি পেতে বসে বসে। বাইরের ঘরকন্না,

কত সংসারের কথা, কত ধরণের সুখ-দুঃখের কাহিনী। বড় বড় আম কাঁঠালের বাগান, যা তাদের গড়ের বাগানের চেয়েও অনেক বড়, পঞ্চাশ বিঘের কলমের আমবাগান; কত বড় বাড়ি, তাদের মেয়েদের বৌদের কথা, দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠ, মাঠের মধ্যে বাবলা গাছের সারি, শেওড়াবন, শিরীষের ফল পেকে ফেটে কালো বীচির রাশি ছড়িয়ে আছে; উইয়ের ঢিবির পাশে বনধুতুরার ঝোপ। শরৎ তন্ময় হয়ে শুনতো।…

অন্য এক জীবন, অন্য এক অস্তিত্বের বার্ত্তা বহন করে আনতো এ সব গল্প। আজ সে মেয়ে হয়ে জন্মেছে—তার হাত-পা বাঁধা, কোথাও যাবার উপায় নেই, কিছু দেখবার উপায় নেই—তার ওপর রয়েছেন বাবা, বৃদ্ধ, সদানন্দ বালকের মত সরল, নির্ব্বিকার।

তার পরে এল প্রভাসদা।

প্রভাসদা এল আর এক জীবনের বার্ত্তা নিয়ে। শহরের সহস্র বৈচিত্র্য ও জাঁকজমক আছে সে কাহিনীর মধ্যে। মানুষ যেখানে থাকে অত অদ্ভুত আমোদ-প্রমোদের মধ্যে ডুবে—নিত্য নতুন আনন্দের মধ্যে যেখানে দিন কাটে, দেখতে ইচ্ছে হয় শরতের সে দেশ কেমন। খুব বড় একটা আশা ও আকাঙ্ক্ষা শরতের মনে জেগেছে প্রভাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর থেকে।

তার পরে এই রাজলক্ষ্মী, ষোল বছরের কিশোরী মেয়ে তো মোটে—এরও নাকি একঘেয়ে লাগছে আজকাল গড়শিবপুরের জীবন। ওর বয়সে শরৎ শুধু শিবপুজো করেছে বসে বসে দীঘির ঘাটে বোধনের বেলতলায়, অত সে বুঝতও না, জানতও না।

কিন্তু আজকালের মেয়েদের মন আলাদা। শরৎ যে কালের মেয়ে, সে কাল কি আছে?

রাজলক্ষ্মী শরতের দিকে চেয়ে হঠাৎ বলে উঠল—সত্যি শরৎদি—

শরৎ মুখ নিচু করে বাসন মাজছিল, মুখ তুলে ওর দিকে চেয়ে বিস্ময়ের সুরে বললে, কি রে?

—আচ্ছা, তোমার চেহারা দেখলে কে বলবে তোমার বয়স হয়েছে! তোমাকে দেখে, আমি মেয়েমানুষ, আমারই চোখের পলক পড়ে না শরৎদি—সত্যি-সত্যি বলছি। রাজকন্যে মানায় বটে।

শরৎ সলজ্জ হাসি হেসে বললে, দূর—বাঁদরী!

—মিথ্যে বলি নি শরৎদি—এতটুকু বাড়িয়ে বলছি নে—

—কেন নিজের দিকে তাকিয়ে বুঝি কথা বলিস্ নে?

—আর লজ্জা দিও না দিদি, তোমার পায়ে পড়ি। অনেক তাকিয়ে দেখেছি, কাজেই ওকথা মনে সর্ব্বদাই জেগে থাকে। ওকথা তুলে আর কেন মন খারাপ করিয়ে দ্যাও?

শরৎ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটু ইতস্ততঃ করে বললে—একটা কথা বলবো রাজলক্ষ্মী?

—কি শরৎদি?

—আমায় অমন কথা আর বলিস্ নে। কে কোথায় থেকে শুনবে আর কি ভাববে। এ গাঁ বড় খারাপ হয়ে উঠেছে ভাই।

—কেন শরৎদি এ কথা বললে?

—তোকে এতদিন বলি নি, কাউকে বলি নি বুঝলি? কিন্তু যখন কথাটা উঠলই, তখন তোর কাছে বলি।

—কি কথা বলে ফেল না ঝাঁ করে। হাঁ করে তোমার মুখের দিকে কতক্ষণ চেয়ে থাকবো—

—এ গাঁয়ের কতকগুলো পোড়ারমুখো ড্যাকরা জুটেছে, তাদের মা বোন জ্ঞান নেই—সেগুলোর জ্বালায় আমার সন্দের সময় উত্তর দেউলে পিদিম দিতে যাবার যদি জো থাকে—সেগুলো কবে ষাঁড়াতলার ঘাটসই হবে তাই ভাবি—

রাজলক্ষ্মী অবাক হয়ে শরতের মুখের দিকে চেয়ে বললে, বলো কি শরৎদি! এ কথা তো কোন দিন শুনি নি তোমার মুখে! কবে দেখেছ? কি করে তারা?

—কি করে আবার—উত্তর দেউলে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে, ছাতিমবনের মধ্যে ফিসফিস করে। রোজ নয়, মাঝে মাঝে প্রায়ই করে। এই কালও তো করেছিল।

—কাল?

—কালই। প্রভাসদা উঠে চলে গেল, তখন প্রায় বেলা গড়িয়ে গিয়েছে। আমি উত্তর দেউলে গেলাম সন্দে দেখাতে, আর অমনি শুনি মন্দিরের পশ্চিম গায়ে দেওয়ালের ওপাশে কার পায়ের শব্দ অন্ধকারে—

—বলো কি শরৎদি! আমার শুনে যে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। তোমার ভয় করলো না?

—আমার গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে ভাই। আর বছর সারা বর্ষাকাল অমনি করে মরেছে পোড়ারমুখোরা—তাদের যমে ভুলে আছে—আবার শুরু করেছে এই ক'দিন—

—তার পর, কি হল?

—কি আর হবে, সাহস নেই এক কড়ার। হেই করলে কুকুরের মত পালিয়ে যায়। একবার যদি দেখতে পাই—তবে দেখিয়ে দিই কার সঙ্গে তারা লাগতে এসেছে। বঁটি দিয়ে নাক কেটে ছাড়ি—

—জ্যাঠামশায়কে বলো না কেন?

—বাবাকে? পাগল! উনি কিছু করতে পারবেন না, মাঝে পড়ে গাঁয়ে ঢাক বাজিয়ে বেড়াবেন। মন্দ লোকে পাঁচ কথা বলবে।

—বাবাকে কি ধর্ম্মদাসকে বলবো তবে?

—না ভাই কাউকে বলবি নে। পাঁচ জনে পাঁচ রকম কথা ওঠাবে। গাঁয়ের লোক বড় খারাপ, জানো তো সবই। কাকারা করতে যাবেন ভালো ভেবে, হয়ে যাবে উল্টো। তা ছাড়া তাঁরা করবেনই বা কি? চোখে তো কাউকে দেখি নি।

—আচ্ছা সন্দেহ হয় কারো ওপরে শরৎদি?

শরৎ চুপ করে নিচু মুখে বাসন মাজতে লাগল।

রাজলক্ষ্মী বললে, বলো না শরৎদি, কাউকে সন্দেহ কর?

—কার ভাই নাম করবো—যখন চোখে দেখি নি। তবে সন্দেহ আমার হয় কার ওপর তা বলতে পারি, তুই কিন্তু কারো কাছে কিছু বলতে পারবি নে। কীর্ত্তি মুখুজ্জের ভাগ্নে অনাদি ছোঁড়াটার চালচলন, অনেক দিন থেকে খারাপ দেখছি। রাস্তাঘাটে যখন দেখা হয়—তখন কেমন হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, শিস দেয়—আর ওই বটুক মুখপোড়াটাকেও আমার সন্দেহ হয়।

—বটুক-মামা? তার তো বয়েস হয়েছে অনেক—তবে—

—বয়েস হয়েছে তাই কি? আমিও তো দাদা বলে ডাকি। ও লোক কিন্তু ভাল না।

—সে আমিও একটু একটু না জানি এমন নয় শরৎ দিদি—একদিন হয়েছে কি শোনো তবে বলি। আমি আসছি হারান চক্কত্তিদের বাড়ি থেকে—ঠিক দুপুর বেলা, ঘোষেদের কাঁটাল বাগানে এসে বটুক মামার সঙ্গে দেখা—

শরৎ বাধা দিয়ে বললে, থাকগে—ওসব কথা আর শুনে কি করবো? ওসব শুনলে রাগে আমার সর্ব্বশরীর রি রি করে জ্বলে। তবে ওরা এখনও আমায় চিনতে পারে নি। কাউকে কিছু বলবার দরকার নেই আমার। শাস্তি যেদিন দেবো, সেদিন নিজের হাতে দেবো। মুখপোড়াদের শিক্ষে সেদিন ভাল করেই হবে। তবে একটা কথা বলি—যাদের নাম করলাম, তাদের সন্দেহ করি এই পর্য্যন্ত। ওরা কি না, আমি ঠিক জানি নে—চোখে তো দেখতে

পাই নি কাউকে। অন্যায় দোষ দিলে ধর্ম্মে সইবে না।

রাজলক্ষ্মী প্রশংসমান দৃষ্টিতে শরতের সুগঠিত সুন্দর দেহের দিকে চেয়ে চেয়ে বললে—সে যদি কেউ পারে, তবে তুমিই পারবে শরৎদি, তা আমি জানি। তোমায় দেখলে আমাদের মনে সাহস আসে।

শরৎ দুষ্টুমির হাসি হেসে রাজলক্ষ্মীর মুখের দিকে সুন্দর ভঙ্গিতে চেয়ে বলল—ইস্! বলিস্ কি রে! সত্যি? সত্যি নাকি?

রাজলক্ষ্মীও উৎসাহের সুরে হাসিমুখে বললে, বাঃ, কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায় শরৎ দিদি? কি চমৎকার ভাবে চাইলে? আমারই মন কেমন করে ওঠে, তবুও আমি মেয়েমানুষ।

শরৎ কৃত্রিম কোপের সঙ্গে বললে, আবার! বারণ করে দিলাম না? ওসব কথা বলবি নে। মেয়ের এদিকে নেই ওদিকে আছে? চল্ বাসনগুলো কিছু নে দিকি হাতে করে—বেলা আর নেই। এখন ছিষ্টির কাজ বাকি!

বাড়ি ফিরে রাজলক্ষ্মী বললে, চলে যাই শরৎ দিদি—সন্দে হলে যেতে ভয় করবে।

শরৎ তাকে যেতে দিলে না। বললে—ও কিরে! তোকে কিছু খেতে দিলাম না যে? তা হবে না। এইবার চা করি, আর কিছু খাবার করি।

—না শরৎদি, পায়ে পড়ি ছেড়ে দাও আজ। আর একদিন এসে খাবো এখন।

শরৎ কিছুতেই শুনলে না—কখনো সে রাজলক্ষ্মীকে কিছু না খাইয়ে ছেড়ে দেয় না, নিজে সে গরীব, গরীব ঘরের মেয়ে রাজলক্ষ্মীর দুঃখ ভাল করেই বোঝে। বাড়িতে হয়তো বিকেলে খাবার কিছুই জোটে না—আসে এখানে, গল্প করে—ওকে খাওয়াতে পারলে শরতের মনে তৃপ্তি হয় বড়। শরৎ চা করে দিলে ওকে, নিজের জন্যে একটা কাঁসার গ্লাসে ঢেলে নিলে। হালুয়া করে ওকে কিছু দিয়ে বাকিটা বাবার জন্য রেখে দিলে।

রাজলক্ষ্মী বললে, ওকি শরৎদি, তুমি নিলে না?

—আমি একেবারে সন্দের পরই তো খাবো। এখন খেলে আর খিদে পায় না, তুই খা।

রাজলক্ষ্মী চা ও খাবার পেয়ে একটু খুশীই হল। বললে, কি সুন্দর হালুয়া তুমি করো শরৎদি—

—যাঃ, আমার সবই তো তোর ভালো।

—তা ভালো লাগলে ভালো বলবো না? বা রে—তোমার সবই আমার যদি ভালো লাগে, তবে কি করি বলো না?

—আমারও ভাল লাগে তুই এলে, বুঝলি? এই নিবান্দা পুরীর মধ্যে একা মুখটি বুজে সদাসর্ব্বদা থাকি, কেউ এলে গেলে বড় ভাল লাগে। বাবা তো সব সময় বাড়ি থাকেন না—তোর সঙ্গে বেশ একটু গল্পগুজব করে বড় আমোদ পাই।

—আমারও, শরৎদি! গাঁয়ের আর কোনো মেয়ের সঙ্গে মিশে তেমন আমোদ পাই নে, তাই তো তোমার কাছে আসি।

রাজলক্ষ্মীর বিবাহের বয়স পার হয়েছে—কিন্তু বাপ-মায়ের পয়সার জোর না থাকায় এখনও কিছু ঠিকঠাক হয়নি। শরতের মনে এটা সর্ব্বদাই ওঠে, যেন তার নিজেরই কন্যা-দায় উপস্থিত।

কেদারকে দিয়ে শরৎ দু-এক জায়গায় কথাবার্ত্তা তুলেছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পয়সা-কড়ির জন্যে সে-সব সম্বন্ধ ভেঙে যায়। আজ দিন দশ-বারো হল, কেদার আর একটা সম্বন্ধ এনেছিলেন—শরতেরও শুনে মনে হয়েছে সেখানে হলে ভালই হয়। পূর্ব্বে এ নিয়ে

একবার দুই সখীর মধ্যে কথাবার্ত্তাও হয়েছে।

আজও শরৎ বললে—ভালো কথা, রাজলক্ষ্মী—আসল ব্যাপারের কি করবি বল—

রাজলক্ষ্মী না বুঝতে পারার ভান করে বললে—কি ব্যাপার আসল ?

—তোকে যে-কথা সেদিন বললাম। সাঁতরা পাড়ার সেই সম্বন্ধটা—

রাজলক্ষ্মী মনে মনে খুশী হয়ে উঠল। মুখে বললে—যাঃ, আর ও-সবে দরকার নেই। বেশ আছি। কেন তাড়িয়ে দেবে শরৎদি ?

—না ও-সব চালাকি রাখ দিকি। এখন আমায় বল, বাবাকে কি বলবো।

যার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব উঠেছে তার সম্বন্ধে সব কথা রাজলক্ষ্মী ইতিপূর্ব্বে দুবার শুনেছে শরতেরই মুখে—তবুও তার ইচ্ছে হল আর একবার সেকথা শোনে।

শুনতে লাগে ভালই। তবুও কিছু নূতনত্ব।

সে তাচ্ছিল্যের সুরে বললে, ভারি তো সম্বন্ধ ? ছেলে কি করে বলেছিলে ?

শরৎ বললে, নৈহাটিতে পাটের কলে চাকরি করে, শুনেছি মাকে নিয়ে নৈহাটিতেই বাসা করে থাকে।

রাজলক্ষ্মী ঠোঁট উলটে বললে, পাটের কলে আবার চাকরি ! তুমিও যেমন !···

রাজলক্ষ্মী কথাটা বললে বটে, কিন্তু তার মনে হল এ সম্বন্ধ খারাপ নয় ! ছেলেটির বিষয়ে আরও কিছু জানবার তার খুব কৌতূহল হল, কেমন দেখতে, কত টাকা মাইনে পায়, বাড়িতে আর কেউ আছে কিনা।

শরৎ কিন্তু সে দিক দিয়েও গেল না। বললে, তা তো বুঝলাম, তোর খুব উঁচু নজর। কিন্তু জজ মেজেস্টার পাত্র এখন পাওয়া যাচ্ছে কোথায় বল্ ? অবস্থা বুঝে তো ব্যবস্থা ? কি মত তোর ?

রাজলক্ষ্মী চুপ করে থেকে বললে, ভেবে বলবো শরৎদিদি—আচ্ছা কি পাশ বলেছিলে যেন সেদিন ?

খানিকক্ষণ এ-সম্বন্ধে কথা চলে যদি, বেশ লাগে।

—শরৎ বলে ম্যাট্রিক পাশ।

—মোটে !

—অমন কথা বলিস্ নে। দু-তিনটে পাশ পাত্র কি পাওয়া সহজ ? এতগুলো টাকা চাইবে।

—আচ্ছা, পাটের কল কি রকম শরৎদি ?

শরৎ হেসে বললে, আমি তো আর দেখি নি কখনো। তোরও পরের মুখে ঝাল খাওয়ার দরকার কি, একেবারে নিজের চোখেই তো দেখবি।

—যাঃ, শরৎদি যেন কি !

শরৎ হাসতে হাসতে বললে, আচ্ছা শোন, তুই যে বলছিস ম্যাট্রিক পাশ কিছুই না—দু-তিনটে পাশ ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ে দিলে তুই কথা বলতে পারবি তার সঙ্গে ?

—কেন পারবো না, দেখে নিও—

গল্পে দুজনে উন্মত্ত, কখন ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, বাইরে বেশ অন্ধকার নেমেছে, ওরা খেয়ালই করে নি। ছাতিমবনে শেয়াল ডেকে উঠলে ওদের চমক ভাঙলো।

রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, ও শরৎদি, একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল যে ! আমি কি করে যাবো ?

—বোস্ না। বাবা এলে তোকে বাড়ি দিয়ে আসবেন এখন।

—না শরৎদি আমি যাই, তুমি গড়ের খাল পার করে দিয়ে এসো আমায়—বাকী পথ ঠিক

যাবো। আমার যত ভয় এই গড়ের মধ্যে।

—আর আমি একলাটি এখন কতক্ষণ পর্য্যন্ত বসে থাকবো তার ঠিক আছে? বাবা যে কখন ফিরবেন! তুই থাকলে বড্ড ভাল হত। থাক্ না লক্ষ্মীটি—আর একটু চা খাবি?

কিন্তু রাজলক্ষ্মী আর থাকতে চাইল না। বেশি রাত পর্য্যন্ত বাইরে থাকলে মা ভারি বকবে। একলাটি অন্ধকারে যেতে ভয়ও করে। কেদার-জ্যাঠার আসবার ভরসায় থাকতে গেলে দুপুররাত হয়ে যাবে, বাপ রে!

কেরোসিনের টেমি ধরে শরৎ গড়ের খাল পর্য্যন্ত রাজলক্ষ্মীকে এগিয়ে দিল। রাজলক্ষ্মী খাল পার হয়ে ওপারের রাস্তায় উঠে বললে, তুমি যাও শরৎদি, গোয়ালাদের বাড়ির আলো দেখা যাচ্ছে—আর ভয় নেই।

যেতে যেতে সে ভাবছিল, নৈহাটি কেমন জায়গা না জানি।

সংসারে বেশী ঝামেলা না থাকাই ভালো।

ম্যাট্রিক পাশ ছেলে মন্দ নয়।

ছেলের রংটা কালো না ফর্সা?

চার

শীত কমে গিয়েছে—বসন্তের হাওয়া দিতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে সজনে গাছে থোকা থোকা ফুল দেখা দিয়েছে।

কেদার নিজের গ্রামেই একটি কৃষ্ণযাত্রার দল খুলেছেন। সম্প্রতি এ অঞ্চলে কৃষ্ণযাত্রার একটা হিড়িক এসে পড়েছে—গত পুজোর সময় থেকে এর সূত্রপাত ঘটে, বর্ত্তমানে মহামারীর মত গ্রামে গ্রামে হুজুক ছড়িয়ে পড়েছে। কেদার হটবার পাত্র নন, তাঁর গ্রামকে ছোট হয়ে থাকতে দেবেন কেন—জেলেপাড়া, কামারপাড়া এবং কুমোরপাড়ার লোকজন জুটিয়ে তিনিও এক দল খুলে মহা উৎসাহে মহলা আরম্ভ করেছেন। স্নানাহারের সময় নেই তাঁর, ভারি ব্যস্ত। সম্প্রতি তাঁর দলের গাওনা হবে চৈত্রমাসে অন্নপূর্ণা পুজার দিন, গ্রামের বারোয়ারি তলায়। বেশি দেরি নেই, দেড় মাস মাত্র।

সীতানাথ জেলের বাড়ির বাইরে বড় ছ-চালা ঘর। যাত্রার দলের মহলা এখানেই রোজ বসে। অন্য সকলের আসতে একটু রাত হয়, কারণ সবাই কাজের লোক—কাজকর্ম্ম সেরে আসতে একটু দেরিই হয়ে পড়ে। কেদারের কিন্তু সন্ধ্যা হতে দেরি সয় না, তিনি সকলের আগে এসে বসে থাকেন।

সীতানাথ বাড়ি নেই—শীতকালের মাঝামাঝি নৌকো করে এখান থেকে পাঁচ দিনের পথ চূর্ণী নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছে—এখনও দেশে ফেরে নি।

সীতানাথের বড় ছেলে মানিক বাড়িতে থাকে ও গ্রামের নদীতেই মাছ ধরে স্থানীয় হাটে বিক্রী করে সংসার চালায়। আজ পুরো মহলা হবে বলে সে সকাল সকাল নদী থেকে ফিরে এসে বাইরের ঘরে বড় বড় খানকতক মাদুর ও চট পেতে আসর করে রেখেছে।

কেদারকে বললে, বাবাঠাকুর, তামাক কি আর এক বার ইচ্ছে করবেন?

—তা সাজ না হয় একবার। হ্যাঁরে মানকে, এরা এখনো সব এল না কেন?

—আসছে বাবাঠাকুর, সবাই কাজ সেরে আসছে তো, একটু দেরি হবে।

—তুই তামাক সেজে একবার দেখে আয় দিকি বিশু কুমোরের বাড়ি। ওর ছেলেটাকে না হয় ডেকে আন। সে রাধিকা সাজবে, তার গানগুলো ততক্ষণ বেহালায় রপ্ত করে দিই—

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে জন দুই অভিনেতা ঘরে ঢুকলো—একজন ছিবাস মুদি আর একজন হৃষিকেশ কর্ম্মকার।

কেদার খুশিতে উৎফুল্ল হয়ে বললেন, আরে ছিবাস যে। এই যে রিষিকেশ এসো এসো—তোমরা না এলে তো রিয়াশাল আরম্ভ হয় না। বেশ ভাল করেছ—বসো।

মানিক ততক্ষণ তামাক সেজে কেদারের হাতে দিয়ে বললে, তামাক ইচ্ছে করুন।

কেদারের মনে অকস্মাৎ তুমুল আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। বাইরের ঝিরঝিরে মিঠে ফাল্গুনের হাওয়ায় আমের বউলের সুঘ্রাণ, একটা আঁকোড় ফুলের গাছের সাদা ফুল ধরেছে—সামনে এখন অর্ধেক রাত পর্যন্ত গানবাজনার গমগমে আসর, কত লোকজন, ছেলে-ছোকরা আসবে, মানুষের জীবনে এত আনন্দও আছে!

তামাক খেতে খেতে কেদার খুশির আতিশয্যে বলে উঠলেন, ওহে রিষিকেশ, এদিক এসে—ততক্ষণ তোমার আয়ান ঘোষের পাটটা একবার মুখস্ত বলে যাও শুনি—

কেদারের হুকুম অমান্য করবার সাধ্য নেই কারো এ আসরে। হৃষিকেশ কর্মকার দু-একবার ঢোক গিলে দু-একবার ঘরের আড়ার দিকে তাকিয়ে বিপন্ন মুখে বলতে শুরু করলে—'অদ্য পৌর্ণমাসী রজনী, যমুনা পুলিনের কি অদ্ভুত শোভা! কিন্তু অহো! আমার হৃদয়ে সহস্র বৃশ্চিকদংশনের মত এরূপ মর্মঘাতী জ্বালা অনুভব করিতেছি কেন?—কোকিলের কুহু ধ্বনি আমার কর্ণকুহরে—'

—আঃ দাঁড়াও দাঁড়াও, অমন নামতা মুখস্ত বলে গেলে হবে না। থেমে দমক দিয়ে দিয়ে বলো—কাঠের পুতুলের মত অমন আড়ষ্ট হয়ে থাকার মানে কি? হাত-পা নড়ে না?

এই সময় কয়েকজন লোক এসে ঢুকলো। কেদারের ঝোঁক গানবাজনার দিকে, শুধু বক্তৃতার তালিম তাঁর মনে পুরো আনন্দ দিতে পারে নি এতক্ষণ, নবাগতদের মধ্যে বিশ্বেশ্বর পালের ছেলে নন্দকে দেখে তিনি হঠাৎ অতিমাত্রায় খুশী হয়ে উঠলেন।

—আরে ও নন্দ, এত দেরি করে এলি বাবা, তবেই তুই রাধিকা সেজেছিস! বারোখানা গান তোমার পার্টে, আজই সব তালিম দেওয়া চাই নইলে আর কবে কি হবে শুনি? বোস, বেয়ালা বেঁধে নি—গানগুলো আগে হয়ে যাক।

দু-এক জন ক্ষীণ আপত্তি তুলবার চেষ্টা করলে। ছিবাস মুদির নন্দ ঘোষের পার্ট, সে বললে, এ্যাক্‌টোর সঙ্গে সঙ্গে গান চললে একানে গানগুলো ভালো রপ্ত হয়ে যেতো বাবাঠাকুর—নইলে এ্যাক্‌টো আড়ষ্ট মেরে যাবে যে!

কেদার মুখ খিঁচিয়ে বললে, থামো না ছিবাস। বোঝ তো সব বাপু—কিসে কি হয় সে আমি খুব ভাল জানি। একানে গান আগে না তালিম দিয়ে নিলে শেষকালে এ্যাক্‌টোর সময় গান গাইতে গেলে ভয়েই গলা শুকিয়ে যাবে। তুমি তোমার নিজের পাট দ্যাখো গিয়ে বাইরে বসে—

ছিবাস ধমক খেয়ে অপ্রতিভ হয়ে গেল। এর পরে আর কেউ কোন প্রকার প্রতিবাদ করতে সাহস করলে না, কেদারের মুখের ওপর প্রতিবাদ কখনো বড় একটা করেও না কেউ।

সুতরাং গান-বাজনা চললো পুরোদমে।

ক্রমে সব লোক এসে জড় হয়ে গেল—ঘরে বসবার জায়গা দিতে পারা যায় না। বাইরের দাওয়ায় গিয়ে অনেকে বসলো। বাইরে যাবার আরও একটা কারণ এই, এদের মধ্যে বেশির ভাগ ছেলেছোকরা ও বাইশ-তেইশ থেকে ত্রিশ-বত্রিশ বছরের যুবক, এরা কেদারের সামনে বিড়ি বা তামাক খায় না—অথচ বেশীক্ষণ ধূমপান না করে তারা থাকতেও পারে না, বাইরের দাওয়া আশ্রয় করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই।

গানে বাজনায় বক্তৃতায় গল্পে এবং সঙ্গে সঙ্গে তামাক ও বিড়ির ধোঁয়ায় মহলাঘরের বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে, এমন সময় দূরে কিসের চীৎকার শোনা গেল।

কে একজন বললে, ও ছিবাস জ্যাঠা—চৌকিদার হাঁকছে যে বামুনপাড়ায়, অনেক রাত হয়েছে তবে !

দু-এক জন উৎকর্ণ হয়ে শুনে বললে, তাই তো, রাতটা বেশী হয়ে গিয়েছে। বাবাঠাকুর, আজ বন্ধ করে দিলে হত না ? আপুনি আবার এতটা পথ যাবেন—

বিশু কুমোরের ছেলে এ পর্যন্ত গোটা আষ্টেক গানের তালিম দিয়ে এবং কেদারের কাছে বিস্তর ধমক খেয়ে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল—সে করুণ দৃষ্টিতে কেদারের দিকে চাইলে।

কেদার বললেন, ঘুম আসছে, না ? তোর কিছু হবে না বাবা। কুমোরের ছেলে, চাক ঘোরাবি, ভাঁড় আর তিজেল হাঁড়ি গড়বি, তোর এ বিড়ম্বনা কেন বল্ দিকি বাপু ? সেই সন্দে থেকে তোকে পাখীপড়া করছি, এখনও একটা গানও নিখুঁত করে গলায় আনতে পারলি নে—তোর গলায় নেই সুর তার কোত্থেকে কি হবে ? বেসুরো গলা নিয়ে গান গাওয়া চলে ?

আসলে তো একথা ঠিক নয়। বিশু ছেলেটি বেশ সুকণ্ঠ গায়ক, সবাই জানে, কেদারও তা ভালই জানেন—কিন্তু তিনি বড় কড়া মাস্টার এবং তাঁর কথা বলবার ধরনই এই। ছেলেটির এ রকম তিরস্কার গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে, সুতরাং সে কেদারের কথায় দুঃখিত না হয়ে বললে—দাদাঠাকুর, বাড়িতে মার অসুখ—বাবা সকাল সকাল যেতি বলে দিয়েল—

—তা যা যা। আজ তবে থাক এই পর্যন্ত, কাল সবাই সকালে সকালে আসা হয় যেন। চল হে ছিবাস, চল হে রিষিকেশ—

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেদার উঠে পড়লেন, হুঁশ না করিয়ে দিলে তিনি আরও কতক্ষণ এখানে থাকতেন কে জানে।

কিন্তু মহলা-ঘরের বাইরে পা দিয়ে তিনি একটু অবাক হয়ে বললেন, একি, হ্যাঁ ছিবাস, জ্যোৎস্না উঠে গিয়েছে যে !

—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবাঠাকুর, তাই তো দেখছি—

—তাই তো হে, আজ নবমী না ? কৃষ্ণপক্ষের নবমী, ওঃ অনেক রাত হয়ে গিয়েছে তা হলে।

পথে কিছুদূর পর্যন্ত এক সঙ্গে এসে বিভিন্ন পাড়ার দিকে একে একে সবাই বেরিয়ে গেল কেদারকে ফেলে। দু-তিনজন কেদারকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে চাইলে—কিন্তু কেদার সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে একাই বাড়ির দিকে চললেন। গড়ের খাল পার হবার সময় নিশীথ রাত্রির জ্যোৎস্নালোকিত বন-ঝোপের দিকে চেয়ে চেয়ে কেদারের বেশ লাগল। কেদারের পিতামহ রাজা বিষ্ণুরামের স্বহস্তে রোপিত বোম্বাই আমের গাছে প্রচুর বউল এসেছে এবার—তার ঘন সুগন্ধে মাঝরাত্রির জ্যোৎস্নাভরা বাতাস যেন নেশায় ভরপুর, তারি আনন্দে জীবনের দিনগুলো কেটে যাচ্ছে মোটের উপর তাঁর। সকাল থেকে এত রাত পর্যন্ত সময় যে কোথা দিয়ে কেটে যায় তা তিনি বুঝতেই পারেন না।

কি চমৎকার দেখাচ্ছে জ্যোৎস্নায় এই গড়বাড়ির জঙ্গল, ভাঙা ইট-পাথরের ঢিবিগুলো ! সবাই বলে নাকি অপদেবতা আছে, তিনি বিশ্বাস করেন না ! সব বাজে কথা !

কই এত রাত পর্যন্ত তো তিনি বাইরে থাকেন, একাই আসেন বাড়ি, কখনো কিছু তো দেখেন নি ! বাল্যকাল থেকে এই বনে-ঘেরা ভাঙা বাড়িতে মানুষ হয়েছেন, এর প্রত্যেক ইটখানা, প্রত্যেক গাছটি, বনের লতাটি তাঁর প্রিয় ও পরিচিত। তাঁর অস্তিত্বের সঙ্গে এরা জড়ানো, তিনি যে চোখে এদের দেখেন, অন্য লোকে সে চোখ পাবে কোথায় ?

কষ্ট হয় শরতের জন্যে।

ওকে তিনি কোনো সুখে সুখী করতে পারলেন না। ছেলেমানুষ, ওর জীবনের কোন সাধ পুরলো না। সারাদিনের কাজকর্ম ও আমোদ-প্রমোদের ফাঁকে ফাঁকে শরতের মুখখানা

যখন তাঁর মনে পড়ে হঠাৎ তখন বড় অন্যমনস্ক হয়ে যান কেদার ! যেখানেই থাকুন, মনে হয় এখনি ছুটে একবার তার কাছে চলে যান।

আহা, এত রাত পর্য্যন্ত মেয়েটা একা এই জঙ্গলে-ঘেরা বাড়ির মধ্যে থাকে, কাজটা ভাল হচ্ছে না—ঠিক নয় কেদারের এতক্ষণ বাইরে থাকা !

দোরে ঘা দিয়ে কেদার ডাকলেন, ও শরৎ, মা ওঠো, দোর খোলো—

দু-তিনবার ডাকের পর শরতের ঘুমজড়িত কণ্ঠের ক্ষীণ সাড়া পাওয়া গেল।

—উঠে দোর খুলে দে—ও শরৎ—

শরৎ বিরক্তিভরা মুখে দোর খুলতে খুলতে বললে, আমি মরবো মাথা কুটে কুটে তোমার সামনে বাবা। পারি নে আর—সন্দে হয়েছে কি এ যুগে ! রাত কাবার হয়ে গেল—এখন তুমি বাড়ি এলে ! পুবে ফর্সা হবার আর বাকি আছে ?

—না না, আরে এই তো বামুনপাড়ায় চৌকিদার হেঁকে গেল—রাত এখনও অনেক আছে। আর বকিস নে, এখন ভাত দে দিকি। খিদে পেয়েছে যা—

কেদার খেতে বসলে শরৎ ঝাঁঝের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলে, কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?

—কোথায় আর থাকবো ? আমাদের দলের মহলা হচ্ছে, সেখানে আমি না থাকলেই সব মাটি। যেদিকে আমি না যাবো সেদিকেই কোনো কাজ হবে না।

শরৎ একটু নরম সুরে বললে, যাত্রা কোথায় হবে ? আমি কিন্তু যাবো তোমার সঙ্গে।

—তা ভালই তো। বাড়ির মেয়েদের জন্যে চিক দিয়ে দেবে, যাবি তো ভালই।

শরৎ একটু চুপ করে থেকে বললে, বাবা, আজ প্রভাসদা এসেছিল।

কেদার বিস্ময়ের সুরে বললেন, কোথায় ? কখন ?

—তুমি বেরিয়ে চলে গেলে তার একটু পরেই। এখানে এসে বসলো। তার সঙ্গে আর একজন ওর বন্ধু। দু-জনকে চা করে দিলাম—খাবার কিছু নেই, কি করি—একটুখানি ময়দা পড়েছিল, তাই দিয়ে খানকতক পরোটা ভেজে দিলাম।

—বেশ বেশ। কতক্ষণ ছিল ?

—তা অনেকক্ষণ—প্রায় ঘণ্টাতিনেক। সন্ধ্যা হবার পরও খানিকক্ষণ ছিল।

—কি বলে গেল ?

—বেড়াতে এসেছিল। প্রভাসদা'র বন্ধু কলকাতার কোন বড়লোকের ছেলে, বেশ চেহারা। নাম অরুণ মুখুজ্জে। আমাদের গড়বাড়ির গল্প শুনে সে এসেছিল প্রভাসদা'র সঙ্গে দেখতে। অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে দেখলে।

—বড়লোকের কান্ড, তুইও যেমন ! ঘরে পয়সা থাকলেই মাথায় নানা রকম খেয়াল গজায়। তার পর, দেখে কি বললে ?

—খুব খুশী। আমাদের এখানে এসে কত রকম কথা বলতে লাগল, অরুণবাবু আবার আসবে, ফটোগ্রাফ নিয়ে যাবে ! কি লিখবে নাকি আমাদের গড়বাড়ি নিয়ে। আমায় তো একেবারে মাথায় তুললে।

—ওই তো বললাম, বড়লোকের যখন যেটি খেয়াল চাপবে। কলকাতায় মানুষের অভাব নেই—আমাদের মত দুঃখ-ধান্দা করে যদি খেতে হত—

শরতের হাসি পেল বাবার দুঃখ-ধান্দা করে খাবার কথায়। জীবনে তিনি তা কখনো করেন নি। কাকে বলে তা এখনও জানেন না। কিসে কি হয় তা শরৎ ভাল করেই জানে।

যেমন আজকের দিনের কথা। শরৎ হুবহু সত্য কথা বলে নি। ঘরে কিছুই ছিল না। ওরা গেল ভাঙা ইট কাঠ দেখতে, গড়বাড়ি ঘুরতে—সেই ফাঁকে শরৎকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে হল রাজলক্ষ্মীদের বাড়ি ময়দা ও ঘি ধার করতে। সেখানে পাওয়া গেল তাই মান রক্ষে।

সব দিন আবার সেখানেও পাওয়া যায় না।

রাজলক্ষ্মী ওদের কথা শুনে দেখতে এসেছিল। সে-ই চা ও খাবার পরিবেশন করেছিল প্রভাস ও তার বন্ধুকে।

আর একটা কথা শরৎ বলে নি বাবাকে। প্রভাস ওকে একটা মখমলের বাক্স দিয়ে গিয়েছে। কেমন চমৎকার বাক্সটা। তার মধ্যে গন্ধতেল, এসেন্স, পাউডার আরও সব কি কি! না নিলে প্রভাসদা কি মনে করবে, সে বাক্সটা হাত পেতে নিয়েছিল—কলকাতার ছেলে, ওরা হয়তো বোঝে না যে বিধবা মানুষের ওসব ব্যবহার করতে নেই। তার যে কোনো বিষয়ে কোনো সাধ-আহ্লাদ নেই, সব বিষয়ে সে নিস্পৃহ, উদাসী—কেমন এক ধরণের। এ বয়সেই মেয়ের সন্ন্যাসিনী মূর্ত্তি—তার বাবার ভাল লাগে না। শরৎ তা জানে। বাবাকে বলে কি হবে বাক্সটার কথা, যখন সেটা সে রাখবে না।

কেদার আহারান্তে তামাক খেতে বসলেন বাইরের দাওয়ায়।

শরৎ বলল, বাইরে কেন বাবা, ঘরে বসে খাও না তামাক, আজকাল রাত্তিরে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে। দিনে গরম রাতে ঠাণ্ডা যত অসুখের কুটি।

গভীর রাত্রি।

বিছানায় শুয়ে একটা কথা তার মনে হল বার বার। এর আগেও অনেক বার মনে হয়েছে। প্রভাস-দার বন্ধু অরুণবাবুর চেহারা বেশ সুন্দর, অবস্থাও ভাল। রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে ওর বিয়ে দেওয়া যেত!

রাজলক্ষ্মী এল তিনদিন পরে।

সে গড়ের-বনে সজনে ফুল কুড়ুতে এসেছিল, কোঁচড় ভর্ত্তি করে ফুল কুড়িয়ে বাড়ি ফিরবার পথে শরতের রান্নাঘরে উঁকি মেরে বললে, ও শরৎদি, সজনে ফুল রাখবে নাকি? কত ফুল কুড়িয়েছি দ্যাখো—তোমাদের ওই পুকুরের কোণের গাছে।

শরৎ রান্না চড়িয়েছিল, ব্যস্তভাবে খুশির সুরে বললে, ও রাজলক্ষ্মী আয় আয়, দেখি কেমন ফুল? আয় তোকে আমি খুঁজছি ক'দিন। কথা আছে তোর সঙ্গে।

একটা ছোট চুবড়ি এনে বললে, দে এতে চাট্টি ফুল। বেশ কুঁড়ি কুঁড়ি ফুলগুলো, ভাজবো এখন। বাবা বড্ড খেতে ভালবাসেন।

—শরৎদি, আমাদের ওদিকে তুমিও তো যাও নি ক'দিন?

—না ভাই, বাবার পায়ে বাত মত হয়ে ক'দিন কষ্ট পেলেন। তাঁর তাপসেঁক—আবার এদিকে সংসারের ছিষ্টি কাজ, এর পরে সময় পাই কখন যে যাবো বল্। চা খাবি?

—না শরৎদি, বেলা হয়ে গেল—আর বেশীক্ষণ থাকলে এবেলা ফুলগুলো ভাজা হবে কখন? এ বেলা যাই—ও বেলা বরং আসবো।

—দাঁড়া, তোর জন্যে একটা জিনিস রেখে দিয়েছি, নিয়ে যা—

শরৎ মখমলের বাক্সটা এনে ওর হাতে দিয়ে বললে, দ্যাখ্ তো কেমন? খুলে দ্যাখ্—

অপ্রত্যাশিত আনন্দে ও বিস্ময়ে রাজলক্ষ্মীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এক মুহূর্ত্তে। বাক্সটা খুলতে খুলতে বললে, কোথায় পেলে শরৎদি?

—প্রভাসদা দিয়ে গিয়েছিল সেদিন।

রাজলক্ষ্মী শরতের মুখের দিকে চেয়ে বললে, তা তুমি রাখলে না?

শরৎ মৃদু হেসে বললে, ওর মধ্যে দ্যাখ্ না কত কি—সাবান, পাউডার, মুখে মাখবার ক্রিম্—আমি কি করবো ও সব। তুই নিয়ে গিয়ে রাখলে আমার আনন্দ হবে।

রাজলক্ষ্মী কিছু ভেবে বললে, যদি মা জিজ্ঞেস করে কোথায় পেলি ?

—বলিস্ আমি দিয়েছি !

—এ নিয়ে কেউ কিছু বলবে না তো ? জানো তো নিমু ঠাকরুণকে, গাঁয়ের গেজেট। প্রভাসবাবুর কথা বলবো না—কি বলো ?

—সত্যি কথা বলছি, এতে আর ভয় কি ? নিমু ঠানদি এতে বলবে কি ? বলিস প্রভাসবাবু দিয়েছিল শরৎদিকে।

—ভারি খারাপ মানুষ সব শরৎদি। তুমি যত সহজ আর ভালো ভাবো সবাইকে, অত ভালো কেউ নয়। আমার আর জানতে বাকী নেই। সেবার যে এখানে প্রভাসবাবু এসেছিল, এ কথা গাঁয়ে রটনা হয়ে গিয়েছে। কাল যে এসেছিল আবার—তা নিয়েও কাল কথা হয়েছে।

শরৎ বিস্ময়ের সুরে বললে, বলিস্ কি রে ? কি কথা হয়েছে ?

—অন্য কথা কিছু নয় শরৎ দিদি। শুধু এই কথা যে প্রভাসদা তোমাদের বাড়ি আসা-যাওয়া করছে আজকাল। তুমি না হয়ে অন্য মেয়ে যদি হত, তা হলে অনেকে অন্য রকম কথাও ওঠাতো—নিমু ঠাকরুণ, আমার জ্যেঠাইমা, হীরেন কাকার মা, জগন্নাথ দাদু—এরা। কিন্তু তুমি বলেই কেউ কিছু বলতে সাহস করে না।

শরৎ যাত্রার দলের সুর নকল করে টেনে টেনে হাত নেড়ে বললে, দেশের রাজকন্যার নামে অপকলঙ্ক রটাবে, কার ঘাড়ে ক'টা মাথা ? সব তা হলে গর্দান নেবো না দুরাচারদের ?

রাজলক্ষ্মী হি হি করে হেসে লুটিয়ে পড়ে আর কি ! মুখে কাপড় গুঁজে হাসতে হাসতে বললে, উঃ, এত মজাও তুমি করতে জানো শরৎদি ! হাসিয়ে মারলে—মাগোঃ—

শরৎ হাসিমুখে বললে, তবে একটু বসে যা লক্ষ্মী দিদি আমার। দুটো মুড়ি খেয়ে যা—

রাজলক্ষ্মী দুর্ব্বল সুরের প্রতিবাদ জানিয়ে বললে, না শরৎদি—ফুল ভাজা হবে কখন তা হলে এবেলা ? আমায় আটকো না—

—বোস্। আমিও খাচ্ছি দুটো মুড়ি—নারকোল-কোরা দিয়ে। তুইও খাবি। যেতে দিলে তো ? সজনে ফুলের দুর্ভিক্ষ লাগে নি গড়শিবপুরে—

খানিক পরে শরৎ মুড়ি খেতে খেতে বললে, শোন রে, তোর সঙ্গে একটা কথা আছে। অরুণবাবু এসেছিল প্রভাসদা'র সঙ্গে, দেখেছিস তো ? ওর সঙ্গে তোর বিয়ের কথা পাড়বো প্রভাসদা'র কাছে ? অরুণবাবুরা বেশ অবস্থাপন্ন। বেশ ভালো হবে।

রাজলক্ষ্মী সলজ্জ দৃষ্টিতে শরতের মুখের দিকে চেয়ে বললে, কি যে তুমি বলো শরৎদি ! এক-এক সময় এমন ছেলেমানুষ হয়ে যাও !

—ছেলেমানুষ হওয়া কি দেখলি ?

—ওরা আমায় নেবে কেন ? আমার কি রূপগুণ আছে বলো ! তুমি যে চোখে আমায় দ্যাখো—সকলে কি সে চোখে দেখবে ?

—সে ভাবনার তোর দরকার নেই। তুই শুধু আমায় বল্ প্রভাসদা'র কাছে কথা আমি পাড়বো কি না। অরুণবাবুকে পছন্দ হয় ?

—দূর—কি যে বলো ? শরৎদি একটা পাগল—

—সোজা কথাটা কি বল্ না ?

—ধরো যদি বলি হয়—তুমি কি করবে ?

—তাই বল্। আমি প্রভাসদা'র কাছে তা হলে কথাটা পেড়ে ফেলি।

রাজলক্ষ্মী চুপ করে রইল। শরৎ বললে, বাড়িতে বা অন্য কারো কাছে বলিস্ নে কোনো কথা এখন।

রাজলক্ষ্মী হাত নেড়ে বললে, হ্যাঁ, আমি বলে বেড়াতে যাই, ওগো আমার বিয়ের সম্বন্ধ

হচ্ছে সবাই শোনো গো। একটা কথা, জ্যাঠামশাইকে যেন বোলো না শরৎদি।

—বাবাকে? ও বাপ রে! এখুনি সারা গাঁ পরগনা রটে যাবে তা হলে। পাগল তুই, তা কখনো বলি?

রাজলক্ষ্মী বিদায় নিয়ে বাড়ি যাবার পথে গড়ের খাল পার হয়ে দেখলে কেদার একটা চুপড়িতে আধ-চুপড়ি বেগুন নিয়ে হন্ হন্ করে আসছেন।

ওকে দেখে বললেন, ও বুড়ি, ওঃ কত সজনে ফুল রে!—কোত্থেকে? তা বেশ। শরতের সঙ্গে দেখা করে এলি তো?

—হ্যাঁ জ্যাঠামশায়, শরৎদির সঙ্গে দেখা না করে আসবার জো আছে? আর না খাইয়ে কখনো ছাড়বে না।

—হ্যাঃ, ভারি তো খাওয়া! কি খেতে দিলে?

—মুড়ি মাখলে, ও খেলে, আমি খেলাম।

—তা যা মা—বেলা হয়ে গেল আবার—

রাজলক্ষ্মী দূরে থেকে কেদারকে আসতে দেখে মখমলের বাক্সটা কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে ফেলেছিল—সে একটু অস্বস্তি বোধ করছিল। কথা শেষ করে কেদারের সামনে থেকে পালিয়ে বাঁচলো সে।

কিন্তু কিছু দূরে যেতেই সে শুনলে কেদার তাকে পেছন থেকে ডাকছেন—ও বুড়ি, শুনে যা। একটু দাঁড়িয়ে যা—

—কি জ্যাঠামশায়?

—এই বেগুন ক'টা আনলাম গেঁয়োহাটির তারক কাপালীর বাড়ি থেকে। তুই নিয়ে যা দুটো। সজনে ফুলের সঙ্গে বেশ হবে এখন—

রাজলক্ষ্মী বিব্রত হয়ে পড়ল। এক হাতে সে বাক্সটা ধরে আছে, অন্য হাতে ফুলে ভর্ত্তি আঁচল। বেগুন নেয় কোন্ হাতে? কিন্তু কেদার সদাই অন্যমনস্ক, কোনোদিকে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখবার সময় নেই। কোনো রকমে গোটা চারেক বেগুন রাজলক্ষ্মীর সামনে নামিয়ে রেখে তিনি চলে যেতে পারলে যেন বাঁচেন এমন ভাব দেখালেন।

রাজলক্ষ্মী ভাবলে—জ্যাঠামশায় বড় ভাল। এ গাঁয়ে ওদের মত মানুষ নেই। শরৎদি কি ভালই বাসে আমায়। এ গাঁ থেকে যদি বিয়ে হয়ে অন্য জায়গায় চলে যাই, শরৎদিকে না দেখে কি করে থাকবো তাই ভাবি! পাছে বাড়িতে জ্যাঠাইমা টের পায়, এজন্যে রাজলক্ষ্মী বাক্সটা সন্তর্পণে লুকিয়ে বাড়ি ঢুকলো। মাকে ডেকে বললে, এই দ্যাখো মা—

রাজলক্ষ্মীর মা বাক্সটা হাতে নিয়ে বললে, বাঃ দেখি, দেখি—কোথায় পেলি রে? শরৎ দিলে? চমৎকার জিনিসটা। আমরা বাপু সেকেলে লোক, কখনো চক্ষেও দেখি নে এসব। শরৎ কোথায় পেলে রে?

রাজলক্ষ্মী বললে, ওকে প্রভাসদা কাল দিয়েছিল। তা ও তো এসব মাখবে না—জানো তো ওকে। তাই আমায় বললে, তুই নিয়ে যা। এ কথা কাউকে বোলো না কিন্তু মা।

দু-দিন পরে কেদার একদিন সকালে বললেন, শরৎ মা, আমি আজকে একবার তালপুকুর যাবো খাজনা আদায় করতে, আমার আসতে একদিন দেরি হতে পারে, একটু সাবধানে থেকো।

শরৎ বলল, বেশি দেরি কোরো না বাবা, তুমি যেখানে যাও আসবার নামটি করতে চাও না তো! আমি একলা থাকবো মনে কোরো।

কেদার একবার বাড়ির বার হলে ফিরবার কথা ভুলে যান একথা শরৎ ভালভাবেই জানে। মুখে বললেও শরৎ জানে বাবা এখন দিন দু-তিনের মত গা-ঢাকা দিলেন। সেদিন সে

রাজলক্ষ্মীকে বলে পাঠালো একবার দেখা করতে।

দুপুরের পর রাজলক্ষ্মী এসে বললে, কি শরৎ দিদি, ডেকেছিলে কি জন্যে ?

—বাবা গিয়েছেন তালপুকুরে খাজনা আদায় করতে, আমাদের বাড়ি দু-দিন রাত্রে শুবি ?

রাজলক্ষ্মী বললে, মা থাকতে না দিলে তো থাকা হবে না। আচ্ছা, বলে দেখবো এখন।

—এইখানেই খাবি কিন্তু এবেলা—

—ওই তো তোমার দোষ শরৎদি, কেন বাড়ি থেকে খেয়ে আসতে পারি নে ?

—পারবি নে কেন। তবে দুজনে মিলে খেলে বেশ একটু আনন্দ পাওয়া যায়। খাবি ঠিক বললাম কিন্তু।

দুপুরের অনেক পরে রাজলক্ষ্মী এসেছে। বেলা প্রায় গড়িয়ে বিকেল হয়ে এল। পুকুর-ঘাটে ছাতিমবনের দীর্ঘ ছায়া পড়ে গিয়েছে, যখন ওরা দুজনে পুকুরঘাটে এসে বসলো।

মুখে বিদেশে যাবার যত ইচ্ছেই ওরা প্রকাশ করুক, এই গ্রাম ওদের অস্তিত্বের সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে গিয়েছে এর ছাতিম ফুলের উগ্র সুবাস নিয়ে, ঘুঘু ও ছাতারে পাখীর ডাক নিয়ে, প্রথম হেমন্তে গাছের ডালে ডালে আলকুশী ফলের দুলুনি নিয়ে—এর সমস্ত রূপ, রস, গন্ধ নিয়ে। শরৎ যখনই এই দীঘির বাঁধা ঘাটের পাড়ে বসে ছাতিমবনের দিকে তাকায়, তখন মনে হয় ওর, সে কত যুগ থেকে এই গ্রামের মেয়ে, তার সমস্ত দেহমন-চেতনাকে আশ্রয় করে আছে এই ভাঙা গড়বাড়ি, এই কালো পায়রার দীঘি, এই পুরনো আমলের মন্দিরগুলো, এই ছাতিমবন, ইটের স্তূপ।

ঋতুতে ঋতুতে ওদের পরিবর্তনশীল রূপ ওর মন ভুলিয়েছে। শরৎ অত ভাল করে বোঝে না, ঋতুর পরিবর্তন সম্বন্ধে তার মন তত সজাগ নয়, তবুও ভাল লাগে। বুদ্ধি দিয়ে না বুঝলেও অন্য একটা অনুভূতি দিয়ে তার মন এর সৌন্দর্যকে নিতে পারে।

শরৎ পুকুরপাড়ে বাসন নামিয়েই বললে, রাজলক্ষ্মী, পাতাল-কোঁড় তুলে আনবি ? ওই উত্তর দেউলের ওদিকের জঙ্গলে সেদিন অনেক ফুটেছিল—চল্ দেখে আসি।

—এখন বর্ষাকাল নয়, এখন বুঝি পাতাল-কোঁড় ফোটে ?

—ফুটে বনের তলা আলো করে আছে, বলে ফোটে না! চল্ না দেখবি—

—আমার বড্ড ভয় করে শরৎদি ও বনে যেতে, তুমি চলো আগে আগে—

বাসন সেখানেই পড়ে রইল। গড়শিবপুরে এ পর্যন্ত কোন জিনিস ফেলে রাখলে চুরি যায় নি। কতদিন এমন দীঘির ঘাটে এঁটো বাসন জলে ডুবিয়ে রেখে চলে যায়, সারা রাত হয়তো পড়ে থাকে—তার পরদিন সকালে সে-সব বাসন মাজা হয়—একটা ছোট তেলমাখা বাটিও চুরি যায় নি। শরৎদি'র ঘরে বেশি জায়গা নেই বলে কত জিনিসপত্র বাইরেই পড়ে থাকে দিনরাত। শুধু গড়ের মধ্যে বলে যে এমন তা নয়, এ-সব পল্লী অঞ্চলে চোরের উপদ্রব আদৌ নেই।

ঘন নিবিড় বনের মধ্যে ঢুকে রাজলক্ষ্মীর গা ছম্‌ছম্ করতে লাগল। শরৎদি শক্ত মেয়েমানুষ, ওর সাহস বলিহারি—ও সব পারে। বাবাঃ, এই বনে মানুষ ঢোকে পাতাল-কোঁড়ের লোভে ?

—ও শরৎ দিদি, সাপে খাবে না তো ? তোমাদের গড়ের ইটের ফাটলে ফাটলে সাপ বাবা—

শরৎ কৃত্রিম কোপের সঙ্গে বললে, অমন করে আমার বাপের বাড়ির নিন্দে করতে দেবো না তোকে—আমাদের এখানে যদি সাপ থাকতো তবে আমায় এতদিন আস্ত থাকতে হত না। আমার মতো বনে-জঙ্গলে তো তুমি ঘোরো না! কি বর্ষা, কি গরমকাল, ঝড় নেই, বৃষ্টি

নেই, অন্ধকার নেই—একলাটি বনের মধ্যে দিয়ে যাবো উত্তর দেউলে সন্দে পিদিম দিতে—তা ছাড়া এই বনে কাঠ কুড়িয়ে বেড়াই, বাবা কি যোগাড় করে দেন ?

এক জায়গায় রাজলক্ষ্মী থমকে দাঁড়িয়ে বললে, দ্যাখো দ্যাখো শরৎ দিদি, কত পাতাল-কোঁড়—বেশ বড় বড়—

শরৎ তাড়াতাড়ি এসে বললে, কই দেখি ?

পরে হেসে বলে উঠল—দূর ! ছাই পাতাল-কোঁড়—ও সব ব্যাঙের ছাতা, অত বড় হয় না পাতাল-কোঁড়—ও খেলে মরে যায় জানিস্ ? বিষ—

—সত্যি শরৎদি ?

—মিথ্যে বলছি ? ব্যাঙের ছাতা বিষ—

—আমি খেলে মরে যাবো—

—বালাই ষাট—কি দুঃখে ?

—বেঁচে বা কি সুখ শরৎদি ? সত্যি বলছি—

—কেন, জীবনের উপর এত বিতেষ্টা হল যে হঠাৎ ?

—অনেকদিন থেকেই আছে। এক এক সময় ভাবি আমাদের মত মেয়ের বেঁচে কি হবে শরৎদি ? না আছে রূপ, না আছে গুণ—এমনি করে কষ্টেসৃষ্টে করে ঘুঁটে কুড়িয়ে আর বাসন মেজেই তো সারাজীবন কাটবে ?

—সুখ যদি জুটিয়ে দিই ? তা হলে কিন্তু—

—তোমার সেই সেদিনের কথা তো ? তুমি পাগল শরৎদি—

—তুই রাজী হয়ে যা না !

—সেই জন্যে আটকে রয়েছে ! তোমার যেমন কথা—

—এবার প্রভাসদাকে বলবো দেখিস্ হয় কি না—

হঠাৎ রাজলক্ষ্মী উৎকর্ণ হয়ে বললে, চুপ শরৎদি, বনের মধ্যে কারা আসছে—

শরতের তাই মনে হল। কাদের পায়ের শব্দ বনের ওপাশে। শরৎ রাজলক্ষ্মী একটা গাছের আড়ালে লুকুলো। দুজন লোক বনের মধ্যে কি করছে। কিসের শব্দ হচ্ছে যেন। শরৎ চুপি চুপি বললে, কারা দেখতে পাচ্ছিস ?

—না শরৎদি, চলো পালাই—

—পালাবো কেন ? বাঘভাল্লুক তো না—তুই দাঁড়া না—

একটু সরে শরৎ আবার বললে, দেখেছিস্ মজা ? রামলাল কাকার ছেলে সিদ্ধু আর ওপাড়ার জীবন শুঁড়ির ভাই হরে শুঁড়ি।

হঠাৎ শরৎ কড়া গলার সুর চড়িয়ে বললে, কে ওখানে ?

দুপ দুপ দ্রুত পদশব্দ। তারপর সব চুপচাপ।

শরৎ বললে, আয় তো গিয়ে দেখি—কি করছিল মুখপোড়ারা—

রাজলক্ষ্মী চেয়ে দেখলে শরতের যেন রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি। ভয় ও সঙ্কোচ একমুহূর্ত্তে চলে গিয়েছে তার চোখমুখ থেকে। রাজলক্ষ্মী ভয় পেয়ে বললে, ও শরৎদি, ওদিকে যেও না—পরে শরৎ নিতান্তই গেল দেখে সে নিজেও সঙ্গে সঙ্গে চললো। খানিকদূর গিয়ে দুজনেই দেখলে যেখানে উত্তর দেউলের পূব কোণে একটা ভাঙা পাথরের মূর্ত্তি পড়ে আছে ঘন লতাপাতার ঝোপের মধ্যে—সেখানে একটা লোহার শাবল পড়ে আছে, কারা খানিকটা গর্ত্ত খুঁড়েছে আর কতকগুলো মাটিতে পোঁতা ইট সরিয়েছে।

শরৎ খিল খিল করে হেসে উঠে বললে, মুখপোড়াদের বিশ্বাস গড়ের জঙ্গলে সর্ব্বত্র ওদের জন্যে টাকার হাঁড়ি পোঁতা রয়েছে। গুপ্তধন তুলতে এসেছিল হতচ্ছাড়া ড্যাকরারা, এরকম

দেখে আসছি ছেলেবেলা থেকে। কেউ এখানে খঁড়েছে, কেউ ওখানে খঁড়েছে—আর সব খঁড়বে কিন্তু লুকিয়ে। পাছে ভাগ দিতে হয়! যাক—শাবলখানা লাভ হয়ে গেল। চল্ নিয়ে চল্—

রাজলক্ষ্মীও হেসে কুটিপাটি। বললে, ভারি শাবলখানা নিয়ে পালাতে প্যারলে না। তোমার গলা শুনেই পালিয়েছে—তোমাকে সবাই ভয় করে শরৎদি—

বনের পথ দিয়ে ওরা আবার যখন দীঘির ঘাটে এসে পে'ছিলো, তখন বেলা বেশ পড়ে এসেছে। আর রোদ নেই ঘাটের সি'ড়িতে, তে'তুল গাছের ডালে দ-একটা বাদুড় এসে ঝুলতে শুরু করেছে। ওরা তাড়াতাড়ি বাসন মেজে নিয়ে বাড়ির দিকে চললো।

শরৎ বললে, এবার কিছু খা—তার পর বাড়ি গিয়ে বলে আয় খুড়ীমাকে এখানে থাকবার কথা রাতে।

রাজলক্ষ্মী ব্যস্তভাবে বললে, না শরৎদি, সন্দের আর দেরি নেই। আমি আগে বাড়ি যাই। অনেকক্ষণ বেরিয়েছি বাড়ি থেকে, মা হয়তো ভাবছে—

—বোস্ আর একটু—একটু চা করি, খেয়ে যা—

শাবল ফেলে ওদের পালানো ব্যাপারটাতে শরৎ ও রাজলক্ষ্মী খুব মজা পেয়েছে। তাই নিয়ে হাসিখুশি ওদের যেন আর ফুরোতে চায় না।

রাজলক্ষ্মী বললে, তোমার সাহস আছে শরৎ দিদি, আমি হলে পালিয়ে আসতাম—

—ওই রকম না করলে হয় না, বুঝলি? সব সময় ভীতু হয়ে থাকলে সবাই পেয়ে বসে—আর কখনো ওরা আসবে না দেখিস্।

—যদি আমার না আসা হয়, একলা থাকতে পারবে শরৎদি?

শরৎ হেসে বললে, কতবার তো থেকেছি। এমনিতেই বাবা এত রাত করে বাড়ি ফেরেন, এক একদিন আমার একঘুম হয়ে যায়। বাবার কি কোন খেয়াল আছে নাকি?

তার পর সে ঈষৎ লাজুক মুখে মুখ নিচু করে বললে, বাবার জন্যে মন কেমন করছে—

—ওমা, সে কি শরৎ দিদি! আজ তো জ্যাঠামশায় সবে গেলেন—

—সে জন্যে না। বিদেশে কোথায় খাবেন কোথায় শোবেন, উনি বাড়ি থেকে বেরুলেই আমার কেবল সেই ভাবনা!

—জলে তো আর পড়ে নেই? লোকের বাড়ি গিয়েই উঠেছেন তো—

—তুই জানিস্ নে ভাই—ও'র নানান্ বাচাবিচার। এটা খাবে না ওটা খাবে না—দুনিয়ার আশ্বেক জিনিস তাঁর মুখে রোচে না। আমায় যে কত সাবধানে থাকতে হয়, তা যদি জানতিস্। পান থেকে চুণ খসলেই অমনি ভাতের থালা ফেলে উঠে গেলেন। আমার হয়েছে ও'কে নিয়ে সব চেয়ে বড় ভাবনা। একেবারে ছেলেমানুষের মত।

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে বললে, তোমার বুড়ো ছেলেটি শরৎ দিদি—আহা, কোথায় গেল, মায়ের প্রাণ, ভাবনা হবে না?

শরতের চোখ ছলছল করে উঠল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বললে, তাই এক এক সময় ভাবি, ভগবান আমায় যেন এর মধ্যে টেনে নিও না। বুড়ো বয়সে বাবা বড় কষ্ট পাবেন। ও'কে ফেলে আমার স্বর্গে গিয়েও সুখ হবে না—উনি মারা যান আগে, তার পর আমি কষ্ট পাই দুঃখ পাই, যা থাকে আমার ভাগ্যে।

—আমি এবার যাই শরৎদি—সন্দের আর দেরি কি?

—তুই কিন্তু আসবি ঠিক—খুব চেষ্টা করবি, কেমন তো? একলা আমি থাকতে পারি, সেজন্যে না। দুজনে থাকলে বেশ একটু গল্পগুজব করা যেতো—মুখ বুজে এই নিবান্দা পুরীর মধ্যে থাকতে বড় কষ্ট হয়।

রাজলক্ষ্মী চলে গেলে শরৎ সলতে পাকাতে বসলো—তার পর শাঁখ বাজিয়ে চৌকাঠে জলের ধারা দিয়ে তার অভ্যাস মত ছোট্ট একটি মাটির প্রদীপ জেলে নিয়ে উত্তর দেউলে সন্ধ্যাদীপ দিতে চলল। সঙ্গে দেশলাই নিয়ে গিয়ে দেউলে বসে প্রদীপ জ্বালাও চলে বটে, কিন্তু এদের বংশের নিয়ম ঘরের সন্ধ্যাদীপ থেকে জ্বালিয়ে নিয়ে যেতে হয় মন্দিরের প্রদীপ। তবে যদি ঝড়ে বৃষ্টিতে পথে সেটা নিবে যায়, অগত্যা সেখানে বসেই জ্বালাতে হয়—উপায় কি?

উত্তর দেউলের পথে শরতের কেবলই মনে হচ্ছিল, আবার হয়তো সেইখানে খঁড়তে আরম্ভ করেছে। সে একবার গিয়ে দেখবে নাকি? তা হলে বেশ মজা হয়—

কথাটা মনে আসতেই শরৎ আপন মনেই হি-হি করে হেসে উঠল।

—উঃ, শাবল ফেলেই ছুট দিলে! এ গুপ্তধন না তুললে নয় মুখপোড়াদের! ওদের জন্যে আমার বাপ ঠাকুরদাদা কলসী কলসী মোহর পুঁতে রেখে গিয়েছে। যদি থাকে তো আমরা নেবো আমাদের জিনিস—তোরা মরতে আসিস্ কেন হতভাগারা?

শরৎ হঠাৎ থমকে দাঁড়াল এবং একটু অবাক হয়ে চেয়ে দেখলে একটা নতুন সিগারেটের বাক্স পড়ে আছে উত্তর দেউলের পৈঠার ওপরেই। এ বনের মধ্যে সন্ধ্যাবেলা সিগারেট খেয়েছে কে? এখানকার লোকে সিগারেট খাবে না, তাদের তামাক জোটে না সিগারেট তো দূরের কথা। বাক্সটা হেলাগোছা ভাবে ফেলা নয়, কে যেন তার যাবার পথে ইচ্ছে করে রেখেছে।

প্রদীপ দেখিয়ে এসে ও সিগারেটের বাক্সটা হাতে তুলে নিলে, খালি বাক্স অবিশ্যি।

রাংতাটা আছে ভেতরে। বেশ পাওয়া গিয়েছে। সিগারেটের রাংতা বেশ জিনিস। তবে এ গাঁয়ে মেলে না, কে আর সিগারেট খাচ্ছে!

শরতের হাত থেকে সিগারেটের বাক্সটা পড়ে গেল। তার মধ্যে একখানা চিঠি! শরৎ বিস্ময়ে ও কৌতূহলে পড়ে দেখলে, লেখা আছে—

"আমি তোমার জন্যে জঙ্গলের মধ্যে ভাঙা মন্দিরের পেছনে কতক্ষণ বসেছিলাম। তুমি এলে না। তোমাকে কত ভালবাসি, তা তুমি জানো না। যদি সাহস দাও লক্ষ্মীটি, তবে কালও এই সময় এইখানেই থাকবো।"

শরৎ খানিকটা অবাক হয়ে থেকে চারিদিকে চেয়ে চেঁচিয়েই বললে, আ মরণ চুলোমুখো আপদগুলো! আচ্ছা, আবার চিঠি লেখা পর্যন্ত শুরু করেছে—হ্যাঁ? এ-সব কি কম খ্যাংরার কাজ? কাল এসো, থেকো না জঙ্গলের মধ্যে, থেকো। বঁটি দিয়ে একটা নাক যদি কেটে না নিই, তবে আমার নাম নেই—যমে ভুলে আছে কেন তোমাদের, ও মুখপোড়ারা?

রাগে গরগর করতে করতে শরৎ বাড়ি এসে দেখলে রাজলক্ষ্মী বসে আছে। বাড়ি থেকে সে একটা লণ্ঠন নিয়ে এসেছে। শরৎ খুশী হয়ে বললে, এসেছিস ভাই!

রাজলক্ষ্মী হেসে বললে, না, একেবারে আসি নি শরৎ দিদি। মা বললে, বলে আয়, রাত্তিরে থাকা হবে না।

—সত্যি?

—সত্যি শরৎদি। আমি কি বাজে কথা বলছি?

—তবে তুই আর কষ্ট করে এলি কেন?

—কথাটা বলতে এলাম শরৎ দিদি। তুমি আবার হয়তো কি মনে করবে, তাই। রাজকন্যে তুমি।

রাজলক্ষ্মীর কথা বলার ধরনে শরতের সন্দেহ হল। সে হেসে বললে, যাঃ আর চালাকি করতে হবে না। আমি আর অত বোকা নই—বুঝলি?

রাজলক্ষ্মী খিল খিল করে হেসে উঠে বললে, কিন্তু তোমায় প্রথমটা কেমন ভাবিয়েছিলাম, বলো না ?

শরৎ বললে, যাঃ, আমি গোড়া থেকেই জানি। খুড়ীমা এখানে রাত্তিরে থাকতে না দিলে তোকে আলো নিয়ে আসতে দিতেন না। ও রাজলক্ষ্মী···একটা মজা দেখবি ভাই ?

বলেই শরৎ চিঠিখানা রাজলক্ষ্মীর হাতে দিয়ে বললে, পড়ে দ্যাখ—

রাজলক্ষ্মী পড়ে বললে, এ কোথায় পেলে ?

—উত্তর দেউলের সিঁড়ির ওপর একটা সিগারেটের খোলের মধ্যে ছিল।

—আশ্চর্য, আচ্ছা কে লিখলে বলো তো শরৎদি ?

—তাই যদি জানবো তা হলে তো একেবারে শ্রাদ্ধের চাল চড়িয়ে দিই তাদের—

—তুমি আগে যাদের কথা বলেছিলে—

—তারাই হবে হয়তো। নাও হতে পারে। সিগারেট খাবে কে এ গাঁয়ে ?

—কাউকে দেখলে, কি পায়ের শব্দ শুনলে ?

শরৎ সুর বদলে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, বাদ দে ও-সব কথা! বাবা নেই কিনা বাড়িতে, বাবা না থাকলেই ওদের বিদ্ধি বাড়ে আমি জানি। যদি দেখতে পেতাম তবে না কথা ছিল!

রাজলক্ষ্মী বললে, আচ্ছা যদি আমি না আসতাম, তবে তুমি ভয় পেতে না শরৎদি, এই সব চিঠি পেয়ে—জ্যাঠামশায় নেই বাড়ি—?

—দূর, কি আর ভয়! আমার ও-সব গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে—

—একলাটি তো থাকতে হত ?

—থাকিই তো। ভয় করে কি করবো ? চিরদিনই যখন একা—

—তোমার বলিহারি সাহস শরৎদি! এই অরণ্যি বনের মধ্যে—

—ঘরে বঁটি আছে, দা আছে—এগুক দিকি কে এগুবে শরৎ বামনীর সামনে—ঠাণ্ডা করে ছেড়ে দেবো না ? কি খাবি বল্ রাত্রে—ও কথা যাক। ভাত না রুটি ?

—যা হয় করো। তুমি তো ভাত খাবে না, তবে রুটিই করো—দুজনে মিলে তাই খাবো।

বাইরে বসে আটাটা মেখে ফেলি—

—তুমি যাও শরৎদি, আমি মাখছি আটা—

দু'জনে গল্পগুজবে রাঁধতে খেতে অনেক রাত করে ফেললে। তার পর দোর বন্ধ করে দু'জনে যখন শুয়ে পড়ল, তখন খুব সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে। বেশী রাত্রে শরৎ ঘুম ভেঙে উঠে রাজলক্ষ্মীর গা ঠেলে চুপি চুপি বললে, ও রাজলক্ষ্মী, ওঠ্—বাইরে কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে যেন—

রাজলক্ষ্মী ঘুমে জড়িত কণ্ঠে ভয়ের সুরে বললে, কোথায় শরৎদি ?

—চুপ, চুপ, ওই শোন্ না—

রাজলক্ষ্মী বিছানায় উঠে বসে উৎকর্ণ হয়ে শোনবার চেষ্টা করেও কিছু শুনতে পেলে না।

শরৎ উঠে আলো জ্বাললে। তার ভয় ভয় করছিল। তবু সে সাহস করে আলো হাতে দোর খুলে বাইরে যাবার চেষ্টা করাতে রাজলক্ষ্মী ছুটে এসে ওর হাত ধরে বললে, খবরদার বাইরে যেও না শরৎদি, কার মনে কি আছে বলা যায় না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি—

শরৎ কিন্তু ওর কথা না শুনেই দোর খুলে দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়াল। ফুট ফুট করছে জ্যোৎস্না, কেউ কোথাও নেই! তবুও তার স্পষ্ট মনে হল খানিক আগে কেউ এখানে ঘুরে

বেড়াচ্ছিল, তার কোন ভুল নেই।

হঠাৎ তার মনে পড়ল, আজ ত্রয়োদশী তিথি।

তাদের এখানে প্রবাদ আছে, বারাহী দেবীর পাষাণ-মূর্ত্তি ত্রয়োদশী থেকে পূর্ণিমা তিথি পর্যান্ত তিন দিন, গভীর রাত্রিকালে নিজের জায়গা থেকে নড়ে চড়ে বেড়ায় গড়বাড়ির নির্জ্জন বনজঙ্গলের মধ্যে। সেই সময় যে সামনে পড়ে, তার বড় অশুভ দিন।

শরতের সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

যদি সত্যিই তাই হয়?

যদি সত্যিই বারাহী দেবীর বুভুক্ষু ভগ্ন পাষাণ-বিগ্রহ রক্তের পিপাসায় তাদেরই ঘরের আনাচে কানাচে শিকার খুঁজে বেড়াতে বার হয়ে থাকে?

শরৎ ভয় পেলেও মুখে কিছু বললে না। ধীরভাবে ঘরে ঢুকে দোর বন্ধ করে দিলে।

রাজলক্ষ্মী কলসী থেকে জল গড়িয়ে খাচ্ছিল, বললে, কিছু দেখলে শরৎদি?

—না কিছু না। তুই শুয়ে পড়।

পরদিন বৈকালের দিকে প্রভাস ও আর একটি তরুণ সুদর্শন যুবক হঠাৎ এসে হাজির।

রাজলক্ষ্মী তখন সবে কি একটা ঘরের কাজ সেরে দীঘির ঘাটে শরতের কাছে যাবার যোগাড় করছে—এমন সময় ওদের দেখে জড়সড় হয়ে উঠল।

প্রভাস বললে, খুকী, তুমি কি এ বাড়ির মেয়ে? না, তোমাকে তো কখনো দেখি নি? বাড়ির মানুষ সব গেল কোথায়?

রাজলক্ষ্মী সলজ্জমুখে বললে, শরৎদি দীঘির পাড়ে। ডেকে আনছি।

—হ্যাঁ, গিয়ে বলো প্রভাস আর অরুণবাবু এসেছে।

শেষের নামটা উচ্চারিত হতে শুনে রাজলক্ষ্মীর মুখ তার নিজের অজ্ঞাতসারে রাঙা হয়ে উঠল। সে জড়িত পদে কোন রকমে ওদের সামনে থেকে নিজেকে সরিয়ে আড়ালে এনে এক ছুটে ঘাটের পাড়ে গিয়ে খবরটা দিল শরৎকে।

শরৎ অবাক হয়ে বললে, তুই দেখে এলি?

—ও মা, দেখে এলাম না তো কি! এসো না—

শরৎ ব্যস্তভাবে দীঘির ঘাট থেকে উঠে এল। প্রভাস ততক্ষণ নিজেই মাদুর পেতে বসে পড়েছে ওদের দাওয়ায়। হাসিমুখে বললে, আবার এসে পড়লাম। এখন একটু চা খাওয়াও তো দিদি—

—বসুন প্রভাসদা। এক্ষুনি চা করে দিচ্ছি—

প্রভাস পকেট থেকে একটা কাগজের প্যাকেট বার করে বললে, ভাল চা এনেছি। আর এতে আছে চিনি—

—আবার ও-সব কেন প্রভাসদা? আমরা গরীব বলে কী একটু চা দিতে পারি নে আপনাদের?

—ছিঃ অমন কথা বলতে নেই। সে ভেবে আনি নি, এখানে সব সময় ভাল চা তো পাওয়া যায় না পয়সা দিলেও। আর এ চিনি সে চিনি নয়, এ চায়ে খাওয়ার আলাদা চিনি। দ্যাখো না—এ পাড়াগাঁয়ে কোথায় পাবে এ চিনি?

শরৎ হাতে করে দেখলে চৌকো চৌকো লেবেঞ্চুসের মত জিনিসটা। এ আবার কি ধরণের চিনি! কখনো সে দেখেই নি। শহর বাজারে কত নতুন জিনিস আছে!

প্রভাস বললে, কাকাবাবু কোথায় গেলেন?

—বাবা গিয়েছেন খাজনার তাগাদায়। দু-তিন দিন দেরি হবে ফিরতে।

প্রভাস হতাশ মুখে বললে, তিনি বাড়ি নেই! এঃ, তবে তো সব দিকেই গোলমাল হয়ে গেল।

—কেন, কি গোলমাল?

—আমি এসেছিলাম তোমাদের কলকাতা ঘুরিয়ে আনতে। মোটর ছিল সঙ্গে। সেই ভেবেই অরুণকে সঙ্গে নিয়ে এলাম।

—তাই তো, সে এখন কি করে হয়?

—নিতান্তই আমার অদৃষ্ট।

—সে কি, আপনার অদৃষ্ট কেন প্রভাসদা, আমাদের অদৃষ্ট।

—তা নয় দিদি, মুখে যাই বলো, প্রাচীন রাজবংশের মেয়েকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে সব দেখিয়ে বেড়ানোর মধ্যে যে আনন্দ আছে—তা কি সকলের ভাগ্যে ঘটে শরৎদি? বিশেষ করে তুমি আর কাকাবাবু যখন কখনো কলকাতাতে যাও নি।

—কোথাও যাই নি—তার কলকাতায়।

অরুণ এবার কথা বললে। সে অনেকক্ষণ থেকে একদৃষ্টে শরতের দিকে চেয়ে ছিল। শরতের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অরুণ জিভ ও তালুর সাহায্যে একপ্রকার খেদসূচক শব্দ উচ্চারণ করে বললে, ও, ভাবলে একদিকে কষ্ট হয়, একদিকে আনন্দ হয়। আপনার এই সরলতার তুলনা নেই। অভিজ্ঞতা সব জায়গাতেই যে পুজো পাবে তা পাবে না। অনভিজ্ঞতার মূল্য অনেক সময় অভিজ্ঞতার চেয়ে অনেক—অনেক বেশি।

প্রভাস বললে, তাই তো, বড় ভাবনায় পড়া গেল দেখছি।

—ভাবনা আর কি, অন্য এক সময় নিয়ে যাবেন প্রভাসদা।

প্রভাস কিছুক্ষণ বসে ভেবে ভেবে বললে, আচ্ছা, কোনো রকমেই এখন যাওয়া হয় না? ধরো তুমি আর কাউকে নিয়ে না হয় আমাদেরই সঙ্গে গেলে—

—আমি একাও আপনার সঙ্গে যেতে পারি প্রভাসদা। আমার মন তেমন নীচ নয়। কিন্তু সেজন্যে নয়—বাবার বিনা অনুমতিতে কোথাও যেতে চাই নে। যদিও আমার মনে হয় আপনি নিয়ে গেলে বাবা তাতে অমত করবেন না।

অরুণ এবার বললে, তবে চলুন না কেন, গাড়ি রয়েছে—কাল সকালে বেরুলে বেলা বারোটার মধ্যে কলকাতা পৌঁছে যাওয়া যাবে। ইচ্ছে করেন, কাল রাতেই আবার আপনাকে এখানে পৌঁছে দেবো। কি বলেন প্রভাসবাবু?

প্রভাস ঘাড় নেড়ে বললে, তা তো বটেই। তাই চলো যাওয়া যাক—অবিশ্যি যদি তোমার মনের সঙ্গে খাপ খায়। কাল সকালে আমরা আসবো এখন আবার—

এরা উঠে গেলে রাজলক্ষ্মী দেখলে শরৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। কি যেন ভাবছে আপন মনে। কিছুক্ষণ পরে শরৎ নিজেই বললে, তুই তো সব শুনলি, তোর কি মনে হয়—যাবো ওদের সঙ্গে? খুব ইচ্ছে করছে। কক্ষনো দেখিনি কলকাতা শহর—

—তোমার ইচ্ছে শরৎদি। তুমি আমার চেয়ে অনেক বুদ্ধিমতী।

—তুই যাবি?

—আমার যেতে খুব ইচ্ছে—কিন্তু আমার যাওয়া হবে না শরৎদি। বাবা মা যেতে দেবে না।

—আমার সঙ্গে যাবি, এতে আর দোষ কি?

—তুমি যদি যাও, লোকে কোনো কথা ওঠাতে সাহস করবে না শরৎদি। কিন্তু আমায় কেউ ছেড়ে কথা বলবে না। শেষকালে বাপ-মা মুশকিলে পড়ে যাবে বিয়ে দেবার সময়।

—বাবাঃ, এর মধ্যে এত কথা আছে? ধন্যি সব মন বট।

—তুমি থাকো গাঁয়ের বাইরে। তা ছাড়া তুমি যে বংশের মেয়ে, তোমার নামে এ অঞ্চলের লোকে কিছু রটাতে সাহস করবে না। আমার বেলায় তা তো হবে না!

আরও কিছুক্ষণ পরে রান্না শেষ হয়ে গেল। শরৎ রাজলক্ষ্মীকে খেতে দিয়ে নিজে একটা বাটিতে চিঁড়ে ভাজা তেল-নুন দিয়ে মেখে নিয়ে খেতে বসলো।

রাজলক্ষ্মী খেতে খেতে বললে, ও সাত-বাসি চিঁড়ে-ভাজা কেন খাচ্ছ শরৎদি? আমার জন্যে তো সেই কণ্ট করলেই; রান্না করলে, এখন নিজের জন্যে না হয় খানকতক পরোটা কি রুটি করে নিলেই পারতে?

শরৎ সলজ্জ হেসে বললে, ময়দা আর ছিল না। প্রভাসদা আর অরুণবাবুকে তখন দুখানা করে পরোটা করে দিলাম—যা ছিল সব ফুরিয়ে গেল।

—আমায় বললে না কেন শরৎদি? ওই তোমার বড় দোষ। আমায় বললে আমি বাড়ি থেকে নিয়ে আসতাম।

—থাক গে, খাওয়ার জন্যে কি? এখন কলকাতায় যাওয়ার কি করা যায় বল্। আর শোন্ ওই অরুণবাবু, দেখলি তো? পছন্দ হয়? এবার তবে কথাটা পাড়ি প্রভাসদা'র কাছে?

রাজলক্ষ্মী জবাব দিতে একটু ইতস্ততঃ করে সংকোচের সঙ্গে বললে, তা তোমার ইচ্ছে। কিন্তু ও আমাদের কখনো হয়? বলে বামন হয়ে চাঁদে হাত—

—যদি ঘটিয়ে দিতে পারি?

রাজলক্ষ্মী মনে মনে ভাবলে, শরৎদি'র বয়সই হয়েছে আমার চেয়ে বেশি, কিন্তু এদিকে সরলা। অনেক জিনিসই আমি যা বুঝি, ও তাও বোঝে না। চিরকাল গাঁয়ের বাইরে জঙ্গলের মধ্যে বাস করে এলো কি না।

সে মুখে বললে, দিতে পারো ভালই তো। বেশ কথা।

—ঘটকালির বখশিশ দিবি কি?

—যা চাইবে শরৎদি।

—দেখিস্ তখন যেন আবার ভুলে যাস্ নে—

রাজলক্ষ্মীর খাওয়ার প্রবৃত্তি চলে গিয়েছিল শরৎকে বাসি চিঁড়ে ভাজা খেতে দেখে। তার ওপর যখন আবার শরৎ গরম দুধের বাটি এনে তার পাতের কাছে নামতে গেল, সে একেবারে পিঁড়ির ওপর থেকে উঠে পড়ল। দুধটুকু থাকলে তবুও শরৎদি খেতে পাবে।

—ও কি, উঠলি যে?

রাজলক্ষ্মী ভাল করেই চেনে শরৎকে। সে যদি এখন আসল কথা বলে, তবে শরৎ ও দুধ ফেলে দেবে, তবু নিজে খাবে না। সুতরাং সে বললে, আর আমার খাওয়ার উপায় নেই শরৎদি, পেট খুব ভরে গিয়েছে। মরবো নাকি শেষে একরাশ খেয়ে?

—দুধ যে তোর জন্যে জ্বাল দিয়ে নিয়ে এলাম? কি হবে তবে?

রাজলক্ষ্মী তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, কি হবে তা কি জানি। না হয় তুমি খেয়ে ফেল ওটুকু। আমার আর খাওয়ার উপায় দেখছি নে। জানোই তো আমার শরীর খারাপ, বেশী খেতে পারি নে।

অগত্যা শরৎকেই দুধটুকু খেয়ে ফেলতে হল।

পরদিন সকালেই প্রভাস ও অরুণ আবার এসে হাজির।

প্রভাস বললে, কি ঠিক করলে দিদি?

—ও এখন হয়ে উঠবে না প্রভাসদা। আপনারা যাবেন না, বসুন। চা আর খাবার করে দি, বসে গল্প করুন।

শরৎ কাল রাত্রে ভেবে ঠিক করেছে রাজলক্ষ্মীর বিবাহের প্রস্তাবটা সে আজই প্রভাসের কাছে উত্থাপিত করে দেখবে কি দাঁড়ায়। রাজলক্ষ্মীকে এজন্যে সে সরিয়ে দেবার জন্যে বললে, ভাই, তোদের বাড়ি থেকে এত ক'টা আটা কি ময়দা দৌড়ে নিয়ে আয় তো? কাল রাত্রে আমাদের ময়দা ফুরিয়েছে। প্রভাসদা ও অরুণবাবুকে চায়ের সঙ্গে দুখানা পরোটা ভেজে দিই।

প্রভাস যেন একটু হতাশার সুরে বললে, তা হলে যাওয়া হল না তোমার? এবার গেলেই বেশ হত।

শরৎ বললে, না এবার হবে না।

—তোমার বন্ধুটিকে নিয়ে চলো না কেন?

—কে? রাজলক্ষ্মীর কথা বলছেন? আচ্ছা, একটা কথা বলবো? রাজলক্ষ্মীকে কেমন লাগল আপনাদের?

প্রভাস একটু বিস্ময়ের সুরে বললে, কেন বলো তো? ভালই লেগেছে।

—গরীব বাপ-মা, বিয়ে দিতে পারছে না। ওর জন্যে একটা পাত্র দেখে দিন না কেন প্রভাসদা? বড্ড উপকার করা হবে। একটা কথা শুনুন প্রভাসদা—

প্রভাস শরতের পিছু পিছু বাড়ির পিছনদিকে গেল।

শরৎ বললে, আচ্ছা প্রভাসদা, অরুণবাবুর সঙ্গে রাজলক্ষ্মীর বিয়ে দিন না কেন জুটিয়ে? পাল্টি ঘর। চমৎকার হবে—

প্রভাস যেন ঠিক এ ধরণের কথা আশা করে নি শরতের মুখ থেকে। সে আশাহতের সুরে বললে, তা—তা দেখলেও হয়।

শরতের যদি কিছুমাত্র সাংসারিক ও সামাজিক জ্ঞান থাকতো তবে প্রভাসকে চিনে নিতে সে পারতো এই এক মুহূর্তেই। কিন্তু শরৎ যদিও বয়সে যুবতী, সারল্যে ও ব্যবহারিক অনভিজ্ঞতায় সে বালিকা। সুতরাং সে প্রভাসের স্বরূপ ধরতে পারলে না।

সে আরও আগ্রহের সঙ্গে বললে—তাই দেখুন না প্রভাসদা? আপনি করলে অনেক সহজ হয়ে যায় কাজটা—

প্রভাস অন্যমনস্কভাবে কি একটা কথা ভাবছিল। দু-একবার যেন কোনো একটা কথা বলবার জন্যে শরতের মুখের দিকে চাইলেও—কিন্তু শেষ পর্যন্ত বললে না।

দুজনকে চা করে দিয়ে শরৎ পথের দিকে চেয়ে আছে—এমন সময় দেখা গেল রাজলক্ষ্মী ফিরে আসছে। সে দাওয়া থেকে নেমে রাজলক্ষ্মীর কাছে গিয়ে বললে—এনেছিস্ ময়দা? দে আমার কাছে।

—আমি যাই শরৎদি, মা বলে দিয়েছে বাড়ি ফিরতে—

—কেন বল্ তো? প্রভাসদারা এখানে বসে আছে বলে?

রাজলক্ষ্মী অপ্রতিভ মুখে বললে—তাই শরৎদি, জানোই তো, আমরা গরীব, এখানে ওদের সঙ্গে বসে থাকলে হয়তো কথা উঠবে। মা বড় ভয় করে ওসব।

—তাহলে তুই যা—গিয়ে মান বজায় রাখ্—

রাজলক্ষ্মী হাসতে হাসতে চলে গেল।

প্রভাসদের খাবার করে দিতে বেলা প্রায় আটটা বেজে গেল। ওরা উঠতে যাবে এমন সময় শরৎ গড়ের খালের দিকে চেয়ে আহ্লাদের সঙ্গে বলে উঠল—বাবা আসছেন। প্রভাস ও অরুণ দুজনেই যেন চমকে উঠে সেদিকে চেয়ে দেখলে। ওদের মুখ দেখে মনে হবার কথা নয় যে কেদারের অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তনে তারা খুব খুশী।

তবুও প্রভাস এগিয়ে গিয়ে হাসিমুখে কেদারের পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। কেদার আনন্দের সঙ্গে বলে উঠলেন—এই যে প্রভাস কখন এলে ? ভালো সব ?···আমি—হঁ্যা—তাই বেরিয়েছিলাম বটে। সাংকিনী ও মাকড়ার বিলে বাচ্ হচ্ছে খবর পেলাম পথেই। খাজনা আদায় করতে যখন যাওয়া—আর সবই জেলে প্রজা—বাচ্ শেষ না হলে কাউকে বাড়ি পাওয়া যাবে না তাও বটে—আর মস্ত কথা হচ্ছে বাচ্ না মিটে গেলে ওদের হাতে পয়সা আসবে না। তাই ফিরে এলাম।

প্রভাস বললে, ভালই হল। শরৎ তো ছোটবোনের মত —আপনাদের কলকাতা ঘুরিয়ে নিয়ে আসবো বলে মোটর এনেছি এবার। আপনি ছিলেন না বলে একটু মুশকিল ছিল। শরৎদি বলেছিল যাবে। আমার সঙ্গে যাবে এ আর বেশি কথা কি ? নিজের দাদার মত—তবুও আপনি এলেন—বড় ভালই হল। কাল সকালে চলুন কাকাবাবু কলকাতায়।

শরৎ প্রভাসের কথা শুনে একটু অবাক হয়ে ভাবলে—কই, সে কখন প্রভাসদা'র সঙ্গে কলকাতায় যাবে বললে ? প্রভাসদা'র ভুল হয়েছে শুনতে—কিন্তু সে তো আজ দুবার তিনবার বলেছে তার যাওয়া হবে না।

কেদার বললেন, তা বেশ কথা। চলো না, ভালই তো। অনেককাল থেকে কলকাতায় যাবো যাবো ভাবি তা হয়ে ওঠে না। মন্দ কি ?

প্রভাস ও অরুণ একসঙ্গে খুশির সঙ্গে বলে উঠল—কাল সকালেই চলুন তবে! সে কথা তো আমরাও বলছি।

—কখন গিয়ে পেঁছিবে ?

—বেলা বারোটার মধ্যে। কোন কষ্ট হবে না আপনাদের, যাতে সব রকম সুবিধে হয়—

—এখানে কাল সকালে তোমরা খাবে—খেয়ে গাড়িতে ওঠা যাবে।

শরৎ বাবার অনুরোধে যোগ দিয়ে বললে, হ্যাঁ প্রভাসদা, অরুণবাবুকে নিয়ে কাল সকালে এখানেই খাবেন। না, কোনো কথা শুনবো না। এখানে খেতেই হবে—

প্রভাস বললে, রাজলক্ষ্মী বলে সেই মেয়েটি যাবে নাকি ? তারও জায়গা হয়ে যাবে। বড় গাড়ি।

শরৎ বললে, না, তার যাবার সুবিধে হবে না। আমায় সে বলে গেল এই মাত্র।

প্রভাস বললে, তা হলে কাকাবাবু কাল সকালেই আসবো তো ?

—হঁ্যা, এখানে তোমরা খাবে যে সকালে। তারপর রওনা হওয়া যাবে। অরুণকেও নিয়ে এসো—

দুপুরের পরে রাজলক্ষ্মী এল। শরৎ দাওয়ায় বসে পুরোনো টিনের তোরঙ্গটা থেকে তার ও বাবার কাপড় বার করতে ব্যস্ত। রাজলক্ষ্মীকে দেখে বললে, এই যে আয় রাজলক্ষ্মী, সব কাপড়ই ছেঁড়া, কোনটাতে হাত দিই। আমার তবু দুখানা বেরিয়েছে, বাবার দেখছি আস্ত কাপড় বাক্সে একখানাও নেই। কি নিয়ে যে যাবেন কলকাতায়—

—তা হলে যাচ্ছ সত্যিই শরৎদি ? কাকাবাবু কোথায় ?

—যাই, একবার বেড়িয়েই আসি। বসে বসে বাবার কাপড়গুলো এখন সেলাই করবো—কেনবার পয়সা নেই যে নতুন একজোড়া ধুতি কিনে নেবো—বেশী ছেঁড়া নয়, একটু আধটু সেলাই করলে কেউ টেরও পাবে না। বাবা নেই বাড়ি। এই মাত্র পাড়ার দিকে গেলেন।

শরতের মনে খুব আনন্দ হয়েছে বাইরে বেড়াতে যাবার এই সুযোগ পেয়ে। সে বসে বসে কেবল সেই গল্পই করতে লাগল রাজলক্ষ্মীর কাছে। কতকাল আগে তার শ্বশুরবাড়ি গিয়েছিল—ভাল মনেও পড়ে না—সে-ও তো বেশী দূরে নয়, টুঁড়ি-মাজদে গ্রামের কাছে

বল্লভপুরের ভাদুড়ীদের বাড়ি। মাজদিয়া স্টেশনে নেমে তিন ক্রোশ গরুর গাড়িতে গিয়ে কি একটা ছোট্ট নদীর ধারে। তাদেরও অবস্থা খারাপ, আগে একসময় ও অঞ্চলের ভাদুড়ীদের নামডাক ছিল, সে নাকি অনেককাল আগে। এখন সতেরো সরিকে ভাগ হয়ে আর সবাই মিলে বাড়ি বসে খেয়ে বেজায় গরীব হয়ে পড়েছে।

রাজলক্ষ্মী বললে, সেখানে তোমায় নিয়ে যায় না শরৎদি ?

—কে নিয়ে যাবে ভাই ?

—তোমার দেওর ভাশুর নেই ?

—আপন ভাশুরই তো রয়েছেন। হলে হবে কি, তাঁর বেজায় পুরী পাল্লা—সাত মেয়ে, পাঁচ ছেলে—নিজেরগুলো সামলাতে পারেন না—খেতে দিতে পারেন না—আমাকে নিয়ে যাবেন! আজ তেরো বছর কপাল পুড়েছে, কখনও একখানা থান কাপড় দিয়ে খোঁজ করেন নি। আর খোঁজ করলেও কি হত, আমি কি বাবাকে ফেলে সেখানে গিয়ে থাকতে পারি ? সে গাঁয়ে আমার মনও টেঁকে না।

—যদি এখন তারা নিতে আসে শরৎদি ?

—আমি ইচ্ছে-সুখে যাইনে—তবে ভাশুর যদি পেড়াপীড়ি করেন—না গিয়ে আর উপায় কি ?

—কতদিন থাকতে পারো ? বলো না শরৎদি ?

—কেন বল্ তো, আজ আবার তুই আমার শ্বশুরবাড়ি নিয়ে পড়লি কেন ?

রাজলক্ষ্মী মুখে আঁচল দিয়ে দুষ্টুমির হাসি হেসে উঠল। তার পর বললে, দাও গুছিয়ে দিই কি জিনিসপত্তর আছে—মা বলছিল—

—কি বলছিলেন খুড়ীমা ?

—ভাগ্যিস কাকাবাবু এসে গিয়েছেন তাই। নইলে তোমার একা যাওয়া উচিত হত না প্রভাসবাবুর সঙ্গে—

শরতের চোখ দুটি যেন ক্ষণকালের জন্যে জ্বলে উঠল। মুখের রং গেল বদলে—রাজলক্ষ্মী জানে শরৎ দিদি রাগলে ওর মুখ রাঙা হয়ে ওঠে আগে। রাজলক্ষ্মী ভয় পেল মনে মনে, হয়তো তার এ কথা বলা উচিত হয় নি, কিন্তু বলতে তাকে হবেই শরৎদির ভালোর জন্যে। না বলে সে পারে না। কতবার তার মনে হয়েছে—শরৎ দিদি তার ছোট বোন, সে-ই এই সংসারানভিজ্ঞা বালিকাপ্রকৃতির দিদিকে সব বিপদ থেকে, কলঙ্ক থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে বেড়াবে।

শরৎ কড়া সুরে বললে, কেন উচিত হত না, একশো বার হত। খুড়ীমাকে গিয়ে বোলো রাজলক্ষ্মী, শরৎ যেখানে ভাল ভাবে সেখানে আপনার লোকের মতই ব্যবহার করে—পর ভাবে না। তার মন যেখানে সায় দেয় সেখানে যেতে তার এতটুকু ভয় নেই—আমি কারো কথা—

রাজলক্ষ্মী সভয়ে বললে, ওকি শরৎদি, তোমার পায়ে পড়ি শরৎদি, অমন চলে যেও না, ছিঃ—

—তবে তুই এমন কথা বলিস্ কেন, খুড়ীমাই বা কেন বলেন ? তিনি কি ভাবেন—

—শোনো আমার কথা। মা সে কথা বলে নি। কিন্তু একা মেয়েমানুষ যদি বিপদে পড় তখন তোমায় দেখবে কে ? সেই কথাই মা বলছিল। তুমি যত ভাল ভাবো লোককে সকলেই অত ভাল নয়। তুমি সংসারে কি বোঝ ? মার বয়েস তোমার চেয়ে তো কত বেশী—সেদিক থেকে মা যা বলেছে মিথ্যে বলে নি। লক্ষ্মী দিদি, অমন রাগে না, রাগলে সংসারে কাজ চলে ? আমি তোমায় কত ভালবাসি, মা কত ভালবাসে—তা তুমি বুঝি জানো না ? মা আমায় গাঁয়ে কারোর বাড়ি যেতে দেয় না—কিন্তু তোমাদের বাড়ি আসতে চাইলে

কখনো কোনো আপত্তি করে নি।

শরতের রাগ ততক্ষণ চলে গিয়েছে। সে রাজলক্ষ্মীর হাত ধরে বললে, কিছু মনে করিস নে রাজী—

—না, মনে তো করি নে, আমি জানি শরৎদি ছেলেমানুষের মত, এই রেগে উঠল, এই জল হয়ে গেল। রাগ তোমার বেশীক্ষণ শরীরে থাকে না—গঙ্গাজলে ধোয়া মন যে! সাধে কি বড়বংশের মেয়ে বলে তোমাকে শরৎদি?

শরৎ সলজ্জ-মুখে বললে, যা যা বকিস্ নে—থাম তুই।

এই সময় দূরে থেকে কেদারকে আসতে দেখে রাজলক্ষ্মী বললে, কাকাবাবু আসছেন, শরৎদি—ও-সব কথা থাক, কি কি কাজ করতে হবে, কি গুছিয়ে দিতে হবে বলে দাও।

—কি আর গুছিয়ে দিবি! দু-পাঁচ দিনের জন্যে তো যাওয়া। হ্যাঁ রে, উত্তর দেউলে সন্দে-পিদিম দেওয়ার জন্যে বামী বাগ্দীকে ঠিক করে দিতে পারবি? আমি এসে তাকে চার আনা পয়সা দেবো।

রাজলক্ষ্মী বললে, বলে দেখবো—কিন্তু সে রাজী হবে না। সন্দে বেলা সে ঘেঁষবে উত্তর দেউলের অরণ্যি বিজেবনে? বাপ্‌রে! তার চেয়ে এক কাজ করা যাক না কেন? আমি তোমার সন্দে দেবো রোজ রোজ—

শরৎ বিস্মিত হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে বললে, তুই দিবি সন্দে-পিদিম—উত্তর দেউলে?

রাজলক্ষ্মী হেসে বললে, কেন হবে না? পানুকে সঙ্গে নিয়ে আসবো—আর সন্দের এক ঘণ্টা আগে আলো জেবলে রেখে চলে যাবো। তোমাদের ঘরবাড়িও তো দেখাশুনো করতে হবে আমায়? অমনি দিয়ে যাবো পিদিম জেবলে।

—তা হলে তো বেঁচে যাই রাজলক্ষ্মী। ওই একটা মস্ত ভাবনা আমার তা জানিস? মনে মনে ভাবি, আমি বেঁচে থাকতে পূর্বপুরুষের দেউলে আলো জবলবে না—তা কখনই হতে দেবো না প্রাণ ধরে। আর একটা কথা শিখিয়ে দি, যখন পিদিম হাতে নিয়ে দেউলে যাবি তখন বেতবনের জঙ্গলে বারাহী দেবীর যে ভাঙা মূর্ত্তি আছে সেখানটাতে একবার উদ্দেশ্যে পিদিমটা তুলে দেখাবি।

রাজলক্ষ্মীর মুখে কেমন ভয়ের ছায়া নামলো—সে বললে, ওমা, ওই ভাঙা কালীর মূর্ত্তি! ওখানে যেতে ভয় করে।

—কালী নয়—ও বারাহী বলে এক পুরোনো আমলের দেবীমূর্ত্তি। বহুকাল পুজোও হয় নি। কেমন চড়কের সময় সন্নিসিরা একবার ওখানে এসে নেচে যায় দেখিস্ নি?

—তা যাক নেচে। আমি ওখানে যেতে পারবো না শরৎদি। মাপ করো।

—তুই যদি না পারিস্—তবে আমার যাওয়া হবে না। আমি বারাহী দেবীকে ফেলে রেখে যেতে পারবো না।

রাজলক্ষ্মী বললে, না দিদি, সত্যি কিছু ভাল লাগছে না। তুমি চলে যাবে, আমার মন কাঁদবে সত্যিই। তাই বলছিলাম পারবো না, যদি তোমার যাওয়ায় বাধা দিতে পারি। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে, এ কাজ ভাল না। শরৎ দিদি কখনো কোনো জায়গায় যায় না, কিছু দেখে নি—ও-ই যাক্। ঘুরে আসুক।

কেদার গামছা পরে পুকুর থেকে স্নান করে এসে বললেন, ওমা শরৎ, একটা ডাব খাওয়াতে পারবি?

—না বাবা, একটা ছোট্ট ডাব ওবেলা ঠাকুরদের দিয়েছি—এবেলা আর কিছু নেই। পুণ্য বাগ্দীকে ডেকে নিয়ে আসবো?

—না থাক্ মা, সব গুছিয়ে নিয়ে রাখো—রাজলক্ষ্মী মা এলি কখন ? তা তুই একটু সাহায্য কর না !

—ও তো করছেই বাবা। ও উত্তর দেউলে পিদিম দেবে পর্যাস্ত বলছে। এ গাঁয়ের মধ্যে আর কেউ এতদূর আসেও না, খোঁজখবরও নেয় না। ও আছে তাই, তবু মানুষের মুখ দেখতে পাই।

পরদিন প্রভাসের মোটর সামনের বারুইদ'র বিল পার হয়ে যাওয়ার পরে কেদারের মুখে প্রথম কথা ফুটলো। পেছনের সিটে তিনি মেয়েকে নিয়ে বসেছেন—সামনের সিটে বসেছে অরুণ ও প্রভাস—অরুণ গাড়ি চালাচ্ছে।

কেদার মাঝে মাঝে বিস্ময়সূচক দু-একটা রব করছিলেন এতক্ষণ, এইবার মেয়েকে সম্বোধন করে প্রথম কথা বললেন।

—ও শরৎ, কি জোরে যায় বটে মটোর গাড়ি, বারুইদ'র বিল গড়শিবপুর থেকে পাক্কা চার ক্রোশ রাস্তা। হেঁটে আসলে দু-ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টার কম পেঁছুনো যায় না—আর এই দ্যাখো, চোখের পাতা পাল্টাতে না পাল্টাতে এসে হাজির বারুইদ'র বিলে—

—হাজির কি বাবা, বিল পেরিয়েও তো গেল।

—ও, মানুষ না পাখী ? কি জোরেই যায় তাই ভাবছি।

—হ্যাঁ বাবা, কলকাতা কতদূর বললে প্রভাসদা ?

—বেলা বারোটা কি একটার মধ্যে যাবো বলছে। ত্রিশ ক্রোশ হবে এখান থেকে কলকাতা।

প্রভাস সামনের সিটে বসে মুখ ফিরিয়ে চেঁচিয়ে বললে, কাকাবাবু কখনো কলকাতায় এসেছিলেন ?

কেদার বললেন, তা দু-বার এর আগে আমি কলকাতা ঘুরে এসেছি। তবে সে অনেক দিন আগের কথা। প্রায় দু-যুগ হল।

অরুণ বললে, সে কলকাতা আর নেই, গিয়ে দেখবেন। শরৎদি, আপনি কখনো যান নি কলকাতায় এর আগে ?

—নাঃ, আমি কোথাও যাই নি।

—কলকাতাতেও না ?

—কলকাতা তো কলকাতা ! বলে কখনো রাণাঘাট কি রকম শহর তাই দেখি নি ! রাজী হয়ে গেল বাবা তাই, নইলে আমার আসা হত না ! পিদিম দেখানোর জন্যেই তো যত গোলমাল।

আশ্চর্য্যের ওপর আশ্চর্য্য। ধর্ম্মদাসপুরে এসে গাড়ি দাঁড়িয়েছে ছায়ায়। এখনি এল ধর্ম্মদাসপুরে ! কেদার খাজনা আদায় করতে বেরিয়েছেন সকালে—বেলা এগারোটার কমে ধর্ম্মদাসপুরে পেঁছুতে পারেন নি। আর সেই ধর্ম্মদাসপুর পার হয়ে গেল বড় জোর চল্লিশ মিনিটে। কি তারও কমে।

শরৎকে বললেন, মা, এই দ্যাখো ধর্ম্মদাসপুর গেল, সেই যে একবার ওল এনেছিলাম মনে আছে ? সে এখান থেকে নিয়ে গিয়েছিলাম। কি জোরে যাচ্ছে একবার ভেবে দ্যাখো দিকিন্ ?···হ্যাঁ, গাড়ি বের করেছে বটে সায়েবরা !

শরৎ ক্রমাগত ছেলেমানুষের মত প্রশ্ন করতে লাগল, বাবা—আর কত দেরি আছে কলকাতা ? কতক্ষণে আমরা কলকাতা পেঁছবো ?

প্রায় ঘণ্টা চারেক একটানা ছোটার পরে একটা শহরে বাজারের মত জায়গায় গাড়ি

ঢুকলো। কেদার বললেন, এটা কি জায়গা ?

প্রভাস বললে, এটা বারাসাত। আর বেশী দূরে নেই কলকাতা। এখান থেকে একটু চা খেয়ে নেবেন কাকাবাবু ?

কেদার বললেন, কেন এখানে কি তোমার কোনো জানাশুনো লোকের বাড়ি আছে নাকি ? চা খাবে কোথায় ?

—না, জানাশুনো কেউ নেই। দোকানে খাবো। চায়ের দোকান আছে অনেক—

—না বাপু। তোমরা খাও, আমি দোকানের চা কখনও খাই নি, ও আমার ঘেন্না করে। আমি বরং একটু তামাক ধরিয়ে খাই। অনেকক্ষণ তামাক খাওয়া হয় নি।

দোকানের চা শরৎও খেলে না। অরুণ ও প্রভাস নিজেরা গাড়ির কাছে চা আনিয়ে খেলে। কেদার আরাম করে হুঁকো টানতে টানতে বললেন, চা ভালো ?

প্রভাস ব্যস্ত হয়ে উঠে বললে, কেন, মন্দ না ! খাবেন, আনবো ?

—না, আমি সেজন্যে বলছি নে। আমি দোকানের চা কখনো খাই নি, ও খাবোও না কখনো। তোমরা খাও। আমরা সেকেলে মানুষ, আমাদের কত বাচবিচার।

গাড়ি ছেড়ে যশোর রোড দিয়ে অনেকখানি এসে একটা বড়লোকের বাগানবাড়ির মধ্যে ঢুকলো। ফটক থেকে লাল সুরকির রাস্তা সামনের সুদৃশ্য অট্টালিকাটির গাড়িবারান্দাতে গিয়ে শেষ হয়েছে। পথের দু-ধারে এরিকা পামের বড় বড় চারা গাছ, ক্রোটন, শেফালি, চাঁপা, আম, গোলাপজাম প্রভৃতি নানারকম গাছ।

প্রভাস বললে, আপনারা নামুন—এবেলা এখানে থাকবেন আপনারা। এটা অরুণদের বাগানবাড়ি, ওর দাদামশায়ের তৈরি বাড়ি এটা।

কেদার ও শরৎ দুজনেই বাড়ি দেখে আনন্দে ও বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেলেন। এমন বাড়িতে বাস করবার কল্পনাও কখনো তাঁরা করেন নি। মার্বেল পাথরে বাঁধানো মেজে, ছোট বড় আট-দশটা ঘর। বড় বড় আয়না, ইলেকট্রিক পাখা, আলো, কৌচ, কেদারা। তবে দেখে মনে হয় এখানে যেন কেউ বাস করে নি কোন দিন, সব জিনিসই খুব পুরোনো—দু একটা ঘর ছাড়া অন্য ঘরগুলোতে ধুলো, মাকড়সার জাল বোঝাই।

কেদার কথাটা বললেন প্রভাসকে।

প্রভাস বললে, ওর দাদাবাবু শৌখীন লোক ছিলেন, তিনি মারা গিয়েছেন আজ বছর কয়েক। এখন মাঝে মাঝে অরুণেরা আসে—সব সময় কেউ থাকে না।

শরৎ বললে, এটাই কলকাতা প্রভাসদা ?

—না, এটাকে বলে দমদম। এঁর পরেই কলকাতা শুরু হ'ল। তোমরা বিশ্রাম করো—ওবেলা কলকাতা বেড়িয়ে নিয়ে আসবো। এখুনি ঝি আসবে, যা দরকার হয় বলে দিও ঝিকে—সব গুছিয়ে এনে দেবে। ঠাকুর আসবে এখন—

শরৎ বললে, কি ঠাকুর ?

—রান্না করতে আসবে ঠাকুর !

—বাবা ঠাকুরের হাতে রান্না খেতে পারবেন না প্রভাসদা, ঠাকুর আসবার দরকার নেই। আমি আছি তবে কি জন্যে ?

—কলকাতায় এলে, একটু বেড়াবে না, বসে বসে রান্না করবে গড়শিবপুরের মত ? বাঃ—

—তা হোক্ গে। আমার রান্না করতে কতক্ষণ যাবে বলুন তো ? ক'জন লোকের রান্না করতে হবে ?

প্রভাস ও অরুণ শরতের প্রশ্ন শুনে হেসে ফেললে। প্রভাস বললে—ক'জন লোকের রান্না আবার ! তোমাদের দুজনের, আবার কে আসবে তোমার এখানে খেতে ? তুমি তো আর

র‍াঁধ্নী বামনী নও যে দেশ সুদ্ধ লোকের রেঁধে বেড়াবে ? আচ্ছা, আমরা এখন আসি কাকাবাবু, বিকেলে ছ'টার সময় আবার আসবো। মলঙ্গা লেনে আমাদের যে বাড়ি আছে সেখানে নিয়ে যাবো ওবেলা।

ওরা গাড়ি নিয়ে চলে গেলে কেদার আর একবার তামাক সাজতে বসলেন।

শরৎ চারিদিকে ঘেড়িয়ে এসে বললে, বাঃ চমৎকার জায়গা। ওদিকে একটা বাঁধা ঘাট-ওয়ালা পুকুর। দেখবে এসো না বাবা! তোমার কেবল তামাক খাওয়া আর তামাক খাওয়া! এই তো একবার খেলে বারাসাত না কি জায়গায়!

কেদার অগত্যা উঠে মেয়ের পিছু পিছু গিয়ে পুকুর দেখে এলেন। বাঁধা ঘাট অনেক দিনের পুরোনো—কতকাল এ ঘাট যেন কেউ ব্যবহার করে নি। পুকুরের ওপারেও বাগান, কিন্তু ওদিকটাতে আগাছার জঙ্গল বড় বেশি।

শরৎ বললে, বাবা, খিদে পেয়েছে ?

—নাঃ—

—ঠিক পেয়েছে বাবা। উড়িয়ে দিলে শুনবো না। ভাঁড়ারে জিনিসপত্র সব আছে দেখে এসেছি—হালুয়া আর লুচি করে আনি।

কেদার চুপ করে তামাক টানতে লাগলেন, মেয়ের কাজে বাধা দেবার বিশেষ কোনো লক্ষণ প্রকাশ করলেন না অবিশ্যি। শরৎ কিন্তু অল্প একটু পরে রান্নাঘর থেকে ফিরে এসে বললে—বাবা, মুশ্‌কিল বেধেছে—

—কি রে ?

—এখানে তো দেখছি পাথুরে কয়লা জ্বালোনো উনুন। কাঠের উনুন নেই। কয়লা কি করে জ্বালতে হয় জানি নে যে বাবা ? ঝি না এলে হবেই না দেখছি।

শরৎ ছেলেমানুষের মত আনন্দে বাগানের সব জায়গায় বেড়িয়ে ফুল তুলে ডাল ভেঙে এ গাছতলায় লোহার বেঞ্চিতে বসে ও গাছতলায় লোহার বেঞ্চিতে বসে বসে উৎপাত করে বেড়াতে লাগল। বেশ সুন্দর ছায়াভরা বাগান। কত রকমের ফুল—অধিকাংশই সে চেনে না, নামও জানে না। কেদার মেয়ের পীড়াপীড়িতে এক জায়গায় গিয়ে লোহার বেঞ্চিতে খানিকটা বসে কলের পুতুলের মত দু-একবার মাথা দুলিয়ে বলতে লাগলেন—বাঃ, বেশ—বাঃ—

বেলা যখন বেশ পড়ে এসেছে, তখন প্রভাস মোটর নিয়ে এসে বললে—আসুন কাকাবাবু, চলো শরৎ—কাকাবাবুকে কিছু খাইয়েছ ?

শরৎ হেসে বললে, তা হয় নি। ঝি তো মোটেই আসে নি।

—তুমি তো বললে তুমিই করবে ? জিনিসপত্র তো আছে।

—কয়লার উনুনে জ্বাল দিতে জানি নে, কয়লা ধরাতে জানি নে। তাতেই তো হল না।

প্রভাস চিন্তিতমুখে বলল, তাই তো। এ তো বড় মুশকিল হল!

কেদার বললেন, কিছু মুশকিল নয় হে প্রভাস। চলো তুমি, ফিরে এসে বরং জলযোগ করা যাবে—

প্রভাস বললে, যদি নিকটের ভাল দোকান থেকে কিছু মিষ্টি কিনে আনি, তা আপনার চলবে না কাকাবাবু ?

শরৎ হেসে বললে, বাবা ও-সব খাবেন না প্রভাসদা, তা ছাড়া আমি তো খেতেও দেবো না। কলকাতা শহরে শুনেছি বড় অসুখ-বিসুখ, যেখান সেখান থেকে খাবার খাওয়া ওঁর সইবে না।

অগত্যা সকলে মোটরে উঠে বসলেন, গাড়ি ছাড়লো।

প্রথমে যশোর রোডের দু-ধারে বাগানবাড়ি ও কচুরীপানা-বোঝাই ছোট বড় জলা ছাড়িয়ে বেলগেছের মোড়ের আলোকোজ্জ্বল দৃশ্য দেখে পিতাপুত্রী বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে পড়ল। ওদের দুজনের মুখে আর কোনো কথা নেই। গাড়ি ওখান থেকে এসে পড়ল কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে—এবং দু-ধারে দোকান পসার, থিয়েটার, সিনেমা, ইলেকট্রিক আলোর বিজ্ঞাপন, দোকানের বাইরে শো-কেসে বহুবিচিত্র কাপড়, পোশাক, পুতুল, আয়না, সেন্ট, সাবান, স্নো প্রভৃতির সুদৃশ্য সমাবেশের মধ্য দিয়ে গাড়ি এসে পড়ল হ্যারিসন রোডের মোড়ে এবং এখান থেকে গাড়ি ঘুরে গেল হাওড়ার পুলের ওপর, ও পার হয়ে হাওড়া স্টেশনের গাড়িবারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

পুল পার হবার সময় প্রভাস বললে, এই দেখুন হাওড়ার পুল, নিচে গঙ্গা—আমরা যাচ্ছি হাওড়া স্টেশনে।

এবারও কেদার বা শরৎ কারো মুখ থেকে কোনো কথা বেরুলো না।

প্রভাস গাড়ি থামিয়ে বললে, কাকাবাবু, চলুন স্টেশনের রেস্টোরেন্ট থেকে আপনাকে চা খাইয়ে আনি—খাবেন কি?

কেদারের কোনো আপত্তি ছিল না—কিন্তু মেয়ে বাপের পরকালের দিকে অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে—বাবা নাস্তিক মানুষ—ওঁর এ বয়সে কোনো অশাস্ত্রীয় অনাচারের সংস্পর্শে কখনো সে আসতে দেবে না কেদার তা ভাল জানতেন। তিনি মেয়ের মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চাইলেন বটে, কিন্তু শরৎ তাঁর মুখের দিকে ভাল করে না চেয়েই বললে, চলুন প্রভাসদা, উনি ওখানে খাবেন না—

অগত্যা প্রভাস আবার গাড়ি ছেড়ে হাওড়ার পুলের ওপর এল এবং আস্তে আস্তে চলতে লাগল।

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, ওই দেখুন সব জাহাজ, শরৎদি দ্যাখো সমুদ্রে যে সমস্ত জাহাজ যায়, ওই দাঁড়িয়ে আছে।

স্ট্র্যান্ড রোড দিয়ে গাড়ি এল আউট্রাম ঘাটে। ওদের দুজনকে নামিয়ে নিয়ে প্রভাস আউট্রাম ঘাটের জেটিতে গিয়ে একখানা বেঞ্চিতে বসলো। সামনের গঙ্গাবক্ষে ছোট বড় স্টীমার বাঁশি বাজিয়ে চলেছে, বড় বড় ভড় ও বজরা ডাঙার দিকে নোঙর করে রেখেছে, সার্চলাইট ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাল একখানা বড় স্টীমার আস্তে আস্তে যাচ্ছে নদীর মাঝখান বেয়ে, সুবেশা নরনারীরা জেটির ওপর বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে—চারিদিকে একটা যেন আনন্দ ও উৎসাহের কোলাহল।

একটা বড় বয়া ঢেউয়ের স্রোতে দুলছে দেখে শরৎ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, ওটা কি?

প্রভাস বললে, জাহাজ বাঁধে ওই আংটাতে, বয়া বলে ওকে। আরও অনেক আছে নদীতে—

এতক্ষণে ওদের দু-জনের কথা যেন ফুটলো। কেদার নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, বাপ্‌ রে, এ কি কাণ্ড! হ্যাঁ, শহর তো শহর, বলিহারি শহর বটে বাবা!

শরৎ বললে, সত্যি বাবা, এমন কখনো ভাবি নি। এ যেন জাদুকরের কাণ্ড! আচ্ছা, এখানে জলের ওপর ঘর কেন?

প্রভাস বুঝিয়ে দিয়ে বললে, শরৎদি, কাকাবাবুকে এবার চা খাওয়ানো চলবে এখানে? খুব ভাল বন্দোবস্ত।

শরৎ রাজী হল না। বাবাকে পরকালে যমের বাড়ি সে কখনো পাঠাতে পারবে না। বা নাস্তিক উনি, এমনি কি গতি হয় ওঁর কে জানে। তার ওপর রাশ আলগা দিলে কি আর রক্ষা আছে? বাবা ধেই ধেই করে নৃত্য করে বেড়াবেন এই কলকাতা শহরে।

প্রভাসের নির্বন্ধাতিশয্যে শরৎ একটু বিরক্তই হল। সে যখন বলছে বাবা যেখানে

সেখানে খাবেন না, তখন তাঁকে অত প্রলোভন দেখাবার মানে কি ?

· বললে, আচ্ছা প্রভাসদা, ওঁকে খাইয়ে কেন বাবার জাতটা মারবেন এ কদিনের জন্যে ? ও কথাই ছেড়ে দিন।

এবার কিন্তু কেদার বিদ্রোহ ঘোষণা করে বললেন, হ্যাঁঃ, যত সব ! একদিন কোথাও চা খেলেই একেবারে নরকে যেতে হবে। নরক অত সোজা নয়, পরকালও অমন ঠুনকো জিনিস নয় ! চলো সবাই মিলে চা খেয়ে আসা যাক হে—

শরৎ দৃঢ়স্বরে বললে, না, তা কখনো হবে না। যাও দিকি ! সন্দে-আহ্নিক তো করো না কোনোকালে, আবার ছত্রিশ জাতের জল না খেলে চলবে না তোমার বাবা ?

কেদারের সাহসের ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে গেল। প্রভাসও আর অনুরোধ করলে না, তিনিও আর যেতে চাইলেন না। ওখান থেকে সবাই এল ইডেন গার্ডেনে। রাত প্রায় সাড়ে আটটা, বহু সুসজ্জিত সাহেব-মেমকে বেড়াতে দেখে শরৎ তো একেবারে বিস্ময়ে স্তম্ভিত। এত সাহেব-মেম একসঙ্গে কখনো দেখা দূরে যাক, কল্পনাও করে নি কোন দিন। শরৎ হাঁ করে একদৃষ্টে এরিকা পামের কুঞ্জের মধ্যে বেঞ্চিতে উপবেশন-রত দুটি সুবেশ, সুদর্শন সাহেব ও মেমের দিকে চেয়ে রইল। হঠাৎ কি ভেবে তার চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়তেই আঁচল দিয়ে ক্ষিপ্রহস্তে সে মুছে ফেললে। শরতের মনে পড়ল, গ্রামের লোকের দুঃখদারিদ্র্য, কত ভাগ্যহত, দীনহীন ব্যক্তি সেখানে কখনো জীবনে আনন্দের মুখ দেখলে না। ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডে ব্যাণ্ড বাজছিল অনেকক্ষণ থেকে। শরৎ অনেকক্ষণ বাবার সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাজনা শুনলে। কিন্তু ওর ভাল লাগল না। সবাই যেন বেসুরো, তার অনভ্যস্ত কানে পদে পদে সুরের খুঁৎ ধরা পড়ছিল।

প্রভাস বললে, সিনেমা দেখবে তো বলো নিয়ে যাই।

শরৎ কখনো না দেখলেও সিনেমা সম্বন্ধে গড়শিবপুরে থাকতেই শহর-প্রত্যাগত নববিবাহিতা বালিকা কিংবা বধূদের মুখে অনেক গল্প শুনেছে। বাবাকে এমন জিনিস দেখাতেই হবে, সে নিজে দেখুক না দেখুক কিন্তু আজ আর নয়—বাবার কিছু খাওয়া হয় নি বিকেল থেকে। একবার তার মনে হ'ল বাবা চা খেতে চাইছেন, খান বরং কোনো ভাল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দোকানে বসে ! কি আর হবে ! বাবা যা নাস্তিক, এত বয়েস হ'ল একবার পৈতেগাছটা হাতে করে গায়ত্রী জপটাও করেন না কোনদিন, পরকালে ওঁর অধোগতি ঠেকাবার সাধ্যি হবে না শরতের—সুতরাং ইহকালে যে ক'দিন বাঁচেন, অন্ততঃ সুখ করে যান। ইহকালে পরকালে দু-কালেই কষ্ট করে আর কি হবে ?

শরৎ বললে, বাবাকে চা খাইয়ে নিই কোনো দোকানে বসে। ভাল দোকান দেখে—ব্রাহ্মণের দোকান নেই ?

কেদার অবাক হয়ে মুখের দিকে চাইলেন। প্রভাস বিপন্ন মুখে বললে, ব্রাহ্মণের দোকান—তাই তো—ব্রাহ্মণের দোকান তো এদিকে দেখছি নে—আচ্ছা, হয়েছে—এক উড়ে বামুন ঘড়া করে চা বেচে ওই মোড়টাতে, ভাঁড়ে করে দেয়—সেই সবচেয়ে ভালো। চলুন নিয়ে যাই।

চা পান শেষ করে ওরা আবার মোটরে চৌরঙ্গী পার হয়ে পার্ক স্ট্রীটের মোড় পর্য্যন্ত গেল। এক জায়গায় এসে কেদার বললেন, এখানটাতে একটু নেমে হেঁটে দেখলে হত না প্রভাস ? বেশ দেখাচ্ছে—

গাড়ি এক জায়গায় রেখে ওরা পায়ে হেঁটে চৌরঙ্গীর চওড়া ফুটপাথ দিয়ে আবার ধর্ম্মতলার মোড়ের দিকে আসতে লাগল। দোকান হোটেলগুলির আলোকোজ্জ্বল অভ্যন্তর ও শো-কেসগুলির পণ্যসজ্জা ওদের একেবারে তাক লাগিয়ে দিয়েছে—শরৎ তো একেবারে বিস্ময়বিমুগ্ধ।

কতকাল মেয়েমানুষ হয়েও সে জিনিসপত্রের লোভ করে নি। জিনিসপত্র অধিকার করে রাখবার মেয়েদের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি চেপে চেপে রাখে মনের মধ্যে, শরতের সে-সব বহুদিন চলে গিয়েছিল মন থেকে মুছে—কিন্তু আজ যেন আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে তারা।

একটা দোকানে ক্রিস্ট্যালের চমৎকার ফুলদানি দেখে শরৎ ভাবলে—আহা, একটা ওইরকম ফুলদানি কেনা যেত!—বুনোফুল কত ফোটে এই সময় কালো পায়রা দীঘির পাড়ের জঙ্গলে, সাজিয়ে রাখত সে রোজ রোজ। একটা চমৎকার পুতুল সাদা পাথরের, একটা কি অদ্ভুত কাঁচের বল তার মধ্যে বিজলির আলো জ্বলছে···কি চমৎকার চমৎকার শাড়ী একটা বাঙালীর দোকানে, রাজলক্ষ্মীর জন্যে ওইরকম শাড়ী একখানা যদি নিয়ে যাওয়া যেত! জন্মে সে এরকম রঙের আর এরকম পাড়ের শাড়ী কখনো দেখে নি।

প্রভাস বললে, এটাকে বলে নিউমার্কেট। চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে এলাম—চলুন শরৎদির জন্যে কিছু ফল কিনি।

শরৎ বললে, না, আমার জন্যে আবার কেন খরচ করেন প্রভাসদা? ফল কিনতে হবে না আপনার।

প্রভাস ওদের কথা না শুনে ফলের দোকানের দিকে সকলকে নিয়ে গেল। এর নাম ফলের দোকান! শরৎ ভেবেছিল, বুঝি ঝুড়িতে করে তাদের দেশের হাটের মত কলা, পেঁপে, বাতাবী নেবু বিক্রি হচ্ছে রাস্তার ধারে—এরই নাম ফলের দোকান। কিন্তু এ কি ব্যাপার! এত স্তূপীকৃত বেদানা, কমলালেবু, কিশমিশ, আনারস, আঙ্গুর যে এক-জায়গায় থাকতে পারে, এ কথা সে জানত এখানে আসবার আগে? তবুও তো এগুলো তার পরিচিত ফল, পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—অন্য কত শত প্রকারের ফল রয়েছে যা সে কখনো চক্ষেও দেখে নি—নামও শোনে নি।

শরৎ জিজ্ঞেস করলে, কাগজে জড়ানো জড়ানো ওগুলো কি ফল প্রভাসদা?

—ও আপেল। কালিফোর্নিয়া বলে একটা দেশ আছে আমেরিকায়, সেখান থেকে এসেছে। তোমার জন্যে নেবো শরৎদি? আর কিছু আঙ্গুর নিই। কাকাবাবু আনারস ভালবাসেন?

একটা বড় ঠোঙায় ফল কিনে ওরা নিউমার্কেটের বিভিন্ন দিকে বেড়াতে বেড়াতে এক জায়গায় এল—সেখানে একটা আস্ত বাঘের হাঁ-করা মুণ্ডু মেঝের ওপর দেখে শরৎ চমকে উঠে বাবাকে দেখিয়ে বললে, বাবা, একটা বাঘের মাথা!

কেদারও অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন সেদিকে।

প্রভাস বললে, এরা জন্তুর চামড়া আর মাথা এরকম সাজিয়ে বিক্রি করে। এদের বলে ট্যাক্সিডারমিস্ট। এরকম অনেক দোকান আছে।

এইবার সত্যি সত্যি একটা জিনিস পছন্দ হয়েছে বটে শরতের। ওই বাঘের মুণ্ডু সুদ্ধ ছালখানা। তার নিজের শাড়ীর দরকার নেই, গহনার দরকার নেই—সে-সব দিন হয়ে গিয়েছে তার জীবনে। কিন্তু এই একটা পছন্দসই জিনিস যদি সে নিজের দখলে নিজের ঘরে সাজিয়ে রাখতে পারত, তবে সুখ ছিল পাঁচজনকে দেখিয়ে, নিজে পাঁচবার দেখে, পাঁচজনকে ওর গল্প করে। ডেকে এনে পাঁচজনকে দেখাবার মত জিনিস বটে।

মুখ ফুটে সে প্রভাসকে দামটা জিজ্ঞেস করলে। প্রভাস দোকানে ঢুকে বললে, ওটা বিক্রির জন্যে নয়।—দোকান সাজাবার জন্যে। তবে ওরকম ওদের আছে,—আড়াই শো টাকা দাম।

অরুণ বললে, এখন কোথায় যাওয়া হবে?

প্রভাস বললে, কেন সিনেমায় ? কি বলেন কাকাবাবু—

শরতের যদিও সিনেমা দেখবার আগ্রহ খুবই প্রবল, তবুও সে যেতে রাজী হ'ল না। বাবা সেই কোন্ সকালে দুটো খেয়ে বেরিয়েছেন, এখন গিয়ে রান্না না চড়িয়ে দিলে আবার তিনি কখন খাবেন ?

অগত্যা সকলে মোটরে আলোকোজ্জ্বল কলিকাতা নগরীর বিরাট সৌন্দর্যের মধ্যে দিয়ে এল আবার সেই বেলগেছের পুলের মুখে।

শরৎ এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এইবার বললে, বাবাঃ, কত বড় শহর ? কুলও নেই, কিনারাও নেই।

প্রভাস হেসে বললে, শরৎদি, একি আর তুমি ধর্ম্মদাসপুর পেয়েছ ? গড়শিবপুর থেকে ধর্ম্মদাসপুর যত বড়—ততখানি লম্বা হবে কলকাতা। আজ চলো, কাল আবার ভাল করে দেখো। আমাদের মলঙ্গা লেনের বাড়িতেও নিয়ে যাব।

বেলগেছের পুল ছেড়ে দু-ধারের দৃশ্য যেন অনেকটা পাড়াগাঁয়ের মত। বড় বড় বাগান-বাড়ির ঘন বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে দু-চারটি বিজলি বাতি, কোনো কোনো বাগানবাড়ি একদম অন্ধকার। এখানে এক পশলা বৃষ্টি আসতে গাড়ির জানলার কাঁচ উঠিয়ে দেওয়া হ'ল হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে—খাড়া সোজা পথ তীব্র হেডলাইটের আলোয় স্পষ্ট ফুটে উঠেছে চোখের সামনে—দ্রুতগামী মোটর লম্ফে লম্ফে যেন সে সুদীর্ঘ পথটার খানিকটা করে অংশ এক এক কামড়ে গিলে খাচ্ছে। শরৎ হাঁ করে চেয়ে রইল।

ওদের বাগানবাড়িটার ফটক দিয়ে গাড়ি ঢুকল ভেতরে।

এ বাগানটা যেন আরও অন্ধকার। তবে সব ঘরেই বিজলি বাতির বন্দোবস্ত।

প্রভাস কি টিপলে—পুটুস্ পুটুস্—এ ঘরে আলো জ্বলে উঠল সবুজ কাঁচের বড় চিমনির মধ্যে দিয়ে—বারান্দায় পুটুস্ পুটুস্—দীর্ঘ বারান্দায় এদিক থেকে ওদিকে তিনটে আলো জ্বলে উঠল।

শরৎ বললে, আমায় দেখিয়ে দিন প্রভাসদা কি করে জ্বালতে হয়—

পুটুস্—বাতি নিবে গেল—একদম অন্ধকার।

—এইটে হাত দিয়ে টেপো শরৎদি—এই দেখো—এই জ্বললো—আবার উঠিয়ে দাও—এই নিবে গেল—

শরৎ বালিকার মত খুশিতে বার বার সুইচ টিপে আলো একবার জ্বালিয়ে একবার নিবিয়ে দেখতে লাগল।

—বাবা, দ্যাখো কি রকম, তুমি এরকম দ্যাখো নি—

কেদার তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, ওসব তুমি দ্যাখো মা। আমি এর আগেও এসেছি, ওসব দেখে গিয়েছি—

শরৎ বললে, সে কবে বাবা ? তুমি আবার কবে কলকাতায় এসেছিলে শুনি ?

—তুই তখন জন্মাস্ নি। কলকাতায় তখন ঘোড়ার ট্রাম চলত। তোর মার জন্যে বড়বাজার থেকে ভাল তাঁতের ডুরে-শাড়ী কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম, তাই দেখে তোর মার কি আহ্লাদ !···তখন ইলেকট্রির আলো সব রাস্তায় ছিল না, দু-একটা বড় রাস্তায় দেখেছিলাম। লোকের বাড়িতে তখন গ্যাস জ্বলত—

প্রভাস বিস্ময়ের সুরে বললে, সত্যি কাকাবাবু, আপনি যা বলছেন ঠিক তো। আমি বাবার মুখেও শুনেছি প্রথম হ্যারিসন রোডে ইলেক্‌ট্রিক লাইট জ্বলে, তখন—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই যে রাস্তা বললে, ওখানেই আমি দেখেছি—অনেক দিনের কথা।

ইতিমধ্যে ঝি এসে জানাল, উনুনে আঁচ দেওয়া হয়েছে। শরৎ তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের

দিকে গেল—যাবার সময় বলে গেল, বোসো বাবা, ভাল করে চা করে আনি—প্রভাসদা, অরুণবাবু যাবেন না চা না খেয়ে।

রাত সাড়ে ন'টার মধ্যে ক্ষিপ্রহস্তে রান্না-বাড়া সাঙ্গ করে শরৎ বাবাকে খাওয়ার ঠাঁই করে দিলে। প্রভাস ও অরুণ তার অনেক আগে চা পান করে বিদায় নিয়েছে।

শরৎ মাথা দুলিয়ে বললে, ভাত কিন্তু নয় বাবা—লুচি—

—যা হয় দাও মা। লুচি কেন?

—লুচির বন্দোবস্ত দেখি করে রেখেছে। ঘি, আটা—চা'ল আনে নি—

—বেশ ভালই হ'ল—তুই খেতে পাবি এখন—

—বোসো, গরম গরম আনি—

পরম তৃপ্তির সহিত প্রায় বিশ-বাইশখানা লুচি অনর্গল খেয়ে যাওয়ার পরে কেদারের মনে পড়ল, আর বেশি খাওয়া ঠিক হবে না—মেয়ের লুচিতে টান পড়বে।

শরৎ আবার যখন দিতে এল, বললে, নাঃ, আর না, থাক্।

—কেন দিই না এই দুখানা গরম গরম—

—তোমার জন্যে আছে তো?

—ওমা, সে কি? প্রায় আধসেরের ওপর আটা—এক পোয়া আটার লুচি আমি খেতে পারি না, তুমি পারো?

—খুব পারি। ওকথা বলো না মা—এক সময়ে···

—তোমার তো বাবা কেবল এক সময়ে আর এক সময়ে। এখন পারো না তো আর?

—খুব পারি—

—পারলেও আর দেবো না। খেয়ে ওঠো—বিদেশ বিভুঁই জায়গা—দাঁড়াও দইটা নিয়ে এসে দিই—দই আছে, মিষ্টি আছে—

আহারাদি সেরে পরিতৃপ্তির সহিত তামাক টানতে টানতে কেদার মেয়েকে বললেন, প্রভাস ছোকরা ভালো। বেশ যোগাড় আয়োজন করেছে খাওয়ার—কি বলিস্ মা?

—চমৎকার, আবার কি করবে?

—ফলগুলো কেটেছিস্ নাকি?

—না বাবা, কাল সকালে কাটবো। তোমায় দেবো। আজ তো লুচি ছিল, তাই খেলাম।

—বড্ড নির্জ্জন বাগানটা—না?

—গড়ের জঙ্গলের চেয়ে নির্জ্জন নয় তা বলে। ওই তো রাস্তা দিয়ে মোটর গাড়ি যাচ্ছে, আর গড়ের জঙ্গলে যে-সময়ে শেয়াল ডাকে, বাঘ বের হয়!

—তা যা বলিস্ বাপু, সেখানে যতই জঙ্গল হোক, জন্মভূমি তো বটে। সেখানে ভয় হয়? তুই সত্যি করে বল্ তো?

—ভয় হলে কি থাকতে পারতাম বাবা? ছেলেবেলা থেকে কাটালাম কি করে তবে?

—কিন্তু এখানে কেমন যেন ভয় করে মা। কলকাতা শহর বড় যেমন, তেমন গুন্ডা বদমাইশের জায়গা।

সারাদিন মোটর ভ্রমণের ক্লান্তির ফলে রাত্রি যেন কোথা দিয়ে কেটে গেল।

পরদিন সকালে শরৎ বাথরুমে ঢুকে স্নান সেরে নিয়ে বাবার জন্যে চা আর খাবার করতে বসল। অনেক দিন পরে সে বাবাকে ভাল করে খাওয়ানোর সচ্ছল উপকরণ হাতের কাছে পেয়ে তার সদ্ব্যবহার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

কেদার বললেন, প্রভাস আর অরুণের জন্যে খাবার করে রাখো মা, যদি ওরা সকালে এসে পড়ে ?

কিন্তু তারা সকালের দিকে এল না।

দুপুরের পর কেদার একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর দিবানিদ্রা অভ্যাস নেই—অথচ রাস্তাঘাট না চেনার দরুন কোথাও যেতেও পারেন না। এই বাগানবাড়ির চতুঃসীমায় বন্দী-জীবন যাপন করার মত লোক নন তিনি।

শরৎকে ডেকে বললেন, হ্যাঁ মা, গঙ্গা কোন্‌দিকে ঝিকে জিজ্ঞেস করো তো ?

শরৎ ঘুরে এসে বললে, গঙ্গা নাকি এখান থেকে দুক্রোশ পথ, বাবা। কেন, গঙ্গা কি হবে ?

—না, একটু বেরিয়ে আসতাম গঙ্গার ধারে।

বেলা তিনটের পর প্রভাস একা মোটর হাঁকিয়ে এল।

বললে, ওবেলা কাজ ছিল জরুরী—আসতে পারলাম না। কোন অসুবিধে হয় নি তো কাকাবাবু ?

—নাঃ, অসুবিধে কি হবে ? অরুণ এল না ?

—তার সঙ্গে দেখাই হয় নি আজ সারাদিন। তবে সেও কাজে ব্যস্ত আছে মনে হচ্ছে। নইলে নিশ্চয় আসত।

—তুমি চা খেয়ে নাও, শরৎ মা, তোমার প্রভাসদাকে—

আধ ঘণ্টার মধ্যে কেদার চা পান শেষ করে মেয়েকে নিয়ে মোটরে উঠলেন। বললেন, কলকাতার দিকে না গিয়ে এবার চলো না বেশ গঙ্গার ধারে নির্জন জায়গায়—

—পেনেটিতে দ্বাদশ শিবের মন্দিরে যাবেন ?

শরৎ আগ্রহের সুরে বললে, তাই চলো প্রভাসদা, দেখি নি কখনো।

কেদার শিবমন্দির দেখবার কোনো আগ্রহ দেখালেন না—তীর্থ দর্শনে পুণ্য অর্জন করবার ওপর লোভ জীবনে তাঁর কোনো দিনই দেখা যায় নি।

ব্যারাকপুর ট্রাংক রোডে পড়ে মোটর তীরবেগে পেনিটির দিকে ছুটল। রাস্তার দুধারে কত বিচিত্র উদ্যানরাজি, কত সুন্দর বাড়ি—কলকাতার বড় লোকেদের ব্যাপার। পেনিটির দ্বাদশ শিবের মন্দির দেখে শরৎ খুব খুশী। সামনে গঙ্গা, ওপারে কত কলকারখানা, মন্দির ঘরবাড়ি। এপারে সারি সারি বাগানবাড়ি—বিকেলের নীল আকাশ গঙ্গার বিশালবক্ষে ঝুঁকে পড়েছে—নৌকো স্টীমারের ভিড়।

শরৎ অবাক হয়ে গঙ্গার বাঁধাঘাটে রানার ওপর দাঁড়িয়ে দেখে দেখে বললে—এমন কখনো দেখি নি বাবা, ওপারের দিকটা কি চমৎকার।

প্রভাস বললে, ভাল লাগছে, শরৎদি ?

—উঃ, ইচ্ছে করে এখানেই সব সময় থাকি আর গঙ্গাস্নান করি—ভাল কথা, প্রভাসদা, কাল গঙ্গা নাওয়াও না কেন ?

—বেশ ভালোই তো। কোন্ সময়ে আসবো বলো—কোথায় নাইবে ?

—এখানেই এসো। এ জায়গা আমার ভারি ভালো লেগেছে—

—এখানই আসবে, না কালীঘাটে ? কাকাবাবু কি বলেন ?

—তুমি যেখানে ভাল বোঝো। বাবার কথা ছেড়ে দাও—উনি ওসব পছন্দ করেন না।

সন্ধ্যার আগে অস্ত-দিগন্তের চিত্রবিচিত্র রঙীন আকাশের ছায়া গঙ্গার জলে পড়ে যে মায়ালোক সৃষ্টি করল, শরৎ সে-রকম দৃশ্য জীবনে কোনোদিন দেখে নি। গড়শিবপুর জলের দেশ নয়—এত বড় নদী, জলের বুকে এমন রঙীন মেঘের প্রতিচ্ছায়া সে এই প্রথম

দেখল। রাজলক্ষ্মীর জন্যে মনটা কেমন করে উঠল শরতের—সে বেচারী কিছু দেখতে পেলে না জীবনে, আজ সে সঙ্গে থাকলে আনন্দ অনেক বেশী হত।

বাড়ি ফিরে শরৎ রান্নাঘরে ঢুকল—প্রভাস কিছুক্ষণ বসে কেদারের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে লাগল।

কথায় কথায় কেদার বললে, হ্যাঁ হে, এখানে কোথাও গান-টান হয় না?

আসলে কেদারের এসব খুব ভাল লাগছিল না—শহর, দেবমন্দির, গঙ্গা, দোকান, ট্রাম—এসব খুব ভাল জিনিস। কিন্তু তিনি একটু গান-বাজনা চান, চিরকাল যা করে এসেছেন। শরৎ ছেলেমানুষ, তার ওপর মেয়েমানুষ—ও শহর বাজার, ঠাকুর দেবতা দেখে খুশী থাকতে পারে—কেদারের এখন সে বয়েস নেই। মেয়েমানুষও নন যে পুণ্যের লোভ থাকবে।

প্রভাস বললে, কি রকম গান-বাজনা বলুন?

—এই ধরো কোনো গান-বাজনার আড্ডা—শুনেছি তো কলকাতায় অনেক বড় বড় গানের মজলিস বসে বড়লোকের বাড়ি। একদিন সে-রকম কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে পারো?

প্রভাস একটু ভেবে বললে, তা বোধ হয় পারব—দেখি সন্ধান নিয়ে। কাল বলব আপনাকে—

—অনেক শুনেছি বড় বড় ওস্তাদ আছে কলকাতায়। কোথায় থাকে জানো? তাদের গান শোনবার সুবিধে হয়?

—আমি দেখব কাকাবাবু। অরুণকে জিগ্যেস করি কাল—ও অনেক খোঁজ রাখে—

প্রভাস মোটর নিয়ে চলে যাচ্ছে, এমন সময় শরৎ এসে বললে—ও প্রভাসদা, যাবেন না—

—কেন শরৎদি?

—আপনার জন্যে একটা জিনিস তৈরি করছি—

—কি বলো না?

—এখন বলছি নে—আসুন, খাবার সময় দেবো—

—খুব দেরি হয়ে যাবে শরৎদি—

—কিছু দেরি হবে না, হয়ে গেল—গরম গরম ভেজে দেবো—

কিছুক্ষণ পরে শরৎ একখানা রেকাবিতে খানকতক মাছের কচুরি এনে বললে—খেয়ে দেখুন কেমন হয়েছে। এবেলা ঝি ভাল পোনা মাছ এনেছে প্রায় আধসের। অত মাছ রান্না করে কে খাবে? তাই ভাবলাম বাবার জন্যে খান-কতক কচুরি ভাজি—

প্রভাস বললে, কাকাবাবুকে দিলে না?

—তাঁকে এখন না। এখন খেলে রাত্রে আর খেতে পারবেন না। তখন একেবারে দেবো—

প্রভাস খাওয়া শেষ করে বিদায় নেওয়ার আগে বললে—কাল শরৎদি, গঙ্গা নাওয়াবো তোমায়। ভেবে রেখো কালীঘাট না পেনিটি কোথায় যাবে।

কেদার বললেন, আমার কথাটা যেন মনে থাকে, প্রভাস। ভাল গান-বাজনার সন্ধান পেলেই খবর দেবে—

—সে আমার মনে আছে কাকাবাবু।

পরদিন সকালে উঠে কেদার দেখলেন মেয়ে তাঁর আগেই উঠে বাগানে ফুল তুলে বেড়াচ্ছে। বাবাকে দেখে বললে—ওঠো বাবা, আমি আজ পুজো করব ভেবে ফুল তুলছি। কি চমৎকার চমৎকার ফুল ফুটে আছে পুকুরের ওপাড়ে। তুমি চেনো এসব ফুল? বিলিতি না কি ফুল—দেখিই নি কখনো—

কেদার বললেন, বেশ বাগান-বাড়িটা, না মা শরৎ? কিন্তু—

—কিন্তু কি বাবা ?

—এখানে বেশীদিন মন টেঁকে না। আমাদের গড়শিবপুরের সেই জঙ্গলা ভালো—না বা ?

—যা বলেছ বাবা। বাগানের পুকুরটা দেখে আমার এইমাত্র কালো পায়রার দীঘির কথা মনে পড়ছিল—

—আর কত দিন থাকবে এখানে ? প্রভাস কিছু বলেছে ?

—তুমি যে ক'দিন বলো বাবা। এখনও কালীঘাট দেখি নি, বায়স্কোপ দেখি নি—দেখি সেগুলো ? আর কি কি আছে দেখবার বাবা ?

—চিড়িয়াখানাটা আমার সেবারও দেখা হয় নি—এবার দেখবো।

—সেবার মানে কি বাবা ? হয়তো ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগেকার কথা। আমার জন্মাবার অনেক আগে—না ?

—হ্যাঁ—তা হবে। তোমার মায়ের জন্যে একখানা শাড়ী, বেশ ভাল ডুরে শাড়ী কিনে নিয়ে যাই, মনে আছে।

—তুমি হাত ধুয়ে নাও বাবা, আমি চা করে আনি—খাবার কি খাবে ?

এমন সময় গেটের পথে মোটরের শব্দ শোনা গেল—সঙ্গে সঙ্গে প্রভাসের মোটর এসে বারান্দার সামনের লাল কাঁকরের পথের ওপর এরিকা-পাম কুঞ্জের ছায়ায় দাঁড়িয়ে গেল। প্রভাস নেমে এসে বললে, চলুন কাকাবাবু, কালীঘাটে নিয়ে যাই—শরৎদি তৈরী হয়ে নাও।

শরৎ খুশিতে উৎফুল্ল হয়ে বললে, সে বেশ হবে প্রভাসদা, চলো বাবা, চা করে নিয়ে এলাম বলে, বসো সব।

সত্যিই এ ক'দিন অদ্ভুত উত্তেজনা ও আনন্দের মধ্যে শরতের দিনগুলো কেটে যাচ্ছে। কেদার বৃদ্ধ হয়েছেন, নতুন জায়গা এখন আর তাঁর মনে তেমন ধাক্কা দেয় না, জীবনের সমস্ত আকাশটা জুড়ে গড়শিবপুরের ভাঙা রাজ-দেউড়ি ও বনজঙ্গলে ঘেরা গড়খাই সেখানে পূর্ণ অধিকারের আসন পেতেছে, আর আছে ছিবাস মুদির দোকান, ওপাড়ার কৃষ্ণযাত্রার আখড়াইয়ের আসর—তার সঙ্গে হয়তো সতীশ কলুর দোকান—তাদের ছোট্ট খড়ের বাড়িখানা। এ বয়সে নতুন কোন জিনিস জীবনে স্থান দখল করতে পারে না। জীবনের বৃত্ত পরিধিকে শেষ করে ওদিকের বিন্দুতে মিলবার চেষ্টায় রয়েছে—নব অনুভূতিরাজির সঞ্চার এ বয়সে সম্ভব কবি ও বৈজ্ঞানিকের পক্ষে, প্রতিভাবান শিল্পীর পক্ষে, কেদার সে দলে পড়ে না।

প্রভাসের মোটর এবার স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে চলল হ্যারিসন রোড দিয়ে পড়ে। প্রভাস বললে, ইডেন গার্ডেনটা একবার দেখিয়ে নিয়ে যাই আপনাদের।

কেদার বললেন, সেটা কি বাবাজি ?

—আজ্ঞে একটা বাগান, বেশ ভাল, সবাই বেড়াতে আসে।

—ও বাগান-টাগান আমরা আর কি দেখব, বন বাগান তো দেখেই আসছি, তুমি বরং আমাদের কালীঘাটটা নিয়ে চল।

কালীঘাটে কালী মন্দিরের সামনের চত্বরে অরুণ দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেয়ে শরৎ খুশীর সুরে বললে—বাবা, ওই অরুণবাবু, ডাকুন না প্রভাসদা ?

প্রভাস বললে, এখানে আমাদের সঙ্গে মিশবার কথা ছিল ওর। ও অরুণ—এই যে।

শরৎ কালী-গঙ্গায় স্নান সেরে মন্দিরে দেবী দর্শন করে এল। সঙ্গে রইল প্রভাস। কেদার মোটরে বসে চারিপাশের ভিড় দেখতে লাগলেন। অরুণ একটা ছোট ঘর ভাড়ার চেষ্টায় গেল, কারণ প্রভাস ও অরুণ দুজনে শরৎকে বিশেষ করে ধরেছে, এখানে চড়ুইভাতি করতে হবে।

শরতের বড় অস্বস্তি বোধ করে একটা ব্যাপারে। এখানকার লোকে এমন ভাবে তার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে কেন? শহরের লোকের এমন খারাপ অভ্যাস কেন? আজ ক'দিন থেকেই সে লক্ষ্য করছে। অপরিচিতা মেয়েদের দিকে অমন ভাবে চেয়ে থাকা বুঝি ভদ্রতা? শরতের জানা ছিল কলকাতার লোকে শিক্ষিত, তাদের ধরনধারন খুব ভদ্র হবে, তাদের দেখে গড়শিবপুরের মত পাড়াগাঁয়ের লোকেরা শিখবে। এখন দেখা যাচ্ছে তার উল্টো।

অরুণ বাড়ি ঠিক করে এসে কেদারকে বললে, এরা কই? চলুন এবার, সব ঠিক করে এলাম।

একটু পরে প্রভাসের সঙ্গে শরৎ মন্দির থেকে ফিরল। ওরা সবাই মিলে ভাড়াটে ঘরে গিয়ে শতরঞ্জি পেতে বসল। হোগলার ছাওয়া, দরমার বেড়া দেওয়া সারি সারি অনেকগুলো খুপরির মত ঘর। ছোট্ট একটুখানি নিচু দাওয়ায় মাটির উনুন। প্রভাস মোটরের ক্লিনারকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে প্রচুর বাজার করে নিয়ে এল, এমন কি প্রসাদী মাংস পর্যন্ত। কেদার খুব খুশী। মেয়েকে বললেন—ভাল করে মাংসটা রাঁধিস মা, একটু ঝাল দিস্।

—সে কি বাবা, ঝাল যে তুমি মোটে খেতে পারো না?

—তা হোক, কচি পাটার মাংস ঝাল না দিলে ভাল লাগে না।

রান্না খাওয়া মিটতে বেলা তিনটে বাজলো। অরুণদের আবার কে একজন বন্ধু এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিলে। লোকটি এসেই বলে উঠল—এই যে প্রভাস, আরে অরুণ, এনেছিস্। তো জুত করে? ভাল চীজ বাবা, তোদের সাহস আছে বলতে হবে।

প্রভাস তাড়াতাড়ি তাকে চোখ টিপে দিলে, শরৎ দেখতে পেলো। সে কিছু বুঝতে পারলে না, লোকটা অমন কেন, এসেই চীৎকার করে কতকগুলো কথা বলে উঠল—যার কোনো মানে হয় না। কলকাতা শহরে কত রকম মানুষই না থাকে!

কি জানি কেন, লোকটাকে শরতের মোটেই ভাল লাগল না। মোটা মত লোকটা, নাম গিরীন, বয়সে প্রভাসের চেয়েও বড়, কারণ কানের পাশের চুলে বেশ পাক ধরেছে।

তিনটের পরে ওখান থেকে বেরিয়ে কিছু দূরে গিয়ে প্রভাস একটা বাগানের সামনে গাড়ি রেখে বললে—এই চিড়িয়াখানা কাকাবাবু, নেমে দেখুন এবার—

শরৎ সব দেখে শুনে সমস্ত দিনের কষ্ট ও শ্রম ভুলে গেল। কেদারও এমন এমন একটা জিনিস দেখলেন, যা তাঁর মনে হ'ল না দেখলে জীবনে একটা অসম্পূর্ণতা থেকে যেত। পৃথিবীতে যে এত অদ্ভুত ধরণের জীবজন্তু থাকতে পারে, তার কল্পনা কে করেছিল? কেদার তো ভাবতেই পারেন না। পিতা পুত্রীতে মিলে সমবয়সী বালক-বালিকার মত আমোদ পশুপক্ষী দেখে বেড়াল। এ ওকে দেখায়, ও একে দেখায়। কী ভীষণ ডাক সিংহের? জলহস্তী? এর নাম জলহস্তী? ছেলেবেলায় 'প্রাণী-বৃত্তান্ত' বলে বইয়ে কেদার এর কথা করে পড়েছিলেন বটে। ওই দ্যাখো শরৎ মা, ওকে বলে উটপাখী।

—কতবড় ডিম বাবা উটপাখীর! আচ্ছা ও খায়, প্রভাসদা? বিক্রী হয়?

ফেরবার সময় গেটের কাছে এসে গিরীন, প্রভাস ও অরুণের সঙ্গে কি সব কথা বললে। প্রভাস এসে বললে, কাকাবাবু এবার চলুন সিনেমা দেখে আসি, মানে বায়স্কোপ। কাছেই আছে—

কেদার বললেন, তা চলো, যা ভাল হয়।

বাইরে এসে ওরা একটা ফাঁকা মাঠের ধারে মোটর থামিয়ে রেখে কেদার ও শরৎকে নেমে হাওয়া খেতে বললে। এরই নাম গড়ের মাঠ। সেদিনও নেমেছিল শরৎ। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে—রাস্তার ধারে গ্যাসের আলো এক-একটা করে জেলে দিচ্ছে। শরৎ

জিজ্ঞাসা করলে—সে বায়স্কোপ কতক্ষণ দেখতে হবে? প্রভাস বললে, এই সাড়ে ন'টা পর্য্যন্ত।

শরৎ ভেবে দেখলে অত রাত্রে গিয়ে রান্না চড়ালে বাবা খাবেন কখন? তা ছাড়া বাবা আজ সারাদিন এখানে ওখানে বেড়িয়ে শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন—বুড়ো বয়সে অত অনিয়ম করলে যদি শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে বিদেশে—তখন ভুগতে হবে তাকেই। সে বললে, আজ থাক প্রভাসদা, আজ আর বায়স্কোপ দেখে দরকার নেই। বাবার খেতে দেরি হয়ে যাবে।

গিরীন তবুও নাছোড়বান্দা। সে বললে, কিছু ক্ষতি হবে না—মোটরে যেতে আর কতটুকু লাগবে? আজই দেখা যাক।

শরৎকে অত সহজে ভোলানো যাবে তেমন প্রকৃতির মেয়ে নয় সে। নিজের বুদ্ধিতে সে যা ঠিক করে, ভাল হোক, মন্দ হোক, তার সে সঙ্কল্প থেকে নড়ানো গিরীনের কর্ম্ম নয়—গিরীন শীঘ্রই তার পরিচয় পেলে। প্রভাসকে সে ইংরেজীতে কি একটা কথা বললে, প্রভাস ও অরুণ দুজনে অনুচ্চস্বরে কি বলাবলি করল।

প্রভাস বললে, কাকাবাবু কি বলেন?

কেদার নিজের মত অনুসারে চলবার সাহস পান গড়শিবপুরে, এখানে মেয়ের মতের বিরুদ্ধে যেতে তাঁর সাহসে কুলোয় না। সুতরাং তিনি বললেন, ও যখন বলছে, তখন আজ না হয় ওটা থাকগে প্রভাস, কাল যা হয় হবে।

অগত্যা প্রভাস ওদের নিয়ে মোটরে উঠল—কিন্তু বেশ বোঝা গেল ওদের দল তাতে বিরক্ত হয়েছে।

পাঁচ

পর দিন প্রভাসের দলের কেউই বাগানবাড়িতে এল না। শরৎ সন্ধ্যার দিকে বাগানে আপন মনে খানিকটা বেড়িয়ে বাবাকে ডেকে বললে, বাবা খাবে নাকি?

কেদার বললেন, আজ এরা কেউ এল না কেন রে শরৎ?

—তা কি জানি বাবা। বোধ হয় কোনো কাজ পড়েছে—

—তা তো বুঝলাম, কিন্তু যা দেখবার দেখে নিতে পারলে হ'ত ভাল। আবার বাড়ি ফিরতে হবে সংক্রান্তির আগেই—

কেদারের আর তেমন ভাল লাগছিল না বটে, কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন মেয়ের এত তাড়াতাড়ি দেশে ফিরবার ইচ্ছে নেই—তার এখন দেখবার বয়স, কখনো কিছু দেখে নি, আছে আজীবন গড়শিবপুরের জঙ্গলে পড়ে। দেখতে চায় দেখুক—তিনি বাধা দিতে চান না।

শরৎ বললে, পেঁপে খাবে বাবা? বাগানের গাছ থেকে পেড়েছি, চমৎকার গাছ-পাকা। নিয়ে আসি দাঁড়াও—

কেদার বললেন, আশপাশের বাগানবাড়িতে লোক থাকে কিনা জানিস্ কিছু মা?

—চলো না, তুমি পেঁপে খেয়ে নাও—দেখে আসি।

মিনিট পনেরো পরে দুজনে পাশের একটা অন্ধকার বাগানবাড়ির ফটকের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই একজন খোট্টা দারোয়ান ফটকের পাশের ছোট্ট একটা গুমটি ঘর থেকে বার হয়ে বললে, কেয়া মাংতা বাবুজি?

কেদার হিন্দী বলতে পারেন না। উত্তর দিলেন, এ বাগানে কি আছে দারোয়ানজি?

—বাবুলোক হ্যায়—মাইজি ভি হ্যায়—যাইয়ে গা?

—হ্যাঁ, আমার এই মেয়েটি একবার বাগান দেখতে এসেছে—

—যাইয়ে—

বেশ বাগান। প্রভাসদের বাগানের চেয়ে বড় না হলেও, নিতান্ত ছোট নয়। অনেক রকম ফুলের গাছ, ফুল ফুটেও আছে অনেক গাছে—সানবাঁধানো পুকুরের ঘাট, খানিকটা জায়গা তার দিয়ে ঘেরা তার মধ্যে হাঁস এবং মুরগী আটকানো। খুব খানিকটা এদিক-ওদিক লিচুতলা ও আমতলায় অন্ধকারে বেড়ানোর পরে ওরা একেবারে বাগানবাড়ির সামনের সুরকি বিছানো পথে গিয়ে উঠল। বাড়ির বারান্দা থেকে কে একজন প্রৌঢ়কণ্ঠে হাঁক দিয়ে বললেন, কে ওখানে?

কেদার বললেন, এই আমরা। বাগান দেখতে এসেছিলাম—

একটি পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের বৃদ্ধ ভদ্রলোক ধপধপে সাদা কোঁচানো কাপড় পরে খালি গায়ে রোয়াকে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, আসুন আসুন—সঙ্গে মা রয়েছেন, তা উনি বাড়ির মধ্যে যান না? আমার স্ত্রী আছেন—

শরৎ পাশ পাঁচিলের সরু দরজা দিয়ে অন্দরে ঢুকলো। কেদার রোয়াকে উঠতেই ভদ্রলোক তাঁকে নিয়ে উপরে চেয়ারে বসালেন। বললেন, কোন্ বাগানে আছেন আপনারা?

—এই দুখানা বাগানের পাশে। প্রভাসকে চেনেন কি বাবু?

—না, আমি নতুন এ বাগান কিনেছি, কারুর সঙ্গে চেনা হয় নি এখনও। তামাক খান কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ তা খাই—তবে আমার আবার হ্যাঙ্গামা আছে—ব্রাহ্মণের হুঁকো না থাকলে—

—আপনি ব্রাহ্মণ বুঝি? ও, বেশ বেশ। আমিও তাই, আমার নাম শশিভূষণ চাটুজ্জে—'এঁড়েদার' চাটুজ্জে আমরা। ওরে ও নন্দে, তামাক নিয়ে আয়—

দুজনে কিছুক্ষণ তামাক খাওয়ার পরে চাটুজ্জে মশাই বললেন, আচ্ছা মশাই—এখানে টেক্স এত বেশী কেন বলতে পারেন—আমার এই বাগানে কোয়ার্টারে আট টাকা টেক্স। আপনি কত দেন বলুন তো? না হয় আমি একবার লেখালেখি করে দেখি—কলকাতায় আপনারা থাকেন কোথায়?

কেদার অপ্রতিভ মুখে বললেন, আমার বাগান নয়—আমাদের বাড়ি তো কলকাতায় নয়। বেড়াতে এসেছি দু-দিনের জন্যে—কলকাতায় থাকি নে—

—ও, আপনাদের দেশ কোথায়? গড়শিবপুরে? সে কোন্ জেলা? ও, বেশ বেশ।

—বাবু কি এখানেই বাস করেন?

—না, আমার স্ত্রীর শরীর ভাল না, ডাক্তারে বলেছে কলকাতার বাইরে কিছুদিন থাকতে। তাই এলাম—যদি ভাল লাগে আর যদি শরীর সারে তবে থাকবো দু-তিন মাস! বেশ হ'ল মশায়ের সঙ্গে আলাপ হয়ে। আপনার গানটান আসে?

কেদার সলজ্জ বিনয়ের সুরে বললেন, ওই অল্প অল্প।

—তবে ভালই হ'ল—দুজনে মিলে বেশ একটু গান-বাজনা করা যাবে। কাল এখানে এসে বিকেলে চা খাবেন। বলা রইল কিন্তু...বাজাতে পারেন?

—আজ্ঞে, সামান্য।

—সামান্য-টামান্য না। গুণী লোকে আপনি দেখেই বুঝেছি। এখন খালি গলায় একখানা শুনিয়ে দিন না দয়া করে? তার পর কাল থেকে আমি সব যোগাড়যন্ত্র করে রাখবো এখন।

কেদার একখানা শ্যামা বিষয় গান ধরলেন, কিন্তু অপরিচিত জায়গায় তেমন সুবিধে

করতে পারলেন না, কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকতে লাগল—সতীশ কলুর দোকানে বসে গাইলে যেমনটি হয় তেমনটি কোনোখানেই হয় না। চাটুজ্জে মশাই কিন্তু তাই শুনেই খুব খুশী হয়ে উঠে বললেন, বাঃ বাঃ, বেশ চমৎকার গলাটি আপনার। এসব গান আজকাল বড় একটা শোনাই যায় না—সব থিয়েটারি গান শুনে শুনে কান পচে গেল, মশাই। বসুন, একটু চায়ের ব্যবস্থা করে আসি—

কেদার ভদ্রলোককে নিরস্ত করে বললেন, চা খেয়ে বেরিয়েছি, আমি দুবার চা খাইনে সন্দের পর, রাত্তে ঘুম হয় না, বয়েস হয়েছে তো—এবার আপনি বরং একটা—

চাটুজ্জে মশায়ও দেখা গেল বিনয়ের অবতার। তিনি গান গাইলেন না, কারণ তিনি বললেন, একে তিনি গান গান না, কারণ গানের গলা নেই তাঁর—যাও বা একটু আধটু হুঁ হুঁ করতেন, কেদারের মত গুণী লোকের সামনে তাঁর গলা দিয়ে কিছুই বেরুবে না। অবশেষে অনেক অনুরোধের পর চাটুজ্জে মশায় একটা রামপ্রসাদী গেয়ে শোনালেন—কেদারের মনে হ'ল তাঁদের গ্রামের যাত্রাদলের তিনকড়ি কামার এর চেয়ে অনেক ভাল গায়।

এ সময় শরৎ বাড়ির মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে বললে, চলো বাবা, রাত হয়ে গেল।

চাটুজ্জে মশায় বললেন, এটি কে? মেয়ে বুঝি? তা মা যে আমার জগদ্ধাত্রী প্রতিমার মত ঘর আলো করা মা দেখছি। বিয়ে দেন নি এখনও?

—বিয়ে দিয়েছিলাম চাটুজ্জে মশাই—কিন্তু বরাত ভাল নয়, বিয়ের দু-বছর পরেই হাতের শাঁখা ঘুচে গেল। চলো মা, উঠি আজ চাটুজ্জে মশাই, নমস্কার। বড় আনন্দ হ'ল—মাঝে মাঝে আসবো কিন্তু।

—আসবেন বৈকি, রোজ আসবেন আর এখানে চা খাবেন। মাকেও নিয়ে আসবেন। মায়ের কথা শুনে মনে বড় দুঃখ হ'ল—উনি আমার এখানে একটু মিষ্টিমুখ করবেন একদিন। নমস্কার।

পথে আসতে আসতে শরৎ বললে, গিন্নী বেশ লোক বাবা। আমায় কত আদর করলে, জল খাওয়ানোর জন্যে কত পীড়াপীড়ি—আমি খেলাম না, পরের বাড়ি খেতে লজ্জা করে—চিনি নে শুনি নে। আমায় আবার যেতে বলেছে।

—আমারও ভাল হ'ল, কর্ত্তা গান-বাজনা ভালবাসে, শখ আছে—এখানে সন্দেটা কাটানো যাবে—

ওরা নিজেদের বাগান-বাড়িতে ঢুকেই দেখলে বাড়ির সামনে প্রভাসের মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার পর বাড়ি পেঁাছেই প্রভাসের সঙ্গে দেখা হ'ল। সে বাড়ির সামনে গোল বারান্দায় বসে ছিল, বোধ হয় এদের প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষায়। কাছে এসে বললে, কোথায় গিয়েছিলেন কাকাবাবু? আমি অনেকক্ষণ এসে বসে আছি। কিন্তু আজ যে বড্ড দেরি করে ফেললেন—সিনেমা যাবার সময় চলে গেল। সাড়ে ন'টার সময় যাবেন? প্রায় বারোটায় ভাঙবে।

শরৎ বললে, না প্রভাসদা, অত রাত্রে ফিরলে বাবার শরীর খারাপ হবে। থাক না আজ, আর একদিন হবে এখন—

কেদার বললেন, তাই হবে এখন প্রভাস, আজ বড্ড দেরি হয়ে যাবে। তুমি তো আজ ও-বেলা এলে না—এ-বেলাও আমরা সন্দে পর্য্যন্ত দেখে তবে বেরিয়েছি। কাল বরং যাওয়া যাবে এখন। বসো চা খাও।

—না কাকাবাবু, আজ আর বসবো না। কাল তৈরি থাকবেন, আসবো বেলা পাঁচটার মধ্যে। কোনো অসুবিধে হচ্ছে না?

—না না অসুবিধে কিসের? তুমি সেজন্য কিছু ভেবো না।

পর দিন একেবারে দুপুরের পরই প্রভাস মোটর নিয়ে এল। শরৎ চা করে খাওয়ালে প্রভাসকে—তারপর সবাই মিলে মোটরে গিয়ে উঠল। অনেক বড় বড় রাস্তা ও গাড়ি মোটরের ভিড় পেরিয়ে ওদের গাড়ি এসে একটা বড় বাড়ির সামনে দাঁড়াল। প্রভাস বললে, এই হলো সিনেমা ঘর—আপনারা গাড়িতে বসুন, আমি টিকিট করে আনি—

শরৎ বাড়িটার মধ্যে ঢুকে চারিদিকে চেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। কত উঁচু ছাদ, ছাদের গায়ে বড় বড় আলোর ডুম, গদি-আঁটা চেয়ার বেঞ্চি ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে, কত সাহেব-মেম বাঙালীর ভিড়।

কেদার বললে, এ জায়গাটার নাম কি হে প্রভাস?

—আজ্ঞে এ হ'ল এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেস—একটা পার্শি কোম্পানীর।

—বেশ বেশ। চমৎকার বাড়িটা—না মা শরৎ? থাকি জঙ্গলে পড়ে, এমন ধারাটি কখনো দেখি নি—আর দেখবোই বা কোথায়? ইচ্ছে হয় সতীশ কলু, ছিবাস এদের নিয়ে এসে দেখাই। কিছুই দেখলে না ওরা, শুধু তেল মেপে আর দাঁড়ি-পাল্লা ধরেই জীবনটা কাটালে।

সারা ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। কেদার বলে উঠলেন—ও প্রভাস, এ কি হ'ল? ওদের আলো খারাপ হয়ে গেল বুঝি?

প্রভাস নিম্নস্বরে বললে, চুপ করুন কাকাবাবু, এবার ছবি আরম্ভ হবে।

সামনে সাদা কাপড়ের পর্দ্দাটার ওপরে যেন জাদুকরের মন্ত্রবলে মায়াপুরীর সৃষ্টি হয়ে গেল, দিব্যি বাড়িঘর, লোকেজন কথা বলছে, রেলগাড়ী ছুটছে, সাহেব মেমের ছেলেমেয়েরা হাসি খেলা করছে, কাপড়ের পর্দ্দার ওপরে যেন আর একটা কলকাতা শহর।

কিন্তু ছবিতে কি করে কথা বলে? কেদার অনেক বার ঠাউরে দেখবার চেষ্টা করেও কিছু মীমাংসা করতে পারলেন না। অবিশ্যি এর মধ্যে ফাঁকি আছে নিশ্চয়ই, মানুষের পেছন থেকে কথা বলছে কৌশল করে, মনে হচ্ছে যেন ছবির মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে—কিন্তু কেদার সেটা ধরে ফেলবার অনেক চেষ্টা করেও কৃতকার্য্য হতে পারলেন না। একবার একটা মোটর গাড়ির আওয়াজ শুনে কেদার দস্তুরমত অবাক হয়ে গেলেন। মানুষে কি মোটর গাড়ির আওয়াজ বের করে মুখ দিয়ে? বোধ হয় কোনো কলের সাহায্যে ওই আওয়াজ করা হচ্ছে। কলে কি না হয়?

হঠাৎ সব আলো একসঙ্গে আবার জ্বলে উঠল। কেদার বললেন, শেষ হয়ে গেল বুঝি?

প্রভাস বললে, না কাকাবাবু, এখন কিছুক্ষণ বন্ধ থাকবে—তারপর আবার আরম্ভ হবে। চা খাবেন কি? বাইরে আসুন তবে?

শরৎ বললে, প্রভাসদা, দোকানের চা আর ওঁকে খাওয়ানোর দরকার নেই—সাতাক জাতের এঁটো পেয়ালায় চুমুক দিতে হবে—থাকগে। ওমা, ওই যে অরুণবাবু—উনি এলেন কোথা থেকে?

অরুণ কেদারকে প্রণাম করে বললে, কেমন লাগছে আপনার, ওঁর লাগছে কেমন? চলুন আজ সিনেমা ভাঙলে দমদমা পর্য্যন্ত আপনাদের পোঁছে দিয়ে আসব—

কেদার বললেন, বেশ, তা হলে আমাদের ওখানেই আজ খেয়ে আসবে দুজনে—

—না আজ আর না, আর একদিন হবে এখন বরং।

এই সময় গিরীন বলে সেই লোকটিও ওদের কাছে এসে দাঁড়াল। প্রভাসকে সে কি একটা কথা বললে ইংরিজীতে।

প্রভাস বললে, কাকাবাবু, শরৎ দিদিকে আমার এই বন্ধু ওঁর বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে বলছেন।

কেদার বললেন, বেশ তো। আজই ?

—হ্যাঁ আজ, বায়োস্কোপের পরে।

ছবি ভাঙবার পরে সবাই মোটরে উঠল। গিরীন ও প্রভাস বসেছে সামনে, কেদার, অরুণ আর শরৎ পেছনের সিটে। একটা গলির মধ্যে ঢুকে একটা ছোট বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। গিরীন নেমে ডাক দিলে—ও রবি, রবি ?

একটি ছেলে এসে দোর খুলে দিলে। গিরীন বললে, তোমার এই পিসীমাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে যাও—আসুন কেদারবাবু, বাইরের ঘরে আলো দিয়ে গিয়েছে।

সে বাড়িতে বেশীক্ষণ দেরি হ'ল না। বাড়ির মধ্যে থেকে সেই ছেলেটাই সকলকে চা ও খাবার দিয়ে গেল বাইরের ঘরে। একটু পরে শরৎ এসে বললে, চলো বাবা।

আবার দমদমার বাগানবাড়ি। রাত তখন খুব বেশী হয় নি—সুতরাং কেদার ওদের সকলকেই থেকে খেয়ে যেতে বললেন। হাজার হোক, রাজবংশের ছেলে তিনি। নজরটা তাঁর কোনো কালেই ছোট নয়। কিন্তু ওরা কেউ থাকতে রাজী হ'ল না—তবে এক পেয়ালা করে চা খেয়ে যেতে কেউ বিশেষ আপত্তি করলে না।

কেদার জিজ্ঞেস করলেন রাত্রে খেতে বসে—ওই ছেলেটির বাড়িতে তোকে কিছু খেতে দেয় নি ?

—দিয়েছিল, আমি খাই নি। তুমি ?

—আমায় দিয়েছিল, আমি খেয়েওছিলাম।

—তা আর খাবে না কেন ? তোমার কি জাতজন্মো কিছু আছে ? বাচবিচের বলে জিনিস নেই তোমার শরীরে।

—কেন ?

—কেন ? ওরা জাতে কি তার ঠিক নেই। বামুন নয়, কায়েতও নয়। আমি পরের বাড়ি গিয়ে কি করে তোমাকে বারণ করে পাঠাই ?

—কি করে জানলে ?

—ও মা, সে যেন কেমন। দু-তিনটি বৌ বাড়িতে। সবাই সেজেগুজে পান মুখে দিয়ে বসে আছে। যে ছেলেটা দোর খুলে দিলে, তাকে ও বাড়ির চাকর বলে মনে হ'ল। কেমন যেন—ভাল জাত নয় বাবা। একটি বৌ আমায় বেশ আদর-যত্ন করেছে। বেশ মিষ্টি কথা বলে। আবার যেতে বললে। আমার ইচ্ছে হয় মাথা খুঁড়ে মরি বাবা, তুমি কেন ওদের বাড়ি জল খেলে ? আমায় পান সেজে দিতে এসেছিল, আমি বললাম, পান খাই নে।

—তাতে আর কি হয়েছে ?

—তোমার তো কিছু হয় না—কিন্তু আমার যে গা-কেমন করে। আচ্ছা, গিরীনবাবুর বাড়ি নাকি ওটা ?

—হ্যাঁ, তাই তো বললে।

—অনেক জিনিসপত্র আছে বাড়িতে। ওরা বড়লোক বলে মনে হ'ল। হারমোনিয়ম, কলের গান, বাজনার জিনিস—বেশ বিছানা-পাতা চৌকি, বালিশ, তাকিয়া—দেওয়ালে সব ছবি। সেদিক থেকে খুব সাজানো-গোজানো।

—তা হবে না কেন মা, কলকাতার বড়লোক সব। এ কি আর আমাদের গাঁয়ের জঙ্গল পেয়েছ ?

—তুমি আমাদের গাঁয়ের নিন্দে করো না অমন করে।

কেদার বললেন, তোদের গাঁ বুঝি আমাদের গাঁ নয় পাগলী ? আচ্ছা, বল তো তোর

এখানে থাকতে আর ভাল লাগছে, না গ্রামে ফিরতে ইচ্ছে হচ্ছে ?

—এখন দুদিন এখানে থেকে দেখতে ইচ্ছে হয় বৈকি বাবা। আমার কথা যদি বলো—আমার ইচ্ছে এখানে এখন কিছুদিন থেকে সব দেখি শুনি—গাঁ তো আছেই, সে আর কে নিচ্ছে বলো।

পরদিন সকালে চাটুজ্জে মশায় কেদারকে ডেকে পাঠালেন। সেখানে গানের মজলিশ হবে সন্ধ্যায়। কেদারকে আসবার জন্যে যথেষ্ট অনুরোধ করলেন তিনি। মজলিশে শুধু শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত থাকলে চলবে না, কেদারকে গান গাইতে হবে।

কেদার বললেন, আজ্ঞে, আমি বাজাতে পারি কিছু কিছু বটে—কিন্তু মজলিশে গাইতে সাহস করি নে।

—খুব ভাল কথা। কি বাজান বলুন ?

—বেহালা যোগাড় করতে পারেন বাবু ?

—বেহালা ওবেলা পাবেন। আনিয়ে রাখবো। সেদিন তো বলেন নি আপনি বেহালা বাজাতে পারেন! আপনি দেখছি সত্যিই গুণী লোক। ওবেলা এখানে আহার করতে হবে কিন্তু। বাড়িতে মাকে বলে আসবেন।

—আমার মেয়ে যেখানে সেখানে আমায় খেতে দেয় না, তবে আপনার বাড়িতে সে নিশ্চয়ই কোনো আপত্তি করবে না। তাই হবে।

—আপত্তি ওঠালেও শুনবো না তো কেদারবাবু ? মার সঙ্গে নিজে গিয়ে ঝগড়া করে আসবো। আচ্ছা তাঁকে—

—সে কোথাও খায় না। তাকে আর বলার দরকার নেই।

—বিকেলে চাও এখানে খাবেন—

বৈকালে কেদার সবে চাটুজ্জে মশায়ের বাগানবাড়িতে যাবার জন্যে বার হয়েছেন, এমন সময় প্রভাসের গাড়ি এসে ঢুকলো ফটকে। প্রভাস গাড়ি থেকে নেমে বললে, কাকাবাবু কোথায় যাচ্ছেন ?

কেদারের উত্তর শুনে প্রভাস হতাশের সুরে বললে, তাই তো, তা হলে আর দেখছি হ'ল না—

—কি হ'ল না হে ? .

—শরৎ দিদিকে আজ একবার অরুণের বাড়ি আর আমার বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে এসেছিলাম, ওখান থেকে একেবারে নিউমার্কেট দেখিয়ে—

—চলো একটু কিছু মুখে দিয়ে যাবে—এসো—

শরৎ ছুটে বাইরে এসে বললে, প্রভাসদা! আসুন, আসুন—অরুণবাবু এসেছেন নাকি? বসুন প্রভাসদা, চা খাবেন।

কেদার বললেন, বড় মুশকিল হয়েছে মা, প্রভাস নিতে এসেছিল, এদিকে আমি যাচ্ছি চাটুজ্জেবাবুদের গানের আসরে। না গেলে ভদ্রতা থাকে না—ওবেলা বার বার বলে দিয়েছেন—

প্রভাসও দুঃখ প্রকাশ করলে। শরৎ দিদিকে সে নিজের বাড়ি ও অরুণের বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে এসেছিল—কিন্তু কাকাবাবু বেরিয়ে যাচ্ছেন—

শরৎ বললে, বাবা আমি যাই নে কেন প্রভাসদার সঙ্গে ? যাবো বাবা ?

কেদার খুশির স্বরে বললে, তা বরং ভালো বাবা। তাই যাও প্রভাস—তুমি শরৎকে নিয়ে যাও—তবে একটু সকাল সকাল পেঁছে দিয়ে যেও—

প্রভাস বললে, আজ্ঞে, তবে তাই। আমি খুব শীগ্‌গির দিয়ে যাবো। সে বিষয়ে

ভাববেন না।

প্রভাসের গাড়ি একটা বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। প্রভাস নেমে দোর খুলে বললে, আসুন শরৎদি, ভেতরে আসুন।

শরৎ বললে, এটা কাদের বাড়ি প্রভাসদা?

—এটা? এটা অরুণদেরই বাড়ি ধরুন—তবে অরুণ এখন বোধ হয় বাড়ি নেই—এলো বলে।

শরৎকে নিয়ে গিয়ে প্রভাস একটা সুসজ্জিত ঘরে বসিয়ে ডাক দিলে—ও বৌদি, বৌদি, কে এসেছে দ্যাখো—

শরৎ চেয়ে দেখলে ঘরটার মেজেতে ফরাস বিছানা পাতা, দেওয়ালে বেশির ভাগ বিলিতি মেম-সাহেবের ছবি, একদিকে একটা ছোট তক্তপোশের ওপর একটা গদি পাতা বিছানা—তাতে বালিশ নেই, গোটা দুই ডুগি-তবলা এবং একটা বেলো-খোলা বড় হারমোনিয়াম বিছানার ওপর বসানো। একটা খোল-মোড়া তানপুরা, দেয়ালের কোণের খাঁজে হেলান দেওয়ানো। খুব বড় একটা কাঁসার পিকদানি তক্তপোশের পায়াটার কাছে। একদিকে বড় একটা কাঠের আলমারি—তার মধ্যে টুকিটাকি শৌখীন কাঁচের ও মাটির জিনিস, গোটাকতক ছোট মত বোতল, আরও কি কি। একটা বড় দেওয়াল ঘড়ি।

শরৎ ভাবলে—এদের বাড়িতে গান-বাজনার চর্চা খুব আছে দেখছি। বাবাকে এখানে এনে ছেড়ে দিলে বাবার পোয়া বারো—

একটি সুবেশা মেয়ে এই সময় ঘরে ঢুকে হাসিমুখে বললে, এই যে এসো ভাই—তোমার কথা কত শুনেছি প্রভাসবাবু ও অরুণবাবুর কাছে। এসো এই খাটের ওপর ভাল হয়ে বোসো ভাই—

মেয়েটিকে দেখে বয়স আন্দাজ করা কিছু কঠিন হ'ল শরতের। ত্রিশও হতে পারে, পঁয়ত্রিশও হতে পারে—কম হবে না, বরং বেশিই হবে। কিন্তু কি সাজগোজ! মা গো, এই বয়সে অত সাজগোজ কি গিন্নিবান্নি মেয়েমানুষের মানায়? আর অত পান খাওয়ার ঘটা!

পেটো-পাড়া চুলে ফিরিঙ্গি খোঁপা, গায়ে গহনাও মন্দ নেই—বাড়িতে রয়েছে বসে এদিকে পায়ে আবার চটিজুতো—মখমলের উপর জরির কাজ করা। কলকাতার লোকের কাণ্ড-কারখানাই আলাদা।

শরৎ গিয়ে খাটের ওপর বসলো বটে ভদ্রতা রক্ষার জন্যে—কিন্তু তার কেমন গা ঘিন ঘিন করছিল। পরের বিছানায় সে পারত-পক্ষে কখনো বসে না—বিছানার কাপড় না ছাড়লে সংসারের কোনো জিনিসে সে হাত দিতে পারবে না—জলটুকু পর্যন্ত মুখে দিতে পারবে না। কথায় কথায় বিছানায় বসা আবার কি, কলকাতার লোকের আচার-বিচার বলে জিনিস নেই।

বৌটি তেমনি হাসিমুখে বললে, পান সাজবো ভাই? পানে দোক্তা খাও নাকি?

শরৎ মৃদু হেসে জানালে যে সে পান খায় না।

—পান খাও না—ওমা, তাই তো—আচ্ছা, দাঁড়াও ভাজা মশলা আনি—

—না, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমার ওসব কিছু লাগবে না।

প্রভাস বললে, শরৎদি, বৌদি খুব ভাল গান করেন, শুনবেন একখানা?

শরৎ উৎফুল্ল কণ্ঠে বললে, শুনবো বৈকি, ভাল গান শোনাই তো হয় না—উনি যদি গান দয়া করে—

বাবার গান ও বাজনা শরৎ শুনেছে বাল্যকাল থেকেই, কিন্তু লণ্ঠনের তলাতেই অন্ধকার, বাবার গান-বাজনা তার তেমন ভাল লাগে না। এমন কি বাবা ভাল গাইতে পারেন বলেও মনে হয় না শরতের। অপরে শুনে বাবার গানের বা বাজনার কেন অত প্রশংসা করে শরৎ

তা বুঝতে পারে না।

মাঝে মাঝে কেদার বলতেন গড়শিবপুরের বাড়িতে—শরৎ শোনো মা এই মালকোষখানা—বেহালার সুরের মূর্চ্ছনায় রাগিণী পর্দায় পর্দায় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করতো—বাবার ছড় ঘুরানোর কত কায়দা, ঘাড় দুলুনির কত তন্ময় ভঙ্গি—কিন্তু শরৎ মনে মনে ভাবতো বাবার এসব কিছুই হয় না। এ ভালই লাগে না, বাবা হয়তো বোঝেন না, লোকে শুনে হাসে···

প্রভাস ওর বৌদিদির দিকে চেয়ে হেসে বললে, শুনিয়ে দাও একটা—

মেয়েটি মৃদু হেসে হারমোনিয়মের কাছে গিয়ে বসল—তার পরে নিজে বাজিয়ে সুকণ্ঠে গান ধরল—

"পাখী এই যে গাহিলি গাছে,
চুপ দিলি কেন ঝোপে ডুবে গেলি যেমন এসেছি কাছে।"

শরৎ মুগ্ধ হয়ে শুনলে, এমন কণ্ঠ এমন সুর জীবনে সে কখনও শোনে নি। গড়শিবপুরের জঙ্গলে এমন গান কে কবে গেয়েছে? আহা, রাজলক্ষ্মীটা যদি আজ এখানে থাকত! রাজলক্ষ্মী কত দুঃখদিনের সঙ্গিনী, তাকে না শোনাতে পারলে যেন শরতের অর্দ্ধেক আমোদ বৃথা হয়ে যায়। সুখের দিনে তার কথা এত করে মনে পড়ে।

গান থেমে গেলে শরতের মুখ দিয়ে আপনা-আপনি বেরিয়ে গেল—কি চমৎকার!

মেয়েটি ওর দিকে চেয়ে হেসে হেসে কি একটা বলতে যাবে—এমন সময় একটি উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ে দোরের কাছে এসে বললে, আজ এত গানের আসর বসল এত সকালে, কে এসেছে গো তোমাদের বাড়ি? আমি বলি তুমি—

শরতের দিকে চোখ পড়াতে মেয়েটি হঠাৎ থেমে গেল। তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। ঘরে না ঢুকে সে দোরের কাছে রইল দাঁড়িয়ে।

মেয়েটির পরনে লাল রঙের জরিপাড় শাড়ী, খোঁপায় জরির ফিতে জড়ানো, নিখুঁত সাজ-গোজ, মুখে পাউডার। শরৎ ভাবলে, মেয়েটি হয়তো কোথাও নিমন্ত্রণ খেতে যাবে, কুটুম-বাড়ি, তাই এমন সাজগোজ করেছে।

প্রভাসের বৌদি বললে, এই যে গানের আসল লোক এসে গিয়েছে। কমলা, এঁকে তোমার গান শুনিয়ে দাও তো ভাল—

কমলা বিষণ্নমুখে বললে, তাই তো, আমার ঘরে যে এদিকে হরিবাবু এসে বসে আছে—

—আজ আবার দিন বুঝে সকাল সকাল—

প্রভাস ওকে চোখ টিপলে মেয়েটি চুপ করে গেল।

প্রভাসও বললে, না তোমার একখানা গান না শুনে আমরা ছাড়ছি নে—এদিকে এসো কমলা—

কমলাও হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান ধরলে। থিয়েটারি গান ও হালকা সুর—কলকাতার লোক বোধ এই সব গান পছন্দ করে। অন্য ধরনের গান তারা তেমন জানে না, কিন্তু গড়শিবপুরে ঠাকুরদেবতা, ইহকাল পরকাল, ভবনদী পার হওয়া, গৌরাঙ্গ ও নদীয়া ইত্যাদি সংক্রান্ত গানের প্রাদুর্ভাব বেশি। বাল্যকাল থেকে শরৎ বাবার মুখে, কৃষ্ণযাত্রার আসরে, ফকির-বোষ্টমের মুখে এই সব গান এত শুনে আসছে যে কলকাতায় প্রচলিত এই সব নূতন সুরের নূতন ধরনের গান তার ভারি সুন্দর লাগল। জীবনটা যে শুধু শ্মশান নয়, সেখানে আশা আছে, প্রাণ আছে, আনন্দ আছে—এদের গান যেন সেই বাণী বহন করে আনে মনে। শুধুই হতাশার সুর বাজে না তাদের মধ্যে।

শরৎ বললে, বড় চমৎকার গলা আপনার, আর একটা গাইবেন?

বিনা প্রতিবাদে মেয়েটি আর একটা গান ধরলে, গান ধরবার সময় ঘরের মেজেতে বসানো এক জোড়া বাঁয়াতবলার দিকে চেয়ে প্রভাসকে কি বলতে যাচ্ছিল, প্রভাস আবার চোখ টিপে বারণ করলে। আগের চেয়েও এবার চড়া সুর, দু-একটা ছোটখাটো তান ওঠালে গলায় মেয়েটি, দ্রুত তালের গান, শিরায় শিরায় যেন রক্ত নেচে ওঠে সুরে ও তালের মিলিত আবেদনে।

গান শেষ হলে প্রভাস বললে, কেমন লাগল শরৎদি ?

—ভারি চমৎকার প্রভাসদা, এমন কখনও শুনি নি—

কমলা এতক্ষণ পরে প্রভাসের বৌদিদির দিকে চেয়ে বললে, ইনি কে গা ?

প্রভাসের বৌদিদি বললে, ইনি ? প্রভাসবাবুদের দেশের—

শরৎ এ কথায় একটু আশ্চর্য্য হয়ে ভাবলে, প্রভাসদার বৌদিদি তাকে 'প্রভাসবাবু' বলছেন কেন, বা যেখানে 'আমার শ্বশুরবাড়ির দেশের' বলা উচিত সেখানে 'প্রভাসবাবুদের দেশের'ই বা বলছেন কেন ? বোধ হয় আপন বৌদিদি নন উনি।

কমলা বললে, বেশ, আপনার নাম কি ভাই ?

শরৎ সলজ্জ সুরে বললে, শরৎসুন্দরী—

—বেশ নামটি তো।

প্রভাস বললে, উনি এসেছেন কলকাতা শহর দেখতে। এর আগে কখনও আসেন নি—

কমলা আশ্চর্য্য হয়ে বললে, সত্যি ? এর আগে আসেন নি কখনও ?

শরৎ হেসে বললে, না।

—আপনাদের দেশ কেমন ?

—বেশ চমৎকার। চলুন না একবার আমাদের দেশে—

—যেতে খুব ইচ্ছে করে—নিয়ে চলুন না—

—বেশ তো, আপনি আসুন, উনি আসুন—

মেয়েটি আর একটি গান ধরলে। এই মেয়েটির গলার সুরে শরৎ সত্যিই মুগ্ধ হয়ে গেল—সে এমন সুকণ্ঠী গায়িকার গান জীবনে কখনও শোনে নি—প্রভাসের বৌদিদির বয়স হয়েছে, যদিও তাঁর গলা ভালো তবুও এই অল্পবয়সী মেয়েটির নবীন, সুকুমার, কণ্ঠস্বরের তুলনায় অনেক খারাপ। শরতের ইচ্ছে হল, কমলার সঙ্গে ভাল করে আলাপ করে।

গান শেষ করে কমলা বললে, আসুন না ভাই, আমাদের ঘরে যাবেন ?

—চলুন না দেখে আসি—

প্রভাস তাড়াতাড়ি বলে উঠল—না, উনি এখনই চলে যাবেন, বেশীক্ষণ থাকবেন না—এখন থাক্‌গে—

কিন্তু শরৎ তবুও বললে, আসি না দেখে প্রভাসদা ? এখুনি আসছি—

প্রভাস বিব্রত হয়ে পড়ল যেন। সে জোর করে কিছু বলতেও পারে না অথচ কমলার সঙ্গে শরৎ যায় এ যেন তার ইচ্ছে নয়। এই সময় হঠাৎ একটা লোক ঘরে ঢুকে অস্পষ্ট ও জড়িত স্বরে বলে উঠল—আরে এই যে, কমল বিবি এখানে বসে, আমি সব ঘর ঢুঁড়ে বেড়াচ্ছে বাবা—বলি—প্রভাসবাবুও যে আজ এত সকালে—

প্রভাস হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে উঠে তাকে কি একটা বলে তাড়াতাড়ি বাইরে নিয়ে গেল। লোকটার ভাবভঙ্গি দেখে শরৎ আশ্চর্য্য হয়ে ভাবলে—লোকটা পাগল নাকি ? অমন কেন ?

সে প্রভাসের বৌদিদিকে বললে, উনি কে ?

—উনি—এই হ'ল গে—আমাদের বাড়ির—বাইরের ঘরে থাকেন—

—কমলার সম্পর্কে কে ?

—সম্পর্কে—এই ঠাকুরপো—

কমলার ঠাকুরপো কি রকম শরৎ ভাল বুঝল না। লোকটির বয়স চল্লিশের কম নয়—তা হলে কমলার দোজবরে কি তেজবরে স্বামীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে নাকি ? না হলে অত বড় ঠাকুরপো হয় কি করে ? কমলার ওপর কেমন একটু করুণা হ'ল শরতের। আহা, এমন মেয়েটি ! কমলাও একটু অবাক হয়ে প্রভাসের বৌদিদির দিকে চাইলে। সে যেন অনেক কিছুই বুঝতে পারছে না।

শরৎ জিজ্ঞেস করলে, আপনি প্রভাসদার কে হন ?

কমলা কিছু বলবার আগে প্রভাসের বৌদিদি উত্তর দিলে, ও আমার পিসতুতো বোন হয়। এখানে থেকে পড়ে।

হঠাৎ শরৎ কমলার সিঁথির দিকে চাইলে। সত্যই তো, ওর এখনও বিয়ে হয় নি। এতক্ষণ সে লক্ষ্য করে নি। তবে আবার ওর ঠাকুরপো কি রকম হ'ল। শরতের বড় ইচ্ছে হচ্ছিল এসব গোলমেলে সম্পর্কের একটা মীমাংসা সে করে ফেলে—এদের প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে ! কিন্তু দরকার কি পরের বাড়ির খুঁটিনাটি কথা জিজ্ঞেস করে।

একটু পরে প্রভাস বাইরে থেকে ডাকলে, কমলা, তোমায় ডাকছেন—শুনে যাও—

কমলা চলে যাবার আগে হাত তুলে ছোট্ট একটা নমস্কার করে শরৎকে বললে, আচ্ছা, আসি ভাই—

—কেন, আপনি আর আসবেন না ?

—কি জানি যদি কোন কাজ পড়ে—

—কাজ সেরে আসবেন—যাবার আগে দেখা করেই যাবেন—

—আপনি কতক্ষণ আছেন আর ?

প্রভাসের বৌদি বললেন, উনি এখনও ঘণ্টাখানেক থাকবেন—

কমলা বললে, যদি পারি আসবো তার মধ্যে—

ও চলে গেলে শরৎ প্রভাসের বৌদিদির দিকে চেয়ে বললে, বেশ মেয়েটি—

—কমলা তো ? হ্যাঁ ওকে সবাই পছন্দ করে—

—বড় চমৎকার গলা—

—গানের মাস্টার এসে গান শিখিয়ে যায় যে ! এখন বোধ হয় সেই জন্যেই উঠে গেল। আপনি বসুন চায়ের দেখি কি হ'ল—

শরৎ ব্যস্ত হয়ে বললে, না না, আপনি যাবেন না। আমি চা খেয়ে বেরিয়েছি—

—বেরুলেন বা। তা কখনও হয় ? একটু মিষ্টিমুখ—

—না না—আমি এসময় কিছুই খাই নে—

—বসুন, আমি আসছি।

—বসছি কিন্তু খাওয়ার যোগাড় কিছু করবেন না যেন। আমি সত্যিই কিছু খাব না।

প্রভাস বললে, থাক বরং বৌদি, উনি এসময় কিছু খান না। ব্যস্ত হতে হবে না।

এই সময় অরুণ ও গিরীন বলে সেই লোকটা ঘরে ঢুকল। শরৎ হাসিমুখে বললে, এই যে অরুণবাবু আসুন—

—দেখুন মাথায় টনক আছে আমার। কি করে জানলুম বলুন আপনি এখানে এসেছেন—

গিরীন প্রভাসকে বাইরে ডেকে নিয়ে বললে, কি ব্যাপার ?

প্রভাস বিরক্ত মুখে বললে, আরে, ওই হরি সা না কি ওর নাম, সব মাটি করে দিয়েছিল

আর একটু হলে—এমন বেফাঁস কথা হঠাৎ বলে ফেললে—আমি বাইরে নিয়ে গিয়ে ধমকে দিলাম আচ্ছা করে। ভাগ্যিস পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, কিছু বোঝে না তাই বাঁচোয়া। কমলা বিবি আবার ঘর দেখাতে নিয়ে যাচ্ছিল ওর, কত কষ্টে থামাই। দেখলেই সব বুঝে না ফেলুক, সন্দেহ করতো।

—তার পর ?

—তার পর তোমরা তো এসেছ, এখন পথ বাংলাও—

—লেমনেড্ খাওয়াতে পারবে না ?

—চা পর্যন্ত খেতে চাইছে না—তা লেমনেড্।

—ও এখানে থাকুক—চলো আমরা সব এখান থেকে সরে পড়ি।

—মতলবটা বুঝলাম না।

—এখানে দু-দিন লুকিয়ে রাখো। তার পর ওর বাবা ওকে আর নেবে না—ওর গ্রামে রটিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে দাও যে কোথায় ওকে পাওয়া গিয়েছে। পাড়াগাঁয়ের লোক, সমাজের ভয়ে ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

—তাই করো—কিন্তু মেয়েটিকে তুমি জানো না। যত পাড়াগেঁয়ে ভীতু মেয়ে ভাবছো, অতটা নয় ও। বেশ তেজী আর একগুঁয়ে মেয়ে। তোমার যা মতলব, ও কতদূরে গড়াবে আমি বুঝতে পারছি নে। চেষ্টা করে দেখতে পারো।

—তুমি আমার হাতে ছেড়ে দাও, দেখ আমি কি করি—টাকা কম খরচ করা হয় নি এজন্যে—মনে নেই ?

—হেনাকে ডাকো একবার বাইরে। হেনার সঙ্গে পরামর্শ করো। তাকে সব বলা আছে, সে একটা পথ খুঁজে বার করবেই। কমলাকেও বোলো।

ওর বৌদিদি শরৎকে পাশের ঘরের সাজসজ্জা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। একটা খুব বড় ড্রেসিং টেবিল দেখে শরৎ খুশী হয়ে বললে, বেশ জিনিসটা তো ? আয়নাখানা বড় চমৎকার, এর দাম কত ভাই ?

—একশো পঁচিশ টাকা—

—আর এই খাটখানা ?

—ও বোধ হয় পড়েছিল সত্তর টাকা—আমার ধীরেনবাবু—মানে আমার গিয়ে বাপের বাড়ির সম্পর্কে ভাই—সেই দিয়েছিল।

—বিয়ের সময় দিয়েছিলেন বুঝি ? এ সবই তা হলে আপনার বিয়ের সময় বরের যৌতুক হিসেবে—

—হ্যাঁ তাই তো।

—আপনার স্বামী এখনো বাড়ি আসেন নি, আফিসে কাজ করেন বুঝি ?

—হ্যাঁ।

—আপনার শাশুড়ী বা আর সব—ওঁদের সঙ্গে আলাপ হ'ল না।

—এ বাড়িতে আর কেউ থাকেন না। এ শুধু মানে আমাদের—উনি আর আমি—

—আলাদা বাসা করেছেন বুঝি ? তা বেশ।

—হ্যাঁ। আলাদা বাসা। আফিস কাছে হয় কিনা। এ অনেক সুবিধে।

—তা তো বটেই।

—আপনি এইবার কিছু মুখে না দিলে সত্যিই ভয়ানক দুঃখিত হবো ভাই।

বারবার খাওয়ার কথা বলাতে শরৎ মনে মনে বিরক্ত হ'ল। সে যখন বলছে খাবে না, তখন তাকে পীড়াপীড়ি করার দরকার কি এদের ? সে যে বিধবা মানুষ, তা এরা নিশ্চয়ই

বুঝতে পেরেছে, বিধবা মানুষ সব জায়গায় সব সময় খায় না—বিশেষ করে সে পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা, তার অনেক কিছু বাছবিচার থাকতে পারে, সে জ্ঞান দেখা যাচ্ছে— কলকাতার লোকের একেবারেই নেই।

শরৎ এবার একটু দৃঢ়স্বরে বললে, না আমি এখন কিছু খাবো না, কিছু মনে করবেন না আপনি।

প্রভাসের বৌদিদি আর কিছু বললে না এ বিষয়ে। শরৎ ভাবলে, এদের সঙ্গে ব্যবহারে হয়তো সে ভদ্রতা বজায় রেখে চলতে পারবে না, কিন্তু কি করবে সে, কেন এ নিয়ে পীড়াপীড়ি করা? খাবে না বলেছে ব্যস্ মিটে গেল—ওদের বোঝা উচিত ছিল।

—আরও দু-পাঁচ মিনিট শরৎকে এ ছবি, ও আলমারি দেখানোর পরে প্রভাসের বৌদিদি ওর দিকে চেয়ে বললে, ভাল, একটা অনুরোধ রাখো না কেন—আজ এখানে থেকে যাও রাতটা।

শরৎ আশ্চর্য্য হয়ে বললে, এখানে? কি করে থাকবো?

—কেন, এই আলাদা ঘর রয়েছে। উনি বোধ হয় আজ আর আসবেন না। এক-একদিন রাত্রে কাজ পড়ে কিনা! সারারাত আসতে পারেন না। একলা থাকতে হবে, তার চেয়ে তুমি থাকো ভাই, দুজনে বেশ গল্প-গুজবে রাত কাটিয়ে দেবো, তোমাকে আমার বড় ভাল লেগেছে।

কথা শেষ করে প্রভাসের বৌদিদি শরতের হাত ধরে আবদারের সুরে বললে, কথা রাখো ভাই, কেমন তো? তা হলে প্রভাসবাবুকে—ইয়ে ঠাকুরপোকে বলে দিই আজ গাড়ি নিয়ে চলে যাক্—তাই করি, বলি ঠাকুরপোকে।

শরৎ বিষণ্ণ মনে বলে উঠল—না না, তা কি করে হবে? আমি থাকতে পারবো না। বাবার পাশের বাড়িতে চাটুজ্জে মহাশয়ের ওখানে আজ রাত্রে নেমন্তন্ন আছে, তাই রান্না নেই, এতক্ষণ আছি সেই জন্যে। নইলে কি এখনও থাকতে পারতাম! বাবা একলাটি থাকবেন, তা কখনো হয়? তা ছাড়া তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠবেন যে! আমি তো আর বলে আসি নি যে কারো বাড়ি থাকবো, ফিরবো না। আর সে এমনিই হয় না। আপনার স্বামী যদি এসেই পড়েন—হঠাৎ—

প্রভাসের বৌদিদি বললে, এসে পড়লে কিছুই নয়। তিনটে ঘর রয়েছে এখানে, তোমাকে ভাই এই ঘরে আলাদা বিছানা করে দেবো, কোনো অসুবিধে হবে না—থাকো ভাই, প্রভাসকে বলি গাড়ি নিয়ে চলে যাবার জন্যে। বোসো তুমি এখানে—

—না, সে হয় না! বাবাকে কিছু বলা হয় নি, তিনি ভীষণ ভাববেন—

—প্রভাস কেন গাড়িতে করে গিয়ে বাবার কাছে খবর দিয়ে আসুক না যে তুমি আমাদের এখানে থাকবে—তা হলেই তো সব চেয়ে ভাল হয়—তাই বলি—এই বেশ সব দিক দিয়ে সুবিধা হ'ল—তোমার পায়ে পড়ি ভাই, এতে অমত করো না।

শরৎ পড়ে গেল বিপদে। একদিকে তার অনুপস্থিতিতে তার বাবার সুবিধে অসুবিধের ব্যাপার, অন্যদিকে প্রভাসের বৌদিদির এই সনির্বন্ধ অনুরোধ - কোন্ দিকে যে যায়? অবিশ্যি একটা রাত এখানে কাটানো আর তেমন কি, সম্ভবতঃ ওর স্বামী আজ আফিসের কাজের চাপে বাড়ি ফিরতে পারবেন না বলেই ওকে সঙ্গে রাখবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছে—শোয়ারও অসুবিধে কিছু নেই, থাকলেই হ'ল—কিন্তু একটা বড় কথা এই যে, সে বাড়ি না ফিরলে বাবা কি ভাবনাতেই পড়ে যাবেন! তবে বাবাকে যদি প্রভাসদা এখুনি খবর দিয়ে দেন—সে আলাদা কথা।

সে সাতপাঁচ ভেবে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে কমলা এসে ঘরে ঢুকে বললে,

বা রে, এখানে সব যে, আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি —

প্রভাসের বৌদিদি উৎফুল্ল হয়ে উঠে বললে, বেশ সময়ে এসে পড়েছ কমলা—আমি ওকে বোঝাচ্ছি ভাই যে আজ রাতটা এখানে থেকে যেতে। উনি আজ আফিস থেকে আসবেন না, জানোই তো—দুজনে বেশ একসঙ্গে গল্পগুজবে - কি বলো ?

প্রভাস এবং তার দলবল একটু আগে বাইরে কমলার সঙ্গে কি কথা বলেছে। সেই জন্যই তার এখানে আসা, যতদূর মনে হয়।

সে বললে, আমিও তাই বলি ভাই, বেশ সবাই মিলেমিশে—একটা রাত আপনাকে নিয়ে আমোদ করা গেল—

প্রভাসের বৌদিদি বললে, আর বড্ড ভাল লেগেছে তোমাকে তাই বলছি। কি বলো কমলা ?

—তা আর বলতে ! আমি তো ভাবছি একটা কিছু সম্বন্ধ পাতাবো—

এই মেয়েটিকে সত্যিই শরতের খুব ভাল লেগেছিল—বয়সে এ তার সঙ্গিনী রাজলক্ষ্মীর চেয়ে কিছু বড় হবে, দেখতে শুনতে রূপসী মেয়ে বটে। সকলের ওপরে ওর গান গাইবার গলা···অনেক জায়গায় গান শুনেছে শরৎ···কিন্তু এমন গলার স্বর —

শরৎ আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠল, বেশ সম্বন্ধ পাতাও না ভাই—আমি ভারী সুখী হবো—

—কি সম্বন্ধ পাতাবেন বলুন ?

—আপনি বলুন—

প্রভাসের বৌদিদি বললে, গঙ্গাজল ? পছন্দ হয় ?

কমলা উৎসাহের সুরে ঘাড় নেড়ে বললে, বেশ পছন্দ হয়। আপনারও হয়েছে তো ?··· তবে তাই—কিন্তু আজ রাত্রে —

শরৎ আপন মনেই বলে গেল তোমাকে ভাই আমাদের দেশে নিয়ে যাবো, যাবে তো ? তোমার বয়সী একটি মেয়ে আছে রাজলক্ষ্মী, বেশ মেয়ে। আলাপ করিয়ে দেবো। আমাদের বাড়ি গিয়ে থাকবে। তবে হয়তো অত অজ-পাড়াগাঁ তোমার ভাল লাগবে না—

—কেন লাগবে না, খুব লাগবে—আপনাদের বাড়ি থাকবো —

—জানো না তাই বলছো। আমাদের বাড়ি তো গাঁয়ের মধ্যে নয়—গাঁয়ের বাইরে জঙ্গলের মধ্যে —

কমলা আগ্রহের সুরে বললে, কেন, জঙ্গলের মধ্যে কেন ?

—আগে বড় বাড়ি ছিল, এখন ভেঙে-চুরে জঙ্গল হয়ে পড়েছে, যেমনটি হয়—

— বাঘ আছে সেখানে ?

শরৎ হেসে বললে, সব আছে, বাঘ আছে, সাপ আছে, ভূতও আছে—

কমলা ও প্রভাসের বৌদিদি একসঙ্গে বলে উঠল—ভূত ! আপনি দেখেছেন ?

—না, কখনো দেখি নি, ওসব মিথ্যে কথা। কিংবা চলো তোমরা একদিন, ভূত দেখতে পাবে।

প্রভাসের বৌদিদি বললে, আচ্ছা, সে জঙ্গলে না থেকে কলকাতায় এসে থাকো না কেন ভাই। এখানে কত আমোদ-আহ্লাদ—তুমি এখানে থাকলে কত মজা করবো আমরা—তোমাকে নিয়ে মাসে মাসে আমরা থিয়েটারে যাবো, বায়স্কোপে যাবো—খাবো দাবো—কত আমোদ ফুর্তি করা যাবে। গঙ্গার ইস্টিমারে বেড়াতে যাবো, যাও নি কখনো বোধ হয় ? চমৎকার বাগান আছে, ওই শিবপুরের দিকে, সেখানে কত গাছপালা —

শরতের হাসি পেলো। গাছপালা দেখতে ইস্টিমারে চেপে গঙ্গা বেয়ে কোথায় যেন যেতে হবে কতদূরে কলকাতায় এসে—তবে সে গাছপালা দেখতে পাবে। হায় রে গড়শিব-

পুরের জঙ্গল—এরা তোমাকে দেখে নি কখনো তাই এমন বলছে। সেখানে গাছ দেখতে রেলেও যেতে হয় না, ইস্টিমারেও যেতে হয় না—ঘুম ভেঙে উঠে চোখ মুছে জানালা দিয়ে. চাইলেই দেখতে পাবে জঙ্গলের ঠ্যালা।

কমলাও বললে, তাই করুন—কলকাতায় চলে আসুন, কেমন থাকা যাবে—

প্রভাসের বৌদিদি বললে, এই আমাদের বাড়িতেই থাকবে ভাই! মানে—আমাদের বাড়ির কাছেও বাসা করে দেওয়া যাবে এখন। এমনি সাজিয়ে গুজিয়ে বেশ চমৎকার করে দেওয়া যাবে। কি ভাই সেখানে পড়ে আছ জঙ্গলে, কলকাতায় এসে বাস করে দেখো ভাই, আমোদ ফুর্তি কাকে বলে বুঝতে পারবে। আমাদের সঙ্গে থাকবে, একসঙ্গে বেড়াবো, দেখবো শুনবো, সে কি রকম মজা হবে বলো দিকি ভাই? তোমার মত মানুষ পেলে তো—

কমলাও উৎসাহের সুরে বললে, আপনাকে পেয়ে আর ছাড়তে ইচ্ছে করছে না বলেই তো—

শরতের খুব ভাল লাগছিল ওদের সঙ্গ। এমন মন-খোলা, আমুদে, তরুণী মেয়েদের সঙ্গ পাড়াগাঁয়ে মেলে না, এক আছে রাজলক্ষ্মী, কিন্তু সেও এদের মত নয়—এদের যেমন সুশ্রী চেহারা, তেমনি গলার সুর, এদের সঙ্গে একত্রে বাস করা একটা ভাগ্যের কথা। কিন্তু ওরা যা বলছে, তা সম্ভব হবে কি করে? এরা আসল ব্যাপারটা বোঝে না কেন?

সে বললে, ভাল তো আমারও লেগেছে আপনাদের। কিন্তু বুঝছেন না? কলকাতায় বাবা থাকবেন কি করে? তেমন অবস্থা নয় তো তাঁর? এই হ'ল আসল কথা।

প্রভাসের বৌদিদি হেসে বললে, এই! এজন্যে কোনো ভাবনা নেই তোমার ভাই। এখন দিনকতক আমাদের বাসাতে থাকো না—তার পর বাসা একটা দেখে শুনে নিলেই হবে এখন। আর তোমার বাবা? উনি যে অফিসে কাজ করেন, সেখানে একটা কাজটাজ—

—সে কাজ বাবা করতে পারেন না। ইংরিজি জানেন না—উনি জানেন গান-বাজনা, বেশ ভাল বেহালা বাজাতে পারেন—

প্রভাসের বৌদিদি কথাটা যেন লুফে নিয়ে বলল, বেশ, বেশ—তবে তো আরও ভাল। নরেশবাবু থিয়েটারেই তো কাজ করেন—তিনি ইচ্ছে করলে—

শরৎ বললে, নরেশবাবু কে?

—নরেশবাবু!—এই গিয়ে—ও'র একজন বন্ধু। আমাদের বাসায় প্রায়ই আসেন-টাসেন কিনা।

শরৎ একটুখানি কি ভেবে বললে, কিন্তু বাবা কি গাঁ ছেড়ে থাকতে পারবেন? আমার শহর দেখা শেষ হয় নি বলে তিনি এখনও বাড়ি যাবার পেড়াপীড়ি করছেন না—নইলে এতদিন উত্যক্ত করে তুলতেন না আমাকে! নিতান্ত চক্ষুলজ্জায় পড়ে কিছু বলতে পারছেন না। তিন টিকবেন শহরে? তবেই হয়েছে!

প্রভাসের বৌদিদি বললে, আচ্ছা, এক কাজ করো না কেন?

—কি?

—তুমিই কেন থাকো না এখন দিনকতক? এই আমাদের সঙ্গেই থাকো। তোমার বাবা ফিরে যান দেশে, এর পরে এসে তোমাকে নিয়ে যাবেন। আমাদের বাড়িতে আমাদের বন্ধু হয়ে থাকবে, টাকাকড়ির কোনো ব্যাপার নেই এর মধ্যে—তোমায় মাথায় করে রেখে দেবো ভাই। বড্ড ভাল লেগেছে তোমাকে, তাই বলছি। কি বলিস্ কমলা? তুই কথা বলছিস্ নে যে—বল্ না তোর গঙ্গাজলকে।

কমলা বললে, হ্যাঁ, সে তো বলছিই—

প্রভাসের বৌদিদি বললে, সে-সব গেল ভবিষ্যতের কথা। আপাততঃ আজ রাত্রে তুমি

এখানে থাকো। প্রভাস গিয়ে খবর দিয়ে আসুক তোমার বাবাকে। রাজী ?

শরৎ দ্বিধার সঙ্গে বললে, আজ ? তা—না ভাই আজ বরং আমায় ছেড়ে দাও—কাল বাবাকে বলে—

—তাতে কি ভাই ! প্রভাস ঠাকুরপো গিয়ে এখুনি বলে আসছে। যাবে আর আসবে —ডাকি প্রভাসবাবুকে –তুমি আর অমত কোরো না। বসো আমি আসছি—তুমি থাকলে কমলাকে দিয়ে সারারাত গান গাওয়াবো।

শরৎ এমন বিপদে কখনো পড়ে নি।

কি সে করে এখন ? এদের অনুরোধ এড়িয়ে চলে যাওয়াও অভদ্রতা—যখন এতটাই পীড়াপীড়ি করছে তার থাকার জন্যে, থাকলে মজাও হয় বেশ –কমলার গান শুনতে পাওয়া যায়।

কিন্তু অন্যদিকে বাবাকে বলে আসা হয় নি, বাবা কি মনে করতে পারেন। তবে প্রভাসদা যদি মোটরে করে গিয়ে বলে আসে, তবে অবিশ্যি বাবার ভাববার কারণ ঘটবে না। তবুও কি তার নিজের মন তাতে শান্তি পাবে ? কোথায় বাগানের মধ্যে নির্জন বাড়ি, সেখানে একলাটি পড়ে থাকবেন বাবা, রাত্রে যদি কিছু দরকার পড়ে তখন কাকে ডাকবেন, কে তাঁকে দেখে ?

সে ইতস্ততঃ করে বললে, না ভাই, আমার থাকবার জো নেই –আজ ছেড়ে দাও, বাবাকে বলে কাল আসবো।

হঠাৎ প্রভাসের বৌদিদি উঠে হাত বাড়িয়ে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে বললে, যাও দিকি কেমন করে যাবে ভাই ? কক্ষনও যেতে দেবো না—কই, যাও তো কেমন করে যাবে ? এমন আমোদটা আমাদের মাটি করে দিয়ে গেলেই হ'ল !

শরৎ তার কাণ্ড দেখে হেসে ফেললে।

এমন সময় বাইরে থেকে প্রভাসের গলা শুনতে পাওয়া গেল—ও বৌদিদি—

প্রভাসের বৌদিদি বললে, দাঁড়াও ভাই আসছি—ঠাকুরপো ডাকছে –বোধ হয় চা চান, বন্ধু-বান্ধব এসেছে কিনা ? ঘন ঘন চা—

সে বাইরে যেতেই প্রভাস তাকে বারান্দার ও-প্রান্তে নিয়ে গিয়ে বললে, কি হ'ল ?

তার সঙ্গে অরুণ ও গিরীনও ছিল। গিরীন ব্যস্তভাবে বললে, কতদূর কি করলে হেনা?

—বাবাঃ –সোজা একগুঁয়ে মেয়ে ! কেবল বাবা আর বাবা। এত বোঝাচ্ছি, এত কাণ্ড করছি এখনও মাথা হেলায় নি—কমলা আবার চোক মেরে চুপ করে রয়েছে। আমি একা বকে বকে মুখে বোধ হয় ফেনা তুলে ফেললাম। ধন্যি মেয়ে যা হোক। যদি পারি, আমায় একশো কিন্তু পুরিয়ে দিতে হবে। কমলা কিছুই করছে না ওর টাকা –

গিরীন বিরক্তির সুরে বললে, আরে দূর, টাকা আর টাকা ! কাজ উদ্ধার করো আগে—একটা পাড়াগেঁয়ে মেয়েকে সন্দে থেকে ভুলোতে পারলে না—তোমরা আবার বুদ্ধিমান, তোমরা আবার শহুরে—

প্রভাসের বৌদিদি মুখনাড়া দিয়ে বলে উঠল—বেশ, তুমি তো বুদ্ধিমান, যাও না, ভজাও গে না, কত মুরোদ। তেমন মেয়ে নয় ও –আমি ওকে চিনেছি। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি, আমরা চিনি মেয়েমানুষ কে কি রকম। ও একেবারে বনবিছুটি–তবে পাড়াগাঁ থেকে এসেছে, আর কখনো কিছু দেখে নি—তাই এখনও কিছু সন্দেহ করে নি, নইলে ওকে কি যেমন তেমন মেয়ে পেয়েছ ?

প্রভাস বিরক্ত হয়ে বললে, যাক্, আর এক কথা বার বার বলে কি হবে ? সোজা কাজ হলে তোমাকেই বা আমরা টাকা দিতে যাবো কেন হেনা বিবি, সেটাও তো ভাবতে হয়—

হেনা বললে, এবার যেন একটু নিমরাজি গোছের হয়েছে – দেখি —

হেনা ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল এবং মিনিট পাঁচেক পরেই হাসিমুখে বার হয়ে এসে বললে, কই ফেল তো দেখি টাকা ?

ওরা সবাই ব্যস্ত ও উৎসুক ভাবে বলে উঠল—কি হ'ল। রাজী হয়েছে ?

হেনা হাসিমুখে ঘাড় দুলিয়ে বাহাদুরির সুরে বললে, এ কি যার তার কাজ ? এই হেনা বিবি ছিল তাই হ'ল। দেখি টাকা ? আমি যাকে বলে—সেই যাই পাতায় পাতায় বেড়াই—তাই—

গিরীন বিরক্তির সুরে বললে, আঃ, কি হ'ল তাই বলো না ? গেলে আর এলে তো ?

—আমি গিয়েই বললাম, ভাই, প্রভাস ঠাকুরপোকে বলে এলাম তোমার বাবাকে খবর দিতে। সে গাড়ি নিয়ে এখুনি যাচ্ছে বললে। আমি জোর করে কথাটা বলতেই আর কোন কথা বলতে পারলে না। কেবল বললে, প্রভাসদা যাবার আগে আমার সঙ্গে যেন দেখা করে যায়—বাবাকে কি বলতে হবে বলে দেবো—কমলা কিন্তু কিচ্ছু করছে না, মুখ বুজে গিন্নি-শকুনির মত বসে আছে।

গিরীন বললে, না প্রভাস, তুমি এখান থেকে সরে পড়ো, হেনা গিয়ে বলুক তুমি চলে গিয়েছ—তুমি এসময় সামনে গেলে একথাও বলতে পারে যে আমিও ওই গাড়িতে বাবার কাছে গিয়ে নিজেই বলে আসি। তা ছাড়া তোমার চোখমুখ দেখে সন্দেহ করতে পারে—হেনার মত তুমি পারবে না—ও হ'ল অ্যাকট্রেস্, ও যা পারবে, তা তুমি আমি পারতে—

হেনা বললে, বঙ্গরস থিয়েটারে আজ পাঁচটি বছর কেটে গেল কি মিথ্যে মিথ্যে ? ম্যানেজার সেদিন বলেছে, হেনা বিবি, তোমাকে এবার ভাবছি সীতার পার্ট দেবো—সেদিন আমার রানীর পার্ট দেখে ও কি ওই কমুলির কাজ ? অনেক তোড়জোড় চাই—

গিরীন বললে, থাক্ ও সব কথা, কে কোথা দিয়ে শুনে ফেলবে। এত পরিশ্রম সব মাটি হবে। খসে পড়ো প্রভাস—তোমাকে আর না দেখতে পায়—মন আবার ঘুরে যেতে কতক্ষণ, যদি বলে বসে—না, আমি প্রভাসদার মোটরে বাবার কাছে যাবো। আর কে যাচ্ছে এখন এত রাত্রে সেই পাগলা বুড়োটার কাছে ?

প্রভাস ইতস্ততঃ করে বললে, তবে আমি যাই ?

—যাও—তোমায় আর না দেখতে পায় –পায়ের বেশী শব্দ করো না।

—তোমরা ? তোমাদেরও এখানে থাকা উচিত হবে না, তা বুঝছ ?

—আমরা যাচ্ছি। তুমি আগে যাও—কারণ তুমি চলে গেলে ওর হাতের তীর ছাড়া হয়ে যাবে, আর তো ও মত বদলাতে পারবে না ?

হেনা বললে, আজ রাত্তিরটা কোনো রকম বেতাল না দেখে ও। তোমরা ওই হরি সা লোকটাকে আগলে রাখো—

অরুণ বললে, কোথায় সে ?

প্রভাস বললে, আমি তাকে কমুলির ঘরে বসিয়ে রেখে এসেছি। কিন্তু এখন যা আছে, আর দু-ঘণ্টা পরে তো থাকবে না। ওকে চেনো তো ? চীনেবাজারের অত বড় দোকানটা ফেল করেছে এই করে। বোকা তাই রক্ষে। ওকে সরিয়ে দাও বাবা, আজ রাত্তিরের মত—

গিরীন বললে, যাও না তুমি ? কেন দাঁড়িয়ে বক্‌বক্ করছো ?

প্রভাস চলে যেতে উদ্যত হলে গিরীন তাকে বললে, কোথায় থাকবে ?

—আজ বাড়ি চলে যাই —বাবা সন্দেহ করবেন, বেশী রাত্তিরে বাড়ি ফিরলে —

—ভাল কথা, তোমার বাবার সঙ্গে তো ওর বাবার খুব আলাপ, সেখানে গিয়ে সন্ধান নেবে না তো বুড়ো ?

প্রভাস হেসে বুড়ো আঙ্গুল নেড়ে বললে—হুঁ হুঁ বাবা—সে গুড়ে বালি। অত কাঁচা ছেলে আমি নই। বাবা তো বাবা, ব্যাড়ির কেউই ঘুণাক্ষরেও কিছু জানে না। বাবাও কেদারকে ভুলে গিয়েছেন, দুজনের দেখাশুনো নেই কতকাল। দেখলে কেউ হঠাৎ হয়তো চিনতে পারবে না। তার ওপর আমাদের বাড়ি কেদার বুড়ো জানবে কি করে? ঠিকানা জানে না, নম্বর জানে না—কোনদিন শোনেও নি। আর এ কলকাতা শহর, বুড়ো না চেনে বাড়ি না চেনে রাস্তাঘাট। সেদিকে ঠিক আছে।

প্রভাস সিঁড়ি দিয়ে নেমে নিচে গেল।

অরুণ একটু দ্বিধার সুরে বললে, কাজটা তো এক রকম যা হয় এগুলো—শেষে পুলিসের কোন হাঙ্গামায় পড়বো না তো?

—কিসের পুলিসের হাঙ্গামা? নাবালিকা তো নয়, ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের ধাড়ি—আমরা প্রমাণ করবো ও নিজের ইচ্ছেয় এসেছে। ওকে এ জায়গায় কেন পাওয়া গেল এ কথার কি জবাব দেবে ও? আমি বুঝি নি বললে কেউ বিশ্বাস করবে? নেকু?

—তা ধরো ও পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, সত্যিই ওর বয়েস হয়েছে বটে, কিন্তু এসব কিছু জানে না, বোঝে না। দেখতেই তো পেলে—একটু সন্দেহ জাগলে ওকে রাখতে পারত হেনা? তা জাগে নি। এমন জায়গাও কখনো দেখে নি, জানে না। যদি এই সব কথা প্রমাণ হয় আদালতে?

গিরীন আত্মম্ভরিতার সুরে বললে, শুধু দেখে যাও আমি কি করি। গিরীন কুণ্ডুকে তোমরা সোজা লোক ঠাউরো না—

অরুণ বললে, আর একটা কথা। সে না হয় বুঝলাম—কিন্তু ওসব ঘরের মেয়ে, যখন সব বুঝে ফেলবে, তখন আত্মহত্যা করে বসে যদি? ওরা তা পারে।

গিরীন তাচ্ছিল্যের সুরে বললে, হ্যাঁ—রেখে দাও ওসব। মরে সবাই—দেখা যাবে পরে—

—আজ চলো আমরা এখান থেকে যাই—

—এখন?

—আমার মনে হয় তাই উচিত। কোনো সন্দেহ না জাগে মনে—এটা যেন মনে থাকে।

হেনাকে সন্তর্পণে বাইরে আনিয়ে গিরীন বললে, আমরা চলে যাচ্ছি হেনা বিবি। রেখে গেলাম কিন্তু—

হেনা বললে, আমি বাবু পুলিসের হ্যাঙ্গামে যেতে পারবো না, তা বলে দিচ্ছি। কাল দুপুর পর্যন্ত ওকে এখানে রাখা চলবে। তারপর তোমরা কোথায় নিয়ে যাবে যেও—আমার টাকা চুকিয়ে দিয়ে।

গিরীন বললে, কেন, আবার নতুন কথা বলছো কেন? কি শিখিয়ে দিয়েছিলাম?

—সে বাপু হবে না। ও বেজায় একগুঁয়ে মেয়ে। আগে যা ভেবেছিলাম তা নয়—ও শুধু বুঝতে পারে নি তাই এখানে রয়ে গেল। নইলে রসাতল বাধাত এতক্ষণ। আর একটা কথা কি, কিছুতেই খাচ্ছে না, এত করে বলছি, নানারকম ছুতো করছে, পাড়াগাঁয়ের বিধবা মানুষ, ছুঁচিবাই গো, ছুঁচিবাই। কেন খাচ্ছে না আমি আর ওসব বুঝি নে? আমি মানুষ চরিয়ে খাই—

অরুণ বললে, মানুষ চরাও নি কখনো হেনা বিবি, ভেড়া চরিয়েছ। এবার মানুষ পেয়েছ, চরাও না দেখি। বুঝলে?

ওরা দুজনে নিচে নেমে গেল।

চাটুয্যে মশায়ের বাড়ির গানের আসর ভাঙলো রাত এগারোটায়। তার পরে খাওয়ার

জায়গা হ'ল, প্রায় ত্রিশজন লোক নিমন্ত্রিত, আহারের ব্যবস্থাও চমৎকার। যেমন আয়োজন, তেমনি রান্না। কেদার এক সময়ে খেতে পারতেন ভালই, আজকাল বয়স হয়ে আসছে,- তেমন আর পারেন না—তবুও এখনও যা খান, তা একজন ওই বয়সের কলকাতার ভদ্রলোকের বিস্ময় ও ঈর্ষার বিষয়।

বাড়ির কর্ত্তা চাটুয্যে মশায় কেদারের পাতের কাছে দাঁড়িয়ে তদারক করে তাঁকে খাওয়ালেন। আহারাদির পরে বিদায় চাইলে বললেন, আবার আসবেন কেদারবাবু, পাশেই আছি—আমরা তো প্রতিবেশী। আপনার বাজনার হাত ভারি মিঠে, আমার স্ত্রী বলছিলেন—উনি কে? আমি বললাম, আমাদের পাশের বাগানেই থাকেন—এসেছেন বেড়াতে। আহা, আজ যদি আপনার মেয়েটিকে আনতেন—বড় ভাল হ'ত, আমার স্ত্রী বলছিলেন—

—আজ্ঞে হ্যাঁ—তা তো বটেই। তার এক দাদা এসে তাকে নিয়ে গেল বেড়াতে কিনা? মানে গ্রাম-সম্পর্কের দাদা হলেও খুব আপনা-আপনি মত। কলকাতায় তাদের বাড়ি আছে—সেখানেই নিয়ে গেল। মটোর গাড়ি নিয়ে এসেছিল। তা আর একদিন নিয়ে আসবো—

—আনবেন বৈকি, মাকে আনবেন বৈকি,—বলা রইল, নিশ্চয় আনবেন—আচ্ছা নমস্কার, কেদারবাবু—

কেদারের সঙ্গে চাটুয্যে মশায় একজন লোক দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কেদার তা নিতে চান নি। তিনি গানের আসরের শেষ দিকে একটু ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, মেয়ে এসে একা থাকবে বাগানবাড়িতে। গাঁয়ে গড়বাড়ির বনের মধ্যে মেয়েকে ফেলে রেখে যেতেন প্রায় প্রতি রাত্রেই, সে কথা ভেবে এখন তাঁর কষ্ট হ'ল। তবুও সে নিজের গ্রাম, পূর্ব্ব-পুরুষের ভিটে, সেখানকার কথা স্বতন্ত্র।

গেট দিয়ে ঢোকবার সময় কেদার দেখলেন, কোনো ঘরে আলো জ্বলছে না। শরৎ তা হলে হয়তো সারাদিন ঘুরে ফিরে এসে ক্লান্ত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েছে। আহা, কত আর ওর বয়স, কাল তো এতটুকু দেখলেন ওকে—দেখুক শুনুক, আমোদ করুক না!

বাড়ির রোয়াকে উঠে ডাকলেন, ও শরৎ—মা শরৎ উঠে দোরটা খোলো, আলোটা জ্বালো—

সাড়া পাওয়া গেল না।

কেদার ভাবলেন—বেশ ঘুমিয়ে পড়েছে দেখছি—বড্ড ঘুম-কাতুরে, গড়শিবপুরে এক-একদিন এমন ঘুমিয়ে পড়তো—ছেলেমানুষ তো হাজার হোক্—হুঁ—

পুনরায় ডাক দিলেন—ও মা শরৎ, ওঠো, আলো জ্বালো—

ডাকাডাকিতে ঝি উঠে আলো জেলে রান্নাঘরের বারান্দা থেকে এসে বললে, কে—বাবু? কই দিদিমণি তো আসেন নি এখনও—

কেদার বিস্ময়ের সুরে বললেন, আসে নি? বাড়ি আসে নি? তুই ঘুমিয়ে পড়েছিলি, জানিস্ নে হয়তো—দ্যাখ্—সে হয়তো আর ডাকে নি—চল্ ঘরে, আলো জ্বাল্—

ঝি বললে, চাবি দেওয়া রয়েছে যে বাবু, এই আমার কাছে চাবি। দোর খুলবে, আমার কাছ থেকে চাবি নেবে, তবে তো ঢুকবে ঘরে। কি যে বলো বাবু!

তাই তো, কেদার সে কথাটা ভেবে দেখেন নি। চাবি রয়েছে যখন ঝিয়ের কাছে, তখন শরৎ দোর খুলবে কি করে!

ঝি বললে, আমি সন্দে থেকে বসে ছিনু এই রোয়াকে, এই আসে, এই আসে—বলি মেয়েমানুষ একা থাকবে? এসব জায়গা আবার ভাল না। বাগানবাড়ি, লোকজনের গতাগমি্য নেই—রাত্তির কাল। আমি শুয়ে থাকবোখন দিদিমণির ঘরে—রান্নাঘরে আটা

এনে রেখেছি, ঘি এনে রেখেছি, যদি এসে খাবার করে খায়—

কেদার অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন—ঝিয়ের দীর্ঘ উক্তির খুব সামান্য অংশই তাঁর কর্ণগোচর হ'ল। ঝিয়ের কথার শেষের দিকে প্রশ্ন করলেন—কে খাবার করে খেয়েছে বললে ?

—খায় নি গো খায় নি, যদি খায় তাই এনে রাখনু সব গুছিয়ে। আটা ঘি—

কেদার বললেন, তাই তো ঝি, এখনও এল না কেন বল্ দেখি ? বারোটা বাজে—কি তার বেশীও হয়েছে—

—তা কি করে বলি বাবু।

—হ্যাঁ ঝি, থিয়েটার দেখতে যায় নি তো ? তা হলে কিন্তু অনেক রাত হবে। না ?

—তা জানি নে বাবু।

রাত একটা বেজে গেল—দুটো। কেদারের ঘুম নেই, বিছানায় শুয়ে উৎকর্ণ হয়ে আছেন। বাগানবাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে অত রাতেও দু-একখানা মোটর বা মাল-লরীর যাতায়াতের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে ; কেদার অমনি বিছানার ওপর উঠে বসেন। এই এতক্ষণে এল প্রভাসের গাড়ি ! কিছুই না।

আবার শুয়ে পড়েন।

নয়তো উঠে তামাক সাজেন বসে বসে, তবুও একটু সময় কাটে।

হলের ঘড়িটা টং টং করে তিনটে বাজলো।

কত রাত্রে কলকাতার থিয়েটার ভাঙে ! কারণ এতক্ষণে তিনি ঠিক করেই নিয়েছেন যে প্রভাস ওকে থিয়েটার দেখাতে নিয়ে গিয়েছে, প্রভাস এবং অরুণের বাড়ির সবাই গিয়েছে, মানে মেয়েরা। তাদের সঙ্গেই—তা তো সব বুঝলেন তিনি, কিন্তু থিয়েটার ভাঙে কত রাত্রে ? কাকে জিজ্ঞেস করেন এত রাত্রে কথাটা ! আবার শুয়ে পড়লেন। একবার ভাবলেন, গেটের কাছে দাঁড়িয়ে কি দেখবেন ? শেষ রাত্রে কখন ঘুম এসে গিয়েছিল চোখে তাঁর অজ্ঞাতসারে, যখন কেদার ধড়মড় করে বিছানা ছেড়ে উঠলেন, উঃ, এ যে দেখছি রোদ উঠে বেশ বেলা হয়ে গিয়েছে।

ডাকলেন—ও ঝি—ঝি—

ঝি এসে বললে, আমি বাজারে চননু বাবু, এর পর মাছ মিলবে না, ওই মুখপোড়া ইটের কলের বাবুগুলো হন্নে শেয়ালের মত—

—হ্যাঁরে, শরৎ আসে নি ?

—না বাবু, কই ? এলে তো তখুনি উঠে দরজা খুলে দিতাম বাবু। আমার ঘুম বড্ড সজাগ ঘুম।

ঝি বাজারে চলে গেল। কেদারের মনে এখন আর ততটা উদ্বেগ নেই। তিনি এইবার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন। অনেক রাত্রে থিয়েটার ভেঙে গেলে প্রভাসের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে শরৎ তাদের বাড়িতে গিয়ে শুয়েছে—এ তো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যাপার। রাত্রের অন্ধকার মানুষের মনে ভয় ও উদ্বেগ আনে, দিনের আলোয় তাঁর মনের দুশ্চিন্তা কেটে গিয়েছে। মিছিমিছি ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই এর মধ্যে। কলকাতার জীবন-যাত্রা প্রণালী গড়শিবপুরের সঙ্গে এক নয়—এ তাঁর আগেই বোঝা উচিত ছিল।

কেদার নিজেই জল ফুটিয়ে চা করে খেলেন, ঝি দোকান থেকে খাবার নিয়ে এল—আটটা ন'টা দশটা বাজলো, কেদার ঝিকে বলে দিয়েছিলেন কি কি আনতে হবে, মেয়ে এসে মাছ রাঁধবে বলে ভাল মাছও আনতে দিয়েছেন—ঝি বাজার থেকে ফিরে এল, অথচ এখনও শরতের সঙ্গে দেখা নেই। বাজার পড়ে রইল, ঝি জিজ্ঞেস করল—দিদিমণি তো এখনও এলো না, মাছ কি কুটে রাখবো ?

—রেখে দে। হয়তো গঙ্গাচ্চান করে আসবে।

যখন বারোটা বেজে গেল, তখন ঝি এসে বললে, বাবু, রান্নাটা আপনিই চড়িয়ে দিন না. কেন? আমার বোধ হয় দিদিমণি এবেলা আর এলেন না। না খেয়ে কতক্ষণ বসে থাকবেন!

কিন্তু কেদার বড় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন।

আজ একটা ব্যাপার তাঁর কাছে আশ্চর্য্য ঠেকেছিল, সেটা এই, শরৎ যত আমোদের মধ্যেই থাকুক কেন না, বাবাকে ভুলে—তাঁর জন্যে রান্নার কথা ভুলে—সে কোথাও থাকবে না। জীবনে সে কখনও তা করে নি। যতই কালীঘাটেই যাক আর গঙ্গাস্নানই করুক বাবার খাওয়া হবে না দুপুরে, এ চিন্তা তাকে বৈকুণ্ঠের দোর থেকেও ফিরিয়ে আনবে।

অথচ এ কি রকম হ'ল!

মহা মুশকিলে পড়ে গেলেন কেদার।

প্রভাসের বাড়ির ঠিকানা জানেন না তিনি যে খোঁজ নেবেন। এমন তো হতে পারে কোনো অসুখ করেছে শরতের। কিন্তু প্রভাসও খবর দিতে এল না একবার, এই বা কেমন কথা!

ঝি এসে দাঁড়াল, আবার ভাত চড়াবার কথাটা বলতে।

একটু ইতস্ততঃ করে বলল, বাবু, একটা কথা বলবো কিছু মনে কোরো নি, দিদিমণি যেনার সঙ্গে গিয়েছেন, তিনি কি রকম দাদা!

ঝিয়ের কথার সুর ও বলবার ধরন কেদারের মনের মধ্যে হঠাৎ যেন একটা ধারালো অস্ত্রের বিষম ও নিষ্ঠুর খোঁচা দিয়ে তাঁর সরল মনকে জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করলে।

তিনি পাংশু মুখে ঝিয়ের দিকে চেয়ে বললেন, কেন মেয়ে? কেন বলো তো?

—না বাবু, তাই বলছি। বলি, যেনার সঙ্গে তিনি গিয়েছেন, তিনি লোক ভালো তো? শহর-বাজার জায়গা, এখানে মানুষ সব বদমাইশ কিনা, দিদিমণি সোমত্ত মেয়ে তাই বলছি। তবে আপনি বলছিলে দাদার সঙ্গে গিয়েছে, তবে আর ভয় কি। তা বাবু, ভাতটা চড়িয়ে—

কেদার রান্না চড়াবেন কি, ঝির কথা শুনে তাঁর কেমন একটা ভয়ে সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করে উঠল, হাতে পায়ে যেন বল নেই। এসব কথা তাঁর মনেও আসে নি। ঝি নিতান্ত অন্যায় কথা তো বলে নি। প্রভাসকে তিনি কতটুকু জানেন? তাঁর সঙ্গে মেয়েকে যেতে দেওয়া হয়তো তাঁর উচিত হয় নি।

হঠাৎ মনে পড়ল, পাশের বাগানে গিয়ে চাটুজ্জে মশাইকে সব জানিয়ে এ বিপদে তাঁর পরামর্শ নেওয়া দরকার—বিশাল কলকাতা শহরের মধ্যে তিনি আর কাউকে জানেন না, চেনেন না। ঝিকে বসিয়ে রেখে বাড়িতে, তিনি চাটুজ্জে মশায়ের বাগানবাড়িতে গেলেন। চাটুজ্জে মশায়কে সামনের চাতালেই চাকরে তেল মাখাচ্ছিল, কেদারকে এমন অসময়ে আসতে দেখে তিনি একটু বিস্মিত হয়ে কাপড় গুছিয়ে পরে উঠে বসলেন। হাত তুলে নমস্কার করে বললেন. আসুন কেদারবাবু, ওরে বাবুকে টুলটা এগিয়ে দে—

কেদার বললেন, বড় বিপদে পড়ে এসেছি চাটুজ্জে মশায়—আপনি ছাড়া আমি তো আর কাউকে জানি নে চিনিও নে—কার কাছেই বা যাবো—

চাটুজ্জে মশায় সোজা হয়ে বসে বিস্ময়ের সুরে বললেন, কি বলুন দিকি? কি হয়েছে?

কেদার ব্যাপার সব খুলে বললেন।

চাটুজ্জে মশাই শুনে একটু চুপ করে ভাবলেন। তার পর বললেন, আপনি ঠিকানা জানেন না?

—আজ্ঞে না—

—প্রভাস কি?

—দাস—ওরা কর্ম্মকার।

—আহা দাঁড়ান, টেলিফোন গাইডটা দেখি। কিন্তু আপনি তো বলছেন ঠিকানা জানেন না, তবে তাতে কি হবে? ওই নামে পঞ্চাশ জন মানুষ বেরুবে—আচ্ছা, আপনি দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন, আমি স্নানটা সেরে নি চট্ করে, বেলা হয়েছে। আপনাকে নিয়ে একবার থানায় যাবো কি না ভেবে দেখি। পুলিসের সঙ্গে একবার পরামর্শ করা দরকার।

পুলিসের নাম শুনে নিশ্বির্বরোধী কেদার ভয় পেয়ে গেলেন। পুলিসে যেতে হবে, ব্যাপারটা গুরুতর দাঁড়াবে কি? নাঃ। হয়তো মন্দির-টন্দির দেখতে বেরিয়েছে মেয়ে, ফিরে আসতে একটু বেলা হচ্ছে! একেবারে পুলিসে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

কেদার বললেন, আচ্ছা, আপনি স্নানাহার সেরে নিন—আমি ততক্ষণ একবার দেখে আসি এল কি না। আপনি খেয়ে একটু বিশ্রাম করুন। আমি আসছি—

বাগানবাড়িতে ফিরে কেদার এঘর ওঘর খুঁজলেন, ঝিকে ডাকলেন, শরৎ আসে নি। ঘড়িতে বেলা দুটো। কিছুক্ষণ চুপ করে বিছানায় শুয়ে মন শান্ত করার চেষ্টা করলেন—পুলিসে খবর দেবার আগে বরং একটু দেরি করা ভাল। ঘড়িতে আড়াইটে বাজল।

এমন সময়ে ফটকের কাছে মোটরের হর্ন শোনা গেল। কেদার উৎকর্ণ হয়ে রইলেন—সকাল থেকে একশো মোটর গাড়ির বাঁশি শুনেছেন তিনি। কিন্তু মনে হ'ল—না, এই তো, গাড়ির শব্দ একেবারে বাগানের লাল কাঁকরের পথে। বাবাঃ, বাঁচা গেল। সমস্ত শরীর দিয়ে যেন ঝাল বেরিয়ে গেল কেদারের।

ঝি ছুটে এসে বললে, বাবু মোটর ঢুকছে ফটক দিয়ে—দিদিমণি এসেছে—

কেদার প্রায় ছুটেই বাইরে গেলেন। মোটর সামনে এসে দাঁড়াল—তা থেকে নামল প্রভাস ও গিরীন। শরৎ তো গাড়িতে নেই!

ওরা এগিয়ে এল।

কেদার ব্যস্ত ভাবে বললে, এসো বাবা প্রভাস—শরৎ আসে নি? এত দেরি করলে, তাকে কি বাড়িতে—

প্রভাস ও গিরীনের মুখ গম্ভীর। পাশেই ঝিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গিরীন বললে, শুনুন, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে। ওদিকে চলুন—

ঝি হঠাৎ বলে উঠল, হ্যাঁ গা বাবু, দিদিমণি ভাল আছে তো?

গিরীন নামতা মুখস্থ বলার মত বললে, হ্যাঁ, আছে—আছে—আসুন, চলুন ওই ওদিকে। তুই যা না কেন, হাঁ ক'রে এখানে দাঁড়িয়ে কি—?

ওদের রকম-সকম দেখে কেদার উদ্বিগ্ন মুখে প্রশ্ন করলেন, কি—কি হয়েছে? শরৎ ভাল আছে তো?

প্রভাস বললে, হ্যাঁ, ভাল আছে। সেজন্য কিছু নয়, তবে একটা ব্যাপার হয়েছে, তাই আপনার কাছে—

কেদার জিনিসটা ভাল বুঝতে না পেরে বললেন, তা শরৎকে সঙ্গে নিয়ে এলেই হ'ত বাবাজি—তাকে আর কেন বাড়িতে রেখে এলে?

গিরীন বললে, আজ্ঞে না, তাঁকে নিয়েই তো ব্যাপার—সেই বলতেই তো—

কেদারের প্রাণ উড়ে গেল—শরতের নিশ্চয় অসুখ-বিসুখ হয়েছে, এরা গোপন করছে—তা ছাড়া আর কি হওয়া সম্ভব? তিনি অধীর ভাবে কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, গিরীন এগিয়ে এসে গম্ভীর মুখে বললে, আপনাকে বলতেই তো আমাদের আসা। কিন্তু কি করে যে বলি, তাই বুঝতে পারছি নে। আসল কথাটা কি জানেন, আপনার মেয়েকে কাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না—মানে এখন পাওয়া গিয়েছে। তবে—

এদের কথাবার্তার গতি কেদার বুঝতে পারলেন না, একবার বলে মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না, আবার বলে পাওয়া গিয়েছে—গিয়ে যদি থাকে, তবে কি তাকে সাংঘাতিক আহত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে? নইলে এরা তার পরে আবার 'কিন্তু' বলে কেন? মুহূর্ত্তের মধ্যে কেদারের মনে এই কথাগুলো খেলে গেল—কিন্তু তাঁর হতবুদ্ধি ওষ্ঠাধর বাক্যে এর রূপ দেওয়ার পূর্ব্বেই গিরীন আবার বললে—হয়েছিল কি জানেন, আপনার মেয়ে—বল না হে প্রভাস!

প্রভাস বললে, বলবো কি, আমারও হাত-পা আসছে না। আপনার সামনে একথা বলতে, অরুণের সঙ্গে কাল শরৎ-দি কোথায় চলে গিয়েছিল—কাল রাত্রে তারা সারারাত আসে নি। আজ সকালে—মানে—

গিরীন ওর কাছ থেকে কথা লুফে নিয়ে বললে, মানে আমরা কাল সারারাত খোঁজাখুঁজি করেছি—পাই নি। আপনার কাছেই বা কি বলি, কার কাছেই বা কি বলি—তার পর আজ সকালে একটা কুশ্রেণীর মেয়ের বাড়িতে এদের দুজনকে পাওয়া গিয়েছে। এসব কথা বলতে আমাদের মাথা কাটা যাচ্ছে লজ্জায়। প্রভাস তো বলেছিল, আমি কাকাবাবুর কাছে গিয়ে এসব বলতে পারবো না। আমি বললাম - না চলো, বলতেই যখন হবে আমিই বলবো এখন। তিনিও তো ভাববেন। তাই ও এল, নইলে ও আসতে চাইছিল না।

কেদার নির্ব্বোধের মত ওদের মুখের দিকে চেয়ে সব কথা শুনছিলেন—কিন্তু কথাগুলোর অর্থ তাঁর তেমন বোধগম্য হয় নি বোধ হয়—কারণ কিছুমাত্র না ভেবেই তিনি প্রশ্ন করলেন, তাকে তোমরা আনলে না কেন? তার অসুখ-বিসুখ হয় নি তো?

গিরীন হাত নেড়ে একটা হতাশাসূচক ভঙ্গি করে বললে, সে চেষ্টা করতে কি আর আমরা বাকি রেখেছিলাম? আসতে চাইলেন না।

কেদার বিস্ময়ের সুরে বললেন, আসতে চাইলে না।

—তবে আর বলছি কি ছাই আপনাকে। আমি আর প্রভাস গিয়ে আজ সকাল থেকে কত খোশামোদ। তা বললেন, আমি যাবো না। এখানে বেশ আছি। কুশ্রেণীর দুটো মেয়ে আছে সে বাড়িতে, দিব্যি দেখলুম সাজিয়েছে। আমায় বললেন, দেশে আর সে জঙ্গলে ফেরবার আমার ইচ্ছে নেই। এই বেশ আছি। অরুণ তাঁকে সুখে রাখবে বলেছে। কলকাতা শহর ফেলে তিনি আর জঙ্গলে ফিরতে চান না, এই গেল আসল কথা। বললেন, আমি সাবালিকা, আমার বয়স হয়েছে, আমি এখন যা খুশি করতে পারি। আমি যাবো না। এখন যেমন ব্যাপার বুঝছি অরুণের সঙ্গে ওর—মানে মনের মিল হয়ে গিয়েছে—বয়েসও তো এখনও—বুঝলাম যতদূর তাতে—

কেদার অধীর ভাবে বললেন, আমার কথা বলেছিলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এই জিজ্ঞেস করুন না প্রভাসকে। সকাল থেকে ঝুলোঝুলি করেছি আমরা। কিছু কি আর বাদ রেখেছি—কাল থেকে কলকাতা শহর তোলপাড় করে বেড়িয়েছি। ওদিকে অরুণের সঙ্গে ওখানে গিয়ে উঠেছেন তা কি করে জানবো? তা আপনার কথা বলতে বললেন, বাবাকে দেশে ফিরে যেতে বলুন। আমার এখন সেখানে যাবার ইচ্ছে নেই—এই জিজ্ঞেস করুন না প্রভাসকে?

প্রভাস বিষণ্ণ মুখে বললে, সে-সব কথা আর কি বলি? কত রকম করে বোঝালুম। তা ওই এক বুলি মুখে। আমি আর ফিরবো না দেশে, বাবাকে গিয়ে বলো গে যাও। আমি এখানে বেশ আছি। এসব কথা কি আপনার কাছে বলবার কথা, লজ্জায় মাথা কাটা যায়—কি করি বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে। আমি কি চেষ্টার ত্রুটি করেছি কাকাবাবু? এখন এক

উপায় আছে পুলিসে খবর দেওয়া। আপনার সঙ্গে সেই পরামর্শ করতেই আসা। আপনিও চলুন আমাদের সঙ্গে, জোড়াসাঁকো থানায় গিয়ে পুলিসের কাছে এজাহার করে দেওয়া যাক—

গিরীন চিন্তিত মুখে বললে, তাতেই বা কি হবে? সেই ভাবছি। ছেলেমানুষ নয়, বয়েস হয়েছে ছাব্বিশ-সাতাশ, বিধবা—সে মেয়ে যা খুশি করতে পারে। পুলিস হস্তক্ষেপ করতে চাইবে না। তার ওপরে ওঁদের মানী বংশ, পুলিসে কেস্ করতে গেলেই এ নিয়ে খবরের কাগজে একটা লেখালেখি হবে, ওঁদের ছবি বেরুবে। একটা কেলেঙ্কারীর কথা—ভাল কথা তো নয়? চারিদিকে ছি ছি পড়ে যাবে। এ সবই ভাবছি কি না। তা উনি যে-রকম বলেন সে-রকম করতে হবে। চলুন না হয় এখুনি তবে পুলিসে যাই—পুলিসে খবর দিলেই এখুনি প্রথম তো ওঁর মেয়েকে বেঁধে চালান দেবে—যদি অবিশ্যি পুলিসে এ কেস্ নেয়। তাঁকেই আসামী করবে—

গিরীন ধীরে ধীরে যে চিত্রপট কেদারের সামনে খুলে ধরলে, নিরীহ কেদার তাতে শিউরে উঠলেন। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, না না—পুলিসে যাওয়ার দরকার নেই।

গিরীন বললে, না কেন? আমার মনে হয় পুলিসে একবার যাওয়া উচিত। আমাদের মোটরে আসুন জোড়াসাঁকো থানায়। আপনি গিয়ে এজাহার করুন। আদালতে আপনাকে সব খুলে বলতে হবে এর পর। হয় কেস্ হোক্। আপনার মেয়ে যখন এ পথে গিয়ে পড়েছেন, তখন তাঁরও একটু শিক্ষা হয়ে যাক না! তিনটি বছর জেল ঠুকে দেবে এখন। ও অরুণকেও ছাড়বে না—আপনার মেয়েকেও ছাড়বে না। যা হয় হবে, আপনি আসুন আমাদের সঙ্গে জোড়াসাঁকো থানায়। চলুন—কি বলো প্রভাস?

প্রভাস বললে, হ্যাঁ, তা যেতে হবে বৈকি। যা থাকে কপালে। শরৎদিকে আসামী হয়ে ডকে দাঁড়াতে হবে বলে আর কি করা, চলুন আপনি। আমার গ্রামের লোক আপনি। আমি এর একটা বিহিত না করে—

গিরীন বললে, না, বিহিত করাই উচিত। খারাপ পথে যখন পা দিয়েছে, তখন ওদের শাস্তি হয়ে যাওয়াই উচিত। জেল হলেই বা আপনি করবেন কি? আসুন, উঠুন গাড়িতে, আপনার আহারাদি হয়েছে?

কেদার যেন অকূলে কূল পেয়ে বললেন, না এখনও হয় নি। ভাত চড়াতে যাচ্ছিলাম—

—কি সর্বনাশ! খাওয়া হয় নি এখনও? আপনি রান্না খাওয়া করে নিন—আমরা ততক্ষণ একটু অন্য কাজ সেরে আসি।

কেদার ব্যস্তভাবে বললেন, তোমরা যেন আমায় না বলে থানায় যেও না বাবাজি।

গিরীন বললে, আপনি না থাকলে তো পুলিসে এজাহার করাই হবে না। আমরা কে? আপনিই তো ফরিয়াদী—আপনার মেয়ে। আমরা বাইরের লোক—আমাদের কথা নেবেই না পুলিস। আপনাকে না নিয়ে গেলে তো কাজই হবে না। আপনি খাওয়া-দাওয়া করুন, আমরা বেলা চারটের মধ্যে আসব।

প্রভাস ও গিরীন মোটর নিয়ে চলে গেলে কেদার খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবলেন। ঠিকমত ভাববার শক্তিও তখন তাঁর নেই—মাথার মধ্যে কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে গিয়েছে। জীবনে কখনো এ-ধরনের ভাবনা ভাবেন নি তিনি—নির্বিরোধী নিরীহ মানুষ কেদার—শখের যাত্রাদলে গানের তালিম দিয়ে আর গ্রাম্য মুদির দোকানে বসে হাসিগল্প করেই চিরদিন কাটিয়ে এসেছেন। এমন জটিল ঘটনাজালের মধ্যে কখনো পড়েন নি, এমন ধরনের চিন্তায় তাঁর মস্তিষ্ক অভ্যস্ত নয়।

একটা কথাই শুধু বার বার তাঁর মাথায় খেলতে লাগল—পুলিসে গেলে তাঁকে মেয়ের বিরুদ্ধে এজাহার করতে হবে, তাতে তাঁর মেয়ের জেল হয়ে যেতে পারে।

শরতের জেল হয়ে যেতে পারে!

আর এ মোকদ্দমার তিনিই হবেন ফরিয়াদী! আদালতে দাঁড়িয়ে মেয়ের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে হবে তাঁকে!

ঝি এসে বললে, বাবু ওনারা চলে গেল। দিদিমণির কথা কি বলে গেল বাবু? কখন আসবেন তিনি?

কেদারের চমক ভাঙলো ঝিয়ের কথায়। বললেন, হ্যাঁ—এই—কি বললে? ও, শরৎ? না, তার এখন আসবার দেরি আছে।

—তা আপনি আজ ভাত চড়াবেন না বাবু? দিদিমণির খবর তো পাওয়া গেল—এখন দুটো ভাতে ভাত যা হয় চড়িয়ে—

—না মেয়ে, এখন অবেলায় আর ভাত—দুটো চিঁড়ে এনে দেবে?

—ও মা, চিঁড়ে খেয়ে থাকবেন আপনি? তা দেন, পয়সা দেন—নিয়ে আসি।

বাগানের পথে দিব্যি বাতাবিলেবু গাছের ছায়া পড়েছে, প্রায় বিকেল হতে চলল।

ঘণ্টা দুই পরে প্রভাস ও গিরীন মোটর নিয়ে ফিরে এসে দেখলে ঝি গাড়িবারান্দার সামনের রোয়াকে বসে। তাকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল কেদার কোথায় চলে গিয়েছেন, বাজার থেকে চিঁড়ে কিনে নিয়ে এসে সে আর তাঁকে দেখতে পায় নি। কেদারের কাপড়-চোপড়ের পুঁটুলিটাও সেই সঙ্গে দেখা গেল নেই।

গিরীন বাগানের বাইরে এসে হো হো করে হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি।

—কেমন বাবাঃ! বললাম যে সব আমার হাতে ছেড়ে দাও—গিরীন কুণ্ডুর মাথার দাম লাখ টাকা বাবা। ও পাড়াগেঁয়ে বুড়োর কানে এমন মন্তর ঝেড়েছি যে, এ-পথে আর কোন দিন হাঁটবে না। বলি নি তোমায়?

—আচ্ছা, বুড়োটা গেল কোথায়?

—কোথায় আর যাবে? গিয়ে দেখ গে যাও তোমাদের সেই কি পুর বলে, তার জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে কাল সকাল লাগাৎ ঠেলে উঠেছে। লজ্জায় এ-কথা কারো কাছে এমনিই বলতে পারত না—তার ওপর যে পুলিসের ভয় দিইছি ঢুকিয়ে বুড়োর মাথায়—দেখবে যে রা কাটবে না কারো কাছে। এক ঢিলে দুই পাখী সাবাড়।

দমদমার বাগানবাড়ি থেকে বার হয়ে কেদার পুঁটুলি হাতে হনহন করে পথে চলতে লাগলেন। হাতে পয়সার সচ্ছলতা নেই—খরচের দরুন যা কিছু ছিল, তা নিতান্তই সামান্য। তা ছাড়া কেদার এখনও কোথায় যাবেন না যাবেন ঠিক করে উঠতে পারেন নি—এখন তাঁর প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য, তাঁর ও কলকাতা শহরের মধ্যে অতি দ্রুত ও অতি বিস্তৃত একটি ব্যবধান সৃষ্টি করা। এই ব্যবধান যত বড় হবে, যত দূরে গিয়ে তিনি পড়তে পারবেন—তাঁর মেয়ে তত নিরাপদ।

সুতরাং পিছন ফিরে না চেয়ে এখন শুধু হেঁটেই যেতে হবে···হেঁটেই যেতে হবে। মেয়ের বিপদ না ঘটে···শুধু হাঁটতেই হবে। কিসের বিপদ মেয়ের, তা কেদারের ভাবার সময় বা অবসর নেই। মেয়ে যে খুব নিরাপদ আছে কি নেই—সে-সব ভাবনারও সময় নেই এখন। শুধু হাঁটতে হবে, কলকাতা থেকে দূরে গিয়ে পড়তে হবে। প্রভাস ও গিরিন যেমন রেগে গিয়েছে, ওরা শোধ তুলে হয়তো ছাড়বে অরুণের ওপর। মোটরে করে এসে তাকে রাস্তা থেকে জোর করে ধরে নিয়ে না যায়।

ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই—ক্লান্তি নেই, পরিশ্রম নেই, শুধু পথ বেয়ে চলা—যতদূর

যাওয়া যায়।

সন্ধ্যার সময় দমদমা থেকে সাত মাইল দূরে যশোর রোডের ধারে গাছতলায় বসে একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে হাউ হাউ করে কাঁদতে দেখে দু-চারজন পথিকের ভিড় জমে গেল।

একজন বললে, কি হয়েছে মশায় ?

আর একজন বললে, বাড়ি কোথায় আপনার ? কি হয়েছে ?

লোকজনের মধ্যে বেশির ভাগ চাষী লোক, দুজন দমদমায় এইচ-এম-ভি গ্রামোফোন কোম্পানীর কারখানায় কাজ করে, ছুটির পর সাইকেলে গ্রামে ফিরছিল। তাদের একজন এগিয়ে এসে বললে—কি হয়েছে মশাই ? আমিও ব্রাহ্মণ, আসুন আমার বাড়ি—এই কাঁচা রাস্তা দিয়ে নেমে গিয়ে গরানহাটি কেশবপুরে আমার বাড়ি—

কেদার বললেন, না ও কিছু না—আমি এখন হেঁটে যাবো—

—কাঁদছেন কেন, কি হয়েছে আপনার বলতেই হবে—আসুন আপনি দয়া করে। এ অন্ধকার রাত্রে একা যাবেন কোথায় ?

কেদার কাকুতি মিনতির সুরে বললেন, না বাবু, আমি যাবো না। আমার কিছুই হয় নি—এই গিয়ে মাঝে মাঝে পেটে ফিক্ ব্যথা ধরে কি না। ও কিছু নয়, এক্ষুনি সেরে যাবে—সেরে গিয়েছে অনেকটা।

কেদার পুঁটুলি নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে উঠে বারাসাতের দিকে রওনা দিলেন পথ ধরে।

সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে।

ওদের মধ্যে একজন মুচকি হেসে বললে, পাগল—পাগল ও, দেখেই চেনা যায়। পাগল—

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে পথে রাত এল। অন্ধকার রাত। কেদারের দূকপাত নেই—কোথায় যাচ্ছেন তা তিনি এখনও জানেন না। মাঝে মাঝে মোটরের হর্ন বাজে পেছন থেকে, মাল বোঝাই লরি যশোর রোড বেয়ে বারাসাত কি বনগাঁয়ে মাল নিয়ে চলেছে—কেদার হর্ন শুনলেই পথের ধারের গাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকিয়ে পড়েন, প্রভাসদের মোটর তাঁর সন্ধানে পুলিস নিয়ে বেরিয়েছে কি না কে জানে। সারাদিন পেটে কিছু যায় নি, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কেদার এখন আহারের কোন প্রয়োজন পর্যন্ত অনুভব করছেন না। শরীর এবং মন যেন তাদের সমস্ত অনুভূতি হারিয়ে একটি মাত্র অনুভূতিতে পর্যবসিত হয়েছে, সেটা সময় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ তীক্ষ্ন ও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। অন্য কিছু নয়—কন্যার উপর তাঁর গভীর স্নেহ ও একটি অদ্ভুত করুণা। শরৎ যেন ছাব্বিশ বছরের যুবতী নেই, তাঁর মনোরাজ্যে সে কখন শিশু মেয়েটি হয়ে ফিরে এসেছে, যে গড়শিবপুরের বাড়িতে জঙ্গলের ধারে কুচফল তুলে খেলা করতো—তার খেলাঘরে ধুলোর ভাত ও পাথরকুচি পাতা মাছ খেতে হয়েছে বসে বসে। তার এখনও কি বুদ্ধিই বা হয়েছিল, চিরকাল পাড়াগাঁয়ে কাটানোর ফলে শহরের ব্যাপার কি বা সে বোঝে!

একবার ভাবলেন, কলকাতায় ফিরে গিয়ে পাশের বাগানের চাটুজ্জে মশায়ের কাছে সব কথা ভেঙে বলে তাঁর সাহায্য চাইলে কেমন হয়। কিন্তু পুলিসের আইন বড় কড়া। সেখানে চাটুজ্জে মশায় কতটুকু সাহায্য করতে পারবেন ? বিশেষ করে এমন একটা কথা তিনি কি চাটুজ্জে মশায়কে খুলে বলতে পারবেন ? তবে কথা গোপন থাকবে না। ওই ঝিটা এতক্ষণ কথাটা পাড়াময় রাষ্ট্র করেছে—ঝি কি আর এতক্ষণ এ কথা না জেনেছে। ওই প্রভাস ও গিরীনই তাকে সব কথা প্রকাশ করে বলেছে এতক্ষণ। না, সেখানে আর ফিরবার উপায় নেই—এখন তো নয়ই, এর পর—কত পরে তা তিনি এখনও জানেন না—যা হয় একটা কিছু করবেন তিনি।

বারাসাতের বাজারে পেঁছে কেদারের ইচ্ছে হ'ল এখানে চা কিনে খান দোকান বেছে—

রাস্তার ধারেই অনেকগুলো চায়ের দোকান। আজ শরৎ নেই সঙ্গে—যে তাঁকে দোকানের চা খেতে বাধা দেবে, যে তাঁকে ইহকালের অনাচার থেকে সন্তর্পণে বাঁচিয়ে রেখে তাঁর পরকালের মুক্তির পথ খোলসা করবার জন্যে সচেষ্ট ছিল চিরদিন—আজ সে নির্মমভাবে সমস্ত অনাচারের স্বাধীনতা দিয়ে তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছে—সুতরাং অনাচার তিনি করবেনই। যা হয় হবে, পরকাল তিনি মানেন না। আরও জোর করে, ইচ্ছে করে তিনি যা খুশি অনাচার করবেন। কে দেখবার আছে তাঁর ?

রাস্তার ধারের দোকান থেকে এক পেয়ালা চা খেয়ে কেদার আবার হনহন করে রাস্তা হাঁটতে লাগলেন—সারা রাত ধরে পথ চলে সকালের দিকে দত্তপুকুর থেকে কিছু দূরে একটা গ্রামে এসে পথের ধারেই বসে পড়লেন। আর তিনি ক্ষুধা ও পথশ্রম-ক্লান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে যেতে পারছেন না।

জনৈক গ্রাম্য লোক সকালে গাড়ু হাতে মাঠ থেকে ফিরে আসছিল, তাঁকে এ অবস্থায় দেখে বললে—কোথা থেকে আসা হচ্ছে ?

—আজ্ঞে বারাসাত থেকে।

কেদার একটু মিথ্যে কথার আমদানি করলেন, লোককে সন্ধান দেওয়ার দরকার কি, তিনি কোথা থেকে আসছেন ?

লোকটি আবার বললে, তা এখানে বসে এমন ভাবে ?

—একটু বসে আছি, এইবার উঠি।

—আপনারা ?

—ব্রাহ্মণ।

—আজ্ঞে, প্রাতঃপ্রণাম। আমার নাম হরিহর ঘোষ, কায়স্থ—আপনি যদি কিছু না মনে করেন, একটা কথা বলি। আমার বাড়ি এবেলা দয়া করে পায়ের ধুলো দিয়ে দুটি সেবা করে যান। আমরাও প্রসাদ পাবো এখন। চলুন উঠুন।

কেদার কিছুতেই প্রথমটা রাজী হন নি—কিন্তু তাঁর চেহারা দেখে লোকটার কেমন দয়া ও সহানুভূতির উদ্রেক হয়েছিল, সে পীড়াপীড়ি করে তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। কেদার দেখলেন লোকটি সম্পন্ন অবস্থার গ্রাম্য গৃহস্থ, বাইরে বড় চণ্ডীমণ্ডপ, অনেকগুলো ধানের মরাই, বাড়ির সামনে একটা পানাভরা ডোবা। সেই ছোট পানাভরা ডোবার আবার একটা ঘাট বাঁধানো দেখে দুঃখের মধ্যেও কেদার ভাবলেন—এদের দেশে এর নাম পুকুর, এর আবার বাঁধা ঘাট। এদের নিয়ে গিয়ে গড়ের কালো পায়রার দীঘিটা একবার দেখিয়ে দিতে হয়—

ভাল লাগল জায়গাটা তবুও। কেদার সারাদিন রইলেন, সন্ধ্যার সময় বিদায় নিতে চাইলে গৃহস্বামী আপত্তি করে বললে—তা হবে না ঠাকুরমশায়। সামনে অন্ধকার রাত, আপনাকে কি ছেড়ে দিতে পারি এখন ? থাকুন না এখানে দুদিন।

ইতিমধ্যে কেদার নিজের একটা মিথ্যা পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি গরীব ব্রাহ্মণ। গোবরডাঙার জমিদার বাড়িতে কিছু সাহায্য প্রার্থনা করতে চলেছেন।

লোকটা তাই বললে, দুদিন থাকুন, দেখি যদি আমাদের এখান থেকে আপনাকে কিছু সাহায্য করতে পারি! আমি দুপুরবেলা দু-একজনকে আপনার কথা বলেছি—সকলেই কিছু কিছু দিতে রাজী হয়েছে।

কেদার বিপদে পড়লেন। তিনি গড়শিবপুরের রাজবংশের লোক, কারো কাছে হাত পেতে কখনো কিছু নিতে পারবেন না ওভাবে—যতই অভাব থাকুক। নিজেকে গরীব ব্রাহ্মণ বলে তিনি যে মহা মুশকিলে পড়ে গেলেন।

রাত্রিটা অগত্যা থেকে যেতে হ'ল। পরদিন সকালে তিনি যখন আবার বিদায় চাইলেন, গৃহস্বামী তিনটি টাকা তাঁর হাতে দিতে গেল। বললে—এই উঠেছে ঠাকুরমশায়, মিত্তির মশায় দিয়েছেন এক টাকা আর আমি সামান্য কিছু—এই নিয়ে যান—

কেদার বিনীত ভাবে বললেন, আমি ও নিতে পারবো না—

ঘোষ মশায় আশ্চর্য্য হয়ে বললে, নেবেন না? কেন?

—আজ্ঞে—ইয়ে—ও আমার দরকার নেই।

ঘোষ মশায় তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বললে, এর চেয়ে বেশী উঠলো না যে ঠাকুর মশায়? না হয় আমি আর একটা টাকা—

কেদার বললেন, না—না—আপনি অতি মহৎ লোক, যা করেছেন তা কেউ করে না। কিন্তু আমি—আমি নিতে পারবো না। আমি আপনাকে এমনিই আশীর্ব্বাদ করছি—আপনি ধনে পুত্রে লক্ষ্মীশ্বর হোন—ভগবান আপনাদের সুখে রাখুন—

কেদারের চোখে জল দেখে গৃহস্বামী বিস্মিত হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইল, তার পরে উঠে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললে—আচ্ছা, আপনি ঠিকমত পরিচয় দেন নি বোধ হয়। এ বাজারে চার টাকা ছেড়ে দেয় এমন লোক আমি দেখি নি—বলুন আপনি কে—কি হয়েছে আপনার—

কেদার উদ্গত অশ্রু কোনোমতে চেপে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় উঠতে উঠতে বললেন—কিছু হয় নি, কিছু হয় নি। আমি আসি, আমার বিশেষ দরকার আছে—কিছু মনে করবেন না—

গৃহস্বামী টাকাটা হাতে করে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সেদিন সারাদিন অবিরত পায়ে হেঁটে সন্ধ্যার পর কেদার গড়শিবপুর থেকে ছয় ক্রোশ দূরে হলুদপুরের বাজারে পৌঁছিলেন। এখানে কেউ তাঁকে চিনতো না—চার ক্রোশ দূরের এ বাজারে তাঁর যাতায়াত বিশেষ ছিল না। না চেনে সে খুব ভালো। একটা পুকুরের বাঁধা ঘাটের চাতালে এসে বসলেন, এতদূর পর্য্যন্ত চলে এসেছেন কিসের ঝোঁকে, কিছু বিবেচনা না করেই, এই বার তাঁর মনে প্রশ্ন জাগলো—কোথায় যাবেন তিনি? গাঁয়ে ফেরা কি উচিত হবে? মেয়ের কথা লোকে জিজ্ঞেস করলে কি উত্তর দেবেন তিনি? কেদারের উদ্‌ভ্রান্ত মন এ দু-দিন এসব কথা ভাববার অবকাশ পায় নি।

ছয়

রাত্রে শরতের ভাল ঘুম হ'ল না, অচেনা জায়গা ভাল ঘুম হবার কথা নয়, দেশের বাড়ি ছেড়ে এসে পর্য্যন্তই তার ঘুম তেমন হয় না। কিন্তু কাল রাত্রে কি জানি কেমন হ'ল, বাবার কথা মনে হয়েই হোক্ বা অন্য যে কারণেই হোক্—শরৎ প্রথম দিকে তো চোখের পাতা একটুও বোজাতে পারে নি।

প্রভাসের বৌদিদি তার পাশে শুয়ে দিব্যি ঘুমিয়ে পড়ল। এত শব্দ এত আওয়াজের মধ্যে মানুষ পারে ঘুমুতে? মোটর গাড়ি যাচ্ছে, লোকজনের কথাবার্ত্তা চলেছে—ভাল রকম অন্ধকার হয় না, জানলা দিয়ে কোথা থেকে আলো এসে পড়েছে দেওয়ালের গায়ে—আর সারারাতই কি লোক-চলাচল করবে আর গান-বাজনা চলবে? এখানে এতও গানবাজনা হয়! ডুগি-তবলার শব্দ, হারমোনিয়মের আওয়াজ, মেয়ে-গলার গান চলেছে আশেপাশের সব বাড়ি থেকে। দমদমার বাগানবাড়িতে থাকতে সে বুঝতে পারে নি আসল কলকাতা

শহর কি। এখন দেখা যাচ্ছে এখানকার তুলনায় দমদমার বাগানবাড়ি তাদের গড়শিবপুরের জঙ্গলের সমান।

ভোরে উঠে সে গঙ্গাস্নান করে আসবে—এখান থেকে গঙ্গা কতদূর কে জানে? প্রভাস-দাকে বললে মোটরে নিয়ে যাবে এখন। সকালে প্রভাসের বৌদিদির ডাকে তার ঘুম ভাঙল। জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে বিছানায়। অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়েছে নাকি তবে? ওর মুখে কেমন ধরনের ভয় ও উৎকণ্ঠার চিহ্ন প্রভাসের বৌদিদির চোখ এড়ালো না।

সে বললে, ভাবনা কি দিদি, দেরিতে উঠেছ তাই কি? তোমায় উঠে আপিস করতে হচ্ছে না তো আর। মুখ ধুয়ে নাও, চা হয়ে গিয়েছে—

শরৎ লজ্জিত মুখে জানালে এত সকালে সে চা খায় না। তার চা খাওয়ায় কতকগুলো বাধা আছে—স্নান করতে হবে, কাপড় ছাড়তে হবে—সে-সব হাঙ্গামায় এখন কোন দরকার নেই, থাক্ গে। গঙ্গা এখান থেকে কতদূর? এক বার গঙ্গায় নাইতে যাবার বড় ইচ্ছে তার। প্রভাসদা কখন আসবে?

প্রভাসের বৌদি বললে, গঙ্গা নাইবে? চল না আমাদের—আচ্ছা, দেখি বোসো। ওরা আসুক সব—

—কখন আসবে? আসতে বেশী দেরি করবে না তো প্রভাসদা?

—কি জানি ভাই। তবে দেরি হওয়ার কথা নয় তো। এখুনি আসবে—

—গঙ্গা নেয়ে এসে আমি বাবার কাছে যাবো—আমায় রেখে আসুক—

—সে কি ভাই? এ-বেলাটা থাকবে না এখানে? থেকে খাওয়াদাওয়া করে ওবেলা—

শরৎ চিন্তিত মুখে বললে, কাল রাতে গেলাম না, বাবা কত ভেবেছেন। আমার কি থাকবার জো আছে যে থাকব?

প্রভাসের বৌদিদি বললে, ওবেলা চলো ভাই সিনেমা দেখে দুজনে—

—কি দেখে?

—সিনেমা—মানে বায়োস্কোপ—টকি—

—ও—

—দেখে চলো আমরা যশোর রোড দিয়ে মটোরে বেড়িয়ে আসবো। চাঁদের আলো আছে—

শরৎ হেসে বললে, মোটে একাদশী গেল বুধবারে, এরই মধ্যে চাঁদের আলো কোথায় পাবেন? আপনারা কলকাতার লোক, আপনাদের সে খবরে কোনো দরকার নেই—ওখানে সারারাতই গ্যাসের আলো—ইলেকট্রিক আলো—

ঈষৎ অপ্রতিভের সুরে প্রভাসের বৌদিদি বললে, তা বটে ভাই, যা বলেছ। ওসব খেয়াল থাকে না।

এমন সময় পাশে কমলাদের ঘর থেকে জড়িত স্বরে কে বলে উঠল—আরে ও হেনা বিবি এদিকে এসো না চাঁদ, আলোর সুইচটা যে খুঁজে পাচ্ছি নে—ও হেনা বিবি—

প্রভাসের বৌদিদি হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, আ মরণ, বেলা সাড়ে সাতটা বাজে—উনি আলোর সুইচ খুঁজে বেড়াচ্ছেন এখন—

শরৎ বললে, কি হয়েছে, কে উনি?

—কে জানে কে? মাতালের মরণ যত—পাশের বাড়ির এক বুড়ো। রোজ ভাই অমনি করে—

শরৎও হেসে ফেললে মাতাল বুড়োটার কথা ভেবে। বললে, ডাকছে কাকে? ও যেন পাশের ঘর থেকে কথা বললে বলে মনে হ'ল—না?

—ওই পাশের বাড়ি, দোতলার জানলাটা খোলা রয়েছে দেখছ তো, ওই ঘর। দাঁড়াও আসছি—

শরৎ শুনলে বুড়ো মাতালটা হঠাৎ 'এই যে হেনা বিবি বলিহারি যাই। বলি সার্সি জানলা বন্ধ করে'—এই পর্যন্ত চেঁচিয়ে বলে উঠেই চুপ করে গেল। কে যেন তার মুখে থাবা দিয়ে চুপ করিয়ে দিলে। কিছুক্ষণ পরে কমলাও ঘরে ঢুকল। শরৎ হাসিমুখে বলে উঠল—এসো ভাই গঙ্গাজল এসো—তোমাকেই খুঁজছি—গঙ্গা নাইতে চলো না কেন যাই সবাই মিলে?

কমলা সত্যিই সুন্দরী মেয়ে। ঘুম ভেঙে সদ্য উঠে এসেছে, আলুথালু চুলের রাশ খোঁপার বাঁধন ভেঙে ঘাড়ে পিঠে এলিয়ে পড়েছে, বড় বড় চোখে অলস দৃষ্টি, মুখের ভাবেও জড়তা কাটে নি—বেশ ফর্সা নিটোল হাত দুটি কেমন চমৎকার ভঙ্গিতে ঘাড়ের পেছনে তুলে ধরে এলোচুল বাঁধবার চেষ্টা করছে। আসলে বাঁধার ছলে একটা কায়দা মাত্র, চুল বাঁধবার চেয়ে ওই ভঙ্গিটা দেখাবার আগ্রহটাই ওখানে বেশি। শরতের হাসি পায়—ছেলেমানুষ কমলা!

শরৎ এসব বোঝে। সেও এক সময়ে সুন্দরী কিশোরী ছিল, ওই কমলার মত বয়সে, সে জানে, নিজেকে ভাল দেখানোর কত খুঁটিনাটি আগ্রহ অকারণে মেয়েদের মনে জাগে। তারও জাগত। এসব শিখিয়ে দিতে হয় না, বলে দিতে হয় না মেয়েদের। আপনিই জাগে। শরতের কেমন স্নেহ হয় কমলার ওপর। স্নেহের সুরেই বলে—ভাই, চমৎকার দেখাচ্ছে তোমায় গঙ্গাজল—

—সত্যি?

—সত্যি বলছি।

কমলার মুখে লজ্জার আভাস নেই, সে যে পথে পা দিয়েছে, সে পথের পথচারিণীরা লজ্জাবতী লতা নয়, বনচাঁড়ালের পাতা—টুসি দিলে নাচে। কমলা হেসে বললে, আপনার ভাল লাগে?

—খুব, ভাই।—খুব—

—তবে তো আমার ভবিষ্যতের পক্ষে ভালো—এদিকে আবার গঙ্গাজল পাতিয়েছি—

কমলার কথার নির্লজ্জ সুর শরতের কানে বাজল। সে মনে মনে ভাবলে, মেয়েটি ভালো, কিন্তু অল্প বয়সে একটু বেশী ফাজিল হয়ে পড়েছে। আমি ওর চেয়ে কত বড়। মা না হলেও কাকী খুড়ীর বয়িসী—আমার সঙ্গে কেমন ধরনের কথা বলছে দ্যাখো—

কমলা বললে, আপনি চা খেয়েছেন?

শরৎ হেসে বললে, না ভাই, আমি বিধবা মানুষ, নাই নি, ধুই নি—এখুনি চা খাবো কি করে? চা খাওয়ার কোনো তাড়াতাড়ি নেই আমার। এখন গঙ্গা নাইবার কি ব্যবস্থা হয় বলো তো?

—চলুন না হেঁটে গিয়ে নেয়ে আসি। এই তো আহিরীটোলা দিয়ে গেলে সামনেই গঙ্গা—

প্রভাসের বৌদিদি ওদের ঘরের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছিল; এমন সময়ে পেছন থেকে গিরীন ডাকলে—ও হেনা বিবি—

হেনা দাঁড়িয়ে গিয়ে পেছন ফিরে বললে, কখন এলে? কি ব্যাপার? ওদিকে—

গিরীন চোখ টিপে বললে, আস্তে।

হেনা এবার গলার সুর নিচু করে বললে, কি হ'ল?

—এখনো হয় নি কিছু। আমরা এখনো বুড়োর কাছে যাই নি। বেশী বেলা হলে যাবো। এদিকের খবর কি?

হেনা রাগের সুরে বললে, তোমরা আমায় মজাবে দেখছি। এখনও সে কিছু খায় নি, এ বাড়ি এসে পর্য্যন্ত দাঁতে কুটো কাটে নি। না খেয়ে ও কতক্ষণ থাকবে, ও আপদ যেখানে পারো বাপু তোমরা নিয়ে যাও। আমার টাকা আমায় চুকিয়ে দাও, মিটে গেল গোলমাল। না খেয়ে মরবে নাকি শেষটা—তার পর এদিকে হরি সা যা কাণ্ড বাধিয়েছিল! হেনা বিবি বলে ডাকাডাকি। সারারাত কমলির ঘরে বসে মদ খেয়েচে—এই একটু আগে কি চেঁচামেচি! মেয়েটা যাই একটু সরল গোছের, কোনোরকমে তাকে বুঝিয়ে দিলাম, পাশের বাড়িতে একটা মাতাল আছে তারই কাণ্ড, বিশ্বাস করেছে কিনা কে জানে—

গিরীন হাসিমুখে বললে, ভয় কি তোমার হেনা বিবি, রাত যখন এখানে কাটিয়েছে তখন ওর পরকাল ঝরঝরে হয়ে গিয়েছে। ওর সমাজ গিয়েছে, ধর্ম্ম গিয়েছে। ওর বাবার কাছে সেই কথাই বলতে যাচ্ছি—

—কি বলবে?

—সে-সব বুদ্ধি কি তোমাদের আছে? গিরীনের কাছ থেকে বুদ্ধি ধার করে চলতে হয় সব ব্যাটাকে।

—গালাগাল দিও না বলছি—

—গালাগাল তোমাকে তো দিই নি হেনা বিবি, চটো কেন? তার পর শোনো। সন্দে অবধি রেখে দাও। সন্দের আগে আবার আমরা আসবো।

—টাকা নিয়ে এসো যেন।

—অত অবিশ্বাস কিসের হেনা বিবি? নতুন খদ্দেরের কাছে তাগাদা করো, আমাদের কাছে নয়।

—আচ্ছা, কথায় দরকার নেই—যাও এখন। আমি দেখি গে কমলিটা ছেলেমানুষ—কি বলতে কি বলে বসে—ওকে সামলে নিয়ে চলতে হচ্ছে আবার—

হেনা ঘরে ঢুকে দেখলে শরৎ ও কমলা চুল খুলে তেল মাখতে বসেছে। বললে—ও কি? নাইতে যাবে নাকি ভাই?

কমলা বললে, গঙ্গাজলকে নিয়ে নেয়ে আসি—

হেনা প্রশংসার দৃষ্টিতে শরতের সুদীর্ঘ কালো কেশপাশের দিকে চেয়ে বললে, কি সুন্দর চুল ভাই তোমার মাথায়? এমন চুল যদি আমাদের মাথায় থাকতো—

কমলা বললে, আমিও তাই বলছিলাম গঙ্গাজলকে—

শরৎ সলজ্জ স্বরে বললে, যান, কি যে সব বলেন! গঙ্গাজলের মাথায় চুল কি কম সুন্দর? দেখুন দিকি তাকিয়ে? তা ছাড়া আমার লম্বা চুলের কি দরকার আছে ভাই? বাবা কিছু পাছে মনে করেন তাই—নইলে ও চুল আমি এতদিন বঁটি দিয়ে কেটে ফেলতাম। শুধু বাবার মুখের দিকে চেয়ে পারি নে। তাঁর চোখ দিয়ে যাতে জল পড়ে, তাতে আমার ধর্ম্ম নেই।

হেনা এ পথের পুরাতন পথিক, তার মন কোমল হৃদয়-বৃত্তির ধার ধারে না অনেক দিন থেকে—যা কিছু ছিল তাও পাষাণ হয়ে গিয়েচে চর্চ্চার অভাবে, শরতের কথায় তার মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত হ'ল না—কিন্তু কমলা মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

হেনা বললে, কমলা, এঁকে গঙ্গায় নিয়ে যাবি? কেন, বাড়িতে চান কর না? বেলা হয়ে যাবে।

শরতের দিকে চেয়ে বললে, সে তুমি যেও না ভাই, ও ছেলেমানুষ, পথ চেনে না—কোথায় যেতে কোথায় নিয়ে যাবে।

কমলা বললে, বা রে, আমি বুঝি আর—সেবার তো আমি—

হেনা কমলাকে চোখ টিপে বললে, থাম বাপ্‌ তুই। তুই ভারি জানিস্‌ রাস্তা-ঘাট। তার পর দিদিকে নিয়ে যেতে একটা বিপদ হোক রাস্তায়! যে গুণ্ডা আর বদমাইশের ভিড়—

শরৎ বললে, সত্যি নাকি ভাই, বলুন না?

—আমি কি আর মিথ্যে কথা বলছি—ও ছেলেমানুষ, কি জানে?

এইবার কমলা বললে, না—তা—হ্যাঁ আছে বটে।

—কি আছে ভাই গঙ্গাজল?

কমলাকে উত্তর দেওয়ার সুযোগ না দিয়েই বললে, কি নেই কলকাতা শহরে বলতে পারো? সব আছে। আজকাল আবার সোলজারগুলো ঘুরে বেড়ায় সর্ব্ব জায়গায়।

—সে আবার কি?

—সোলজার মানে গোরা সৈন্য। এরা যে অঞ্চলে আছে, তার ত্রিসীমানায় মেয়েমানুষের যাওয়া উচিত নয়। না, তুমি যেও না ভাই। আমি তোমায় যেতে দিতে পারি নে। তোমার ভাল-মন্দর জন্যে আমি দায়ী যখন। প্রভাস-ঠাকুরপো আমার হাতে তোমায় যখন সঁপে দিয়ে গিয়েছে।

কমলা বললে, আমরা তেল মাখলাম যে।

—তেল মেখে বাড়ির বাথরুমে ওঁকে নিয়ে চান্‌ করো। মিছিমিছি কেন ওঁকে বিপদের মধ্যে নিয়ে যাওয়া?

আড়ালে নিয়ে গিয়ে কমলাকে হেনা খুব বকলে। প্রভাসের কাছ থেকে সেও টাকা নেবে যখন, তখন এতটুকু বুদ্ধি নিয়ে কাজ করলে কি চলে না? বাড়ির মধ্যেই ওকে ধরে রাখা যাচ্ছে না, একবার বাইরের রাস্তায় পা দিলে আর সামলানো যাবে না ওকে। এত কম বুদ্ধি কেন কমলার! হরি সা লোকটাকে কাল রাত্রে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলে কি কোম্পানীর রাজ্য অচল হ'ত? সামলে না নিলে সব কথা ফাঁস হয়ে যেতো যে আর একটু হলে? ঘটে বুদ্ধি হবে কবে তার?···ইত্যাদি।

কমলা গুরুজন-কর্ত্তৃক-তিরস্কৃতা-বালিকার ন্যায় চুপ করে রইল।

হেনা বললে, তুমি আর ওঘরে যেও না। আমি করছি যা করবার—তুমি যাও। হরি সা যেন এখন আর না ঢোকে—

হেনা ঘরে ঢুকে শরৎকে বললে, গঙ্গায় যাওয়া হবে না ভাই। পথে আজকাল বড় গোলমাল, তুমি বাথরুমে নেয়ে নাও, আমি সব যোগাড় করে রেখে এলাম—

স্নান করে আসবার কিছু পরে হেনা শরৎকে বললে, তোমার খাওয়ার কি করবো ভাই? আমাদের রান্না চলবে না তো?

—আমার খাওয়ার জন্যে কি ভাই! দুটো আলো চাল আনুন, ফুটিয়ে নেবো।

—মাছমাংস চলে না—না? গাঁ থেকে এসেছ, এখন চলুক না, কে আর দেখতে আসছে ভাই?

প্রভাসের বৌদিদির এ কথায় শরৎ বিস্মিত হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে নয় বটে, কিন্তু হিন্দু তো—সে একজন ব্রাহ্মণের বিধবাকে একথা বলতে পারলে কি করে? অন্য জায়গায় এ ধরনের কথা বললে শরৎ নিজেকে অপমানিতা বিবেচনা করত, তবে এরা কলকাতার লোক, এদের কথা স্বতন্ত্র।

শরৎ গম্ভীর মুখে বললে, না ও-সব চলে না। ও কথাই বলবেন না আর—

হেনা মনে মনে বললে, বাপ রে, দেমাক দ্যাখো আবার! কথা বলেছি তো ওঁর গায়ে ফোস্কা পড়েছে। তোমার দেমাক আমি ভাঙবো, যদি দিন পাই—কত দেখলাম ওরকম, শেষ পর্য্যন্ত টিকল না কোনটা।

শরৎ বিকেল থেকে কেবল দমদমায় ফেরবার জন্যে তাগাদা করতে লাগল। হেনা ক্রমাগত বুঝিয়ে রাখে, ওরা এখনো আসছে না, এলেই পাঠিয়ে দেবে। শরৎ তো জলে পড়ে নেই—এর জন্যে ব্যস্ত কি?

কমলার দেখা নেই অনেকক্ষণ থেকে। শরৎ বললে, গঙ্গাজল কই, তাকে দেখছি নে—

হেনা কমলাকে সরিয়ে দিয়েছিল, কাঁচা লোক, কখন কি বলে বসবে, করে বসবে—সব মাটি হবে। তা ছাড়া কমলার ঘরে এমন সব জিনিসপত্র আছে, যা দেখলে শরতের মনে সন্দেহ হতে পারে। হরি সা'র একটা বিছানা, আলমারিতে তার দাড়ি কামানোর আসবাব, বড় নল লাগানো গড়গড়া ইত্যাদি। মদের বোতলগুলো না হয় পাড়াগাঁয়ের মেয়ে না বুঝতে পারলে—কিন্তু পুরুষের বাসের এসব চিহ্নের জবাবদিহি দিয়ে মরতে হবে হেনাকে!

বিকেলের দিকে হেনা বললে, চলো ভাই টকি দেখে আসি—

—সে কোথায়?

—চৌরঙ্গীতে বলো, শ্যামবাজারে বলো—

—বাবার কাছে কখন যাবে? ওরা কখন আসবে?

—চলো, টকি দেখে দমদমায় তোমায় রেখে আসবো—

শরৎ তখুনি রাজী হয়ে গেল। টকি দেখবার লোভ যে তার না হয়েছিল তা নয়। বিশেষ করে টকি দেখেই যখন বাবার কাছে যাওয়া হচ্ছে তখন আর গোলমাল নেই এর ভেতর।

কিন্তু হেনার আসল উদ্দেশ্য কোনো রকমে ওকে ভুলিয়ে রাখা। টকি দেখবার জন্যে গাড়ি ডাকতে গিয়েছে বলে দেরি করিয়ে সে প্রায় সন্ধ্যা করে ফেললে। শরৎ ব্যস্ত হয়ে কেবলই তাগাদা দিতে লাগল—কখন গাড়ি আসবে, কখন যাওয়া হবে। হেনাও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল, এদের কারো দেখা নেই—পোড়ারমুখো গিরীনটা লম্বা লম্বা কথা বলে, তারও তো চুলের টিকি দেখা যাচ্ছে না, গিয়েছে সেই সকাল বেলা। যা করবি কর্‌গে বাপু, টাকাটা মিটিয়ে দিয়ে এ আপদ তোরা যেখানে পারিস্ নিয়ে যা, তার এত ঝঞ্ঝাটে দরকার কি? এদিকে একে আর বুঝিয়ে রাখা যায় না।

সন্ধ্যার পরে গিরীন এসে নিচের তলায় হেনাকে ডেকে পাঠালে।

হেনা তাড়াতাড়ি নেমে এসে বললে, কি ব্যাপার জিজ্ঞেস করি তোমাদের? আমার ঘাড়ে যে চাপিয়ে দিয়ে গেলে এখন আমি করি কি? ও যে থাকতে চাইছে না মোটে। কোথায় নেবে নিয়ে যাও না, আমি কতকাল ভুলিয়ে রাখবো? আমার থিয়েটার আছে কাল। কাল ওকে কার কাছে রাখবো? ওদিকে কদ্দূর করলে?

গিরীন তুড়ি দিয়ে গর্বের সুরে বললে, সব ঠিক।

—কি হ'ল?

—বুড়োকে ভাগিয়েছি। সে বলবো এখন পরে। সে পুঁটুলি নিয়ে বুঝলে—হি-হি-হি—

—কি বলো না?

—পুঁটুলি নিয়ে ভেগেছে হি-হি—ঝি চিঁড়ে আনতে গিয়েছে আর সেই ফাঁকে হি-হি—পুলিসের এ্যায়সা ভয় দেখিয়ে দিইছি, বুড়োটা আর এ মুখো হবে না।

—বেশ, এখন নিয়ে যাও—

—দ্যাখো, ওকে একটু ভুলোও-টুলোও। পাড়াগাঁয়ে গরীব ঘরে থাকতো, সুখ আমোদ-আহলাদের মুখ দেখে নি। গয়নাগাঁটি কাপড়-চোপড়ের লোভ দেখাবে—

—ওরে বাপ রে, বলেছি তো ও মেয়ে তেমন না। একটুখানি মাছমাংস খাওয়ার কথা

বলেছিলাম তো অমনি ফোঁস করে উঠল—আর কেবল হা বাবা যো বাবা—

—তবে আর তোমার কাছে দিয়েছি কেন হেনা বিবি ? পাকা লোকের কাছে রেখেছি, আজ রাতটা রেখে দাও, রেখে যা পারো করো। আজ আর নিয়ে যাই কোথায় ? এখনো কিছু ঠিক করি নি। প্রভাসের বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, প্রভাস বাড়ি থেকে বেরুতে পারছে না। অরুণ আজ নাইট-ডিউটি করবে আপিসে। আমি একা—

—কেন তুমি একাই একশো বলে যে বড্ড গোমর করো। লম্বা লম্বা কথা বলবার সময় হেন করেঙ্গা, তেন করেঙ্গা - এখন কাজের সময়ে হেনা বিবি তুমি করো। আরও টাকা চাই তা বলে দিচ্ছি—

—যাহোক, যা বললাম আজকার রাতটা তো রাখো—

—ও টকি দেখতে যাবে বলছিল, নিয়ে যাবো ?

—দরকার নেই। বাড়ির বার করবার হ্যাঙ্গামা অনেক। ভুলিয়ে রাখো—

—কাল সকালে এসো বাপু। কাল আমার থিয়েটার, আমার দ্বারা কাল কোনো কাজ হবে না বলে দিচ্ছি।

হেনা মুখ চুন করে শরতের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললে, বড় মুশকিল। প্রভাস-ঠাকুরপোর বাবার বড় অসুখ, এখন যান তখন যান। হঠাৎ অসুখ হয়ে পড়েছে। এই মাত্তর খবর দিয়ে পাঠিয়েছে।

শরৎ উদ্বেগের সুরে বললে, অসুখ ! তা বয়সও তো হয়েছে—বাবা বলেন তাঁর চেয়ে দশ-বারো বছরের বড় !

—তা তো বুঝলুম। এদিকে এখন উপায় !

—আজ কি দমদমা যাওয়া হবে না ?

—কি করে আর যাওয়া হচ্ছে বলো ভাই। প্রভাস-ঠাকুরপোর গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না তো—

—কেন ভাড়াটে গাড়ি ?

—কে নিয়ে যাবে ? তুমি আমি দুই মেয়েমানুষ। ভাড়াটে গাড়িতে ভরসা করে যাওয়া চলবে না। কাল সকালেই যা হয় ব্যবস্থা হবে।

শরৎদি অগত্যা রাজী হ'ল। না হয়ে উপায় যখন নেই।

সন্ধ্যার পরে শরৎকে সঙ্গে নিয়ে হেনা গিয়ে ছাদে উঠল। চারদিকে আলোর কুরকুটি, নিচের রাস্তা দিয়ে সারবন্দী গাড়ি ঘোড়া, মোটর, কর্মব্যস্ত জনস্রোত, ফিরিওয়ালারা কত কি হেঁকে যাচ্ছে, বেলফুলের মালাওয়ালা—'চাই বেলফুলের গোড়ে' বলে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে হাঁকছে, শরৎ মুগ্ধ চোখে চেয়ে চেয়ে দেখলে।

বললে, সত্যি, শহর বটে কোলকাতা। জায়গার মত জায়গা একথা ঠিক। কি লোকজন, কি আলোর বাহার ! আমাদের গাঁ এতক্ষণ অন্ধকার হয়ে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে জঙ্গলে।

হেনা অবসর বুঝে অমনি বললে, আমিও তো তাই বলি, এখানেই কেন থেকে যাও না ? সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। সুখে থাকবে, খাও-দাও, আমোদ-আহ্লাদ করে বেড়াও—

শরৎ হেসে বললে, তা তো বুঝলাম। আমার ইচ্ছে করে না যে তা নয়। কিন্তু চলবে কি করে ? বাবা গরীব মানুষ—

হেনা উৎসাহের সুরে বললে, সব বন্দোবস্ত হয়ে যাবে এখন। তুমি রাজী হয়ে যাও ভাই—

কি বন্দোবস্ত হবে ? বাবার চাকরি করে দিতে পারা যায় যদি, তবে সব হয়। গড়শিব-পুরের জঙ্গলে থেকে আমার প্রাণও হাঁপিয়ে উঠেছে—দুদিন এখানে থেকে বাঁচি—

—বেশ কথা তো! কলকাতার মত জায়গা আছে ভাই? এখানে নিত্য আমোদ, লোকজন—ইচ্ছে হ'ল আজ শিবপুরে কোম্পানীর বাগানে বেড়াতে গেলাম—ইচ্ছে হ'ল আজ জু'তে গেলাম—

—সে আবার কি?

—মানে চিড়িয়াখানা। যখন যেখানে যেতে চাও গেলে, যা খাবার ইচ্ছে হয় খেলে, এই তোমার বয়েস! হেসে খেলে যদি এখন না বেড়ালে তবে কবে আর কি করবে? মানব-জীবনে এই সবই তো আসল। জঙ্গলে থাকলাম আর আলোচাল খেলাম—এজন্যে কি আসা জগতে?

—কি করব বলুন। অল্প বয়সে কপাল পুড়েছে যখন, তখন কি আর উপায় আছে—ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ের? বাবাও টাকার মানুষ নন যে কলকাতায় বাসা করে রাখবেন।

—তুমি ইচ্ছে করলেই সব হয়। কলকাতায় থাকতে চাও, বাসা কেন··খুব ভাল ভাবে থাকতে পারবে এখন—স্টাইলে থাকবে। রেডিও রাখবে এখন বাড়িতে—

—সে কি?

—বেতার। ওই শোনো বাজছে—ওই যে দোকানের সামনে লোক জমেছে? গান গাইছে না? তার পর গ্রামোফোনে মানে কলের গান—

—জানি।

—সে কলের গান রাখো—মটর পর্য্যন্ত হয়ে যাবে। আজ এখানে বেড়াও, কাল ওখানে বেড়াও। ইচ্ছে হ'ল আজ কাশী বেড়াতে যাবে, কাল এলাহাবাদ কি দার্জ্জিলিং বেড়াতে যাবে—

শরৎ হি হি করে হেসে উঠে বললে, আপনি যে রূপকথার গল্প আরম্ভ করে দিলেন দেখছি। আমি মুখে বললেই সব হবে—এ যেন সেই আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের—যাক্ গে, সত্যি হোক না হোক—ভেবে তো নিলাম—বেশ লোক কিন্তু আপনি!

—আমি মোটেই গল্পকথা বলি নি ভাই। আপনি ইচ্ছে করলেই হয়—

—আমি কি আর ইচ্ছে করলে বাবার চাকরি করে দিতে পারি? অবিশ্যি আমিও বুঝতে পারি বাবার যদি থিয়েটারে চাকরি হয়, তবে সব হয়। বাবা যে কি চমৎকার বেহালা বাজান, সে আপনি শোনেন নি—কলকাতার থিয়েটারে সে-রকম পেলে লুফে নেয়। যেমনি বাজান, তেমনি গাইতে পারেন।

হেনার হাসি পাচ্ছিল। পাড়াগেঁয়ে একটা বুড়ো এমন বেহালা বাজায় যে তাকে কলকাতার বড় থিয়েটারে লুফে নিয়ে এত টাকা মাইনে দেবে যে তাতে ওদের বাড়ি, গাড়ি, জুড়ি, ঢাক, ঢোল সব হয়ে যাবে। শোনো কথা! বাঙাল কি আর গাছে ফলে?

হেনা চুপ করে ভাবলে। আর বেশী বলা কি উচিত হবে একদিনে? অনেকদূরে সে এগিয়েছে—অনেক কথা বলে ফেলেছে। মাগী কি সত্যিই বোঝে না—না ঢং করছে? কিন্তু যদি সত্যি ও বুঝতে পেরে থাকে তার কথার মর্ম্ম—তবে আর না বলাই ভালো। ভয় করে বাবা, এখনি ফোঁস্ করে উঠে একটা কাণ্ড বাধিয়ে তুলতে পারে। বাঙালনীকে বিশ্বাস নেই।

শরৎ বললে, কই বললেন না আমি ইচ্ছে করলে কি করতে পারি?

এ কথার জবাবে হেনা খপ্ করে বলে ফেললে, তুমি বুঝতে পারছো না ভাই সত্যিই আমি কি বলছি?

এই পর্য্যন্ত বলেই হেনার হঠাৎ বড় ভয় হ'ল। চোখ বুজে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার দরকার নেই—আপাততঃ সাহসও নেই তার। কথা সামলে নেবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে একই নিশ্বাসে সে কণ্ঠস্বরকে লঘু ও হাস্য-তরল করে এনে বললে, বুঝলে এবার? একটু ঠাট্টা করছি

তোমায়। তাই কি কখনো হয় ? তুমি আমি বললে কি হবে বলো। এমনি বলছিলাম। চলো নিচে যাই—রাত্রে কি খাবে ?

—কিছু না। আমি কিছু খাইনে রাত্রে।

—বেশ, একটু দুধ একটু মিষ্টি খেতে আপত্তি আছে ?

— আমি কিছুই খাবো না, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

হেনা মনে মনে বললে, তুমি না খেয়ে মরো না, আমার কি ? এমন একগুঁয়ে বাঙাই যদি আর কখনো দেখে থাকি। যা বলবে তাই। 'না' বললে আর 'হাঁ' করাবার জো নেই।

এই সময় নিচের তলায় খুব একটা চেঁচামেচি শোনা গেল। কে জড়িত স্বরে চীৎকার করছে, কে গালাগালি করছে।

শরৎ ভীতমুখে বললে, ও কি ভাই ? কে চেঁচাচ্ছে ? আমাদের বাড়িতে না ?

হেনা পাংশু মুখে বললে, না, ও আমাদের বাড়ি নয়।

হরি সা মদ খেয়ে কমলার ঘরে ঢুকে নিত্যকার মত উপদ্রব শুরু করেছে। সর্ব্বনাশ।

এই সময় নিচে মারধরের শব্দ শোনা গেল। এও নতুন নয়, হরি সা মদ খেয়ে এসে কমলাকে ঠেঙায় মাঝে মাঝে—পয়সার খাতিরে গায়ের কালশিরে ঢেকে আবার হাসতে হয় কমলাকে। কিন্তু—

শরৎ ব্যস্ত হয়ে বললে, না, দেখুন, আমাদের বাড়িতে নিচের ঘরেই। কমলার ঘরের দিকে মনে হচ্ছে। যান, যান, আপনি শীগ্গির যান। দেখুন—চলুন যাই আমরা। কে হয়তো বদমাইশ ঘরে ঢুকেছে—

চেঁচামেচি বাড়ল। আর রক্ষা হ'ল না। হরি সা গর্দ্দভের মত চেঁচানি জুড়েছে। হরি সা যে একদিন মাটি করে দেবে সব, হেনা তা জানতো। সেই লম্বা কথাওয়ালা গিন্নীন এই সময় আসুক না দেখা যাক্।

কমলার গলার কান্না মেশানো আর্ত্ত সুর শোনা গেল—ও দিদি, তোমরা এসো, আজ আমায় মেরে ফেললে মুখপোড়া আর পারি নে দিদি উঃ আর রক্ষা হয় না।

তবুও অ্যাকট্রেস হেনা মরীয়া হয়ে শেষ চাল চাললে। মুখে দিব্যি শান্ত হাসি এনে বললে, ও আমাদের বাড়ি না, পাশের বাড়ির সেই বুড়ো মাতালটা। ছাদ থেকে মনে হয় যেন আমাদের বাড়ি। রোজই শুনছি। যাবেন না নিচে—জানলা দিয়ে ওদের ঘরটা দেখা যায় কি না ? আমাদের দেখলে আবার গালাগালি করবে। আমি তো এ সময় সিঁড়ি দিয়ে নামি নে—

সাত

ওদিকে কমলার চীৎকার তখনও শোনা যাচ্ছে।

শরৎ বললে, ও তো পষ্ট গঙ্গাজলের গলা—আপনি কি বলছেন ?

তার পর সে নিজে এগিয়ে গিয়ে কমলার ঘরে ঢুকলো। গিয়ে যা দেখলে তাতে সে অবাক হয়ে গেল। কমলা মেঝেতে পড়ে কাঁদছে, একটা কালো মোটা-মত লোক তক্তপোশের ওপর বসে, তার হাতে একখানা পাখা। পাখার বাঁটের দিকটা উঁচিয়ে বোধ হয় কিছুক্ষণ আগে সে কমলাকে মেরেছে, কারণ পাখাখানা উল্টো করে ধরা রয়েছে লোকটার হাতে।

শরৎকে দেখে কমলা দিশাহারা ভাবে বললে, আমায় মারছে গঙ্গাজল—আমায় বাঁচাও—

শরৎ কমলার হাত ধরে বললে, তুমি চলে এসো আমার সঙ্গে—

মোটামত লোকটা গর্জ্জন করে বলে উঠল, ও কোথায় যাবে ?

পরক্ষণেই সে শরতের দিকে ভাল করে চেয়ে, সুর নরম করে ইতরের মত রসিকতার সুরে বললে, তুমি আবার কে চাঁদ ?

শরৎ সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে কমলার হাত ধার তাকে ঘরের বাইরে আনতে গেল।

বুড়ো লোকটা বললে, ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ চাঁদ ? ওকে আমার দরকার আছে— তুমিও এখানে বসো না একটু—কোন্ ঘরে থাকো ?

পরে কমলার দিকে চেয়ে কড়া সুরে বললে, এই, যাবি নে। বোসে বলছি ?

শরৎ বললে, আপনি একে মারছেন কেন ?

—আমার ইচ্ছে—তুমি কে হে আমার কাজের কৈফিয়ৎ নিতে এসো ? আমার নাম হরি সা। বৌবাজারে আমার দোকানে ছাপ্পান্ন হাজার টাকার জল বিক্রী হয় মাসে—শুধু জল, বুঝলে চাঁদ। বোতলভরা জল—

শরৎ ততক্ষণে কমলার হাত ধরে ঘরের বাইরে এনেছে। কমলার পিঠের কাপড় তুলে দেখলে, পিঠেও অনেক জায়গায় লম্বা লম্বা মারের দাগ। হেনা কখন এসে নিঃশব্দে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছে। শরৎ তার দিকে চেয়ে বললে, দেখুন ওই কে একজন লোক কি রকম মার মেরেছে—কে ভাই উনি তোমার ?

কমলা চুপ করে রইল, তখন সে নিঃশব্দে কাঁদছে।

এ কথার উত্তর দিলে স্বয়ং হরি সা। কমলার পিছনে পিছনেই সে ঘরের বাইরে এসে বললে—আমি কে ওর ? শুধু ওকে জিজ্ঞেস করো ওর পেছনে কত টাকা খরচ করেছি আমি। হাড়কাটা গলির দোকানখানাই উড়িয়ে দিয়েছি ওর পেছনে—আমার—আচ্ছা আমি বসছি গিয়ে ঘরের মধ্যে। ও পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘরে আসুক—

শরৎ এতক্ষণও খুব খারাপ কোনো সন্দেহ করে নি। কমলার কোনো গুরুজন হবে এতক্ষণ ভেবেছিল—যদিও লোকটার কথাবার্ত্তার ধরনে সে রাগ করেছিল খুব। কিন্তু এবার তার বুকের মধ্যেটা হঠাৎ ধক্ করে উঠল, এ কোন্ সমাজে সে এসে পড়েছে যেখানে দাদামশায়ের বয়সী বৃদ্ধ নাতনীর বয়সী মেয়ের সম্বন্ধে এ ধরনের কথাবার্ত্তা বলে ? সে কোথায় এসে পড়েছে ! বুড়ো লোকটার সঙ্গে কমলার সম্পর্ক কি ?

প্রভাসের বৌদিদিই বা তাকে এত মিথ্যে বলতে গেল কেন ?

সে হেনার দিকে তীব্রদৃষ্টিতে চেয়ে বললে, আপনি জেনেশুনে আমায় কি সব কথা বলছিলেন এতক্ষণ ? আমায় আপনারা কোথায় এনেছেন ? এ সব কি কাণ্ড !

হেনা ঠোঁট উল্টে বললে, ন্যাও ন্যাও গো রাইমণি। অমন সতীপনা অনেককে করতে দেখেছি—প্রথম প্রথম যারা আসে, সবাই অমনি সতী থাকে ! কত দেখলুম, কত হ'ল আমাদের এ চক্ষের সামনে—

শরৎ রাগের সুরে বললে, তার মানে ? কি বলছেন আপনি ?

—যা বলছি তা বলছি, ভেবে দ্যাখো। আর ঢং দেখাতে হবে না তোমাকে। বেরিয়ে এসেছ তো প্রভাসের আর গিরীনের সঙ্গে—কোথায় এসে পড়েছ বুঝতে পারছ না ? তোমার একুল ওকুল দুকুল গিয়েছে। এখন যেখানে এসে উঠেছ সেখানেই থাকো—সুখে থাকবে। তোমার বাবা এখানে নেই—চলে গিয়েছে কাল। তুমি এখানে ওদের সঙ্গে পালিয়ে এসে উঠেছ শুনে—

শরতের মুখ থেকে হঠাৎ সব রক্ত চলে গিয়ে সমস্ত মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে হাঁ করে হেনার মুখের দিকে চেয়ে রইল। মুখ দিয়ে কোন কথা বার হ'ল না, শুধু তার ঠোঁট

দুটো কাঁপতে লাগল।

ওর অবস্থা দেখে হেনার ভয় হ'ল।

বাঙালনীর ঢং দ্যাখো আবার! ফিট-টিট হবে নাকি রে বাবা! আঃ কি ঝঞ্জাটেই তাকে ফেলে গেল ওই কথার ঝুড়ি গিরীনটা। এসে সামলাক্ এখন তাল।

সে কাছে এসে বললে, তা ভাই তুমি তো আর জলে নেই? ভয় কিসের? আমি তো বলছিলাম তোমার সব হবে। থাকো না এখানে আমাদের এই বাড়িতে। তোমায় মাথায় করে রেখে দেবে এখন ওরা। মটোর বলো, কালই মটোর হবে। রেডিও হবে, কলের গান হবে—যা আমি বলেছি। আপাদমস্তক জড়োয়া দিয়ে মুড়ে দেবে—ভয় কিসের তোমার? চাকর-চাকরাণীর মাথায় পা দিয়ে বেড়াও। মুখের কথা খসাও, কাল থেকে সব ঠিক করে দেবো—কি হবে সেই ধাবধাড়া গোবিন্দপুরের জঙ্গলে—

শরৎ এতক্ষণে যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। বললে, এমন লোক আপনারা—তা আমি ভাবি নি। মাথার ওপর ভগবান আছেন, আমি জানতাম না, সরল বিশ্বাস করেছিলাম প্রভাস দাদার ওপর। ভাইয়ের মত দেখতাম। আপনাদের ভেবেছিলাম ভদ্রঘরের মেয়ে। আমার বোকামির শাস্তি যথেষ্ট হয়েছে—

কান্নায় তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

হেনার মন যে পথকে আশ্রয় করে পোক্ত হয়েছে, সেই পথেরই সংকীর্ণ দৃষ্টি ওর মনুষ্যত্বকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে। পাপের পথে যে মনে মনে ঝানু হয়ে পড়ে, পুণ্যের আলো প্রবেশ করবার বাতায়ন-পথ তার নিজের অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে রুদ্ধ হয়ে যায়।

হেনার মন গলবার নয়।

সে বললে, কেন কান্নাকাটি করছো ভাই? প্রথম প্রথম অবিশ্যি একটু কষ্ট হয়—কিন্তু জগতে এসে সুখের মুখ যদি না দেখলে তবে করলে কি? এখানে দিব্যি সুখে থাকো—পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খাও—সব সয়ে যাবে।

শরৎ বললে, আপনি দয়া করে আর কিছু বলবেন না। আমি গরীব লোকের মেয়ে, বাসন মেজে ভাত রেঁধে কাঠ চ্যালা করে সংসার করে এসেছি এতকাল, এক দিনের জন্যেও ভাবি নি যে কষ্টে আছি। আপনাদের সুখ নিয়ে থাকুন আপনারা—

এই সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে দুপ্ দুপ্ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল গিরীন।

তাকে দেখে হেনা যেন অকূলে কূল পেয়ে গেল। তার দিকে ফিরে বললে, এই যে! বাপরে বাপ! এত ঝক্কি পোয়াবার জন্যে আমি রাজী হই নি, তা বলে দিচ্ছি। ওই নাও, সব খুলে বলেছি—যা বোঝো করো।

গিরীন বললে, কি, ও বলে কি?

—জিজ্ঞেস করো, তোমার সামনেই তো বিরাজ করছে সশরীরে—

গিরীন শরতের দিকে ফিরে বললে, কি? বলছ কি তুমি? তোমার বাবা তোমার কথা সব শুনে পালিয়েছে। এখানে থাকো পরম সুখে থাকবে—

শরৎ বললে, আপনি আমায় কোন কথা বলবেন না। আমায় ছেড়ে দিন দয়া করে—আমি গাঁয়ে চলে যাবো বাবার কাছে—

গিরীন বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বললে, সে গুড়ে বালি। এতক্ষণ গাঁয়ে রটে গিয়েছে সব। কোথায় দু-দিন দুরাত্ত কাটিয়েছ গাঁয়ের সবাই জেনে গিয়েছে। আর ঘরে জায়গা নেই তোমার—এখন যা বলছি তাতে রাজী হও চাঁদ—

শরৎ হঠাৎ তীব্র, পরুষ কণ্ঠে বলে উঠল, খবরদার! আমাকে যা তা বলবার কোনো এক্তার নেই আপনার জানবেন—সাবধানে কথা বলুন—

গিরীন কৃত্রিম ভয়ের ভান করে হেনার পেছনে লুকোবার অভিনয় করলে। বললে—ও বাবা, শূলে দেবার না ফাঁসিতে লটকাবার হুকুম হয়ে গেল বুঝি! তাল সামলাও হেনা বিবি—

শরৎ বললে, সে দিন নেই, আজ আমার বাবা গরীব, আমরা গরীব—নইলে আপনাদের মত ছোটলোককে শূলে ফাঁসে দেওয়া খুব বেশী কথা ছিল না গড়শিবপুরে—যাক্, আমায় যেতে দিন, আমি চলে যাবো—

গিরীন বললে, কোথায় যাবে চাঁদ? সে পথ বন্ধ—আমি তো—

শরৎ বলে উঠল, আবার ওই ইতরের মত কথা! আমি কোনো কথা শুনবার আগে আপনি আমার সামনে থেকে চলে যান—ভদ্রলোক বলে ভুল করে ঠকেছি—

শরতের কথাবার্ত্তার ভঙ্গীর মধ্যে ও কণ্ঠস্বরে এমন কি একটা জিনিস ছিল যাতে গিরীন কুণ্ডু যেন সাময়িক ভাবে ভয় পেয়ে চুপ করল।

হেনা ওকে আড়ালে চুপি চুপি বললে, কেন ও বাঙালনীকে রাগাচ্ছ। রাগিয়ে কাজ পাবে না ওর কাছে।

—বাপরে! কেবলই যে ফোঁস ফোঁস করে? আজ ওকে এখানে রাখো—

—আমি পারবো না, আমার থিয়েটার আজ—

—তুমি নিয়ে যাও কমলাকে। হরি সাকে আমি নিয়ে ফ্ল্যাটে তালা দিয়ে যাচ্ছি। থাকুক এখানে চাবি দেওয়া আটকানো—

হেনা ফিরে গিয়ে বললে, তোমার কথা হ'ল। বাড়ি যাবে কোথায়? সেখানে সব রটে গিয়েছে—গাঁয়ে যাবে কোন্ মুখে? এখানে সুখে থাকবে।

—সে ভাবনা আপনি ভাববেন না। আমার যে দিকে দু-চক্ষু যায় চলে যাবো। মা-গঙ্গা তো আছেন, শেষ পর্য্যন্ত। এমন কি করেছি আমি যাতে মা আমায় কোলে স্থান দেবেন না?

শরতের গলা আবার কান্নার বেগে আটকে গেল। বললে—লোককে বিশ্বাস করে আজ আমার এই দশা—কি করে জানবো যে মানুষের পেটে এত থাকে!

হেনা বললে, আচ্ছা, তাই হবে। না হয় মোটরে করে তোমাকে ইস্টিশানে রেখে আসুক—দেখে আসি নীচে—

সে চলে গেল। কমলাকে গিরীন কি বলতে নিয়ে গেল পাশে। শরৎ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হেনার ওপরে উঠে আসবার অপেক্ষা করলে। তার পর তার দেরি হচ্ছে দেখে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে দেখলে বাইরের দরজা বন্ধ। বাইরে থেকে ওরা তালা দিয়েছে।

শরৎ আবার ওপরে উঠে এল। একবার মনে করলে তালা দেয় নি, ওরা গাড়ির সন্ধানে গিয়েছে। আনতে দেরি হচ্ছে হয়তো।

শরৎ এসে চুপ করে ওপরে অনেকক্ষণ বসে রইল।

বাড়ি নির্জ্জন, নিস্তব্ধ। জলতেষ্টা পেয়েছে বড়, জল আছেও কিন্তু এ বাড়িতে সে জল-স্পর্শ করবে না, জলতেষ্টায় মরে গেলেও না। প্রভাসদার বাবার কি সত্যিই অসুখ? হয়তো সব মিথ্যে কথা ওদের। কথাতে কথাতে বিশ্বাস করেই আজ তার এই দশা। প্রভাসও লোক ভাল নয় নিশ্চয়ই।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। কেউ আসে না। শরৎ জানলা দিয়ে পাশের বাড়িতে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করলে। কোন লোক দেখা গেল না। দু ঘণ্টা তিন ঘণ্টা কেটে গেল, শরৎ বসে বসে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল। সম্পূর্ণ অসহায়, কেউ তাকে জানে না, কেউ চেনে না। কি সে এখন করে?

শেষ পর্য্যন্ত সে ভাবলে, এও ভালো, দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়ালও ভালো। ওরা না

আসুক, সে এখানে না খেয়ে মরবে—মরতে তার ভয় নেই। একবার আশা ছিল বাবার সঙ্গে দেখা করে সব কথা খুলে বলে—কিন্তু বাবার দর্শনলাভ অদৃষ্টে বোধ হয় নেই।

বিকেল হয়ে আসছে। পাশের বাড়ির গায়ে লম্বা ছায়া পড়েছে। শরৎ বসে বসে একটা উপায় ঠিক করলে। সে যেই দেখবে পাশের বাড়ির জানলায় লোক, তাকে সে নিজের অবস্থার কথা জানাবে। তার কথা শুনে দয়া হবে না কি ওদের? বাড়ির চাবিটা খুলিয়ে দেবে না তারা?

হঠাৎ সে দেখলে পাশের বাড়ির জানলায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে।

সে চেঁচিয়ে বললে, শুনুন, এই যে এদিকে—

মেয়েটি ওর দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চেয়ে বললে, আমায় বলছো—কি ভাই?

—আমায় এ বাড়িতে আটকে রেখেছে। আমি পাড়াগাঁ থেকে এসেছি—আমায় দোরটা খুলে দিন দয়া করুন আমার ওপর।

—এ তো হেনা দিদির বাড়ি। হেনা নেই?

—হেনা কে জানি নে। তবে কেউ এখন এ-বাড়িতে নেই। আমায় তালা দিয়ে বন্ধ করে রেখে চলে গিয়েছে—

—তোমার বাড়ি কোথায়?

—অনেক দূরে। গড়শিবপুর বলে একটা গাঁ—যশোর জেলা—

—এখানে কার সঙ্গে এসেছ?

—প্রভাস আর অরুণ বলে দুজন লোক—আমাদের গাঁয়ের—

মেয়েটি মুচকি হেসে বললে, তার পর ঝগড়া হয়েছে বুঝি? থাকো ভাই, থাকো। এসেছে যখন, তখন যাবে কোথায়?

শরৎ ব্যগ্রস্বরে বললে, না না—আপনি বুঝতে পারছেন না। ওরা আমায় ঠকিয়ে এনেছে, আমি ভদ্রলোকের মেয়ে। আমায় দোর খুলে দিন কাউকে বলে দয়া করে—আমায় বাঁচান—আমার সব কথা শুনুন—

মেয়েটি ঠোঁট উল্টে বললে, সবাই বলে ঠকিয়ে এনেছে। তবে এসেছিলে কেন? ওসব আমি কিছু করতে পারবো না—কে হ্যাঙ্গামা পোয়াতে যাবে বাপু তোমার জন্যে? যারা এনেছে, তাদের কাছে বোঝাপড়া করো গে—

কথা শেষ করে মেয়েটি জানলা থেকে সরে গেল। শরৎ জানত না যে এ পাড়ায় আশ-পাশের বাড়িতে যে-সব স্ত্রীলোক বাস করে, তারা কেউ ভদ্রঘরের নয়, মনে, চরিত্রে, পেশায় তারা হেনারই সগোত্র। এদের কাছ থেকে সাহায্য ভিক্ষা নিষ্ফল।

কিছুক্ষণ কেটে গেল। বিকেল বেশ ঘনিয়ে এসেছে। এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে শরৎ তাড়াতাড়ি ছুটে বাইরের বারান্দায় এসে দেখতে গেল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে একা কমলা। ওর পেছনে কেউ নেই। ওকে দেখে কমলা হাসিমুখে বললে—কি ভাই গঙ্গাজল?

তার পর তাড়াতাড়ি দু-তিনটে সিঁড়ি একলাফে ডিঙিয়ে এসে শরতের গলা জড়িয়ে ধরে বললে, গঙ্গাজল—কি কষ্ট ওরা তোমাকে দিলে! কোনো ভয় নেই ভাই, আমি যখন এসে গিয়েছি। তুমি পালাও—আমি লুকিয়ে দেখতে এসেছিলাম তোমার কি দশা হচ্ছে—হয়তো এতক্ষণে একটা উপায় হয়েছে ভেবেছিলাম। তুমি চলে যাও—আমার কাছে এ বাড়ির একটা চাবি থাকে, তাই রক্ষে।

এতক্ষণ শরৎ কথা বলবার অবকাশ পায় নি, এত তাড়াতাড়ি সব ব্যাপারটা ঘটল।

সে এইবার বললে, ভগবান আছেন গঙ্গাজল, তাই তোমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন ভাই—

আমার তো আর কেউ ছিল না—

কমলা বললে, তুমি ভাই তাড়াতাড়ি নেমে চলো, জিনিসপত্র কিছু এনেছিলে - সুটকেস কি পুঁটুলি—নেই ? —এসো নেমে। গিন্নীরা এসে পড়তে পারে। আমায় দেখলে গোলমাল করবে। হেনাদি থিয়েটারে গিয়েছে সে আজ এখুনি আসবে না।

শরৎ ওর সঙ্গে ফুটপাথে এসে দাঁড়াল।

কমলা বললে, ভাই, তুমি এখন কোথায় যাবে ?

—যেদিকে দু চোখ যায়—ভগবান আমার হাত ধরে যে পথে নিয়ে যাবেন। আমাদের গড়ের ভাঙা দেউলে সন্দে পিদিম দিয়েছি জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত—তিনি পথ দেখিয়ে দেবেন আমায়। পথ না হয়, মা-গঙ্গা আর কোলে থেকে ঠেলে ফেলবেন না।

কমলার চোখ ভরে উঠল। সে বললে, আমরা নরকের কীট ভাই, তোমার মত মেয়ের পায়ের ধুলো পড়ে আমাদের পাপের বাসা পবিত্র হয়ে গেল। একটু সাবধানে থেকো, তোমার রূপ যে কি তুমি নিজে জানো না। আমাদের মাথা ঘুরে যায়—পুরুষের দোষ কি দেবো ? তার পর সে আঁচল খুলে পাঁচটা টাকা নিয়ে শরতের হাতে দিয়ে বললে—এই টাকা কটা সঙ্গে রাখো দিদি। দরকার হবে, ছোট বোনের কাছ থেকে নিতে লজ্জা নেই। সুসময় আসে, অনেক রকমে শোধ দিতে পারবে।

শরৎ বললে, তুমিও কেন চলো না আমার সঙ্গে ? এই কষ্ট সহ্য করে মার খেয়ে কেন এখানে পড়ে থাকো ? চলো দুই বোনে পথে বেরুই ভগবানের নাম করে। তিনি নিরুপায়ের উপায়, একটা কিছু করে দেবেনই তিনি—

কমলা বিষণ্ণ মুখে বললে—না দিদি। আমার তা হবার নয়। আমার মা এখানে—মার বয়েস হয়েছে—তাঁকে ফেলে যেতে পারবো না। তা ছাড়া, আরও অনেক কাল এই পথের পথিক—এক পুরুষে নয়, অনেক পুরুষে। আমাদের উদ্ধার নেই—আমি যাবো বললেই যাওয়া হবে না। বাঁচি মরি এখানে থাকতে হবে। গোবরের গাদাতে জন্মেছি, গোবরের গাদাতেই মরতে হবে।

শরৎ কমলার চিবুক ধরে আদর করে বললে, না ভাই, গোবরের গাদায় তুমি পদ্মফুল—

কমলা অশ্রুসজল চোখে মাথা নিচু করে বললে, একটু পায়ের ধুলো দাও দিদি। ছোট বোন বলে মনে রেখো যেখানে থাকো—আমার আর দেরি করবার জো নেই—

কমলা বিদায় নিয়ে দ্রুতপদে চলে গেল।

কমলা চলে গেলে শরৎ বড় একা মনে করল নিজেকে। এতক্ষণ তবুও একটা অবলম্বন ছিল, তাও গেল। এখন থেকে সে সম্পূর্ণ একা, নিঃসহায়। কখনো এমন অবস্থায় পড়ে নি জীবনে। কোথায় সে এখন যায় ? বেলা পড়ে এসেছে—এই বিশাল অপরিচিত শহর সামনে। সুনির্দ্দিষ্ট পথে চিন্তাধারাকে চালিত করবার শিক্ষা ওর নেই—যারা এ বিষয়ে আনাড়ি, তাদের চিন্তা যেমন খাপছাড়া ধরনের, ওর বেলাতে তার ব্যতিক্রম হ'ল না। শরৎ ভাবলে—কালীঘাটে গিয়ে গঙ্গাস্নান করে শুদ্ধ হই—যা কিছু পাপ, যদি ঘটে থাকে কিছু, গঙ্গায় ডুব দিয়ে কেটে যাবে এখন—

একটা ঘোড়ার গাড়ি যাচ্ছিল পাশ দিয়ে। গাড়োয়ান এ পাড়াতেই থাকে এ পাড়ার স্ত্রীলোকদের সে চেনে—সওয়ারি খুঁজবার চেষ্টায় বললে, গাড়ি চাই ?

শরৎ যেন অকূলে কূল পেলে। গাড়ি ডেকে নিজে চড়তে পারতো না—কি করে গাড়ি ডাকতে হয়, কি বলতে হয়, এসবে সে অনভ্যস্ত। সে বললে, আমায় কালীঘাটে নিয়ে যাবে ?

—কেন যাবো না বিবিজান ? চলো—

—কত ভাড়া দিতে হবে ?

—তিন টাকা দিও, তোমাদের এ পাড়ার ভাড়া তো বাঁধাই আছে। ওই খেঁদি বিবি যায়, বড় পারুল বিবি সেদিন গেল—তিন টাকা দিলে। আমি যাস্তি লেবো না।

শরৎ দরদস্তুর করতে জানে না। দু টাকার জায়গায় তিন টাকা ভাড়ায় সওয়ারি পেয়ে গাড়োয়ান মনের আনন্দে গাড়ি ছুটিয়ে দিলে। গড়ের মাঠ দিয়ে যখন গাড়ি চলেছে, তখন শরতের মনে হ'ল একটা বিশাল জনস্রোতের মধ্যে সেও একজন। প্রকাণ্ড মাঠটার মধ্যে দিয়ে কত রাস্তা, কত গাড়ি ঘোড়া, ট্রাম গাড়ি, লোকজন ছুটেছে, চলেছে—দূরে গঙ্গাবক্ষে বড় বড় জাহাজের মাস্তুল দেখা যাচ্ছে। সকলের ওপর উপুড় হওয়া নীল আকাশের কতটা দেখা যাচ্ছে, মুচকুন্দ চাঁপাগাছের সারির নিচে সাহেবদের ছেলেমেয়েদের ঠেলে নিয়ে বেড়াচ্ছে ছোট ছোট ঠ্যালা গাড়িতে—জীবনটা ছোট নয়, সংকীর্ণ নয়—এত বড় জগতে যদি সবাই বেঁচে থাকে নিজের নিজের পথে—সেও থাকবে। ভগবান তাকে পথ দেখিয়ে দেবেন।

গাড়িতে বসে গতির বেগে মন যখন পুলকিত, তখন অনেক কথা এমন অল্প সময়ের জন্যে মাথায় আসে, শরীরের জড়তার সুদীর্ঘ অবসরে নিষ্প্রভ ও অলস মন যা কখনো কল্পনা করতে পারে না।

এই অল্প সময়টুকুর মধ্যেই শরৎ অনেক কথা ভেবে ঠিক করলে। সে আর গড়শিবপুরে ফিরবে না।

বাবা সেখানে গিয়ে আছেন, হয়তো তিনি গিয়ে বলেছেন মেয়ে তাঁর মারা গিয়েছে। সে গেলেই গ্রামে কলঙ্ক রটবে। সে কলঙ্কের হাত থেকে বাবাকে সে রক্ষা করবে।

কোথায় সে যাবে ? তা সে জানে না আজ, যদি কখনো কারো অনিষ্ট চিন্তা না করে থাকে জীবনে, কখনো অন্যায় না করে থাকে—তবে সে-সবের জোর নেই জীবনে ?

কালীঘাটে পেঁছে সে গঙ্গায় ডুব দিলে, তার পর আর কোথাও যাওয়া নিরাপদ নয় ভেবে সে কালী-মন্দিরের সামনে চুপ করে বসে রইল।

সন্ধ্যার আরতি আরম্ভ হ'ল। কত মেয়ে সাজগোজ করে আরতি দেখতে এল। তার মধ্যে ও চুপ করে বসে বসে সকলের দিকে চেয়ে দেখলে। কত বৃদ্ধা এসে দোরের কাছে ওর পাশে বসলো। রাত্রি বেশী হ'ল। ও ভাবলে কোথায় যাবে এখন। কোনো জায়গা নেই যাবার। এত বড় বিশাল শহরে অসহায়, তরুণী নারীর পক্ষে নিরাপদ স্থান কোথায় এই দেবমন্দির ছাড়া। সুতরাং সে বসেই রইল। বসে বসে মনে পড়লো বাবার কথা। গড়শিবপুরের জঙ্গল-ঘেরা বাড়িতে বাবাকে একা হয়তো এতক্ষণ হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে হচ্ছে। আনাড়ি মানুষ, কোন দিন জীবনে কুটোটা ভেঙে দুখানা করার অভ্যেস নেই, বেহালা বাজিয়ে আর গান গেয়েই নিশ্চিন্ত দিনগুলো কাটিয়ে এসেছেন বাবা—শরৎ তাঁর গায়ে আঁচটুকুও লাগতে দেয় নি। আজ সে থেকেও নেই, বাবার কি কষ্টই হচ্ছে! তার কথা মনে ভেবে বাবার কি শান্তি আছে ?

শরতের চোখে জল এল। বাবার কথা মনে পড়লে মন হু-হু করে। সে কিছুতেই চুপ করতে পারে না, ইচ্ছে হয় সে এখুনি ছুটে চলে যায় সেই গড়শিবপুরের ভাঙা বাড়িতে, বড় কাঁঠাল কাঠের পিঁড়িখানা বাবাকে পেতে দেয় রান্নাঘরের কোণে—একটা চটা-ওঠা কলাই-করা পেয়ালায় বাবাকে চা করে দিয়ে ছোট্ট খুকীর মত বাবার মুখের দিকে চেয়ে বসে বসে গল্প শোনে।

মন্দিরের সামনে নাটমন্দিরে একজন সন্ন্যাসিনী ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছে—ওর নজর পড়লো। তার চারিপাশ ঘিরে অনেক মেয়েছেলে জড়ো হয়ে কেউ হাত দেখাচ্ছে, কেউ ওষুধ নিচ্ছে, কেউ শুধু বা কথা শুনছে। শরৎ সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে এই দেবমন্দিরের

পবিত্রতা অনুভব করতে চাইছিল—যে ঘরে সে আজ দুদিন কাটিয়ে এসেছে তার সমস্ত গ্লানি, অপবিত্রতা, পাপ—এই দেবায়তনের ধূপধুনার সৌরভে, শংখঘণ্টার ধ্বনিতে, সমবেত ভক্তমণ্ডলীর প্রাণের নিবিড় আগ্রহে যেন ধুয়ে যায়, মুছে যায়, শুভ্র হয়ে ওঠে, নির্ম্মল হয়ে ওঠে। কালীঘাটের মন্দিরের সেবকদের লোভ যেখানে উগ্র, পূজার্থীদের অর্থ শোষণ করবার হীন আকাঙ্ক্ষা সব ছাপিয়ে যেখানে প্রবল হয়ে উঠেছে—পূজার মধ্যে ব্যবসা এসে ঢুকেছে, বৈষয়িকতা এসে ঢুকেছে—সে সব দিক পল্লীবাসিনী শরতের জানা নেই। তার মুগ্ধ মনের ভক্তি ওর চোখে যে অঞ্জন মাখিয়েছে, তার সাহায্যে প্রাচীন ভারতের সংস্কারপূত বাহান্ন পীঠের এক মহাপীঠস্থান জাগ্রত হয়ে উঠেছে ওর মনে, বুদ্ধদেবের সেই অমর বাণী 'মনই জগৎকে সৃষ্টি করে'—শরতের মনে মহারুদ্রের চক্রছিন্ন দক্ষকন্যা সতীর দেহাংশ সতী নারীর তেজ ও পাতিব্রত্যের প্রতীক স্বরূপ এখানকার মাটিতে আশ্রয় নিয়েছে। এই মাটি তার মনে তেজ ও বল দিক। সন্ন্যাসিনীর সামনে বসে সারারাত কাটিয়ে দিলে সে। কিছু কিছু কথাও হ'ল সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে। সামান্য কিছু ফলমূল কিনে ক্ষুন্নিবৃত্তি করলে।

সন্ন্যাসিনী বললে, বাড়ি কোথায় তোমার?

—গড়শিবপুরে।

—এখানে কোথায় থাকো?

—কোথাও না মা। মন্দিরেই আছি এখন। আশ্রয় নেই কোথাও।

—তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি বড়ঘরের মেয়ে। কে আছে তোমার? কি করে এখানে এলে মা? একটা কথা জিজ্ঞেস করি কিছু মনে কোরো না—কারো সঙ্গে—মানে কেউ ভুলিয়ে নিয়ে এসেছিল?

কিন্তু একথা জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে সঙ্গেই শরতের সরল, তেজোদৃপ্ত মুখের সুকুমার রেখার দিকে, তার ডাগর, কালো, নিষ্পাপ চোখ দুটির দিকে চেয়ে সন্ন্যাসিনী এ প্রশ্ন করার জন্যে নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়ল।

শরৎ মুখ নিচু করে বললে, না, মা। ও সব নয়। তবে সব তো বোঝেন, মেয়েমানুষের অনেক শত্রু—বিশেষ করে মা, যে সকলকে বিশ্বাস করে তার শত্রু এখন দেখছি চারিদিকেই। ভুলিয়েই এনেছিল বটে মা তবে আমি ভুলে আসি নি। বুঝলেন মা।

—তোমার বয়েস কত মা?

—সাতাশ বছর।

—কিন্তু তোমার রূপ এই বয়েসে যা আছে, তা কুড়ি বছরের যুবতীরও থাকে না—তোমার বড় বিপদ এই কলকাতা শহরে। আমার এখানে থাকো—কোথাও গেলে তোমার বিপদ ঘটতে দেরি হবে না মা।

শরতের চোখ ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। এই তো মা সতী রাণী তাকে আশ্রয় দিয়েছেন। ঠাকুর-দেবতার মাহাত্ম্য কলিকালে তবে নাকি নেই? বাবা তো নাস্তিক, সন্ধে-আহ্নিকটা পর্য্যন্ত করবেন না। সে কত বকুনির পর জোর করে আসন পেতে বাবাকে আহ্নিকে বসাত। বাবার কথা মনে পড়তে শরতের চোখের জল আর থামে না। বাবা কি আর সন্ধে-আহ্নিক করছেন? উত্তর দেউলে এই সন্ধ্যায় বাদুড়নখীর জঙ্গল ঠেলে কে সন্ধে-পিদিম দিচ্ছে আজকাল? কেউ না।

বহুদূরে থেকে সে দেখতে পায়, ভগ্ন দেবীমূর্ত্তি'র পায়ের চিহ্ন বনে-জঙ্গলে নিদ্দেশহীন কালো নিশীথ রাত্রে এখনও অমনি পড়ে যাচ্ছে, ভয়ে শিউরে উঠে কুটীরের ঘরে অর্গলবন্ধ করবার জন্যে সে আর সেখানে নেই। রাজলক্ষ্মী? সে কি আছে—সে আর সেখানে আসে না। কেনই বা আসবে?

শরৎ সেখানেই রইল সেদিনটা। সন্ধ্যার পরে অনেকগুলি মেয়ে আসে—রোজ শাস্ত্রকথা হয়। শরৎ বড় ভালবাসে শাস্ত্রকথা শুনতে, একদিন নকুলেশ্বরের মন্দিরে কথকতা হ'ল। আরও কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে সেখানে শরৎ গেল। কথকতার পর প্রসাদ বিতরণের পালা। সকলের সঙ্গে শরৎও শালপাতা পেতে বাতাসা, শসা, ছোলা ভিজে, ফলমূল নিয়ে এল। সন্ন্যাসিনী ব্রাহ্মণের মেয়ে তিনি স্বপাক ভিন্ন খান না, নিজে রান্না করেন, শরৎকে শাল-পাতে ভাত বেড়ে দেন। সারাদিন খাওয়া হয় না--সন্ধ্যার পর রান্না চড়ে।

তিন-চার দিন পরে একটি বড়লোকের গৃহিণী এলেন সন্ন্যাসিনীর কাছে। স্নানের ঘাটে যেতে শরৎকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন দুপুরে। বোধ হয় সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে তাঁর কিছু কথা হয়ে থাকবে শরতের সম্বন্ধে। বললেন—তোমাকে দেখে আমার বড় ভাল লেগেছে। তোমার নাম কি?

—শরৎসুন্দরী।

—কতদিন সন্ন্যাসিনীর কাছে আছো?

—বেশী দিন না।

—আমাদের সঙ্গে যাবে?

—কোথায় মা?

—আমরা বেরিয়েছি কাশী, গয়া করবো বলে। মুখে বলতে নেই—এখন হবে কি না তা জানি নে। ইচ্ছে তো আছে। আমার বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে লক্ষ্মৌ। সেখানে গিয়ে একবার মেয়ের সঙ্গে দেখা করবো। আমি যাচ্ছি আর আমার দুই মেয়ে, ছোট ছেলে আর কর্ত্তা। একটা লোক আমাদের দরকার। বয়েস হয়েছে—একা ভরসা করি নে সব ঝক্কি নিতে বিদেশে। তুমি চলো না কেন আমার সঙ্গে? মাইনে-টাইনে সব ঠিক করে দেবো এখন—কোনো অসুবিধে হবে না। গৌরী-মা বলেছিলেন তোমার কথা। কথা কি জানো, যে সে মেয়ে নিতে ভরসা হয় না। স্বভাব-চরিত্তির কার কি রকম না জেনে বাপু নেওয়া তো যায় না। গৌরী-মা যখন তোমার সম্বন্ধে বললেন—তখন আমার নিতে কোন আপত্তি নেই।

মহিলাটির প্রস্তাব ভালই—তবুও শরৎ বলল, ভেবে দেখি মা—আপনাকে আমি বলবো এখন সন্দেবেলা। গৌরী-মার কথকতা আপনি আসবেন তো শুনতে সন্দেবেলা?

তার পর মন্দিরে ফিরে এল ওরা স্নান সেরে।

গিন্নী বললেন, আমি এখন যাচ্ছি মনোহরপুকুর রোডে আমার মেজ জামাইয়ের বাড়ি। নাতির অসুখ, তাকে গৌরী-মার কাছে নিয়ে এসে মাদুলী ধারণ করাবো। জামাই খৃষ্টান মানুষ, ওসব মানে না। মেয়েকে বলে রেখেছি জামাই আপিসে বেরুলে নাতিকে মোটরে নিয়ে আসবো। যাবে আমার সঙ্গে?

শরতের যাবার কৌতূহল হ'ল। ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি করে ওরা অনেক রাস্তা গলি পার হয়ে একটা ছোট দোতলা বাড়ির সামনে এসে নামলে। শরৎ আশ্চর্য্য হয়ে ভাবলে, কলকাতার বড় লোক; দেখি ওদের বাড়ি-ঘর কি রকম—

প্রথমে এগারো বারো বছরের একটি মেয়ে নেমে এসে দোর খুলেই চেঁচিয়ে বলে উঠল—ও মা, কে এসেছে দ্যাখো—

একটি সুন্দরী মেয়ে ওপর থেকে নেমে এসে গিন্নীর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, মা কবে এলে? কখন এলে? চিঠি তো লিখলে না আজ আসছো? এ কে মা?

—ওকে নিয়ে এলাম। আমাদের সঙ্গে যাবে। গৌরী-মার কাছে এসেছে—সেখানে থাকে। পাড়াগাঁয়ে বাড়ি—কোন্ জায়গায় গো?

শরৎ বলল—যশোর জেলায় গড়শিবপুরে।

মেয়েটি বলল, এসো ওপরে এসো।

ওপরের ঘর বেশ চমৎকার সাজানো। শরৎ চেয়ে চেয়ে দেখলে। বড় বড় গদি-আঁটা চেয়ার, মেঝের উপর বড় বড় শতরঞ্জির মত আসন পাতা। তার ওপর দিয়ে মাড়িয়ে চলে যাচ্ছে সবাই, তবে আসন পাতা কেন? এক কোণে একটি ছোট পাথরের মূর্ত্তি,মেয়েটি বলল, তার শ্বশুরের চেহারা। বড় ডাক্তার ছিলেন, আজ ছ-বছর মারা গিয়েছেন। ফুল-দানীতে বড় বড় রজনীগন্ধার ঝাড়। রান্নাঘরের মধ্যে কল, রান্না করতে করতে কল টিপলেই জল, ভারী সুবিধে। ছ-সাতটা বড় কাঠের আলমারি-ভর্ত্তি মোটা মোটা বই। সেগুলো দেখিয়ে মেয়েটি বলল, শ্বশুর ডাক্তার ছিলেন বড়, নাম করতে পারি নে। তাঁর ডাক্তারি বই এগুলো — আরও সাত আলমারি বোঝাই বই আছে, নিচের ঘরে—শ্বশুরের শোবার ঘরে।

মেয়েটি শরৎকে কিছু মিষ্টি ও ফল খেতে দিলে।

তার পর গিন্নী মেয়ে ও নাতি সঙ্গে তাদের বড় মোটরে আবার এলেন কালীমন্দিরে। বেলা প্রায় তিনটে। শরৎ বলল, মা, আমি গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আসি, বড্ড গরম—

আসল কথা গরম নয়। গঙ্গাহীন দেশের মেয়ে শরৎ, গঙ্গাকে কাছে পেয়ে সর্ব্বদা ডুব দিয়ে পুণ্য সঞ্চয়ের লোভ দমন করতে পারে না। কিন্তু স্নান করে উঠে আসবার সময় শরৎ মহা বিপদের সামনে পড়ে গেল। স্নান করে উঠে কৃষ্ণকালী লেনের মুখে এসেছে, বাঁ দিকেই মনসাতলা ও কৃষ্ণকালীর মন্দিরে একবার দর্শন করে আসবে—হঠাৎ দেখলে তার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে গিরীন, প্রভাস ও আরও দুটো অজানা লোক। তারা চারিদিকে কি যেন খুঁজছে।

ওর সঙ্গে গিরীনের একেবারে চোখোচোখি হয়ে গেল। গিরীন আঙুল দিয়ে তার সঙ্গীদের ওর দিকে দেখিয়ে বলল—এই যে! তার পর সবাই মিলে এসে ওকে ঘিরে ধরলে। গিরীন বলল, তার পর? রাগ করে ঝগড়া করে পালিয়ে এসে এখানে আছ? চল বাড়ি চলো—

সঙ্গীদের দিকে চেয়ে বলল, কেমন বলেছি কি না যে ঠিক কালীঘাটে খুঁজলেই পাওয়া যাবে। আজীর গাড়োয়ান দেখ ঠিক সন্ধান দিয়েছিল। বাবা, এ সব ডিটেক্‌টীভগিরি কি তোমাদের কর্ম্ম?

প্রভাস বলল, চলো শরৎ দিদি, ফিরে চলো—রাগ কেন? আর রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে হয়?

ওদের কথাবার্ত্তার সুরে এমন একটা সহজ ভাব নিয়ে এসে ফেলেছে যেন শরৎ ওদের বহুদিনের ন্যায্য অভিভাবকত্ব থেকে বঞ্চিত করে নিজের একগুঁয়েমি এবং বদমেজাজের দরুন নিজে চলে এসেছে। ওরা যথেষ্ট উদারতা দেখিয়ে আবার ফিরিয়ে নিতে এসেছে। গিরীন বলল, নাও হয়েছে, কোথায় বাসা নিয়েছ চল দেখি—জিনিসপত্র কিছু আছে-টাছে? প্রভাস একখানা গাড়ি ডেকে আনো—এসো—

শরৎ হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, এতক্ষণে যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বলল, আপনি আবার এসেছেন এখান পর্য্যন্ত? কেন এসেছেন, আমি আপনাদের সঙ্গে যাবই বা কেন? আপনাদের সাহস তো খুব।

প্রভাসের দিকে চেয়ে বলল, আর প্রভাসদা, আপনাকে মায়ের পেটের ভাইয়ের মত জ্ঞান করতাম—তার সাজা খুব দিয়েছেন। এত খারাপ হয় লোকে তা আমি বুঝি নি। বাবা কোথায়? বাবার খবর কিছু আছে?

গিরীন ওদের দিকে সাট করে চোখ টিপে বলল—আরে আছেই তো। তিনি তো কাল থেকে এসে আমাদের ওখানে প্রভাসদের বাড়ি বসে। সেই জন্যেই নিতে আসা—চলো।

শরৎ বলল, মিথ্যে কথা। বাবা কখনো আসেন নি। হ্যাঁ প্রভাসদা সত্যি? বাবা এসেছেন সত্যি বলুন—

প্রভাস বলল, মিথ্যে বলে লাভ? এসো দেখবে চলো। গাড়ি আনি।

—গাড়ি আনতে হবে না প্রভাসদা। বাবা কখনো আসেন নি। এলে আপনাদের সঙ্গে এখানে আসতেন।

—আমাদের কথা বিশ্বাস হ'ল না? যাবে কি না তাই বলো।

কলকাতা শহরের রাস্তা—একটি তরুণী মেয়েকে ঘিরে তিন-চারজন লোককে কথা-কাটাকাটি করতে দেখে দু-একজন লোক জমতে শুরু করল। একজন ছোকরা এগিয়ে এসে বলল, কি হয়েছে মশাই?

গিরীন কুণ্ডু ঈষৎ সলজ্জ সুরে বলল, ও আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার মশাই। আপনারা যান।

আর একজন বলল, ইনি কে? কি বলছেন? আপনারা নিয়ে যেতে চাইছেন কোথায়?

প্রভাস বলল, উনি আমাদের লোক—

গিরীন বলল, মশাই আপনারা ভদ্দর লোক, চলে যান। আমাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে—সে-সব কথা শুনে আপনাদের লাভ কি? আমাদের মেয়েমানুষ ঝগড়া হয়ে রাগ করে চলে এসেছে, তাই নিয়ে যেতে এসেছি।

কে একজন বাইরে থেকে বলে উঠল—ওহে চলে এসো না—ওসবের মধ্যে থাকবার দরকার নেই, ও বুঝতে পেরেছি। এসব জায়গায় ওরকম কত কাণ্ড নিত্যি ঘটছে।—

শরৎ অবাক, স্তম্ভিত। এমন সহজ ভাবে এমন নির্লজ্জ মিথ্যা কথা কেউ যে বলতে পারে তা তার ধারণার বাইরে। সে এর প্রতিবাদ করতেও পারলে না, প্রকাশ্য রাজপথে অপরিচিত পুরুষ বেষ্টিতা অবস্থায় কথা-কাটাকাটি করা, চীৎকার করে ঝগড়া করা তার ঘটে লেখা নেই, তার স্বভাবজ শোভনতা-বোধ মুখে যেন হাত চাপা দেয়। সে মরে যাবে তবুও পথে দাঁড়িয়ে ইতরের মত ঝগড়া করতে পারবে না।

লোকজন চলে যেতে শুরু করলে। শরৎ এগিয়ে যেতে চাইল, গিরীন কুণ্ডু এসে পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলল, নাও চলো—খুব চলান চলালে রাস্তায় দাঁড়িয়ে, এতগুলো ভদ্দরলোক জুটিয়ে ফেললে চারিদিকে এখন ফিরে চলো আমাদের সঙ্গে—রাগ অভিমান করে কি পালিয়ে এলে চলে চাঁদ?

গিরীন যেন রাস্তার লোককে শুনিয়ে শুনিয়ে এ কথাগুলো চেঁচিয়েই বলল।

শরতের হঠাৎ বড় রাগ হ'ল, গিরীনের মিথ্যা কথায়, ধূর্তামি ও শেষের কথার ইতর সম্বোধনে।

সে বলল, আবার ঐ কথা মুখে? আপনার সাধ্য নেই এখান থেকে আমায় নিয়ে যান। আমি এখানে চলে এলাম—এখানেও আপনারা এলেন? পথ ছেড়ে দিন বলছি—

শরৎ তখনই মনে ভেবে দেখলে এই দল যদি তার সঙ্গে যায় বা যে মহিলাটির আশ্রয় সে পেয়েছে তারা যদি এখন এখানে এসে পড়ে, তবে এদের সাজানো মিথ্যে কথায় তাদের মনে সন্দেহ জাগবে এবং তারা তাকে কুচরিত্রা ভেবে তখনই পরিত্যাগ করে চলে যাবে। তা হলে সে একেবারে অসহায়—এই সব শুনলে গৌরী-মা কি তাকে জায়গা দেবেন আর?

যাক্, যদি কেউ আশ্রয় না দেয়, গঙ্গা তো কেউ কেড়ে নেবে না?

গিরীন আবার বলল, দাঁড়াও এখানে গাড়ি ডাকি—মিছে রাগ করে কি হবে বলো!

সুর নিচু ও নরম করে বলল, চলো—কেন মিথ্যে পথে পথে ঘুরে কষ্ট পাও। এখানে আছ কোথায় বলো তো? খুব সুখে থাকবে। আমাদের সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। প্রভাস

মাসে পঞ্চাশ টাকা দেবে—আমি আর অরুণ পঞ্চাশ। আলাদা বাড়ি ভাড়া করে থাকতে চাও, পাবে—হেনার বাড়িতেও থাকতে পারো। নেক্‌লেস আর চুড়ি সামনের হপ্তাতেই পাবে। ঘর সাজিয়ে দেবো দুশো টাকা খরচ করে। কলের গান কিনে দেবো। পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাকবে, যা যখন হুকুম করো ইচ্ছামত—

শরৎ ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, আবার ওই সব কথা? চলে যান আপনারা! আপনাদের দেখলেও পাপ হয়। আমি এই পথে বসে থাকবো, মা কালী আমায় আশ্রয় দেবেন—

গিরীন জানতো রাস্তার ওপর কোনো জোর করতে গেলেই লোক ছুটে হৈ চৈ বাধিয়ে দেবে, পুলিস আসবে—সব পণ্ড হবে। মিষ্টি কথায় কাজ হাসিল হ'ল না দেখে সে ভয় দেখাতে আরম্ভ করল। চোখ রাঙিয়ে বললে, সহজে না যাও—জানো আমি কি করতে পারি? আমার নাম গিরীন কুণ্ডু—থানায় এজাহার করবো তুমি হেনা বিবির হার চুরি করে এনেছ। এক্ষুনি চালান দিয়ে দেবো জানো? হেনা সাক্ষী দেবে—আজ রাতেই হাজতে বাস করতে হবে। ও বাঙালের বাঙালগিরি কি করে ঘোচাতে হয়, সে আমি জানি—তুমি এখানে আছ কোথায় শুনি?

শরৎ বলল, বেশ তাই করুন। ভগবান জানেন আমি কোনো অপরাধ করি নি। এখনও চন্দ্র সূর্যি উঠছে—আমি জীবনে পরের কুটো গাছটাতে কখনো হাত দিই নি। তিনি কখনো আমায় মিছিমিছি শাস্তি—

হঠাৎ নিজের অসহায় অবস্থা কল্পনা করে এবং ভগবানের উপর নির্ভরতার অনুভূতিতে শরতের চোখে জল এসে পড়ল—সে কেঁদে ফেললো।

ক্রন্দনরতা মেয়ে পথের ওপর, তখনই কৌতুহলী জনতা জমতে আরম্ভ করল আবার।

একজন ষণ্ডা গোছের তোয়ালে-কাঁধে লোক এগিয়ে এসে বললে, কি হয়েছে? কে আপনি? উনি কাঁদছেন কেন মশাই?

ভিড়েরই একজন বলল, তা কি জানি? আপনার সঙ্গে কে আছেন মা? হয়েছে কি?

আর একজন বলল, আপনি কোথায় যাবেন? কি হয়েছে আপনার বলুন তো মা?

এরা গিরীনের দলকে ঠাওর করতে পারে নি—সুতরাং তাদের সঙ্গে জনতার কথা বিনিময় হ'ল না। জনতার সুর ক্রমশঃ উত্তেজিত ও কৌতুহলী হয়ে উঠতে দেখে গিরীন বুঝলে এখানে কথা বলতে যাওয়া মানেই বিপদ টেনে আনা। এরা কোনো কথা শুনবে না, সকলেরই সহানুভূতি ক্রন্দনরতা নারীর দিকে। মার খেতে হবে বেশী কথা বললে। বাতাসের মোড় হঠাৎ এমন ভাবে ঘুরে যাবে, তা ওরা ভাবে নি।

গিরীন কুণ্ডু আর যাই হোক, নির্বোধ নয়। বেগতিক বুঝে সে দলবল নিয়ে মুহূর্তে হাওয়া হয়ে গেল।

শরৎ যখন নাটমন্দিরে ফিরে এল, তখন বেলা পাঁচটা।

গৌরী-মা বললেন, এত দেরি হ'ল যে মা? এসে একটু প্রসাদ খেয়ে নাও। ওরাই পুজো দিয়ে গেল। কাল যাবে তো ওদের সঙ্গে?

শরৎ বলল, যাবো মা, আপনি যা বলেন।

শরৎ ইতিমধ্যে পথে আসতেই ঠিক করে ফেলেছে সে ওদের সঙ্গে যাবে। এখানে থাকলে তার সমূহ বিপদ। আজ উদ্ধার পেয়েছে, কিন্তু যদি গিরীন তোড়জোড় করে আর একদিন আসে—আসবেই সে, তখন হয়তো জোর করেই নিয়ে যাবে। সন্ধ্যাবেলা গৌরী-মার কথকতা শুনতে গিন্নী এলেন, সব ঠিক হয়ে গেল—কাল বেলা তিনটার সময় শরৎ তৈরী থাকবে। কালই রওনা হতে হবে ওদের সঙ্গে।

রাত্রিটা নিতান্ত ভয়ে ভয়ে কেটে গেল। সকালে উঠে শরৎ গৌরী-মার সঙ্গে গঙ্গাস্নান

করে এল। তাও তার বুক ঢিপ ঢিপ করছিল, কোন দিক থেকে ওরা এসে পড়ে নাকি। ভগবান কাল বড় বাঁচিয়ে দিয়েছেন! মানুষ এত খল হতে পারে, এমন নয়-কে হয় করতে পারে, হাসিমুখে নির্জলা মিথ্যে বলতে পারে—গ্রাম্য মেয়ে শরতের তা জানা ছিল না। বিশেষ করে সে যে বাপের মেয়ে! কেদারের মেয়ে তাঁরই মত সরল।

গৌরী-মা বললেন, নকুলেশ্বর তলায় গিয়ে একটু প্রসাদী বেলপাতা নিয়ে এসো। তোমার যাত্রার দিন, ওদের যাত্রার দিন। মায়ের ফুল বেলপাতা আমি মন্দির থেকে এনে দেবো।

যাবার সময় গৌরী-মার চোখে জল এল, বললেন—তিনদিনের মায়া, তাতেই তোমায় ছেড়ে দিতে মন কেমন করছে। আবার এসো, দেশে ফেরবার সময় এখান দিয়েই হয়ে যাবে সরলারা।

শরৎ চোখের জলে ভেসে গৌরী-মার পায়ের ধুলো নিলে, বলল—অনেকদিন মাকে হারিয়েছি, আবার সেই মায়ের কথা আমার আপনাকে দিয়ে মনে পড়লো। আশীর্বাদ করুন মা।

হাওড়া স্টেশন। মস্তবড় জায়গা। লোকজন গমগম করছে। লম্বা লম্বা রেলগাড়ি ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াচ্ছে। আলোয় আলো চারিদিকে। ঘরের মধ্যে এসে রেলগাড়ি দাঁড়ায় কেমন করে?

সে সত্যিই চললো তবে? কোথায় চললো?

বাবার সঙ্গে আর দেখা হবে না। কোথায় পড়ে রইল তার আবাল্য-পরিচিত গড়-শিবপুর! যেখানকার গড়ের জঙ্গলে, তাদের কালো পায়রার দীঘির জলে, চৈত্র মাসে তুলো-ওড়া বড় শিমুল গাছটার ছায়ায়, উত্তর দেউলের নির্জন পথে বাদুড়নখীর শুকনো খোলের ঝুমঝুমির শব্দে তার যে জীবনের শুরু, সেই মাটিতেই—সেখানকার জ্যোৎস্নার মধ্যে, বর্ষার দিনের মেঘের ছায়ায় যে জীবন সুখেদুঃখে আপন পথ ধরে চলে এসেছিল এতদিন—সে জীবনের সঙ্গে আজ চিরদিনের মত ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

শরৎ জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে দিল। চোখের জলে দ্রুত পলায়নপর টেলিগ্রাফের তারের খুঁটি, গাছপালা, ঘরবাড়ি সব ঝাপসা। কামরার মধ্যে শরৎ চেয়ে দেখলে অবাক হয়ে। কাদের সঙ্গে সে আজ দেশ ছেড়ে যাচ্ছে? কারা এরা? ওই মোটামত ফর্সা রঙের গিন্নী, এই চৌদ্দ বছরের মেয়ে, ওই তিন চারটি ছোট বড় খুকি, কর্তা আছেন পুরুষগাড়িতে—এদের তো সে চেনে না।

বাবা গান গাইতেন—'দিয়ে মায়াবেড়ি পদে ফেলেচ বিপদে।'

কত যে তার সাধ ছিল দেশবিদেশে বেড়াতে! গড়শিবপুরের জঙ্গল ভাল লাগে না। রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে সে কত গল্প! আজ তো সে-সব সফল হতেই চললো—কিন্তু এ ভাবে সর্বস্ব ছেড়ে, বাবাকে ছেড়ে গড়শিবপুর জন্মের মত ছেড়ে যেতে হবে, জন্মজন্মান্তরের গভীর চেতনা দিয়ে যে গড়শিবপুর তার মন আঁকড়ে ধরে ছিল, তা সে কি কোনদিন ভাবতো?

আর সে ফিরবে না। বাবাকে সে কলঙ্কের হাত থেকে—লোকের টিটকিরি থেকে মুক্ত রাখবে। তার ভাগ্যে পরের বাড়ির দাসী হয়ে চিরকাল বিদেশে নির্বাসন—যা ঘটে ঘটুক—বুড়ো বয়সে বাবার মুখ হাসাতে পারবে না। বাবা হয়তো দেশে গিয়ে বলেছেন, মেয়ে মরে গিয়েছে। খুব ভাল। আর সে দেখা দেবে না। দেশের কাছে মৃত হয়েই থাকবে যতদিন বাঁচবে সে।

রাতের অন্ধকারে বাংলা মুছে গেল। কামরাটা ছোট—ধামা, লণ্ঠন, পেঁটরা, বিছানা, জলের কুঁজোতে একটা দিক ঠাসা, অন্য দিকে শরৎ গৃহিণীর জন্য বিছানা পেতে দিলে

বেঞ্চিতে। তার স্বাভাবিক সেবা-প্রবৃত্তি এখানেও সজাগ আছে।

গিন্নী বললেন, কোন্ ইস্টিশানে রে মিনু ?

তেরো-চোদ্দ বছরের মেয়েটি মুখ বাড়িয়ে বললে, ব্যাণ্ডেল জংশন—

—সব শুয়ে পড় তোরা। শরৎ ওদের বিছানা করে দাও—

মিনু তাড়াতাড়ি বলল, আমি বিছানা পেতে নিচ্ছি মা—আমার পাতাই আছে।

শরৎ অবাক হয়ে মেয়েটির দিকে চাইল। বাঃ, বেশ মেয়েটি। এতক্ষণ চুপ করে লাজুকের মত আপন মনে বসে ছিল।

পথে তার পর মেয়েটির সঙ্গে ওর বড় ভাব হয়ে গেল। ওর ভাল নাম মৃণাল, মৃদু স্বভাব, হৃদয়বতী। ও শরৎকে কি চোখে দেখে ফেলেছে, দিদি বলে ডাকে, লুকিয়ে হাতের কাজ কেড়ে নেয়।

জামালপুরে বদল করে ওরা গেল প্রথমে মুঙ্গেরে। সেখানে গিন্নীর ছোট ঠাকুর-পো চাকরি করে। গঙ্গার ধারে বেশ ভাল বাসা। তিন দিন ধরে ওরা কাটাল সেখানে, শরৎ মিনুকে সঙ্গে নিয়ে কষ্টহারিণীর ঘাটে রোজ স্নান করে আসে। গৃহিণীর বাতের ধাত, তিনি বাথরুমে স্নান করেন।

কষ্টহারিণীর ঘাটে প্রথমে যে দিন গিয়ে দাঁড়াল, শরতের মন অভিভূত হয়ে পড়ল—গঙ্গার রূপ দেখে। একদিকে জামালপুরের মাবক পাহাড়ের লম্বা টানা সুনীল রেখা, সামনে প্রশস্ত পুণ্যতোয়া জাহ্নবী, দু-একখানা পালতোলা নৌকা নদীবক্ষে, কত স্নানার্থীর যাতায়াত।

পৃথিবীতে এমন সুন্দর জায়গাও আছে ?

আবার চোখে জল আসে, শরৎ দেখে নি কখনো এসব।

মিনু বললে, দিদি চেয়ে দ্যাখো—এই যে ভাঙা পাঁচিল না ?—এখানে মীরকাসিমের দুর্গ ছিল। ওই যে ফটক দিয়ে এলাম—দেখলে তো ?

—তোর দিদি মুখ্যু মেয়ে, তোরা এ কালের ইস্কুলে পড়া মেয়ে—দিদিকে একটু শিখিয়ে নে। মীরকাসিমের দুর্গ বললে তো—কে ছিল সে ?

—আহা দিদি, তুমি কিছু জান না। শোনো বলি—

তার পর মিনু বিজ্ঞভাবে স্কুলে সদ্য-অধীত ইতিহাসের বিদ্যা সবিস্তারে জাহির করে।

শরৎ চোখ বড় বড় করে বলল—ও!

দিন বেশ কেটে যায়। একদিন সবাই মিলে চণ্ডীর মন্দিরে পুজো দিতে গেল, আর একদিন গেল সীতাকুণ্ড। মুঙ্গের থেকে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে গমের ক্ষেত, ছোলার ক্ষেতের পাশের পথ দিয়ে গিয়ে, কত ছোট বড় বস্তি ছাড়িয়ে কতখানি বেড়িয়ে এল সবাই মিলে।

পাহাড় জিনিসটা শরতের কাছে একটা বিস্ময়ের বস্তু।

প্রথম যেদিন মিনু ওকে দেখালে ঐ দ্যাখো দিদি জামালপুরের পাহাড়—শরৎ অপলক চোখে চেয়ে রইল সেদিকে। তারপর আরো ভাল করে দেখলে যেদিন মুঙ্গের থেকে ওরা বখ্‌তিয়ারপুর রওনা হ'ল। কাজরা স্টেশনের কাছে এবং স্টেশন ছাড়িয়ে বাঁদিকে সে কি লম্বা, উঁচু পাথরের পাহাড়—এত বড় বড় পাথর যে আবার হয়, তার এত বড় স্তূপ হয়—এ কথা কে আবার কবে ভেবেছিল ?

কিউলের কাছাকাছি এসে দূরে দূরে কত নীল পাহাড়—শরৎ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। দেখে মনে আনন্দ হয়, দুঃখও হয়—কেবলই মনে হয় বাবাকে এসব সে যদি আজ দেখাতে পারত!

রেলে যেতে যেতে একটা চমৎকার জায়গা সে দেখেছে মনের মধ্যে গেঁথে গেল জায়গাটা। কাজরা পাহাড়ের একটা কি সুবৃহৎ গাছের ছায়ায় অনেকটা যেন পাথরের সান বাঁধানো রোয়াক, চারিধারে শুধু পাহাড়, নিকটেই একটা ঝর্ণা ঝিরঝির করে পাহাড় থেকে বয়ে নেমে এসেছে। কি শান্তি পাহাড়ের ওপর সান-বাঁধানো রোয়াকের মত পাথরটাতে। কি ছায়া!

ট্রেনের এককোণে সে বসে বসে ভাবে বাবাকে নিয়ে সে ওইখানে একটা ছোট ঘর বাঁধবে। মাঝে মাঝে গড়শিবপুর থেকে বাবা আর সে ওখানে এসে বাস করবে দু-মাস, তিনমাস। জ্যোৎস্না রাতে এদিকের সেই যে পাথরখানা, বাবা ওটার ওপর বসে বেহালা বাজাবেন, তাঁর সেই প্রিয় গানটি গাইবেন—

'তারা কোন্ অপরাধে, এ দীর্ঘ মেয়াদে, সংসার গারদে থাকি বল্"—

ভাবতে বেশ লাগে। যদিও সে জানে, এসব ভাবনা আকাশকুসুম, কোথায় বা বাবা, কোথায় কে? এত দূরে দূরে সব জায়গা আছে তা হলে? গড়শিবপুর থেকে, কলকাতা থেকে? সত্যি পৃথিবীটা কত বড়—না মিনু?

মিনু হেসে খিল্ খিল্ করে গড়িয়ে পড়ে বলল—দিদি, তুমি বড় ছেলেমানুষ। কিছু জানো না।

—মুখ্যু যে তোর দিদি—তোরা আজকাল কত পড়িস্ বোন, কত জানিস্—

—দিদি, তোমাদের বাড়ির যে বড় গড়টা আর সেই ভাঙা কি কি পাথরের মূর্ত্তি সেই বলেছিলে?

—বারাহী দেবীর মূর্ত্তি।

—সেই অন্ধকারে চলে বেড়ায় জঙ্গলের মধ্যে—না?

—হ্যাঁ ভাই মিনু।

—সামনে যে পড়ে তাকে মেরে ফেলেন বুঝি?

—এই রকম সবাই বলে। গড়ের জঙ্গলে সেই তিথিতে কেউ যায় না প্রাণের ভয়ে।

—সব দিন বুঝি নয়?

—তিথির দিনে।

—আচ্ছা দিদি—কখনো এরকম হতে দেখেছ তুমি? তোমাদেরই তো গড়—

শরৎ গড়শিবপুরের জঙ্গল থেকে বহু দূরে থেকেও যেন ভয়ে শিউরে উঠে বললে—না দিদি, আমি কিছু দেখি নি চোখে। তবে পায়ের দাগ দেখেছে অনেকে—আমিও দেখেছি ছোটবেলায়—

—কিসের পায়ের দাগ?

—বারাহী দেবীর পাথরের পায়ের ছাপ—

—সত্যি?

—সত্যি ভাই মিনু। তোর গা ছুঁয়ে বলছি—

শরৎ যুবতী হলে কি হবে, ছেলেপুলে হয় নি, একা নির্জ্জন গ্রাম্য সংসারে চিরদিন কাটিয়েছে, বালিকা-স্বভাব তার যায় নি। যায় নি বলেই সে বালিকাদের সঙ্গে নিজেকে যত মিশ খাওয়াতে পারে, বড়দের দলে তেমন পারে না। মিনুর সঙ্গে তাই তার মিলছিল ভালই—যেমন গাঁয়ে থাকতে মিলেছিল রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে।

বখ্‌তিয়ারপুর থেকে ওরা গেল রাজগীর। কর্ত্তার শরীর ভাল নয়, গিন্নীর বাতের ধাত—রাজগীরের উষ্ণ-কুণ্ডে স্নান করে বাত ভাল করতে চান। মিনু ও শরৎ বাসা থেকে বেরিয়ে রাজগীরের বৌদ্ধ মঠ পার হয়ে বাজার ও উষ্ণ-কুণ্ডকে ডাইনে রেখে বেণুবন ও বৈভার

পর্ব্বতের ছায়ায় ছায়ায় সোন ভাণ্ডার গুহা পর্য্যন্ত বেরিয়ে আসে সরস্বতী নদীর ধারের পথ বেয়ে। ওদের ডাইনেই থাকে সেই গৃধ্রকূট পর্ব্বত ও সেই সুপবিত্র বেণুবন, বুদ্ধদেব যেখানে শিষ্য আনন্দকে উপদেশ দিয়েছিলেন। হাজার বছর ধরে পার্ব্বত্য সরস্বতী নদীর বাতাসে বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন-পূত করণ্ড ও বেণুবন ধ্বনিত হয়, হাজার হাজার বছরের জ্যোৎস্না লোকে বৈভার পর্ব্বতের শিখরদেশ উদ্ভাসিত হয়—ছেলেমানুষ মিনু ও অশিক্ষিতা গ্রাম্য মেয়ে শরৎ লোকেত্তর কিছুই খবর রাখে না। তবুও মিনু তার স্কুলপাঠ্য ইতিহাসের জ্ঞানকে আশ্রয় করে বলল—এই যে রাজগীর দেখছো দিদি, এর নাম রাজগৃহ। মগধের রাজধানী ছিল রাজগৃহ—জরাসন্ধের নাম জানো তো দিদি? এখানে জরাসন্ধের রাজধানী ছিল—

মগধের খবর রাখে না শরৎ, কিন্তু কাশীরাম দাসের মহাভারত ও গ্রাম্য যাত্রার কল্যাণে জরাসন্ধের নাম তার অপরিচিত নয়।

শরতের চোখ বিস্ময়ে বড় বড় হয়। জরাসন্ধের রাজ্যে এসে গিয়েছে তারা—পুরাণের সেই জরাসন্ধ? কতদূরে এসে পড়েছে আজ ··কত দূর বিদেশে?

এখানে প্রতিদিন ওরা উষ্ণ কুণ্ডে স্নান করে, গিন্নীকে ধরে এনে রোজ স্নান করাতে হয়, শরৎ অত্যন্ত যত্নে নিয়ে আসে, অত্যন্ত যত্নে নিয়ে যায়। গিন্নী শরতের ওপর খুব সন্তুষ্ট—সেবাপরায়ণা শরৎ প্রাণ দিয়ে আশ্রয়দাত্রীর সেবা করে। সে সেবার মধ্যে এতটুকু ফাঁকি নেই।

রাজগীর থাকতেই গিন্নীর এক জা কোন্ জায়গা থেকে ছেলেপুলে নিয়ে ওদের ওখানে হাওয়া বদলাতে এলেন। ইনি নাকি বেশ বড়লোকের মেয়ে, স্বামী পশ্চিমের কোন্ শহরে ইন্‌জিনিয়ার, মোটা পয়সা রোজগার করে। সঙ্গে দুটি ছেলেমেয়ে, একজন আয়া এসেছে। সর্ব্বাঙ্গে সোনার গহনা—গুমোরে মাটিতে পা পড়ে না। দোহারা গড়ন, রং খুব ফর্সাও নয়, খুব কালোও নয়। দাম্ভিক মুখশ্রী।

প্রথম দিন থেকেই মিনুর কাকীমা শরতের ওপর ভাল ব্যবহার করত না। যে দিন গাড়ি থেকে নামল—সেই দিনই বিকেলে মিনু ও শরৎ রাজগীরের বাজার ছাড়িয়ে সরস্বতী নদীর ধারে বেড়িয়ে সন্ধ্যার কিছু আগে ফিরল। মিনুর কাকী অমনি শরৎকে বলে উঠল, ছেলে দুটোকে একটু কোথায় ধরবে, না কোথা থেকে এখন বেড়িয়ে ফিরলো—বামুনী, ও বামুনী, খোকাদের কাপড় ছাড়িয়ে গা-হাত ধুইয়ে দাও—

তার পর থেকে প্রত্যেক সময় সে শরৎকে ডাকে 'বামুনী' বলে। শরৎ নিজের হাতেই দুবেলার রান্নার ভার নিয়েছিল। বাড়ির পাচিকাকে যে চোখে দেখা উচিত, মিনুর কাকী সেই চোখেই দেখতো ওকে।

একদিন মিনুকে ডেকে বলল, হ্যাঁরে, বামুনীকে নিয়ে রোজ রোজ যাস্ কোথায়?

—কে? দিদি? দিদির সঙ্গে বেড়াতে যাই—

—দ্যাখ্, তোকে বলে দিই মিনু! চাকর-বাকরের সঙ্গে বেশী মেশামেশি করা ভাল নয়। সেবার তো দেখি নি, ওকে কোথা থেকে আনলি?

—মা কলকাতা থেকে এনেছে এবার।

—ক'টাকা মাইনে ঠিক হয়েছে জানিস্?

—আমি জানি নে কাকীমা। তবে আমার মার যিনি গুরু-মা, কালীঘাটে থাকেন, তিনিই দিয়েছেন।

—যাক্‌গে, ওদের সঙ্গে এত মেশামেশি ভাল নয় বাপু। ওদের নাই দিলেই মাথায় চড়ে বসবে, চাকর-বাকরকে কখনো নাই দিতে নেই। অমনি একদিন বলে বসবে দু-টাকা মাইনে বাড়িয়ে দাও—ওসব করিস্ নে।

—উনি কিন্তু তেমন নয় কাকীমা—বড় ভাল, কি কথাবার্ত্তা, ও'দের দেশে মস্ত বড় বাড়ি ছিল, এখন পড়ে গিয়েছে—গড় ছিল বাড়িতে—কেমন দেখতে দেখছো তো? বড় বংশের মেয়ে—

মিনুর কাকীমা হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি। একটু সামলে নিয়ে বললে, তোকে এইসব গল্প করে বুঝি? কলকাতা থেকে এসেছে, ওই বয়েস—যাই হোক, ওরা লোক ভাল হয় না। সে-সব তোর শোনার দরকারও নেই—মোট কথা তুই ছেলেমানুষ, ওর সঙ্গে অত মেলামেশা করো না—বারণ করলুম।

তার পর থেকে মিনুর সত্যিই শরতের সঙ্গে বেড়ানো বন্ধ হয়ে গেল, কাকীমার হুকুমে।

একদিন মিনুর কাকীমা শরৎকে ডেকে বললে, ওগো বামুনী, শোনো এদিকে। আগে কোথায় কাজ করতে?

শরৎ এই বৌটির পাশ কাটিয়ে চলতো—এ পর্যান্ত সামনেই এসেছে কম, উত্তর দিলে—কাজ বলছেন? কাজ—কলকাতাতেই—

—কোথায় বলো তো? আমরা কলকাতার লোক। সব চিনি। কোথায় ছিলে?

—কালীঘাটে গৌরী-মার কাছে।

—না না, আমি বলছি কাজ করতে কোথায়?

—কাজ করি নি কোথাও।

—তবে যে খানিক আগে বললে কাজ করতে! বাড়ি কোথায় তোমার?

—যশোর জেলার গড়শিবপুর—

—আচ্ছা, তোমার নাম কি বলো। কি পোস্টাফিস তোমার গাঁয়ের, আমরা চিঠি লিখবো। তোমাকে সেখানে কেউ চেনে কিনা দেখা দরকার। অজানা লোককে রাখা ঠিক নয় কিনা! তোমার কেউ আছে, সেই কি নাম বললে, সেই গাঁয়ে?

শরতের মুখ শুকিয়ে গেল। সে সত্য কথা বলে বিপদে পড়ে যাবে এমন তো ভাবে নি। কথা বানিয়ে বলা তার অভ্যাস নেই—তার বাবাও যেমন চিরকাল সোজা সরল কথা বলে এসেছেন, সেও তাই শিখেছে। এখন কি করা যায়, দেশে চিঠি লিখলে তো সব ফাঁস হয়ে যাবে।

কিন্তু এর মধ্যে একটা সত্য কথা বলবার ছিল, ডাকঘরের নাম তার জানা নেই। আগে ডাকঘর ছিল কুলবেড়ে। সে ডাকঘর উঠে গিয়েছে, বাবার কাছে সে শুনেছিল—তাদের কস্মিন্‌কালে চিঠিপত্র আসে না, কেই-বা দেবে, ডাকঘর যে কোথায় হয়েছে।

সে বললে—ডাকঘর কোথায় জানি নে—

—ওমা, সে কি কথা—ডাকঘর জানো না কোথায়—কে আছে তোমার?

—কেউ নেই মা—

কথাটা বলবার সময়ে শরতের গলা ধরে গেল, মিনুর কাকীমা সেটা লক্ষ্য করলে। গিন্নীকে গিয়ে বললে—দিদি লোক দেখে রাখতে হয়। বামুনীর বাড়িঘর আজ জিজ্ঞেস করলুম তা বলতে চায় না। আমি তো ভাল বুঝছি নে। ওকে তাড়াও—

গিন্নী বললেন, গৌরী-মা ওকে দিয়েছেন, তাঁর কাছে থাকত। ভাল মেয়ে বড্ড—কোনো বদ্‌চাল তো দেখি নি। ওর আর কেউ নেই, তখনি জানি। ওকে তাড়াতে পারবো না।

আট

মিনুর কাকীমার এ খুঁটিনাটি জেরার পরদিন থেকে শরৎ ভয়ে আর সামনে বেরুতে চায় না সহজে। সে জানত না গিন্নীর কাছে তার সম্বন্ধে লাগানোর কথা। কিন্তু আবার কোনদিন বাপের বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করে হয়তো বসবে বৌটি - হয়তো যে আশ্রয়টুকু আছে, তাও যাবে। তার চেয়ে সামনে না যাওয়া নিরাপদ।

কিন্তু শরৎ এড়িয়ে যেতে চাইলেও মিনুর কাকীমা অত সহজে শরৎকে রেহাই দিতে রাজী নয় দেখা গেল। শরৎকে সে পছন্দও করে না—অথচ পছন্দ না করার মধ্যেই শরৎ সম্বন্ধে ওর কেমন এক ধরনের উগ্র কৌতূহল।

একদিন শরৎকে ডেকে বললে, ও বামুনী—শোনো—

শরৎ কাছে গিয়ে বললে, কি বলছেন ?

—তোমার হাতের রান্না বেশ ভালো। কোন্ জেলায় বাপের বাড়ি বললে সেদিন যেন—

শরতের মুখ শুকিয়ে গেল। এই বুঝি আবার—

সে বললে—যশোর জেলা।

—যশোর জেলা। বাঙাল দেশের নিরিমিষ্যি রান্না বাপু তোমাদের ভালোই। তোমার বয়েস কত ?

—সাতাশ বছর।

—না, তার চেয়ে বয়েস বেশী। বত্রিশ-তেত্রিশের কম না। তোমাদের হিসেব থাকে না।

শরৎ চুপ করে রইল। এর কোন উত্তর নেই।

—তোমার বিয়ে হয়েছিল কোথায় ?

—আমাদের গাঁয়ের কাছেই।

—কতদিন বিধবা হয়েছ ?

এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে শরতের মনে বড় কষ্ট হয়। যা ভুলে গিয়েছে, যা চুকেবুকে গিয়েছে কতদিন আগে, সে-সব দিনের কথা, সে-সব পুরোনো কাসুন্দি—এখন আর ঘেঁটে লাভ কি ?

—তবু সে বললে, অনেকদিন আগে। আমার তখন আঠার বছর বয়েস।

—সেই থেকে বুঝি কলকাতায়—মানে, চাকরি করছ ?

—না। দেশেই ছিলাম।

শরৎ খুব সতর্ক ও সাবধান হ'ল। তার বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল।

—কলকাতায় কতদিন আগে এসেছিলে ?

—বেশীদিন না।

—গাঁ থেকে কার সঙ্গে—মানে কলকাতায় আনলে কে ?

শরতের জিব ক্রমশঃ শুকিয়ে আসছে। তার মুখে কথা আর যোগাচ্ছে না। কাঁহাতক বানিয়ে বানিয়ে কথা বলবে সে ?

—কালীঘাট এসেছিলাম মা—গৌরী-মার কাছে সেই থেকে ছিলাম।

সেদিন মিনু এসে পড়াতে তার কাকীমার জেরা বন্ধ হ'ল। শরৎ মুক্তি পেয়ে সামনে থেকে সরে গেল।

পরদিন বাসার সকলে মিলে উষ্ণকুণ্ডে স্নান করতে গেল। শরৎ ছেলে-মেয়েদের সামলে নিয়ে পেছনে পেছনে চলল। মিনুর মা সেদিন যান নি। মিনুর কাকীমার সঙ্গে যে আয়া এসেছিল, সে যেন এখানে এসে ছুটি পেয়েছে—খাটুনি যত কিছু শরতের ঘাড়ে। কাকীমার দুটি ছেলেমেয়ে যেমন দুষ্ট তেমনি চঞ্চল—তাদের সামলাতে সামলাতে শরৎ হয়রান হয়ে পড়ে।

মিনুর কাকীমা বলে, ও বামুনী, ওই মিণ্টুকে চার পয়সার গরম জিলিপি কিনে এনে দাও তো বাজার থেকে—

বাজারে সকলের সামনে দোকান থেকে জিনিস কেনা শরতের অভ্যেস নেই। চুপি চুপি মিনুকে বললে, মিনু দিদি, যাবি আমার সঙ্গে?

মিনু সব সময়েই তার দিদিকে সাহায্য করতে রাজী।

বললে, চলো দিদি—

জিলিপি কিনে ফিরে আসতেই মিনুর কাকীমা বললে, চলো কুণ্ডীতে কাপড়গুলো নিয়ে—সাবানের বাক্স নেও। নেয়ে আসি—

মিনু পেছন থেকে এসে সাবানের বাক্স নিজেই নিয়ে চলল।

স্নান শেষ হয়ে গেল। সিক্ত বসনে সবাই উঠে এসে মেয়েদের কাপড় ছাড়বার ঘেরা জায়গার মধ্যে ঢুকল। শরৎও স্নান করে এল। সে লক্ষ্য করল, মিনুর কাকীমা ওর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। পশ্চিমের জলহাওয়ার গুণে হয়তো শরতের স্বাস্থ্য আরও কিছু ভাল হয়ে থাকবে, তার গৌর তনুর লাবণ্য আরও খুলে থাকবে, সিক্তবসনা দীর্ঘদেহা সে তরুণীর মূর্ত্তি এমন মহিমময়ী দেখাচ্ছিল—যে রাস্তার কত লোক তার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল।

মিনু অপলক চোখে চেয়ে চেয়ে ভাবলে—দিদি যে বলে তাদের রাজার বংশ, মিথ্যে নয় কথাটা। ওই তো কাকীমা অত সেজেগুজে এসেছেন, দিদির পাশে দাঁড়াতে পারেন না—

মিনুর কাকীমাও বোধ হয় শরতের অদ্ভুত রূপে কিছুক্ষণের জন্যে মুগ্ধ না হয়ে পারলে না—কারণ সেও খানিকটা শরতের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলে।

সঙ্গে সঙ্গে তার কেমন এক ধরনের ভাব হ'ল মনে—সেই পুরাতন মনোভাব, সুন্দরী নারীর প্রতি সাধারণ নারীর ঈর্ষা।

সে ধমকের সুরে বললে, একটু হাত চালিয়ে কাপড় টাপড়গুলো কেচে-টেচে নাও না বাপু, তোমার সব কাজেই ন্যাড়া-ব্যাড়া—

যেন শরতকে খাটো করে অপমান করে ওর নিজের মর্য্যাদা আভিজাত্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করলে।

ফিরবার পথে মিনুর কাকীমা বললে, তুমি একটু আগে হেঁটে যাও বাপু, আমরা আস্তে আস্তে যাচ্ছি—তোমাকে আবার গিয়ে দিদির গরম জল চড়াতে হবে—কাপড়গুলো নিয়ে গিয়ে রোদে দাও গে—

বড় এক বোঝা ভিজে কাপড় শরতের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে কাকীমা মিনুকে ও নিজের ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে পিছিয়ে পড়ল। মিনু বলল, দিদিকে আজ চমৎকার দেখাচ্ছিল নেয়ে উঠে, না কাকীমা?

কেন মিনু হঠাৎ একথা বললে? মিনুর কাকীমাও বোধ হয় ওই ধরনের কোন কথাই ভাবছিল। হঠাৎ যেন চমকে উঠে মিনুর দিকে চেয়ে রইল অল্প একটু সময়ের জন্যে। পরক্ষণেই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, পরের ঘি-দুধ খেলে অমন সবারই হয় বাপু—তুই চল্, নে—

বিকেলে আবার বৌটি ডাকলে শরতকে। বৌ নিজে স্টোভ ধরিয়ে চা করে এক পেয়ালা মুখে তুলে চুমুক দিচ্ছে, আর একটা ধূমায়মান পেয়ালা সামনে বসানো মেঝের ওপর। শরতকে বললে, ও বামুনী, দিদিকে চা-টা দিয়ে এসো তো?

তার পরের কথাতে শরৎ বড় চমৎকৃত হয়ে গেল কিন্তু।

বৌটি বললে, তোমার জন্যেও এক পেয়ালা আছে, ওটা দিদিকে দিয়ে এসো—এসে তুমি খাও—

শরৎ অগত্যা ফিরে এসে কলাইকরা পেয়ালাটা তুলে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছে, বৌটি

বললে, এখানে বসে খাও না গো। তাড়াতাড়ি কি আছে?

শরৎ বসে চা খেতে লাগল কিন্তু কোন কথা বললে না।

মিনুর কাকীমা আবার বললে, তোমাকে একটা কথা বলবো ভাবছি। দিদির কাছ থেকে তোমায় যদি আমি নিয়ে যাই, তুমি মাইনে নেবে কত?

শরৎ আরও অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে বললে —আমাকে?

—হ্যাঁ গো—তোমাকে। বলো না মাইনে কত নেবে?

—গিন্নীমা যেতে দেবেন না আমায়।

মিনুর কাকীমা মুখ নেড়ে বললে, সে ভাবনা তোমার না আমার? আমি যদি বলে কয়ে নিতে পারি! মানে আর কিছু না, যেখানে থাকি খোট্টা বামুনে রাঁধে, বাঙালীর মুখে সে রান্না একেবারে অখাদ্য। আমার নিজের ওসব অভ্যেস নেই—হাঁড়ি হেঁসেল কখনো করি নি, বাপের বাড়িতেও না, শ্বশুরবাড়িতে এসে তো নয়ই। তোমাদের বাঙাল দেশের রান্না ভাল—তাই বলছিলাম—বুঝলে?

শরতের মুখ চুন হয়ে গেল।

এমন একটা আশ্রয় পেয়ে সে যে কোথাও যেতে রাজী নয়, এদের ছেড়ে, মিনুকে ছেড়ে। কিন্তু সে এখনও পরের দয়ার পাত্রী, তার কোন ইচ্ছে বা দয়া এসব স্থলে খাটবে না, সে ভালই বোঝে।

সে চুপ করে রইল।

মিনুর কাকীমা ভুল বুঝে বললে, আচ্ছা তাই তবে ঠিক রইল। মাইনের কথা একটা কিন্তু ঠিক করে ফেলা ভালো—তা বলছি। তখন যে বলবে—

শরৎ মিনুকে নিরিবিলি পেয়ে বললে, মিনু বেড়াতে যাবি?

—চলো দিদি—কোন্ দিকে যাবে?

—সোন ভাণ্ডারের গুহার দিকে চল—

নদীর ধারে ধারে বনাবৃত পথ গৃধ্রকূট শৈলের ছায়ায় ছায়ায় সোন ভাণ্ডার ছাড়িয়ে রাজগীরের প্রাচীনতর অঞ্চলে জরাসন্ধের মল্লভূমির দিকে বিস্তৃত। ওরা সেই পথে চলল। কত পাথরের নুড়ি পড়ে আছে পাহাড়ের তলায়, নদীর পাড়ে। সমতলবাসিনী শরৎ এখনও এই সব রঙচঙে নুড়ির মোহ কাটিয়ে ওঠে নি, দেখতে পেলেই কুড়িয়ে আঁচলে সঞ্চয় করে।

মিনু বললে, তুমি একটা পাগল দিদি। কি হবে ওসব?

—বেশ না এগুলো? দ্যাখ এটা কেমন —

—কি করবে?

—ইচ্ছে কি করে জানিস্। ওসব দিয়ে ঘর সাজাই—কিন্তু ঘর কোথায়?

—জড়ো করেছ তো একরাশ।—তাতেই সাজিও—

—জানিস মিনু, তোর কাকীমা কি বলেছে?

—কি দিদি?

—আমায় নিয়ে যেতে চায় ওদের বাড়ি।

—তোমার যাওয়া হবে না, আমি মাকে টিপে দেবো!

—আমি তোদের ফেলে কোথাও যেতে চাই নে মিনু। যখন আশ্রয় পেয়েছি, যতদিন বাঁচি এখানেই থাকব।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতেই হ'ল মিনুর কাকীমার সঙ্গে। মিনুর মা বললেন—যাও মা, ওরা কাশীতে যাচ্ছে, তোমার তীর্থ করা হবে এখন। আমি এর পরে তোমায় কাছে নিয়ে আসবো।

মিনুর কাকীমা সগর্বে অন্যান্য বোঁচকা, ট্রাংক, আয়া ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে শরৎকেও নিয়ে গিয়ে কাশী নামল দিন-দশেক পরে। মাঝারি গোছের তেতলা বাড়ি, ছোট্ট সংসার, স্বামী-স্ত্রী আর এক দেওর। দেওর লাহোর মেডিকেল ইস্কুলে পড়ে, এবার পাশ দেবে। নিচে একঘর গরীব লোক থাকে ওদের ভাড়াটে।

শরৎ মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে নি, কিন্তু নতুন জায়গায় এসে তার এত খারাপ লাগছিল। একটা কথা বলবার লোকও নেই। মিনুর কাকীমা চাকর-বাকরকে আমল দেয় না, ছেলেমেয়েদেরও তার ভাল লাগে না। যেমন দুষ্ট, তেমনি একগুঁয়ে এগুলো। যা ধরবে তাই।

একদিন মিনুর কাকীমা বললে—ও বামুনী, এই ডালটুকু ওই নিচের তলার পটলের মাকে দিয়ে এসো—চেয়েছিল আমার কাছে, গরীব লোক—

শরৎ ডাল দিতে গিয়ে দেখল একটি বৌ রান্নাঘরে বসে ওর দিকে পিছন ফিরে রান্না করছে। ওর কথায় বৌটি ওর দিকে ফিরতেই শরৎ বললে, উনি ডাল পাঠিয়ে দিয়েছেন—রাখুন—

তার পরেই বৌয়ের চোখ দুটোর দিকে চেয়ে শরতের মনে কেমন খট্‌কা লাগল।

বৌটি হেসে বললে, তোমার গলা নতুন শুনছি। তুমি বুঝি ওদের এখানে নতুন ভর্তি হয়েছ? বলছিলেন কাল দিদি। বসো ভাই। আমি চোখে দেখতে পাইনে—বাটিটা রাখ এই সিঁড়ির কাছে।

ও, তাই অমন চোখের চাউনি।

শরতের বুকের মধ্যে যেন কোথায় ধাক্কা লাগল।

বৌটি আবার বললে, তোমার নাম কি ভাই? তোমার গলা শুনে মনে হচ্ছে বয়েস বেশী নয়।

—আমার নাম শরৎ। বয়েস আপনার চেয়ে বেশীই হবে বোধ হয়—

—না ভাই আমার বয়েস কম নয়। তা আমাকে তুমি আপনি আজ্ঞে কোরো না। আমি একা থাকি এই ঘরে—উনি তো বাইরের কাজেই ঘোরেন। তুমি এসো, দুজনে গল্প করব।

—বেশ ভাই। তাহলে তো বেঁচে যাই—

শরতের মনের মধ্যে কাশী আসবার কথা শুনে একটু আগ্রহ না হয়েছিল এমন নয়। মিনুর মার কাছে এজন্যে সে না আসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে নি। কাশী গয়া ক'জন বেড়াতে পারে? তাদের গাঁয়ের নীলমণি চাটুজ্জের মা শরতের ছেলেবেলায় কাশীতে এসে তীর্থ করে যান—সে গল্প বুড়ীর এখনো ফুরলো না। আর বছরও সে গল্প বুড়ীর মুখে শরৎ শুনেছে। সেই কাশীতে যদি এমনি যাওয়া হয়—হোক।

কাশী এসে কিন্তু মিনুর কাকীমার ফরমাশ আর হুকুমের চোটে এতটুকু সময় পায় না শরৎ। সকালে উঠে হেঁসেলের কাজ শুরু। একদফা ছোটদের দুধ বার্লি, একদফা বড়দের চা খাবার, বাজল বেলা আটটা। তার পরে রান্নার পালা শুরু হ'ল এবং খাওয়ানো-দাওয়ানোর কাজ মিটতে বেলা দেড়টা। ওবেলা তিনটে থেকে সাড়ে তিনটের মধ্যে আবার চা খাবারের পালা। সন্ধ্যার সময় বাবুর বন্ধুরা বৈঠকখানায় এসে বসে, রাত নটা পর্য্যন্ত বিশ পেয়ালা চা-ই হবে।

দুপুরবেলা কাজকর্ম্ম চুকিয়ে ফাঁক পেলে শরৎ এসে বসে একতলায় অন্ধ বৌটির কাছে। শরৎ তার পরিচয় নিয়েছে—ওর নাম রেণুকা, ওর বাবা কাশীতেই স্কুল-মাস্টারি করতেন। মা নেই, ভাই নেই, আজ কয়েক বছর আগে ওর বিয়ে দিয়েই বাবা মারা যান। ওরা ব্রাহ্মণ, স্বামী সামান্য মাইনেতে কি একটা চাকরি করে। সন্ধ্যার সময় ভিন্ন বাড়ি আসতে পারে না—সারাদিন রেণুকাকে একা থাকতে হয় বাসাতে।

শরৎ বলে, তুমি বাংলা দেশে যাও নি কখনো ?

—না ভাই, এখানেই জন্ম, বিশ্বনাথের চরণ ছেড়ে আর কোথাও যাবার ইচ্ছে নেই।

—দেশ ছিল কোথায় বাবার মুখে শোনো নি ?

— হালিশহর বলুদেঘাটা। এখনো আমার কাকারা সেখানে আছেন শুনেছি।

দুজনে বসে সুখদুঃখের কথা বলে। রেণুকার অনেক কাজ শরৎ করে দেয়। বড় ভাল লাগে এই অন্ধ মেয়েটিকে। মন বড় সরল, অল্পেই সন্তুষ্ট, জীবন ওকে বেশী কিছু দেয় নি, যা দিয়েছে তাই নিয়েই খুশী আছে।

রেণুকা বলে, একদিন আমার বাড়ি কিছু খাও ভাই—

—বেশ আমি কি খাবো না বলছি ?

—রান্না তো খেতে পারবে না। নিরিমিষের হাঁড়ি নেই—সব একাকার। রান্না করে খাবে আলাদা ?

—না ভাই, সে হাঙ্গামাতে দরকার নেই—তুমি ফল খাইও বরং—

রেণুকার স্বামী ছানা, ফলমূল মিষ্টি কিনে রেখে গিয়েছিল। একদিন বিকেলে রেকাবি সাজিয়ে রেণুকা ওকে খেতে দিলে। চোখে দেখতে পায় না বটে—কিন্তু কাজকর্ম সবই করে হাতড়ে হাতড়ে।

শরৎ একদিন মিনুর কাকীমাকে বলে কয়ে বিশ্বনাথ দর্শনের ছুটি নিলে। ওদের আয়া সঙ্গে গেল মন্দিরের পথ দেখানোর জন্যে। শরৎ রেণুকাকে হাত ধরে নিয়ে গেল।

বিশ্বনাথের গলির মধ্যে কি লোকের ভিড়! কত বৌ-ঝি, কত লোকজন। শরৎ অবাক হয়ে চেয়ে দেখলে, তার কাছে সব কিছু নতুন, সবই আশ্চর্য্য। মন্দির থেকে বার হয়ে দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে বসলো বিকেল বেলা। নিত্য উৎসব লেগেই আছে সেখানে। নৌকো আর বজরাতে কত লোক সাজগোজ করে বেড়াতে বেরিয়েছে।

রেণুকা বললে, আমি এসব জায়গা দেখেছি ছেলেবেলায়। চোদ্দ বছর বয়েস থেকে অসুখে চোখ হারিয়েছি। এখনো সেইরকম আছে, কানে শুনে বুঝতে পারি।

—ভারী ভাল জায়গা ভাই। কলকাতা শহর দেখে ভাল লেগেছিল বটে—কিন্তু সেখানে শান্তি পাই নি এমন। এখানে মন জুড়িয়ে গেল।

—একদিন গঙ্গায় নাইতে এসো—

—সময় পাই নে, আসি কখন। কাল একবার বলবো—

শরৎ আর রেণুকা একটু তফাৎ হয়ে বসে। চারিদিকের জন-কোলাহল ও সম্মুখে পুণ্য-তোয়া জাহ্নবীর দিকে চেয়ে শরতের নতুন চোখ ফোটে। সত্যই সে বড় শান্তি পেয়েছে মনে।

আয়া বললে, একদিন তোমাকে কেদার ঘাটে নিয়ে যাবো—

শরৎ চমকে উঠে বললে, কি ঘাট ?

—কেদার ঘাট। ওই দিকে—আমার সঙ্গে যেও—

শরতের মন স্বপ্নঘোরে একমুহূর্ত্তে কোন্ পথে চলে গেল পাহাড় পর্ব্বত বন-বনানীর ব্যবধান ঘুচিয়ে। গরীব বাবা কত কষ্টে চাল যোগাড় করে, নুন তেল যোগাড় করে এনে বলতেন ভাল করে রাঁধো, বাবা যে ছেলেমানুষের মত, ঘরে কিছু নেই, তা বুঝবেন না—ভাল খাওয়াটি হওয়া চাই—নইলে অবুঝের মত রাগ করবেন, অভিমান করবেন। এতটুকু কষ্ট সহ্য করতে পারেন না বাবা। কোথায় গেলেন বাবা! জানবার জন্যে বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে, তিনি এখন কোথায় কি ভাবে আছেন। এমন জায়গা কাশী, সেই কতকাল আগের গল্পে শোনা বিশ্বনাথের মন্দির, দশাশ্বমেধ ঘাট সব দেখা হ'ল—কিন্তু মনের মধ্যে সব সময় একথা আসে কেন, বাবা যে এসব কিছু দেখলেন না, বাবা বুড়ো হয়েছেন, তাঁর

এখন তীর্থধর্ম্ম করবার সময়, অথচ বাবার অদৃষ্টে জুটলো না কিছু! তিনি গোয়াল-পাড়া বাগদিপাড়ায় বেহালা বাজিয়ে, গান গেয়ে বেড়াচ্ছেন, ফিরে এসে অবেলায় হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাচ্ছেন কিম্বা তাও খাচ্ছেন না, কে তাঁকে দেখছে, কে মুখের দিকে চাইবার আছে তাঁর!

কাশী গয়া সব তুচ্ছ—কিছু ভাল লাগে না।

শরৎ বলে, আচ্ছা রেণুকা, কাশীতে দুজন লোকের কত হলে চলে?

রেণুকা ওর মুখের দিকে চেয়ে বললে, তা কুড়ি টাকার কম তো কোনো মাস যেতে দেখলাম না। আমরা তো দুটো মানুষ থাকি। কেন ভাই?

শরৎ কি ভেবে কি কথা বলছে সে নিজেই জানে না। রেণুকা ভাবে, শরৎ হঠাৎ কি রকম অন্যমনস্ক হয়ে গেল, না কি—আর ভাল করে কথা বলছে না কেন?

বাড়ি ফিরে মিনুর কাকীমার কড়া ফাইফরমাশ ও হুকুমের মধ্যে রান্নাঘরে রাঁধতে বসে সে ভাবে তার কোন্ জীবনটা সত্যি, গড়শিবপুরের ভাঙা গড়-বাড়ির বনের সেই জীবন, না পরের বাড়ির হাঁড়ি-হেঁসেলের এ জীবন?

নয়

মিনুর কাকীমা শরৎকে প্রায়ই বেরুতে দেন না। আজ তিনি যাবেন মিছরীপোখরায় তাঁর বন্ধুর বাড়ি, শরৎকে বাড়ি আগলে বসে থাকতে হবে, কাল তিনি লক্সাতে মাসিমার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন, শরৎ ছেলেমেয়ে সামলে বাড়ি বসে থাকবে।

একদিন মিনুর কাকীমা বললে, পটলের বউয়ের ওখানে অত ঘন ঘন যাও কেন?

—কেন?

—আমি পছন্দ করি নে। ওরা গরীব লোক, আমাদের ভাড়াটে, অত মাখামাখি করা ভাল না।

—আমি মিশি, আমিও তো গরীব লোক। এতে আর দোষ কি বলুন?

—তুমি বড় মুখে মুখে তর্ক করতে শুরু করেছ দেখছি। পটলের বউ মেয়ে ভাল নয়—তুমি জানো কিছু?

শরৎ এতদিন মিনুর কাকীমার কোনো কথার প্রতিবাদ না করে নীরবে সব কাজ করে এসেছে, কিন্তু অন্ধ রেণুকার নামে কটু কথা সে সহ্য করতে পারলে না। বললে—আমি যতদূর দেখেছি কোনো বেচাল তো দেখি নি। আমি যদি যাই আপনাকে তাতে কেউ কিছু বলবে না তো!

—না, আমি চাই আমার বাড়ির চাকরবাকর আমার কথা শুনবে—যাও, রান্নাঘরের দিকে দ্যাখো গে—

শরৎ মাথা নামিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল। সেখানে গিয়েই সে ক্ষুণ্ণ অভিমানে কেঁদে ফেললে। আজ সে এ-কথার জবাব দিতো মিনুর কাকীমার, একবার ভেবেছিল দিয়েই দেবে উত্তর, যা থাকে ভাগ্যে।

তবে মুখে জবাব না দিলেও কাজে সে দেখালে, মিনুর কাকীমার অসঙ্গত হুকুম সে মানতে রাজী নয়। রেণুকার বাড়ি সেই দিনই বিকেলের দিকে সে আবার গেল।

রেণুকা ওকে পেয়ে সত্যিই বড় খুশী হয়। বললে—ভাই, আজ চলো আমরা নতুন কোনো জায়গায় যাই—

—কোথায় যাবে ?

—আমি রাস্তাঘাট চিনি নে, তুমি বাঙালীটোলায় আমার এক বন্ধুর বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে ?

—কেন পারবো না, চলো।

—ছ' নম্বর ধ্রুবেশ্বরের গলি—জিজ্ঞেস করে চলো যাওয়া যাক।

একে ওকে জিজ্ঞেস করে ওরা ধ্রুবেশ্বরের গলিতে নির্দ্দিষ্ট বাসায় পৌঁছলো। তারাও খুব বড়লোক নয়, ছোট দুটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে স্বামী-স্ত্রী, চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে। বাড়ি অনেক দিন আগে ছিল ঢাকা জেলায় কি এক পাড়াগাঁয়ে, বাড়ির কর্ত্তা বেনারস মিউনিসিপ্যালিটির কেরানী, সেই উপলক্ষে এখানে বাস।

বাড়ির গিন্নীর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। তিনি ওদের যত্ন করে বসালেন, চা করে খেতে দিলেন।

তাদের বাড়িতে একটি চার-পাঁচ বছরের খোকা আছে, নাম কালো। দেখতে কি চমৎকার, যেমন গায়ের রং, তেমনি মুখশ্রী, সোনালি চুল, চাঁচাছোলা গড়ন।

শরৎ বললে, এমন সুন্দর ছেলের নাম কালো রাখলেন কেন ?

গিন্নী হেসে বললেন, আমার শ্বশুরের দেওয়া নাম। তাঁর প্রথম ছেলে মারা যায়, নাম ছিল ওই। তিনিই জোর করে কালো নাম রেখেছেন।

প্রথম দর্শনেই খোকাকে শরৎ ভালবেসে ফেললে।

বললে, এসো খোকা, আসবে ?

খোকা অমনি বিনা দ্বিধায় শরতের কাছে এসে বসলো।

শরৎ বললে, আমি কে হই বলো তো খোকন ?

খোকা হেসে শরতের মুখের দিকে চোখ তুলে চুপ করে রইল।

খোকার মা বললেন, মাসীমা হন, মাসীমা বলে ডাকবে—

খোকা বললে, ও মাসীমা—

—এই যে বাবা, উঠে এসে কোলে বসো—

খোকার মা বললেন, সেই ছড়াটা শুনিয়ে দাও তোমার মাসীমাকে খোকন ?

খোকা অমনি দাঁড়িয়ে উঠে বলতে আরম্ভ করলে—

এই যে গঙ্গা পুণ্য ঢারা
বিমল মুরটি পাগলপারা
বিশ্বনাটের চরণটলে বইছে কুটুহলে—

খোকা 'ত' এর জায়গায় 'ট' বলে, 'ধ' এর জায়গায় 'ঢ' বলে—শরতের মনে হ'ল খোকার মুখে অমৃত বর্ষণ হচ্ছে যেন। অভাগিনী শরৎ সন্তানস্নেহ কখনো জানে নি, কিন্তু এই খোকাকে দেখে তার সুপ্ত মাতৃহৃদয় যেন হঠাৎ সজাগ হয়ে উঠল। কত ছেলে তো দেখলে এ পর্য্যন্ত, মিনুর কাকীমারই তো এ বয়সের ছেলে রয়েছে, তাদের প্রতি স্নেহ তো দূরের কথা —শরৎ নিতান্তই বিরক্ত। এ ছেলেটির ওপর এমন ভাবের কারণ কি সে খুঁজে পায় না। কিন্তু মনে হ'ল এ খোকা তার কত দিনের আপনার, একে দেখে, একে কোলে করে বসে ওর নারীজীবন যেন সার্থক হ'ল।

শরৎ সেদিন সেখান থেকে চলে এল বটে, কিন্তু মন রেখে এল খোকার কাছে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তার মন হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

গড়বাড়ির জঙ্গলে তাদের পুরানো কোঠা।

বাবা বাড়ি নেই।

—ও খোকন, ও কালো—

—কি মা ?

—বেড়িও না এই রোদ্দুরে হটর হটর করে—ঘরে শোবে এসো—

খিল খিল করে দুষ্টুমির হাসি হেসে খোকা ছুটে পালায়।

হাঁড়ি-হেঁসেলের অবসরে নতুন আলাপী খোকনকে ঘিরে তার মাতৃহৃদয়ের সে কত অলস স্বপ্ন। যে সাধ আশা কোনোকালে পূর্ণ হবার নয়, ইহজীবনে নয়, মন তাকেই হঠাৎ যেন সবলে আঁকড়ে ধরে।

দিন দুই পরে সে রেণুকাকে বলে—চল ভাই, কালোকে দেখে আসি গে—

কিন্তু সেদিন রেণুকার যাবার সময় হয় না। স্বামী দুজন বন্ধুকে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছেন, রান্নাবান্নার হাঙ্গামা আছে।

আরও দিন কয়েক পরে আবার শরতের অবসর মিললো—এবার রেণুকাকে বলে কয়ে নিয়ে গেল ধ্রুবেশ্বরের গলি। দূর থেকে বাড়িটা দেখে ওর বুকের মধ্যে যেন সমুদ্রের ঢেউ উথলে উঠল—বড় বড় পর্বতপ্রমাণ ঢেউ যেন উদ্দাম গতিতে দূর থেকে ছুটে এসে কঠিন পাষাণময় বেলাভূমির গায়ে আছড়ে পড়ছে।

খোকা দেখতে পেয়েছে, সে তাদের বাড়ির দোরে খেলা করছিল। সঙ্গে আরও পাড়ার কয়েকটি খোকাখুকি।

শরতের বুক ঢিপ ঢিপ করে উঠল—খোকা যদি ওকে না চিনতে পারে!

কিন্তু খোকা তাকে দেখেই খেলা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দুধে-দাঁত বার করে একগাল হেসে ফেললে।

শরতের অদৃষ্টাকাশের কোন্ সূর্য্য যেন রাশিচক্রের মধ্যে দিয়ে পিছু হঠতে হঠতে মীন-রাশিতে প্রবিষ্ট হলেন, যার অধিপতি সর্ব্বপ্রকার স্নেহপ্রেমের দেবতা শুক্র!

—চিন্‌তে পারিস্ খোকা ? আয়—

শরৎ হাত বাড়িয়ে দিলে ওকে কোলে নেবার জন্যে। খোকা বিনা দ্বিধায় ওর কোলে এসে উঠল, বললে—মাছীমা—

—তাহলে তুই দেখছি ভুলিস নি খোকা—

খোকার মা ছুটে এসে বললেন, যাক, এসেছ ভাই ? ও কেবল মাসীমা মাসীমা করে, একদিন ভেবেছিলাম রেণুকাদের বাড়ি নিয়েই যাই—দাঁড়াও ভাই, পাশের বক্সীদের বাড়ির বড় বউ তোমাকে দেখতে চেয়েছে, ডেকে আনি—

বক্সীদের বাড়ির দুই বউ একটু পরে হাজির। দুজনেই বেশ সুন্দরী, গায়ে গহনাও মন্দ নেই দুজনের। বড় বউ প্রণাম করে বললে—ভাই, আপনার কথা সেদিন দিদি বলছিলেন, তাই দেখতে এলুম—

—আমার কথা কি বলবার আছে বলুন ?

—দেখে মনে হচ্ছে, বলবার সত্যিই আছে। যা নয় তা কখনো রটে ভাই ? রটেছে আপনার নামে—

শরতের মুখ শুকিয়ে গেল। কি রটেছে তার নামে ? এরা কি কেউ গিরীন প্রভাসের কথা জানে নাকি ? সে বললে, আমার নামে কি শুনেছেন ?

বড় বউ হেসে বললে, না, তা আর বলবো না।

শরতের আরও ভয় হ'ল। বললে, বলুনই না ?

—আপনার চেহারার বড় প্রশংসা করছিলেন দিদি। আমায় বললেন, ভাই রেণুকাদের বাড়িও'লাদের বাড়িতে তিনি এসেছেন রান্না করতে, কিন্তু অনেক বড় ঘরে অমন রূপ নেই।

সে যে সামান্য বংশের মেয়ে নয়, তা দেখলে আর বুঝতে বাকী থাকে না। তাই তো ছুটে এলাম, বলি দেখে আসি তো—

শরৎ বড় লজ্জা পায় রূপের প্রশংসা শুনলে। এ পর্যন্ত তা সে অনেক শুনেছে—রূপের প্রশংসাই তার কাল হয়ে দাঁড়াল জীবনে, আজ এই দশা কেন হবে নইলে? কিন্তু সে-সব কথা বলা যায় না কারো কাছে, সুতরাং সে চুপ করেই রইল।

কালোর মা বললেন, খোকা তো মাসীমা বলতে অজ্ঞান। তবু একদিনের দেখা। কি গুণ তোমার মধ্যে আছে ভাই, তুমিই জানো—

বক্সীদের বড় বউ বললে, একটু আমাদের বাড়ি পায়ের ধুলো দিতে হবে ভাই—

—এখন কি করে যাবো বলুন, ছুটি যে ফুরিয়ে এলো—

—তা শুনবো না, নিয়ে যাবো বলেই এসেছি—দিদিও চলুন, রেণুকা ভাই তুমিও এসো—

খোকাকে কোলে নিয়ে শরৎ ওদের বাড়ি চলল সকলের সঙ্গে।

বড় বউ বললে, ভাই তোমার কোলে কালোকে মানিয়েছে বড় চমৎকার। ও যেমন সুন্দর, তুমিও তেমন। মা আর ছেলে দেখতে মানানসই একেই বলে—

ওদের বাড়ি যে জলযোগের জন্যেই নিয়ে যাওয়া একথা সবাই বুঝেছিল। হ'লও তাই, শরতের জন্যে ফলমূল ও সন্দেশ—বাকি দুজনের জন্যে সিঙ্গাড়া কচুরির আমদানিও ছিল। বউ দুটির অমায়িক ব্যবহারে শরৎ মুগ্ধ হয়ে গেল। খানিকক্ষণ বসে গল্পগুজবের পর শরৎ বিদায় চাইলে।

বড় বউ বললে, আবার কিন্তু আসবেন ভাই, এখন যখন খোকার মাসীমা হয়ে গেলেন, তখন খোকাকে দেখতে আসতেই হবে মাঝে মাঝে—

—নিশ্চয়ই আসবো ভাই—

খোকা কিন্তু অত সহজে তার মাসীমাকে যেতে দিতে রাজী হ'ল না। সে শরতের আঁচল ধরে টেনে বসে রইল, বললে—এখন টুমি যেও না মাছীমা—

—যেতে দিবি নে?

—না।

—আবার কাল আসবো। তোর জন্যে একটা ঘোড়া আনবো—

—না, টুমি যেও না।

শরৎ মুগ্ধ হয় শিশু কত সহজে তাকে আপন বলে গ্রহণ করেছে তাই দেখে। যেন ওর কতদিনের জোর, কতদিনের ন্যায্য অধিকার। সব শিশু যে এমন হয় না, তা শরতের জানতে বাকী নেই।

খোকা ওর ছোট্ট মুঠি দিয়ে শরতের আঁচলে কয়েক পাক জড়িয়েছে। সে পাক খুলবার সাধ্য নেই শরতের, জোর করে তা সে খুলতে পারবে না, চাকরি থাকে চাই যায়। শরতের হৃদয়ে অসীম শক্তি এসেছে কোথা থেকে, সে ত্রিভুবনকে যেন তুচ্ছ করতে পারে এই নবার্জিত শক্তির বলে, জীবনের নতুন অর্থ যেন তার চোখের সামনে খুলে গিয়েছে। যখন অবশেষে সে বাড়ি চলে এল, তখন সন্ধ্যার বেশী দেরি নেই। মিনুর কাকীমা মুখ ভার করে বললেন, রোজ রোজ তোমার বেড়াতে যাওয়া আর এই রাত্তিরে ফেরা! উনুনে আঁচ পড়লো না এখনও, ছেলেমেয়েদের আজ আর খাওয়া হবে না দেখছি। আটটার মধ্যেই ওরা ঘুমিয়ে পড়বে—

—কিছু হবে না, আমি ওদের খাইয়ে দিলেই তো হ'ল—

—তোমার কেবল মুখে মুখে জবাব। এ বাড়িতে তোমার সুবিধে দেখে কাজ হবে না—আমার সুবিধে দেখে কাজ হবে, তা বলে দিচ্ছি। কাল থেকে কোথাও বেরুতে পারবে না।

মুখোমুখি তর্ক করা শরতের অভ্যেস নেই। সে এমন একটি অদ্ভুত ধরনের নিশ্বিকার, স্বাধীন ভঙ্গীতে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল, একটা কথাও না বলে—যাতে মিনুর কাকীমা নিজে যেন হঠাৎ ছোট হয়ে গেল এই অদ্ভুত মেয়েটির ধীর, গম্ভীর, দর্পিত ব্যক্তিত্বের নিকট।

মিনুর কাকীমা কিন্তু দমবার মেয়ে নয়, শরতের সঙ্গে রান্নাঘর পর্যন্ত গিয়ে ঝাঁঝালো এবং অপমানজনক সুরে বললে, কথার উত্তর দিলে না যে বড়? আমার কথা কানে যায় না নাকি?

শরৎ রান্নাঘরের কাজ করতে করতে শান্তভাবে বললে, শুনলাম তো যা বললেন—

—শুনলে তো বুঝলাম। সেই রকম কাজ করতে হবে। আর একটা কথা বলি। তোমার বেয়াদবি এখানে চলবে না জেনে রেখো। আমি কথা বললাম আর তুমি এমনি নাক ঘুরিয়ে চলে গেলে, ও-সব মেজাজ দেখিও অন্য জায়গায়। এখানে থাকতে হলে—ও কি, কোথায় চললে?

—আসছি, পাথরের বাটিটা নিয়ে আসি ওঘর থেকে—

মিনুর কাকীমার মুখে কে যেন এক চড় বসিয়ে দিলে। সে অবাক হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। এ কি অদ্ভুত মেয়ে, কথা বলে না, প্রতিবাদ করে না, রাগঝালও দেখায় না—অথচ কেমন শান্ত, নিশ্বিকার, আগ্রহ ভাবে তুচ্ছ করে দিতে পারে মানুষকে। মিনুর কাকীমা জীবনে কখনো এমন অপমানিতা বোধ করে নি নিজেকে।

শরৎ ফিরে এলে তাই সে ঝাল ঝাড়বার জন্যে বললে, কাল থেকে দুপুরের পর বসে বসে ডালগুলো বেছে হাঁড়িতে তুলবে। কোথাও বেরুবে না।

মিনুর কাকা তাঁর স্ত্রীর চীৎকার শুনে ডেকে বললেন, আঃ, কি দুবেলা চেঁচামেচি করো রাঁধুনীর সঙ্গে? অমন করলে বাড়িতে চাকরবাকর টিকতে পারে?

—কেন গো, রাঁধুনীর উপর যে বড্ড দরদ দেখতে পাই—

—আঃ, কি সব বাজে কথা বল! শুনতে পাবে—

—শুনতে পেলে তো পেলে—তাতে ওর মান যাবে না। ওরা কি ধরনের মানুষ তা জানতে বাকি নেই—আজ এসেছে এখানে সাধু সেজে তীর্থ করতে।

—লোককে অপ্রিয় কথাগুলো তুমি বড্ড কট কট করে বলো। ও ভাল না—

মিনুর কাকীমা ঝাঁজের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললে, আমায় তোমার পাদ্রী সাহেবের মত মর্ম্মজ্ঞান শিখিয়ে দিতে হবে না—থাক্—

মিনুর কাকাটিকে শরৎ দূরে থেকে দেখেছে। সামনে এ পর্যন্ত একদিনও বার হয় নি। লোকটি বেশ নাদুস্-নুদুস্ চেহারার লোক, মাথায় ঈষৎ টাক দেখা দিয়েছে, সাহেবের মত পোশাক পরে আপিসে বেরিয়ে যায়, বাড়িতে কখনো চেঁচামেচি হাঁকডাক করে না, চাকর-বাকরদের বলাবলি করতে শুনেছে যে লোকটা মদ খায়। মাতালকে শরৎ বড় ভয় করে, কাজেই ইচ্ছে করেই কখনো সে লোকটির ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না।

সেদিন আবার তার মন উতলা হয়ে উঠল খোকাকে দেখবার জন্যে। খোকাকে একটা ঘোড়া দেবে বলে এসেছিল, হাতে পয়সা নেই, এদের কাছে মুখ ফুটে চাইতে সে পারবে না, অথচ কি করা যায়?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত খোকাকে খেলনা দেবার টানই বড় হ'ল। সে মিনুর কাকীমাকে বললে—আমায় কিছু পয়সা দেবেন আজ?

মিনুর কাকীমা একটু আশ্চর্য হ'ল। শরৎ এ পর্যন্ত কখনো কিছু চায় নি।

বললে—কত?

—এই—পাঁচ আনা—

মিনুর কাকীমা মনে মনে হিসেব করে দেখলে শরৎ পাঁচ মাস হ'ল এখানে রাঁধুনীর কাজ করছে, এ পর্য্যন্ত তাকে মাইনে বলে কিছু দেওয়া হয় নি, সেও চায় নি। আজ এতদিন পরে মোটে পাঁচ আনা চাওয়াতে সে সত্যিই আশ্চর্য হ'ল।

আঁচল থেকে চাবি নিয়ে বাক্স খুলে বললে, ভাঙানো তো নেই দেখছি, টাকা রয়েছে। ও বেলা নিও—

শরৎ ঠিক করেছিল আজ দুপুরের পরে কাজকর্ম্ম সেরে সে খোকার কাছে যাবে। মুখ ফুটে সে বললে, টাকা ভাঙিয়ে আনলে হয় না? আমার বিকেলে দরকার ছিল।

—কি দরকার?

—ও আছে একটা দরকার—

—বলোই না—

—একজনের জন্যে একটা জিনিস কিনবো।

—কে?

শরৎ ইতস্ততঃ করে বললে রেণুকা জানে—পটলের বউ—

মিনুর কাকীমা মুখ টিপে হেসে বললে, আপত্তি থাকে বলবার দরকার নেই, থাক গে। নিও এখন—

শরৎ রেণুকাকে নিয়ে বিশ্বনাথের গলিতে ঘোড়া কিনতে গেল। এক জায়গায় লোকের ভিড় ও কান্নার শব্দ শুনে ও রেণুকাকে দাঁড় করিয়ে রেখে দেখতে গেল। একটি আঠারো-উনিশ বছরের বাঙালীর মেয়ে হাউ হাউ করে কাঁদছে, আর তাকে ঘিরে কতকগুলো হিন্দুস্থানী মেয়েপুরুষ খেপাচ্ছে ও হাসাহাসি করছে।

মেয়েটি বলছে, আমার গামছা ফেরত দে—ও মুখপোড়া, যম তোমাদের নেয় না, মণিকর্ণিকা ভুলে আছে তোদের? শালারা, পাজি ছুঁচোরা—গামছা দে—

শরৎকে দেখে ভিড় সসম্ভ্রমে একটু ফাঁক হয়ে গেল। কে একজন হেসে বললে, পাগলী, মাইজী—আপলোক হঠ্ যাইয়ে—

মেয়েটি বললে, তোর বাবা মা গিয়ে পাগল হোক্ হারামজাদারা—মণিকর্ণিকায় নিয়ে যা ঠ্যাং-এ দড়ি বেঁধে, পুড়ুতে কাঠ না জুটুক—দে আমার গামছা—দে—

যে ওকে পাগলী বলেছিল সে তার পুণ্যশ্লোক পিতামাতার উদ্দেশে গালাগালি সহ্য করতে না পেরে চোখ রাঙিয়ে বললে, এইয়ো—মু সামহালকে বাত বোলো—নেই তো মু মে ইটা ঘুষা দেগা—

মেয়েটির পরনে চমৎকার ফুলন পাড় মিলের শাড়ি, বর্ত্তমানে অতি মলিন—খুব এক মাথা চুল তেল ও সংস্কার অভাবে রুক্ষ ও অগোছালো অবস্থায় মুখের সামনে, চোখের সামনে, কানের পাশে পড়েছে, হাতে কাঁচের চুড়ি, গায়ের রং ফর্সা, মুখশ্রী একসময়ে ভাল ছিল, বর্ত্তমানে রাগে, হিংসায়, গালাগালির নেশায় সর্ব্বপ্রকার কোমলতা-বর্জ্জিত, চোখের চাউনি কঠিন, কিন্তু তার মধ্যেই যেন ঈষৎ দিশাহারা ও অসহায়।

শরতের বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল। রাজলক্ষ্মী? গড়শিবপুরের সেই রাজলক্ষ্মী? এর চেয়ে সে হয়তো দু-তিন বছরের ছোট—কিন্তু সেই পল্লীবালা রাজলক্ষ্মীই যেন। বাঙালীর মেয়ে হিন্দুস্থানীদের হাতে এভাবে নির্য্যাতিতা হচ্ছে, সে দাঁড়িয়ে দেখতে পারবে এই বিশ্বনাথের মন্দিরের পবিত্র প্রবেশপথে?

শরৎ সোজাসুজি গিয়ে মেয়েটির হাত ধরে বললে, তুমি বেরিয়ে এসো ভাই—আমার সঙ্গে—

মেয়েটি আগের মত কাঁদতে কাঁদতে বললে, আমার গামছা নিয়েছে ওরা কেড়ে—আমি

রাস্তায় বেরুলেই ওরা এমনি করে রোজ রোজ—তার পরেই ভিড়ের দিকে রুখে দাঁড়িয়ে বললে, দে আমার গামছা, ওঃ মুখপোড়ারা, তোদের মড়া বাঁধা ওতে হবে না—দে আমার গামছা—

ভিড় তখন শরতের অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে কিছু অবাক হয়ে ছত্রভঙ্গ হবার উপক্রম হয়েছে। দু-একজন হি হি করে মজা দেখবার তৃপ্তিতে হেসে উঠল। শরৎ মেয়েটির হাত ধরে গলির বাইরে যত টেনে আনতে যায়, মেয়েটি ততই বার বার পিছনে ফিরে ভিড়ের উদ্দেশে রুদ্রমূর্ত্তিতে নানা অশ্লীল ও ইতর গালাগালি বর্ষণ করে।

অবশেষে শরৎ তাকে টানতে টানতে গলির মুখে বড় রাস্তার ধারে নিয়ে এল, যেখানে মনোহারী দোকানের সামনে সে রেণুকাকে দাঁড় করিয়ে রেখে গিয়েছিল।

রেণুকা চোখে না দেখতে পেলেও গোলমাল ও গালাগালি শুনেছে; এখনও শুনছে মেয়েটির মুখে—সে ভয়ের সুরে বললে, কি, কি ভাই? কি হয়েছে? ও সঙ্গে কে?

—সে কথা পরে হবে। এখন চলো ভাই ওদিকে—

মেয়েটি গালাগালি বর্ষণের পরে একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যেন। সে কাঁদো কাঁদো সুরে বলতে লাগল—আমার গামছাখানা নিয়ে গেল মুখপোড়ারা—এমন গামছাখানা—

শরৎ বললে, ভাই রেণুকা, দোকান থেকে গামছা একখানা কিনে দিই ওকে—চল তো—

মেয়েটি গালাগালি ভুলে ওর মুখের দিকে চাইলে। রেণুকা জিজ্ঞেস করলে, তোমার নাম কি? থাকো কোথায়?

মেয়েটি কোনো জবাব দিলে না।

গামছা কিনতে গিয়ে দোকানী বললে, একে পেলেন কোথায় মা?

শরৎ বললে, একে চেন?

—প্রায়ই দেখি মা। গণেশমহল্লার পাগলী, গণেশমহল্লায় থাকে—ও লোককে বড় গাল-গালি দেয় খামকা—

পাগলী রেগে বললে, দেয়! তোর পিণ্ডি চটকায়, তোকে মণিকর্ণিকার ঘাটে শুইয়ে মুখে নুড়ো জেবলে দেয় হারামজাদা—

দোকানী চোখ রাঙিয়ে বললে, এই চুপ! খবরদার—ওই দেখুন মা—

শরৎ ছেলেমানুষকে যেমন ভুলোয় তেমনি সুরে বললে, ওকি, অমন করে না ছিঃ—লোককে গালাগালি দিতে নেই।

পাগলী ধমক খেয়ে চুপ করে রইলো।

—গামছা কত?

—চোদ্দ পয়সা মা—আমার দোকানে জিনিসপত্তর নেবেন। এই রাস্তায় বাঙালী বলতে এই আমিই আছি। দশ বছরের দোকান আমার। হুগলী জেলায় বাড়ি, ম্যালেরিয়ার ভয়ে দেশে যাই নে, এই দোকানটুকু করে বাবা বিশ্বনাথের ছিচরণে পড়ে আছি—আমার নাম রামগতি নাথ। এক দামে জিনিস পাবেন মা আমার দোকানে—দরদস্তুর নেই। মেড়োদের দোকানে যাবেন না, ওরা ছুরি শানিয়ে বসে আছে। বাঙালী দেখলেই গলায় বসিয়ে দেবে। এই গামছাখানা মেড়োর দোকানে কিনতে যান—চার আনার কম নেবে না।

দোকানীর দীর্ঘ বক্তৃতা শরৎ গামছা হাতে দাঁড়িয়ে একমনে শুনলে, যেন না শুনলে দোকানীর প্রতি নিষ্ঠুরতা ও অসৌজন্য দেখানো হবে। তার পর আবার রাস্তায় উঠে পাগলীকে বললে, এই নেও বাছা গামছা—পছন্দ হয়েছে?

পাগলী সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে বললে, খিদে পেয়েছে—

শরৎ বললে, কি করি রেণু, ছ'টা পয়সা সম্বল, তাতেই যা হয় কিনে খাক গে—

রেণুকা বললে, আমার হাঁড়িতে বোধ হয় ভাত আছে।

—তাই দেখি গে চলো,—

পাগলীকে ভাত দেওয়া হ'ল, কতক ভাত সে ছড়ালে, কতক ভাত ইচ্ছে করে ধুলোতে মাটিতে ফেলে তাই আবার তুলে তুলে খেতে লাগল, অর্ধেক খেলে ভাত, অর্ধেক খেলে ধুলো মাটি।

শরতের চোখে জল এসে পড়ে। মনে ভাবলে—আহা, অল্প বয়সে, কি পোড়া কপাল দেখো একবার! মুখের ভাত দুটো খেলেও না—

বললে, ভাত ফেলছিস্ কেন? থালায় তুলে নে মা—অমন করে না—

ঠিক সেই সময় রাজপথে সম্ভবতঃ কোনো বিবাহের শোভাযাত্রা বাজনা বাজিয়ে ও কলরব করতে করতে চলেছে শোনা গেল। শরৎ তাড়াতাড়ি সদর দরজার কাছে ছুটে এসে দেখতে গেল, এসব বিষয়ে তার কৌতূহল এখনও পল্লীবালিকার মতই সজীব।

সঙ্গে সঙ্গে পাগলীও ভাতের থালা ফেলে উঠে ছুটে গেল শরৎকে ঠেলে একেবারে সদর রাস্তায়—

শরৎ ফিরে এসে বললে, ওমা, একি কাণ্ড, ভাত তো খেলেই না, গামছাখানা পর্যন্ত ফেলে গেল।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও পাগলীর আর দেখা পাওয়া গেল না।

দশ

পরদিন শরৎ আবার খোকাদের বাড়ি ধ্রুবেশ্বরের গলিতে গিয়ে হাজির, সঙ্গে পটলের বউ।

খোকার মা বললেন, দু-দিন আস নি ভাই, খোকা 'মাসীমা মাসীমা' বলে গেল।

খোকার জন্যে আজ সে এসেছে শুধু হাতে, কারণ পাগলীকে পয়সা দেবার পরে ওর হাতে আর পয়সা নেই। মিনুর কাকীমার কাছে বার বার চাইতে লজ্জা করে।

খোকা শরতের কোল ছাড়তে চায় না।

শরৎ যখন এদের বাড়ি আসে, যেন কোন নূতন জীবনের আলো, আনন্দের আলোর মধ্যে ডুবে যায়। আবার যখন মিনুর কাকীমাদের বাড়ি যায়, তখন জীবনের কোন্ আলো-আনন্দহীন অন্ধকার রন্ধ্রপথে ঢুকে যায়, দূর দিক্‌চক্রবালে উদার আলোকোজ্জ্বল প্রসার সেখান থেকে চোখে পড়ে না।

খোকা বলে, এসো, মাছীমা—খেলা করি—

খোকার আছে দুটো রবারের বল, একটা কাঠের ভাঙা বাক্স, তার মধ্যে 'মেকানো' খেলার সাজ-সরঞ্জাম। শেষোক্ত জিনিসটা ছিল খোকার দাদার, এখন সে বড় হয়ে তার ত্যক্ত সম্পত্তি ছোট ভাইকে দিয়ে দিয়েছে।

খোকা বলে, সাজিয়ে দাও মাছীমা।

শরৎ জীবনে 'মেকানো'র বাক্স দেখে নি, কল্পনাও করে নি। সে সাজাতে পারে না। খোকাও কিছু জানে না, দুজনে মিলে হেলাগোছা করে একটা অদ্ভুত কিছু তৈরী করলে।

খোকার মা শরতের জন্যে খাবার করে খেতে ডাকলেন।

শরৎ বললে, আমি কিছু খাবো না দিদি—

—তা বললে হয় না ভাই, খোকার মাসীমা যখন হয়েছ, কিছু মুখে না দিয়ে—

—রোজ রোজ এলে যদি খাওয়ান তা হলে আসি কি করে?

—খোকনকে তুমি বড় হলে খাইও ভাই। শোধ দিও তখন না হয়—

বক্‌সীদের বড় বউ খবর পেয়ে এসে শরতের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলে।

সে বললে, কি ভাল লেগেছে ভাই তোমাকে, তুমি এসেছ শুনে ছুটে এলাম—একটা কথা বলবে?

—কি, বলুন?

—তোমার বাপের বাড়ি কোথায় ভাই?

—গড়শিবপুর, যশোর জেলায়।

—শ্বশুরবাড়ি?

—বাপের বাড়ির কাছেই—

—বাবা মা আছেন?

শরৎ চুপ করে রইল। দু চোখ বেয়ে টস্‌-টস্‌ করে জল গড়িয়ে পড়ল বাবার কথা মনে পড়াতে। সে তাড়াতাড়ি চোখের জল আঁচল দিয়ে মুছে নিয়ে বললে, ওসব কথা জিজ্ঞেস করবেন না দিদি—

বক্‌সীদের বউ বুদ্ধিমতী, এ বিষয়ে আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না তখন। কিছুক্ষণ অন্য কথার পরে শরৎ যখন ওদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে আসছে, তখন ওকে আড়ালে ডেকে বললে, আমি তোমাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করতে চাই নে ভাই—কিন্তু আমার দ্বারা যদি তোমার কোন উপকার হয়, জানিও—তা যে করে হয় করবো। তোমাকে যে কি চোখে দেখেছি!

শরৎ অশ্রুভারনত চোখে বললে, আমার ভাল কেউ করতে পারবে না দিদি। যদি এখন বাবা বিশ্বনাথ তাঁর চরণে স্থান দেন, তবে সব জ্বালা জুড়িয়ে যায়।

—তুমি সাধারণ ঘরের মেয়ে নও কিন্তু—

—খুব সাধারণ ঘরের মেয়ে দিদি। ভালবাসেন তাই অন্যরকম ভাবেন। আচ্ছা এখন আসি।

—আবার এসো খুব শীগ্‌গির—

শরৎ ও পটলের বৌ পথ দিয়ে চলে আসতে সেদিনকার সেই পাগলীর সঙ্গে দেখা। সে রাস্তার ধারে একখানা ছেঁড়া কাপড় পেতে বসেছে জাঁকিয়ে—আর যে পথ দিয়ে যাচ্ছে, তাকেই বলছে—একটা পয়সা দিয়ে যাও না?

শরৎ বললে, আহা, সেদিন ওর কিছু খাওয়া হয় নি, পয়সা আছে কাছে ভাই?

পটলের বউ বললে, পাঁচটা পয়সা আছে—

—ওকে কিছু খাবার কিনে দিই—এসো।

নিকটবর্ত্তী একটা দোকান থেকে ওরা কিছু খাবার কিনে নিয়ে ঠোঙাটা পাগলীর সামনে রেখে দিয়ে বললে, এই নাও খাও—

পাগলী ওদের মুখের দিকে চেয়ে কোন কথা না বলে খাবারগুলো গোগ্রাসে খেয়ে বললে—আরও দাও—

শরৎ বললে, আজ আর নেই—কাল এখানে বসে থেকো বিকেলে এমনি সময়। কাল দেবো।

পটলের বৌ বললে, ভাই, আমাদের বাড়ি থেকে দুটো রেঁধে নিয়ে এসে দেবো কাল?

—বেশ এনো। আমি একটু তরকারী এনে দেবো। আমার যে ভাই কোন কিছু করবার যো নেই—তা হলে আমার ইচ্ছে করে ওকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে ভালো ক'রে পেট ভরে খাওয়াই। দুঃখ-কষ্টের মর্ম্ম নিজে না বুঝলে অপরের দুঃখ বোঝা যায় না। বাঙালীর মেয়ে কত দুঃখে পড়ে আজ ওর এ দশা—তা এক ভগবান ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না।

আমিও কোনদিন ওই রকম না হই ভাই—

—বালাই ষাট, তুমি কেন অমন হতে যাবে ভাই ?···ধরো, আমার হাত ধরো ভাই, বড্ড উঁচু-নীচু—

এই অন্ধ পটলের বউ। এর ওপরও এমন মায়া হয় শরতের! কে আছে এর জগতে, কেউ নেই—পটল ছাড়া। আজ যদি, ভগবান না করুন, পটলের কোন ভালমন্দ হয়, তবে কাল এই নিঃসহায় অন্ধ মেয়েটি দাঁড়ায় কোথায় ?

আবার ওই রাস্তার ধারের পাগলীর কথা মনে পড়ে।

জগতে যে এত দুঃখ, ব্যথা, কষ্ট আছে, শরৎ সেসব কিছু খবর রাখতো না। গড়শিবপুরের নিভৃত বনবিতান শ্যামল আবরণের সংকীর্ণ গন্ডী টেনে ওকে স্নেহে যত্নে মানুষ করেছিল—বহির্জগতের সংবাদ সেখানে গিয়ে কোনোদিনও পেঁছোয় নি।

শরৎ জগৎটাকে যে-রকম ভাবত, আসলে এটা সে রকম নয়। এখন তার চোখ ফুটেছে, জীবনে এত মর্ম্মান্তিক দুঃখের মধ্যে দিয়েই তবে সে উদার দৃষ্টি লাভ হয়েছে তার, এক-একদিন গঙ্গার ঘাটে চুপ করে বসে থাকতে থাকতে শরতের মনে ওঠে এসব কথা।

আগেকার গড়শিবপুরের সে শরৎ যে আর সে নেই—সেটা খুব ভাল করেই বোঝে। সে শরৎ ছিল মনেপ্রাণে বালিকা মাত্র। বয়স হয়েছিল যদিও তার ছাব্বিশ—দৃষ্টি ছিল রাজলক্ষ্মীর মতই, সংসারের কিছু বুঝত না, জানত না। সব লোককে ভাবত ভাল, সব লোককে ভাবত তাদের হিতৈষী।

সেই বালিকা শরতের কথা ভাবলে এ শরতের এখন হাসি পায়।

শরৎ মনে এখন যথেষ্ট বল পেয়েছে। কলকাতা থেকে আজ এসেছে প্রায় দেড় বছর, যে ধরনের উদ্‌ভ্রান্ত, ভীরু মন নিয়ে দিশেহারা অবস্থায় পালিয়ে এসেছিল কলকাতা থেকে—এখন সে মন যথেষ্ট বল সঞ্চয় করেছে। দুনিয়াটা যে এত বড়, বিস্তৃত—সেখানে যে এত ধরনের লোক বাস করে, তার চেয়েও কত বেশী দুঃখী অসহায়, নিরাবলম্ব লোক যে তার মধ্যে রয়েছে, এই সব জ্ঞানই তাকে বল দিয়েছে।

সে আর কি বিপদে পড়েছে, তার চেয়েও শতগুণে দুঃখিনী ওই গণেশ-মহল্লার পাগলী, এই অন্ধ পটলের বউ। এই কাশীতে সেদিন সে এক বুড়ীকে দেখেছে দশাশ্বমেধ ঘাটে, বয়স তার প্রায় সত্তর-বাহাত্তর, মাজা ভেঙে গিয়েছে, বাংলা দেশে বাড়ি ছিল, হাওড়া জেলার কোন এক পাড়াগাঁয়ে। কেউ নেই বুড়ীর, অনেক দিন থেকে কাশীতে আছে, ছত্রে ছত্রে খেয়ে বেড়ায়।

সেদিন শরৎকে বললে, মা, তুমি থাকো কোথায় গা ?

—কাছেই। কেন বলুন তো ?

—তোমরা ?

—ব্রাহ্মণ।

—আমায় দুটো ভাত দেবে একদিন ?

—আমার সে সুবিধে নেই মা। আমি পরের বাড়ি থাকি। আপনার মত অবস্থা। কেন, আপনি খান কোথায় ?

—পুঁটের ছত্তরে খেতাম, সে অনেকদূরে। অত দূরে আর হাঁটতে পারি নে—আজকাল আবার নিয়ম করেছে একদিন অন্তর মাদ্রাজীদের ছত্তরে ভাল ভাত দেয়। তা সে-সব তরকারী নারকোল তেলে রান্না মা। আমাদের মুখে ভাল লাগে না। আজ এক জায়গায় ভোজ দেবে, সেখানে যাবো—ওই পাঁড়েদের ধর্ম্মশালায়—চলো না, যাবে মা ?

—কতদূরে ?

—বেশি দূরে নয়। এক হিন্দুস্থানী বড়লোক কাশীতে তীর্থধর্ম্ম করতে এসেছে মা। লোকজন খাওয়াবে—আমাদের সব নেমন্তন্ন করেছে। চলো না ?

—না মা, আমি যাবো না।

—এতে কোনো লজ্জা নেই, অবস্থা খারাপ হলে মা সব রকম করতে হয়। আমারও দেশে গোলাপালা ছেল, দুই ছেলে হাতীর মত। তারা থাকলে আজ আমার বেধ্ধ বয়েসে কি এ দশা হয় ?

বুড়ীর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

শরৎ ভাবলে, দেখেই আসি, খাবো না তো—যা জিনিস দেবে, নিয়ে এসে পাগলীকে কি পটলের বউকে দিয়ে দেবো।

তাই সেদিন সে মনোমোহন পাঁড়ের ধর্ম্মশালায় গেল বুড়ীর সঙ্গে। ধর্ম্মশালার বিস্তৃত প্রাঙ্গণে অনেক বৃদ্ধ বাঙালী ও হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ জড়ো হয়েছে—মেয়েমানুষও সেখানে এসেছে, তবে সংখ্যা খুব বেশী নয়।

যারা ভোজ দিচ্ছে, তারা বাংলা জানে না—হিন্দীতে কথাবার্ত্তা কি বলে, শরৎ ভাল বুঝতে পারে না। তারা খুব বড়লোক, দেখেই মনে হ'ল। শরৎকে দেখে আলাদা ডেকে তাদের একটি বউ বললে, তুমি কি আলাদা বসে খাবে, মাইজি ?

—না মা—আমি নিয়ে যাবো।

—বাড়িতে লেড়কালেড়কি আছে বুঝি ?

শরৎ মৃদু হেসে বললে, না।

—আচ্ছা বেশ নিয়ে যাও—এখানে থাকো কোথায় ?

—একজনদের বাড়ি। রান্না করি।

—বাঙালী রান্না করো ?

—হ্যাঁ মা !

একটু পরে ভোজের বন্দোবস্ত হ'ল। অন্য কিছু নয়, শুধু হালুয়া, তিল তেলে রান্না। প্রকাণ্ড চাদরের কড়াইয়ে প্রায় দশ সের সুজি, দশ সের চিনি—আর ছোট টিনের একটিন তিল তেল ঢেলে হালুয়া তৈরী হচ্ছে, শরৎকে ডেকে নিয়ে গিয়ে হিন্দুস্থানী বৌটি সব দেখালে। অভ্যাগত দরিদ্র নরনারীদের বসিয়ে পেট ভরে সেই হালুয়া খাওয়ানো হ'ল—যাবার সময় দু-আনা করে মাথাপিছু ভোজন দক্ষিণাও দেওয়া হ'ল। শরৎকে কিন্তু একটা পুঁটুলিতে হালুয়া ছাড়া পুরী ও লাড্ডু অনেক করে দিলে ওরা।

খাবারগুলো পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে এসে শরৎ পটলের বউকে দিয়ে দিলে। বললে, আজ আর পাগলীর দেখা নেই। আজ খেতে পেতো, আজই নিরুদ্দেশ।

পটলের বউ বললে, পাগলীর জন্যে রেখে দেবো দিদি ?

—কেন মিথ্যে বাসি করে খাবে ? কাল যে আসবে তারই বা মানে কি আছে ? খাও তোমরা।

—তুমি খাবে না ?

—আমি খাবো না, সে তুমি জানো। ওরা কি জাত তার ঠিক নেই, ওদের হাতে রান্না—

—কাশীতে আবার জাতের বিচার—

—কেন কাশী তো জগন্নাথ ক্ষেত্তর না, সেখানে নাকি জাতের বিচার নেই—

এমন সময় ওপর থেকে ঝি এসে বললে—ওগো বামুনঠাকরুন, মা ডাকছেন—

ওপরে যেতেই মিনুর কাকীমা এক তুমুল কাণ্ড বাঁধিয়ে দিল। মোগলসরাই থেকে তার ভাইপোরা এসেছে, রাত আটটার গাড়িতে চলে যাবে, অথচ বামুনীর দেখা নেই, মাইনে

যাকে দিতে হচ্ছে সে সব সময় বাড়ি থাকবে। বিধবা মানুষের আবার অত শখের বেড়ানো কিসের, এতদিন কোনো কৈফিয়ৎ চাওয়া হয় নি শরতের গতিবিধির, কিন্তু ব্যাপার ক্রমশঃ যে-রকম দাঁড়াচ্ছে, তাতে কৈফিয়ৎ না নিলে চলে না।

শরৎ বললে, আমি তো জানতাম না ও'রা আসবেন। আমি আটটার অনেক আগে খাইয়ে দিচ্ছি—

—তুমি রোজ রোজ যাও কোথায় ?

—পটলের বউয়ের সঙ্গে তো যাই—

—কোথায় যাও ?

—৬ নম্বর ধ্রুবেশ্বরের গলি। হরিবাবু বলে এক ভদ্রলোকের বাড়ি—

—সেখানে কেন ?

—পটলের বউ বেড়াতে নিয়ে যায়। ওদের জানাশুনো।

—আজ কোথায় গিয়েছিলে ?

—একটা ধর্ম'শালা দেখতে।

—ওসব চলবে না বলে দিচ্ছি—কোথাও বেরুতে পারবে না কাল থেকে। ডুবে ডুবে জল খাও, আমি সব টের পাই। একশো বার করে কর্তাকে বললাম পটলদের তাড়াও নীচের ঘর থেকে। এগারো টাকার জায়গায় এখুনি পনেরো টাকা ভাড়া পাওয়া যায়। তা কর্তার কোন কথা কানে যাবে না—পটলের বউয়ের স্বভাবচরিত্র আমার ভাল ঠেকে না—

বেচারী অন্ধ পটলের বউ, তার নামে মিথ্যে অপবাদ শরতের সহ্য হ'ল না। সে বললে, আমার নামে যা হয় বলুন, সে বেচারী অন্ধ, তাকে কেন বলেন ? আমায় না রাখেন, কাল সকালেই আমি চলে যাবো—

—বেশ যাও। কাল সকালেই চলে যাবে—

শরৎ নির্বি'কার চিত্তে রান্নাবান্না করে গেল। লোকজনকে খাইয়ে দিলে। রাত ন'টার পরে মিনুর কাকীমা বললে, তোমার কি থাকবার ইচ্ছে নেই নাকি ?

—আপনিই তো থাকতে দিচ্ছেন না। পটলের বউয়ের নামে অমন বললেন কেন ? আমি মিশি বলে সে বেচারীও খারাপ হয়ে গেল ?

—তোমার বড্ড তেজ—কাশী শহরে কেউ জায়গা দেবে না। সে কথা ভুলে যাও—

—আমার কারো আশ্রয়ে যাওয়ার দরকার নেই। বিশ্বেশ্বর স্থান দেবেন। আমি আপনাদের বাড়ি থাকতে পারবো না। সকালে উঠেই চলে যাবো, যদি বলেন তো রে'ধে দিয়ে যাবো, নয় তো খোকাদের খাওয়ার কষ্ট হবে।

রাত্রে বাড়ি ফিরে মিনুর কাকা সব শুনলেন। সেই রাত্রেই তিনি শরৎকে ডেকে বললেন, তুমি কোথাও যেতে পারবে না বামুন-ঠাকরুন। ও যা বলেছে, কিছু মনে করো না।

শরৎ মিনুর কাকার সামনে বেরোয় না, কথাও বলে না। ঝিকে দিয়ে বলালে, তিনি যদি যেতে বারণ করেন, তবে সে কোথাও যাবে না। কারণ গৌরী-মা তাকে যাঁর হাতে স'পে দিয়েছিলেন—তাঁর অর্থাৎ মিনুর মা'র বিনা অনুমতিতে সে এ সংসার ছেড়ে যেতে পারবে না।

আরও দিন পনের কেটে গেলে। একদিন বিশ্বেশ্বরের গলির মুখে সেই বুড়ীর সঙ্গে আবার দেখা। বুড়ী বললে, কি গা, যাচ্ছ কোথায় ? কোন্ ছত্তরে ?

শরৎ অবাক হয়ে বললে, আমি ছত্তরে খাই নে তো ? আমি লোকের বাড়ি থাকি যে।

—চলো, আজ কুচবিহারের কালীবাড়িতে খুব কান্ড, সেখানে যাই। নাটকোটার ছত্তর চেন ?

—না মা, আমি কোথাও যাই নি—

—চলো আজ সব দেখিয়ে আনি—

সারা বিকেল তিন-চারটি বড় বড় ছত্রে শরৎ কাঙালী ভোজন, ব্রাহ্মণ ভোজন দেখে বেড়াল। বাঙালীটোলা ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্য্যন্ত পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বিরাট কালীবাড়ি ও ছত্র কুচবিহার মহারাজের। কালী মন্দিরের দেওয়ালে কত রকমের অস্ত্রশস্ত্র, কি চমৎকার বন্দোবস্ত অনাহূতে রবাহূত গরীব, নিরন্ন সেবার! মেয়েদের জন্যে খাওয়ানোর আলাদা জায়গা, পুরুষদের আলাদা, ব্রাহ্মণদের আলাদা। এত অকুণ্ঠ অন্নদান সে কখনো কল্পনাও করতে পারে নি।

শরৎ বললে, হ্যাঁ, মা, এখানে যে আসে তাকেই খেতে দেয় ?

—কুচবিহারের কালীবাড়িতে তা দেয় গো। তবুও আজকাল কড়াকড়ি করেছে। হবে না কেন, বাঙাল দেশ থেকে লোক এসে সব নষ্ট করে দিয়েছে।

—আমি নিজে যে বাঙাল—হ্যাঁ, মা—

শরৎ কথা বলেই হেসে ফেললে। বুড়ী কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বললে, হ্যাঁ গো, বাঙাল না ছাই, তোমার কথায় বুঝি বোঝা যায় কিছু, চলো চলো—নাটকোটার ছত্তর দেখিয়ে আনি—

নাটকোটার ছত্রে যখন ওরা গেল, তখন সেখানকার খাওয়া-দাওয়া শেষ। বাইরের গরীব লোকেরা ভাত নিয়ে যাচ্ছে কেউ কেউ।

শরৎ বললে, এ কাদের ছত্র মা ?

—তৈলিঙ্গিদের ছত্তর। এখানে খেতে এসেছিলুম একদিন, ডালে যত বা টক্, তত বা লঙ্কা। সে মা আমাদের পোষায় না। তুন্ডুমুন্ডুদের পোষায়, ওদের মুখে কি সোয়াদ আছে মা ?

শরৎ হেসে কুটি কুটি। বললে, তুন্ডুমুন্ডু কারা মা ?

—আরে ওই তৈলিঙ্গিদের কথাবার্ত্তা শোনো নি ? তুন্ডুমুন্ডু না কি সব বলে না ?

—আমি কখনো শুনি নি। আমায় একদিন শোনাবেন তো।

—একদিন খাওয়া-দাওয়ার সময় নাটকোটার ছত্তরে নিয়ে আসবো—দেখতে পাবে—

—আর কি ছত্তর আছে ?

—এখনো রাজরাজেশ্বরী ছত্তর, পুঁটের ছত্তর, আমবেড়ে—অহিল্যেবাই—

—সব দেখবো মা, আজ সব দেখে আসবো—

সমস্ত ঘুরে শেষ করতে ওদের প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। বুড়ী বললে, কাশীতে ভাতের ভাবনা নেই, অন্নপুন্নো মা দু-হাতে অন্ন বিলিয়ে যাচ্ছেন—

শরৎ বাসায় ফিরে এসে ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে রইল। তার সকলের চেয়ে ভাল লেগেছে কাশীর এই অন্নদান। এমন একটা ব্যাপারের কথা সত্যিই সে জানত না। ডাল ভাত উনুনে চাপিয়ে দিয়ে সে শুধু ভাবে ওই কথাটা। তার আর কিছু ভাল লাগে না। কাল সকাল সকাল এদের খাইয়ে-দাইয়ে দিয়ে সে আবার বেরুবে ছত্র দেখতে। ছত্রে খাওয়ানোর দৃশ্য সে মাত্র দেখলে কুচবিহারের কালীবাড়িতে। অন্য ছত্রে যখন গিয়েছিল তখন সেখানকার খাওয়ানো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সে দেখতে চায় দুচোখ ভরে এই বিরাট অন্নব্যয়, অকুণ্ঠ সদাব্রত—যেখানে গণেশমহল্লার পাগলীর মত, ওই অন্ধ রেণুকার মত, তার নিজের মত, ওই সত্তর বছরের মাজা-ভাঙা বুড়ীর মত—নিরন্ন, নিঃসহায় মানুষকে দুবেলা খেতে

দিচ্ছে। ওই দেখতে তার খুব ভাল লাগে—খুব—খুব ভাল লাগে—ওই সব ছত্রেই বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা প্রত্যক্ষ বিরাজ করেন বুভুক্ষু অভাজনদের ভোজনের সময়—মন্দিরে তাঁদের দেখার চেয়েও সে দেখা ভালো। অনেক, অনেক ভালো।

ঝি এসে বলে, ও বামুন-ঠাকরুন, মাছের ঝোল দিয়ে বাবুকে আগে ভাত দিতে হবে। খেয়ে এখুনি বেরিয়ে যাবেন—

—ও ঝি শোনো—পাঁচফোড়ন মোটে নেই, বাজার থেকে আগে এনে দাও—

ঝি চলে যায়। মাছের ঝোল ফোটে। নিভৃত রান্নাঘরের কোণে গোলমাল নেই—বসে শরৎ স্বপ্ন দেখে, সে প্রকাণ্ড ছত্র খুলেছে, কেদার ছত্র, বাবার নামে। কত লোক এসে খাচ্ছে—অবারিত দ্বার। বাবার ছত্র থেকে কোনো লোক ফিরবে না, অনাহারে কেউ ফিরে যাবে না। সে নিজে দেখবে শুনবে—সকলকে খাওয়াবে। সে দু-হাতে অন্নদান করবে। সকলকেই—ব্রাহ্মণ শূদ্র নেই, তুণ্ডুমুণ্ডু নেই, বাঙাল ঘটি নেই—সকলেই হবে তার পরম সম্মানিত অতিথি। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সবাইকে খাওয়াবে সে।

শরতের মাথার মধ্যে কি যেন নেশা জমেছে।···

রান্নাবান্না সেরে সে মিনুর কাকীমাকে বলল, আজ একবারটি বাইরে যাবো?

—কোথায়?

শরৎ হঠাৎ সলজ্জ হেসে বললে—সে বলবো এখন এসে।

শরতের হাসি দেখে মিনুর কাকীমার মনে সন্দেহ হ'ল। সে বললে, কোথায় না বললে চলে? সব জায়গায় যেতে দিতে পারি কি? রাগ করলে তো চলে না—বুঝে দেখতে হয়।

—ছত্তর দেখতে। রাজরাজেশ্বরী ছত্তরে অনেক বেলায় খাওয়া-দাওয়া হয়, পুঁটের ছত্তরেও হয়—দেখে আসি একটিবার—

মিনুর কাকীমা শরতের মনের উত্তাল উদ্বেল সমুদ্রের কোনো খবর রাখে না—সেবা ও অন্নদানের যে বিরাট আকুতি ও আগ্রহ তার কোনো খবর রাখে না—বললে, কেন ছত্তর দেখতে কেন? সে আবার কি?

—দেখি নি কখনো। যেতে দিন আজ আমায়—

শরতের কণ্ঠে সাগ্রহ মিনতির সুরে মিনুর কাকীমা ছুটি দিতে বাধ্য হ'ল, তবে হয়তো শরতের কথা সে আদৌ বিশ্বাস করলে না।

শরৎ এসে বললে, ও রেণু পোড়ারমুখী—কি হচ্ছে?

—ও, আজ যেন খুব ফুর্ত্তি, তোমার কি হয়েছে শুনি?

—কি আবার হবে, তোর মুণ্ডু হবে। চল্ ছত্তরে যাই, খাওয়া দেখে আসি।

রেণু অবাক হয়ে বললে, কেন?

—কেন, তোর মাথা। আমি যে কাশীতে ছত্তর খুলছি জানিস্ নে?

—বেশ তো ভাই। আমাদের মত গরীব লোকে তাহলে বেঁচে যায়। দু-বেলা তোমার ছত্তরে পেট ভরে দুটো খেয়ে আসি। হাঁড়ি-হেঁসেলের পাট উঠিয়ে দিই। কি নাম হবে, শরৎসুন্দরী ছত্র?

—না ভাই। বাবার নামে—কেদার ছত্তর। কেমন নাম হবে বল্ তো?

—যাই বলো ভাই, শরৎসুন্দরী ছত্র শুনতে যেমন, তেমনটি কিন্তু হ'ল না।

রাজরাজেশ্বরী ছত্রে ওরা যেতেই ছত্রের লোকে জিজ্ঞেস করলে—আপনারা আসুন, মেয়েদের জন্যে আলাদা বন্দোবস্ত আছে—

শরৎ বললে, চল ভাই রেণু, দেখি গে—

—যদি খেতে বলে?

—জোর করে খাওয়াবে না কেউ, তুমি চলো।

মেয়েদের মধ্যে সবাই বুড়ো-হাবড়া, এক আধ জন অল্পবয়সী মেয়েও আছে—কিন্তু তারা এসেছে বুড়ীদের সঙ্গে, কেউ নাতনী, কেউ মেয়ে সেজে। বুড়ীরা বড় ঝগড়াটে, পাতা আর জলের ঘটি নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়েছে। শরৎ বললে, মা বসুন, আমি জল দিচ্ছি আপনাদের—

একজন জিজ্ঞেস করলে—তুমি কি জেতের মেয়ে গা ?

—বামুনের মেয়ে, মা।

—কাশীতে এলে সবাই বামুন হয়। কোথায় থাকো তুমি ?

—বাঙালীটোলায় থাকি মা—কিছু ভাববেন না আপনি।

ছত্রের পরিবেশনকারিণী একটি মধ্যবয়স্কা মেয়ে শরতকে বললে, তোমরা বসছো না বাছা ?

—আমি খাবো না মা।

সে অবাক হয়ে বললে, তবে এখানে কেন এসেছ ?

—দেখতে।

রেণুকা বললে, উনি বড়লোকের মেয়ে, ছত্তর খুলবেন কাশীতে। তাই দেখতে এসেছেন কি রকম খাওয়া-দাওয়া হয়।

এক মুহূর্ত্তে যে-সব বুড়ী খেতে বসেছে এবং যারা পরিবেশন ও দেখাশুনো করছে, সকলেরই ধরন বদলে গেল। যে বুড়ী শরতের জাতি-বর্ণের প্রশ্ন তুলেছিল, সে-ই সকলের আগে একগাল হেসে বললে, সে চেহারা দেখেই আমি ধরেছি মা, চেহারা দেখেই ধরেছি। আগুন কি ছাই চাপা থাকে ? তা দ্যাখো রাণীমা, একটা দরখাস্ত দিয়ে রাখি। আমার এই নাতনী, অল্পবয়সে কপাল পুড়েছে, কেউ নেই আমাদের। আপনার ছত্তর খুললে এর দুটো বন্দোবস্ত যেন সেখানে হয়। ভগবান আপনার ভাল করবেন। কুচবেহার কালী-বাড়িতেও আমাদের নাম-লেখানো আছে মাসে পনেরো দিন। বাকী পনেরো দিন আমবেড়েয় আর এই ছত্তরে—

আর চার-পাঁচজন নিজেদের দুরবস্থা সবিস্তারে এবং নানা অলঙ্কার দিয়ে বর্ণনা করছে, এমন সময় পায়েস এসে হাজির হ'ল। একটা ছোট পিতলের গামলার এক গামলা পায়েস, খেতে বসেছে প্রায় জন ত্রিশ-বত্রিশ, বেশি করে কাউকে দেওয়া সম্ভব নয়—অথচ প্রত্যেকেই নির্লজ্জভাবে অনুযোগ করতে লাগল তার পাতে পায়েস কেন অতটুকু দেওয়া হ'ল, রোজই তে পায়েস কম পায়, তাকে আজ একটু বেশী করে দেওয়া হোক্। কেউ কেউ ঝগড়াও আরম্ভ করলে পরিবেশনকারিণীর সঙ্গে।

শরৎ রেণুকাকে নিয়ে বাইরে চলে এল। বললে, কেন ওরকম বললি ? ছিঃ—ওরা সবাই গরীব, ওদের লোভ দেখাতে নেই।

তার পর অন্যমনস্কভাবে বললে, ইচ্ছে করে ওদের খুব করে পায়েস খাওয়াই। আহা, খেতে পায় না, ওদের দোষ নেই—ছত্তরে বন্দোবস্ত ঠিকই আছে, একটু পায়েস দেয়, একটু ঘি দেয়—তবে ছিটেফোঁটা।

রেণুকা বললে, বাবা, বুড়ীগুলো একটু পায়েসের জন্যে কি রকম আরম্ভ করে দিয়েছে বল্ তো ? খাচ্ছিস্ পরের দয়ায়—আবার ঝগড়া ! ভিক্ষের চাল কাঁড়া-আঁকাড়া !

—আহা ভাই—কত দুঃখে যে ওরা এমন হয়েছে তা তুমি আমি কি জানি ? মানুষে কি সহজে লজ্জা-শরম খোয়ায় ? ওদের বড় দুঃখ। সত্যি ভাই, আমার ইচ্ছে করছে আজ যদি আমার ক্ষমতা থাকতো, বাবার নামে ছত্তর দিতাম। আর তাতে নিজের হাতে বড় কড়ায়

পায়েস রেঁধে ওদের খাওয়াতাম। সেদিন যেমন কড়ায় হালুয়া রেঁধে দিল সেই ছত্তরটা—তুই দেখিস্‌ নি—চাদরের মস্ত বড় কড়া।

—নে চল্‌ আমার হাত ধর্‌—

—ওই পাগলীকে নিজের হাতে রেঁধে একদিন পেট ভরে খাওয়াবো। তোর বাড়িতে—

—বেশ তো।

—আমি মাইনে বলে কিছু চাইলে ওরা দেবে না?

—দেওয়া তো উচিত। তবে গিন্নীটি যে রকম ঋানু—তুমি তো ভাই মুখ ফুটে কিছু বলতে পারবে না—

—মরে গেলেও না। তবে একবার বলে দেখতে হবে। বেশী লোককে না পারি, একজনকেও তো পারি।

ওরা খানিক দূরে এসেছে, ছত্রের উত্তর দিকের উঁচু রোয়াক থেকে পুরুষের দল খেয়ে নেমে আসছে, হঠাৎ তাদের মধ্যে কাকে দেখে শরৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তার মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ বার হ'ল—পরক্ষণেই সে রেণুকার হাত ছেড়ে দিয়ে সেদিকে এগিয়ে চলল।

বিস্মিতা রেণুকা বললে, কোথায় চললে ভাই? কি হ'ল?

পুরুষের ভিড়ের মধ্যে এঁটো হাতে নেমে আসছেন সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তিন বৎসর আগে যিনি পদব্রজে দেশভ্রমণে বেরিয়ে গড়শিবপুরে শরৎদের বাড়ির অতিথিশালায় কয়েকদিন ছিলেন।

শরৎ চেয়ে চেয়ে দেখলে। কোনো ভুল নেই—তিনিই। সেই গোপেশ্বর চট্টোপাধ্যায়!

সে প্রথমটা একটু ইতস্ততঃ করছিল—কিন্তু তখনি দ্বিধা ও সংকোচ ছেড়ে কাছে গিয়ে বললে, ও জ্যাঠামশাই? চিনতে পারেন?

সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণই বটে। শরতের দিকে অল্পক্ষণ হাঁ করে চেয়ে থেকে তিনি আগ্রহ ও বিস্ময়ের সুরে বললেন—মা, তুমি এখানে?

—হ্যাঁ জ্যাঠামশাই। আমি এখানেই আছি—

—কতদিন এসেছ? রাজামশায় কোথায়? তোমার বাবা?

—তিনি—তিনি দেশে। সব কথা বলছি, আসুন আমার সঙ্গে। আমার সঙ্গে একটি মেয়ে আছে—ওকে ডেকে নিই। আপনি হাত মুখ ধুয়ে নিন জ্যাঠামশায়।

পথে বেরিয়েই গোপেশ্বর চাটুজ্জে বললেন—তারপর মা, তুমি এখানে কবে এসেছ? আছো কোথায়?

—সব বলবো। আপনি আগে বলুন, আপনি কবে এসেছেন?

—আমি সেই তোমাদের ওখান থেকে বেরিয়ে আরও দু-এক জায়গায় বেড়িয়ে বাড়ি যাই। বাড়িতে বলেছি তো ছেলের বউ আর ছেলেরা। তাদের অবস্থা ভাল না। কিছুদিন বেশ রইলাম—তার পর এই মাঘ মাসে আবার বেরিয়ে পড়লাম—একেবারে কাশী।

—হেঁটে?

—না মা, বুড়ো বয়সে তা কি পারি। ভিক্ষে-সিক্ষে করে কোনোমতে রেলে চেপেই এসেছি। ছত্তরে ছত্তরে খেয়ে বেড়াচ্ছি। মা অন্নপূর্ণোর কৃপায় আমার মত গরীব ব্রাহ্মণের দুটো ভাতের ভাবনা নেই এখানে। চলে যাচ্ছে এক রকমে। আর দেশে ফিরবো না ভেবেছি মা।

রেণুকাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে শরৎ বললে, চলুন জ্যাঠামশায়, দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে বসি।

দুজনে গিয়ে দশাশ্বমেধ ঘাটের রানায় বসলো।

গোপেশ্বর চাটুজ্জে বললেন, তার পর মা, তোমার কথা বলো। কার সঙ্গে এসেছো কাশীতে? ও মেয়েটি বুঝি চোখে দেখতে পায় না? ও কেউ হয় তোমাদের?

শরতের কোন দ্বিধা হ'ল না এই পিতৃসম স্নেহশীল বৃদ্ধের কাছে সব কথা খুলে বলতে। অনেক দিন পরে সে এমন একজন মানুষ পেয়েছে, যার কাছে বুকের বোঝা নামিয়ে হাল্কা হওয়া যায়। কথা শেষ করে সে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল।

বৃদ্ধ গোপেশ্বর চাটুজ্জে সব শুনে কাঠের মত বসে রইলেন।

...এসব কি শুনছেন তিনি? এও কি সম্ভব?

শেষে আপন মনেই যেন বললেন, তোমার বাবা রাজামশায় তা হলে দেশেই—না?

—তা জানি নে জ্যাঠামশায়, বাবা কোথায় তা ভেবেছিও কতবার—তবে মনে হয় দেশেই আছেন তিনি—যদি এতদিন বেঁচে থাকেন—

কান্নার বেগে আবার ওর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল।

—আচ্ছা, থাক মা, কেঁদো না। আমিও বলছি শোনো—গোপেশ্বর চাটুজ্জে যদি অভিনন্দ ঠাকুরের বংশধর হয়, তবে এই কাশীর গঙ্গাতীরে বসে দিব্যি করছি তোমাকে তোমার বাবার কাছে নিয়ে যাবোই। তুমি তৈরি হও মা—কালই রওনা হয়ে যাবো বাপে-ঝিয়ে—তুমি কোন্ বাড়ি থাকো—চল দেখে যাই। তুমি কি মেয়ে, আমার তা জানতে বাকী নেই। নরাধম পাষণ্ড ছাড়া তোমার চরিত্রে কেউ সন্দেহ করতে পারে না। আমার রোগ থেকে সেবা করে তুমি বাঁচিয়ে তুলেছিলে—তা আমি ভুলি নি—আমার আর জন্মের মা-জননী তুমি। তোমায় এ অবস্থায় এখানে ফেলে গেলে আমার নরকেও স্থান হবে না যে।

এগারো

বৃদ্ধ গোপেশ্বর চাটুজ্জেকে সঙ্গে নিয়ে শরৎ ফিরল নিজের বাসায়।

বৃদ্ধ বললেন, এই বাড়ি? বেশ। কাল তুমি তৈরি হয়ে থেকো। তোমার এই বুড়ো ছেলের সঙ্গে কাল যেতে হবে তোমায়। পয়সাকড়ি না থাকে, সেজন্যে কিছু ভেবো না—ছেলের সে ক্ষমতা আছে মা-জননী।

রেণুকা এতক্ষণ কিছু বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে গিয়েছিল, শরৎকে চুপি চুপি বললে, উনি কে ভাই?

—আমার জ্যাঠামশাই—

—তোমাকে দেশে নিয়ে যাবেন?

—তাই তো বলছেন।

—হঠাৎ কালই চলে যাবে কেন, এ মাসটা থেকে যাও না কাশীতে। বলো তোমার জ্যাঠামশাইকে। খোকার সঙ্গে একবার দেখাও করতে হবে তো? আমাকে এত শীগ্‌গির ফেলে দিয়েই বা যাবে কোথায়?

শরৎ বৃদ্ধকে জানাল। কালই যাওয়া মুশকিল হবে তার। যেখানে কাজ করছে, যারা এতদিন আশ্রয় দিয়ে রেখেছিল, তারা একটা লোক দেখে নিলে সে যাবার জন্যে তৈরী হবে।

বৃদ্ধ গোপেশ্বর চাটুজ্জে তাতে রাজী হলেন। পাঁচ দিনের সময় নিয়ে শরৎ রোজ রান্না-বান্নার পরে রেণুকাকে সঙ্গে নিয়ে খোকনদের বাড়ি যায়। কাশী থেকে কোন্ অনির্দেশ্য ভবিষ্যতের পথে সে যাত্রা শুরু করবে তা সে জানে না—কিন্তু খোকনকে ফেলে যেতে তার সব চেয়ে কষ্ট হবে তা সে এ ক'দিনে হাড়ে হাড়ে বুঝছে। খোকনের মা ওর যাবার কথা

শুনে খুবেই দুঃখিত।

শরৎ বলে, ও খোকন বাবা, গরীব মাসীমাকে মনে রাখবি তো বাবা ?

খোকন না বুঝেই ঘাড় নেড়ে বলে—হুঁ। তোমাকে একটা বল কিনে দেবো মাসীমা—

—সত্যি ?

—হ্যাঁ মাসীমা, ঠিক দেবো।

—আমায় কখনো ভুলে যাবি নে ? বড় হলে মাসীমার বাড়ি যাবি, মুড়কী নাড়ু দেবো ধামি করে, পা ছড়িয়ে বসে খাবি।

খোকা ঘাড় নেড়ে বলে—হুঁ।

বক্সীদের বড় বউ ওর নাম ঠিকানা সব লিখে নিলে, খোকনের মার কাছে ওর নাম ঠিকানা রইল।

ফেরবার পথে শরৎ গণেশমহল্লার পাগলীর সন্ধানে ইতস্ততঃ চাইতে লাগল, কিন্তু কোথাও তাকে দেখা গেল না। রেণুকাকে বললে, ওই একটা মনে বড় সাধ ছিল, পাগলীকে একদিন ভাল করে রেঁধে খাওয়াবো—তা কিন্তু হ'ল না। আমি মাইনে বলে কিছু চেয়ে নেবো মিনুর কাকীর কাছে থেকে, যদি কিছু দেয় তবে তোর কাছে রেখে যাবো। আমার হয়ে তুই তাকে একদিন খাইয়ে দিস্—

রেণুকা ধরা গলায় বলে—আর আমার উপায় কি হবে বললে না যে বড় ? তোমার ছত্র কবে এসে খুলছো কাশীতে—শরৎসুন্দরী ছত্র ? গরীব লোক দুটো খেয়ে বাঁচি।

শরৎ হেসে ভঙ্গি করে ঘাড় দুলিয়ে বললে, আ তোমার মরণ ! এর মধ্যে ভুলে গেলি মুখপুড়ী ? শরৎসুন্দরী নয় কেদার ছত্তর—

—ও ঠিক, ঠিক। জ্যাঠামশায়ের নামে ছত্র হবে যে ! ভুলে যাই ছাই—

—না হলেও তুই যাবি আমাদের দেশে। মস্ত বড় অতিথিশালা আছে। রাজারাজড়ার কান্ড ! সেখানে বারো মাস থাবি, রাজকন্যের সখী হয়ে—কি বলিস ?

—উঃ, তা হলে তো বর্ত্তে যাই দিদি ভাই। কবে যেন যাচ্ছি তাই বলো, জোড়ে না বিজোড়ে ?

—তা কি কখনো হয় রে পোড়ারমুখী ? জোড়ের পায়রা জোড় ছাড়া করতে গিয়ে পাপের ভাগী হবে কে ?

মিনুর কাকীমাকে শরৎ বিদায়ের কথা বলতেই সে চমকে উঠল প্রায় আর কি। কেন যাবে, কোথায় যাবে, কার সঙ্গে যাবে—নানা প্রশ্নে শরৎ ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। তার কোনো কথাই অবিশ্যি মিনুর কাকীমার বিশ্বাস হ'ল না। ওসব চরিত্রের লোকের কথার মধ্যে বারো আনাই মিথ্যে।

শরৎ বললে, আমায় কিছু দেবেন ? যাবার সময় খরচপত্র আছে—

—যখন তখন হুকুম করলেই কি গেরস্তর ঘরে টাকাকড়ি থাকে ? আমি এখন যদি বলি আমি দিতে পারবো না ?

—দেবেন না। আপনারা এতদিন আশ্রয় দিয়েছিলেন এই ঢের ! পয়সাকড়ির জন্যে তো ছিলাম না. গৌরী-মা বলে দিয়েছিলেন, সব ঠিক করে দিয়েছিলেন—তাই এখানে ছিলাম। আপনাদের উপকার জীবনে ভুলবো না।

মিনুর কাকীমা শরতের কথা শুনে একটু নরমও হ'ল। বললে, তা—তা তো বটেই। তা আচ্ছা দেখি যা পারি দেবো এখন।

বিদায়ের দিন শরৎ মিনুর কাকীমাকে অবাক করে দিয়ে বাড়ির ছেলেমেয়েদের জন্যে কিছু-না-কিছু খেলনা ও খাবার জিনিস কিনে নিয়ে এল। রেণুকাকে তার ঘরে একখানা লালপাড়

শাড়ি দিতে গিয়ে চোখের জলের মধ্যে পরস্পরের ছাড়াছাড়ি হ'ল।

রেণুকা বললে, এ শাড়ি আমার পরা হবে না ভাই, মাথায় করে রেখে দেবো—

—তাই করিস মুখপুড়ী।

—কেন আমার জন্যে খরচ করলে! ক'টাকা দাম নিয়েছে?

—তোর সে খোঁজে দরকার কি? দিলাম, নে। মিটে গেল। জানিস আমি রাজকন্যে, আমাদের হাত ঝাড়লে পর্ব্বত?

রেণুকা চোখের জল ফেলতে ফেলতে বললে—তুমি আমায় ভুলে গেলে আমি মরে যাবো ভাই।

শরৎ মুখে ভেংচি কেটে বললে, মরে ভুত হবি পোড়ারমুখী! ভুত না তো, পেত্নী হবি। রাত্রে আমায় যেন ভয় দেখাতে যেয়ো না।

শরতের মুখে হাসি অথচ চোখে জল।

আবার কলকাতা শহর।···

গোপেশ্বর চাটুজ্জে বললেন, এখানে বৃন্দাবন মল্লিকের লেনে আমাদের গাঁয়ের একজন লোক থাকে বাসা করে, আপিসে চাকরি করে। চলো সেখান গিয়ে উঠি দুজনে।

খুঁজতে খুঁজতে বাসা মিললো। বাড়ির কর্ত্তা জাতিতে মোদক, স্বগ্রামের প্রবীণ ব্রাহ্মণ প্রতিবেশীর উপস্থিতিতে সে যেন হাতে স্বর্গ পেয়ে গেল। মাথায় রাখে কি কোথায় রাখে, ভেবে যেন পায় না। বললে—মা-ঠাকরুণ কে?

—আমার ভাইঝি, গড়শিবপুরে বাড়ি ওদের। তুমি চেনো না। মস্ত লোক ওর বাবা।

—তা চাটুজ্জে মশাই, সব যোগাড় আছে ঘরে। দিদি-ঠাকরুণ রান্নাবান্না করুন, ওরা সব যুগিয়ে দেবে এখন। আমার আবার আপিসের বেলা হয়ে গেল—দশটায় হাজির হতেই হবে। আমি তেল মাখি—কিছু মনে করবেন না।

বাড়ির গৃহিণী শরৎকে যথেষ্ট যত্ন করলেন। তাকে কিছুই করতে দিলেন না। বাটনা বাটা, কুটনো কোটা সবই তিনি আর তাঁর বড় মেয়ে দুজনে মিলে করে শরৎকে রান্না চড়িয়ে দিতে ডাক দিলেন।

শরতের জন্যে মিছরী ভিজের শরবৎ, দই সন্দেশ আনিয়ে তার স্নানের পর তাকে জল খেতে দিলেন।

আহারাদির পর শরতের বড় ইচ্ছে হ'ল একবার কালীঘাটে গিয়ে সে গৌরী-মার সঙ্গে দেখা করে। বৃদ্ধ গোপেশ্বর চাটুজ্জে শুনে বললেন, চলো না মা, আমারও ওই সঙ্গে দেবদর্শনটা হয়ে যাক্।

বিকেলের দিকে ওরা কালীঘাটে গেল। বাড়ির গৃহিণী তাঁর বড় মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ওদের সঙ্গিনী হলেন। মন্দিরের প্রাঙ্গণে বিস্তৃত নাটমন্দিরে দু-তিনটি নূতন সন্ন্যাসী আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। গৌরী-মা তাঁর পুরোনো জায়গাটিতেই ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন। শরৎকে দেখে তিনি প্রায় চমকে উঠলেন। বললেন, সরোজিনীরা কি কলকাতায় এসেছে?

শরৎ তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে সব খুলে বললে।

গৌরী-মা বললেন, তোমার জ্যাঠামশাই? কই দেখি—

বৃদ্ধ চাটুজ্জে মহাশয় এসে গৌরী-মার কাছে বসলেন, কিন্তু প্রণাম করলেন না, বোধ হয় সন্ন্যাসিনী তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট ব'লে। বললেন—মা, আমি আপনার কথা শরতের মুখে সব শুনেছি। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন আমি ওকে যেন ওর বাবার কাছে নিয়ে যেতে পারি। আপনার আশীর্ব্বাদ ছিল ব'লে বোধ হয় আমার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল কাশীতে।

গৌরী-মা বললেন, তাঁর কৃপায় সব হয় বাবা, তিনিই সব করছেন—আপনি আমি নিমিত্ত মাত্র।

বাসায় ফিরে আসবার পথে শরতের কেবলই মনে হচ্ছিল, যদি কমলার সঙ্গে একবারটি পথেঘাটে কোথাও দেখা হয়ে যেতো, কি মজাই হ'ত তা হলে! কলকাতার মধ্যে যদি কারো সঙ্গে দেখা করবার জন্যে প্রাণ কেমন করে—তবে সে সেই হতভাগিনী বালিকার সঙ্গেই আবার সাক্ষাতের আশায়।

কাশীতে গিয়ে এই দেড় বৎসরে সে অনেক শিখেছে, অনেক বুঝেছে। এখন সে হেঁনাদের বাড়ি আবার যেতে পারে, কমলাকে সেখান থেকে টেনে আনতে পারে, সে সাহস তার মধ্যে এসে গিয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে হেনাদের বাড়ির ঠিকানা জানে না, শহর বাজারে ঘরবাড়ির ঠিকানা বা রাস্তা না জানলে বের করতে পারা যায় না, আজকাল সে বুঝেছে।

কলকাতায় এসে আবার তার বড় ভাল লাগছে। কাশী তো পুণ্যস্থান, কত দেউল দেবমন্দির, ঘাট, যত ইচ্ছে স্নান কর, দান কর, পুণ্য কর—স্বয়ং বাবা বিশ্বনাথের সেখানে অধিষ্ঠান। কিন্তু কলকাতা যেন ওকে টানে, এখানে এত জিনিস আছে যার সে কিছুই বোঝে না—সেজন্যেই হয়তো কলকাতা তার কাছে বেশী রহস্যময়। এত লোকজন, গাড়িঘোড়া, এত বড় জায়গা কাশী নয়।

শরৎ বলে, জ্যাঠামশায় আপনি কোন্ কোন্ দেশে বেড়ালেন?

—বাংলা দেশের কত জায়গা পায়ে হেঁটে বেড়িয়েছি মা, বর্ধমানে গিয়েছি, বৈঁচি, শক্তিগড়, নারানপুরে গিয়েছি। রাঢ় দেশের কত বড় বড় মাঠ বেয়ে সন্দেবেলা সুমুখ আঁধার রাত্তিরে একা গিয়েছি। বড় তালগাছে ঘেরা দীঘি, জনমানব নেই কোথাও, লোকে বলে ঠ্যাঙাড়ে ডাকাতের ভয়—এমন সব দীঘির ধারে সারাদিন পথ হাঁটবার পরে বসে চাট্টি জলপান খেয়েছি। একদিন সে কথা গল্প করবো তোমাদের বাড়ি বসে।

—বেশ জ্যাঠামশায়।

—বেড়াতে বড় ভাল লাগে আমার। আগে বাংলাদেশের মধ্যেই ঘুরতাম, এবার গয়া কাশীও দেখা হ'ল—

—আমারও খুব ভাল লাগে। বাবা কোনো দেশ দেখেন নি, বাবাকে নিয়ে চলুন আবার আমরা বেরুবো—

—খুব ভাল কথা মা। চলো এবার হরিদ্বারে যাবো—

—সে কতদূর? কাশীর ওদিকে?

—সে আরও অনেক দূরে শুনেছি। তা হোক, চলো সবাই মিলে যাওয়া যাক্—বৃন্দাবন হয়ে যাবো—তোমার বাবাও চলুন।

—জ্যাঠামশায়?

—কি মা?

—বাবার দেখা পাবো তো?

—আমি যখন কথা দিয়েছি মা, তুমি ভেবো না। সে বিষয়ে নিশ্চিন্দি থাকো।

পরদিন গোপেশ্বর চাটুজ্জে শরৎকে কলকাতায় তাঁর স্বগ্রামবাসী কৃষ্ণচন্দ্র মোদকের বাসায় রেখে দুদিনের জন্যে গড়শিবপুরে গেলেন। শরৎকে আগে হঠাৎ গ্রামে না নিয়ে গিয়ে ফেলে সেখানকার ব্যাপার কি জানা দরকার। গড়শিবপুরে গিয়ে সন্ধান নিয়ে কিন্তু তাঁর চক্ষুস্থির হয়ে গেল, যা শুনলেন সেখানে। গ্রামের লোকে বললে, কেদার রাজা বা তাঁর মেয়ে আজ

প্রায় দেড় বৎসর দু-বৎসর আগে গ্রাম থেকে কলকাতায় চলে যান। সেখান থেকে তাঁরা কোথায় চলে গিয়েছেন তা কেউ জানে না। কলকাতায় তাঁরা নেই একথাও ঠিক। যাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন, তারাই ফিরে এসে বলেছে।

গোপেশ্বর চাটুজ্জে গ্রামের অনেককেই জিজ্ঞেস করলেন, সকলেই ওই এক কথা বলে। সেবার যে সেই মুদির দোকানে কেদারের সঙ্গে বসে বসে গান-বাজনা করেছিলেন সেখানেও গেলেন। কেদার গাঁয়ে না থাকায় গানবাজনার চর্চা আর হয় না, মুদি খুব দুঃখ করলে। গোপেশ্বরকে তামাক সেজে খাওয়ালে। অনেকদিন কেদার বা তাঁর মেয়ের কোনো সন্ধান নেই, আর আসবেন কিনা কে জানে।

বৃদ্ধ তামাক খেয়ে উঠলেন।

গ্রামের বাইরের পথ ধরে চিন্তিত মনে চলেছেন, শরতের বাপের যদি সন্ধান না-ই পাওয়া যায়, তবে উপস্থিত শরতের গতি কি করা যাবে? কাশী থেকে এনে ভুল করলেন না তো?

এমন সময় পেছন থেকে একজন চাষা লোক তাঁকে ডাক দিলে—বাবাঠাকুর—

গোপেশ্বর চাটুজ্জে ফিরে চেয়ে দেখে বললেন—কি বাপু?

—আপনি ক্যাদার খুড়ো ঠাকুরের খোঁজ করছিলে ছিবাস মুদির দোকানে। আমিও সেখানে ছেলাম। আপনি কি তাঁর কেউ হও?

—হ্যাঁ বাপু। আমি তাঁর আত্মীয়, কেন তুমি কিছু জান নাকি?

—আপনি কারো কাছে বলবেন না তো?

—না, বলতে যাবো কেন? কি ব্যাপার বলো তো শুনি। আমি তাঁর বিশেষ আত্মীয়, আর আমার দরকারও খুব।

লোকটা সুর নীচু করে বললে—তিনি হিংনাড়ার ঘোষেদের আড়তে কাজ করছেন যে। হিংনাড়া চেনেন? হলুদপুকুর থেকে তিন ক্রোশ। আমি পটল বেচতে যাই সেবার মাঘ মাসে। আমার সঙ্গে দেখা। আমায় দিব্যি দিয়ে দিয়েলেন, গ্রামের কাউকে বলতে নিষেধ করে দিলেন। তাই কাউকে বলি নি। আপনি সেখানে যাও, পুকুরের উত্তর পাড়ে যে ধান-সর্ষের আড়ত, সেখানেই তিনি থাকেন। আমার নাম করে বলবে, গেঁয়োহাটির ক্ষেত্তর সন্ধান দিয়েছে। আমাদের গাঁয়ের শখের যাত্রার দলে কতবার উনি গিয়ে বেয়ালা বাজিয়েছেন। আমায় বড্ড স্নেহ করতেন। মনে থাকবে? গেঁয়োহাটির ক্ষেত্তর কাপালী।

গোপেশ্বর চাটুজ্জে আশা করেন নি এভাবে কেদারের সন্ধান মিলবে। বললেন, বড্ড উপকার করলে বাপু। কি নাম বললে? ক্ষেত্র? আমি বলবো এখন তাঁর কাছে—বড় ভালো লোক তুমি।

সেই দিনই সন্ধ্যার আগে গোপেশ্বর চাটুজ্জে হিংনাড়ার বাজারে গিয়ে ঘোষেদের আড়ত খুঁজে বার করলেন। আড়তের লোকে জিজ্ঞেস করলে, কাকে চান মশাই? কোত্থেকে আসা হচ্ছে?

—গড়শিবপুরের কেদারবাবু এখানে থাকেন?

—হ্যাঁ আছেন। কিন্তু তিনি মালঞ্চার বাজারে আড়তের কাজে গিয়েছিলেন—এখনও আসেন নি। বসুন।

রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় কে তাঁকে বললে—মুহুরী মশায় ঐ যে ফিরছেন—

গোপেশ্বর চাটুজ্জে সামনে গিয়ে বললেন, রাজামশায়, নমস্কার। আমায় চিনতে পারেন?

গোপেশ্বরের দেখে মনে হ'ল কেদারের বয়স যেন খানিকটা বেড়ে গিয়েছে, কিন্তু হাবভাবে সেই পুরানো আমলের কেদার রাজাই রয়ে গিয়েছেন পুরোপুরিই।

কেদার চোখ মিটু মিটু করে বললেন, হ্যাঁ, চিনেছি। চাটুজ্জে মশায় না?

—ভাল আছেন ?

—তা একরকম আছি।

—এখানে কি চাকরি করছেন ? আপনার মেয়ে কোথায় ?

—আমার মেয়ে ? ইয়ে—

কেদার যেন একবার ঢোক গিলে তার পর অকারণে হঠাৎ উৎসাহিতের সুরে বললেন, মেয়ে কলকাতায়—তার মাসীমার—

গোপেশ্বর চাটুজ্জে সুর নিচু করে বললেন, শরৎ-মাকে আমার সঙ্গে এনেছি। সে আমার কাছেই আছে—কোনো ভয় নেই।

এই কথা বলার পরে কেদারের মুখের ভাবের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটলো। নিতান্ত নিরীহ ও নির্ব্বোধ লোক ধমক খেলে যেমন হয় তাঁর মুখ যেন তেমনি হয়ে গেল। গোপেশ্বর চাটুজ্জের মনে হ'ল এখুনি তিনি যেন হাত জোড় করে কেঁদে ফেলবেন।

বললেন, আমার মেয়েকে—আপনি এনেছেন ? কোথায় সে ?

—কলকাতায় রেখে এসেছি। কালই আনবো। বসুন, একটু নিরিবিলি জায়গায়—সব বলছি। ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন, কোনো ভয় নেই রাজামশায়। চলুন ওদিকে—বলি সব খুলে।

গোপেশ্বর চাটুজ্জে বললেন, আপনার মেয়ে আগুনের মত পবিত্র—

কেদার হা-হা করে হেসে বললেন, ও কথা আমায় বলার দরকার হবে না হে গোপেশ্বর। আমার মেয়ে, আমাদের বংশের মেয়ে—ও আমি জানি।

গোপেশ্বর চাটুজ্জে বললেন, রাজামশায় শেষটাতে কি এখানে চাকরি স্বীকার করলেন ?

কেদার অপ্রতিভের হাসি হেসে বললেন, ভুলে থাকবার জন্যে, স্রেফ্ ভুলে থাকবার জন্যে দাদা। এরা আমার বাড়ি যে গড়শিবপুরে তা জানে না। বেহালা বাজাই নি আজ এই দেড় বছর—বেহালার বাজনা যদি কোথাও শুনি, মন কেমন করে ওঠে।

—চলুন, আজই কলকাতায় যাই—

—আমার বড় ভয় করে। ভয়ানক জায়গা—আমি আর সেখানে যাব না হে, তুমি গিয়ে নিয়ে এস মেয়েটাকে। আজ রাতে এখানে থাকো—কাল রওনা হয়ে যাও সকালে। আমার কাছে টাকা আছে, খরচপত্র নিয়ে যাও। প্রায় সওয়া-শো টাকা এদের গদিতে মাইনের দরুন এই দেড় বছরে আমার পাওনা দাঁড়িয়েছে। আজ ঘোষ মশায়ের কাছে চেয়ে নেবো।

গোপেশ্বর চাটুজ্জে পরদিন সকালে কলকাতায় গেলেন এবং দুদিন পরে শরৎকে সঙ্গে নিয়ে স্বরূপপুর স্টেশনে নেমে নৌকাযোগে বৈকালে হিংনাড়া থেকে আধক্রোশ দূরবর্ত্তী ছুতোরঘাটায় পেঁছে কেদারকে খবর দিতে গেলেন। শরৎ নৌকাতেই রইল বসে।

সন্ধ্যার কিছু আগে কেদার এসে বাইরে থেকে ডাক দিলেন—ও শরৎ—

শরৎ কেঁদে ছইয়ের মধ্যে থেকে বার হয়ে এল। সে যেন ছেলেমানুষের মত হয়ে গেল বাপের কাছে। অকারণে বাপের ওপর তার এক দুর্জ্জয় অভিমান।

কেদার বড় শক্ত পুরুষমানুষ—এমন সুরে মেয়ের সঙ্গে কথা বললেন, যেন আজ ওবেলাই মেয়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে, যেন রোজই দেখাসাক্ষাৎ হয়।

—কাঁদিস্ নে মা, কাঁদতে নেই, ছিঃ! কেঁদো না। ভাল আছিস ?

শরৎ কাঁদতে কাঁদতেই বললে, তুমি তো আর আমার সন্ধান নিলে না ? বাবা তুমি এত নিষ্ঠুর! আজ যদি মা বেঁচে থাকতো, তুমি এমনি করে ভুলে থাকতে পারতে ?

দুজনেই জানে কারো কোনো দোষ নেই, যা হয়ে গিয়েছে তার ওপর হাত ছিল না বাবা বা মেয়ের কারো—রাগ বা অভিমান—সম্পূর্ণ অকারণ!

কেদার অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন, তা কিছু মনে করিস নে তুই মা। আমার কেমন ভয় হয়ে গেল—আমায় ভয় দেখালে পুলিস ডেকে দেবে, তোমায় ধরিয়ে দেবে সে আরও কত কিছু। আমার সব মনেও নেই মা। যাক্, যা হয়ে গিয়েছে, তুমি কিছু মনে করো না। চলো চলো আজই গড়শিবপুরে রওনা হই। দেড় বছর বাড়ি যাই নি।

গড়শিবপুরের রাজবাড়ি এই দেড় বছরে অনেক খারাপ হয়ে গিয়েছে।

চালের খড় গত বর্ষায় অনেক জায়গায় ধসে পড়েছে। বাঁশের আড়া ও বাতা উইয়ে খেয়ে ফেলেছে। বাড়ির উঠোনে একহাঁটু বনজঙ্গল—আজ গোপেশ্বর চাটুজ্জে ও কেদার অনবরত কেটে পরিষ্কার করেও এখনও সাবেক উঠোন বের করতে পারেন নি।

নিড়ানি ধরে সামনের উঠোনের লম্বা লম্বা মুথো ঘাস উপড়ে তুলতে তুলতে কেদার বললেন, ও মা শরৎ, আমাদের একটু তামাক দিতে পারো?

গোপেশ্বর চাটুজ্জে উঠোনের ওপাশে কুক্‌শিমা গাছের জঙ্গল দা দিয়ে কেটে জড়ো করতে করতে বলে উঠলেন—ও কি রাজামশায়, না না, মেয়েমানুষদের দিয়ে তামাক সাজানো—ওরা ঘরের লক্ষ্মী—না ছিঃ—তামাক আমি সেজে আনছি গিয়ে—

ততক্ষণ শরৎ তামাক ধরিয়ে কলকেতে ফুঁ পাড়ছে। দুপুর গড়িয়ে বিকেলের ছায়া ঈষৎ দীর্ঘতর হয়েছে। বাতাসে সদ্য কাটা বনজঙ্গলের কটুতিক্ত গন্ধ। ভাঙা গড়বাড়ির দেউড়ির কার্নিসে বন্য পাখীর কাকলী।

কাশীতে যখন ছিল তখন ভাবে নি আবার সে দেশে ফিরতে পারবে কখনো, আবার সে এমনিতর বৈকালে বাবাকে নিড়ান হাতে উঠোনের ঘাস পরিষ্কার করতে দেখবে, বাবার তামাক আবার সাজবার সুযোগ পাবে সে।

তামাক দিয়ে শরৎ বললে, বাবা, হিম হয়ে বসে থেকো না—এবেলা একটা তরকারী নেই যে কুটি, ব্যবস্থা আগে করো।

কেদার কিছুমাত্র ব্যস্ত না হয়ে বললেন, কেন পুকুরপাড়ে ঝিঙে দেখে এলাম তো তখন!

কালোপায়রা দীঘির পাড়ে বাঁধানো ঘাটের পাশের ঝোপের মাথায় বন্য ঝিঙে ও ধুঁধুলের লতা বেড়ে উঠেছে, কেদারের কথার লক্ষ্যস্থল সেই বুনো ধুঁধুলের গাছ।

—শুধু ঝিঙে বাবা?

—তাই নিয়ে এসে ভাতে দে—কি বল হে দাদা? হবে না?

গোপেশ্বর চাটুজ্জে বনজঙ্গল কাটতে কাটতে একটা ঝালের চারা দায়ের মুখে উপড়ে ফেলেছিলেন, সেটিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে কিছুক্ষণ থেকে প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন। অন্যমনস্ক ভাবে ঘাড় নেড়ে বললেন—খুব, খুব। রাজভোগে ভেসে যাবে।

কেদার বললেন—তবে তাই করো মা শরৎ। তাই নিয়ে এসো।

শরৎ কালোপায়রা দীঘির ধারে জঙ্গলে এল ঝিঙে খুঁজতে।

আজই দুপুরবেলা ওরা গরুর গাড়ি করে এসে পেঁছেছে এখানে। বাপ ও জ্যাঠামশায় সেই থেকে বনজঙ্গল পরিষ্কার নিয়েই ব্যস্ত আছেন। সে নিজে ঘর দোর পরিষ্কার করছিল—এই মাত্র একটু অবসর মিলেছে চোখ মেলে চারিদিকে চাইবার। কালোপায়রা দীঘির টলটলে জলে রাঙা কুমুদ ফুল ফুটেছে গড়বাড়ির ভগ্নস্তূপের দিকটাতে। এই তো বাঁধাঘাট। ঘাটের ধাপে শেওলা জমেছে, কুক্‌শিমার জঙ্গল বেড়েছে খুব—কতকাল বাসন মাজে নি ঘাটটাতে বসে। কাল সকালে আসতে হবে আবার।

ছাতিম বনের ছায়ার দিকে চেয়ে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ছাতিম বনের ওপরে ওই দেউলের গম্বুজাকৃতি চূড়োটা বনের আড়াল থেকে মাথা বার করে দাঁড়িয়ে আছে। ছায়া ওপার থেকে এপারে এসে পেঁছেছে, চাতালের যে কোণে বসে শরৎ বাসন মাজত, এপারের

বটগাছটার ডাল তার ওপরে ঝুঁকে পড়েছে। শরৎ যেন কতকাল পরে এসব দেখছে, জন্মান্তরের তোরণদ্বার অতিক্রম করে এ যেন নতুন বার পৃথিবীতে এসে চোখ মেলে চাওয়া বহু কালের পুরোনো পরিচয়ের পৃথিবীতে। কালোপায়রা দীঘির ধারের এমনি একটি সুপরিচিত বৈকালের স্বপ্ন দেখে কতবার চোখের জল ফেলেছে কাশীতে পরের বাড়ি দাসত্ব করতে করতে। দশাশ্বমেধ ঘাটের রানায় সন্ধ্যাবেলা রেণুকার সঙ্গে বসে। রাজগিরিতে গৃধ্রকূট পাহাড়ের ছায়াবৃত পথে মিনুর সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে।

সে শরৎ নেই আর। শরৎ নিজের অনভূতিতে নিজেই বিস্মিত হয়ে গেল। নতুন দৃষ্টি, নতুন মন নিয়ে ফিরেছে শরৎ। পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা যে শরৎসুন্দরীর দৃষ্টি সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রেখেছিল, আজ বহির্জগতের আলো ও ছায়া, পাপ ও পুণ্যের সঙ্গে সংস্পর্শে এসে যেন শরতের মন উদারতর, দৃষ্টি নবতর দর্শনের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে।

ঝিঙে তুলে রেখে শরৎ বার বার দীঘির ঘাটের ভাঙা চাতালে প্রাচীন বটতলায় নানা কারণে অকারণে ছুটে ছুটে আসতে লাগল শুধু এই নতুন ভাবানুভূতিকে বার বার আস্বাদ করবার জন্যে। একবার উপরে গিয়ে দেখলে গ্রামের জগন্নাথ চাটুয্যে কার মুখে খবর পেয়ে এসে পৌঁছে গিয়েছেন। বাবা ও জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে বসে গল্প করছেন।

ওকে দেখে জগন্নাথ বললেন, এই যে মা শরৎ, তা কাশী গয়া অনেক জায়গা বেরিয়ে এলে বাবার সঙ্গে আর গোপেশ্বর ভায়ার সঙ্গে? ভালো—প্রায় দেড় বছর বেড়ালে।

বুদ্ধিমতী শরৎ বুঝল এ গল্প জ্যাঠামশায়ই রচনা করেছেন তাদের দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণ নির্দ্দেশ করার জন্যে। শরৎ জগন্নাথ চাটুয্যের পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে।

—এসো, এসো মা, থাক্। চিরজীবী হও—তা কোন্ কোন্ দেশ দেখলে?

কেদার বললেন, দেড় বছর ধরে তো বেড়ানো হয় নি। আমি মধ্যে চাকরি করেছিলাম হিংনাড়ার বাজারে ঘোষেদের আড়তে। এই গোপেশ্বর দাদা সপরিবারে পশ্চিমে গেলেন, শরৎকে নিয়ে গিয়েছিলেন—

শরৎ বললে, চা খাবেন জ্যাঠামশায়, যাবেন না বসুন। আমি বাসনগুলো ধুয়ে আনি পুকুরঘাট থেকে।

আবার সে ছুটে এল কালোপায়রা দীঘির পাড়ে ছাতিম বনের দীর্ঘ, ঘনশীতল ছায়ায়। পুরোনো দিনের মত আবার রোদ রাঙা হয়ে উঠে গিয়েছে ছাতিম গাছের মাথায়। বেলা পড়ে এসেছে। এমন সময়ে দূরে থেকে রাজলক্ষ্মীকে আসতে দেখে সে হঠাৎ লুকিয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজলক্ষ্মীর হাতে একটি প্রদীপ, তেল সলতে দেওয়া।

দুজনেই দুজনকে দেখে উচ্ছ্বসিত আনন্দে আত্মহারা।

রাজলক্ষ্মী হেসে বললে, মানুষ না ভূত, দিদি?

—ভূত, তোর ঘাড় মটকাবো।

তারপর দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরলে।

—শুনিস নি আমরা এসেছি?

—কারো কাছে না। কে বলবে? আমি অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, উঠে এই আসছি—

—কোথায় চলেছিস রে এদিকে?

তোমাদের উত্তর দেউলে পিদিম দিচ্ছি আজ এই দেড় বছর। বলে গিয়েছিলে মনে নেই?

—সত্যি ভাই?

—না মিথ্যে!

—আর জন্মের বোন্ ছিলি তুই, এই বংশের মেয়ে ছিলি কোন্ জন্মে।

—এতদিন কোথায় ছিলে তোমরা দিদি?

—কাশীতে। সব বলবো গল্প তোকে। চল—

—আজ পিদিম তুমি দেবে দিদি?

—নিশ্চয়! ভিটেয় যখন এসেছি, তখন তোকে আর পিদিম দিতে হবে না। তবে আমার সঙ্গে চল—

বারো

কালোপায়রা দীঘির ওপারের ছাতিমবন নিবিড় হয়েছে, তার ছায়ায় ছায়ায় উত্তর দেউলের যাবার পথে বাদুরনখী গাছের জঙ্গল তেমনি ঘন, যেমন শরৎ চিরকাল দেখে এসেছে, তবে এখন গাছ শুকিয়ে যায় নি—সবে বেগুনে রঙের ফুল ধরেছে বড় বড় সবুজ পাতার আড়ালে। শরৎ আগে আগে প্রদীপ হাতে, রাজলক্ষ্মী পেছনে। কত পরিচিত পুরোনো পথ, সারা জীবনই যেন অতীব শান্ত ও নিরুপদ্রব আরামে এই বাদুড়নখী গাছের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলেছে সে, তার পিতৃগৃহের পুণ্য আবেষ্টনী তার জীবনের পাথেয় যুগিয়ে এসেছে—যে জীবনের না আছে রাত্রি, না আছে অরুণোদয়—শুধু এমনি চাপা গোধূলি, হৈচৈহীন কর্ম-কোলাহলহীন!

প্রদীপ দিয়ে ওরা আবার ফিরল। পথের দুপাশে পুষ্পশ্রীর লীলায়িত চেতনা ওর আগমনে যেন আনন্দিত। কতকাল পরে রাজকন্যা বাড়ি ফিরেছে!

রাজলক্ষ্মী বলে, এঃ দিদি, এ ঘরে বসে রাঁধবে কি করে? জল পড়ে মেজে যে একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

—পিঁড়ি পেতে নেবো এখন। তুই আমার বাপের ভিটের নিন্দে করিস নি বলে দিচ্ছি—

রাজলক্ষ্মী হেসে বললে, সেই ছেলেমানুষি স্বভাব এখনও যায় নি শরৎদি—

—চা খাবি?

—তা খাচ্ছি—এখন বলো এতকাল কোথায় ছিলে তোমরা!

—রাজারাজড়ার কাণ্ড, একটু হিল্লিদিল্লি বেড়িয়ে আসা গেল।

—সে তো বুঝতেই পারছি।

—আজ রাত্তিরে এখানে খাবি রাজলক্ষ্মী। কিন্তু কিছু নেই বলছি, শুধু ধুঁধুলে ভাতে, ধুঁধুল ভাজা।

ভাঙা ঘরে এই দুই তরুণীতে বসে বহুকাল পরে আবার আসর জমালে—ওদিকে দুই বৃদ্ধ উঠোনে দুই কাঁঠালকাঠের পিঁড়ি পেতে বসে অনেক রকম রাজা-উজীর বধের গল্প করছিলেন। জগন্নাথ চাটুজ্জে ইতিমধ্যে চলে গিয়েছেন।

ভাই, জ্যাঠামশায় আর বাবাকে চাটুকু দিয়ে আয় তো—

রাজলক্ষ্মী চা দিতে গেলে কেদার বললেন, আরে আমার মা-লক্ষ্মী যে? আয় আয়—কতকাল পরে দেখলাম, ভাল ছিলি?

গোপেশ্বর চাটুজ্জেও বললেন, হ্যাঁ এ খুকিকে তো দেখেছি বটে এখানে—কি নাম যেন তোমার মা?

রাজলক্ষ্মী দুজনের পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে রান্নাঘরে চলে গেল।

কেদার বললেন, দাদা, এবার এখানে কিছুদিন থেকে যাও। একসঙ্গে দিনকতক কাটানো যাক্—

—শরৎ-মা বলছিল—তীর্থভ্রমণে একবার চলুন, বেরুনো যাক রাজামশায়—

কেদার নিশ্চিন্ত আরামে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বললেন, আর কোথাও বেরুতে ইচ্ছে করে না দাদা। বিদেশে বড় গোলমাল—শুনলে তো সবই। আমাদের এই জায়গাটাই ভালো—বাইরে নানারকম ভয়। কেন এখানে ওখানে বেরুনো—আমার হাতে এখনো যা টাকা আছে, এ বছরটা হেসে খেলে চলে যাবে। খাজনাপত্তর কেউ দেয় নি দুটি বছর—কাল থেকে আবার তাগাদা শুরু করি।

শরৎ নিজে তামাক সেজে আনতেই গোপেশ্বর চাটুজ্জে হাঁ হাঁ করে উঠলেন।

—তুমি কেন মা—তুমি কেন? আমাকে বললেই তো হ'ত—এসব আমি পছন্দ করি নে, মেয়েদের দিয়ে তামাক সাজানো। রাজামশায়ের তামাক আমি সাজবো।

কেদার বললেন, তুমি আমার বয়সে অনেক বড়, দাদা। আর যে উপকার তুমি করেছ, তার ঋণ আমি বা আমার মেয়ে কেউ শুধতে পারবো না। আমার এ বাড়িতে যত দিন ইচ্ছে থাকো, তোমার বাড়ি তোমার ঘর-দোর। আমার মেয়ে তোমার আমার তামাক সাজবে এ আর বেশি কথা কি দাদা?

গোপেশ্বর চাটুজ্জে বললেন, আচ্ছা রাজামশাই, ওই কালোপায়রা দীঘির ওপারের বন কেটে বেশ আলু হয়—কিছু বীজ এনে—

—না দাদা, ওসব আমাদের বংশে নেই। চাষকাজ করে চাষা লোকেরা। আমার দরকার হয় গড়ের জঙ্গল থেকে মেটে আলু তুলে আনবো। সোজা মেটে আলুটা হয় গড়ের জঙ্গলে? সে বছর উত্তর দেউলের গায়ের বন থেকে আলু তুলেছিলাম এক একটা আধমণ ত্রিশ সের। আলুর অভাব কি আমার?

হঠাৎ জগন্নাথ চাটুজ্জেকে পুনরায় আসতে দেখে উচ্চকণ্ঠে বললেন, ও শরৎ, জগন্নাথ খুড়ো আসছেন—আর একটু চা পাঠিয়ে—

জগন্নাথ চাটুজ্জে আসতে আসতে বললেন, তুমি বাড়ি এসেছ শুনে অনেকে দেখা করতে আসছে কেদার রাজা। আমি গিয়ে সাতকড়ির চণ্ডীমণ্ডপে খবরটা দিয়ে এলাম—সেই জন্যেই গিয়েছিলাম। ওঃ, একটু তেল আনতে বলো তো শরৎকে। বিছুটি যা লেগেছে গায়ে—বড্ড বিছুটির জঙ্গল বেড়েছে গড়ের খালের পথটাতে। ছিলে না অনেক দিন, চারিধারে বনজঙ্গল হয়ে—

গোপেশ্বর চাটুজ্জে বললেন, কাল আমি সব কেটে সাফ করে দেবো—দেবেন তো দেখিয়ে জায়গাটা।

জগন্নাথ চাটুজ্জে এসেছেন এদের সব খবর সংগ্রহ করতে। একটু পরেই তিনি বড় বেশী আগ্রহ দেখাতে লাগলেন, এতা এতদিন কোথায় ছিলেন, কি ভাবে কাটলো সে-সব খবর জানতে। জগন্নাথ বললেন, তুমি কি বরাবর হিংনাড়ায় ছিলে এই দেড় বছর—না আর কোথাও—

—না, আমি—গিয়ে হিংনাড়াতেই—

—কাদের আড়তে বললে—

—ঘোষেদের আড়তে। বিপিন ঘোষ বিনোদ ঘোষ দুই ভাই—ওদেরই—

—মাটসের বিনোদ ঘোষ?

—মাটসে তো ওদের বাড়ি নয়, শত্রুঘ্নপুর—

—সে আবার কোন্ দিকে? নাম তো শুনি নি—

—শত্রুঘ্নপুর বাজিতপুর—রামনগর থানা।

কেদার ক্রমশঃ অস্বস্তি বোধ করছিলেন জগন্নাথ চাটুজ্জের জেরায়। এত খুঁটিনাটি

জিজ্ঞেস করবার কি দরকার তিনি বুঝতে পারলেন না। জগন্নাথ চাটুজ্জে পরের ছিদ্র অনুসন্ধান করে জীবন কাটিয়ে দিলেন কি না, তাই ভয় হয়।

গোপেশ্বরকে দেখিয়ে জগন্নাথ বললেন, ইনি সেই একবার তোমার এখানে এসেছিলেন না? চমৎকার হাত তবলার। একদিন শুনতে হবে আবার।

—হ্যাঁ।

—শরৎ বুঝি এঁর পরিবারের সঙ্গে তীর্থ করে এল?

—হ্যাঁ।

—বেশ বেশ।

জগন্নাথ চাটুজ্জে হঠাৎ বললেন, ভাল কথা কেদার ভায়া, শুনেছ বোধ হয় প্রভাসের বাবা হারান বিশ্বেস মারা গিয়েছে আজ বছরখানেক হ'ল। প্রভাসদের কলকাতার বাড়িতে তোমরা তো প্রথম যাও—না?

কেদারের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। জগন্নাথ চাটুজ্জে কতটা জানে বা না জানে আন্দাজ করা শক্ত। কি ভেবে ও কি কথা বলছে, তাই বা কে জানে? হঠাৎ প্রভাসের কথা তোলার মানে কি?

তবুও সত্য কথার মার নেই ভেবে তিনি বললেন, প্রভাসদের বাড়িতে তো ছিলাম না আমরা। একটা বাগানবাড়িতে আমাদের থাকবার জায়গা করে দিয়েছিল।

—কতদিন সেখানে ছিলে তোমরা?

—বেশি দিন নয়—দিন পনেরো।

—তার পর কোথায় গেলে?

এইবার জবাব দিলেন গোপেশ্বর চাটুজ্জে। বললেন, তার পর একদিন আমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা। আমি ও'দের সঙ্গে দেখা করলাম বাগানবাড়িতে গিয়ে তার পরদিন সকালে। আমার বাড়ির সকলে তীর্থ করতে বেরিয়েছিল—সেই সঙ্গে শরৎকে নিয়ে গেলাম। রাজামশাই দেশে চলে আসছেন, হিংনাড়ার বাজারে ঘোষেদের আড়তের একজন কর্ম্মচারীর সঙ্গে ও'র চেনা ছিল—সে নিয়ে গিয়ে চাকরি জুটিয়ে দিলে। এই হ'ল মোট ব্যাপার। কেমন, এই তো রাজামশাই?

—হ্যাঁ, ওই বৈকি।

দুপুরবেলা। কেউ কোথাও নেই। গোপেশ্বর কালোপায়রার দীঘিতে মাছের চার করতে গিয়েছেন, আহারাদির পর কেদারকে নিয়ে মাছ ধরতে যাবেন।

শরৎ বাবাকে একা পেয়ে বললে, আচ্ছা বাবা, আমার খোঁজ করলে না কেন?

কেদার এ কথার কি উত্তর দেবেন? এ সব ব্যাপারকে তিনি এড়িয়ে চলতে চান—জীবনের সব চেয়ে বড় ধাক্কাকে তিনি ভুলে যেতে চেষ্টা করে আসছেন—তাঁর সব চেয়ে ভয় মেয়ে পাছে আবার ঐসব কথা তোলে।

আমতা আমতা করে বললেন, তা—খোঁজ করি কোথায়? আমার—

—তোমাকে ওরা বলেছিল আমি ইচ্ছে করেই তোমার সঙ্গে দেখা করি নি—না? বলো বাবা, তা যদি বিশ্বাস করে থাকো আমি তোমার সামনেই দীঘির জলে ডুবে মরবো।

এবার কেদার যেন একটু বিচলিত হলেন, তাঁর অনড় আত্মস্বাচ্ছন্দ্য-বোধ এইবার একটু ধাক্কা খেলে। মেয়ের মুখের দিয়ে চেয়ে তিরস্কারের সুরে বললেন, তাই তুই বিশ্বাস করিস্ যে আমি ওসব ভাবতে পারি? দে—একটু তেল দে মাখবার—দেখি আবার গোপেশ্বর ভায়া মাছের চারের কতদূর কি করলে। তোর রান্না হ'ল?

—বেশ বাবা, কি নিশ্চিন্দিই থাকতে পারো তুমি, তাই শুধু আমি ভাবি। ঘরে আগুন লাগলেও বোধ হয় তোমার সাড়া জাগে না—মানুষে যে কি ক'রে তোমার মত—আচ্ছা, আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি—উত্তর দেবে?

কেদার বিষণ্ণ মুখে বললেন, কি?

—প্রভাসের নামে তোমাকে কেউ কিছু বলেছিল তো? সেই মুখপোড়া গিরীনই বলে থাকবে। তুমি পুলিসে খবর দিলে না কেন?

—তারাই বললে পুলিসে খবর দেবে তোর নামে। তাতেই তো আমি পালিয়ে এলাম।

পুলিসের কাছে নালিশে কে আসামী কে ফরিয়াদী হয় এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা নেই শরতের—ওসব বড় গোলমেলে ব্যাপার। সে চুপ করে রইল।

কেদার বললেন, কষ্ট পেয়েছিস্ না মা?

—যাও, তোমাকে আর—

—না মা ছিঃ, রাগ করতে নেই। কি রাঁধছিস? বেগুন এনে দেবো এখন ওবেলা। গেঁয়োহাটি যাবো তাগাদা করতে, ব্যাটারা আজ দু-বছর খাজনার নামটি করে নি।

—করবে কি? তুমি ছিলে এ চুলোয়? মেয়েকে ভাসিয়ে দিয়ে নিজেও ভেসে পড়েছিলে। কি নির্বিকার পুরুষমানুষ তুমি তাই শুধু ভাবি বাবা।

শরতের এ মেজাজকে কেদারের চিনতে বাকি নেই। এ সময় ওর সামনে থাকতে যাওয়া মানে বিপদ টেনে আনা। কেদার তেল মেখে সরে পড়লেন। বাবাকে যতক্ষণ দেখা গেল শরৎ চেয়ে চেয়ে দেখলে, তারপর তিনি কালোপায়রা দীঘির পাড়ের বন-ধুঁধুলের লতাজালের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলে শরৎ দুই হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে নিঃশব্দে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। তার বাবা, তাদের বনজঙ্গলে ঘেরা এত বড় গড়বাড়ি, কত পুরানো ভাঙা মন্দির, উত্তর দেউল, বারাহী দেবীর ভগ্ন পাষাণমূর্ত্তি, ওই ছায়ানিবিড় ছাতিমবন—এসব ফেলে তাকে কোথায় চলে যেতে হয়েছিল ভাগ্যের বিপাকে! আর যদি সে না ফিরতো, আর যদি বাবাকে না দেখতো, গড়বাড়ির মাটির পুণ্যস্পর্শলাভের সৌভাগ্য যদি আর না ঘটতো তার?

কার পায়ের শব্দে সে মুখ তুলে দেখলে রাজলক্ষ্মী একটা বাটি হাতে রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠছে। এই আর একটি মানুষ—যাকে দেখে শরৎ এত আনন্দ পায়! দেড় বছরের মধ্যে কত জায়গা সে বেড়াল, কত নতুন নতুন মেয়ের সঙ্গে আলাপ হ'ল—কিন্তু এমন কি একটা দিনও গিয়েছে যেদিন সে এই গরীব ঘরের মেয়েটার কথা ভাবে নি?

—কি রে ওতে?

—তোমাদের জন্যে একটু সুক্তুনি—মা বললেন জ্যাঠামশায়কে দিয়ে আয়—

—খাওয়া হয়েছে?

—পাগল! এখুনি খাওয়া হবে? তোমাদের এখান থেকে গিয়ে নাইবো—তার পর—

—আর বাড়ি যায় না, এখানেই খা—

—না না শরৎদি—

—খেতেই হবে। আচ্ছা, কেন অমন করিস্ বল্ তো? কতকাল দুই বোনে বসে একসঙ্গে খাই নি তা তোর মনে পড়ে? মোটে কাল আর আজ যদি হয়—সত্যি ভাই, বিশ্বাস এখনও যেন হচ্ছে না যে, আমি আবার গড়শিবপুরের ভিটেতে বসে আছি। একযুগ পরে আবার এ মাটিতে—

রাজলক্ষ্মীকে শরৎ এখনও সব কথা খুলে বলে নি। রাজলক্ষ্মীও ওকে খুঁটিনাটি কিছুই জিজ্ঞেস করে নি প্রথম আনন্দের উত্তেজনায়। শরৎ মনে মনে ঠিক করে রেখেছে রাজলক্ষ্মীকে সে অবসর সময়ে সব খুলে বলবে। বন্ধুত্বের মধ্যে দেওয়াল তুলে রাখা তার পছন্দ হয় না।

শরৎ বললে, এই দেড় বছরে গাঁয়ের খবর বল্—কিছুই তো জানি নে।

—চিন্তে বুড়ী মরে গিয়েছে জানো?

—আহা, তাই নাকি? কবে মোলো?

—ফাল্গুন মাসে। গুরুপদ জেলের সেই হাবা ছেলেটা মরে গিয়েছে আষাঢ় মাসে। ম্যালেরিয়া জ্বরে।

—আহা!

—পাঁচী গয়লানীর বাড়ি চোর ঢুকে সব বাসন নিয়ে গিয়েছিল। থানার দারোগা এল, এর নাম লিখলে, ওর নাম লিখলে—কিছুই হ'ল না শেষটা।

—ভাল কথা, ওপাড়ার সেজখুড়ীমার ছেলেপিলে হবে দেখে গিয়েছিলাম—

—একটা ছেলে হয়েছে—বেশ ছেলেটি। দেখতে যাবে কাল?

—বেশ তো চল না। সাতকড়ি চৌধুরীর মেয়ের বিয়ে হয়েছে?

—কেন হবে না? হাতে পয়সা আছে—মেয়ের বিয়ে বাকি থাকে?

শরৎ হেসে বললে, কেন রে, তোর বুঝি বড় দুঃখু—বিয়ে না হওয়ায়?

—কার না হয় শরৎদি, যদি সত্যি কথা বলা যায়। যেমনি মা হিম হয়ে বসে আছে, তেমনি মেজখুড়ীমা হিম হয়ে বসে আছে—আমার এদিকে আঠারো পেরুলো, লোকের কাছে বলে বেড়ান পনেরোতে নাকি পা দিইছি। এমন রাগ ধরে!

শরৎ হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি।

—ওমা, তুই হাসালি রাজলক্ষ্মী! আজকালকার মেয়ে সব হ'ল কি? সত্যি রে তোর মনে কষ্ট হয়?

—ঐ যে বললাম দিদি, সত্যি কথা বললে হাসবে সবাই। তুমি বললে, তাই বললাম।

—আমি দেখবো রে তোর সম্বন্ধ?

—না, হাসি না শরৎদি। এতদিন তুমি ছিলে না—আমার মন পাগল-পাগল হয়ে উঠত। এই গাঁয়ে একঘেয়ে থাকলে মানুষ পাগল হয়ে যায় না তুমিই বলো? তার চেয়ে মনে হয়—যা হয় একটা দেখে-শুনে দে, একঘেয়েমির হাত থেকে নিস্তার পাই। জন্মালাম গড়শিবপুর, তো রয়েই গেলাম সেই গড়শিবপুরে। এই যে তুমি কত দেশ বেড়িয়ে এলে শরৎদি, কেন বেড়িয়ে এলে? নতুন জিনিস দেখবার জন্যে তো?

শরৎ গম্ভীর সুরে বললে, আমার কপাল দেখে হিংসে করিস্ নে ভাই। তোকে সব খুলে বলবো সময় পেলে।

রাজলক্ষ্মী বিস্ময়ের সুরে বললে, কেন শরৎদি?

—সে কথা এখন না ভাই—বাবা আসছেন, সরে আয়—

কেদার গামছায় মাথা মুছতে মুছতে বললেন, কে ও? রাজলক্ষ্মী? বেশ মা বেশ। হ্যাঁ ভাল কথা শরৎ—মনে পড়ল নাইতে নাইতে—তোর মায়ের সেই কড়িগুলো কোথায় আছে মা?

শরৎ হেসে বললে, কোনো ভয় নেই বাবা। লক্ষ্মীর হাঁড়িতেই আছে। প্রথম দিন এসেই আমি আগে দেখে নিয়েছি। ঠিক আছে।

—ও, তা বেশ। আর—ইয়ে—তোর মার সেই ভাঙা চিরুনিখানা?

—সেই গোল তোরঙ্গের মধ্যে রেখে গিয়েছিলাম, সেইখানেই আছে। সেও দেখে নিয়েছি সেদিন।

—ইয়ে, ডাকি তবে গোপেশ্বর দাদাকে? রান্না হয়েছে তো?

কেদার আবার গেলেন পুকুরপাড়ে গোপেশ্বর চাটুজ্জেকে ডাকতে। শরৎ মৃদু হেসে

রাজলক্ষ্মীকে বললে, দুটি নিষ্কর্মা আর নিশ্চিন্দ লোক এক জায়গায় জুটেছে, জ্যাঠামশায় আর বাবা—দুই-ই সমান। দুটিতে জুড়ি মিলেছে ভালো।

কেদার বলতে বলতে আসছিলেন, বেহালা বাজাই নি আজ দেড় বছর দাদা। তারগুলো সব ছিঁড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আজ ওবেলা ছিবাসের ওখানে আসর করা যাক্ গিয়ে। তোমার তবলাও অনেক দিন শোনা হয় নি।

তেরো

দিন দশ-পনেরো কেটে গেল।

এ দিনগুলো কেদার ও গোপেশ্বরের কাটলো খুব ভালই। ছিবাস মুদির দোকানে প্রায়ই সন্ধ্যার পর ছেঁড়া মাদুর আর চট পেতে আসর জমে, কেদার এসেছেন শুনে তাঁর পুরোনো কৃষ্ণযাত্রা দলের দোহার, জুড়ি, একানে গায়কেরা কেউ জাল রেখে, কেউ লাঙল ফেলে ছুটে আসে।

—রাজামশাই? ভাল ছেলেন তো? এট্টু পায়ের ধুলো দ্যান—

—বাবাঠাকুর, এ্যাদ্দিন ছেলেন কনে? মোদের দল যে একেবারে কানা পড়ে গেল আপনার জন্যি!

গেঁয়োহাটি কাপালী পাড়ার মধু কাপালী, নেত্য কাপালী এসে পীড়াপীড়ি—গেঁয়োহাটিতে একবার না গেলে চলবে না। সবাই রাজামশাইকে একবার দেখতে চায়। এদের ওপর কেদারের যথেষ্ট আধিপত্য, অন্য সময় যে কেদার নিতান্ত নিরীহ—এদের দলের দলপতি হিসাবে তিনি রীতিমত কড়া ও উগ্র মেজাজের শাসক।

মধুকে ডেকে বললেন, তোর যে সেই ভাইপো দোয়ার দিতো সে কোথায়?

—আজ্ঞে সে পাট কাটছে মাঠে—

কেদার মুখ খিঁচিয়ে বলেন, পাট তো কাটছে বুঝতে পারছি, চাষার ছেলে পাট কাটবে না তো কি বড় গাইয়ে হবে? কাল একবার ছিবাসের এখানে পাঠিয়ে দিও তো? বুঝলে?

—যে আজ্ঞে রাজামশাই—

—আর শশীকে খবর দিও, দু-বছরের খাজনা বাকী। খাজনা দিতে হবে না? নিষ্কর জমি ভোগ করতে লাগল যে একেবারে—

নেত্য কাপালী এগিয়ে এসে বললে, বাবাঠাকুর, আপনি যদি বাড়ি থাকতেন, তবে সবই হত। তারা খাজনা নিয়ে এসে ফিরে গিয়েল—

কেদার ধমক দিয়ে বললেন, তুই চুপ কর্—তোকে ফোপর-দালালি করতে বলেছে কে?

কেদারের নামে বহু লোক জড়ো হয় ছিবাসের দোকানে—কেদারের বেহালার সঙ্গে মিশেছে ওস্তাদ গোপেশ্বরের তবলা। পাড়াগাঁয়ে নিঃসঙ্গ দিনে রাত্রে সময় কাটাবার এতটুকু সূত্রও যারা নিতান্ত আগ্রহে আঁকড়ে ধরে—তাদের কাছে এ ধরনের গুণী-সম্মেলনের মূল্য অনেক বেশী। দু-তিনখানা গ্রাম থেকে লোকে লণ্ঠন হাতে লাঠি হাতে জুতো বগলে করে এসে জোটে। সেই পুরোনো দিনের মত অনেক রাত্রে দুজনেই অপরাধীর মত বাড়ি ফেরেন।

শরৎ বলে, এলে? ভাত জুড়িয়ে জল হয়ে গিয়েছে—

গোপেশ্বর আমতা আমতা করে বলেন—আমি গিয়ে বললাম মা রাজামশায়কে—যে শরৎ বসে থাকবে হাঁড়ি নিয়ে—তা হয়েছে কি, উনি সত্যিকার গুণী লোক, ছড়ে ঘা পড়লে আর স্থির থাকতে পারেন না। জ্ঞান থাকে না মা—

কেদার গোপেশ্বরের পেছনে দাঁড়িয়ে মনে মনে কৈফিয়ৎ তৈরী করেন।

শরৎ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, আপনি জানেন না জ্যাঠামশায়, বাবার চিরকাল একরকম গেল আর যাবেও। আজ বলে না, কোন কালে ও'র ছিল জ্ঞান, ও'কেই জিজ্ঞেস করুন না?

গোপেশ্বর মিটমাটের সুরে বলেন, না না, কাল থেকে রাজামশাই আর দেরি করা হবে না। শরতের বড্ড কষ্ট হয়, কাল থেকে আমি সকাল সকাল নিয়ে আসবো মা, রাত করতে দেবো না—

এই দুই বৃদ্ধের ওপর শাসনদণ্ড পরিচালনা ক'রে শরৎ মনে মনে খুব আমোদ পায় এবং এ'দের সংকোচজড়িত কৈফিয়তের সুরে যথেষ্ট কৌতুক অনুভব করে—কিন্তু কোনো তর্জ্জন-গর্জ্জনেই বিশেষ ফল হয় না, প্রতি রাত্রেই যা তাই—সেই রাত একটা। নির্জ্জন গড়বাড়ির জঙ্গলে ঝিঁঝি পোকার গভীর আওয়াজের সঙ্গে মিশে শরতের শাসনবাক্য বৃথাই প্রতি রাত্রে নিশীথের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে।

শরৎ বলে—আজ কিছু নেই বাবা, কি দিয়ে ভাত দেবো তোমাদের পাতে? হাট না, বাজার না, একটা তরকারি নেই ঘরে, আমি মেয়েমানুষ যাবো তরকারি যোগাড় করতে? ওল তুলেছিলাম কালোপায়রার পাড় থেকে একগলা জঙ্গলের মধ্যে—তাই ভাতে আর ভাত খাও—এত রাত্তিরে কি করবো আমি?

কেদার সংকুচিত ভাবে বললেন, ওতেই হবে—ওতেই হবে—

—তুমি না হয় বললে ওতেই হবে। জ্যাঠামশায় বাড়িতে রয়েছেন, ও'র পাতে শুধু ওল ভাতে দিয়ে কি করে—

গোপেশ্বর তাড়াতাড়ি বলেন, যথেষ্ট মা যথেষ্ট। তুমি দাও দিকি। ভেসে যাবে—কাঁচালঙ্কা দিয়ে ওল ভাতে মেখে এক পাথর ভাত খাওয়া যায় মা—

—তবে খান। আমার আপত্তি কি?

—কাল গেঁয়োহাটির হাট থেকে আমি ঝিঙে পটল আনবো দুটো—মনে করে দিও তো?

শরতের কি আমোদই লাগে! কতদিন পরে আবার পুরাতন জীবনের পুনরাবৃত্তি চলছে—আবার যে প্রতি নিশীথে গড়বাড়ির জঙ্গলের মধ্যে তাদের ভাঙা বাড়িতে সে একা শুয়ে থাকবে। বাবা এসে অপ্রতিভ কণ্ঠে বলবেন—ও মা শরৎ দোর খুলে দাও মা,—এসব কখনো হবে বলে তার বিশ্বাস ছিল?

সেই সব পুরোনো দিন আবার ঠিক সেই ভাবেই ফিরে এসেছে…

—জ্যাঠামশায়ের জন্যে একটু দুধ রেখেছি—ভাত ক'টা ফেলবেন না জ্যাঠামশায়—

গোপেশ্বর ব্যস্তভাবে বললেন, কেন, আমি কেন—রাজামশায়ের দুধ কই?

—বাবার হবে না। দু-হাতা দুধ মোটে—

—না না সে কি হয় মা? রাজামশায়ের দুধ ও থেকেই—

কেদার ধীরভাবে বললেন, আমার দুধের দরকার নেই। আমরা রাজা-রাজড়া লোক, খাই তো আড়াইসের মেরে একসের করে খাবো। ও দু-এক হাতা দুধে আমাদের—

কথা শেষ না করেই হা হা করে প্রাণখোলা উচ্চ হাসির রবে কেদার রান্নাঘর ফাটিয়ে তুললেন।

এইরকম রাত্রে একদিন গোপেশ্বর ভয় পেলেন কালোপায়রা দীঘির পাড়ের জঙ্গলে। বেশী রাত্রে তিনি কি জন্যে দীঘির পাড়ের দিকে গিয়েছিলেন—সেদিন আকাশে একটু মেঘ ছিল, ঘুম ভেঙে তিনি রাত কত তা ঠিক আন্দাজ করতে পারলেন না। দীঘির জঙ্গলের দিকে একাই গেলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে কোথায় যেন পদক্ষেপের শব্দ তাঁর কানে গেল—গুরুগম্ভীর পদক্ষেপের শব্দ। উৎকর্ণ হয়ে কিছুক্ষণ শুনে গোপেশ্বরের মনে হ'ল তাঁরই কাছাকাছি গভীর বনঝোপের মধ্যে কে যেন সাবধানের সঙ্গে ধীরে ধীরে পা ফেলে চলেছে—

তাঁর দিকেই ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে নাকি ? চোর-টোর হবে কি তা হলে ? না কোনো ছাড়া গরু বা ষাঁড়—

কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে হ'ল এ পায়ের শব্দ মানুষের নয়—গরু বা ষাঁড়েরও নয়। পদশব্দের সঙ্গে কোনো কঠিন জিনিসের যোগ আছে—খুব ভারি ও কঠিন কোনো জিনিস।

এক-একবার শব্দটা থেমে যায়—হয়তো এক মিনিট···তার পরেই আবার···

হঠাৎ গোপেশ্বরের মনে হ'ল শব্দটা যেন—তাঁকেই লক্ষ্য করে হোক বা নাই হোক—মোটের ওপর খুব কাছে এসে গিয়েছে। তিনি আর কালবিলম্ব না করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে নিজের ঘরে ঢুকতেই পাশের বিছানা থেকে কেদার জেগে উঠে বললেন, কি, কি—অমন করছ কেন দাদা ?

—ইয়ে, একবার বাইরে গিয়েছিলাম—কিসের শব্দ—তাই ছুটে চলে এলাম—কেমন যেন গা ছম্ ছম্—

—শব্দ ? ও শেয়াল-টেয়াল হবে—

—না দাদা, মানুষের পায়ের শব্দের মত, ভারি পায়ের শব্দ—যেন ই'ট পড়ার মত—

কেদার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, হুঁ। আজ কি তিথি ?

—তা কি জানি, তিথি-টিথির কোন খোঁজ রাখি নে তো—

—হুঁ। নাও শুয়ে পড় দাদা···একটা কথা বলি। অমন একা রাত্তির বেলা যেখানে-সেখানে যেও না—দরকার হয় ডাক দিও !

রাজলক্ষ্মী দুপুরবেলা হাসিমুখে একখানা চিঠি হাতে করে এসে বললে, ও শরৎদি, তোমার নামে কে চিঠি দিয়েছে দ্যাখো—

শরৎ সবিস্ময়ে বললে, আমার নামে ! কে আনলে ?

—দাদার সঙ্গে পিওনের দেখা হয়েছিল বাজারে—তাই দিয়েছে—

—দেখি দে—

—কোথাকার ভাবের মানুষ চিঠি দিয়েছে দ্যাখো খুলে—

বলে রাজলক্ষ্মী দুষ্টুমির হাসি হাসলে।

শরৎ ভ্রূকুটি করে বললে, মারবো খ্যাংরা মুখে যদি ওরকম বলবি—তোর ভাবের মানুষেরা তোকে চিঠি দিক্ গিয়ে—জন্মজন্ম দিক্ গিয়ে—

রাজলক্ষ্মী হেসে বললে, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক শরৎদি, তাই বলো—তাই যেন হয়।

—ওমা, অবাক করলি যে রে রাজি'? সত্যি তাই তোর ইচ্ছে নাকি ?

—যদি বলি তাই ?

—ও মা আমার কি হবে !

—অমন বোলো না শরৎদি। তুমি এক ধরণের মানুষ তোমার কথা বাদ দিই—কিন্তু মেয়েমানুষ তো, ভেবে দ্যাখো। আমার বয়েস কত হয়েছে হিসেব রাখো ?

শরৎ সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে বললে, কেউ আটকে রাখতে পারবে না যেদিন ফুল ফুটবে বুঝলি রাজি ? কাকাবাবুর হাতে পয়সা থাকলে কি আর এতদিন—ফুল যেদিন ফুটবে—

—ফুল ফুটবে ছাতিমতলার শ্মশান-সই হলে—নাও, তুমিও যেমন ! খোলো চিঠিখানা দেখি—

শরৎ চিঠি খুলে পড়ে বললে, কাশী থেকে রেণুকা চিঠি দিয়েছে—বাঃ—

—সে কে শরৎদি ?

—সে একটা অন্ধ মেয়ে। বিয়ে হয়েছে অবিশ্যি। গরীব গেরস্ত, এ চিঠি তার বরের হাতে লেখা, সে তো আর লিখতে—

—কাশীতে থাকে? কি করে ওর বর?

—চাকরি করে কোথায় যেন—

—দেখতে কেমন?

—কে দেখতে কেমন? মেয়েটা না তার বর?

—দুই-ই

—রেণুকা দেখতে মন্দ নয়, বর তার চেয়েও ভাল—ছোকরা বয়েস, লোক ভালই ওরা। দ্যাখ না চিঠি পড়ে।

—অন্ধ মেয়েরও বিয়ে আটকে থাকে না, যদি কপাল ভাল হয়—

—হ্যাঁ রে হ্যাঁ। তোর আর বকামি করতে হবে না—পড় চিঠি—

রেণুকা অনেক দুঃখ করে চিঠি লিখেছে। শরৎ চলে গিয়ে পর্য্যন্ত সে একা পড়েচে, আর কে তার ওপর দয়া করবে, কে তার হাত ধরে বেড়াতে নিয়ে যাবে? ও'র মোটে সময় হয় না। তার মন আকুল হয়েচে শরৎকে দেখবার জন্য, রাজকন্যা কবে এসে কাশীতে 'কেদার ছত্র' খুলছে? এলে যে রেণুকা বাঁচে—ইত্যাদি।

চিঠি পড়ে শরৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। অসহায়া অভাগী রেণুকা! ছোট বোনটির মত কত যত্নে শরৎ তাকে নিয়ে বেড়াতো—কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাট, জলে ভাসমান নৌকো ও বজরার ভিড়, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে সান্ধ্য আরতির ঘণ্টা ও নানা বাদ্যধ্বনি।···রেণুকার করুণ মুখখানি। এখানে বসে সব স্বপ্নের মত মনে হয়। খোকা—খোকনমণি! রেণুকা খোকনের কথা কিছু লেখে নি কেন? কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হ'ল রেণুকাকে কে বকসীদের বাড়ি নিয়ে যাবে হাত ধরে অত দূরে? তাই লিখতে পারে নি।

রাজলক্ষ্মী কৌতুহলের সঙ্গে নানা প্রশ্ন করতে লাগল কাশী ও সেখানকার মানুষ-জন সম্বন্ধে, বহির্জগৎ সম্বন্ধে। শরৎ বিরাট অন্নসত্রগুলোর গল্প করল, রাজরাজেশ্বরী, আমবেড়ে, কুচবিহারের কালীবাড়ি।

হেসে বললে, জানিস্ এক বুড়ী তৈলঙ্গিদের ছত্তরকে বলতো তুড়ুমুণ্ডুদের ছত্তর!

—তৈলঙ্গি কারা?

—সে আমিও জানি নে—তবে তাদের দেখেছি বটে।

রাজলক্ষ্মী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। বাইরের জগৎ মস্ত একটা স্বপ্ন। জীবনে কিছুই দেখা হ'ল না, একেবারে বৃথা গেল জীবনটা। শরৎদির ওপর হিংসে না হয়ে পারে?

চৌদ্দ

কেদার ও গোপেশ্বর দুজনে মিলে খেটে বাড়ির উঠানটা অনেকটা পরিষ্কার করে তুলেছেন, কেদার তত নন, বলতে গেলে গোপেশ্বরই খেটেছেন বেশী। শরৎকাল পড়েছে, পুজার দেরি নেই, গোপেশ্বর একদিন উঠানের এক ধার খুঁড়ে কতকগুলো কচুর চারা পুঁতছেন, কেদার মহাব্যস্ত হয়ে এসে বললেন, দাদা, এসো—ওসব ফেলে রাখো—

—কি রাজামশায়?

—আরে একটা নতুন রাগিণীর সন্ধান পেয়েছি একজনের কাছে। মুখুজ্জে-বাড়িতে জামাই এসেছে—ভাল গায়ক। দেওগান্ধার ওর কাছে আদায় করতে হবে। থাকবে এখন কিছুদিন এখানে, চলো দুজনে যাই—

—দেবে কি রাজামশাই ? ওসব লোক বড় কষ্ট দেয়। আমি কাশীতে এক ওস্তাদের কাছে বড় আশা করে যাই। একখানা ভীমপলশ্রীর আস্তাই দিলে অতি কষ্টে তো মাসাবধি অন্তরা আর দেয় না। কত খোশামোদ, কেবল বলে, অন্তরা এক মিনিটে নাকি হয়ে যাবে। হায়রান হয়ে গেলাম হাঁটাহাঁটি করে।

—পেলে ?

—কোথায় পেলাম ? আদায় করা গেল না শেষ পর্যন্ত। সেই থেকে নাকে-কানে খৎ—ওস্তাদের কাছে আর যাবো না।

—যা হোক চলো দাদা। এ আমাদের গাঁয়ের জামাই—ওকে নিয়ে একদিন মজলিশ করা যাক্—অনেক দিন থেকে দেওগান্ধারের খোঁজ করছি। ধরা যাক্ চলো—ওখানে কি হচ্ছে ?

—মানকচুর চারা লাগিয়ে রাখলাম গোটাকতক। সামনের বছরে এক একটা কচু হবে দেখবেন কত বড় বড়। আপনার ভিটের এ জমিতে একটা মানকচু—

—জানি দাদা। ও এখন রাখো, হবে পরে। ও শরৎ—

শরৎ রান্নাঘর থেকে বার হয়ে এসে বললে, কি বাবা ?

—আমাদের দুজনকে একটু তেল দ্যাও মা। রান্নার কতদূর ?

—ওলের ডালনা চড়েছে—নামিয়ে ভাত চড়াবো। তা হলেই হয়ে গেল—

—হঁ্যা মা, রাজলক্ষ্মী এসেছে ?

—না আজ আসে নি এখনো। কেন ?

—না বলছিলাম, মুখুজ্জে-বাড়ি জামাই এসেছে, ভদ্রেশ্বর বাড়ি, কেমন লোক তাই তাকে জিজ্ঞেস করতাম।

—সে খোঁজে তোমার কি দরকার ? সে ভাল হোক মন্দ হোক—

—তুই তা বুঝবি নে, বুঝবি নে। অন্য কাজ আছে তার কাছে। যদি এর মধ্যে রাজলক্ষ্মী আসে—

—মুখুজ্জে-বাড়ির কোন্ জামাই বাবা ? আশাদিদির বর ? আশাদিদির শ্বশুরবাড়ি তো ভদ্রেশ্বর—

—তাই হবে।

—সে তো বুড়ো মানুষ। আশাদিদিকে বিয়ে করেছে দোজপক্ষে—

—তোর সে-সব কথায় দরকার কি বাপু ? বুড়ো হয়, আরও ভালো।

—বলো না, কেন বাবা—

—ন্যাঃ, সে শুনে কি করবি ?

—না আমি শুনবো—

—শুনবি ? রাগিণী ভুপালী, বাদী গান্ধার, বিবাদী মধ্যম আর নিখাদ—সম্বাদী ধৈবত—আরও শুনবি ? রাগিণী আশাবরী—বাদী—

—থাক্ আর শুনে দরকার নেই—নেয়ে এসে ভাত খেয়ে আমায় খোলসা করে দিয়ে যত ইচ্ছে রাগিণী শেখো—

বেলা পড়ে গেল। ঘরের তালকাঠের আড়াতে কলাবাদুড় ঝুলছে যেমন শরৎ আবাল্য দেখে এসেছে। কেদার ও গোপেশ্বর আহারাদি সেরে অন্তর্হিত হয়েছেন, মধ্যরাত্রে যদি ফেরেন তবে শরতের সৌভাগ্য। রাজলক্ষ্মীর জন্যে পথ চেয়ে বসে থাকে সে। তবুও দুজনে গল্প করে সময় কাটে। রোজ রোজ বাবার এই কাণ্ড। ভালও লাগে!

এমন সময় কে বাইরে থেকে ডাকল—ও শরৎ, শরৎ—

শরৎ বাড়ির দাওয়ায় উঁকি মেরে দেখে বললে—কে ? ও বটুক-দা, ভাল আছেন ? আসুন।

বটুককে শরৎ কোনো কালেই ভাল চোখে দেখতো না। সেই বটুক, যে এক সময় শরতের প্রতি অনেক অসম্মানজনক ব্যবহার করেছিল, রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে যে বটুকের সম্বন্ধে সে যুগে কলকাতায় যাবার পূর্বে শরৎ আলোচনা করেছিল একবার।

বটুক একটু ইতস্ততঃ করে বললে, শুনলাম তোমরা এসেছ—কাকা এসেছেন, তাই একবার দেখা করতে—

শরৎ আগেকার মত নেই—জীবনের অভিজ্ঞতা তাকে অনেক সাহসী ও সহিষ্ণু করে দিয়েছে। আগেকার দিন হলে শরৎ বটুকের সঙ্গে বেশীক্ষণ কথাও বলতো না এ নিশ্চয়ই। আজ শরৎ দাওয়ায় একখানা পিঁড়ি পেতে বটুককে বসতে বললে।

বটুক একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেল, শরতের কাছ থেকে এ আদর সে আশা করে নি এখানে। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করে অবশেষে বসলো। শরৎ তাকে চা করে খাওয়ালে। বললে, দুটি মুড়ি খাবে বটুকদা ? আর তো কিছু নেই ঘরে। তুমি এলে এতদিন পরে—

—থাক্, থাক্, সে জন্যে কিছু নয় ! আমি দেখতে এলাম, বলি দেখা হয় নি কত দিন। আচ্ছা শুনলাম নাকি কত দেশ-বিদেশে বেড়িয়ে এলে ?

—তা বেড়ালাম বৈকি। রাজগীর, কাশী।

—কাকা নিয়ে গিয়েছিলেন বুঝি ?

—জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে গিয়েছিলাম—ঐ যিনি আমাদের এখানে আছেন—

—তা বেশ, বেশ।

এই সময় দূরে রাজলক্ষ্মীকে আসতে দেখে বটুক তাড়াতাড়ি উঠে বিদায় নিলে। শরৎ বললে—আর একদিন এসো, বাবার সঙ্গে তো দেখা হ'ল না। বাবা থাকতে এসো একদিন—

রাজলক্ষ্মী চেয়ে বললে—ও এখানে কি জন্যে এসেছিল ! বটুকদা তো লোক ভাল না—

—কি মতলব নিয়ে এসেছিল কি করে বলব বল্ ? এলো—বসতে দিলাম, চা করে দিলাম—

—না না শরৎদি, জানো তো—ওসব লোকের সঙ্গে কোনো মেলামেশা না করাই ভালো। তুমি তো জানো না ওর কাণ্ড। তোমরা চলে যাওয়ার পর ও গাঁয়ে যে-সব কাণ্ড করেছে, সে শুনলে তুমি কানে আঙুল দেবে। অতি বদ লোক। কি মতলব নিয়ে এসেছিল কে জানে !

—তা তো বুঝলাম, কিন্তু আমার বাড়ি এলো, আমি কি বলে না বসাই ? তা তো হয় না। আমায় আমার কাজ করতেই হবে।

—সেই যে প্রভাস কামার তোমাদের মোটরে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিল, সে লোকটাও ভাল না, পরে শুনলাম। বটুকদা প্রভাসের খুব বন্ধু ছিল আগে—তবে এখন অনেক দিন আর তাকে এ গাঁয়ে দেখি নি। তোমরা চলে গেলে একবার এসেছিল যেন।

শরতের মুখ হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে গেল, সে তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়লে একথা চাপা দিয়ে। বললে—চল্। দীঘির পাড় থেকে গোটাকতক ধুঁধুল পেড়ে আনি—কিছু তরকারি নেই, বাবাকে বলা না বলা দুই সমান—

রাজলক্ষ্মী বললে, আর কোথাও যেও না শরৎদি, দুটি বোনে এই গাঁয়ে কাটিয়ে দিই জীবনটা। আমারও যা হবে, সে বেশ দেখতেই পাচ্ছি। তুমি থাকলে বেশ লাগে।

—খারাপ কি বল্ না ? আমি কত জায়গায় গেলাম, কিন্তু তোকে ছেড়ে—কালো-পায়রার দীঘি ছেড়ে—

—যা বলেছ শরৎদি। তুমি এসেছ আমি আর কোথাও যেতে চাই নে, স্বর্গেও না।

দুজনে পা ছড়িয়ে বসে গল্প করি—

—আর চাল-ছোলা ভাজা খাই—না রে? ভাজি দুটো চাল-ছোলা?

—না না শরৎদি। ঐ তোমার পাগলামি—

—পাগলামি নিয়েই জীবন। আয় আমার সঙ্গে রান্নাঘরে, তার পর আবার দুজনে এসে বসবো।

রাজলক্ষ্মী আজকাল সর্ব্বদা শরতের সঙ্গে থাকতে ভালবাসে। সন্ধ্যার আগে একাই বাড়ি চলে যায়, শরৎ দিদির মুখে বাইরের জগতের কথা শুনতে ওর বড় আগ্রহ, যে একঘেয়ে জীবন আবাল্য সে কাটাচ্ছে গড়শিবপুরে, যার জন্যে তার মনে হয় এ একঘেয়েমির চেয়ে যে কোনো জীবন বাঞ্ছনীয়, যে কোনো ধরনের—শরৎ দিদি আজ কিছু দিন হ'ল বিদেশ থেকে ফিরে সেই একঘেয়ে আবেষ্টনীর মধ্যে যেন আগ্রহ ও নতুনত্বের সঞ্চার করেছে। তা ছাড়া জীবনে শরৎ দিদিই তার একমাত্র ভালবাসার লোক, ও দূরে চলে যাওয়াতে রাজলক্ষ্মীর জীবন শূন্য হয়ে পড়েছিল, এখন আবার গড়বাড়িতে এসে, ওর সঙ্গে বসে গল্প করে, ওর সামান্য কাজকর্ম্মে সাহায্য করে রাজলক্ষ্মীর অবসর-ক্ষণ ভরে ওঠে।

শরৎ বললে, রেণুকার চিঠির জবাব দিলাম অনেক দিন, উত্তর তো এল না?

—আসবে। অত ব্যস্ত কেন? দিন দশেক হ'ল মোটে জবাব গিয়েছে। ঠিকানা লেখা ঠিক হয়েছিল তো?

—ঠিকানা লিখে দিয়েছিলেন জ্যাঠামশায়। উনি কি আর ভুল করবেন? আমার বড় মন কেমন করে খোকনমণির জন্যে। সে যদি চিঠি লিখতে পারতো আমায় নিজের হাতে—

রাজলক্ষ্মী হেসে বললে, একেই বলে মায়া। কোথাকার কে তার ঠিক নেই—

শরৎ ব্যথা-কাতর কণ্ঠে বললে, অমন বলিস্ নে রাজি। তুই জানিস নে, সে আমার কি। কেন তাকে ভুলতে পারি নে তাই ভাবি। কখনো অমন হয় নি আমার, কাশীতে থাকবার শেষ একটা মাস যা হয়েছিল। খোকাকে না দেখলে পাগলের মত হয়ে যেতাম, বুঝলি? কষ্টও যা গিয়েছে! আচ্ছা বল তো, সত্যিই সে আমার কে? অথচ মনে হ'ত কত জন্মের আপনার লোক সে, তার মুখ দিনান্তে একবার না দেখলে—ভালই হয়েছে রাজি, সেখানে বেশিদিন থাকলে মায়ায় বড্ড জড়িয়ে পড়তাম। আর তেমনি ছিল মিনুর মা!

—সে কে শরৎদি?

—যাদের বাড়ি ছিলাম, সে বাড়ির গিন্নী। বলবো তোকে সব কথা একদিন। এখন না—

—কাশীর কথা শুনতে বড্ড ভাল লাগে তোমার মুখে—কখনো কিছু দেখি নি—যেন মনে হয় এখানে বসে দেখছি সব—আজ একটু ঠাণ্ডা পড়েছে, না শরৎদি?

—তা হেমন্তকাল এসে পড়েছে, একটু শীত পড়বার কথা। একটা নারকেল কুরতে হবে—দা-খানা খুঁজে দ্যাখ ততক্ষণ—আমি ছোলাগুলো ততক্ষণ ভেজে ফেলি—

—কেন অত হাঙ্গামা করছো শরৎদি? দাঁড়াও আমি নারকোল কুরে দিই—

শরৎ বললে, দুজনে পা ছড়িয়ে বসে গল্প করবো আর চালভাজা—কি বলিস্?

ছেলেমানুষের মত উৎসাহ ও আগ্রহভরা কণ্ঠস্বর তার। এই জন্যই শরৎ দিদিকে রাজলক্ষ্মীর এত ভাল লাগে। এই পাড়াগাঁয়ে সব লোক যেন ঘুমুচ্ছে, তাদের না আছে কোনো বিষয়ে আগ্রহ, না শোনা যায় তাদের মুখে একটা ভাল কথা। অল্প বয়সে বুড়িয়ে যেতে হয় ওদের মধ্যে থাকলে। শরৎ দিদি এসে বাঁচিয়েছে।

রাজলক্ষ্মী হঠাৎ মনে পড়বার সুরে বললে, ভাল কথা, বলতে মনে নেই শরৎদি, টুঁড়ি-মাজদে থেকে তোমার নামে একখানা চিঠি এসেছিল একবার—

শরৎ চমকে উঠে বললে—টুণ্ডি-মাজদে ! কই সে চিঠি ?

—আছে বোধ হয়, বাড়িতে খঁুজে দেখবো। তোমরা তখন এখানে ছিলে না—আমি রেখে দিয়েছিলাম—

—কতদিন আগে ?

—তা ছ-সাত মাস কি তার বেশিও হবে। গত বোশেখ মাসে বোধ হয়। আচ্ছা শরৎদি, ওখানে তোমার শ্বশুরবাড়ি—নয় ?

শরৎ অন্যমনস্কভাবে বললে, হাঁ।

একটুখানি চুপ করে কি ভেবে বললে, কে দিয়েছিল জানিস্ ?

—খামের চিঠি। আমি খুলে দেখি নি—কে আছে তোমার সেখানে ?

শরৎ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, নিয়ে আসিস্ চিঠিখানা দেখবো।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। তারপর রাজলক্ষ্মী বললে, খাও শরৎদি, সন্দে হয়ে আসছে—

—হঁু—

—নারকোল কেটে দেবো আর একটু ?

—না, তুই খেয়ে নে। উত্তর দেউলে সন্দে দেখিয়ে আসতে হবে—

—এখনও রোদ রয়েছে গাছের ডগায়, অনেক দেরি এখনো। খেয়ে নাও না—

—আমি আর খাবো না এখন।

—তুমি না খেলে আমার এই রইল—

—না, না, আচ্ছা খাচ্ছি আমি—নে তুই। কাঁচা লঙ্কা একটা নিয়ে আসি—

উত্তর দেউল থেকে সন্ধ্যা-প্রদীপ দিয়ে কিছুক্ষণ পরে ওরা ফিরছিল। কালোপায়রা দীঘির ওপাড়ের ঘন জঙ্গলে সেখানে ছাতিম ফুল ফুটে হেমন্তসন্ধ্যার বাতাস সুবাসিত করে তুলেছে। শ্যামলতার লম্বা কালো ডাঁটায় কুচো কুচো সুগন্ধ ফুল প্রত্যেক বর্ষাপুষ্ট ঝোপের মাথায়। পায়ে চলার পথ গত বর্ষার ঘাসে ঢেকে আছে, ভাঙা ইঁটের স্তূপে শেওলা জমেছে, গড়ের জঙ্গল ঘন কালো দেখাচ্ছে আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে। রাজলক্ষ্মীকে বাড়ি ফিরতে হবে বলে ওরা সন্ধ্যা-প্রদীপ দেখানোর কাজ বেলা থাকতে সেরে এল।

শরৎ বললে, অনেক মেটে আলু হয়ে আছে বনে, আজ দু-বছর এদিকে আসি নি—

—তুলবে একদিন শরৎদি ? আমিও আসবো—

বাড়ি গিয়ে শরৎ বললে, চল্ তোকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি—গড়ের খাল পর্যন্ত যাই। জল নেই তো খালে ?

রাজলক্ষ্মী হেসে বললে, কোথায় ? বর্ষায় সামান্য জল হয়েছিল, শুকিয়ে গেছে।

—থাক না কেন আজ রাতটা ? একা থাকবো ?

—বাড়িতে বলে আসি নি যে শরৎদি—নইলে আর কি। আচ্ছা কাল রাত্রে বরং থাকবো। বাড়িতে বলে আসতে হবে কিনা ?

রাজলক্ষ্মীকে এগিয়ে দিয়ে ফিরে আসবার পথে শরৎ একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর বসলো। হেমন্তের সান্ধ্য বাতাস কত কি বন্য পুষ্প, বিশেষতঃ বনমরচে ও শ্যামলতার পুষ্পের সুবাসে ভারাক্রান্ত। দেউড়ির ভাঙা ইঁটের ঢিবির সর্বত্র এ-সময় বনমরচে লতায় ছেয়ে গিয়েছে, পুরোনো রাজবাড়ি, লক্ষ্মীছাড়া দৈন্য তাদের শ্যামশোভায় আবৃত করে রেখেছে। রাজকন্যার সম্মান রেখেছে ওরা সেভাবে।

কি হবে এখুনি ঘরে ফিরে ? বেশ লাগে বাইরের বাতাস। ভয় নেই ওর মনে, যা ছিল তাও চলে গিয়েছে। তা ছাড়া ভয় কিসের ? সবাই বলে ভূত আছে, অপদেবতা আছে।

তার পূর্ব্বপুরুষের অভ্যুদয়ের দিনের শত পুণ্য অনুষ্ঠানে এ বাড়ির মাটি পবিত্র, এ বাড়ির সে মেয়ে, আবাল্য যে এ-সব এইখানেই দেখে এসেছে—তার ভয় কিসের ?

উত্তর দেউলের দেবী বাহারী তাদের মঙ্গল করবেন।

সে ঘরে ফিরে ডুমুরের চচ্চড়ি রান্না করবে বাবা আর জ্যাঠামশায়ের জন্যে। জ্যাঠামশায় অনেক ডুমুর পেড়ে এনেছেন আজ কোথা থেকে। জ্যাঠামশায় বেশ লোক। ওঁকে সে আর কোথাও যেতে দেবে না। উনি না থাকলে কে তাকে আনতো কাশী থেকে ? বাবার সঙ্গে কে আবার দেখা করিয়ে দিত ? যতদিন উনি বাঁচেন, সে ওঁর সেবা-যত্ন করবে মেয়ের মত।

শরতের হঠাৎ মনে পড়ল, রাজলক্ষ্মীকে তার শ্বশুরবাড়ির সে পুরানো চিঠিখানা আনবার জন্যে মনে করিয়ে দেওয়া হয় নি আর একবার। টুঁডি-মাজদিয়া। কত দিন সেখানে যাওয়া হয় নি। কে-ই বা আছে আর সেখানে ? চিঠি লিখেছেন বোধ হয় খুড়শাশুড়ী। তাই হবে—তা ছাড়া আর কে ? সেখানকার সব কিছু যখন শেষ হয়ে গিয়েছে, তখন ভাল জ্ঞানই হয় নি শরতের। এক উৎসব-রজনীর চাঁপাফুলের সুগন্ধ আজও যেন নাকে লেগে আছে। কত কাল আগে বিস্মৃত মুহূর্ত্তগুলির আবেদন—আজও তাদের ক্ষীণ বাণী অস্পষ্ট হয়ে যায় নি তো ! বিস্মৃতির উপলেপন দিয়ে রেখেছে চলমান কাল, সেই মুহূর্ত্তগুলির ওপর। তবে সে ভালবাসে নি, ভালবাসলে কেউ ভোলে না। তখনও বোঝবার, জানবার বয়স হয় নি তার।

টুঁডি-মাজদে তার শ্বশুরবাড়ি। ওখানকার ভাদুড়ীরা তার শ্বশুরবংশ—এক সময়ে নাকি ভাদুড়ীদের অবস্থা খুব ভাল ছিল। এখন—তাদেরই মত।

টুঁডি-মাজদে ! নামটা সে ভুলেই গিয়েছিল। রাজলক্ষ্মী আবার মনে করিয়ে দিলে।

বনের মধ্যে কোথায় গম্ভীর স্বরে হুতুম প্যাঁচা ডাকছে, শুনলে ভয় করে—যেন রাত্রিচর কোনো অপদেবতার কুস্বর। শরৎ অস্পষ্ট অন্ধকারের মধ্যে ধরে গিয়ে রান্নাঘরে খিল দিয়ে রান্না চড়িয়ে দিলে।

অনেক রাত্রে কেদার এসে ডাকাডাকি করেন—ও মা শরৎ, দোর খোলো—ওঠো—

দিন দশেক পরে একদিন রাজলক্ষ্মী এসে বললে, চললাম শরৎদি—

শরৎ বিস্ময়ের সুরে বললে, কি রে ? কোথায় চললি ?

—সব ঠিক। আমার বিয়ে হচ্ছে সতেরোই অঘ্রাণ—জানো না ?

—তোর ? সত্যি ?

—সত্যি না তো মিথ্যে ?

—বল্ শুনি—সত্যি ? কোথায় ?

রাজলক্ষ্মী বেশী কিছু জানে না বোঝা গেল। এখান থেকে মাইল দশেক দূরে দশঘরা বলে অজ এক পাড়াগাঁয়ে। যার সঙ্গে সম্বন্ধ হয়েছে, তার বয়েস নাকি তত বেশী নয়, বিশেষ কিছু করে না, বাড়িতেই থাকে।

শরৎ বললে, তোর পছন্দ হয়েছে ?

—পছন্দ হলেও হয়েছে, না হলেও হয়েছে—

—তার মানে ?

—তার মানে বাবার যখন পয়সা নেই, আমি যদি বলি আমার বর হাকিম হোক, হুকুম হোক, দারোগা হোক, তা হলে তো হবে না। যা জোটে তাই সই।

—এখন যা হয় হলে বাঁচি, না কি ?

—তোমার মুণ্ডু।

তার পর ওরা বনের মধ্যে মেটে আলু তুলতে গিয়ে অনেক বেলা পর্যন্ত রইল। বনের মধ্যে এক জায়গায় একটা পাথরের থামের ভাঙা মুন্ডুটা মাটিতে অর্ধেক পোঁতে আছে। রাজলক্ষ্মী সেটার ওপরে গিয়ে বসলো। পাথরের গায়ে সামুদ্রিক কড়ির মত ঘিট কাটা, মাঝে মাঝে পদ্মফুল এবং একটা দাঁড়ি। আবার কড়ি, পদ্ম ও দাঁড়ি—মালার আকারে সারা থামটা ঘুরে এসেছে। নিচের দিকে একরাশ কেঁচোর মাটি বাকী অংশটুকু ঢেকে রেখেছে।

রাজলক্ষ্মী চেয়ে চেয়ে বললে, এই নক্সাটা কেমন চমৎকার শরৎদি? বুনলে ভাল হয়—দেখে নাও—

শরৎ বললে, এর চেয়েও ভাল নক্সা আছে ওই অশ্বত্থ গাছটার তলায়—একটা খিলেন ভেঙে পড়ে আছে, তার ইঁটের গায়ে। কিন্তু বড্ড বন ওখানে—আর কাঁটা গাছ।

—তোমাদেরই সব তো—একদিন শুনেছি গড়বাড়ির চেহারা অন্যরকম ছিল। না?

—কি জানি ভাই, ও-সবের খবর আমি রাখি নে। আজকাল যা দেখছি, তাই দেখছি। তেল জোটে তো নুন জোটে না, নুন জোটে তো চাল জোটে না।

তার পর শরৎ কি ভেবে আনন্দপূর্ণ কণ্ঠে বললে, সত্যি রাজি, খুব খুশী হয়েছি তোর বিয়ের কথা শুনে। কত যে ভেবেছি, কাশীতে থাকতে কতবার ভাবতাম, ভাল সম্বন্ধ পাই তো রাজির জন্যে দেখি। একবার দশাশ্বমেধ ঘাটে একটা চমৎকার ছেলে দেখে ভাবলাম, এর সঙ্গে যদি রাজির বিয়ে দিতে পারতাম, তবে—

রাজলক্ষ্মী চুপ করে রইল। সে যেন কি ভাবছে।

শরৎ বললে, প্রভাসদার দেওয়া সেই মখমলের বাক্সটা আছে রে?

—হুঁ। স্নোটা সব খরচ হয়ে গেছে—আর সব আছে। দ্যাখো শরৎদি, সত্যি সত্যি একটা কথা বলি, আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না তোমায় ছেড়ে—আমি একবার বলেছি, আবার বলছি। মনের কথা আমার।

তার পর রাজলক্ষ্মী উঠে ধীরে ধীরে শরতের গলা জড়িয়ে ধরে বললে, শরৎদি, তুমি আমায় ভালবাসো?

শরৎ তাকে ঠেলে দিয়ে হেসে বললে, যাঃ—

রাজলক্ষ্মীর চোখ দিয়ে হঠাৎ ঝর ঝর করে জল পড়ল। সে অশ্রুসিক্ত স্বরে বললে, তুমি ভালোবাসো বলেই বেঁচে আছি শরৎদি। তুমি গরীব হতে পারো, আমার কাছে তুমি গড়বাড়ির রাজার মেয়ে, এই দেউল, মন্দির, দীঘি, গড়, ঠাকুর-দেবতার মূর্ত্তি সব তোমাদের, আমি তোমাদের প্রজার মেয়ে, একপাশে পড়ে থাকি—তুমি সুনজরে দ্যাখো বলে বার বার আসি—

শরৎ কৌতুকের সুরে বললে, খেপলি নাকি, রাজি? কী হয়েছে আজ তোর?

রাজলক্ষ্মী চলে যাবার কিছু পরে বটুক এসে ডাকলে, ও শরৎ—বাড়ি আছ?

শরৎ তখন স্নান করতে যাবার জন্যে তৈরী হয়েছে, বটুককে দেখে একটু বিরত হয়ে পড়ল। মুখে বললে, এসো বটুকদা—

—হ্যাঁ, এলাম। তুমি বুঝি—

—নাইতে বেরিয়েছি বটুকদা। রাজির সঙ্গে বন থেকে মেটে আলু তুলতে গিয়েছিলাম কি না। না ডুব দিয়ে ঘরে-দোরে ঢুকবো না—

—ও, তা আমি না হয় অন্য সময়—

—কোনো কথা ছিল?

—হ্যাঁ, না—কথা—তা একটু ছিল—তা—

বটুকের অবস্থা দেখে শরতের হাসি পেল। মনে মনে বললে, কি বলবি বল্ না—বলে চলে যা—কাণ্ড দ্যাখো একবার!

মুখে বললে, কি বটুকদা? কি কথা?

বটুক খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ইতস্ততঃ করে তার পর মরীয়ার সুরে বললে, প্রভাস এসেছিল কাল কলকাতা থেকে।

বলে সে শরতের মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল।

শরতের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল এক মুহূর্ত্তে। তার সমস্ত শরীর কেমন ঝিম-ঝিম করে উঠল। কিন্তু তখনি সামলে নিয়ে বললে, তা আমায় এ কথা কেন? আমি কি করবো?

বটুক মাথা চুলকে বললে, না—তা—এমন কিছু নয়, এমন কিছু নয়। প্রভাসের সঙ্গে গিরীনবাবু বলে এক ভদ্রলোক ছিল। এই গিয়ে তারা বলছিল—

এই পর্য্যন্ত বলে বটুক একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলে।

শরৎ দাওয়ার খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে নিজেকে যেন টলে পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে বললে, কি বলছিল?

—বলছিল যে—

—বলো না কি বলছিল?

—মানে, ওরা—তোমার সঙ্গে একবার লুকিয়ে দেখা করতে চায়। নইলে গাঁয়ে সব কথা নাকি প্রকাশ করে দেবে।

—হুঁ—তোমাকে তারা চর করে পাঠিয়েছে বুঝি?

শরতের অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে বটুক ভয় খেয়ে গেল। সুর নরম করে বললে—আমার ওপরে অনর্থক রাগ করছো তুমি। আমায় তারা বললে, তোমাকে কথাটা বলতে—কেউ টের পাবে না, গড়ের জঙ্গলের ওদিকে হোক্ কি রাণীদীঘির পাড়ে হোক্—কি তারা বলবে তোমায়। আমায় বললে, বলে এসো। তারা কলকাতায় চলে গিয়েছে, আবার আসবে। নয় তো কলকাতায় কি হয়েছিল না হয়েছিল, সব গাঁয়ে প্রকাশ করে দিয়ে যাবে—

শরৎ চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। কোনো কথা নেই তার মুখে। তার মূর্ত্তি দেখে বটুকের ভয় হ'ল। সে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় শরৎ স্থির গলায় বললে, বটুকদা, তোমার বন্ধুদের বোলো আমি লুকিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা কোনোদিন করবো না। তাদের সাহস থাকে বাবা আর জ্যাঠামশায়ের সামনে এসে যেন দেখা করে। আমরা গরীব আছি তাই কি? আমাদেরও মান আছে। না হয় তারা বড়লোকই আছে।

বটুক বললে, না—এর মধ্যে আর গরীব বড়লোকের কথা কি?

—আর একটা কথা বটুকদা! তুমি না গাঁয়ের ছেলে? তোমার উচিত কলকাতার সেই সব বখাটে বদমাইশদের তরফ থেকে আমায় এ-সব কথা বলা? আমি না তোমার ছোট বোনের মত? তোমায় না দাদা বলে ডাকি? তুমি এসেছ চর সেজে?

বটুক আমতা আমতা করে বললে, আমি কি করবো, আমি কি করবো—তোমার ভালোর জন্যেই—

শরৎ পূর্ব্ববৎ স্থির কণ্ঠেই বললে, আমার বাড়ি তুমি এসেছ—আমার বলতে বাধে, তবুও আমি বলছি—আমার এখানে তুমি আর এসো না—আমার ভালো তোমায় করতে হবে না।

বটুক ততক্ষণ ভগ্ন দেউড়ির পথে অদৃশ্য হয়েছে।

পনেরো

শরৎ কাঠের পুতুলের মত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল কতক্ষণ—এখন সে কি করবে ? গড়শিবপুরের রাজবংশে সে কি অভিশাপ বহন করে এনেছে, তার বংশের নাম বাবার নাম ডুবতে বসেছে আজ তার জন্যে !

মানুষ এত খারাপও হয় !

এই পল্লীগ্রামের বনে বনে হেমন্তকালের কত বনকুসুম, লম্বা লতার মাথায় থোবা থোবা মুকুল ধরেছে বন্য মাখম-সিম ফুলের, শিউলির তলায় খই-ছড়ানো শুভ্র পুষ্পের সমারোহ, সুমুখ জ্যোৎস্না রাতের প্রথম প্রহরে ছাতিমবনের নিবিড়তায় চাঁদের আলোর জাল-বুনুনি। ছাতিম ফুলের সুবাস—এ সবের আড়ালে লুকিয়ে আছে প্রভাসের মত, বটুকের মত ভয়ানক প্রকৃতির লোক, যাদের অসাধ্য কাজ নেই, যাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নেই। এত কষ্ট দিয়েও ওদের মনোবাঞ্ছা মিটলো না ? এতদিন পরে আবার এখানেও এসে জুটলো তার জীবনে আগুনে জ্বালাতে ?

আচ্ছা, সে কি করেছে যার জন্যে তার এত শাস্তি ?

সে কি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কিছু করেছে ? সে কি স্বেচ্ছায় কমলাদের পাপপুরীর মধ্যে ঢুকেছিল ? হতে পারে সে নির্বোধ, কিছু বুঝতে পারে নি, অত খারাপ কাউকে ভাবতে পারে নি বলেই তার মনে কোনো সন্দেহ জাগে নি, যখন সন্দেহ সত্যই জাগলো—তখন ওরা তো তাকে বেরুতে দিল না। অথচ সে যদি সব কথা খুলে বলে গ্রামে, কেউ তাকে বিশ্বাস করবে না।

প্রভাসের ও গিরীনের বদমাইশির কথা শুনে ওদের কেউ শাস্তি দেবে না ? ভগবান সত্যের দিকে দাঁড়াবেন না ?

না হয়—সে কালোপায়রা দীঘির জলে ডুবে মরে বাবার ও বংশের মুখ রক্ষা করবে। তা সে এখুনি করতে পারে—এই দণ্ডে।

শুধু পারে না বাবার মুখের দিকে চেয়ে।

আচ্ছা, সে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে দু'দিনের জন্যে ? টুঙি-মাজদে গ্রামে খুড়শাশুড়ীর আশ্রয়ে এখন থাকবে গিয়ে কিছুদিন ? কার সঙ্গে পরামর্শ করা যায় ? জ্যাঠামশায় বা বাবাকে এসব কথা বলতে বাধে।

তার চেয়ে জলে ডুবে মরা সহজ।

সকলে মিলে অমন ভাবে তাকে যদি জ্বালাতন করে, বনের মেটে আলু, বুনো সিম-ভাতে-ভাত এক বেলা খেয়েও যদি শান্তিতে থাকতে না দেয়, তবে মায়ের মুখে শোনা তারই বংশের কোন্ পুরোনো আমলের রাণীর মত—তারই কোন্ অতি-বৃদ্ধ প্রপিতামহীর মত নিজের মান বাঁচাবার জন্যে কালোপায়রা দীঘির শীতল জলের তলায় আশ্রয় নিয়ে সব জ্বালা জুড়ুতে হবে, যদি তাতে হতভাগারা শান্তিতে থাকতে দেয়।···চোখের জলে শরতের গালের দু-পাশ ভেসে গেল।

কতক্ষণ পরে তার যেন হুঁশ হ'ল—কত বেলা হয়েছে! রান্না চড়ানো হয় নি—বাবা জ্যাঠামশায় এসে ভাত চাইবেন এখুনি।

উঠে সে স্নান করে এল—তেল আগেই মেখে বসে ছিল। বটুক আসবার আগেই।

রান্না চড়িয়ে দিয়ে আবার সে ভাবতে বসলো। সব সময়েই ভাবছে, বটুক চলে যাবার পর থেকে। কতবার চোখের জল গড়িয়ে পড়েছে, কতবার আঁচল দিয়ে মুছেছে। কি সে করে এখন ?

তার কি কেউ নেই সংসারে?

কেউ তার দিকে দাঁড়িয়ে, তার হয়ে দুটো কথা বলবে না? প্রভাস ও গিরীন যদি তার নামে কুৎসা রটিয়ে দেয় গ্রামে, তবে তাদের কথাই সবাই সত্য বলে মেনে নেবে? তার কথা কেউ শুনবে না?

এমন সময় কেদার ও গোপেশ্বর এসে পেঁছে গেলেন।

তাঁরা মুখুজ্জে-বাড়ির জামাই সোমেশ্বরের কাছে নতুন রাগিণীর সন্ধানে গিয়েছিলেন, বোধ হয় খানিকটা কৃতকার্যও হয়েছেন, তাঁদের মুখ দেখলে সেটা বোঝা যায়।

গোপেশ্বর খেতে খেতে বললেন—গলাটা ভাল লোকটার।

—বেশ। ভৈরবীখানা গাইলে, বড় চমৎকার—অবরোহীতে একবার যেন ধৈবৎ ছুঁয়ে নামলো—

—না না। আমার কানে তো শুনলাম না। কোমল ধৈবৎ তো লাগবেই অবরোহীতে—

—সেটা আমার খুব ভাল জানা আছে—শুনবে? এই শোন না—আচ্ছা খেয়ে উঠি। অবরোহীতে কোমল নিখাদ, তার পরেই কোমল ধৈবৎ আসছে। যেমন—

শরৎ বললে, বাবা খেয়ে নাও দিকি। এর পর ওর অনেক সময় পাবে।

—এটা কিসের চচ্চড়ি মা?

—মেটে আলু। রাজলক্ষ্মী আর আমি তুলে এনেছিলাম আজ ওই বনের দিক থেকে—

—রাজলক্ষ্মী এসেছিল নাকি?

—কতক্ষণ ছিল। এই তো খানিকটা আগে গেল—

—ওর বিয়ের কথা শুনে এলাম কিনা—তাই বলছি—

—আমার সঙ্গে অত ভাব, ও চলে গেলে গাঁয়ের আর কেউ এদিকে মাড়াবে না। ওকে একটা কিছু দিতে হবে বাবা—

—কি দিবি?

—তুমি বলো বাবা—

—আমি ওসব বুঝি নে। যা বলবি, কিনে এনে দেবো—ওসব মেয়েলি কাণ্ডকারখানার আমি কোনো খবর রাখি নে—

আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে দুজনে হাটে চলে গেলেন, আজ পাশের গ্রামে হাট। পূর্বে হাট ছিল না, দুই জমিদারে বাদাবাদির ফলে আজ বছরখানেক নতুন হাট বসেছে। হাটের খাজনা লাগে না বলে কাপালীরা তরিতরকারী নিয়ে জমা হয়—সস্তায় বিক্রি করে।

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহ শেষ হয়ে দ্বিতীয় সপ্তাহ পড়েছে। অথচ এবার শীত এখনও তেমন পড়ে নি। বাবা ও জ্যাঠামশায় চলে গেলে শরৎ রোদে পিঠ দিয়ে বসে আবার সেই একই কথা ভাবতে লাগল।

গড়ের খাল পার হয়ে দেখা গেল রাজলক্ষ্মী আসছে। ওর জীবনে যদি কেউ সত্যিকার বন্ধু থাকে তবে সে রাজলক্ষ্মী, ও এলে যেন বাঁচা যায়, দিন কাটে ভাল।

রাজলক্ষ্মী আসতে আসতে বললে, আজ একটু শীত পড়েছে শরৎদি—না?

—আয় আয়, তোর কথাই ভাবছি—

—কেন—

—তুই চলে গেলে যেন ফাঁকা হয়ে যায়, আয় বোস্—

শরৎ ভাবছিল বটুকের কথাটা বলা উচিত হবে কি না। কিন্তু তা হলে অনেক কথাই ওকে এখন বলতে হয়—রাজলক্ষ্মী তাকে কিছু যদি মনে করে সব শুনে? শরৎ তা হলে মরে যাবে—জীবনের মধ্যে দুটিমাত্র বন্ধু সে পেয়েছে—অন্ধ রেণুকা আর এই রাজলক্ষ্মী।

এদের কাউকে সে হারাতে প্রস্তুত নয়।

আর একটি মেয়ের কথা মনে হয়—হতভাগিনী কমলার কথা—কে জানে সেই পাপপুরীর মধ্যে কি ভাবে সে দিন কাটাচ্ছে ?

সরলা শরৎ জানত না—পাপে যারা পাকা হয়ে গিয়েছে, তাঁদের পাপপুণ্য বলে জ্ঞান অল্প দিনেই তারা হারিয়ে ফেলে, পাপে ও বিলাসে মত্ত হয়ে বিবেক বিসর্জন দেয়। কোনো অসুবিধাতে আছে বলে নিজেকে মনে করে না। পুণ্যের পথই কণ্টকসঙ্কুল, মহাদুঃখময়—পাপের পথে গ্যাসের আলো জ্বলে, বেলফুলের গড়ে মালা বিক্রি হয়, গোলাপ জলের ও এসেন্সের সুগন্ধ মন মাতিয়ে তোলে। এতটুকু ধুলো কাদা থাকে না পথে। ফুলের পাপড়ির মত কোঁচা পকেটে গুঁজে দিব্যি চলে যাও।

রাজলক্ষ্মী বললে, দিন ঘনিয়ে এল, তাই তো তোমায় ছাড়তে পারি নে—

—হুঁ—

—কি ভাবছো শরৎদি ?

শরৎ চমক ভেঙে উঠে বললে—কই না—কিছু না। হ্যাঁ রে, তুই আশাদিদির বরের গান শুনেছিস্ ? খুব নাকি ভাল গায় ? বাবা আর জ্যাঠামশায় সেখানে ধন্না দিয়ে পড়ে আছেন আজ ক'দিন থেকে। দিন দশেক থেকে দেখছি—

—ও। তাই শরৎদি ! মুখুজ্জে-বাড়ির দিকে যেতে দেখেছি বটে ও'দের আজ সকালে—

—রোজ সেখানে পড়ে আছেন দুজনে—কি সকাল, কি বিকেল—কেমন গান গায় রে লোকটা ?

—হিন্দী-মিন্দি গায়—কি হা হা করে, হাত-পা নাড়ে, আমার ও ভাল লাগে না।

দুজনে সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত গল্প করলে, সন্ধ্যার আগে প্রতিদিনের মত রাজলক্ষ্মী চলে গেল, শরৎ এগিয়ে দিতে গেল। অল্প অল্প অন্ধকার হয়েছে, ভারি নির্জন গড়বাড়ির জঙ্গল। শরৎ ভয় পায় না একটুও, বরং এতকাল পরে তার বড় ভাল লাগে। এসব জিনিস তার হারিয়ে গিয়েছিল, আবার সে ফিরে পেয়েছে। চিরদিনের গড়বাড়ির জঙ্গল তার পল্লব-প্রচ্ছায় বীথিপথে কত কি বনপুষ্পের সুবাস ও বনবিহঙ্গের কলকাকলী নিয়ে বসে আছে, পিতৃপিতামহের পায়ের দাগ আজও যেন আঁকা আছে সে পথের ধুলোয়, মায়ের স্নিগ্ধ স্নেহদৃষ্টি কোন্ কোণে সেখানে যেন লুকিয়ে আছে আজও—তাই তো মনে হয়, তার যদি কোনো পাপ হয়ে থাকে নিজের অজ্ঞাতে—সব কেটে গিয়েছে এখানে এসে, ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

রাজলক্ষ্মীর বিবাহে বেশী ধুমধাম হবে না, গ্রামের সকলকে ওরা বিবাহ-রাত্রে নিমন্ত্রণ করতে পারবে না বলে বেছে বেছে নিমন্ত্রণ করছে। কেদার ও গোপেশ্বর দুজনেই অবিশ্যি নিমন্ত্রিত—এসব খবর কেদারই আনলেন।

শরৎ বললে, বাবা, ওর বিয়েতে কি একটা দেওয়া যায় বলো না—

—তুই যা বলবি, এনে দেবো।

—তুমি যা ভাল ভাবো, এনো।

—আমি তো তোকে বললাম, ওসব মেয়েলি ব্যাপারে আমি নেই—

—টাকা আছে ?

—আড়তে চাকরি করার দরুন টাকা তো খরচ হয় নি। সেগুলো আছে একজনের কাছে জমা। কত চাই বলে দে—

—আইবুড়ো ভাতের একখানা ভাল শাড়ি দাও আর এক জোড়া দুল—ও আমার বড় ভালবাসে, আমার ছোট বোনের মত। আমার বড় সাধ—

—তা দেবো মা। কখনো তোর কাউকে কিছু হাতে করে দেওয়া হয় না—তুই হাতে করে দিয়ে আসিস্—হরি সেকরাকে আজই দুলের কথা বলে দিই—

বিবাহের দু-তিন দিন আগে কেদার শাড়ি ও দুল এনে দিলেন। শরৎ কাপড়ের পাড় পছন্দ না করাতে দুবার তাঁকে ও গোপেশ্বরকে ভাজনঘাটের বাজারে ছুটোছুটি করতে হ'ল। শরৎ নিজে ওদের বাড়ি গিয়ে রাজলক্ষ্মীকে আইবুড়ো ভাতের নিমন্ত্রণ করে এল। সকাল থেকে শাক, সুক্তুনি, ডালনা ঘণ্ট অনেক কিছু রান্না করলে। গোপেশ্বর চাটুজ্জে এসব ব্যাপারে শরৎকে কুটনো কোটা ফাইফরমাশ—নানা রকম সাহায্য করলেন।

শরৎ বললে, জ্যাঠামশায়কে বড় খাটিয়ে নিচ্ছি—

—তা নেও মা। আমি ইচ্ছে করে খাটি। আমার বড় ভাল লাগে—এ বাড়ি হয়ে গিয়েছে নিজের বাড়ির মত। নিজে যা খুশি করি—

ইতিমধ্যে দুবার গোপেশ্বর চাটুজ্জে চলে যাবার ঝোঁক ধরেছিলেন, দুবার শরৎ মহা আপত্তি তুলে সে প্রস্তাব না-মঞ্জুর করে।

শরৎ বললে, সেই জন্যেই তো বলি জ্যাঠামশায়, যতদিন বাঁচবেন, থাকুন এখানে। এখান থেকে যেতে দেবো না।

—সেই মায়াতেই তো যেতে পারি নে—সত্যি কথা বলতে গেলে যেতে ভালও লাগে না। সেখানে বৌমারা আছেন বটে, কিন্তু আমার দিকে তাকাবার লোক নেই মা—তার চেয়ে আমার পর ভাল—তুমি আমার কে মা? কিন্তু তুমি আমার যে সেবা যে যত্ন করো তা কখনো নিজের লোকের কাছ থেকে পাই নি—বা রাজামশায় আমায় যে চোখে দেখেন—

শরৎ ধমকের সুরে বললে, ওসব কথা কেন জ্যাঠামশায়? ওতে পর করে দেওয়া হয়। সত্যিই তো আপনি পর নন?

রাজলক্ষ্মী খেতে এল।

শরৎ বললে, দাঁড়া কাপড় ছাড়তে হবে—

রাজলক্ষ্মী বিস্ময়ের সুরে বললে, কেন শরৎদি?

—কারণ আছে। ঘরের মধ্যে চল্—

পরে কাগজের ভাঁজ খুলে শাড়ি দেখিয়ে বললে—পর্ এখানা—পছন্দ হয়েছে?—তোর কান মলে দেবো—কান নিয়ে আয় এ দিকে—দেখি—

—দুল? এসব কি করেছ শরৎদি?

—কি করলাম। ছোট বোনকে দেবো না? সাধ হয় না?

রাজলক্ষ্মী গরীবের মেয়ে, তাকে এমন জিনিস কেউ কোনোদিন দেয় নি। সে অবাক হয়ে বললে, এই সব জিনিস আমায় দিলে শরৎদি! সোনার দুল—

শরৎ ধমক দিয়ে বললে, চুপ। বলিনি আমাদের রাজারাজড়ার কাণ্ড, হাত ঝাড়লে পর্বত—

রাজলক্ষ্মীর চোখের জল গড়িয়ে পড়ল। নীরবে সে শরতের পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিলে। বললে, তা আজ দিলে কেন? বুঝেছি শরৎদি—তুমি যাবে না বিয়ের রাতে।

—যাবো না কেন—তা যাবো—তবে পাড়াগাঁ জায়গা বুঝিস তো—

—তোমার মত মানুষ আমার বিয়েতে গিয়ে দাঁড়ালে আমার অকল্যাণ হবে না শরৎদি। এ তোমায় ভাল করেই জানিয়ে দিচ্ছি, তুমি না গেলে আমার মনে বড্ড কষ্ট হবে। আর তুমি গেলে যদি অকল্যাণ হয়, তবে অকল্যাণই সই—

—ছিঃ ছিঃ—ওসব কথা বলতে নেই মুখে—আয়, চল্ রান্নাঘরে—কেমন গোটা দিয়ে

সজনে রেঁধেছি খেয়ে বলবি চল্—

বিকেলের দিকে শরৎ পুকুর থেকে গা ধুয়ে বাড়ি গিয়ে দেখলে রান্নাঘরের দাওয়ার ইট-চাপা একখানা কাগজের কোণ বেরিয়ে রয়েছে। একটু অবাক হয়ে কাগজটা টেনে নিয়ে দেখলে, তাতে লেখা আছে—

"আজ সন্ধ্যার পরে রানীদিঘীর পাড়ে ডুমুরতলায় আমাদের সঙ্গে দেখা করিবা। নতুবা কলিকাতায় কি হইয়াছিল প্রকাশ করিয়া দিব। হেনা বিবি আমাদের সঙ্গে আছে ভাজনঘাটের কুঠির বাংলায়। সেও তোমার সঙ্গে দেখা করিতে চায়। দেখা করিলে তোমার ভাল হইবে। এ চিঠির কথা কাহাকেও বলিও না। বলিলে যাহা হইবে দেখিতেই পাইবে। সাবধান।"

শরৎ টলে পড়ে যেতে যেতে কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিলে। মাথাটা যেন ঘুরে উঠল। আবার সেই হেনা বিবি, সেই পাপপুরীর কথা—যা মনে করলে শরতের গা ঘিন্ ঘিন্ করে! এ চিঠিখানা ছুঁয়েছে, তাতেই তাকে নাইতে হবে এই অবেলায়।

এরা তাকে রেহাই দেবে না? তাদের গড়বাড়িতে কলকাতার লোকের জোর কিসের?

সব সমস্যার সে সমাধান করে দিতে পারে এখুনি, এই মুহূর্তেই কালোপায়রা দীঘির অতল জলতলে।

কিন্তু বাবার মুখের অসহায় ভাব মনে এসে তাকে দুর্বল করে দেয়। নইলে সে প্রভাসেরও ধার ধারতো না, গিরীনেরও না। নিজের পথ করে নিতো নিজেই। তাদেরই বংশের কোন্ রানী ঐ দীঘির জলে আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন মান বাঁচাতে। সেও ঐ বংশেরই মেয়ে। তার ঠাকুরমারা যা করেছিলেন সে তা পারে।

বাবাকে এ চিঠি দেখাবে না। বাবার ওপর মায়া হয়, দিব্যি গানবাজনা নিয়ে আছেন, ব্যস্ত হয়ে উঠবেন এখুনি। গোপেশ্বর জ্যাঠামশায়কে দেখাতে লজ্জা করে। থাক্ গে, আজ সে এখুনি রাজলক্ষ্মীদের বাড়ি গিয়ে কাটিয়ে আসবে অনেক রাত পর্যন্ত। উত্তর দেউলে পিদিম আজ সকাল সকাল দেখাবে।

রাজলক্ষ্মীর মা ওকে দেখে বললেন, এসো এসো মা—শরৎ, আচ্ছা পাগলী মেয়ে, অত পয়সাকড়ি খরচ করে রাজিকে দুল আর শাড়ি না দিলে চলতো না?

রাজলক্ষ্মীর কাকীমা বললেন, গরীবের ওপর ওদের চিরকাল দয়া অমনি—কত বড় বংশ দেখতে হবে তো? বংশের নজর যাবে কোথায় দিদি?

শরৎ সলজ্জ সুরে বললে, ওসব কথা কেন খুড়ীমা? কি এমন জিনিস দিয়েছি—কিছু না—ভারি তো জিনিস—রাজি কোথায়?

রাজলক্ষ্মীর মা বললেন, এই এতক্ষণ তোমার কথাই বলছিল, তোমার দেওয়া কাপড় আর দুল দেখতে চেয়েছেন গাঙ্গুলীদের বড় বউ, তাই নিয়ে গিয়েছে দেখাতে। শরৎদি বলতে মেয়ে অজ্ঞান, তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ! বলে, মা—শরৎদিকে ছেড়ে কোথাও গিয়ে সুখ পাবো না। বসো, এলো বলে—

একটু পরে গাঙ্গুলী-বউকে সঙ্গে নিয়ে রাজলক্ষ্মী ফিরলো, সঙ্গে জগন্নাথ চাটুজ্জের পুত্রবধূ নীরদা। নীরদা শরতের চেয়ে ছোট, শ্যামবর্ণ, একহারা গড়নের মেয়ে, খুব শান্ত প্রকৃতির বউ বলে গাঁয়ে তার সুখ্যাতি আছে।

গাঙ্গুলী বউ বললেন, এই যে মা-শরৎ, তোমার কথাই হচ্ছিল। তুমি যে শাড়ি দিয়েছ, দেখতে নিয়েছিলাম—ক'টাকা নিলে? ভাজনঘাটের বাজার থেকে আনানো? বটঠাকুর কিনেছেন বুঝি?

শরৎ বললে, দাম জানি নে খুড়ীমা, বাবা ভাজনঘাট থেকেই এনেছেন। দুবার ফিরিয়ে দিয়ে তবে ঐ পাড় পছন্দ—

নীরদা বললে, দিদির পছন্দ আছে। চলুন দিদি, ও ঘরে একটু তাস খেলি আপনি আমি রাজলক্ষ্মী আর ছোট খুড়ীমা—

রাজলক্ষ্মীর মা শরৎকে পাশের ঘরে নিয়ে বললেন, মা, কাল তুমি আসতে পারো আর না পারো, আজ সন্দের পর এখান থেকে দুখানা লুচি খেয়ে যেও—রাজলক্ষ্মী আমায় বার বার করে বলেছে—

সবাই মিলে আমোদ স্ফূর্ত্তিতে অনেকক্ষণ কাটলো—বেলা পড়ে সন্ধ্যা হয়ে গেল। বিয়ে-বাড়ির ভিড়, গ্রামের অনেক ঝি-বউ সেজেগুজে বিকেলের দিকে বেড়িয়ে দেখতে এল। মুখুজ্জে-বাড়ির মেজ বউ পেতলের রেকাবে ছিরি গাঁড়িয়ে নিয়ে এলেন। রাজলক্ষ্মীর মা বললেন, বরণ-পিঁড়ির আলপনাখানা তুমি দিয়ে দ্যাও দিদি—তুমি ভিন্ন এসব কাজ হবে না—এক হৈমদিদি আর তুমি—তারকের মা তো স্বর্গে গেছেন—আলপনা দেবার মানুষ আর নেই পাড়ায়—তারকের মা কি আলপনাই দিতেন!

শরৎ বললে, বাবাকে একটু খবর দিন খুড়ীমা, কালীকান্ত কাকার চণ্ডীমণ্ডপে গানের আড্ডায় আছেন। যাবার সময় আমাকে যেন সঙ্গে নিয়ে যান এখান থেকে। অন্ধকার রাত, ভয় করে একা থাকতে।

পরদিন সকাল আটটার সময় শরৎকে আবার রাজলক্ষ্মীদের বাড়ি থেকে ডাকতে এল। নিরামিষ দিকের রান্না তাকে রাঁধতে হবে, গাঙ্গুলীদের বড় বউয়ের জ্বর কাল রাত্রি থেকে। তিনিই রান্না করে থাকেন পাড়ায় ক্রিয়াকর্ম্মে।

রাজলক্ষ্মী প্রায়ই রান্নাঘরে এসে শরতের কাছে বসে রইল।

শরৎ ধমক দিয়ে বলে—যা রাজি, দধিমঙ্গলের পরে হটরু হটরু ক'রে বেড়ায় না। এখানে ধোঁয়া লাগবে চোখে মুখে—অন্য ঘরে বসগে যা—

রাজলক্ষ্মী হেসে বললে, কারো ধমকে আর ভয় খাই নে। এই বসলাম পিঁড়ি পেতে—দেখি তুমি কি করো।

নীরদা এসে বললে, শরৎদি, একটা অর্থ বলে দাও তো?

আকাশ গম গম পাথর ঘাটা
সাতশো ডালে দুটি পাতা—

শরৎ তাকে খুন্তি উঁচিয়ে মারতে গিয়ে বললে, ননদের কাছে চালাকি—না? দশ বছরের খুকিদের ওসব জিজ্ঞেস করগে যা ছুঁড়ি—

গরীবের বিয়ে-বাড়ি, ধুমধাম নেই, হাঙ্গামা আছে। সব পাড়ার বউ-ঝি ভেঙে পড়ল সেজেগুজে। প্রথম প্রহরের প্রথম লগ্নে বিবাহ। শরৎ সারাদিন খাটুনির পরে বিকেলের দিকে নীরদাকে বললে, গা হাত পা ধুয়ে আসবো এখন। বাড়ি যাই—কাউকে বলিস নে—

বাড়ি ফিরে সে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখাতে গেল। শীতের বেলা অনেকক্ষণ পড়ে গিয়েছে, রাঙা রোদ উঠে গিয়েছে ছাতিমবনের মাথায়, ঈষৎ নীলাভ সাদা রঙের পুঞ্জ পুঞ্জ ছোট এড়াঞ্চির ফুল শীতের দিনে এই সব বনঝোপকে এক নির্জ্জন, ছন্নছাড়া মূর্ত্তি দান করেছে। শুকনো বাদুড়নখী ফল তাদের বাঁকানো নখ দিয়ে কাপড় টেনে ধরে। থমথমে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর অন্ধকার রাত্রি।

এক জায়গায় গিয়ে হঠাৎ সে ভয়ে ও বিস্ময়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। একটি লোক উপুড় হয়ে পড়ে আছে উত্তর দেউলের পথ থেকে সামান্য দূরে বাদুড়নখী জঙ্গলের মধ্যে। শরৎ কাছে দেখতে গিয়ে চমকে উঠল—কলকাতার সেই গিরীনবাবু!

মরে কাঠ হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। ওর ঘাড়টা যেন শক্ত হাতে কে মুচড়ে দিয়েছে পিঠের দিকে, সেই মুণ্ডুটা ধরের সঙ্গে এক অস্বাভাবিক কোণের সৃষ্টি করেছে। গিরীনের দেহটা যেখানে পড়ে, তার পাশেই মাটিতে ভারি ভারি গোল গোল কিসের দাগ, হাতীর পায়ের দাগের মত।···শরতের মাথা ঘুরে উঠল, সে চিৎকার করে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ে গেল। হাত থেকে সন্ধ্যাপ্রদীপ ছিট্‌কে পড়ল বাদুড়নখীর জঙ্গলে।

* * * *

এই অবস্থায় অনেক রাত্রে কেদার ও গোপেশ্বর তাকে বিয়ে-বাড়ি থেকে ডাকতে এসে দেখতে পেলেন। ধরাধরি করে তাকে নিয়ে বাড়ি যাওয়া হ'ল।

লোকজনের হৈ হৈ হ'ল পরদিন। পুলিস এল, রাণীদীঘির জঙ্গলে এক চালকবিহীন মোটর গাড়ি পাওয়া গেল। কি ব্যাপার কেউ বুঝতে পারলে না! সবাই বললে গড়বাড়ির সবাই সারা রাত বিয়ে-বাড়িতে ছিল। মৃতদেহের ঘাড়ে শক্ত, কঠিন পাঁচটা আঙুলের দাগ যেন লোহার আঙুলের দাগের মত, ঘাড়ের মাংস কেটে বসে গিয়েছে। গোল গোল হাতীর পায়ের মত দাগগুলোই বা কিসের কেউ বুঝতে পারলে না।

* * * *

গড়ের জঙ্গলে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে। সন্ধ্যাবেলা। কেদার ঘোর নাস্তিক, কি মনে করে তিনি হস্তপদভগ্ন বারাহী দেবীর পাষাণ মূর্ত্তির কাছে মাথা নিচু করে দণ্ডবৎ করে বললেন, গড়ের রাজবাড়ি যখন সত্যিকার রাজবাড়ি ছিল, তখন শুনেছি তুমি আমাদের বংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলে। আমাদের অবস্থা পড়ে গিয়েছে, অনেক অপরাধ করেছি তোমার কাছে, কিন্তু তুমি আমাদের ভোল নি। এমনি পায়ে রেখো চিরকাল মা—অনেক পুজো আগে খেয়েছ সে কথা ভুলে যেও না যেন।

যাত্রাবদল

ভণ্ডুলমামার বাড়ি

পাড়াগাঁয়ের মাইনার স্কুল। মাঝে মাঝে ভিজিট করতে আসি, আর কোথাও থাকবার জায়গা নেই, হেডমাস্টার অবিনাশবাবুর ওখানেই উঠতে হয়। অবিনাশবাবুকে লাগেও ভাল, বছর বিয়াল্লিশ বয়স, একহারা চেহারা, বেশ ভাবুক লোক। বেশী গোলমাল ঝঞ্ঝাট পছন্দ করেন না, কাজেই জীবনের পথে বাধা ঠেলে অগ্রসর না হতে পেরে দেবলহাটি মাইনার স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে পনেরো বছর কাটিয়ে দিলেন এবং বাকী পনেরোটা বছর যে এখানেই কাটাবেন তার সম্ভাবনা ষোল আনার ওপর সতেরো আনা।

কার্ত্তিক মাসের শেষে হেমন্ত সন্ধ্যা। স্কুলের বারান্দাতে ক্লাস-রুমের দুখান চেয়ার টেনে নিয়ে আমরা গল্প করছিলাম। সামনের একটা ছোট মাঠ, একপাশে একটা বড় তুঁতগাছ, একপাশে একটা মজা পুকুর। সামনের কাঁচা রাস্তাটা গ্রামের বাজারের দিকে গিয়েচে। স্থানটা নির্জ্জন।

চায়ের কোন ব্যবস্থা এখানে হওয়া সম্ভব নয়, তা জানি। একটি গরীব ছাত্র হেডমাস্টারের বাসায় থেকে পড়ে আর তাঁর হাটবাজার করে। সে এসে দুটো রেকাবিতে ঘি-মাখানো রুটি, আলুচচ্চড়ি ও একটু গুড় রেখে গেল। আমি বললুম—অবিনাশবাবু, বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে—বেশ গরম মুড়ি খাবার ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু···

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—সার্টেনলি—ওরে ও কানাই, শোন্, শোন্, যা দিকি, একবার গঙ্গার বউয়ের বাড়ি, আমার নাম ক'রে বলগে, দুটি গরম মুড়ি ভেজে দ্যায়—এক্ষুণি···

আমি বললুম, অভাবে চালভাজা···

তারপর গল্পগুজবে আধঘণ্টা কেটে গেল। অবিনাশবাবু কথা বলতে বলতে কেমন অন্যমনস্কভাবে মাঝে মাঝে বাঁ-ধারের মজা পুকুরটার দিকে চাইছিলেন। হঠাৎ বললেন—মুড়ি আসুক, একটা গল্প বলি ততক্ষণ। শুনুন, ইন্সপেক্টারবাবু। এইরকম শীতের সন্ধ্যাতেই কথাটা মনে পড়ে। আপনাকে পেয়ে মনে এত আনন্দ হয়!···এখানকার লোকজন দেখেচেন তো? সব দোকানদার, লেখাপড়ার কোন চর্চা নেই, ছেলেপিলেকে লেখাপড়া শেখায় এইজন্যে যে কোন রকমে ধারাপাত আর শুভঙ্করীটা শেষ করাতে পারলেই দাঁড়ি ধরাবে। কারুর সঙ্গে কথা বলে সুখ পাই নে, ঝালমসলার দরের কথা কাঁহাতক আলোচনা করি বলুন। ভদ্রঘরের ছেলে, না-হয় এসে পড়েচি পেটের দায়ে এই পাণ্ডববর্জ্জিত দেশে, কিন্তু তা বলে মনটা তো—কলেজের দু-চার ক্লাস চোখে দেখেছিলামও তো—পড়াশুনো না-হয় নাই করেচি···

দেখলাম অবিনাশবাবু কলেজের দিনগুলোর কথা এখনোও ভুলতে পারেননি। বেচারীর জীবনে জাঁকজমক নেই, আত্মপ্রতিষ্ঠার দুরাশা নেই, সাহসও বোধ করি নেই। তাঁর যা-কিছু অভিজ্ঞতা, যা-কিছু কর্ম্ম নৈপুণ্য, সবই এই অনাড়ম্বর সরল জীবনধারাকে আশ্রয় ক'রে। কলেজের দিনগুলোতেই শহরের মুখ দেখেছিলেন, আড়ম্বর বা বিলাসিতা—মনেরই বলুন বা দেহেরই বলুন—ঐ কলেজের ক'টা বছরেই তার আরম্ভ ও শেষ। সে দিনগুলো যত দূরে গিয়ে পড়চে, রঙীন স্মৃতির প্রলেপ তাদের ওপর যে তত বিচিত্র ও মোহময় হয়ে পড়বে এটা খুব স্বাভাবিক বটে।

অবিনাশবাবু তামাক ধরিয়ে আমার হাতে দিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন।

—হুগলী জেলার কোনো এক গ্রামে ছিল আমার বাড়ি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—ছিল কেন? এখন নেই?

সে কথা পরে বল্‌চি। না, এখন নেই ধরে নিতে পারেন। কেন যে নেই, তার সঙ্গে এই গল্পের একটা সম্বন্ধ আছে, গল্পটা শুনলেই বুঝবেন।

হুগলী জেলার কোনো এক গ্রামে আমার মামার বাড়ি ছিল। ছেলেবেলায় যখন সর্ব্বপ্রথম মায়ের সঙ্গে সেখানে যাই, তখন আমার বয়েস বছর পাঁচেক। আমাদের মামার বাড়ির পাড়ায় আট নয় ঘর ব্রাহ্মণের বাস, ঘেঁষাঘেঁষি বসতি, এক চালে আগুন লাগলে পাড়াসুদ্ধ পুড়ে যায়, এমন অবস্থা। কোঠাবাড়ি ছিল কেবল আমার মামাদের, আর সব খড়ের ছাউনি, ছোট-বড় আটচালা ঘর, এ-পাড়া থেকে ও-পাড়া যাবার পথে একটা বড় আম-কাঁটালের বাগান, বনজঙ্গল, সজনে গাছ ও দু-একটা ডোবা। বনজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অনেকদূর গেলে তবে ও-পাড়ার প্রথম বাড়িটা। সেই বনজঙ্গলের মধ্যে কাদের একটা কোঠাবাড়ি খানিকটা গাঁথা হচ্চে।

সে-বার কিছুদিন থেকে চলে আসবার পর আবার যখন মামার বাড়ি গেলুম, তখন আমার বয়স আট বছর। গ্রামটা অনেক দিন পরে দেখতে বেরিয়ে চোখে পড়ল, এ-পাড়া ও ও-পাড়ার মধ্যে বাঁ-দিকে ডোবার ধারের একটা জায়গা। একটু অবাক হয়ে গেলাম। ডোবার পাড়ের জঙ্গল অনেকটা কাটানো, কাদের একটা কোঠাবাড়ি খানিকটা গাঁথা অবস্থায় দাঁড়িয়ে, কিন্তু মনে হ'ল অনেক দিন গাঁথুনির কাজ বন্ধ আছে, যে-জন্যই হোক, কারণ ভিতের গায়ে ও ঘরের মেঝেতে ছোট-বড় ভাঁটশেওড়ার গাছ গজিয়েচে, চুণ-সুরকী মাখার ছোট খানাতে পর্য্যন্ত বনমুলোর চারা। মনে পড়ল, সে-বার এসে বাড়িটা গাঁথা হচ্চে দেখেছিলুম। এখনও গাঁথা শেষ হয়নি তো? কারা বাড়ি তুলচে?

ছুটে গিয়ে দিদিমাকে জিজ্ঞেস করলুম।

—কারা ওখানে বাড়ি করচে দিদিমা, সে-বার এসে দেখে গিইচি, এখনও শেষ হয়নি?

—তোর এত কথাও মনে আছে!···ও তোর ভণ্ডুলমামা বাড়ি করচে, এখানে তো থাকে না, তাই দেখাশোনার অভাবে গাঁথুনি এগুচ্চে না।

আমার ভারী কৌতুহল হ'ল, সাগ্রহে বললুম, ভণ্ডুলমামা কোথায় থাকে দিদিমা? ভণ্ডুলমামা কে?···

—ভণ্ডুল রেলে চাকরি করে, লালমণিরহাটে না কোথায়। আমাদের গাঁয়েই ছেলেবেলায় থাকত, বাড়িঘর তো ছিল না। ও-পাড়ার মুখুয্যে-বাড়ির ভাগে, চাকরিবাকরি করছে, ছেলেপুলে হয়েচে, একটা আস্তানা তো চাই? তাই টাকা পাঠিয়ে দ্যায়, মুখুয্যেরা মিস্ত্রী লাগিয়ে ঘরদোর শুরু ক'রে দিয়েচে, নিজে ছুটিতে এসে মাঝে মাঝে দেখাশুনো করে—

আমি ছাড়বার পাত্র নই, বললুম,—তবে বাড়ি গাঁথা হচ্চে না কেন? মুখুয্যেরা তো দেখলেই পারে?

—তা নয়, সব সময় তো টাকা পাঠাতে পারে না? যখন পাঠায়, তখন মিস্ত্রী লাগানো হয়।

কি জানি কেন সেই থেকে এই ভণ্ডুলমামা ও তাঁর আধ-গাঁথা বাড়িটা আমার মনে একটা অদ্ভুত স্থান অধিকার ক'রে রইল। রূপকথার রাজপুত্রের মতই এই ভণ্ডুলমামা হয়ে রইলেন অবাস্তব, স্পর্শের অতীত, দর্শনের অতীত, এক মানস-রাজ্যের অধিবাসী, তাঁর চাকরির স্থান লালমণির হাট, যায় তাঁর ছেলেমেয়েসুদ্ধ। তাঁর টাকা পাঠাবার ক্ষমতা বা অক্ষমতাও যেন কোথায় আমার ব্যক্তিগত সহানুভূতির বিষয়ীভূত হয়ে দাঁড়াল, অথচ কেন এসব হ'ল তার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ আজও মনের মধ্যে খুঁজে পাই না।

কতবার দিদিমাদের চিলেকোঠার ছাদে শুয়ে দিদিমার মুখে রূপকথা শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক মনে ভেবেচি—লালমণিরহাট থেকে ভণ্ডুলমামা আবার কবে টাকা পাঠাবে বাড়ি

গাঁথার জন্যে ?···না, এবার বোধ হয় নিজে আসবে। মুখুয্যেরা বোধ হয় ভণ্ডুলমামার টাকা চুরি করে, তাই ওদের হাতে আর টাকা দেবে না। বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গল্পের ফাঁকে দিদিমাকে কখনো বা জিজ্ঞেস করি—লালমণির হাট কোথায় দিদিমা ? দিদিমা অবাক হয়ে বলেন—লালমণিরহাট ! কেন, তাতে তোর হঠাৎ কি দরকার পড়ল ?···তা, কি জানি বাপু কোথায় লালমণিরহাট ? নে নে, ঘুমুস্ তো আমায় রেহাই দে,—রাত্তিরে এখন গিয়ে আমায় দুটো মোচা কুটে রাখতে হবে, ঠাকুরঘরের বাসন বের করতে হবে, ছিষ্টির কাজ পড়ে রয়েছে—তোমায় নিয়ে সারা রাত গল্প করলে তো চলবে না আমার !

আমি অপ্রতিভের সুরে বলতুম—না দিদিমা, গল্প বল, যেও না, আচ্ছা মন দিয়ে শুনচি।

এর পরে আবার মামার বাড়ি গেলুম বছর দুই পরে। এই দু-বছরের মধ্যে আমি কিন্তু ভণ্ডুলমামার বাড়ির কথা ভুলে যাইনি। শীতের সন্ধ্যায় গোয়ালে সাঁজালের ধোঁয়ায় আমাদের পুকুরপাড়টা ভরে যেত, বনের গাছপালাগুলো যেন অস্পষ্ট, যেন মনে হ'ত সন্ধ্যায় কুয়াসা হয়েচে বুঝি আজ, সেইদিকে চাইলেই আমার অমনি মনে পড়তো ভণ্ডুলমামার সেই আধ-তৈরি কোঠাবাড়িটার কথা—এমনি শেওড়া বনে ঘেরা পুকুরপাড়ে—এতদিনে কতটা গাঁথা হ'ল কে জানে ? এতদিন নিশ্চয় ভণ্ডুলমামা মুখুয্যেবাড়ি টাকা পাঠিয়েচে।

মামার বাড়িতে রাতে এসে পেঁছিলাম। সকালে ঐ পথে বেড়াতে গিয়ে দেখি—ও মা, এ কি, ভণ্ডুলমামার বাড়িটা যেমন তেমনি পড়ে আছে ! চার-পাঁচ বছর আগে যতটা গাঁথা দেখে গিয়েছিলুম, গাঁথুনির কাজ তার বেশী আর একটুও এগোয় নি, বনে-জঙ্গলে একেবারে ভর্ত্তি, ইটের গাঁথুনির ফাঁকে বট-অশথের বড় বড় চারা ! আহা, ভণ্ডুলমামা বোধ হয় টাকা পাঠাতে পারে নি আর !

ভণ্ডুলমামার সম্বন্ধে সেবার অনেক কথা শুনলাম। ভণ্ডুলমামা লালমণিরহাটে নেই, সান্তাহারে বদলি হয়েচে। তার এখন দুই ছেলে, দুই মেয়ে। বড় ছেলেটি আমারই বয়সী, ভণ্ডুলমামার মা সম্প্রতি মারা গিয়েচে। বড় ছেলেটির পৈতে হবে সামনের চৈত্রমাসে। সেই সময়ে ওরা দেশে আসতে পারে।

কিন্তু সে-বার চৈত্রমাসের আগেই দেশে ফিরলুম, ভণ্ডুলমামার সঙ্গে দেখার যোগাযোগ হয়ে উঠল না।

বছর তিনেক পরে। দোলের সময়। মামার বাড়ির দোলের মেলা খুব বিখ্যাত, নানা জায়গা থেকে দোকানপসারের আমদানি হয়। আমি মায়ের কাছে আবদার শুরু করলুম, এবার আমি একা রেলে চড়ে মেলা দেখতে যাব মামার বাড়ি। আমায় একা ছেড়ে দিতে বাবার ভয়ানক আপত্তি, অবশেষে অনেক কান্নাকাটির পর তাঁকে রাজী করানো গেল। সারাপথ সে কি আনন্দ ! একা টিকিট ক'রে, রেলে চড়ে, মামার বাড়ি চলেছি। জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম একা বাড়ির বার হয়েচি সেই আনন্দেই সারা পথ আত্মহারা !

কিন্তু এ সুখ সইল না। মামার বাড়ির স্টেশনে নেমেই কি রকম হোঁচট খেয়ে প্ল্যাটফর্ম্মের কাঁকরের উপর পড়ে গিয়ে আমার হাঁটু ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। অতি কষ্টে মামার বাড়ি পেঁছে বিছানা নিলুম। পরদিন সকালে উঠতে গিয়ে দেখি আর উঠতে পারি নে—দুই হাঁটুই বেজায় টাটিয়েছে ; সঙ্গে সঙ্গে জ্বর। কোথা দিয়ে দোল কেটে গেল টেরও পেলুম না। দিদিমাকে অনুরোধ করলুম, বাড়িতে যেন তাঁরা চিঠি না লেখেন যে আমি আসবার সময় স্টেশনে পড়ে গিয়ে হাঁটু কেটে ফেলেছি।

সেরে উঠে বেড়াতে বেরিয়ে একদিন দেখি ভণ্ডুলমামার বাড়িটা অনেক দূর গাঁথা হয়ে গেছে। কাঠ-থামাল পর্য্যন্ত গাঁথা হয়েছে, কিন্তু কড়ি এখনও বসানো হয় নি।

হঠাৎ এত খুশী হয়ে উঠলুম যে আছাড় খেয়ে হাঁটু কাটার কথা টের পেলে বাবা কি বলবেন, তখনকার মত সে দুশ্চিন্তা মন থেকে মুছে গেল। উৎসাহে ও কৌতূহলে এক দৌড়ে ভণ্ডুলমামার বাড়িতে গিয়ে হাজির। গাঁথুনি অনেক দিন বন্ধ আছে মনে হ'ল, গত বর্ষার পরে বোধ হয় আর মিস্ত্রি আসে নি। ঘরের মেঝেতে খুব জঙ্গল গজিয়েচে, গাঁথুনির ফাঁকে ফাঁকে আমরুল শাকের গাছ, বাড়ির উঠোনে বড় একটা সজনে গাছে প্রথম ফাগুনে ফুলের খই ফুটেচে। ঘুরে ঘুরে দেখলুম, ভণ্ডুলমামার বাড়িতে তিনটে ঘর, একটা ছোট দালান, মাঝে একটা সিঁড়ির ঘর, আট-দশ ধাপ সিঁড়ি গাঁথা হয়ে গেছে। ওদিকের বড় ঘরটা বোধ হয় ভণ্ডুলমামার, মাঝের ঘরটাতে ছেলেমেয়েরা থাকবে। ভণ্ডুলমামার বাপ আছে? কে জানে? তিনি বোধ হয় থাকবেন সিঁড়ির এপাশের ঘরটাতে। রান্নাঘর কোথায় হবে? বোধ হয় উঠোনের এক পাশে ওই সজনে গাছটার তলায়। ভণ্ডুলমামা ছেলেমেয়ে নিয়ে যখন এসে বাস করবে, তখন এদের উঠোনে কি আর এমন জঙ্গল থাকবে? ছেলেমেয়েরা ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি ক'রে খেলবে, হয়ত বাড়িতে সত্যনারায়ণের সিন্নি দেবে পূর্ণিমায় কি সংক্রান্তিতে সংক্রান্তিতে। পুকুরপাড়ের এ জংলী চেহারা তখন একেবারে বদলে যাবে যে! আমার মামার বাড়ির এ পাড়াতে এক ঘর লোক বাড়বে···ও-পাড়া থেকে খেলা ক'রে ফেরবার পথে সন্ধ্যে হয়ে গেলেও আর ভাবনা থাকবে না···ওদের বাড়িতে আলো জ্বলবে, ছেলেমেয়েরা কথা বলবে, কিসের আর তখন ভয়? দিব্যি চলে যাব।

আরও বছর দুই কেটে গেল। থার্ড ক্লাসে পড়ি। মামার বাড়ি একাই গেলুম। একাই এখন সব জায়গায় যাই। ভণ্ডুলমামার বাড়ির ছাদ-পেটানো হয়ে গিয়েছে, সিমেন্টের মেঝে, দালানের বাইরে রোয়াক্ হয়েছে কবে আমি দেখি নি তো? রোয়াকের ওপর কেমন টিনের ঢালু ছাদ! কেবল একটুখানি এখনও বাকী, দরজা জানালায় এখনও কপাট বসানো হয় নি। বাঃ, ভণ্ডুলমামার বাড়ি তাহলে হয়ে গেল!

ভণ্ডুলমামা নাকি আজকাল বড় সুদখোর হয়ে উঠেছেন, মাঝে মাঝে গাঁয়ে আসেন, চড়া সুদে লোকজনকে টাকা ধার দেন, বাড়ি দেখাশুনো করেন, আবার চলে যান। মাস-কতক পরে আবার এসে কাবুলীওয়ালার মত চড়াও হয়ে সুদ আদায় করেন। গাঁয়ের লোক তাঁর নাম রেখেচে রক্তদন্ত।

তারপর এল একটা সুদীর্ঘ ব্যবধান। ছেলেবেলার মত মামার বাড়িতে আর তত যাই নে, গেলেও এক-আধ দিন থাকি। সেই এক-আধ দিনের মধ্যে পথে যেতে যেতে হয়ত দেখি, জঙ্গলের মধ্যে ভণ্ডুলমামার বাড়িটা তেমনি জনহীন পড়ে আছে···বনজঙ্গল চারিপাশে আরও গভীরতর, কেউ কোনদিন ও-বাড়িতে পা দিয়েচে বলে মনে হয় না। একটা ছন্নছাড়া, লক্ষ্মী-ছাড়া চেহারা, শীতের সন্ধ্যায় বর্ষার দিনে, চৈত্র-বৈশাখের দুপুরে কত বার ও-বাড়িটা দেখেচি, সেই একই মূর্ত্তি···

এমনি ক'রে বছর কয়েক কেটে গেল।

ক্রমে এণ্ট্রেন্স পাস দিয়ে কলকাতায় এসে কলেজে ঢুকলুম। সেবার সেকেণ্ড ইয়ারের শেষ, এফ-এ দেব, কি একটা দরকারে মামার বাড়ি গিয়েচি।

বোধ করি মাঘ মাসের শেষ। দুপুরে পুবের ঘরে জানালার ধারে খাটে শুয়ে আছি, বোধ হয় একখানা লজিকের বই পড়চি, এমন সময়ে একজন কালো, শীর্ণকায় প্রৌঢ় লোক ঘরে ঢুকলেন। বড় মামীমা বললেন,—এই তোর ভণ্ডুলমামা, প্রণাম কর।

আমার সে ছেলেবেলাকার মনের অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েছিল, বয়স হয়েচে, কলেজে পড়ি; নানা ধরনের লোকের সঙ্গে মিশেছি, সুরেন বাঁড়ুয্যে ও বিপিন পালের বক্তৃতা শুনেছি, স্বদেশী মিটিঙে ভলান্টিয়ারী করেছি, জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীই গেছে বদলে, তখন মনের

কোন্ গভীর তলদেশে আরও পাঁচটা পুরানো দিনের আদর্শের ও কৌতূহলের বস্তুর স্তূপের সঙ্গে ভণ্ডুলমামা ও তাঁর বাড়িও চাপা পড়ে গিয়েচে। তাই ঈষৎ অবজ্ঞামিশ্রিত চোখে সামান্য একটু কৌতূহলের সঙ্গে চেয়ে দেখলুম মাত্র—ভণ্ডুলমামার বয়স পঞ্চাশের ওপর হবে, টিকিতে একটা মাদুলী বাঁধা, গলায় কিসের মালা, কাঁচাপাকা একমুখ দাড়ি। এই সেই ছেলেবেলাকার ভণ্ডুলমামা! উদাসীন ভাবে প্রণামটা সেরে ফেললুম।

ভণ্ডুলমামা কিন্তু আমার সঙ্গে খুব আলাপ করলেন, একটু গায়ে পড়েই যেন। আমি কোন্ কলেজে পড়ি, কোন্ মেসে থাকি, কবে আমার পরীক্ষা ইত্যাদি নানা প্রশ্নে আমায় জ্বালাতন ক'রে তুললেন। আজকাল তিনি কল্‌কাতায় চাকরি করেন, বাগবাজারে বাসা, তাঁর বড় ছেলেও এবার ম্যাট্রিক দিয়ে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছে—এসব খবরও দিলেন।

আমি জিজ্ঞেস্ করলুম,—আপনাদের এখানকার বাড়িতে ছেলেমেয়ে আনবেন না?

ভণ্ডুলমামা বললেন, আন্‌বে, শিগ্‌গীরই আন্‌বে বাবা। এখনও একটু বাকী আছে, একটা রান্নাঘর আর একটা কুয়ো—এ দুটো করতে পারলেই সব এনে ফেলি। কলকাতায় বাসাভাড়া আর দুধের খরচ যোগাতেই···সেইজন্যেই তো খেয়ে না-খেয়ে দেশে বাড়িটা করলুম, তবে ঐ একটুখানি যা বাকী আছে···তা ছাড়া চিলেকোঠার ছাদটা এখনও এইবারেই ভাবছি শ্রাবণ মাসের দিকে ওটাও শেষ করব।

বলে কি! এখনও বাকী! জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত দেখে আসছি ভণ্ডুলমামার বাড়ি উঠছে! এ তাজমহল নির্ম্মাণের শেষ বেঁচে থেকে দেখে যেতে পারব তো!

ভণ্ডুলমামা আপন মনেই বলে যেতে লাগলেন—সামান্য চাকরি, ছা-পোষা মানুষ বাবা, কাচ্চাবাচ্চা খাইয়ে যা থাকে তাতেই তো বাড়ি হবে? এখন তো বাসায় বাসায় কাটচে, আজ যদি চাকরি যায় তবে ছেলেপুলে নিয়ে কোথায় দাঁড়াব, তাই ভেবে আজ চোদ্দ-পনেরো বছর ধ'রে একটু একটু ক'রে বাড়িটা তুলচি। তবে এইবার আর দেরি হবে না, আসছে বছর সব এনে ফেল্‌বো। জায়গাটা বড় ভালবাসি।

ভণ্ডুলমামা বল্‌লেন তো চোদ্দ-পনেরো বছর, কিন্তু আমার মনে হ'ল ভণ্ডুলমামার বাড়ি উঠছে আজ থেকে নয়, জীবনের পিছন ফিরে চেয়ে দেখলে যতদূর দৃষ্টি চলে ততকাল ধ'রে··· যেন অনন্তকাল, অনন্ত যুগ ধ'রে ভণ্ডুলমামার বাড়ির ইট একখানির পর আর একখানি উঠছে···শিশু থেকে কবে বালক হয়েছিলুম, বালক থেকে কিশোর, কৈশোর কেটে গিয়ে এখন প্রথম যৌবনের উন্মেষ, আমার মনে এই অনাদ্যন্ত মহাকাশ বেয়ে কত শত জন্মমৃত্যু, সৃষ্টি ও পরিবর্ত্তনের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ভণ্ডুলমামার বাড়ি হয়েই চলেছে ওরও বুঝি আদিও নেই, অন্তও নেই।

পরের বছর আবার ভণ্ডুলমামার সঙ্গে কলকাতাতেই দেখা। আমি তখন থার্ড ইয়ারে পড়ি। ভণ্ডুলমামা বল্‌লেন—এস একবার আমাদের বাসায়। তোমার মামী তোমায় দেখলে খুশী হবে।—সামনের রবিবার তোমার নেমন্তন্ন রইল, অবিশ্যি অবিশ্যি যাবে।

গেলুম, ভণ্ডুলমামার ছেলেদের সঙ্গেও আলাপ হ'ল। ভণ্ডুলমামা অনুযোগের সুরে বললেন,—ওদের বলি, যা একবার এই সময়ে। আষাঢ় মাসে দেশে গিয়ে উঠোনে খাসা বরবটি আর সিম লাগিয়ে রেখে এসেছি, মাচাও বেঁধে রেখে এসেছি,—তা কেউ কি কথা শোনে?

মামীমা ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন,—যাবে সেখানে কেমন ক'রে শুনি? কোনো ঘরে বাস করবার জো নেই, ছাদ ফুটো হয়ে জল পড়ে। জলের ব্যবস্থা নেই বাড়িতে, শুধু সিম আর বরবটির পাতা চিবিয়ে তো মানুষে···তাতে বাড়ি হাট আলগা, পাঁচিল নেই।

ভণ্ডুলমামা মৃদু প্রতিবাদের সুরে ভয়ে ভয়ে যা বললেন তার মর্ম্ম এই যে, মানুষ বাস না করলেই বাড়িতে বট-অশ্বত্থের গাছ হয়, ছাদ আঁটা হয়ে গেছে আজ অনেক দিন, কিন্তু কেউ

বাস তো করে না। বাড়ি কাজেই খারাপ হতে থাকে। তবুও তিনি বছরে দু-তিনবার যান ব'লে এখনও ঘরদোর টিকে আছে। পাতকুয়োর আর কত খরচ? চৈত্র মাসের দিকে না হয় ক'রে দেওয়া যাবে। আর তোমরা সবাই যদি যাও, পাঁচিল আষাঢ় মাসেই ক'রে দেওয়া যাবে।

বুঝলুম পাঁচিল পাতকুয়া এখনও বাকী। ভণ্ডুলমামার বাড়ি এখনও শেষ হয় নি, এখনও কিছু বাকী আছে। কিন্তু এতদিন ধ'রে ব্যাপারটা চলচে যে, এক দিক গড়ে উঠতে অন্য দিকে ধরেছে ভাঙন।

এর পরে মামার বাড়ি গিয়ে দু-একবার দেখেছি ভণ্ডুলমামা দু-পাঁচ দিনের ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসে আছেন। এটা সারাচ্ছেন, ওটাতে বেড়া বাঁধছেন, এ-গাছটা খুঁড়ছেন, ও-গাছটা কাটছেন। ছেলেরা আস্‌তে চায় না কল্‌কাতা ছেড়ে। নিজেকেই আস্‌তে হয়, দেখাশুনো করতে হয় বলে একদিন সলজ্জ কৈফিয়ৎও দিলেন।··· পাঁচিল? হ্যাঁ তা পাঁচিল—সম্প্রতি একটু টানাটানি যাচ্ছে···সামনের বর্ষায়···ঘরদোর বেঁধেছি সারাজীবন খেটে, ওই আমার বড় আদরের জায়গা—তোরা না থাকিস, আমিই গিয়ে থাকি।

আমি বললুম,—ওখানে কেমন ক'রে থাকেন? সারা গাঁয়েই তো মানুষ নেই, মামার বাড়ির পাড়া তো একেবারে জনশূন্য হয়ে গেছে।

—কি করি বাবা, ওই বাড়িখানার ওপর বড় দম আমার যে। দেখ, চিরকাল পরের বাসায়, পরের বাড়িতে মানুষ হয়ে ঘরের কষ্ট বড় পেয়েছিলুম—তাই ঠিক করি বাড়ি একখানা করবই। ছেলেবেলা থেকে ওই গাঁয়েই কাটিয়েছি, ওখানটা ছাড়া আর কোথাও মন বসে না। চিরকাল ভাবতুম রিটায়ার ক'রে ওখানেই বাস করব। একটা আস্তানা তো চাই, এখন না হয় ছেলেপিলে নিয়ে বাসায় বাসায় ঘুরছি, কিন্তু এর পরে দাঁড়াব কোথায়? তাই জলাহার ক'রেও সারাজীবন কিছু কিছু সঞ্চয় ক'রে ওই বাড়িখানা করেছিলুম। তা ওরা তা কেউ এল না—আমি নিজেই থাকি। না থাক্‌লে বাড়িখানা তো থাকবে না—আর এককালে না-এককালে ছেলেদের তো এসে বস্‌তেই হবে বাড়িতে। কলকাতার বাসায় বাসায় তো চিরকাল কাটবে না।

তারপর মামাদের মুখে ভণ্ডুলমামার কথা আরও সব জানা গেল। ভণ্ডুলমামা একা বিজন বনের মধ্যে নিজের বাড়িখানায় থাকেন। তাঁর এখনও দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর ছেলেরা শেষ পর্য্যন্ত ওই বাড়িতেই গিয়ে বাস করবে। তিনি এখনও এ-জায়গাটা ভাঙচেন, ওটা গড়চেন, নিজের হাতে দা দিয়ে জঙ্গল সাফ করচেন। ছেলেদের সঙ্গে বনে না—ওই বাড়ির দরুনই মনান্তর, স্ত্রীও ছেলেদের দিকে। ছেলেরা বাপকে সাহায্যও করে না। ভণ্ডুলমামা গাঁয়ে একখানা ছোট মুদির দোকান করেছিলেন—লোক নেই তার কিনবে কে? যা দু-একঘর খদ্দের জুটেছিল—ধার নিয়েই দোকান উঠিয়ে দিলে। এখন ভণ্ডুলমামা এ-গাঁ ও-গাঁ বেড়িয়ে কোনো চাষার বাড়ি থেকে দু-কাঠা চাল, কারুর বাড়ির পাঁচটা বেগুন—এই রকম ক'রে চেয়ে চিন্তে এনে বাড়িতে হাঁড়ি চড়িয়ে দুটো ফুটিয়ে খান।

তারপর ধীরে ধীরে অনেক বছর কেটে গেল। আমি ক্রমে বি-এ পাস করে চাকরিতে ঢুকলুম। মামার বাড়ি আর যাই নে, কারণ সে-গ্রাম আর যাবার যোগ্য নয়। মামার বাড়ির পাড়ায় গাঙ্গুলীরা, রায়েরা, ভড়েরা সব একে একে মরে হেজে গেল, যারা অবশিষ্ট রইল তারা বিদেশে চাকরি করে, ম্যালেরিয়ার ভয়ে গ্রামের ত্রিসীমানা মাড়ায় না। ও-পাড়াতেও তাই জীবন মজুমদারের প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ির ছাদ ভেঙে ভূমিসাৎ হয়ে গিয়েছে, শুধু একদিকের দোতলা-সমান দেয়ালটা দাঁড়িয়ে আছে। যে পুজোর দালানে ছেলেবেলায় কত উৎসব দেখেছি, এখন সেখানে বড় বড় জগডুমুরের গাছ, দিনেই বোধ হয় বাঘ লুকিয়ে থাকে।

বিখ্যাত রায়দীঘি মজে গিয়েছে, দামে বোঝাই, জল দেখা যায় না, গরুবাছুর কচুরীপানার দামের ওপর দিয়ে হেঁটে দিব্যি পার হতে পারে।

সন্ধ্যা রাতেই গ্রাম নিশুতি হয়ে যায়। দু-এক ঘর নিরুপায় গৃহস্থ যারা নিতান্ত অর্থাভাবে এখনও পৈতৃক ভিটেতে ম্যালেরিয়া-জীর্ণ হাতে সন্ধ্যাদীপ জ্বালাচ্ছে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হতে-না-হতেই তারা প্রদীপ নিবিয়ে শয্যা আশ্রয় করে—তারপর সারারাত ধ'রে চারিধারে শুধু প্রহরে প্রহরে শৃগালের রব ও নৈশপাখীর ডানা ঝটাপটি!

আমার মামারাও গ্রামের ঘর-বাড়ি ছেড়ে শহরে বাসা করেছেন। ছোট মামার ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে সেখানে একবার গিয়েছি। ব্রাহ্মণভোজনের কিছু আগে একজন শীর্ণকায় বৃদ্ধ একটা পুঁটলি-হাতে বাড়িতে ঢুকলেন। এক পা ধুলো, বগলে একটা ময়লা সাদা কাপড়-বসানো বাঁশের বাঁটের ছাতা। প্রথমটা চিনতে পারি নি। পরে বুঝলুম ভণ্ডুলমামা এত বুড়ো হয়ে পড়েছেন এর মধ্যে!···শহরে এসে মামাদের নতুন সভ্য, শৌখীন আলাপী বন্ধুবান্ধব জুটেছে, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদের ধরনে ও কথাবার্তার সুরে ভণ্ডুলমামা কেমন ভয় খেয়ে সংকোচের সঙ্গে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের সতরঞ্চির এককোণে বসলেন। তিনিও নিমন্ত্রিত হয়েই এসেছিলেন বটে, কিন্তু মামারা তখন শহুরে বন্ধুদের আদর-অভ্যর্থনায় মহা ব্যস্ত; তাঁর আগমন কেউ বিশেষ লক্ষ্য করেছে এমন মনে হ'ল না।

আমি গিয়ে ভণ্ডুলমামার কাছে বসলুম। চারিধারে অচেনা মুখের মধ্যে আমায় দেখে ভণ্ডুলমামা খুব খুশী হলেন। আমি জিজ্ঞেস করলুম—আপনি কি কলকাতা থেকে আসছেন?

ভণ্ডুলমামা বললেন—না বাবা, আমি রিটায়ার করেছি আজ বছর-পাঁচেক হবে। গাঁয়ের বাড়িতেই আছি। ছেলেরা কেউ আসতে চায় না।

অন্নপ্রাশন শেষ হয়ে গেল। ভণ্ডুলমামা কিন্তু মামার বাড়ি থেকে আর নড়তে চান না। চার-পাঁচ দিন পরে কিছু চাল-ডাল ও বাসি সন্দেশ-রসগোল্লা নিয়ে দেশে রওনা হলেন। পায়ে দেখি কটক থেকে কিনে-আনা বড় মামার সেই পুরোনো চটিজুতো জোড়া। আমায় দেখিয়ে বললেন—নবীন কটক থেকে এনেছে, দেখে বড় শখ হ'ল, বয়েস হয়েছে কবে মরে যাব, বললুম তা দাও নবীন, জুতোজোড়াটা পুরোনো হ'লেও এখনও দু-তিন মাস যাবে। বাড়িতে একজোড়া রয়েছে, আঙুলে বড় লাগে বলে খালি পায়েই—

তিনি বাড়ির বার হয়ে গেলেন। আমি চেয়ে চেয়ে দেখলুম শীর্ণকায় ভণ্ডুলমামা ভারী চাল ডালের মোটের ভারে একটু সামনের দিকে ঝুঁকে চটিজুতোর ফটাং ফটাং শব্দ করতে করতে স্টেশনের পথে চলেছেন। হঠাৎ আমার মনে তাঁর উপরে আমার বাল্যের সেই রহস্যময় স্নেহ ও অনুকম্পার অনুভূতিটুকু কতকাল পরে আবার যেন ফিরে এল। আমি চেঁচিয়ে বললুম—একটু দাঁড়ান মামা, আপনাকে তুলে দিয়ে আসি। ভণ্ডুলমামার পুঁটুলিটা নিজের হাতে নিলুম, টিকিট ক'রে তাঁকে গাড়িতে তুলেও দিলুম। ট্রেনে ওঠবার সময় একমুখ হেসে বললেন—যেও না হে একদিন, বাড়িটা দেখে এস আমার—খাসা করেছি—কেবল পাঁচিলটা এখনও যা বাকি। কি করি, আমার হাতে আজকাল আর তো কিছু নেই, ছেলেরা নিজেদের বাসার খরচই চালিয়ে উঠতে পারে না—অবিশ্যি ওদের জন্যেই তো সব। দেখি, চেষ্টায় আছি—সামনের বছরে যদি···

ভণ্ডুলমামার সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি। কিন্তু এর মাস-কতক পরে তাঁর বড়ছেলে হরিসাধনের সঙ্গে কলকাতায় দেখা হয়েছিল। ম্যাকমিলান কোম্পানীর বাড়িতে চাকরি করে, জিনের কোট গায়ে, হাতে বইয়ের আকারে খাবারের কৌটো, মুখে একগাল পান—বৌ-বাজারের ফুটপাত দিয়ে বেলা দশটার সময় আপিসে যাচ্ছে। আমিই ভণ্ডুলমামার কথা

তুললুম। হরিসাধন বললেন—বাবা দেশের বাড়িতেই আছেন—আমরা বলি আমাদের সংসারে এসে থাকুন, তাতে রাজী নন। বুদ্ধিশুদ্ধি তো কিছু ছিল না বাবার, নেইও—সারা জীবন যা রোজগার করেছেন ওই জঙ্গলের মধ্যে এক বাড়ি করতে গিয়ে সব নষ্ট করেছেন, নইলে আজ হাজার চার-পাঁচ টাকা হাতে জমতো। ও-গাঁয়ে যাবেই বা কে? রামোঃ, যেমন জঙ্গল তেমনি ম্যালেরিয়া—তাছাড়া লোকজন নেই, অসুখ হলে একটা ডাক্তার নেই—চার-পাঁচ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে বাড়ির পিছনে, বেচতে গেলে এখন ইট-কাঠের দরেও বিক্রী হবে ভেবেছেন? কে নিতে যাবে, পাগল আপনি?

আমি বললুম—কথাটা ঠিক বটে। কিন্তু ভেবে দেখ, তোমার বাবা যখন বাড়িটা প্রথম আরম্ভ করেছিলেন, তখন জাজ্বল্যমান গ্রাম। বাড়িটা তৈরী করতে এত দেরি হয়ে গেল যে ইতিমধ্যে গাঁ হয়ে গেল শ্মশান, লোকজন উঠে অন্যত্র চলে গেল, আর সেই সময় তোমাদের বাড়ির গাঁথুনিও শেষ হ'ল। কার দোষ দেবে?

তারপর ভন্ডুলমামার আর কোন সংবাদ রাখি নি অনেক কাল। বছর-তিনেক আগে একবার মেজমামা চেঞ্জে গিয়েছিলেন দেওঘরে। পুজোর ছুটিতে আমিও সেখানে যাই। তাঁর মুখেই শুনলুম ভন্ডুলমামা সেই শ্রাবণেই মারা গিয়েছেন। অসুখ-বিসুখ হয়ে ক'দিন ঘরের মধ্যেই ছিলেন, কেউ বিশেষ দেখাশুনা করে নি, আর' আছেই বা কে গাঁয়ে যে দেখবে? এ অবস্থায় ঘরের মধ্যে ম'রে পড়েছিলেন, দু-তিন দিন পরে সবাই টের পায়, তখন ছেলেদের টেলিগ্রাম করা হয়। ভন্ডুলমামার এইখানেই শেষ।

এর পর আমি আর কখনও মামার বাড়ির গ্রামে যাই নি, হয়ত আর কোন দিন যাবও না, বাড়িটাও আর দেখি নি, কিন্তু জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত যে বাড়িটা গাঁথা হতে দেখেছি, সেটা আমার মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্থান অধিকার ক'রে আছে। আমার কল্পনায় দেশের মামার বাড়ির গ্রামের, একগলা বনের মধ্যে শীতের দিনের সন্ধ্যায় ভন্ডুলমামার বাড়িটা একটা কান্নাহীন উদ্দেশ্যহীন রূপ নিয়ে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে সেই গাছ-গজানো উঠোনটাতে, ঢোকবার পথ বনে ঢাকা, দরজা-জানলার কপাট নেই, থামে থামে কাঠ থামাল পর্য্যন্ত গাঁথা হয়েছে!

আমার জীবনের সঙ্গে ভন্ডুলমামার বাড়িটার এমন যোগ কি ক'রে ঘটল সেটা আজ ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে যাই—আমার গল্পের আসল কথাই তাই। অমন একটা সাধারণ জিনিস কেন আমার মন এমন জুড়ে বসে রইল, অথচ কত বড় বড় ঘটনা তো বেমালুম মন থেকে মুছেই গিয়েছে!

বিশেষ ক'রে এই সব শীতের সন্ধ্যাতেই মনে পড়ে এইজন্য, যে পাঁচ বছর বয়সে এই শীতের সন্ধ্যাবেলাতেই বাড়িটা প্রথম দেখি।

* * * *

অবিনাশবাবুর ছাত্রটি মুড়ি নিয়ে এল।

পেয়ালা

সামান্য জিনিস। আনা তিনেক দামের কলাই-করা চায়ের ডিস্-পেয়ালা।

যেদিন প্রথম আমাদের বাড়িতে ওটা ঢুকল, সেদিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। শীতকাল, সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে লেপের মধ্যে যাওয়ার চেষ্টা করচি, এমন সময় কাকার গলার সুর শুনে দালানের দিকে গেলাম। কাকা গিয়েছিলেন দোকান নিয়ে কুলবেড়ের মেলায়। নিশ্চয়ই ভাল বিক্রী-সিক্রী হয়েছে!

উঠোনে দু'খানা গরুর গাড়ি। কৃষাণ হরু মাইতি একটা লেপ-তোশকের বাণ্ডিল নামাচ্চে! একটা নতুন ধামায় একরাশ সংসারের জিনিস—বেলুন, বেড়ী, খুন্তী, ঝাঁঝরি, হাতা। খানকতক নতুন মাদুর, গোটা দুই কাঁঠাল কাঠের নতুন জল-চৌকি। এক বোঝা পালংশাকের গোড়া, দু-ভাঁড় খেজুরে গুড়, আরেও সব কি কি।

কাকা আমায় দেখে বললেন—নিবু একটা লণ্ঠন নিয়ে আয়—এটায় তেল নেই।

আমি এক দৌড়ে রান্নাঘরের লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে এলাম। পিসিমা হাঁ-হাঁ ক'রে উঠলেন, কিন্তু তখন কে কথা শোনে?

কাকাকে জিজ্ঞেস করলাম—মেলায় এবার লোকজন কেমন হ'ল কাকা?

কাকা বললেন—লোকজন প্রথমটা মন্দ হয় নি, কিন্তু হঠাৎ কলেরা শুরু হয়ে গেল, ওই তো হ'ল মুশকিল। সব পালাতে লাগল, বাঁওড়ের জলে রোজ পাঁচটা ছ'টা মড়া ফেল্‌ছিল, পুলিস এসে বন্ধ করে দিলে, খাবারের যত দোকান ছিল সব উঠিয়ে দিলে, কিছুতেই কিছু হয় না, ক্রমে বেড়ে চলল। শেষে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলাম। বিক্রী-সিক্রী কাঁচকলা, এখন খোরাকি, গাড়ি ভাড়া উঠলে বেঁচে যাই।

খেতে বসে কাকা মেলার গল্প করছিলেন, বাড়ির সবাই সেখানে বসে। কি ক'রে প্রথমে কলেরা আরম্ভ হ'ল, কত লোক মারা গেল, এই সব কথা।

—আহা সাম্‌টা-মানপুর থেকে কে একজন, যদু চক্কোত্তি না কি নাম—একখানা ছই-এর গাড়ি পুরে বাড়ির লোক নিয়ে এসেচে মেলা দেখতে। ছেলে-মেয়ে, বৌ ঝি, সে একেবারে গাড়ি বোঝাই। বাঁওড়ের ধারের তালতলায় গাড়ি রেখে সেখানেই সব রেঁধে খায়-দায়, থাকে। দু-দিন পরে রাত পোয়ালে বাড়ি ফিরবে, রাত্তিরেই ধরল তাদের একটা ন-বছরের মেয়েকে কলেরায়। কোথায় ডাক্তার, কোথায় ওষুধ, সকাল দশটায় সেটা গেল তো ধরল তার মাকে। রাত আটটায় মা গেল তো ধরল বড় ছেলের বৌকে। তখন এদিকেও রোগ জেঁকে উঠেচে, কে কাকে দ্যাখে—তারপর সে যা কাণ্ড। এক-একটা ক'রে মরে, আর পাশেই বাঁওড়ের জলে ফেলে—আদ্ধেক গাড়ি খালি হয়ে গেল। ব্রাহ্মণের যা সর্বনাশ ঘটল আমাদের চোখের সামনে, উঃ!

কাকা ভুষি-মালের ব্যবসা করেন। প্রায় চল্লিশ মণ সোনামুগ মেলায় বিক্রীর জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন, মণ বারো, না তেরো কাটাতে পেরেছিলেন, বাকী গরুর গাড়িতে ফিরে আসচে, কাল সকাল নাগাদ পৌঁছুবে। গাড়িতে আছে আমাদের আড়তের সরকার হরিবিলাস মান্না।

কাকা খেয়ে উঠে যাবার একটু পরেই কাকার ছোট মেয়ে মনু একটা কলাই-করা পেয়ালা রান্নাঘরে নিয়ে এসে বল্লে, এই দ্যাখো জাঠাই-মা, বাবা এনেছেন, কাল আমি এতে চা খাব কিন্তু। হাতে তুলে সকলকে দেখিয়ে বল্লে—বেশ, কেমন, না। মেলায় তিন আনা দরে কেনা—

এই প্রথম আমি দেখলুম পেয়ালাটা।

সে আজ চার বছরের কথা হবে।

তারপর বছর দুই কেটে গেল। আমি কাজ শিখে এখন টিউবওয়েলের ব্যবসা করি। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ডের কাজ সংগ্রহ করবার জন্যে এখানে-ওখানে বড় ছুটোছুটি ক'রে বেড়াতে হয়। বাড়িতে বেশীক্ষণ থাকা আজকাল আর বড় ঘটে না।

সেদিন সন্ধ্যার গাড়িতে কলকাতা আসব, আমার বিছানাপত্র বেঁধে রান্নাঘরে চায়ের জন্যে তাগাদা দিতে গিয়েচি—কানে গেল আমার বড় ভাই-ঝি বলচে—ও পেয়ালাটাতে দিও না পিসিমা, বাবা মারা যাওয়ার পর মা ও পেয়ালাটাকে দেখতে পারে না দু'চোখে—

আমি বল্লুম—কোন্ পেয়ালাটা রে? কি হয়েচে পেয়ালার?

আমার ভাই-ঝি পেয়ালা নিয়ে এল, মনে হ'ল কাকার কেনা অনেক দিনের সে পেয়ালাটা।

সে বল্লে—বৌদিদির অসুখের সময় এই পেয়ালাটা ক'রে দুধ খেতেন, তারপর বাবার সময়ও এতে ক'রে ওর মুখে সাবু ঢেলে দেওয়া হ'ত—মা বলে, আমি ওটা দেখতে পারি নে—

আমার এই জ্যাঠতুতো ভাইয়ের স্ত্রী কলকাতা থেকে আমাদের এখানে বেড়াতে এসে অসুখে পড়েন এবং তাতেই মারা যান। এর বছর দুই পরে কাকাও মারা যান পৃষ্ঠব্রণ রোগে। কিন্তু এর সঙ্গে পেয়ালাটার সম্পর্ক কি? যত সব মেয়েলী কুসংস্কার!

পরের বছর থেকে আমার টিউবওয়েলের কাজ খুব জেঁকে উঠল, জেলা বোর্ডের অনেক কাজ এল আমার হাতে। আমার নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই, দূর-দূরান্তের পাড়াগাঁয়ের নানা স্থানে টিউবওয়েল বসানো ও মিস্ত্রী খাটানোর কাজে মহা ব্যস্ত—বাকী সময়টুকু যায় আর-বছরের বিলের টাকা আদায়ের তদ্বিরে।

সংসারেও আমাদের নানা গোলযোগ বেধে গেল। কাকা যত দিন ছিলেন কেউ কোনো কথাটি বলতে সাহস করে নি সংসারের পুরানো ব্যবস্থাগুলির বিরুদ্ধে। এখন—সবাই হয়ে দাঁড়াল কর্ত্তা, কেউ কাউকে মেনে চলতে চায় না।

ঠিক এই সময় আমার ছোট ছেলের ভয়ানক অসুখ হলো। আমার আবার সেই সময় কাজের ভিড় খুব বেশী। জেলা বোর্ডের কাজ শেষ হয়ে গিয়েচে, কিন্তু টাকার তাগাদা করতে হবে ঠিক এই সময়টাতে। নইলে বিল চাপা পড়তে পারে ছ-মাস বা সাত মাসের জন্যে। আমি আজ জেলা, কাল মহকুমা ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগলুম,—এ-মেম্বার ও-মেম্বারকে ধরি, যাতে আমার বিলের পাওনাটা চুকিয়ে দিতে তাঁরা সাহায্য করেন।

কাজ মিটিয়ে যখন বাড়ি ফিরলুম, তখন এদিকেও কাজ মিটে গিয়েছে। ছেলেটি মারা গিয়েচে—অবিশ্যি চিকিৎসার ত্রুটি হয় নি কিছু, এই যা সান্ত্বনা।

বছরের শেষে আমি শহরে বাসা ক'রে স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের সেখানে নিয়ে এলাম। বাড়ির ওই সব দুর্ঘটনার পরে সেখানে আমাদের কারুর মন বসে না, তাছাড়া আমার ব্যবসা খুব জেঁকে উঠেচে—সর্ব্বদা শহরে না থাকলে কাজের ক্ষতি হয়।

টিউবওয়েলের ব্যবসাতে নেমে একটা জিনিস আমার চোখে পড়েচে যে, আমাদের দেশের, বিশেষ ক'রে পাড়াগাঁয়ের লোকদের মত অলস প্রকৃতির জীব বুঝি পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এত অল্পে সন্তুষ্ট মানুষ যে কি ক'রে হতে পারে সে যাঁরা এদের সঙ্গে পরিচিত নন, তাঁদের ধারণাতেও আসবে না। নিশ্চিত মৃত্যুকেও এরা পরম নিশ্চিন্তে বরণ ক'রে নেবে, সকল রকম দুঃখ দারিদ্র্য অসুবিধাকে সহ্য করবে কিন্তু তবু দু-পা এগিয়ে যদি এর কোন প্রতিকার হয় তাতে রাজী হবে না। তবে এদের একটা গুণ দেখেচি, কখনো অভিযোগ করে না এরা, দেশের বিরুদ্ধেও না, দৈবের বিরুদ্ধেও না।

বাইরে থেকে এদের দেখে যাঁরা বলবেন এরা মরে গিয়েচে, এরা জড় পদার্থমাত্র, ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখলে কিন্তু তাঁরা মত বদলাতে বাধ্য হবেন। এরা মরে নি, বোধ হয় মরবেও না

কোন কালে। এদের জীবনীশক্তি এত অফুরন্ত যে, অহরহ মরণের সঙ্গে যুদ্ধে এবং পদে পদে হেরে গিয়েও দমে যায় না এরা, বা ভয় পায় না, প্রতিকার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে না। সহজভাবেই সব মেনে নেয়, সব ব্যবস্থা।

খারাপ বিলের পাটপচানো জল খেয়ে কলেরায় গ্রাম উৎসন্ন হয়ে থাকে, তবু এরা টিউব-ওয়েলের জন্যে একখানা দরখাস্ত কখনও দেবে না বা তদ্বির করবে না। কে অত ছুটোছুটি করে, কে-ই বা কষ্ট করে? শুধু একখানা দরখাস্ত করা মাত্র, অনেক সময় দরকার বুঝলে জেলা বোর্ড থেকে বিনা খরচায় টিউবওয়েল বসিয়ে দেয়—কিন্তু ততটুকু হাঙ্গামা করতেও এরা রাজী নয়।

বাসায় একদিন বিকেলে চা খাওয়ার সময়ে লক্ষ্য করলুম, আমার ছোট মেয়েটি সেই কলাই করা পেয়ালাটা ক'রে চা খাচ্ছে।

যদিও ওসব মানি নে, তবুও আমার কি-জানি-কি মনের ভাব হ'ল—চা খাওয়া-টাওয়া শেষ হয়ে গেল পেয়ালাটা চুপি চুপি বাইরে নিয়ে গিয়ে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম পাঁচিলের ওধারের জঙ্গলের মধ্যে।

কাকার বড় মেয়েটির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, ছোট মেয়েটির বয়স দশ বছর, খুব বুদ্ধিমতী। শহরের মেয়ে-স্কুলে লেখাপড়া শেখাব বলে ওকে বাসায় এনে রেখেছিলুম, স্কুলেও ভর্ত্তি করে দিয়েছিলুম।

মাস পাঁচ-ছয় কাটল। বৈশাখ মাস।

এই সময়েই আমার টিউবওয়েলের কাজের ধুম। আট দশ দিন একাদিক্রমে বাইরে কাটিয়ে বাসায় ফিরি কিন্তু তখনই আবার অন্য একটা কাজে বেরিয়ে যেতে হয়। এতে পয়সা রোজগার হয় বটে, কিন্তু স্বস্তি পাওয়া যায় না। স্ত্রীর হাতের সেবা পাই নে, ছেলেমেয়েদের সঙ্গ পাই নে, শুধু টো টো ক'রে দুরদুরান্তর চাষাগাঁ ঘুরে ঘুরে বেড়ানো—শুধুই এস্টিমেট কষা, মিস্ত্রী খাটানো। মানুষ চায় দু-দণ্ড আরামে থাকতে, আপনার লোকেদের কাছে বসে তুচ্ছ বিষয়ে গল্প করতে, নিজের সাজানো ঘরটিতে খানিকক্ষণ ক'রে কাটাতে, হয়তো একটু বসে ভাবতে, হয়তো ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একটু ছেলেমানুষী করতে-শুষ্ক টাকা রোজগারে এসব অভাব তো পূর্ণ হয় না।

হঠাৎ চিঠি পেয়ে বাসায় ফিরলাম, কাকার ছোট মেয়েটির খুব অসুখ।

আমি পৌঁছলাম দুপুরে, একটু পরে রোগীর ঘরে ঢুকে আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলুম। আমার পিসিমা সেই কলাই-করা পেয়ালাটাতে রোগীকে সাবু না বার্লি খাওয়াচ্ছেন।

আমি আমার মেয়েকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম—ও পেয়ালাটা কোথা থেকে এল রে? খুকী বললে—ওটা কুকুরে না কিসে বনের মধ্যে নিয়ে ফেলেছিল বাবা, মনুদি দেখতে পেয়ে নিয়ে এসেছিল। সে তো অনেক দিনের কথা, পাঁচিলের বাইরে ওই যে বন, ওইখানে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

আমি বিস্মিত সুরে জিজ্ঞেস করলুম—মনু নিয়ে এসেছিল? জানিস্ ঠিক তুই?

খুকী অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—হ্যাঁ বাবা, আমি খুব জানি। তুমি না হয় মাকে জিজ্ঞেস করো; আমাদের সেই যে ছোকরা চাকরটাকে কুকুরে কামড়েছিল না, ঐ দিন সকালে মনুদি পেয়ালাটা কুড়িয়ে আনে। ওই পেয়ালাতে তাকে কিসের শেকড়ের পাঁচন খাওয়ানো হ'ল আমার মনে নেই!

আমি চমকে উঠলুম, বললুম কাকে রে? রামলগনকে?

—হ্যাঁ বাবা, সেই যে তারপর এখান থেকে চলে গেল দেশে, সেই ছেলেটা।

আমার সারা গা ঝিম্‌ঝিম্ করছিল—রামলগনকে কুকুরে কামড়ানোর পর দেশে চলে

গিয়েছিল—কিন্তু সেখানে যে সে মারা গিয়েছে, এ খবর আমি কাউকে বলি নি। বিশেষ ক'রে গৃহিণী তাকে খুব ভালবাসতেন বলেই সংবাদটা আর বাসায় জানাই নি। আমাদের টিউবওয়েলের মিস্ত্রী শিউশরণের শালীর ছেলে সে—সে-ই খবরটা মাসখানেক আগে আমায় দেয়।

মনুর অসুখ তখনও পর্যন্ত খুব খারাপ ছিল না, ডাক্তারেরা বলছেন, ভয়ের কোন কারণ নেই। আমার কিন্তু মনে হ'ল ও বাঁচবে না।

ও পেয়ালাটার ইতিহাস এ বাসায় আর কেউ জানে না, অসুখের সময় যে ওতে করে কিছু খেয়েছে সে আর ফেরে নি। জানত কেবল কাকার বড় মেয়ে, সে আছে শ্বশুরবাড়ি।

পেয়ালাটা একটু পরেই আবার চুপি চুপি ফেলে দিলুম—হাত দিয়ে তোলবার সময় তার স্পর্শে আমার সারা দেহ শিউরে উঠল—পেয়ালাটা যেন জীবন্ত, মনে হ'ল যেন একটা ক্রূর, জীবন্ত বিষধর সাপের বাচ্চার গায়ে হাত দিয়েচি, যার স্পর্শে মৃত্যু…যার নিঃশ্বাসে মৃত্যু…

পরদিন দুপুর থেকে মনুর অসুখ বাঁকা পথ ধরল, ন' দিনের দিন মারা গেল।

আমি জানতুম ও মারা যাবে।

মনুর মৃত্যুর পর পেয়ালাটা আবার কুড়িয়ে এনে ব্যাগের মধ্যে পুরে কাজে বেরুবার সময় নিয়ে গেলুম। সাত-আট ক্রোশ দূরে একটা নির্জন বিলের ধারে ফেলে দিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

শোকের প্রথম ঝাপটা কেটে গিয়ে মাস দুই পরে বাসা একটু ঠাণ্ডা হয়েচে তখন। কথায় কথায় স্ত্রীর কাছে একদিন এমনি পেয়ালাটার কথা বলি। তিনি আমার গল্প শুনে যেন কেমন হয়ে গেলেন, কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন, মুখ দিয়ে তাঁর কথা বেরুল না। আমি বললুম—বোধ হয় অত খেয়াল ক'রে তুমি কখনো দ্যাখো নি, তাই ধরতে পার নি—আমি কিন্তু বরাবর—

আমার স্ত্রী বিবর্ণমুখে বললেন—বলব একটা কথা? আমার আজ মনে পড়ল—একটু চুপ করে থেকে বললেন—

—খোকা যখন মারা যায় আর বছর আষাঢ় মাসে, সেই কলাই-করা পেয়ালাটাতে তাকে ডাবের জল খাওয়াতুম। আমি নিজের হাতে কতবার খাইয়েচি। তুমি তো তখন বাইরে বাইরে ঘুরতে, তুমি জানো না।

আমার কোন উত্তর খানিকক্ষণ না পেয়ে বললেন, জানতে তুমি এ কথাটা?

—না, জানতুম না অবিশ্যি। কিন্তু অন্যমনস্ক হয়ে আর একটা কথা মনে তোলাপাড়া করছিলুম—পেয়ালাটা আমাদের ছেড়েচে তো? ওটাকে কেন তখন ভেঙে চুরমার করে নষ্ট ক'রে দিই নি? আবার কোনো উপায়ে এসে এ বাড়িতে ঢুকবে না তো?

উইলের খেয়াল

দেশ থেকে রবিবারে ফিরছিলাম কল্‌কাতায়। সন্ধ্যার আর বেশী দেরি নেই, একটু আগে থেকেই প্লাটফর্মে আলো জেলেচে, শীতও খুব বেশী। এদিকে এমন একটা কামরায় উঠে বসেচি, যেখানে দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই যার সঙ্গে একটু গল্পগুজব করি। আবার যার তার সঙ্গে গল্প ক'রেও আনন্দ হয় না। আমার ধরের কোনো লোকের সঙ্গে গল্প ক'রে কোনো সুখ

পাই নে, কারণ তারা যে কথা বলবে সে আমার জানা। তারা আমারই জগতের লোক, আমার মতই লেখাপড়া তাদেরও, আমারই মত কেরানীগিরি কি ইস্কুল-মাস্টারী করে, আমারই মত শনিবারে বাড়ি এসে আবার রবিবারে কলকাতায় ফেরে। তারা নতুন খবর আমায় কিছুই দিতে পারবে না, সেই এক-ঘেয়ে কল্‌কাতার মাছের দর, এম্‌, সি, সি'র খেলা, ইস্টবেঙ্গল সোসাইটির দোকানে শীতবস্ত্রের দাম, চণ্ডীদাস কি সাবিত্রী ফিলমের সমালোচনা—এসব শুনলে গা বমি-বমি করে। বরং বেগুনের ব্যাপারী, কি কন্যাদায়গ্রস্ত পাড়াগেঁয়ে ভদ্রলোক, কি দোকানদার—এদের ঠিকমত বেছে নিতে পারলে, কথা বলে আনন্দ পাওয়া যায়। কিন্তু বেছে নেওয়া বড় কঠিন—কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক ভেবে যাঁর কাছে গিয়েছি, অনেক সময় দেখেছি তিনি ইন্‌সিওরেন্সের দালাল।

একা বসে বিড়ি খেতে খেতে প্লাটফর্মের দিকে চেয়ে আছি, এমন সময় দেখি, আমার বাল্যবন্ধু শান্তিরাম হাতে একটা ভারী বোঁচকা ঝুলিয়ে কোন্‌ গাড়িতে উঠবে ব্যস্তভাবে খুঁজে বেড়াচ্চে। আমি ডাকতেই 'এই যে!' ব'লে একগাল হেসে আমার কামরার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—বোঁচকাটা একটুখানি ধর না ভাই কাইণ্ডলি—

আমি তার বোঁচকাটা হাত বাড়িয়ে গাড়িতে তুলে নিলাম—পেছনে পেছনে শান্তিরামও হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে আমার সামনের বেঞ্চিতে মুখোমুখি হয়ে বস্‌লো। খানিকটা ঠাণ্ডা হয়ে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বল্‌লে—বিড়ি আছে? কিন্‌তে ভুলে গেলাম তাড়াতাড়িতে। আর ক'মিনিট আছে? পৌনে ছ'টা না রেলওয়ের? আমি ছুটেছি সেই বাজার থেকে—আর ঐ ভারি বোঁচকা! প্রাণ একেবারে বেড়িয়ে গিয়েচে। কল্‌কাতায় বাসা করা গিয়েচে ভাই, শনিবারে শনিবারে বাড়ি আসি। বাগানের কলাটা, মুলোটা যা পাই নিয়ে যাই এসে—সেখানে তো সবই—হুঁ—হুঁ—বুঝলে না? দাঁতন-কাঠিটা এস্তেক তাও নগদ পয়সা। প্রায় তিন-চার দিনের বাজার খরচ বেঁচে যায়। এই দ্যাখো, ওল, পুঁই শাক, কাঁচা লঙ্কা, পাটালি …দেখি দেশলাইটা—

শান্তিরামকে পেয়ে খুশী হ'লাম। শান্তিরামের স্বভাবই হচ্চে একটু বেশী বকা। কিন্তু তার বকুনি আমার শুনতে ভাল লাগে। সে বকুনির ফাঁকে ফাঁকে এমন সব পাড়াগাঁয়ের ঘটনার টুকরো ঢুকিয়ে দেয়, যা গল্প লেখায় চমৎকার—অতি চমৎকার উপাদান। ওর কাছে শোনা ঘটনা নিয়ে দু-একটা গল্প লিখেচিও এর আগে। মনে ভাবলাম, শান্তিরাম এসেচে, ভালোই হয়েচে। একা চার ঘণ্টার রাস্তা যাব, তাতে এই শীত। তা ছাড়া এই শীতে ওর মুখের গল্প জমবেও ভাল।

হঠাৎ শান্তিরাম প্লাটফর্মের দিকে মুখ বাড়িয়ে ডাকতে লাগল—অবনী ও অবনী, এই যে, এই গাড়িতে এস, কোথায় যাবে?

গুটি তিন-চার ছেলেমেয়ে, এক পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের স্বাস্থ্যবতী ও সুশ্রী একটি পাড়াগাঁয়ের বউ আগে আগে, পিছনে একটি ফর্সা একহারা চেহারার লোক, সবার পিছনে বাক্স পেটরা মাথায় জন দুই কুলি। লোকটি আমাদের কামরার কাছে এসে দাঁড়িয়ে হেসে বল্‌লে—এই যে দাদা, কল্‌কাতা ফিরচেন আজই। আমি? আমি একবার এদের নিয়ে যাচ্চি পাঁচঘরার ঠাকুরের থানে। মসলন্দপুর স্টেশনে নেমে যেতে হবে; বাস পাওয়া যায়। দলটি আমাদের গাড়ির পাশ দিয়ে এগিয়ে খালি একটা ইণ্টার ক্লাস কামরায় উঠল।

শান্তিরাম চেয়ে চেয়ে দেখে বল্‌লে—তাই অবনী এখানে এল না। ইণ্টার ক্লাসের টিকিট কিনা? আঙুল ফুলে কলাগাছ একেই বলে! ওই অবনীদের খাওয়া জুটত না, আজ দল বেঁধে ইণ্টার ক্লাসে চেপে বেড়াতে যাচ্ছে…ভগবান যখন যাকে দ্যান্‌,—আমাদের বোঁচকা বওয়াই সার।

গাড়ি ছাড়লো। সন্ধ্যায় পাতলা অন্ধকারে পাম্পিং এঞ্জিনের শেড, কেবিনঘর, ধূমাকীর্ণ কুলীলাইন, সট সট ক'রে দু-পাশ কেটে বেরিয়ে চলেচে, সামনে সিগন্যালের সবুজ বাতি, তারপর দু-পাশে আখের ক্ষেত, মাঠ, বাবলা বন। শান্তিরামের গলার সুর শুনে বুঝলাম, সে গল্প বলার মেজাজে আছে, ভাল ক'রে আলোয়ান গায়ে দিয়ে বসলাম, উৎসুক মুখে ওর দিকে চেয়ে রইলাম।

শান্তিরাম বললে—অবনীকে এর আগে কখনো দেখ নি? নিশ্চয় দেখেছ ছেলেবেলায়, ও আমাদের নীচের ক্লাসে পড়তো আর বেশ ভাল ফুটবল খেলতো—মনে নেই? ওর বাবা কোর্টে নকলনবিশী করতেন, সংসারের অভাব-অনটন টানাটানি বেড়েই চলেছিল। সেই অবস্থায় অবনীর বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে আনলেন। বললেন—কবে মরে যাব, ছেলের বৌয়ের মুখ দেখে যাই। বাঁচলেনও না বেশীদিন, এক পাল পুষ্যি আর একরাশ দেনা ছেলের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সংসার থেকে বিদায় নিলেন।

তারপর কি কষ্টটাই গিয়েচে ওদের। অবনী পাস করতে পারলে না, চাকরিও কিছু জুটলো না, হরিণখালির বিলের এক অংশ ওদের ছিল অনেক কাল আগে থেকে—শোলা হ'ত সেখানে, সেই বিলের শোলা ইজারা দিয়ে যে কটা টাকা পেত, তাই ছিল ভরসা।

ওদের গাঁয়ে চৌধুরী-পাড়ায় নিধিরাম চৌধুরী বলে একজন লোক ছিল। গাঁয়ে তাকে সবাই ডাকতো নিসু চৌধুরী। নিসু চৌধুরীর কোন কুলে কেউ ছিল না, বিয়ে করেছিল দু-দুবার, ছেলেপুলেও হয়েছিল কিন্তু টেকে নি। ওর বাবা সেকালে নিমকির দারোগা ছিল, বেশ দু-পয়সা কামিয়ে বিষয়-সম্পত্তি ক'রে গিয়েছিল। তা শালিয়ানা প্রায় হাজার বারো-শ টাকা আয়ের জমা, আম-কাঁটালের বাগান, বাড়িতে তিনটে গোলা, এক একটা গোলায় দেড়পাট দু-পাট ক'রে ধান ধরে, দুটো পুকুর, তেজারতি কারবার। নিসু চৌধুরী ইদানীং তেজারতি কারবার গুটিয়ে ফেলে জেলার লোন অফিসে নগদ টাকাটা রেখে দিত। সেই নিসু চৌধুরীর বয়স হ'ল, ক্রমে শরীর অপটু হয়ে পড়তে লাগল, সংসারে মুখে জলটি দেবার একজন লোক নেই। আবার পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার জান তো? পয়সা নিয়ে বাড়িতে কাউকে খেতে দেওয়া—এ রেওয়াজ নেই। তাতে সমাজে নিন্দে হয়, সে কেউ করবে না। নিসু চৌধুরী এখন একবার অসুখে পড়ে দিনকতক বড় কষ্ট পেলে—এ-সব দিকের পাড়াগাঁয়ের জান তো ভায়া, না পাওয়া যায় রাঁধুনী বামুন, না পাওয়া যায় চাকর, পয়সা দিলেও মেলানো যায় না। দিন দশ-বারো ভুগবার পর উঠে একটু সুস্থ হয়ে একদিন নিসু চৌধুরী অবনীকে বাড়িতে ডাকালে। বললে—বাবা অবনী, আমার কেউ নেই, এখন তোমরা পাঁচজন ভরসা। তা তোমার বাবা আমায় ছোট ভাইয়ের মত দেখতেন, তোমাদের পাড়ায় তখন যাতায়াতও ছিল খুব। তারপর এখন শরীরও হয়ে পড়েচে অপটু, তোমাদের যে গিয়ে খোঁজখবর করবো, তাও আর পারি নে। তা আমি বলচি কি, আমার যা আছে সব লেখাপড়া ক'রে দিচ্চি তোমাদের, নাও—নিয়ে আমাকে তোমাদের সংসারে জায়গা দেও। তুমি আমার দীনু-দার ছেলে, আমার নিজের ছেলেরই মত। তোমাকে আর বেশী কি বলবো বাবা?

অবনী আশ্চর্য্য হয়ে গেল। নিসু চৌধুরীর নগদ টাকা কত আছে কেউ অবিশ্যি জানে না, কিন্তু বিষয়-সম্পত্তির আয়, ধান—এ-সব যা আছে, এ গাঁয়ে এক রায়েদের ছাড়া আর কারু নেই। সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিতে চায় নিসু চৌধুরী তার নামে! অবনীর মুখ দিয়ে তো কথা বেরুলো না খানিকক্ষণ। তারপর বললে—আচ্ছা কাকা, বাড়িতে একবার পরামর্শ ক'রে এসে কাল বলব।

নিসু চৌধুরী বললে—বেশ বাবা, কিন্তু এ-সব কথা এখন যেন গোপন থাকে। পরদিন গিয়ে অবনী জানালে এ প্রস্তাবে তাদের কোন আপত্তি নেই। নিসু চৌধুরী বললে—বৌমা

তাহলে রাজী হয়েছেন ? দ্যাখো তা হলে আমার একটা সাধ আছে, সেটা বলি। আমার এত বড় বাড়িখানা পড়ে আছে, অনেক দিন এতে মা-লক্ষ্মীদের চরণ পড়ে নি, ঠিকমত সন্ধ্যে পড়ে না। তোমাদের ও-বাড়িটাও তো ছোট, ঘর-দোরে কুলোয় না, তা ছাড়া পুরোনোও বটে। তোমরা আমার এখানে কেন এস না সুবসুদ্ধ ? তোমারই তো বাড়িঘর হবে, তোমাকেই সব দিয়ে যখন যাব, তখন এখন থেকে তোমার নিজের বাড়ি তোমরা না দেখলে নষ্ট হয়ে যাবে যে !

এ প্রস্তাবেও অবনী রাজী হ'ল, একটা ভাল দিন দেখে সবাই এ বাড়িতে চলে এল। অবনীর বৌ নিসু চৌধুরীর বাড়ি কখনো দেখে নি, কারণ সে ও-পাড়ার বউ, এ-পাড়ায় আসবার দরকার তেমন হয় নি কখনো। ঘর-বাড়ি দেখে বৌ যেমন অবাক্ হয়ে গেল, তেমনি খুশী হ'ল। নিসু চৌধুরীর বাবা রোজগারের প্রথম অবস্থায় শখ ক'রে বাড়ি উঠিয়েছিলেন —তখনকার দিনে সস্তাগণ্ডার বাজার ছিল, দেখে অবাক হবার মত বাড়িই করেছিলেন বটে, পাড়াগাঁয়ের পক্ষে অবিশ্যি। কল্কাতার কথা ছেড়ে দেও। মস্ত দোতলা বাড়ি, ওদের নীচে বড় বড় সাত-আটখানা ঘর, বারান্দা, প্রকাণ্ড ছাদ, সান-বাঁধানো উঠোন, ভেতর বাড়িতে পাকা রান্নাঘর, ইঁদারা, বাইরে প্রকাণ্ড বৈঠকখানা। বাড়ির পেছনে ফলের বাগান, ছোট একটা পুকুর, বাঁধানো ঘাট—পাড়াগাঁয়ে সম্পন্ন গেরস্ত বাড়ি যেমন হয়ে থাকে।

ওরা বাড়িতে উঠে এসে জাঁকিয়ে সত্যনারায়ণের পুজো দিলে, লোকজন খাওয়ালে, লক্ষ্মীপুজো করলে। সবাই বল্লে অবনীর বৌয়ের পয় আছে, নইলে অমন বিষয়-সম্পত্তি প্যাওয়া কি সোজা কথা আজকালকার বাজারে। আবার অনেকেরই চোখ টাটালো।

এ-সব হ'ল গিয়ে ও-বছর ফাল্গুন মাসের কথা। গত বছর বোশেখ মাসে নিসু চৌধুরী মারা গেল। জ্বর হয়েছিল, অবনী ভাল ভাল ডাক্তার দেখালে, খুলনা থেকে নৃপেন ডাক্তারকে নিয়ে এল—বিস্তর পয়সা খরচ করলে, অবনীর বৌ মেয়ের মত সেবা করলে—কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। অবনী বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করলে খুব ঘটা ক'রে, সমাজ খাওয়ালে—তা সবাই বল্লে দেখে শুনে যে নিজের ছেলে থাকলে নিসু চৌধুরীর—সেও এর বেশী আর কিছু করতে পারত না। তারপর এখন ওরাই সম্পত্তির মালিক, অবনী নিজেই খাটিয়ে ছেলে, কোনো নেশা-ভাঙ্ করে না, অতি সৎ। কাজেই বিষয় উড়িয়ে দেবে সে ভয় নেই, দেখে শুনে খাবার ক্ষমতা আছে।

তাই বল্‌ছিলাম, ভগবান যাকে দেন, তাকে এমনি করেই দেন। ওই অবনীর বৌ আঁচল পেতে চাল ধার ক'রে নিয়ে গিয়েচে আমার মাসীমাদের বাড়ি থেকে, তবে হাঁড়ি চড়েচে—এমন দিনও গিয়েচে ওদের। আমার মাসীমার বাড়ি ওদের একই পাড়ায় কিনা ? তাঁরই মুখে সব শুনতে পাই। আর তারাই এখন দেখো ইস্টার ক্লাসে—ভগবান যখন যাকে—

অবনীর বউটি খুব ভাল, অত্যন্ত গরীব ঘরের মেয়ে ছিল, পড়েছিলও তেমনি গরিবের ঘরে। সে নাকি মাসীমার কাছে বলেচে, যা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবি নি দিদি তাই যখন হ'ল, এখন ভাবি, ভগবান সব বাঁচিয়ে বর্ত্তে রাখলে হয়। গরীব লোকের কপাল, ভরসা করতে ভয় পাই দিদি। প্রথম যে-দিন বাড়িতে ঢুকলাম, দেখি এ যেন রাজবাড়ি, অত ঘরদোর অত বড় জানলা দরজা, এতে আমার ছেলে-মেয়েরা বাস কত্তে পারবে, জান তো কি অবস্থা ছিলাম —তোমার কাছে আর কি লুকুবো ? এ যেন সবই স্বপ্ন বলে মনে হয়েছিল। এখন ব্রতটা নেমটা ক'রে, দু-দশ জন ব্রাহ্মণের পাতে দু-মুঠো ভাত দিয়ে যদি ভালোয় ভালোয় দিনগুলো কাটাতে পারি, তবে তো মুখ থাকে লোকের কাছে। সেই আশীর্ব্বাদ করো তোমরা সকলে।

সন্ধ্যার অন্ধকার চারিধারে খুব গাঢ় হয়েছে। ট্রেন হু-হু ক'রে অন্ধকার মাঠ, বাঁশবন,

বিল, জলা, আখের ক্ষেত, মাঝে মাঝে ঘন অন্ধকারের মধ্যে জোনাকি-জ্বলা ঝোপ পার হয়ে উড়ে চলেচে, মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম, খড়ে-ছাওয়া বিশ-ত্রিশটা চালাঘর এক জায়গায় জড়াজড়ি ক'রে আছে, দু-চার দশটা মিটমিটে আলো জ্বলে অন্ধকারে ঢাকা গাছপালায় ঢাকা গ্রামগুলোকে কেমন একটা রহস্যময় রূপ দিয়েচে।

একটা বড় গ্রামের স্টেশনে অবনী তার বৌ ও ছেলেমেয়েকে নিয়ে নেমে গেল। স্টেশনের বাইরে একখানা ছইওয়ালা গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, বোধ হয় ওদেরই জন্যে। অবনীর বউকে এবার প্লাটফর্মের তেলের লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোয় দেখে আরও বেশী ক'রে মনে হ'ল যে মেয়েটি সত্যিই সুশ্রী। বেশ ফর্সা রং, সুঠাম বাহু দুটির গড়ন, চলনভঙ্গী ও গলার সুরের সবটাই মেয়েলি। এমন নিখুঁত মেয়েলি ধরনের মেয়ে দেখবার একটা আনন্দ আছে, কারণ সেটা দুষ্প্রাপ্য। ট্রেনখানা প্রায় দশ মিনিট দাঁড়িয়ে রইল; একজন লোক হারিকেন লণ্ঠন নিয়ে ওদের এগিয়ে নিতে এসেছিল, ওরা তার সঙ্গে স্টেশনের বাইরে যেতে গিয়ে ফটক খোলা না পেয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কারণ যিনি স্টেশন-মাস্টার তিনিই বোধ হয় টিকিট নেবেন যাত্রীদের কাছ থেকে—ফটকে চাবী দিয়ে তিনি গার্ডকে দিয়ে প্লাটফর্মের মধ্যে আঁধারে লণ্ঠনের আলোয় কি কাগজপত্র সই করাচ্ছিলেন।

তারপর ট্রেন আবার চলতে লাগল—আবার সেই রকম ঝোপ-ঝাপ, অন্ধকারে ঢাকা ছোট-খাটো গ্রাম, বড় বড় বিল, বিলের ধারে বাগ্দীদের কুঁড়ে। আমার ভারী ভাল লাগছিল—এই সব অজানা ক্ষুদ্র গ্রামে ঘরে ঘরে অবনীর বৌয়ের মত কত গৃহস্থবধূ ভারবাহী পশুর মত উদয়াস্ত খাটচে, হয়ত পেটপুরে দু-বেলা খেতেও পায় না, ফর্সা কাপড় বছরে পরে হয়ত দু দিন কি তিনদিন, হয়ত সেই পুজোর সময় একবার, কোন সাধ-আহ্লাদ পুরে না মনের, কিছু দেখে না, জানে না, বোঝে না, মনে বড় কিছু আশা করতে শেখে নি, বাইরের দুনিয়ার কিছু খবর রাখে না—পাড়াগাঁয়ের ডোবার ধারের বাঁশবাগানের ছায়ায় জীবন তাদের আরম্ভ, তাদের সকল সুখ-দুঃখ, আনন্দ, আশা-নিরাশার পরিসমাপ্তিও ঐখানে।

অবনীর বৌ গৃহস্থ বধূদেরই একজন। অন্ততঃ ওদের একজনও তার সাধের স্বর্গকে হাতে পেয়েচে। অন্ধকারের মধ্যে আমি বসে বসে এই কথাই ভাবছিলাম। আমি কল্পনা করবার চেষ্টা করলাম অবনীর বৌকে, যখন সে প্রথম নিসু চৌধুরীর বাড়িতে এল—কি ভাবলে অত বড় বাড়িটা দেখে,...অত ঘরদোর!...যখন প্রথম জানলে যে সংসারের দুঃখ দূর হয়েচে, প্রথমে যখন সে তার ছেলেমেয়েদের ফর্সা কাপড় পরতে দিতে পারলে, আমি কল্পনা করলাম দশ-ঘরার হাট থেকে অবনী বড় মাছ, সন্দেশ, ছানা কিনে বাড়িতে এসেচে...অবনীর বৌ এই প্রথম সচ্ছলতার মুখ দেখলে। তার সে খুশী-ভরা চোখমুখ অন্ধকারের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি।...

ট্রেন আর একটা স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েচে। শান্তিরাম আলোয়ান মুড়ি দিয়ে জড়সড় হয়ে বসে আছে, মাঝে মাঝে ঢুলচে। স্টেশনে পানের বোঝা উঠচে। শান্তিরামকে বললাম—শান্তিরাম, ঘুমুচ্ছ নাকি? আমি একটা গল্প জানি এই রকমই, তোমার গল্পটা শুনে আমার মনে পড়েচে সেটা, শুনবে?...

কিন্তু শান্তিরাম এখন গল্প শুনবার মেজাজে নেই। সে আরামে ঠেস দিয়ে আরও ভাল ক'রে মুড়িসুড়ি দিয়ে বসলো। সে একটু ঘুমুবে।

পূর্ণবাবুর কথা আমার মনে পড়েচে, শান্তিরামের গল্পটা শুনবার পরে এখন। পূর্ণবাবু আমিন ছিল, পাটনায় আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি। পূর্ণবাবুর বয়স তখন ছিল পঞ্চাশ কি বাহান্ন বছর। লম্বা রোগা চেহারা, বেজায় আফিম খেতো—দাঁত প্রায় সব পড়ে গিয়েছিল, মাথার চুল সাদা,—নাক বেশ টিকলো, অমন সুন্দর নাক কিন্তু আমি কম দেখেছি,

রং না-ফর্সা না-কালো। পূর্ণবাবু কম মাইনে পেত, এখানে কোন রকমে চালিয়ে বাড়িতে তার কিছু টাকা না পাঠালেই চলবে না—কাজেই তার পরনে ভাল জামা-কাপড় একদিনও দেখি নি। পূর্ণবাবু নিজে রেঁধে খেত। একদিন তার খাবার সময় হঠাৎ গিয়ে পড়েচি—দেখি পূর্ণবাবু খাচ্চে শুধু ভাত—কোন তরকারী, কি শাক, কি আলুভাতে—কিছু না, কেবল একতাল সবুজ পাতালতা বাটা-ওষুধের মত দেখতে—কি একটা দ্রব্য ভাতের সঙ্গে মেখে মেখে খাচ্চে। জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, সবুজ রঙের দ্রব্যটা কাঁচা নিমপাতা বাটা। পূর্ণবাবু একটু অপ্রতিভের সুরে বললেন, নিমপাতা-বাটা এত উপকারী, বিশেষ ক'রে লিভারের পক্ষে। ভাত দিয়ে মেখে যদি খাওয়া যায়—আমি আজ দু'বছর ধ'রে—আজ্ঞে দেখবেন খেয়ে, শরীর বড় ঠাণ্ডা—তা ছাড়া কি জানেন, লোভ যত বাড়াবেন ততই বাড়বে—

উপকারী দ্রব্য তো অনেকই আছে, ডাল ঝোলের বদলে কুইনাইন মিকশ্চার ভাতের সঙ্গে মেখে দু-বেলা খাওয়ার অভ্যেস করতে পারলে দেশের ম্যালেরিয়া সমস্যার একটা সুসমাধান হয়, তাও স্বীকার করি। কিন্তু জীবনে বড় বড় উপদেশগুলো চিরকাল লঙ্ঘন ক'রে চলে এসে এসে আজ নীতি ও স্বাস্থ্য-পালন সম্বন্ধে এত বড় একটা সজীব আদর্শ চোখের সামনে পেয়ে খানিকক্ষণের জন্যে নির্বাক হয়ে গেলাম। আর একদিন দু-দিন নয়, দু-বছর ধ'রে চলচে এ ব্যাপার!

একদিন পূর্ণবাবু নিজের জীবনের অনেক কথা বললেন। কলকাতায় তাঁদের বাড়ি, ভবানীপুরে। তাঁর একজন পিসিমা আছেন, একটু দূর সম্পর্কের। সেই পিসিমার মৃত্যুর পরে তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন পূর্ণবাবু। কিন্তু পিসিমা মরি-মরি করচেন আজ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর।

পূর্ণবাবুর বিবাহ হয় বাগবাজারে সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ের সঙ্গে—তবে তখন তাদের অবস্থা খুব ভাল ছিল না। পূর্ণবাবুদের পৈতৃক বাড়িও নেই কলকাতায়, ভবানীপুরে খুব আগে নাকি প্রকাণ্ড বাড়ি পুকুর ছিল, এখন তাঁদের দু-পুরুষ ভাড়াটে বাড়িতে থাকে। পূর্ণবাবুর আঠার-উনিশ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়, তিনি ছেলের জন্য শুধু যে কিছু রেখে যান নি তা নয়, ছেলেটিকে লেখাপড়াও শেখান নি। কারণ তিনিও জানতেন এবং সবাই জানত যে তার দরকার নেই, অতবড় সম্পত্তির যে মালিক হবে দু-দিন পরে—তার কি হবে লেখাপড়ায়?

ছেলেটিও জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত তাই জানত বলে লেখাপড়া শেখবার কোন চেষ্টাও ছিল না। পূর্ণবাবুর শ্বশুরও তাই ভেবে মেয়েকে ঐ গরীব ঘরে দিয়েছিলেন।

পূর্ণবাবুর বাবা তো মারা গেলেন, পূর্ণবাবুর ঘাড়ে রেখে গেলেন সংসার, নব-বিবাহিতা পুত্রবধূ, অল্প কিছু দেনা। কিন্তু পূর্ণবাবুর ক্রেডিট তখন পুরোমাত্রায়—কি বাজারে কি বন্ধুবান্ধব মহলে। টাকা হাত পাতলেই পাওয়া যায়—ধারে দোকানে জিনিস পাওয়া যায়, নিত্য নূতন বন্ধু জোটে। পূর্ণবাবু খুশী, পূর্ণবাবুর তরুণী বৌ খুশী, আত্মীয়-স্বজন খুশী, বন্ধুবান্ধব খুশী। কারণ, সবাই জানে বুড়ী আর ক'দিন? না হয় মেরে কেটে আর পাঁচটা বছর!

অবিশ্যি পূর্ণবাবুর তখন বয়স অনেক কম, সংসারের কিছুই বোঝেন না, জানেন না—মনে উৎসাহ, আশা অদম্য, আনন্দের উৎস—চোখের সামনে দীপ্ত রঙীন ভবিষ্যৎ—যে ভবিষ্যতের সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই, আশঙ্কা নেই, যা একদিন হাতের মুঠোয় ধরা দেবেই—এ অবস্থায় যে যা বুঝিয়েচে পূর্ণবাবু তাই-ই বুঝেচেন, টাকাকড়ি ধার ক'রে দু'হাতে উড়িয়েচেন, বন্ধুবান্ধবদের সাহায্যও করেচেন, ধারে যতদিন এবং যতটা নবাবি করা চলে, বাকী রাখেন নি।

কিন্তু ক্রমে বছর যেতে লাগল, দু-তিন বছর পরে আর ধার মেলে না—সকলেই হাত গুটিয়ে ফেললে। পাওনাদারের যাতায়াত শুরু হ'ল এইজন্যে—আরও বিশেষ ক'রে পূর্ণবাবু বাজারে ক্রেডিট হারিয়ে ফেললেন যে, সবাই দেখলে পূর্ণবাবুর পিসিমা ওঁদের আদৌ বাড়িতে ডাকেন না, পূর্ণবাবুকেও না, পূর্ণবাবুর বৌ ছেলেমেয়ে কাউকে না।

পিসিমার কাছে খাতির পেলে বাজারেও পূর্ণবাবুর খাতির থাক্‌তো—অনেকে বল্‌তে লাগলো পূর্ণবাবুর পিসিমা ওদের দেখতে পারে না, সমস্ত সম্পত্তি হয়ত দেবোত্তর ক'রে দিয়ে যাবে—একটি পয়সাও দেবে না ওদের।

পূর্ণবাবুর পিসিমার বিশ্বাস যে এরা তাঁকে বিষ খাইয়ে মারবে—যত বয়স হচ্ছে এ বিশ্বাস আরও দিন দিন বাড়চে—এতে ক'রে হয়েচে এই যে পূর্ণবাবুর, কি পূর্ণবাবুর স্ত্রীর, কি পূর্ণবাবুর ছেলেমেয়ের পিসিমার বাড়ির ত্রি-সীমানায় ঘেঁষবার যো নেই। কাজেই অতবড় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়েও পূর্ণবাবু আজ ত্রিশ টাকা মাইনের আমীনগিরি করচেন।

আমি পূর্ণবাবুর এ গল্প বিশ্বাস করি নি। কিন্তু সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পে আমরা একসঙ্গে দেড় বছরের উপর ছিলাম—এই দেড় বছরের প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যায় কি রাত্রে একসঙ্গে বস্‌বার সুযোগ হলেই পূর্ণবাবু আমায় তাঁর পিসিমার সম্পত্তির গল্প করতেন। কখন কোন্‌টা হয়ত বলে ফেলেচেন ছ-মাস আগে তাঁর মনে থাক্‌বার কথা নয়, আবার আজ যখন নতুন কথা বল্‌চেন ভেবে বল্‌লেন তখন খুঁটিনাটি ঘটনাগুলোও ছ-মাস আগের কাহিনীর সঙ্গে মিলে যেত—নানা টুকরো কথার জোড়াতালি মিলিয়ে এই দেড় বছরে পূর্ণবাবার সমস্ত গল্পটা আমি জেনেছিলুম—একদিন তিনি বসে আগাগোড়া গল্প আমায় করেন নি, সে ধরনের গল্প করার ক্ষমতাও ছিল না পূর্ণবাবুর।

সেই থেকে পূর্ণবাবুর দুর্দশার সূত্রপাত হ'ল। বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে গেল, শ্বশুরবাড়িতে খাতির কমে গেল, সংসারে দারিদ্র্যের ছায়া পড়ল। দু-এক জন হিতৈষী বন্ধুর পরামর্শে পূর্ণবাবু আমীনের কাজ শিখতে গেলেন—বৌ ছেলেকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

এ সব আজ ত্রিশ বছর আগেকার কথা।

এই ত্রিশ বছরে পূর্ণবাবু আমোদপ্রিয়, শৌখীনচিত্ত, অপরিণামদর্শী যুবক থেকে কন্যাদায়গ্রস্ত, রোগ-জীর্ণ, অকাল-বৃদ্ধ, দারিদ্র্যভারে কুব্জদেহ ত্রিশটাকা মাইনের আমীনে পরিণত হয়েচেন—এখন আর মনে তেজ নেই, শরীরে বল নেই, খেলে হজম করতে পারেন না, চুল অধিকাংশই পেকে গিয়েচে, কশের অনেকগুলো দাঁত পড়ে গেলেও পয়সা অভাবে বাঁধাতে পারেন না বলে গালে টোল খেয়ে যাওয়ায় বয়সের চেয়েও বুড়ো দেখায়।

বাড়ির অবস্থাও ততোধিক খারাপ। পনেরো টাকা ভাড়ার এঁদো ঘরে বাস করার দরুণ স্ত্রী ছেলে মেয়ে সকলেই নানারকম অসুখে ভোগে—অথচ উপযুক্ত চিকিৎসা হয় না। তিনটি মেয়ের বিয়েতে পূর্ণবাবু একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েচেন, অথচ মেয়ে তিনটির প্রথম দুটি ঘোর অপাত্রে পড়েচে। বড় জামাই বৌবাজারে দরজীর দোকান করে, ঘোর মাতাল, কুচরিত্র—বাড়িতে স্ত্রীকে মারপিট করে প্রায়ই, তবুও সেখানে মেয়েকে মুখ গুঁজে প'ড়ে থাকতে হয়—বাপের বাড়ি এলে শোবার জায়গাই দেওয়া যায় না। মেজ জামাই মাতাল নয় বটে, কিন্তু তার এক পয়সা রোজগারের ক্ষমতা নেই—রেলে সামান্য কি চাকুরি করে, সে সংসারে সবাই একবেলা খেয়ে থাকে, তাই নাকি অনেক দিন থেকে নিয়ম। আর একবেলা সকলে মুড়ি খায়। মেজ মেয়ের দুঃখ পূর্ণবাবু দেখতে পারেন না বলে মাঝে মাঝে তাকে বাড়িতে আনিয়ে রাখেন; সেখানে এলে তবু মেয়েটা খেতে পায় পেট পুরে দু-বেলা। আজকাল প্রায়ই জ্বরে ভোগে, শরীরও খারাপ হয়ে গিয়েচে, ডাক্তারে আশঙ্কা করচে থাইসিস। বুড়ী

পিসিমা কিন্তু এখনো বেঁচে। এখনও বুড়ী গঙ্গাস্নানে যায়। নিজের হাতে রেঁধে খায়, বয়স নব্বই-এর কাছাকাছি, কিন্তু এখনও চোখের তেজ বেশ, দাঁত পড়ে নি, বুড়ী একেবারে অশ্বত্থামার পরমায়ু নিয়ে জন্মেছে, এদিকে যারা তার মরণের পানে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, তাদের জীবন ভাটিয়ে শেষ হতে চলল।

সেটেলমেণ্টের কাজ ছেড়ে পাটনা থেকে চলে এলাম। পূর্ণবাবু তখনও সেখানে আমীন। বছর তিনেক পরে একদিন গয়া স্টেশনে পূর্ণবাবুর সঙ্গে দেখা। দুপুরের পর এক্সপ্রেস আসবার সময় স্টেশনের প্লাটফর্মে পায়চারি করচি, একটু পরেই ট্রেনটা এসে দাঁড়ালো। পূর্ণবাবু নামলেন একটা সেকেণ্ড ক্লাস কামরা থেকে, অন্য কামরা থেকে দু-জন দারোয়ান নেমে এসে জিনিসপত্রের তদারকে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। পূর্ণবাবুর পরনে দামী কাঁচি ধুতি, গায়ে সাদা সিল্কের পাঞ্জাবি, তার ওপরে জমকালো পাড় ও কল্কাদার শাল, পায়ে প্যারিস গার্টার আঁটা সিল্কের মোজা ও পাম্প-শু, চোখে সোনার চশমা, হাতে সোনার ব্যাণ্ডওয়ালা হাতঘড়ি।

আমি গিয়ে আলাপ করলাম। পূর্ণবাবু আমায় চিনতে পেরে বললেন—এই যে রাম-রতনবাবু, ভাল আছেন? তারপর, এখন কোথায়?

আমি বললাম—আমি এখানে চেঞ্জে এসেচি মাস-তিনেক, আপনি এদিকে—ইয়ে—

তাঁর অদ্ভুত বেশভূষার দিকে চেয়ে আমি কেমন হয়ে গিয়েছিলাম। পূর্ণবাবুকে এ বেশে দেখতে আমি অভ্যস্ত নই, আমার কাছে সুতীর ময়লা-চিট্ সোয়েটার ও সবুজ আলোয়ান গায়ে পূর্ণবাবু বেশী বাস্তব,—তা-ছাড়া চুয়ান্ন-পঞ্চান্ন বছরের বৃদ্ধের এ কি বেশ!

কি ব্যাপারটা ঘটেচে তা অবশ্য পূর্ণবাবু বলবার আগেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

জিনিসপত্র গুছিয়ে পূর্ণবাবু ওয়েটিং রুমে ঢুকলেন; তিনি সাউথ বিহার লাইনের গাড়িতে যাবেন। গাড়ির এখনও ঘণ্টা-দুই দেরি। একজন দারোয়ানকে ডেকে বললেন—ভুপাল সিং, এখানে ভাল সিগারেট পাওয়া যায় কিনা দেখে এস—নইলে কাঁচি নিয়ে এস এক বাক্স—

আমায় বললেন—ওঃ, অনেক দিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা। আর বলেন কেন, বিষয় থাকলেই হাঙ্গামা আছে। সামনে আসচে জানুয়ারী কিস্তি—তহশীলদার বেটা এখনও এক পয়সা পাঠায় নি, লিখেচে এবার নাকি কলাই ফসল সুবিধে হয় নি। তাই নিজে যাচ্ছি মহালে, মাসখানেক থাকবো। গাড়িটা এখানে আসে কটায়? ভাল কথা, এখানে টাইমটেবেল কিনতে পাওয়া যাবে? কিনতে ভুল হয়ে গেল হাওড়ায়—

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার পিসিমা?

দারোয়ান সিগারেট নিয়ে এল। পূর্ণবাবু একটা সরু ও সুদীর্ঘ হোল্ডার বার করলেন, আমার দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বললেন, আসুন।

তারপর সিগারেট ধরিয়ে আরামে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—পিসিমা মারা গিয়েচেন আর-বছর কার্ত্তিক মাসে। তারপর থেকেই বিষয়-আশয়ের ঝঞ্ঝাটে পড়েচি—নিজে না দেখলে কি জমিদারী টেকে? আর এই বয়সে ছুটোছুটি ক'রে পারি নে, একটা ভাল কাজ জানা লোকের সন্ধান দিতে পারেন রামরতনবাবু? টাকা-চল্লিশ মাইনে দেব, খাবে থাকবে—

ওয়েটিং রুমে বসে পূর্ণবাবু দু-বোতল লেমনেড খেলেন এই শীতকালে। একবার দারোয়ানকে দিয়ে গরম জিলিপী আনালেন দোকান থেকে, একবার নিমকি বিস্কুট আনালেন। আর একবার নিজে স্টেশনের বাইরের দোকান থেকে এক ডজন কমলালেবু কিনে আনলেন। আমায় প্রতিবারেই খাওয়ানোর জন্য পীড়াপীড়ি করলেন, কিন্তু আমার শরীর খারাপ, খেতে একেবারেই পারি নে, সে কথা জানিয়ে ক্ষমা চাইলাম। একটু পরেই

পূর্ণবাবুর ট্রেন এসে পড়ল।

দিন পনের কুড়ি পরে আবার বেড়াতে গিয়েচি স্টেশনে। সেদিন শীত খুব পড়েচে, বেশ জ্যোৎস্না, রাত আটটার কম নয়। স্টেশনের রাস্তা যেখানে ঠেকেছে সেখানে চপকাটলেট চায়ের দোকান থেকে কে আমার নাম ধ'রে ডাকলে—ও রামরতনবাবু—এই যে—এদিকে—ফিরে চেয়ে দেখি পূর্ণবাবু একটা কোণে টেবিলে বসে। পূর্ণবাবুর মাথায় একটা পশমের কানঢাকা টুপি, শালের কম্ফর্টার গলায় জড়ানো, হাতে দস্তানা। আমায় বললেন—আসুন, বসুন—কিছু খাওয়া যাক। আজ ফিরে এলাম মহাল থেকে—এই রাতের গাড়িতে ফিরব কলকাতায়—কিছু খাবেন না ?···না, না, খেতেই হবে কিন্তু, সেদিন তো কিছু খেলেন না—এই বয়, ইধার আও—

আমাকে জোর ক'রে পূর্ণবাবু চেয়ারে বসালেন। তারপর তাঁর নিজের জন্যে যা খাবার দিলে, তা দেখে আমার তো হৃৎকম্প উপস্থিত হ'ল। এত খাবেন কি করে পূর্ণবাবু এই বয়সে ? আর একটা অতি বাজে দোকানে, খানআষ্টেক চপ্, খানচারেক কাটলেট, এক প্লেট মাংস, পাঁউরুটি, ডিমের মামলেট, পুডিং, কেক, চা—তিনি কিছু বাদ দিলেন না। আমাকে দেখিয়ে বল্লেন—এই, বাবুকো ওয়াস্তে এক প্লেট মাটন্ আউর তিন্ পিস—

আমি সবিনয়ে বললাম—আমার শরীর তো জানেন পূর্ণবাবু, ওসব কিছু আমি—

—আরে, তা হোক্, শরীর শরীর করলে কি চলে। খান্ খান্—মাংসটা বেশ করেছে—কল্কাতায় মাংস রাঁধতে জানে না মশাই রেস্টোরেণ্ট—আমি ঝাল পছন্দ করি, কল্কাতায় শুধু মিষ্টি—খেয়ে দেখুন মাংসটা—কাট্লেটেও এরা কাঁচালঙ্কা-বাটা দিয়েচে—ভারি চমৎকার খেতে—এই বয়, আউর দুটো কাটলেট—

কথাটা শেষ হবার আগেই তাঁর বেজায় কাশির বেগ হ'ল—কাশতে কাশতে দম আটকে যায় আর কি !

একটু সাম্লে বললেন—বড্ড ঠাণ্ডা লেগেছে মহালে—সেই জন্যে বেশ একটু গরম চা—চপ খেয়ে দেখবেন ? ভারি চমৎকার চপ করেছে ! এই বয়,—

আমি কথাটা মুখ ফুটে বল্লাম—পূর্ণবাবু, আপনার শরীরে এসব খাওয়া উচিত নয়—আর এ ধরণের দোকান তো খুব ভাল নয় ! চা বরং এক কাপ খান, কিন্তু এত—এগুলো খেলে—

পূর্ণবাবু হেসে উড়িয়ে দিলেন—খাবো না বলেন কি রামরতনবাবু, খাবার জন্যেই সব। শরীরকে ভয় করলেই ভয়, ওসব ভাবলে কি আর—আপনিও যেমন।

রেস্টোরেণ্ট থেকে বার হয়ে এসে আমায় নীচু স্বরে বললেন—কিছু মনে করবেন না রামরতনবাবু, একসঙ্গে অনেকদিন কাজ করেছি এক জায়গায়। এখানে কোন ভাল বাঈজীর বাড়ি-টাড়ি জানা আছে ? থাকে তো চলুন না আজ রাতটা—শুনেছি পশ্চিমে নাকি ভাল ভাল—কলকাতায় না হয় আজ না-ই গেলাম—

আমি বুঝিয়ে বল্লাম, পশ্চিমের যে সব জায়গায় ভাল বাঈজী থাকে, গয়া সে তালিকায় পড়ে না। বিহারের কোথাও নয়। কাশী, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী ওদিকেই সত্যিকার বাঈজী বলতে যা বোঝায়, তা আছে।

পূর্ণবাবু বললেন—পাটনাতে নেই ?

—আমার তাই মনে হয়।

—এদিকে আর কোথাও নেই ? না হয় এম্নি আর কোথাও—

—কোথাও কিছু নেই। আমি ঠিক জানি।

পূর্ণবাবু ওয়েটিং-রুমে ঢুকে আমায় বসতে বললেন। পূর্ণবাবুকে আরও বেশী বৃদ্ধ

দেখাচ্ছিল। আমি তাঁর বাড়িতে কে কেমন আছে জিজ্ঞেস করলাম। থাইসিসের রোগী সেই মেয়েটিকে বাড়িতে রেখেই চিকিৎসা করাচ্ছেন, বড় ছেলেটি বাপের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েচে আজ বছর দুই—সম্পত্তি পাবার আগেই। কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে তার খোঁজ করেচেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এসব গল্প শুনলাম বসে বসে। পূর্ণবাবু গল্পের মধ্যে আরও দু-বার চা আনিয়ে খেলেন, ব্যাগ খুলে ওষুধ খেলেন তিন-চার রকম, কোনটা কবিরাজী, কোনটা বিলেতি পেটেন্ট ওষুধ। দু প্যাকেট সিগারেট শেষ করলেন।

দেখলাম পূর্ণবাবু চিরবঞ্চিত জীবনের সর্ব্বগ্রাসী তৃষ্ণার ভোগলালসা মেটাতে উদ্যত হয়েচেন বিকারের রোগীর মত। চারিধারে ঘনায়মান মৃত্যুর ছায়ার মধ্যে স্বল্পতৈল জীবন-দীপের আলো যত সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর জ্যোতিঃবৃত্তের সৃষ্টি করচে, উনি ততই উন্মাদ আগ্রহে যেখানে যা পাবার আছে পেতে চান—যা নেবার আছে নিতে চান। জীবনে ওঁর যখন সুবৃষ্টি এল, জল না পেয়ে তখন তা আধ-মরা। সেই এল—কিন্তু এত দেরি করে ফেললে!

* * * *

আমায় বললেন—একটু কিছু বাড়াবাড়ি খেলেই, ওষুধ খেয়ে রসিখ। আর হজম করতে পারি নে এখন। আমাদের পাড়ায় আছে গদাধর কবরেজ…খুব ভাল চিকিচ্ছে করে, এক-হপ্তার ওষুধ নেয় দু-টাকা—তারই কাছে ভাবছি এবার—। পূর্ণবাবুর সেই নিমপাতা বাটা মেখে ভাত খাওয়ার কথা আমার মনে পড়ল, আরও মনে পড়ল পূর্ণবাবুর প্রথম জীবনের শৌখিনতার কথা। এখন তিনি বুঝেছেন আর বেশী দিন বাঁচবেন না, চিরবঞ্চিত জীবনের সর্ব্বগ্রাসী তৃষ্ণায় ভোগলালসা তাঁর—বিকারের রোগীর মত অসংযত, অবুঝ।

শান্তিরামকে গল্পটা বলব ভেবেছিলাম, কিন্তু সে দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্চে।

কনে দেখা

সকাল বেলা বৈঠকখানার গাছপালার হাটে ঘুরছিলাম।

গত মাসে হাটে কতকগুলি গোলাপের কলম কিনেছিলাম, তার মধ্যে বেশীর ভাগ পোকা লেগে নষ্ট হয়ে গেছে। নার্সারির লোক আমার জানাশুনো, তাদের বললাম,—কি রকম কলম দিয়েছিলে হে! সে যে টবে বসাতে দেরি সইল না! তা ছাড়া আবদুল কাদের বলে বিক্রী করলে, এখন সবাই বলছে আবদুল কাদের নয় ও, অত্যন্ত মামুলি জাতের টী রোজ। ব্যাপার কি তোমাদের?

নার্সারির পুরোনো লোকটাই আজ আছে। সেদিন এ ছিল না, তাই ঠকেছিলাম। এই লোকটা খুব অপ্রতিভ হলো। বল্লে—বাবু, এই হয়েছে কি জানেন? বাগানের মালিকেরা আজকাল আছেন কল্‌কাতায়। আমি একা সব দিক দেখতে পারি নে, ঠিকে উড়ে মালী নিয়ে হয়েছে কাজ। তাদের বিশ্বাস কল্লে চলে না, আবার না কল্লেও চলে না। আমি তো সর্বদিন হাট সামলাতে পারি নে বাবু! ওদেরই ধরে পাঠাতে হয়, আমি বুনেছিলাম টী রোজ তিনডজন, আমি তো তার কাছ থেকে টী রোজেরই দাম নেবো? এখানে এসে যদি আবদুল কাদের বলে বিক্রী করে তো তারই লাভ। বাড়্‌তি পয়সা আমার নয়, তার। বুঝলেন না বাবু?

বাজার খুব জেঁকেছে। বর্ষার নওয়ালির মুখ, নানা ধরনের গাছের আমদানী হয়েচে।

বড় বড় বিলিতি দোপাটি, মতিয়া, বেল, অতসীলতা, রাস্তার ধারের সারিতে নানা ধরনের পাম্, ছোট ছোট পাম্ থেকে ফ্যান পাম্ ও বড় টবে ভাল এরিকা পামও আছে। সূর্য্যমুখীর যদিও এ সময় নয়, কিন্তু সূর্যমুখী এসেছে অনেক। তাছাড়া কল্‌কাতার রাস্তায় অনভিজ্ঞ লোকদের কাছে অর্কিড্ বলে যা বিক্রী হয়, সেই নারকোলের ছোব্ড়া ও তার-বাঁধা ফার্ন ও রঙীন আগাছা যথেষ্ট বিক্রী হচ্ছে। লোকের ভিড়ও বেশ।

হঠাৎ দেখি আমার অনেকদিন আগেকার পুরোনো রুমমেট্ হিমাংশু। ৭।৩ নং কানাই সরকারের লেনে মেসে তার সঙ্গে অনেক দিন একঘরে কাটিয়েছি। সে আজ সাত আট বছর আগেকার কথা—তারপর সে কলকাতা ছেড়ে চলে যায়। আর তার কোনো খবর রাখি নি আজকাল।

—এই যে হিমাংশু? চিনতে পারো?

হিমাংশু চম্‌কে পেছন ফিরে চাইলে এবং কয়েক সেকেন্ড সবিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে থাক্‌বার পরে সে আমায় চিন্‌লে। হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল হাসিমুখে।

—আরে জগদীশবাবু যে! তারপর? ওঃ আপনার সঙ্গে একযুগ পরে—ওঃ! তারপর আছেন কেমন বলুন! ·

আমি বল্লাম—তোমার গাছপালার শখ দেখচি আছে হিমাংশু, সেই মনে আছে দুজনে কতদিন এখানে হাটে আসতাম?

হিমাংশু হেসে বল্লে—তা আর মনে নেই?—সেই আপনি দার্জিলিংয়ের লিলি কিন্‌লেন? আপনার তো খুব শখ ছিল লিলির। এখনও আছে? আসুন, আসুন, অন্য কোথাও গিয়ে একটু বসি। ও মেসটার কোনো খবর আর রাখেন নাকি? আচ্ছা সেই অনাদিবাবু কোথায় গেল খোঁজ রাখেন?· আর সেই যে মেয়েটি স্টোভ জ্বালাতে গিয়ে গা হাত পুড়িয়ে ফেল্লে মনে আছে? তার বিয়ে হয়েচে?

দুজনে গিয়ে একটা চায়ের দোকানে বসলাম। এ গল্প ও গল্প—নানা পুরোনো দিনের কথা। তার কথাবার্ত্তার ভাবে বুঝলাম সে কলকাতায় এসেচে অনেক দিন পরে।

জিজ্ঞেস কল্লাম—আজকাল কোথায় থাকো হিমাংশু?

সে বল্লে—বি. এন. আর-এর একটি স্টেশনে বুকিং-ক্লার্ক ছিলাম। টাটানগরের ওদিকে, কিছুদিন থাকবার পর দেখলাম জায়গাটার মাটিতে ভারী চমৎকার ফুল জন্মায়, জমিও সস্তা। সেখানেই এখন আছি—ফুলের বাগান করেচি—তুমি তো জানো বাগানের শখ আমার চিরকাল। কিছু চাষবাসের জমি নিয়েচি তাতেই চলে যায়। কিন্তু সে-সব কথা থাক—আজ এখন একটা গল্প করি শোনো। গল্পের মত শোনাবে, কিন্তু আসলে সত্যি ঘটনা। আর আশ্চর্য্য এই, দশ বছর আগে যখন তোমাদের মেসে থাকতাম তখন এ গল্পের শুরু, এবং এর সমাপ্তি ঘটেছে গতকাল। আমি বোল্লাম—ব্যাপার কি, তোমার কথা শুনে মনে হচ্চে নিশ্চয়ই প্রেমের কাহিনী জড়ানো আছে এর সঙ্গে। বলো বলো—। সে বোল্লে—না, সে-সব নয়। অন্য এক ব্যাপার, কিন্তু আমার পক্ষে কোনোও প্রণয়কাহিনীর চেয়ে তা কম মধুর নয়। শোনো বলি। আচ্ছা তোমার মনে আছে—মেসে থাকতে আমি একটা এরিকা পাম্ কিনেছিলাম, আমাদের ঘরের সামনে টবে বসানো ছিল, মনে আছে? আচ্ছা তা হোলে শোনো।

তারপর আধঘণ্টা বসে হিমাংশু তার গল্পটা বলে গেল। আমরা আরও দুবার চা খেলাম, একবাক্স সিগারেট পোড়ালাম। বৌবাজারের মোড়ে গির্জ্জার ঘড়িটায় সাড়ে নটা যখন বাজ্‌ল, তখন হিমাংশু গল্প শেষ করে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

তার গল্পটা আমি আমার নিজের কথায় বল্‌বো, কেননা হিমাংশু সম্বন্ধে কিছু জানা

থাকা দরকার,—গল্পটা ঠিক বুঝতে হোলে, সেটা আমাকে গোড়াতেই বলে দিতে হবে।

হিমাংশু যখন আমার সঙ্গে থাকতো, তখন তার চালচলন দেখলে মনে হবার কথা যে, সে বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। সে যে আহার-বিহারে বা বেশভূষায় খুব বেশী শৌখীন ছিল তা নয়, তার শখ ছিল নানা ধরনের এবং এই শখের পেছনে সে পয়সা ব্যয় করতো নিতান্ত বে-আন্দাজী।

তার প্রধান শখ ছিল গাছপালা ও ফুলের। আমার ফুলের শখটা হিমাংশুর কাছ থেকেই পাওয়া একথা বলতে আমার কোনো লজ্জা নেই। কারণ যত তুচ্ছ, যত অকিঞ্চিৎকর জিনিস হয়েই হোক না কেন, যেখানে সত্যি কোনো আগ্রহ বা ভালবাসার সন্ধান পাওয়া যায়—তাকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না।

হিমাংশুর গাছপালার ওপর ভালবাসা ছিল সত্যিকার জিনিস। সে ভালো খেতো না, ভাল কাপড় জামা কখনো দেখি নি তার গায়ে—কিন্তু এ ধরনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তার কাম্যও ছিল না। তার পয়সার সচ্ছলতা ছিল না কখনো, টুইশানি করে দিন চালাতো, তাও আবার সব সময় জুটতো না, তখন বন্ধুবান্ধবদের কাছে ধার করতো। যখন ধারও মিলতো না তখন দিনকতক চন্দননগরে এক মাসীর বাড়ি গিয়ে মাস-খানেক, মাস-দুই কাটিয়ে আসতো। কিন্তু পয়সা হাতে হলে কাপড় জামা না কিনুক্, খাওয়া-দাওয়ায় ব্যয় করুক্ না করুক্, ভালো গাছপালা দেখলে কিনবেই।

মেসে আমাদের ঘরের সামনে ছোট একটা অপরিসর বারান্দাতে সে তার গাছপালার টবগুলো রাখতো। গোলাপের ওপর তার তত ঝোঁক ছিল না, সে ভালবাসতো নানা জাতীয় পাম্—বিশেষ করে বড় জাতীয় পাম্—আর ভালবাসতো দেশী-বিদেশী লতা—উইস্টারিয়া, অতসী, মাধবীলতা, বোগেন্‌ভিলিয়া ইত্যাদি। কত পয়সাই যে এদের পিছনে খরচ করেছে!

সকালে উঠে ওর কাজই ছিল গাছের পাট কর্ত্তে বসা। শুক্‌নো ডালপালা ভেঙ্গে দিচ্ছে, গাছ ছেঁটে দিচ্ছে, এ টবের মাটি ও টবে ঢালুচে। পুরোনো টব ফেলে দিয়ে নতুন টবে গাছ বসাচ্চে, মাটি বদ্‌লাচ্চে! আবার মাঝে মাঝে মাটির সঙ্গে নানা রকমের সার মিশিয়ে পরীক্ষা কর্ত্ত। এ সব সম্বন্ধে ইংরিজি বাংলা নানা বই কিনতো—একবার কি একটা উপায়ে ও একই লতায় নীলকলমী ও সাদাকলমী ফোটালে। ভায়োলেটের ছিট্ ছিট্ দেওয়া অতসী অনেক কষ্টে তৈরী করেছিল। বেগুনী রং-এর ক্রাইসেন্‌থিমামের জন্যে অনেক পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করেছিল, সুবিধে হয় নি।

তাছাড়া ও ধরনের মানুষ আমি খুব বেশী দেখি নি, যে একটা খেয়াল বা শখের পেছনে সমস্ত মন প্রাণ ঢেলে দিতে পারে। মানুষের মনের শক্তির সে একটা বড় পরিচয়। হিমাংশু বল্‌তো—সেদিন একটা পাড়াগাঁয়ে একজনদের বাড়ি গিয়েচি বুঝলেন?···তাদের গোলার কাছে তিন বছরের পুরোনো নারকেল গাছ হয়ে আছে। সে যে কি সুন্দর দেখাচ্চে! একটা প্রকাণ্ড তাজা, সতেজ, সবুজ পাম্। সমুদ্রের ধারে নাকি নারকেলের বন আছে—পাম্-এর সৌন্দর্য্য দেখতে হোলে সেখানে যেতে হয়।

হিমাংশু প্রায়ই পাম্ আর অর্কিড্ দেখতে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে যেতো। আর এসে তাদের উচ্ছ্বসিত বর্ণনা করতো।

একবার সে একটা এরিকা পাম্ কিনে আনলে। খুব ছোট নয়, মাঝারি গোছের মাটির টবে বসানো—কিন্তু এমন সুন্দর, এমন সতেজ গাছ বাজারে সাধারণতঃ দেখা যায় না। সে সন্ধান করে করে দমদমায় কোন বাগানের মালীকে ঘুষ দিয়ে সেখান থেকে কেনে। কল্‌কাতার মেসের বারান্দায় গাছ বাঁচিয়ে রাখা যে কত শক্ত কাজ, যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা সহজেই বুঝতে পারবেন। গোবি মরুভূমিতে গাছ বাঁচিয়ে রাখা এর চেয়ে সহজ।

একবার সে আর আমি দিন-কুড়ি-বাইশের জন্যে কল্‌কাতার বাইরে যাই। চাকরকে আগাম পয়সা পর্য্যন্ত হিমাংশু দিয়ে গেল গাছে জল দেবার জন্যে, ফিরে এসে দেখা গেল ছ'সাতটা ফ্যান পামু শুকিয়ে পাখা হয়ে গেছে।

সকালে বিকালে হিমাংশু বাল্‌তি বাল্‌তি জল টান্‌তো একতলা থেকে তেতলায় টবে দেবার জন্যে। গাছ বাড়চে না কেন এর কারণ অনুসন্ধান কর্ত্তে তার উদ্বেগের অন্ত ছিল না। অন্য সব গাছের চেয়ে কিন্তু ওই এরিকা পামু গাছটার ওপর তার মায়া ছিল বেশী, তার খাতা ছিল—তাতে লেখা থাক্‌তো কোনু কোনু মাসে কত তারিখে গাছটা নূতন ডাল ছাড়লে। গাছটাও হয়ে পড়ল প্রকান্ড, মাটির টব বদলে তাকে পিপে-কাটা কাঠের টবে বসাতে হোল। মেসের বারান্দা থেকে নামিয়ে একতলায় উঠোনে বসাতে হোল। এ সবে লাগলো বছর পাঁচ ছয়।

সেবার বাড়িওয়ালার সঙ্গে বনিবনাও না হোতে আমাদের মেসু ভেঙে গেল।

দুজনে আর একত্র থাকবার সুবিধে হোল না, আমি চলে গেলাম ভবানীপুর। হিমাংশু গিয়ে উঠ্‌ল শ্যামবাজারে আর একটা মেসে। একদিন আমায় এসে বিমর্ষ মুখে বল্লে—কি করি জগদীশবাবু, ও মেসে আমার টবগুলো রাখ্‌বার জায়গা হচ্ছে না—অন্য অন্য টবের না হয় কিনারা কর্ত্তে পারি, কিন্তু সেই এরিকা পামুটা সেখানে রাখা একেবারে অসম্ভব। একটা পরামর্শ দিতে পারেন? অনেকগুলো মেসু দেখ্‌লাম, অত বড় গাছ রাখবার সুবিধে কোথাও হয় না। আর টানাটানির খরচাও বড় বেশী।

আমি তাকে কোনো পরামর্শ দিতে পারি নি বা তারপর থেকে আমার সঙ্গে আজকার দিনটি ছাড়া আর কোনদিন দেখাও হয় নি।

বাকীটা হিমাংশুর মুখে আজই শুনেচি।

কোনো উপায় না দেখে হিমাংশু শেষে কোনু বন্ধুর পরামর্শে ধর্ম্মতলার এক নীলামওয়ালার কাছে এরিকা পামের টবটা রেখে দেয়। রোজ একবার করে গিয়ে দেখে আস্‌তো, খদ্দের পাওয়া গেল কিনা। শুধু যে খদ্দেরের সন্ধানে যেতো তা নয়, ওটা তার একটা ওজুহাত মাত্র—আসলে যেত গাছটা দেখাতে।

হিমাংশু কিন্তু নিজের কাছে সেটা স্বীকার কর্ত্তে চাইত না। দু'দিন পরে যা পরের হয়ে যাবে, তার জন্যে মায়া কিসের?

তবুও একদিন যখন গিয়ে দেখ্‌লে, গাছটার সে নধর, সতেজ শ্রী যেন ম্লান হয়ে এসেচে, নীলামওয়ালারা গাছে জল দেয় নি, তেমন যত্ন করে নি—সে লজ্জিত মুখে দোকানের মালিক একজন ফিরিঙ্গি ছোক্‌রাকে বল্লে—গাছটার তেমন তেজ নেই—এই গরমে জল না পেলে, দেখ্‌তে ভাল না দেখালে বিক্রী হবে কেন? জল কোথায় আছে আমি নিজে না হয়—কারণ দু'পয়সা আসে, আমারই তো আসবে—

তারপর থেকে যেন পয়সার জন্যেই করচে, এই অছিলায় রোজ বিকেলে নীলামওয়ালার দোকানে গিয়ে গাছে জল দিত। এত একদিন দেখ্‌তো দোকানের চাকরেরা আগে থেকেই জল দিয়েচে।

রোজ নীলামের ডাকের সময় সে সেখানে উপস্থিত থাকতো। তার গাছটার দিকে কেউ চেয়েও দেখে না—লোকে চেয়ার, টেবিল, সোফা, আলমারী কিনচে, ভাঙা পুরোনো ক্লক্‌ ঘড়ি পর্য্যন্ত বিক্রী হয়ে গেল, কিন্তু গাছের শখ খুব বেশী লোকের নেই, গাছটা আর বিক্রী হয় না। একদিন নীলামওয়ালা বল্লে—বাবু, গাছটার তো সুবিধে হচ্ছে না, তুমি নিয়ে যাবে ফেরত?

কিন্তু ফেরত নিয়ে গিয়ে তার রাখ্‌বার জায়গা নেই, থাক্‌লে এখানে সে বিক্রীর জন্যে

দিয়েই বা যাবে কেন ? সে সময় তার অত্যন্ত খারাপ সময় যাচ্চে, চাকুরির চেষ্টায় আকাশ, পাতাল হাতড়ে কোথাও কিছু মিলচে না—নিজের থাকবার জায়গা নেই তো পিপে-কাটা কাঠের টবে বসানো অত বড় গাছ রাখে কোথায় ?

মাসখানেক পরে হিমাংশুর অবস্থা এমন হোল যে আর কল্‌কাতায় থাকাই চলে না। কল্‌কাতার বাইরে যাবার আগে গাছটার একটা কিনারা হয়ে গেলেও মনে শান্তি পেত। কিন্তু আজও যা, কালও তাই—নীলামওয়ালাকে কমিশনের রেট্ আরও বাড়িয়ে দিতে হয়েচে গাছটা রাখ্‌বার জন্যে, নৈলে সে দোকানে রাখ্‌তে চায় না। কিন্তু হিমাংশুর দুর্ভাবনা এই যে, ও কল্‌কাতা ছেড়ে চলে গেলে গাছটার আর যত্ন হবে না, নীলামওয়ালার দায় পড়েচে, কোথাকার একটা এরিকা পাম্ গাছ বাঁচলো কি মোলো—অত তদারক করবার তার গরজ নেই।

কিন্তু শেষে বাধ্য হয়ে কল্‌কাতা ছাড়তে হোল হিমাংশুকে।

অনেকদিন পরে সে আবার এল কল্‌কাতায়। নীলামওয়ালার দোকানে বিকেলে গেল গাছ দেখ্‌তে। গাছটা নেই, বিক্রী হয়ে গিয়েচে সাড়ে সাত টাকায়। কমিশন বাদ দিয়ে হিমাংশুর বিশেষ কিছু রইল না। কিন্তু টাকার জন্যে ওর তত দুঃখ নেই, এত দিন পরে সত্যি সত্যিই গাছটা পরের হয়ে গেল।

তার প্রবল আগ্রহ হোল গাছটা সে দেখে আসে। নীলামওয়ালা সাহেব প্রথমে ঠিকানা দিতে রাজী নয়, নানা আপত্তি তুল্‌লে—বহু কষ্টে তাকে বুঝিয়ে ঠিকানা যোগাড় করলে। সার্কুলার রোডের এক সাহেবের বাড়িতে গাছটা বিক্রী হয়েছে, হিমাংশু পরদিন সকালে সেখানে গেল। সার্কুলার রোডের ধারেই বাড়ি, ছোট গেট্‌ওয়ালা কম্পাউন্ড, উঠোনের একধারে একটা বাতাবী নেবু গাছ, গেটের কাছে, একটা চারা পাকুড় গাছ। সাহেবের গাছ-পালার শখ আছে—পাম্ অনেক রকম রেখেছে, তার মধ্যে ওর পাম্‌টাই সকলের বড়। হিমাংশু বলে, সে হাজারটা পামের মধ্যে নিজেরটা চিনে নিতে পারে। কম্পাউণ্ডে ঢুকবার দরকার হোল না, রাস্তার ফুটপাত থেকেই বেশ দেখা যায়, বারান্দায় উঠ্‌বার পৈঠার ধারেই তার পিপে-কাটা টবসুদ্ধ পাম্‌গাছটা বসানো রয়েচে। গাছের চেহারা ভালো—তবে তার কাছে থাকবার সময় আরও বেশী সতেজ, সবুজ ছিল।

হিমাংশুর মনে পড়্‌ল এই গাছটার কবে কোন্ ডাল গজালো—তার খাতায় নোট করা থাকতো। ও বলতে পারে প্রত্যেকটি ডালের জন্মকাহিনী—একদিন তাই ওর মনে ভারী কষ্ট হোল, সেদিন দেখ্‌লে সাহেবের মালী নীচের দিকে ডালগুলো সব কেটে দিয়েচে। মালীকে ডাকিয়ে বল্লে—ডালগুলো ওরকম কেটেচ কেন ? মালীটা ভাল মানুষ। বল্লে—আমি কাটি নি বাবু, সাহেব বলে দিল নীচের ডাল না কাট্‌লে ওপরের কচি ডাল জোর পাবে না। বল্লে, টবের গাছ না হোলে ও ডালগুলো আপনা থেকেই ঝরে পড়ে যেতো।

হিমাংশু বল্লে—তোমার সাহেব কিছু জানে না। যা ঝরে যাবার তা তো গিয়েচে, অত বড় গুঁড়িটা বার হয়েচে তবে কি করে ? আর ভেঙো না।

বছর তিন চার কেটে গেল। হিমাংশু গাছের কথা ভুলেচে। সে গালুডি না ঘাটশিলা ওদিকে কোথাও জমি নিয়ে বসবাস করে ফেলেচে ইতিমধ্যে।

গাছপালার মধ্যে দিয়েই ভগবান্ তার উপজীবিকার উপায় করে দিলেন। এখানে হিমাংশু ফুলের চাষ আরম্ভ করে দিলে সুবর্ণরেখার তীরে। মাটির দেওয়াল তুলে খড়ের বাংলো বাঁধ্‌লে। একদিকে দূরে অনুচ্চ পাহাড়, নিকটে, দূরে শালবন, কাঁকর মাটির লাল রাস্তা, অপূর্ব সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত।

ফুলের চাষে সে উন্নতি করে ফেল্লে খুব শীগ্‌গীর। ফুলের চেয়েও বেশী উন্নতি করেচে চীনা ঘাস ও ল্যাভেন্ডার ঘাসের চাষে। এই জীবনই তার চিরদিনের কাম্য ছিল, ও-জায়গা

ছাড়া শহরে আসতে ইচ্ছেও হোত না। বছর দুই কাটলো আরও, ইতিমধ্যেই সে বিবাহ করেচে, সস্ত্রীক ওখানেই থাকে।

আজ তিন দিন হোল সে কলকাতায় এসেচে প্রায় পাঁচ ছ'বছর পরে।

কাজকর্ম্ম সেরে কেমন একটা ইচ্ছে হোল, ভাবলে—দেখি তো সেই সাহেবের বাড়িতে আমার সেই গাছটা আছে কি না?

বাড়িটা চিনে নিতে কষ্ট হোল না কিন্তু অবাক্ হয়ে গেল—বাড়ির সে শ্রী আর নেই। বাড়িটাতে বোধ হয় মানুষ বাস করে নি বছর দুই—কি তার বেশী। উঠোনে বন হয়ে গিয়েচে। পৈঠাগুলো ভাঙা, বাতাবী নেবু গাছে মাকড়সার জাল, বারান্দার রেলিংগুলো খসে পড়েচে। তার সেই এরিকা পামটা আছে, কিন্তু কি চেহারাই হয়েচে। আরও বড় হয়েচে বটে কিন্তু সে তেজ নেই, শ্রী নেই, নীচের ডালগুলো শুকিয়ে পাখা হয়ে আছে, ধুলো আর মাকড়সার জালে ভর্ত্তি। যায় যায় অবস্থা। টবও বদ্‌লানো হয় নি আর।

হিমাংশু বল্লে—ভাই সত্যি সত্যি তোমায় বল্‌চি, গাছটা যেন আমায় চিন্‌তে পার্‌লে। আমার মনে হলো ও যেন বল্‌চে আমায় এখান থেকে নিয়ে যাও, আমি তোমার কাছে গেলে হয় তো এখনও বাঁচ্‌বো! ছেড়ে যেও না এবার। আমায় বাঁচাও।

রাত্রে হিমাংশুর ভালো ঘুম হোল না। আবার সার্কুলার রোডে গেল, সন্ধান নিয়ে জান্‌লে সাহেব মারা গিয়েচে। বুড়ী মেম আছে ইলিয়ট রোডে, পয়সার অভাবে বাড়ি সারাতে পারে না, তাই ভাড়াও হচ্চে না। এই বাজারে ভাঙা বাড়ি কেনার খদ্দেরও নেই।

মেমকে টাকা দিয়ে গাছটা ও কিনে নিলে। এখনও সার্কুলার রোডের বাড়িটাতেই আছে, কাল ও গালুডিতে ফিরে যাবে, গাছটাকে নিয়ে যাচ্চে সঙ্গে করে।

বিদায় নেবার সময় হিমাংশু বল্লে—বৈঠকখানা বাজারে এসেছিলাম কেন জানো? আমার সাধ হয়েচে ওর বিয়ে দেবো। তাই একটা ছোটখাটো, অল্প বয়সের, দেখতে ভালো পাম্ খুঁজছিলাম। হি—হি—পাগল নয় হে পাগল নয়, ভালবাসার জিনিস হোত তো বুঝতে।

সার্থকতা

সকাল বেলা। রূপগঞ্জের ভাঙ্গা কালীবাড়ির সামনে বাঁধানো বটতলায় নিয়মিত আড্ডা বসেচে। এখানে প্রথমেই বলা উচিত, রূপগঞ্জ কোনো ব্যবসার জায়গা নয়,—কোনো কালে ছিল যে, এমন কোনো প্রমাণও নেই। রূপগঞ্জ নিতান্তই সাধারণ ছোট পাড়াগাঁ—দু'দশ ঘর ব্রাহ্মণের বাস; এ ছাড়া কামার, কুমোর, জেলে ইত্যাদি অন্য জাত আছে। গঞ্জ থাকা তো দূরের কথা, গ্রামে একখানা মাত্র মুদীখানার দোকান। কিন্তু লোকে বারোমাস ধার নিয়ে নিয়ে দোকানের অবস্থা এমন করে তুলেছে যে, দোকানের মালিক দোকান তুলে দিতে পারলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে—অথচ সে বেশ জানে এবং তার খরিদ্দাররাও জানে যে দোকান একবার উঠে গেলে বাকীবকেয়া আদায় হবার আর কোনো আশাই থাকবে না। রূপগঞ্জে সবাই গরীব, পরস্পরকে ঠকিয়ে কোনো রকমে তারা দিন কাটিয়ে চলেচে।

কালীবাড়ির বটতলায় বসে এই সব কথাই হচ্ছিল—রোজই হয়, আজ ত্রিশবছর ধরে হয়ে আসচে। এর আগে কি হয়েচে না হয়েচে তার হিসেব নেই, কেননা সে-সব লোক এখন বেঁচে নেই। এ-গ্রামে খুব বুড়ো লোক বড় একটা দেখা যায় না—বিশেষ করে ভদ্রলোকের মধ্যে। তার আগেই তাদের রূপগঞ্জের কালীবাড়ির আড্ডার মায়া কাটাতে হয়, পৈতৃক

আমন ধানের জমি ও আমবাগানের মায়া কাটাতে হয়। বিশ বছর ধরে গোপনে মনের কোণে পোষণ-করা কাশীবাসের ইচ্ছাও পরিত্যাগ করতে হয়।

পঞ্চু মুখুয্যে তাই দুঃখ করে বলছিলেন ঃ কি জান হারাণ ভায়া ! এই জায়গা-জমিগুলোই হয়েছে কাল—নইলে এ-গাঁয়ের মুখে ঝাঁটা মেরে কোন্‌দিন বেরুতাম। এই আমাদের দুঃখু ! বিদেশে যারা বেরিয়েচে, তারা বেশ দু'পয়সা—এই ধরো না কেন, সরুলের দীনু ভট্‌চাযার ছেলে—চেনো তাকে ? আরে, অই যে রোগাপানা ছোক্‌রা, বোসেদের বাড়ি কালীপুজো দেখতে আস্‌তো—মনে নেই ? সে লেখাপড়া তো শিখলে না, একবার তো ম্যালেরিয়ায় মর-মর হোল, তারপর তার মামারা তাকে কোথায় যেন নিয়ে গেল। এখন বেশ সেরে উঠেচে, আর সে পিলেরোগা চেহারা নেই। সেদিন শুনলাম রেলে চাক্‌রি পেয়েচে—প'য়ত্রিশ টাকা করে মাইনে। থাকে অই মগরা লাইনের ওদিকে যেন কোথায়। উপযুক্ত ভৌগোলিক জ্ঞানের অভাবে পঞ্চু মুখুয্যে বর্ণনাটাকে বিশদ করে তুলতে পারলেন না।

হারাণ রায় বল্লেন ঃ তোমার সেই চাকরির কি হোল, পঞ্চু ভায়া ?

পঞ্চু মুখুয্যের বয়স পঞ্চাশের ওপর। জীবনে তিনি এ-জেলার গণ্ডী পার হন নি, কিন্তু উঠতি বয়েস থেকেই তাঁর ইচ্ছে, বিদেশে কোথাও তিনি চাকরি পেলে করেন। সুদীর্ঘ ত্রিশ বছরের মধ্যে এ-আশা পূর্ণ হয় নি। গ্রামের সামান্য সম্পত্তির আয়েই সংসার চলে। যে-ভাবে চলে, তাকে চলা বলা যায় না—অন্য জায়গায় হোলে অচল হোতো, রূপগঞ্জ বলেই চল্‌চে।

তিনি মধ্যে বোসেদের বাড়ি 'হিতবাদী' কাগজে দেখেছিলেন, কলকাতার কি একটা আপিসে ষাট টাকা মাইনের গুটি দুই তিন চাকরি খালি আছে—কাজ জানার দরকার হবে না, তারাই শিখিয়ে নেবে। পঞ্চু মুখুয্যে একখানা দরখাস্ত করেছিলেন ; কাল বিকেলে তার উত্তর পেয়েছেন।

হারাণ রায়ের প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চু সেই উত্তরের চিঠিখানা মলিন জীর্ণ কামিজের পকেট থেকে বার করে সকলকে দেখিয়ে ম্লানমুখে বল্লেন ঃ এই তো তারা চিঠি দিয়েচে—কালকে সকালের হাটে পিওন বিলি কল্লে ! কিন্তু পাঁচশো টাকা নগদ জামিন জমা চায়। কোথা থেকে দেবো নগদ পাঁচশো টাকা জমা ? পাঁচটা টাকার সংস্থান নেই। নাঃ, ও-সব আমাদের জন্যে নয় হে—

মধু লাহিড়ী নিজের বাড়ি থেকে তামাক সেজে হুঁকো হাতে নিয়ে বটতলায় এসে পোঁছলেন। সবাই জানে মধু লাহিড়ী সম্প্রতি কিছু টাকা হাতে পেয়েচেন তাঁর শাশুড়ীর মৃত্যুর পরে, গত কার্ত্তিক মাসে। এজন্য মধু লাহিড়ীর ওপর কেউ সন্তুষ্ট নয়, মনে মনে সবাই তাঁকে হিংসে করে।

মধু বয়োজ্যেষ্ঠ হারাণ রায়ের হাতে হুঁকো দিয়ে বল্লেন ঃ কাল রাত্রে এক কাণ্ড হয়েচে আমার বাড়ি, জানো না বোধ হয় ? রান্নাঘরের জানলার পাশে অনেক রাত্তিরে কে একজন দাঁড়িয়ে ছিল—রাম ছাদ থেকে দেখতে পায়। সে বাইরে এসেছিল, ছাদের নীচেই ওপাশে রান্নাঘর। ধপ্‌ধপে জ্যোৎস্না রাত, দেখে যে কালোমত কে একজন জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে। সে ছেলেমানুষ, চেঁচিয়ে উঠতেই আমার স্ত্রীর ঘুম ভেঙেচে। আমারও ঘুম ভেঙেচে। সবাই ছাদে বার হয়ে দেখি, কোথাও কিছু নেই—কিন্তু রান্নাঘরের পেছনে সেওড়াগাছগুলোর মধ্যে যেন কি শব্দ হচ্ছে ! সারা রাত জেগে কাটিয়েচি ! গাঁয়ে বাস করা ভার হোল দেখ্‌চি !

মধু লাহিড়ীর এ-কথায় কেউ সন্তুষ্ট হোল না। কেউ কথাটা বিশ্বাসও করলে না।

সবাই ভাবলে, হাতে টাকা হয়েচে, তাই লোককে জানানো যে আমার বাড়ি চোর যাতায়াত করে রাত্রে—এটা বড়মানুষী দেখানো একরকম।

হারাণ রায় মধুর হাত থেকে হুঁকো নিয়েছিলেন, তিনি চক্ষুলজ্জায় পড়ে বল্লেন: "তুমি আবার বাস করো বাঁশবাগানের মধ্যে। রাত-বেরাত খুব সাবধান থাকবে, কাল পড়েচে বড়ই খারাপ।

মধু লাহিড়ী বল্লেন: উঠে যাবো উঠে যাবো করি, কিন্তু উঠে যাই বা কোথায়? একবার তো ভেবেছিলাম, শ্বশুরবাড়ি বলাগড় গিয়ে বাস করি। কিন্তু সে বেজায় ম্যালেরিয়ার জায়গা—আমাদের এখানকার চেয়েও বেশী। তাই দাদা বারণ কল্লে, দুই ভায়ে যে ক'দিন বেঁচে থাকি, এক জায়গাতেই থাকি, পৈতৃক ভিটেটাতে আলো দি দুজনে। তাই—

পণ্টু মুখুয্যে বল্লেন: না, উঠে যাবে কেন? সবাই যদি উঠে যাবে, গাঁয়ে তবে থাকবে কে? তোমাদের বাড়ির পাশে শ্যামাপদ চাটুয্যেদের ভিটে এখনও পড়ে আছে—তোমরা দেখো নি, আমাদের একটু একটু মনে আছে, শ্যামাপদ চাটুয্যে এখানেই মারা যায়। তার স্ত্রী এখানকার সম্পত্তি বেচে কিনে বাপের বাড়ি চলে গেল, ছ'মাসের ছেলে নিয়ে। অবস্থা ভাল ছিল না, থাকবার মধ্যে ছিল ওই ঘাটের ধারের আমবাগানখানা—এখন মাখন কাকা কিনেচেন। আর কিছু ধানের জমি, তাতে বছর চলতো না। একশো টাকার সম্পত্তি বিক্রী করে ফেল্লে, রাজকৃষ্ট জ্যাঠা কিনলেন, আমার বেশ মনে আছে। তারপর এখন আবার মাখন কাকা কিনে নিয়েচেন রাজকৃষ্ট জ্যাঠার ছেলের কাছ থেকে। তবে ফাঁকি দিয়ে কেনা সম্পত্তি, ওর অপবাদ আছে, ও ভোগে আসে না।

হারাণ রায় এখানে সকলের চেয়ে বয়োবৃদ্ধ। তিনি বল্লেন: অনেকদিন পরে শ্যামাপদর কথাটা উঠলো। শ্যামাপদদা আমাদের চেয়ে দশ পনরো বছরের বড় ছিল। তা'হোলেও একসঙ্গে ছিপে মাছ ধরতে গিয়েছি খাঁদের পুকুরে। আহা, অল্প বয়সে মরে গেল। হ্যাঁ হে, তার সে ছেলেটা বেঁচে আছে কিনা জানো? তার অন্নপ্রাশনে নেমন্তন্ন খেয়ে এসেচি, বেশ মনে আছে। ছেলেদের মুখে ভাত দেওয়ার মাস দুই পরেই শ্যামাপদদা মলো। আহা, সে সব কি আজকের কথা!

পণ্টু বল্লেন: না। তাদের আর কোনো খবরই পাওয়া যায় নি অনেককাল।

মধু লাহিড়ী বল্লেন: কি জানো, একবার এ গাঁ থেকে বেরুলে আর কি কেউ ফিরতে চায়? এই আমাদেরই যদি অন্য উপায় থাকতো, তবে কি আর এখানে পড়ে থাকতে যেতুম? এই যে আমার বাড়ি কাল রাত্তিরে কাণ্ডটি হয়ে গেল—" মধু লাহিড়ীকে কথা শেষ করতে না দিয়েই পণ্টু অসহিষ্ণুভাবে কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় পথের মোড়ে হঠাৎ মোটর গাড়ির হর্ণের আওয়াজে তিনি এবং উপস্থিত সবাই সেদিকে চেয়ে রইলেন। এবং চেয়ে থাকতে থাকতেই প্রকাণ্ড একখানা নতুন মোটর বটতলায় এসে দাঁড়িয়ে গেল।

মোটর গাড়ি যে এ-গ্রামে আসে না তা নয়, তিন ক্রোশ দূরবর্তী স্টেশন থেকে মাঝে মাঝে গ্রামের কোনো নতুন জামাই শখ করে ট্যাক্সি ভাড়া করে এনেচে, শক্ত অসুখে পড়লে কেউ মহকুমা থেকে ডাক্তার অনেকবার এসেচে নিজের মোটরে—কিন্তু এ-ধরণের বড় ও সুন্দর মোটর গাড়ি উপস্থিত ব্যক্তিগণের কেউ দেখে নি। লম্বা ধরনের প্রকাণ্ড গাড়ি, পালিশ-করা নিকেলের পাতের বনেট, দোরের হাতল ল্যাম্প—সবই ঝকঝকে; তবে গাড়ির পেছনে ও মাডগার্ডে রাঙা ধুলো জমেছে—যেন অনেক দূর থেকে আসচে।

একজন ত্রিশ-বত্রিশ বছরের যুবক গাড়ি চালাচ্ছিল—দোহারা গড়ন, গায়ে সাদা সিল্কের পাঞ্জাবি, মাথায় একমাথা ধুলো। সে নেমে বটতলার দিকে এগিয়ে এল—এবং অল্পক্ষণ

উপস্থিত সবারই মুখের দিকে উৎসুক চোখে চেয়ে কি যেন চেনবার চেষ্টা করলে। তারপর হঠাৎ পঞ্চুর মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বল্লে: এই যে কাকা! আমায় চিনতে পারচেন না?

হারাণ রায়ের দিকে চেয়ে বল্লে: কাকা, আমায় মনে নেই আপনার? আমি ননী, আমার পিতার নাম ছিল রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনাদের পাড়াতেই—

হারাণ রায় বিস্ময়ে কেমন হয়ে গিয়েছিলেন। পঞ্চুও তাই। দু'জনেই সমস্বরে, কিন্তু খুব ধীরে ধীরে, যেন অনেকটা আপন মনেই বলে উঠলেন: রাজেনদার ছেলে সেই ননী!

এর বেশী কথা তাঁদের মুখ দিয়ে বের হোল না। ইতিমধ্যে ননী উপস্থিত সকলেরই পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। হারাণ রায় নিজের কোঁচা দিয়ে ঝেড়ে বাঁধানো বেদীর এক অংশে তাকে হাত ধরে বসালেন। নানা সাগ্রহ প্রশ্নোত্তরের আদান প্রদান চলতে লাগল।

হাঁ, রাজেন বাঁড়ুয্যেকে কার মনে নেই? বেশীদিনের কথা তো নয়, বড় জোর কুড়ি বছর আগে রাজেন মারা যায়। রাজেনের ছেলে এই ননী তখন দশ-বারো বছরের ছেলে। এই মাঠে কালীতলায় লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করে বেড়াতো—সবাই দেখেচে। রাজেন বাঁড়ুয্যে মহকুমার রেজেস্ট্রি অফিসে দলিল-লেখক ছিল। সেখানে শশী উকিলের বাসায় থাকতো। সপ্তাহের শেষে শনিবার সন্ধ্যার সময় পিঠে এক ক্যাম্বিসের ব্যাগ ঝুলিয়ে, এক পা ধুলো নিয়ে বাড়ি আসতো—আবার সোমবার ভোর বেলা মহকুমায় ফিরতো। বিশ বছর আগে রাজেন বাঁড়ুয্যের লাঠির আগায় কেম্বিসের ব্যাগ-ঝুলানো মূর্ত্তি গ্রামের পথে-ঘাটে অতি সুপরিচিত ছিল। একদিন হঠাৎ খবর এল, কলেরা হয়ে রাজেন শশী উকিলের বাসাতেই মারা গিয়েচে। ননীর মা তার পরও বছর দুই এ গাঁয়ে ছিল, কিন্তু শেষকালে চলাচলতির কোন উপায় না দেখে এখান থেকে চন্দননগরে ভগ্নিপতির ওখানে চলে যায়। তারপর আর কোন খবর কেউ রাখে না তাদের।

সেই ননী আজ এতকাল পরে ফিরে এল নতুন মোটরে চড়ে।

বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত্ত কেটে গেলে সবাই দেখলেন, গাড়ির পেছনের সিটে একটি মহিলা ও দু'টি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। হারাণ বল্লেন: সঙ্গে কে ননী?···বৌমা? আরে ছি ছি, কি ছেলেমানুষ! এসো, এসো, নামিয়ে নিয়ে এসো? এই রুন্দুরে কিনা—এই কাছেই তোমার গরীব কাকার বাড়ি, এসো বৌমাকে আমার নিয়ে এসো। পঞ্চু উত্তেজিত ভাবে বল্লেন: তা কি কখনো হয়? আমার সঙ্গেই বাবাজীর প্রথমে কথা হোল—আমার বাড়িতেই এ বেলাটা অন্ততঃ—

শেষে হারাণ রায়ই জয়ী হয়ে বিজয়গর্ব্বে উৎফুল্লমুখে ননী ও তার স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েদের নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

বিদ্যুৎবেগে এ সংবাদ গ্রামময় রাষ্ট্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হারাণ রায়ের বাড়িতে রথযাত্রার ভিড় শুরু হোল। ননীর স্ত্রী বেশ সুন্দরী, একটু মোটাসোটা, কথাবার্ত্তায় খুব অমায়িক, বড়মানুষী চালচলন একেবারে নেই। ননীকে ছেলেবেলায় দেখেচে, এমন অনেক লোকই গাঁয়ে আছে—সবাই বলাবলি করতে লাগলো: একেই বলে অদৃষ্ট! ওর মা ওর হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে গাঁ ছেড়ে গিয়েছিল, আর আজ দ্যাখো কাণ্ড! ভগবান যাকে যখন দ্যান—ইত্যাদি।

পঞ্চু বল্লেন: আহা, সকাল বেলাতেই তো বলেছিলাম, এ গাঁ ছেড়ে যে বাইরে পা দিয়েচে সে-ই উন্নতি করেচে—কেউ বেশী, কেউ কম! আজ যদি আমি গাঁয়ে বসে থেকে নিজেকে মাটি না করি, তবে আমার কি এ-দশা হয়? না—এবার বেরুতে হবে। দেখি

একবার ননী বাবাজীকেই বলে দেখি, যদি কিছু যোগাড়-টোগাড় করে দিতে পারে।

ননীর অবস্থা পরিবর্ত্তনে গ্রামের কেউই অসুখী নয়, বরং সকলেই আনন্দিত। কারণ ননীর সঙ্গে এ গ্রামের কারো স্বার্থের সংঘাত নেই, ননী এখানে বাসও করে না—তাছাড়া সবাই ননীকে শেষবার যখন দেখেচে তখন ননী ছিল ছোট ছেলে—তার সম্পর্কে কোনো হিংসাদ্বন্দ্বের স্মৃতি কারো মনে গড়ে ওঠে নি—ছোট ছেলের ওপর স্নেহের স্মৃতি ছাড়া।

বিকেলে বাঁধানো বটতলায় প্রকাণ্ড মজলিস বসেচে—মাঝখানে গাছের গুঁড়ি ঠেস্ দিয়ে বসে ননী—তাকে গোলাকারে ঘিরে গাঁয়ের বালক, বৃদ্ধ ও যুবার দল। কি ক'রে সে বড়লোক হোল, এ কথা সবাই শুনতে চায়।

শ্রীপতি কর্ম্মকার ওপাড়ার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। তামাকের ব্যবসা করে তিনি হাতে দু'পয়সা জমিয়েচেন সবাই বলে, যদিও শ্রীপতি তা স্বীকার করেন না। শ্রীপতির সঙ্গে ননীর বাবা রাজেন্ বাঁড়ুয্যের খুব বন্ধুত্ব ছিল, ননীর আসবার খবর পেয়ে তিনি পায়ের বাত সত্ত্বেও ওপাড়া থেকে এসেচেন দেখা করতে। শ্রীপতি জিগ্যেস করলেন—তা বাবাজির এখন থাকা হয় কি কলকাতাতেই?

—আজ্ঞে না, আমি থাকি হোসঙ্গাবাদ, নর্ম্মদার ধারে, সি. পি.—সেখানেই আমার কাঠের গোলো আর আপিস্। কল্‌কাতাতে এসেছিলাম—একটু কাজও ছিল, আর একখানা মোটর কিনবো বলে। কাল তাই ভাব্‌লাম গাড়িখানা তো কেনা হোল, একবার এতে করে গিয়ে পৈতৃক ভিটেটা দেখে আসি।

বলা বাহুল্য ননী কোথায় থাকে সে কথা কেউ বুঝতে পারলেন না, নর্ম্মদা নামে একটা নদীর কথা অনেকে কাশীরাম দাসের মহাভারতের মধ্যে পড়েচেন—কিন্তু তার ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে এঁদের ধারণা—কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের প্রভাতে সমুদ্রবক্ষ থেকে দৃশ্যমান দূরের তীররেখার চেয়ে স্পষ্টতর নয়। পণ্টু মুখুয্যে একটা সোজা প্রশ্ন জিগ্যেস করলেন—বিয়ে করেচ কোথায় বাবাজী?

—ওই হোসঙ্গাবাদেই, আমার শ্বশুর ওখানকার ডাক্তার। বহুদিন সেখানে বাস করচেন, তবে কলকাতায় সব আত্মীয়স্বজন আছে ওঁদের।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে দু'দিন কেটে গেল। একবেলা থাক্‌বার জন্যে ননী এসেছিল এখানে··· কিন্তু শৈশবের শত স্মৃতি-মাখানো গ্রামকে হঠাৎ ছেড়ে যেতে তার সাধ্যে কুলিয়ে উঠ্‌ল না। ননীর এক ছোট ভাই ছিল বোবা ও কালা, তিন বছর বয়সে বর্ষার সময় ননীদের বাড়ির পেছনে ডোবার জলে ডুবে মারা গিয়েছিল। মৃতদেহ যখন ভেসে উঠেছিল তখন জানা যায়, তার আগে হারিয়ে গিয়েচে বলে এপাড়া-ওপাড়া খোঁজ হচ্ছিল।

সেই ডোবাটি তেমনি আছে। এ-সব পাড়াগাঁয়ে কোনো কিছু হঠাৎ বদলায় না, হয়তো আরও বিশ বছর ডোবাটা থাক্‌বে, হয়তো আরও পঞ্চাশ বছর থাক্‌বে। ননীর বয়েস তখন ছ'বছর, কিন্তু সে বর্ষাদিনের কথা আজও তার বেশ মনে আছে—কখনও কি ভুল্‌বে? ওপারের ওই ডুমুর গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন ননীর বাবা, এপারে লোকে লোকারণ্য হয়েছিল। হোসঙ্গাবাদে তার কিসের বাঁধন আছে? কিছুই না— সে দু'দিনের বাঁধন। এখানকার সঙ্গে সম্বন্ধ অনেক গভীর; এতদিন আসে নি, তাই ভুলে ছিল। আজ সেই তিন বছরের অবোধ বোবা কালা ছোট ভাইয়ের করুণ মুখখানি তার মনে স্পষ্ট হয়ে ফুটলো—সে কি ভাবে তার দিকে চাইতো, তার সে বুদ্ধিহীন দৃষ্টি, নাকের সেই তিল্‌টি—আশ্চর্য্য! মানুষের এতও মনে থাকে!

সমস্ত জীবনটা ননী যেন এক মুহূর্ত্তে একটা ম্যাপের মত চোখের সামনে পড়ে আছে দেখ্‌তে পেলে। প্রথম জীবনের দারিদ্র্য, প্রথম বিদেশযাত্রা, ব্যবসাতে উন্নতি, বিবাহ—তার

মনে হোল, যাকে সে এতদিন সাফল্য ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করে এসেছে, জীবনে আসলে তার মূল্য কি? তার যেন আজ একটা নতুন চোখ খুলেচে, জীবনের পাতাগুলো নতুনভাবে পড়তে শিখেচে, জীবনে যা নিয়ে এতদিন সে ভুলে আছে আজ মনে হচ্চে তা ভেতরের সম্পদ নয়, বাইরের পালিশ মাত্র।

তাও নয়! জীবনটা যেন এতদিন জ্যামিতির সরল রেখার মত প্রস্থবিহীন, গভীরতাবিহীন একটা পথে চলে এসেচে—গভীরতর অনুভূতির অভাবে সে বুঝতে পারে নি যে জীবনের আর একটা বিস্তার আছে আর একদিকে, সেটি তার গভীরতা। নিজের মনের মধ্যে ডুব দেওয়ার অবকাশ কখনো তো হয়নি!

যে-পথ দিয়ে নেমে গেলে সরোবরের গভীর অন্ধকারতলে লুকানো মায়াপুরীর সন্ধান মেলে—তার সোপানশ্রেণী অস্পষ্ট নজরে পড়েচে, কিন্তু সময় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েচে, এমন অসময়ে নজরে পড়লেই কি, বা না পড়লেই কি?

তাকে ফিরে যেতে হবে। কাঠের হিসাব ঠিক করতে হবে, ফরেস্ট অফিসারদের সাথে দেখা করে নতুন জঙ্গল ইজারা নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, ব্যবসাকে আরও বাড়াবার চেষ্টা পেতে হবে, ব্যাঙ্কে জমানো টাকার অঙ্ককে বাড়াতে হবে। আরও কত শত দরকারী কাজ তার জন্য অপেক্ষা করে আছে হোসঙ্গাবাদের কাঠের গোলায়।

এখন নতুন পথ ধরে চলবার মত সময়ও নেই, বয়সও নেই। সাফল্যের আলেয়া তাকে ব্যর্থতার যে-পথে ভুলিয়ে নিয়ে চলেচে—সেই পথই তার পথ।

তবুও এই দিনটি সে ভুলবে না। এই ম্লান মেঘলা দুপুরের আলো, এই প্রাচীন জগডুমুর গাছটা, এই পান-শেওলা-ভরা ডোবা, এই আশ্চর্য অদ্ভুত জীবনমুহূর্তটি স্বপ্নের মত মনে আসবে বহুদূরে উত্তরকালের মানসপটে।

সকলের প্রসংসাবাদের মধ্যে ননী একদিন গ্রামের বারোয়ারী ফাণ্ডে শ'দুই টাকা দিলে। গ্রামের সকলকে নিমন্ত্রণ করে হারাণ রায়ের বাড়ীতে ভুরিভোজে আপ্যায়িত করলে। একটি অনাথা বিধবাকে মাসিক কিছু সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলে। এক সপ্তাহ প্রায় কেটে গেল। ননীর স্ত্রী আর থাকতে চায় না, ম্যালেরিয়ার দেশ, ছেলেমেয়ের শরীর খারাপ হবে—তাছাড়া হারাণ রায়ের বাড়ীতে তেমন ঘরদোর নেই, থাকবারও কষ্ট।

নতুন মোটরগাড়ি চালিয়ে হারাণ রায়ের বাড়িসুদ্ধ সকলের এবং পাড়ার সবারই চোখের জলের মধ্যে ননী গ্রাম থেকে বিদায় নিলে।

পঞ্চু মুখুয্যে বল্লেন: একেই বলে ছেলে! বিদেশে না বেরুলে কি পয়সা হয় বাপু? দেখে নিলে তো চোখের ওপর? তা তোমাদের বলি, তোমরা তো শুনবে না? গাঁয়ে কারুর কিছু নেই, তাই মধু লাহিড়ী মুখের সামনে বড়মানুষী চালের কথা বলে পার পায়। দেখি এবার বেরিয়ে একটা কিছু যদি—

একটি দিন

মনটা ভাল ছিল না। এক এক দিন এরকম হয়, কিছু পড়তে ভাল লাগে না, কিছু ভাবতে ভাল লাগে না, কারুর সঙ্গে কথা বলতেও ভাল লাগে না। মনে হয় যেন মনের চাকার তেল ফুরিয়ে গিয়েচে—'অয়েল' না করে নিলে চাকা আর চলবে না, ক্রমে মরচে পড়ে আসবে—তারপর কবে একদিন ফুট করে বন্ধ হয়ে যাবে।

জেলেপাড়া লেনে এক পুরোনো তাসের আড্ডায় গেলুম। সেই সব পুরনো বন্ধুরা এসে

জুটেচে—তাস কিন্তু ভাল লাগে না। তাস খেলে জিতবো, অন্যদিন এতে কত উৎসাহ, আনন্দ পাই। আজ মনে হোল, না হয় জিতলামই, তাতেই বা কি?—এদের গল্পগুজব ভাল লাগল না। অর্থহীন—অর্থহীন—এই নীচু বৈঠকখানা ঘর, চুন-বালি-খসা দেওয়াল, সেই সব একঘেয়ে সস্তা ওলিওগ্রাফ্ ছবি—কালীয়দমন, অন্নপূর্ণার ভিক্ষাদান, কি একটা মাথামুণ্ডু ল্যাণ্ডস্কেপ—সেই একঘেয়ে কথাবার্ত্তা, চিরকাল যা শুনে আসচি—হঠাৎ মন বিরস ও বিরূপ হয়ে উঠল—সব বাজে, সব অর্থহীন,—পাশের একজনকে জিগ্যেস কল্লুম—আপনার বেশ ভাল লাগচে? মনে কোনোরকম—

সে অবাক্ হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল। বল্লে—কেন, ভাল লাগবে না কেন? কেন বলুন তো?—

মন আরও তিক্ত হয়ে উঠল। কাজের ছুতোয় সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লুম। বেলা চারটে বাজে। ফিরিওয়ালারা গলির মধ্যে হাঁকচে—ছেলেরা বইদপ্তর নিয়ে স্কুল থেকে ফিরচে—কলের জল পড়বার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে—গলির মোড়ে রোয়াকে-রোয়াকে এরই মধ্যে আড্ডা বসে গিয়েচে।

একটা নিতান্ত সরু অন্ধকার গলি, পাশেই একটা মিউনিসিপ্যালিটির নাইবার জায়গা। এই গলিটা দিয়ে যাতায়াত প্রায়ই করি—মিউনিসিপ্যালিটির নাইবার জায়গাটার পাশে একটা খোলার ঘর। এই ঘরখানা ও তার অধিবাসীরা আমার কাছে বড় কৌতুহলের জিনিস। হাত পাঁচেক লম্বা, চওড়াতে ওই রকমই হবে, এই তো ঘরখানা। এরই মধ্যে একটি পরিবার থাকে, স্বামী স্ত্রী ও শিশুসন্তান। না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত, এইটুকু ঘরে কি ভাবে এতগুলো প্রাণী থাকে—তাদের জিনিসপত্র নিয়ে কিন্তু সকলের চেয়ে অবিশ্বাসের বিষয় এই যে এই পাঁচ বর্গহাত ঘরের এক কোণেই ওদের রান্নাঘর। আমি যখন ওখান দিয়ে যাই, প্রায়ই কিছু দেখতে পাই – উনুনে কিছু না কিছু একটা চাপানো আছে। বৌটি ছোট্ট ছেলে কোলে নিয়ে রাঁধছে, না হয় দুধ জ্বাল দিচ্চে! তার বয়স দেখলে বোঝা যায় না—তেইশও হতে পারে, ত্রিশও হতে পারে, চল্লিশও হতে পারে। ঘোমটার কাছে ছেঁড়া, আধময়লা শাড়ি পরনে। হাতে রাঙা কড় কি রুলি; চোখ-মুখ নিষ্প্রভ, নির্ব্বুদ্ধিতার ছায়া মাখানো। স্বামী বোধহয় কোন কারখানাতে মিস্ত্রীর কাজ ক'রে, দু'একদিন সন্ধ্যার আগে ফিরবার সময় দেখেচি লোকটা কালিঝুলি মেখে ছোট্ট বালতি হাতে পাশের নাইবার জায়গায় ঢুক্‌চে।

আজও ওদের দেখলুম। দোরের কাছে বৌটি ছেলে কোলে নিয়ে বসে আছে, ছেলেকে আদর করচে। নির্ব্বোধের মত আমার দিকে একবার চেয়ে দেখলে। সেই পায়রার খোপের মত ঘরটা, ছিটেবেড়ার দেওয়ালে মাটির লেপ, তার ওপরে পুরোনো খবরের কাগজ আঁটা, কাগজগুলো হলদে বিবর্ণ হয়ে গিয়েচে—দড়ির আলনায় ময়লা কাপড়-চোপড় ঝুলচে।

মনটা আরও দমে গেল। কি ক'রে এরা এ থেকে আনন্দ পায়? কি ক'রে আছে? কি অর্থহীন অস্তিত্ব! কেন আছে? আচ্ছা, ও ছেলেটা বড় হয়ে কি হবে? ওই রকম মিস্ত্রী হবে তো, ওই রকমই খোলার ঘরে ছেলে বউ নিয়ে ওই ভাবেই মলিন, কুশ্রী, অন্ধকার অর্থহীন জীবনের দিনগুলো একে একে কাটাতে কাটাতে এগিয়ে চলবে ততোধিক দীন, হীন মরণের দিকে। অথচ মা কত আগ্রহে খোকাকে বুকে আঁকড়ে আদর করচে, কত আশা, কত মধুর স্বপ্ন হয়তো—কিন্তু এখানেও আমার সন্দেহ এল। স্বপ্ন দেখবার মতো বুদ্ধিও বৌটির আছে কি? কল্পনা আছে? নিজেকে এমন অবস্থায় ভাবতে পারে যা বর্ত্তমানে নেই কিন্তু ভবিষ্যতে হতে পারে বলে ওর বিশ্বাস? মনের গোপন সাধ-আশাকে মনে রূপ দিতে পারে? নিজের সংকীর্ণ, অসুন্দর বর্ত্তমানকে আলোক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের মধ্যে হারিয়ে ফেলতে পারে?

বড় রাস্তার মোড়ে বই-এর দোকানগুলো দেখে বেড়ালুম। রাশি রাশি পুরোনো বই, ম্যাগাজিন। অধিকাংশই বাজে। অলস, অপরিণত মনের তৈরী জিনিস। চটকদার মলাটওয়ালা অসার বিলিতি নভেল, সিনেমার ম্যাগাজিন ইত্যাদি। অন্যদিন এখানে বেছে বেছে দেখি, যদি ভালো কিছু পাওয়া যায়। আজ আর বাছবার মত ধৈর্য্য ছিল না। মনের আকাশের চেহারা আজ ঘষা পয়সার মত, নীলিমার সৌন্দর্য্য তো নেই-ই, মেঘভরা বাদল-দিনের রূপও নেই—নিতান্তই ঘষা পয়সার মত তার চেহারা।

সিনেমা দেখতে যাবো? আউট্রাম ঘাটে বেড়াতে যাবো? কোথাও বসে খুব গরম চা খাবো? লেকের দিকে যাবো?—

ধর্ম্মতলার গির্জ্জার সামনে এক জায়গায় লোকের ভিড় জমেছে। একটা সাহেবী পোশাকপরা লোক ফুটপাথে অজ্ঞান হয়ে শুয়ে আছে, ধড়টা ও মাথাটা পরস্পরের সঙ্গে এমন অস্বাভাবিক কোণের সৃষ্টি করেচে, যে মনে হচ্ছে লোকটা মরে গিয়েছে। দুজন সার্জ্জেণ্ট এল। লোকে বল্লে, সামনের বাড়ির নীচের তলায় ওই বাথরুমের মধ্যে পড়েছিল এই অবস্থায়। বাড়ির দারোয়ান ধরাধরি করে ফুটপাথে এনে শুইয়ে দিয়েচে—লোকটা কে, তারা চেনে না। লোকটা মরে নি, মদে বেহুঁশ হয়ে আছে। সার্জ্জেণ্ট দুজন ধরাধরি করে তার সংজ্ঞাহীন নিঃসাড় দেহটা একটা ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে কোথায় গেল।

লোকটার ওপর সহানুভূতি হোল আমার। সেই নির্ব্বোধ বধূটার ওপর যা হয় নি, এই বেহুঁশ মাতালের ওপর তা হ'ল। বেচারা আনন্দের খোঁজে বেরিয়েছিল, পথও যা হয় একটা ধরেছিল, হয়তো ভুল পথ, হয়তো সত্যি পথ···আনন্দের সত্যতা তার মাপকাঠি—কে বলবে ওর কি অভিজ্ঞতা, কি তার মূল্য? ওই জানে। কিন্তু ও তো বেহুঁশ।

কার্জ্জন পার্কের সামনে এলুম। অনেকগুলো চাকর ও আয়া সাহেবদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে বৃষ্টির ভয়ে গাড়িবারান্দার নীচে ফুটপাতের ওপর বসে আছে। বৃষ্টি একটু একটু বাড়ছে, আমিও সেখানে দাঁড়ালুম। একটা ছোট্ট ছেলে, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া সোনালী চুল, নীল চোখ, বছর দেড় কি দুই বয়েস—সে তার চাকরের টুপিটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে টলতে টলতে উঠে অতি কষ্টে নাগাল পেয়ে চাকরের মাথায় টুপিটা পরিয়ে দিচ্ছে—আর যেমন পরানো হয়ে যাচ্ছে, অমনি হাত নেড়ে, নেচে, ঘাড় দুলিয়ে দন্তহীন মুখে হেসে কুটিকুটি হচ্ছে। কিন্তু টুপিটা ভাল করে মাথায় বসাতে পারচে না, একটু পরেই গাড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে, আবার খোকা অতি কষ্টে টুপিটা মাথায় তুলে দিচ্ছে···আবার সেই হাসি, সেই হাত পা নাড়া, সেই নাচ···তাকে কেউ দেখচে না, কারু দেখবার সে অপেক্ষাও রাখচে না, তার চাকর পার্শ্ববর্ত্তিনী আয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপে এমন অন্যমনস্ক, খোকা কি করচে না করচে সেদিকে তার আদৌ খেয়াল নেই, নিকটের অন্য অন্য ছেলেমেয়েরাও নিতান্ত শিশু—ওই খোকাটি আপন মনে বার বার টুপি পরানো খেলা করচে।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে রইলুম। নরম নরম কচি হাত পায়ের সে কি ছন্দ, কি প্রকাশভঙ্গির সজীবতা, কি অবোধ উল্লাস, কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য!···খুশির আতিশয্যে খোকা আবার সামনে ঝুঁকে ঝুঁকে পড়চে, একগাল হাসচে, ছোট ছোট মুঠি বাঁধা হাত দুটো একবার তুলচে, একবার নামাচ্ছে···শিশুমনের আগ্রহভরা উল্লাসের সে কি বিচিত্র, কি সুস্পষ্ট, ভাষাহীন বার্ত্তা!···

আমি আর চোখ ফেরাতে পারি নি। হঠাৎ অদৃষ্টপূর্ব্ব, অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্য্যের সামনে পড়ে গিয়েছি যেন। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। হঠাৎ চাকরটার হুঁশ হোল—সে আয়ার সঙ্গে গল্প বন্ধ করে খোকার দিকে ফিরে টুপিটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পাশে একটা পেরাম্বুলেটারের মধ্যে রেখে দিলে। খোকার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল, সে টলতে টলতে

পেরাম্বুলেটারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল কিন্তু বড্ড উঁচু—তার ছোট্ট হাত দুটি সেখানে পৌঁছয় না। সে একবার অসহায় ভাবে এদিক-ওদিক চাইলে, তারপর থপ্ করে বসে পড়ল। চাকরটা আয়ার সঙ্গে গল্পে মত্ত।

কাৰ্জ্জন-পার্কের বেঞ্চির ওপর গিয়ে বসলুম। সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে, গঙ্গার অপর পারে আকাশ রাঙা হয়ে এসেচে।

খোকার মনের সে অর্থহীন আনন্দ আমার মনে অলক্ষিতে কখন সংক্রামিত হয়েচে দেখলুম। খোলার ঘরের মেয়েটিকে আর নির্ব্বোধ মনে হোল না।

বাইশ বছর

খবরের কাগজের অফিসে সন্ধ্যার পর আড্ডা চল্‌ছিল। 'তরুণ' শব্দটার ওপর ভয়ানক জোর দিয়ে কথা বলা তখন দিনকতক খুব চলেছিল—সেই সময়কার ব্যাপার। তরুণ সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, তারুণ্য, তরুণ দৃষ্টিভঙ্গি, তরুণ সমিতি, তরুণের অভিযান, তরুণের জয়যাত্রা—মাসিক পত্রিকা ও কথাসাহিত্য তখন তরুণ-বায়ুগ্রস্ত! ওদিকে পরশুরাম তখন 'কচি সংসদ্' গল্প লিখ্‌লেন তা নিয়ে দুটো দলের সৃষ্টি হোল, একজন বল্‌লে—আঃ, কি ঠোকাই ঠুকেচে! আর একজন বল্‌লে—যাদের নিজেদের জীবনের পুঁজি বহুকাল ফুরিয়েচে, যাদের প্রাণের তারে মরচে ধরেচে, তারা তরুণের মনকে বুঝ্‌বে কেমন করে! সমস্ত মহীগ্রাস করতে ছুটেছে তরুণের জয়রথ-চক্র, তার উদ্দাম, অশান্ত বেগের সামনে দাঁড়াবার ক্ষমতা ধরে, তাদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলবার স্পর্দ্ধা রাখে কোন্ ওল্ড ফসিল্?···ইত্যাদি ইত্যাদি। মোটের ওপর শেষের দলটাই বেশী পুষ্ট—তরুণের বিরুদ্ধে যারা কথা বলছিল চেয়ে দেখলুম তারা সকলেই মধ্যবয়সী, অপর পক্ষে তরুণ ও প্রৌঢ় দুই-ই আছে—এবং স্বয়ং সম্পাদক যিনি, ষাট্ বৎসরের বৃদ্ধ হলেও তিনি ছিলেন তরুণের সপক্ষে।

কাগজের অফিস থেকে বার হয়ে এসে একটা পার্কের বেঞ্চিতে বসলুম। মনটা খারাপ হয়ে গেল। সত্যিই তরুণেরাই জয়ী—কিন্তু সে বয়সটাকে বহুকাল হারিয়েচি। মাথার চুল ছ-আনা আন্দাজ পাকা, পরিচিত ছোকরার দল সামনে বিড়ি সিগারেট খায় না, হঠাৎ সামনা-সামনি হোয়ে গেলে বিড়ি মুখে থাকলে তাড়াতাড়ি ফেলে দেয়। সমীহ করে কথা বলে—আর বয়োবৃদ্ধ লোকের পরিচয় দিতে গেলেই বলে,—"আজ্ঞে তাঁর বয়েস হয়েচে, এই প্রায় আপনার বয়েসী হবেন।" তা সে কি জানে চল্লিশ—কি জানে পঞ্চাশ—আমার বয়েসী, তাও 'প্রায়'—অর্থাৎ আমিই বড়। কারণ কুড়ি, বাইশ, পঁচিশ বয়সের ছোকরারা চল্লিশে আর পঞ্চাশে বিশেষ কোনো তফাৎ দেখে না। এদিকে বাড়িতেও বড় সংসার, সেখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মুখে 'বাবা' 'বাবা' অনবরত শুনতে শুনতে মনটাও অনেকটা গম্ভীর প্রবীণত্বের দিকে ঝুঁকে চলেচে বৈকি। ছোট মেয়েটা কাছে এলেই বলে—বাবা তোমার পাকা চুল তুলে দেবো?

নাঃ, মনটা খারাপ হবারই কথা বটে। রাত ক্রমে বেশী হোল, পার্কের মধ্যে কুলপীবরফ-ওয়ালা হেঁকে যাচ্চে, মোড়ের মাথায় বেলফুলের মালা বিক্রী হচ্চে, রাস্তায় লোক চলাচল ক্রমে কমে আস্‌চে। জ্যোৎস্নারাত, চাঁদ ভাঙ্গা মেঘের মধ্যে লুকোচুরি খেল্‌চে।

কত বছর বয়সের মানুষকে ঠিক তরুণ বলা চলে? উনিশ থেকে বত্রিশ, না আঠারো থেকে আটাশ, না কুড়ি থেকে পঁচিশ? এ-বয়েস একদিন আমারও ছিল—ওর চেয়েও কম ছিল। কিন্তু তখন কেউ বলে দেয় নি যে আমি তরুণ বা তার জন্যে একটা কিছু হয়েচে।

দুর্ভাগ্যের বিষয় তার উল্টোটাই শুনে এসেচি চিরকাল। কখনও বুঝতে পারি নি যে আমার বয়স অল্প।

সেই কথাটাই আজ রাত্রে আমার বেশী করে মনে এল।

ছেলেবেলায় আমি ছিলাম খুব রোগা শীর্ণ—অসুখে ভুগতাম বছরে ন' মাস। হাতে তাবিজ-কবজ, গলায় আমড়ার আঁটি, কোমরের ঘুনসিতে বাদুড় নখ—সমস্ত দেহে নানা ধরনের বাধা ও গণ্ডী—মৃত্যু যাতে হঠাৎ ডিঙিয়ে এসে আমাকে নিয়ে না পালায়।

এই কারণে ইস্কুলে ভর্ত্তি হতে হয়ে গেল দেরি। যে ক্লাসে গিয়ে ভর্ত্তি হলুম, সে ক্লাসের মধ্যে আমিই বড়। সকলে আমাকে ডাকতে লাগল—'কানু-দা' বলে। কিন্তু প্রথমে ততটা বুঝতে পারি নি যে আমার বয়েসটা এমন বেখাপ্পা গোছের বেশী। একদিন হোল কি, তখন মাস দুই ভর্ত্তি হয়েচি, মামার বাড়ি যাওয়াতে দিন তিনেক ইস্কুল কামাই হোল—তারপর যেদিন ইস্কুলে গেলাম, ফণিমাস্টারের ক্লাসের পড়া হোল না। ফণিমাস্টার আমার চুল ধরে টেনে বল্লে—বুড়োধাড়ী কোথাকার, শিং ভেঙে বাছুরের দলে মিশেচে—আবার ইস্কুল কামাই করে। ছেলেরা অনেকে খিল্-খিল্ করে হেসে উঠ্‌ল আমার দুর্দ্দশায় খুশি হয়ে। বাবার আপিসের পেন্সিলের ও 'পেন্সিল-ঘষা' রবারের প্রত্যাশা রাখ্‌তো যে সব ছেলে, তারাই চুপ করে রইল। এই আমি প্রথম জানলুম যে আমার বয়স বেশী। এর আগে কেউ আমাকে এ-কথা বলে নি। বাড়িতে দিদি ছিলেন আমার চেয়ে বড়। মা বাবা এদের মুখে কখনও আমার বয়েস সম্বন্ধে শ্লেষ-সূচক কোনো কথা শুনি নি। কিন্তু আজ থেকে আমার ধারণা বদলে গেল—তখন বুঝলাম কেন ক্লাসের ছেলেরা আমায় 'কানুদা' বলে ডাকে। এবং এই দিনটি থেকে ক্লাসের পড়া না বল্‌তে পারার অক্ষমতার চেয়েও আমার বয়সের লজ্জায় সব সময় সঙ্কুচিত হয়ে থাকতুম। ফণিমাস্টারও কি প্রতিবারই প্রতি পদে পদেই আমার সে গোপন লজ্জা, যা আমি লোকচক্ষু থেকে লুকিয়ে রাখতে প্রাণপণ করি,—তা-ই ঢাক পিটিয়ে সকলের সামনে প্রচার করবে আর আমার সে অত্যন্ত নিভৃত গোপন ব্যথার স্থানে কারণে অকারণে আঘাত করবে নির্ম্মম ভাবে? এদিকে বয়সের তুলনায় আমি একটু লম্বা ছিলাম। একদিন গ্রামারের কি ভুল বার হোতেই ফণিমাস্টার বল্লে—নাঃ, এ ধাড়ী ছোঁড়াটাকে নিয়ে আর পারা গেল না দেখ্‌চি। বলি গোঁফ-দাড়ি যে লতিয়ে চললো, এখনও নাউনের পার্সিং শিখলে না? আমার চোখে লজ্জায়, অপমানে জল এল। আমার মনে হোল বাস্তবিকই আমার বয়েস বেশী, তাতে নীচের ক্লাসের ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে পড়া আমার পক্ষে লজ্জার কথা—প্রতিদিন ওদের চোখের সামনে আমি এরকমভাবে বকুনি খেতে আর পারি নে, বিশেষ করে ওই ছোট ছোট ছেলেরা—যারা আমায় দাদা বলে ডাকে, তাদের সামনেই আমার এ অপমানের লজ্জা অসহ্য।

বাড়ি গিয়ে মাকে লাজুক মুখে বললুম,—আমি আর স্কুলে পড়্‌বো না মা! আমার ক্লাসের ছেলেরা ছোট ছোট, আমার লজ্জা করে ওদের সঙ্গে পড়তে।

মা অবাক হয়ে বললেন—কেন রে তোর বয়স কত হয়েচে?

—তুমিই বল না কত হয়েচে?

—এই তেরোয় পড়্‌বি আষাঢ় মাসে—বারো বছর ন' মাস চল্‌চে—

—ও বয়সে কেউ বুঝি সিক্‌সথ্ ক্লাসে পড়ে?

—না, তুমি একেবারে বুড়ো হয়ে গিয়েচো—তোমার দাঁত পড়ে গিয়েচে, চুল পেকে গিয়েচে—তুমি কি আর সিক্‌সথ্ ক্লাসে পড়্‌তে পার? পাগ্‌লা একটা কোথাকার—

মায়ের কথায় আমার মনের সন্দেহ দূর হোল না। নিজের ছেলেকে কেউ ছোট দেখে না—ও'রাই আমায় ছোট বলেন, কই আর তো কেউ বলে না? হায় আমার সে তেরো বছর

বয়েসের শৈশব ! এখন সেই কথা ভাবি ।

বয়েস আর কম্‌লো না—বেড়েই উঠ্‌তে লাগ্‌ল । বাকী ক'বছরের মধ্যে আমার চেয়ে বড় কোনো ছেলে এসে ভর্ত্তি হোল না আমার ক্লাসে, আমিই সকলের 'দাদা' রয়ে গেলুম। এর পরে ক্লাসে আমি পড়াশুনোতে খুব ভাল হয়ে ফার্ষ্ট, সেকেণ্ড্‌ হয়ে উঠ্‌তাম—কিন্তু তাতে আমার গৌরব বাড়লো না। আমি সকলের চেয়ে বয়েসে বড়, আমি পড়াশুনোতে ভাল করবো, এতে বাহাদুরিটা কি ?

এই সময় আবার আমার গোঁপ বেরুল একটু একটু—সেই 'ড্রেডেড্‌' গোঁপ, যার কথায় চিরকাল খোঁচা খেয়ে আসচি—যখন সত্য সত্যই সেটা বেরুলো—তখন মরীয়া হয়ে সহ্য করলুম। প্রথম প্রথম বড় লজ্জা হোত—শেষে সয়ে গেল।

একবার আমাদের ওখানে রামেন্দ্রবাবু উকীলের বাড়িতে তাঁর ভাগ্নে এল—তার নাম প্রসাদ, কল্‌কাতায় কলেজে বি. এ. পড়ে। খুব ভাব হয়ে গেল তার সঙ্গে—হঠাৎ কথায় কথায় একদিন সে তার বয়েস বল্লে উনিশ বছর, আমি মনে হিসেব করে দেখলুম আমারও ওই বয়েস—অথচ আমি এবার ম্যাট্রিক দেবো—আর ও পড়ে বি. এ. থার্ড ইয়ার ক্লাসে। ক্লাসের সবাই ঠিক বলে, আমার বয়েস বেশী, আমি যে পড়াশুনোতে ভাল করবো এ আর বিচিত্র কি ?

ম্যাট্রিক দেবার সময়ে হেড্‌মাস্টারের কাছে ফর্ম্ম লিখবার সময় অন্য সব ছেলে লিখলে ষোল, সতেরো। ধীরেন বলে একটা ছেলে ষোলর চেয়েও কম বলে তাকে হেড্‌ মাস্টার পরীক্ষা দিতেই দিলেন না—আর আমি লজ্জায় মুখ নীচু করে, কান লাল করে বয়সের জায়গায় লিখ্‌লুম—উনিশ বছর ক'মাস। এমন বিড়ম্বনাতেও মানুষ পড়ে ?

এই সময় আমি আর এক দুর্ভাবনায় পড়ে গেলুম। অনেক দিনে আমার আট-ন' বছর বয়েসে আমার মামা এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে। তাঁর গোঁপ বেরিয়েছিল, খুব লম্বা-চওড়া—তাঁকে আমার খুব বড় বলেই মনে হোত—আমি তাঁর বুকে হেলান দিয়ে বসতাম সে সময়—আমাকে কাঁধে পিঠে করে নিয়েও কত খেলা করেচেন। তখন শুনেছিলাম মা'র মুখে যে মামার বয়েস বাইশ বছর ! উঃ, সে কত বয়েস ? তার দিকে তখন ভাবতেই পারতুম না, আমার শৈশব মনের জগতের অনন্ত কালসমুদ্রে 'বাইশ বছর' বলে একটা পরিচিত, একটা সুদূর দ্বীপ—আমার বয়োবৃদ্ধ মামা ছিলেন সেই দ্বীপের অধিবাসী—তার ওদিকে কি আছে আমি জান্‌তাম না, ভাবতেও চেষ্টা করি নি তখন ; সেই থেকে বাইশ বছরের সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা ছিল যে—যার বয়েস বাইশ বছর, তার জীবন ফুরিয়ে এল।

এই ম্যাট্রিক দেবার বছরে আমার হঠাৎ মনে হোল, আমার বয়েস কুড়িতে পড়বার আর দেরি নেই—এবং সেই ভীষণ বাইশ বছরে আস্‌বার দেরি মাত্র দু'টি বছর। আরও মুশকিল বাধ্‌ল এই যে—এতদিন ছিল গোঁপ, এইবার আমার এমন অবস্থাতে এসে পেঁছুতে হোল যে দাড়ি না কামালে আর চলে না। গোঁপ ও দাড়ি দুই-ই হোল। গোঁপ-দাড়ি এবং কুড়ি বছরে পা দেবার দেরি মাস কতক মোটে—তার পরে বছর দুই পরেই বাইশ বছর।

কিন্তু তখনকার দু'বছর অনেক সময়—আজকালকার মত নয়। মন ছিল চিন্তাশূন্য, স্ফূর্ত্তিবাজ, কৌতুকপ্রিয়,—দু'বছর আস্‌তে দেরি হয়ে গেল। এল বাইশ বছর, চলেও গেল !

তখন যদি কেউ বলতোও যে আমার বয়েস কম, বাইশ বছর আর এমন কি বয়েস—তাহোলেও হয়তো তার কথা আমার বিশ্বাস হোত না, যেমন বারো বছর বয়েসে বিশ্বাস করি নি মায়ের কথা যে আমি ছোট—কিন্তু আসলে সে-কথা আমাকে কেউ বলেও নি।

বরং আরো একটা ঘটনায় তার উল্টো কথাটাই একবার শুনলাম। তেইশ বছর বয়েসে আমার বিবাহের জন্য কোথা থেকে একটা সম্বন্ধ এল—আমি তখন থার্ড ইয়ারে পড়্‌চি।

ঘটক আমাকে দেখে বল্লে—ছেলের বয়স একটু বেশী না ?

বাবা সামনে বসে। বল্লেন, কোথায়, এই তো মোটে তেইশ—

আমি ভাবলুম বেশ তো ? বাবা ওরকম কথা কেন বল্লেন ? ছিঃ, ওরা কি মনে ভাবলে ? মোটে তেইশ মানে কি ? সেই থেকে আমার বিশ্বাস হোল যে বিবাহ করবারও আমার বয়স আর নেই। ঘটক নিশ্চয় আমার লম্বা-চওড়া মূর্ত্তি দেখে আমার বয়স বেশী আন্দাজ করেছিল —তেইশ বছরের অনুপাতে আমার চেহারা বড় ছিল। কিন্তু আমার সেই থেকে বিশ্বাস দাঁড়ালো অন্যরকম।

চব্বিশ, পঁচিশ, ছাব্বিশ, সাতাশ, আটাশ…

ত্রিশ বৎসর বয়সে যেদিন পড়লাম, সেদিন থেকে মনে হোল এখন থেকে গম্ভীরভাবে চলাফেরা করতে হবে, সাদা রং ছাড়া অন্য রঙের জামা পরা তো অনেকদিনই ছেড়েছিলুম, এখন থেকে ছোট বড় চুল ছাঁটা পর্য্যন্ত ছেড়ে দিলুম। তখন থাকতুম পাড়াগাঁয়ে, সেখানে কেউ কোন দিন একথা বলে নি যে আমার বয়েস খুব বেশী এমন কিছু নয়। পাড়াগাঁয়ে কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক, ত্রিশের পরেই বৃদ্ধত্বে পেঁাছোয়, মনে তো বটেই, চেহারাতেও খানিকটা বটে।

কারণ আমাদের মুখশ্রীকে আমরা অহরহ গড়্‌চি, আমাদের ভাব ও চিন্তার দ্বারা, যেমন ভাস্কর বাটালি দিয়ে মূর্ত্তির মুখ গড়ে। এদের প্রভাব আমাদের মুখশ্রীর ওপরে অনেক বেশী, অন্তরের তারুণ্য মুখশ্রীতে তো বটেই, সারাদেহের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এমন কি দৈহিক স্বাস্থ্যের ওপরও। বাল্যের কত সুন্দর-মুখ ছেলেকে যৌবনে হতশ্রী, হীনশ্রী হতে দেখেচি, শিক্ষার ও কালচারের অভাবে। বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে কত লোকেরও দেখেচি, বিধাতা যেন তাদের দেহ ও মুখশ্রীকে কি চোখের দৃষ্টি পর্য্যন্ত ভেঙে গড়েচেন।

এ সব অবান্তর কথা যাক্।

তারপর আজ এতকাল পরে যখন পঞ্চাশের কোঠায় বয়েস চলচে, কাগজেপত্রে লোকের মুখে শুনি কুড়ি বছর বয়েস থেকে তরুণ বয়েসের নাকি শুরু—মোটের ওপর বাইশ বছরটা যে নিতান্ত তরুণ বয়েস, এতকাল পরে তা' বুঝছি খুব ভাল করেই। কারণ আমার বড় ছেলেরই প্রায় হতে চলেচে ওই।

কিন্তু শুনলাম কথন, যখন বয়োবৃদ্ধ ভীষ্ম পিতামহ মর্ত্তধামে ফিরে এলেও আর আমাদের তরুণ বলতে সাহস করবেন না, স্নেহপরবশ হয়েও নয়। লোক-লজ্জার ভয় একটা আছে তো ?

হায়রে আমার বাইশ বৎসরের প্রথম যৌবন, তুমি যখন এসেছিলে, তখন তোমায় চিনি নি, তারপর পৃথিবী নিজের কক্ষপথে বহুদূরে চলে গিয়েচে সে দিনটির পরে, আজ আর তোমার জন্যে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে লাভ কি ? কিন্তু মুশকিল এই যে তখন একথা বল্লেও বিশ্বাস করতুম না। একটা কথা মনে এল। চব্বিশ বছর বয়সে একবার টুর্গেনেভের কোন একখানা বইয়ে পড়ি যে ভালবাসা, প্রেম, রোমান্স সব তরুণদের জন্যে। যৌবন ফুরিয়ে গেলে ওসবের দিন শেষ হোল। কথাটা পড়ে মনে বড় কষ্ট হয়েছিল,—এই জন্যে যে আমার আর সেদিন নেই—বাইশ বছরের গণ্ডি অনেক দিন ছাড়িয়েচি, যৌবন কতকাল শেষ হয়ে গিয়েচে।

তাই বলচি—যদি কেউ একথা বলতো তখন যে আমার বাইশ বৎসরে তরুণ বয়সের অবসান নয়, সবে শুরু—একথা আমি বিশ্বাস করতুম না নিশ্চয়।

মা তো বারো বছর বয়সে বলেছিলেন আমি ছেলেমানুষ, সে তো নিতান্ত বাল্যকাল, মায়ের কথা কি বিশ্বাস করেছিলাম ?

বৈদ্যনাথ

তিন দিন ধরিয়া কলিকাতায় বেজায় বর্ষা নামিয়াছে। এ ধরনের বর্ষা এ বছর পড়ে নাই। ছাতিতে জল আটকায় না—কারণ সঙ্গে সঙ্গে হাওয়াও তেমনি, রাস্তায় রাস্তায় জল বাধিয়া গিয়াছে। ট্রামে দিনের বেলা আলো জ্বালানো, দোকানে দোকানে সামনের দিকে তেরপল ফেলা, পথেঘাটে লোকজনও খুব বেশী যে চলাফেরা করিতেছে এমন নয়।

আপিসে যাইতেছি, বেলা দশটা কি বড় জোড় দশটা পনেরো। ট্রামে যাইতে পারিতাম কিন্তু এ বর্ষায় হাঁটিয়া যাইতে বড় ভাল লাগিতেছিল, ট্রাম লাইন পার হইয়া হাঁটা পথ ধরিলাম।

বৌবাজারের মোড়ে কে পিছন হইতে ডাকিয়া বলিল—দাদা,—ও দাদা—দাদা শুনুন—

আমাকেই ডাকিতেছেন না কি? ফিরিয়াই চাহিয়া দেখিলাম। যে ডাকিতেছিল, সে কাছে আসিল। বছর পনেরো যোল বয়স, পরনের কাপড় যৎপরোনাস্তি ময়লা, গায়ে চার-পাঁচ জায়গায় ছেঁড়া কোট, মাথার চুল রুক্ষ, ঝাঁকড়া, খালি পা; রাঙা রাঙা দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল—চিনতে পাচ্ছেন না দাদা, আমি বদ্দিনাথ।

ও!—সেজ মামার ছেলে বোদে! এর বয়স যখন বছর দশেক তখন ইহাকে দেখিয়াছিলাম, তারপর বছর পাঁচ-ছয় আর দেখি নাই। কিন্তু না দেখিলেও ইহার বিষয় সব শুনিয়াছি। অতি বদ ছোকরা, দশ বছর বয়সে বাড়ি হইতে পলাইয়া হুগলীতে কোন যাত্রার দলে ঢোকে, বছর খানেক খোঁজখবর ছিল না, হঠাৎ রাজসাহী হইতে এক বেয়ারিংপত্র পাওয়া যায় যে, বদ্দিনাথ টাইফয়েডে মর-মর, শেষ দেখা করিতে হইলে কালবিলম্ব না করিয়া ইত্যাদি। সেজ মামার ছেলের উপর তত টান ছিল না। তিনি দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া কায়েমী সংসার পাতাইয়াছেন—প্রথম পক্ষের অবাধ্য ছেলে বাঁচুক বা মরুক, তাঁর পক্ষে সমান কথা। কিন্তু বদ্দিনাথের পিসি কাঁদা-কাটা শুরু করাতে তিনি দ্বিতীয় পক্ষের বড় শালাকে রাজসাহীতে পাঠাইয়া দেন। সেযাত্রা বদ্দিনাথ বাঁচিয়া উঠিল, চুল-ওঠা জীর্ণ-শীর্ণ চেহারা লইয়া বাড়িও ফিরিল কিন্তু মাস তিনেকের মধ্যেই আবার উধাও, আবার নিখোঁজ। এবারও আর এক যাত্রাদলে বছরখানেক ঘুরিয়া বোদে নগদ সতেরোটি টাকা হাতে করিয়া বাড়ি আসিল ও সৎমায়ের কাছে জমা রাখিল; অত বড় ছেলে বাড়ি বসিয়া খায় ও দু'তিনদিন অন্তর সৎমায়ের কাছে পয়সা চাহিয়া লয়, আজ আট আনা, কাল তিন আনা, তার পরদিন এক টাকা। চুল ছাঁটিতে হইবে, শার্ট তৈরী করিতে হইবে, বন্ধু-বান্ধবে খাইতে চাহিয়াছে, নানা অজুহাত। আসলে জানা গেল যে, বিড়ি সিগারেটেই বদ্দিনাথের মাসে চারি-পাঁচ টাকা লাগে। তাছাড়া চা, বাবুগিরি, সাবান, কলিকাতায় যাওয়া ইত্যাদি আছে। সে সতেরো টাকার মধ্যে টাকা দুই সংসারের সাহায্যে লাগিয়াছিল, বাকিটা বদ্দিনাথের ব্যক্তিগত শখের খরচ যোগাইতে ব্যয়িত হয়। সেজ মামার সংসারের অবস্থা খুব স্বচ্ছল নয়, দুই টাকায় যখন বদ্দিনাথ সাত মাস বসিয়া খাইল এবং নিজের টাকা ফুরাইলে জোর-জুলুম গাল-মন্দ করিয়া বিমাতার নিকট হইতে আরও দু'চার টাকা আদায় করিল—তখন সেজমামা স্পষ্ট জানাইয়া দিলেন, তাহাকে এরূপ ভাবে বসিয়া খাওয়াইতে তিনি পারিবেন না। বদ্দিনাথ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া আরও সাত মাস বসিয়া সংসারের অন্নধ্বংস করিল, খুব নিশ্চিন্ত মনেই করিল—আরও কয়েক টাকা সৎমায়ের নিকটে আদায় করিল, বৈমাত্র ভাই-বোনদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ মার-ধোর করিল—শেষে সেজমামার বাড়ির (শ্বশুরবাড়ির গ্রামেই সেজ মামা ইদানীং বাস করিয়াছিলেন) কাহার পকেট হইতে টাকা চুরি করিয়া একদিন দুপুরে আহারাদির

পরে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। সে আজ বছর-দুই আগেকার কথা।

কিন্তু এ সকল কথাই আমি শুনিয়াছিলাম এক তরফা—বদ্দিনাথের শত্রুপক্ষের মুখে। অর্থাৎ তার সৎমা ও বাবার মুখে। বদ্দিনাথের স্বপক্ষেও হয়ত অনেক কথা বলিবার আছে, কিন্তু সে কথা আমি শুনি নাই। বদ্দিনাথকে আজ এ অবস্থায় দেখিয়া মনে মনে তাহার উপর সহানুভূতি হইল—বলিলাম—ভিজচিস্ কেন? আয় ছাতির মধ্যে। তারপর এ অবস্থায় কোথা? শ্রীরামপুরে যাস্ নি আর?

শ্রীরামপুরেই সেজমামার শ্বশুরবাড়ি।

বদ্দিনাথ রাঙা দাঁত বাহির করিয়া একগাল হাসিল।—না দাদা, সেখানে বাবা বাড়ি ঢুকতে দ্যায় না। বলে, টাকা রোজগার করবি নে তো বসে বসে তোকে খাওয়াবে কে? গেছলুম আষাঢ় মাসে। বাবা হুকুম দিয়ে দিলে আমার ভাত বন্ধ করে দিতে। রাত্তিরে ইস্কুল ঘরে শুয়ে থাকতুম। বাবা দোকানে খাতা লিখতে বেরিয়ে গেলে মাকে গিয়ে বলতুম, ভাত দাও নৈলে কি আমি না খেয়ে মরবো? মা চুপি চুপি খাইয়ে দিত। আবার এসে সারাদিন ইস্কুল ঘরে শুয়ে থাকতুম। এ রকম কোরে ক'দিন কাটে? সতেরোই আষাঢ় বাড়ি থেকে বেরিয়েচি আবার।

বলিলাম—এ ক'দিন ছিলি কোথায়?

—গাড়িতে গাড়িতে বেড়াচ্চি। পরশু দিল্লী এক্সপ্রেসে গেছলুম, আজ এই এলুম। পথে পথেই ঘুরচি ক'দিন—আমার তো আর টিকিট লাগে না। ধরবে কে? এ গাড়িতে চেকার এল, ও গাড়িতে গিয়ে বসলুম। নিতান্ত ধরলে বল্লুম, গরীব ভিখিরী, পয়সা নেই। বল্লে নেমে যাও। নিতান্ত গালমন্দ দিলে তো নেমে গিয়ে পরের ট্রেনে আবার চড়লুম। গাড়ির মধ্যে বসে থাকলে তবু তো বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচি।

বৃষ্টিটা আবার জোরে আসিল। দু'জনে একটা গাড়ি-বারান্দার নীচে দাঁড়াইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, তোর মামার বাড়ি যাস্ নে কেন, শুনেচি তাদের না কি বেশ অবস্থা ভালো?

—ভালো তো, কিন্তু তারা আমায় দেখতে পারে না। সেবার বসিরহাটে আমাদের দলের গাওনা ছিল তো, ওখান থেকে মামার বাড়ি গেলুম। বড় মামা বল্লে—এখানে কি জন্যে এলি? দিদিমা বল্লে—যাকে নিয়ে সম্বন্ধ, সে-ই যখন চলে গিয়েছে তখন তোর সঙ্গে আর সুবাদ কিসের? তুই আর এখানে আসিস্ নে। সেই থেকে আর যাই নে।

একটা খাবারের দোকানে বসাইয়া বদ্দিনাথকে কিছু খাওয়াইলাম। সে যেরূপ গোগ্রাসে খাইতে লাগিল, তাহাতে বুঝিলাম কয়েকদিন তাহার অদৃষ্টে আহার জোটে নাই বোধ হয়। মনে কষ্ট হইল—ছোঁড়াটার নিতান্ত অদৃষ্ট মন্দ, এই বৃষ্টি বর্ষায় ছেঁড়া কাপড় পরিয়া খালি পেটে আশ্রয়-অভাবে আজ দিল্লী, কাল বেনারস করিয়া রেলে রেলে বেড়াইতেছে, দূর দূর করিয়া শেয়াল-কুকুরের মত সবাই তাড়াইয়া দিতেছে, এমন কি নিজের বাবা পর্যন্ত! বেচারী তবে যায় কোথায়? বলিলেই তো হইল না!

ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলাম—এক কাজ কর বোদে, তুই রাণাঘাটে আমার বাসায় গিয়ে থাক্। চল্ আমি তোকে টিকিট কেটে গাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছি—সেখানে বাড়ির ছেলের মতন থাকবি, কোন কষ্ট হবে না, চল্।

টিকিট কিনিয়া গাড়িতে উঠাইয়া দিয়া বদ্দিনাথের হাতে আনা দুই পয়সা দিয়া বলিলাম—পথে যদি দরকার হয় রৈল তোর কাছে।

শনিবার রাণাঘাটে গিয়া দেখিলাম বদ্দিনাথ বাড়িতে মেয়েদের কাছে খুব আদর-যত্ন

পাইতেছে। কাপড়-জামা মেয়েরা সাবান দিয়া কাচিয়া দিয়াছে, বাদ্দিনাথের চেহারারও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। মাথার চুল দশ আনা ছ' আনা ছাঁটা, বেশ টেরী কাটা, পথের মোড়ে সাঁকোর উপর বসিয়া বিড়ি খাইতেছিল, আমায় দেখিয়া তাড়াতাড়ি ফেলিয়া দিল।

দাদার ছোট মেয়ে পাঁচীর জন্য একখানা সাবান আনিয়াছিলাম, দুপুরের পরে সেখানা ব্যাগ হইতে বাহির করিয়া তাহাকে দিতেছি, বাদ্দিনাথ ব্যগ্রভাবে হাত বাড়াইয়া বলিল—ও সাবান কি করবে দাদা, দিন্—দিন্ না ?···

আমি একটু অবাক হইয়া গেলাম। ষোল-সতেরো বছরের ছেলে, নিতান্ত খোকাটি নয়—সাত-আট বছরের মেয়ে, সম্পর্কে তার ছোট ভাইঝি হয়—তার জিনিস কাড়িয়া লইতে যায়, আর বিশেষ করিয়া আমার হাত হইতে। পাঁচীকে বলিলাম—পাঁচী, এ সাবানখানা তোর কাকাকে দে—তোর জন্যে এখানকার বাজার থেকে আর একখানা আনিয়ে দেবো'খন। কেমন তো ?

পাঁচি আমার কথার প্রতিবাদ করিল না। নীরবে কাঁদো কাঁদো মুখে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। সাবানখানা বাদ্দিনাথ লোভ-লোলুপ ব্যগ্রতার সহিত আমার হাত হইতে একরূপ লুফিয়াই লইল। মনটা আমার কেমন অপ্রসন্ন হইয়া গেল।

দু'দিন পরে দেখিলাম বাদ্দিনাথ বাড়ির ছেলে-মেয়েদের সকলকে শাসন করিতে শুরু করিয়াছে। কাহাকেও বলিতেছে হাড় ভাঙিয়া গুঁড়া করিব, কাহাকেও বলিতেছে, পিঠে জলবিছুটি দিব ইত্যাদি। হয়তো কেউ খাবারের জন্য বাড়িতে বিরক্ত করিতেছে, কেহ বা বলিতেছে সে আজ কিছুতেই চুল ছাঁটিবে না, কেহ বা তেতো ওষুধ খাইতে চাহিতেছে না, কিংবা হয়তো নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়াছে—এই সব তাহাদের অপরাধ। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কেহ বকুনি, মার-ধর করে—এ আমি একেবারেই পছন্দ করি না। বাদ্দিনাথকে ডাকিয়া বলিয়াছিলাম—ওদের কথায় তোর থাক্‌বার দরকার কি রে বোদে ?··· ওরা যা খুশি করুক্ না, তুই ওরকম করে বকিস্ নে ওদের।

মাঝে আর একবার রাণাঘাটে গেলাম। বাদ্দিনাথকে বাড়িতে না দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—বাদ্দিনাথ কোথায় দেখ্‌চিনে যে ?

শুনিলাম সে বাড়িতে প্রায় থাকে না, দু'বেলা খাওয়ার সময় হাজির হয় মাত্র, স্টেশনের কাছে—কোন্ পাঁউরুটির দোকানে তার আড্ডা—সেখানে দিন-রাত বসিয়া ইয়ার্কি দেয়। বাড়ির ছেলেমেয়েরা তাহার নামে নানা অভিযোগ উত্থাপিত করিল। দাদার মেয়ে বলিল —আমার সে সাবানখানা বাদ্দিনাথ কাকা কেড়ে নিয়েচে, বল্লে—যদি না দিস্ তোকে মেরে চিংড়ি মাছ বানাবো।

সন্ধ্যার সময়ে মোহিত ডাক্তারের ডিস্পেন্সারিতে বসিয়া চা খাইতেছি—বাদ্দিনাথ আসিয়া বলিল—চার আনা পয়সা দিন্, বৌদি বলে দিলেন বাজার থেকে আলু নিয়ে যেতে হবে। বাদ্দিনাথের উপর মনটা তত প্রসন্ন ছিল না, কিন্তু পয়সা দিতে গিয়া মনে মনে ভাবিলাম—যাই হোক্, দুষ্টুমিই করুক আর যাই করুক, বাসার একটু-আধটু সাহায্য তো ওকে দিয়ে হচ্ছে।···বয়েস কম, দুষ্টুমি একটু-আধটু করেই থাকে।

দু'তিন দিন পরে বৌদি আবার কতকগুলি নূতন অভিযোগ বাদ্দিনাথের বিরুদ্ধে যখন আনিলেন—তখন ওই কথাই আমি বলিলাম। বৌদি বলিলেন—কবে কোন কাজ করে ও ? কে বলেছে তোমায় ঠাকুর-পো ? শুধু খাওয়া আর পাঁউরুটির দোকানে না কোথায় বসে ইয়ার্কি দেওয়া, এছাড়া আর কি কাজ ওর ?

বলিলাম—কেন, হাট-বাজার তো প্রায়ই করে। এই তো সেদিনও তুমিই ওকে বাজার করতে দিয়েছিলে, আলু না কি—এর আগেও তো অনেকবার—

বৌদিদি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—আমি! কবে—কে আমার তো মনে হয় না, কে বল্লে?

আমি বলিলাম—বল্‌বে আবার কে? আচ্ছা দাঁড়াও, ডাকিয়ে দিচ্ছি।

আমার মনেও কেমন সন্দেহ হইল। বন্দিনাথকে ডাকাইলাম কিন্তু তাকে বাড়িতে পাওয়া গেল না। বৌদিদি বলিলেন, তিনি দিব্য করিতে প্রস্তুত আছেন যে, বন্দিনাথকে কখনও কিছু কিনিয়া আনিতে তিনি দেন নাই। তখন মনে পড়িল বন্দিনাথ এটা-ওটা বাড়ির ফরমাশের ছুতায় আমার নিকট হইতে দু'আনা চার আনা অনেকবার আদায় করিয়াছে, প্রায়ই যখন মোহিত ডাক্তারের ডিস্‌পেনসারিতে বসিয়া আড্ডা দিই, সেই সময় গিয়া চায়—উঃ, ছোকরা কি ধড়িবাজ, ঠিকই বুঝিয়াছিল যে আমি যখন আড্ডায় মশগুল, তখন পয়সা চাহিলেও আমি তাহার কাছে কোন কৈফিয়ৎ চাহিব না, কেন পয়সা, কিসের জন্য পয়সা—অথবা বাড়িতেও সে বিষয়ের উল্লেখ করিতে ভুলিয়া যাইব।

ভাবিলাম, ছোঁড়াকে এমন শিক্ষা দিব যাহাতে ওপথে আর কখনো না যায়, কিন্তু সেদিন আমি আহারাদি করিয়া রাত্রের ট্রেনে যখন কলিকাতা রওনা হইলাম, তখন পর্যন্ত বন্দিনাথ বাড়ি ফেরে নাই।

পুনরায় বাড়ি আসিলাম মাসখানেক পরে।

বন্দিনাথের কথা তখন নানা কাজে একরূপ চাপা পড়িয়া গিয়াছে—তাহার উপর রাগটাও পড়িয়া গিয়াছে। পূজার অল্পই দেরি, রাণাঘাটের বাজারেই প্রতি বছর কাপড়-চোপড় কিনি, কে বহিয়া আনে কলিকাতা হইতে? হইল না হয় দু'এক পয়সা দর বেশী। বাড়ির ছেলে-মেয়ে সঙ্গে লইয়া কাপড়ের দোকানে গিয়া পছন্দসই জিনিস কিনিবার বেশ একটা আনন্দ আছে, কলিকাতা হইতে মোট বাঁধিয়া কাপড় কিনিয়া আনিলে সে আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। বন্দিনাথ আর্জি পেশ করিল তাহার কাপড় চাই, জুতা চাই, শার্ট চাই, গামছা চাই, একটা টিনের তোরঙ্গ চাই।

দেখিলাম অনেক টাকার খেলা। তোরঙ্গের কি দরকার এখন? থাক এখন, পূজোর পর দেখা যাইবে। দু'জোড়া কাপড় কেন, এখন এক জোড়াই চলুক, একটা শার্টেই পূজা কাটিয়া যাইবে এখন। জুতা একেবারেই নাই? পায়ের মাপটা দিলে বরঞ্চ আস্‌চে শনিবার চীনে বাড়ি—

পূজার সপ্তমীর দিন একটা ঘটনা ঘটিল। বৈঠকখানায় বসিয়া দৈনন্দিন বাজার-হিসাব লিখিতেছি, বাহির হইতে অপরিচিত চড়া গলায় কে বলিল—এইটে কি সামন্ত পাড়ার বিনোদ চৌধুরীর বাড়ি?

জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিলাম—আমারই নাম। কি চাই?

মড়ুইপোড়া বামুনের মত চেহারা একটা পাকসিটে গড়নের লোক ঘরে প্রবেশ করিল। মাথার চুল কাঁচায়-পাকায় মেশানো, আর লম্বা লম্বা, গায়ে আধ ময়লা গেঞ্জির ওপরে একটা চাদর। হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—ভালোই হলো, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। প্রণাম হই চৌধুরী মশায়। কথাটা বল্‌তেই হয় শেষকালটা। আপনার ছোট ভাই সুরেন আমাদের দোকান থেকে—

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—আমার ছোট ভাই সুরেন?

—হ্যাঁ, ঐ যে লম্বা, একহারা কালোমত চেহারা, ছোক্‌রা, ষোল-সতেরো বছর বয়স—

বুঝিতে বিলম্ব হইল না লোকটা কাহার কথা বলিতেছে। বলিলাম, হ্যাঁ, কি করেছে শুনি?

—কি আর করবে, সর্ব্বনাশ করেছে মশাই। আমাদের ঐ ইস্টিশনের মোড়ে রুটিবিস্কুটের কারখানা আর দোকান—দেখেচেন বোধ হয়, বাবু তো ওইখান দিয়েই যান আসেন। আমার নাম রতন ঠাকুর, শ্রীরামরতন বাঁড়ুয্যে। আজ্ঞে পরিচয় দিতে লজ্জা হয়, কি করি পেটের দায়ে—

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—তারপর কি হয়েচে বলছিলেন ?

সে এক লম্বা গল্প করিয়া গেল। বন্দিনাথ ওখানে বসিয়া আড্ডা দিত, আমার সহোদর ভাই এবং নাম সুরেন এই পরিচয় দিয়া সেখানে খুব খাতির জমাইয়াছিল। বলিত, দাদার সঙ্গে বনিতেছে না, শীঘ্রই সে নাকি পৃথক হইবে। রাধাবল্লভতলায় একখানা বাড়ি আছে, তাহারই ভাগে পড়িবে সেখানা। তখন সে-ও রতন ঠাকুরের রুটি-বিস্কুটের ব্যবসায় যোগ দিবে, কিছু মূলধন ফেলিতেও রাজী আছে। রতন ঠাকুর তাহাকে বিশ্বাস করিয়া দোকানে বসাইয়া মাঝে মাঝে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে নিজের ভেণ্ডারদের কাছে যাইত—এরকম আজ মাস দুই চলিয়া আসিতেছে, রতন কোন অবিশ্বাস করিত না। ইদানীং রতন তাহারই উপর কেনাবেচার ভার দিয়া হয়তো দু'পাঁচ ঘণ্টার জন্য দোকানে অনুপস্থিত থাকিত। গত কল্য রতন চাকদায় গিয়াছিল কি কাজে ; বন্দিনাথকে দোকানে বসাইয়া গিয়াছিল। আজ সকালে ক্যাশ মিলাইতে গিয়া রতন দেখে ছাব্বিশ টাকা তেরো আনা ক্যাশ বাক্স হইতে উধাও হইয়াছে। নিশ্চয়ই এ বন্দিনাথ ছাড়া আর কাহারও কাজ নয়, হইতেই পারে না, তাই সে সকালেই ছুটিয়া আমার কাছে আসিয়াছে।

কোনো রকমে বুঝাইয়া ভরসা দিয়া রতন ঠাকুরকে বিদায় দিলাম। যখন আমার সহোদর ভাই বিশ্বাসে রতন ঠাকুর তাহাকে প্রশ্রয় দিয়াছে, তখন সে আমার যেই হোক্—টাকা মারা যাইবে না রতনের। না হয় আমি নিজেই দিব।

বন্দিনাথকে রতনের সামনে ডাকানো আমি উচিত বিবেচনা করিলাম না, ঘরের ভিতর তর্কাতর্কি কথা-কাটাকাটি আমি পছন্দ করি না।

রতন চলিয়া গেলে বন্দিনাথকে ডাকাইয়া বলিলাম—আমার এখানে থাকা তোমার পোষাবে না বন্দিনাথ, তুমি অন্য জায়গা দেখে নাও।

বিকালে বন্দিনাথ পোঁটলা-পুঁটলি লইয়া বিদায় হইল। এর পরে বন্দিনাথকে দেখি নাই আর অনেক দিন।

মাস পাঁচ ছয় পরে ট্রেনে কলিকাতা হইতে ফিরিতেছি, ব্যারাকপুরের প্ল্যাটফর্ম্মে হঠাৎ দেখি অতি মলিন এক কাচা গলায় বন্দিনাথ। ব্যাপার কি ? সেজমামা ও মামীমা দিব্য সুস্থ দেহে বর্ত্তমান আছেন, গত শনিবারেও দেখা করিয়া আসিলাম, তবে বন্দিনাথের গলায় কাচা কিসের ? ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিবার পূর্ব্বেই বন্দিনাথ আমার গাড়ির দরজাতে আসিয়া পেঁছিল এবং ইনাইয়া বিনাইয়া যাত্রীদের কাছে বলিতে লাগিল যে সম্প্রতি তাহার মাতৃবিয়োগ হইয়াছে, তাহার আর কেহ নাই, কি করিয়া মাতৃদায় হইতে উদ্ধার হইবে ভাবিয়া ভাবিয়া রাত্রে ঘুম হয় না, অতএব—ইত্যাদি।

আমি দেখিলাম, আমার কামরায় আসিল বলিয়া, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি সে কামরা হইতে নামিয়া অন্য একখানা গাড়িতে গিয়া উঠিলাম। কি বিপদ ! কি বিপদ ! এমন বিপদেও মানুষে পড়ে !

একদিন বড়মামার বাসায় গিয়া গল্পটা করিলাম। বড়মামা বলিলেন—ওর কথা আর বোলো না। মধ্যে কি মাসটা এখানে তো এল। তোমার মামীমা বল্লেন, বোদে তুই তো এলি—তোর পকেটে তো একটা পয়সাও নেই দেখছি—আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে রে। বোদে বল্লে, আমারও ভয় হচ্ছে জ্যাঠাইমা, টুনুর গলার হার, ছোট খুকীর বালা সামলে রাখো।

তোমার মামীমা তখ্খুনি তাদের হার বালা সব খুলে ট্রাঙ্কের মধ্যে পুরলেন। খুব সকালে বন্দিনাথ চলে গেল, আমি তখনও মশারীর মধ্যে শুয়ে। একটু বেলা হোলে দেখি, আমার বাঁধানো হুঁকোটা ঘরের কোণে নেই। খোঁজ্ খোঁজ্—আর খোঁজ্!···কার কীর্ত্তি বুঝতে বাকী রইল না। সেই থেকে আর তাকে দেখি নি। ছোক্রাটা এমন করে উচ্ছন্ন গেল! ওর বাবারও দোষ নেই। ওকে মানুষ করবার চেষ্টা যথেষ্ট করেছিল কিন্তু যে মানুষ না হবার, তাকে মানুষ করে কার সাধ্যি?

পুজোর পরে সেজো মামার পত্রে জানিলাম, দত্তপুকুরের জমিদার কাছারী হইতে একখানা পুরানো কাপড় চুরি করিবার ফলে বন্দিনাথের জেল হইয়াছে তিন মাস। জেল হইতে বাহির হইবার অনেক দিন পরে সে একবার রাণাঘাটে আমার বাসায় আসিল। সবারই মুখে শুনিতে পাইলাম বন্দিনাথ ভালো হইয়া গিয়াছে, কি করিয়া তাহারা এ কথা জানিল, আমি তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু হঠাৎ দেখি বন্দিনাথকে বাড়ির সবাই খুব যত্ন আদর করিতেছে। দিন দুই তিন বাসায় থাকিল, একদিন সকালে বন্দিনাথ চা খাইতে খাইতে আমারই সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছে, বৌদিদি আসিয়া বলিলেন,—বোদে, এই বাটি রইলো আর ঠাকুরপোর কাছ থেকে দশটা পয়সা নিয়ে ওই মোড়ের দোকান থেকে সর্ষের তেল নিয়ে আসিস্ তো! বন্দিনাথকে পয়সা বাহির করিয়া দিলাম চা খাওয়ার পরে। বন্দিনাথ কাঁসার বাটিটা হাতে করিয়া পয়সা ট্যাঁকে গুঁজিয়া বাহির হইয়া গেল। সকাল সাড়ে সাতটার বেশী নয়।

বন্দিনাথের সঙ্গে পুনরায় দেখা বছরখানেক পরে, হঠাৎ একদিন কলকাতায়, সীতারাম ঘোষের স্ট্রীটের মধ্যে একটা গলির মোড়ে। জীর্ণ, মলিন, ছন্নছাড়া মূর্ত্তি—খালি পা, বড় বড় ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল, যেমন ময়লা কাপড় পরনে, ততোধিক ময়লা জামা গায়ে।

প্রথম কথাই আমার মুখ দিয়া কি জানি বাহির হইয়া গেল, হ্যাঁ রে, বোদে, বাটিটা কি করলি রে?—

এই এক বৎসর যেন ওই কথাটা জানিবার জন্যই হাঁ করিয়া ছিলাম। বন্দিনাথ বিপন্নমুখে কি একটা জবাব দিবার দু'একবার চেষ্টা করিতে গিয়া যেন বিষম খাইল এবং হঠাৎ সুড়ুৎ করিয়া পাশের গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ডানপিটে

যে সময়ে আমাদের গল্পের শুরু, কাশীতে তখন উৎকৃষ্ট লাচ্ছাদার রাবড়ি পাঁচ আনা সের বিক্রয় হইত, ল্যাংড়া আম টাকায় এক পণ, মহিষের দুধ টাকায় পাকি বারো সের।

কাশীতে তখন স্কুল-কলেজ বেশী ছিল না, শহরের বসতি আরও ঘিঞ্জি ছিল, তেলের আলো জ্বলিত রাস্তায়, অত্যন্ত অপরিষ্কার ছিল শহরের অবস্থা, গাড়ি-ঘোড়া ছিল কম। বুড়ুয়া-মঙ্গলের মেলার সময় গঙ্গার ধারে ধনীদের দু'চারখানা নতুন ধরনের ভিক্টোরিয়া কি ফিটন দেখা যাইত। একা ও স্প্রিং-বিহীন টাঙা ছিল প্রধান সম্বল, শহরের বাহিরে উটের গাড়ি চলিত।

গণেশ মহল্লাতে তখন রামজীবন চক্রবর্ত্তীর খুব নাম ও পসার-প্রতিপত্তি। কমিসারিয়েট্

বাংলা ১২৮৭-৮৮ সালের কথা।

বিভাগে বড় চাকুরিতে তিনি বেশ দু'পয়সা রোজগার করিয়াছিলেন, তবে হাতে রাখিতে পারিতেন না। সেকালের রীতি অনুযায়ী তাঁর কাশীর বাড়িটা ছিল একটা হোটেলখানা। চাকুরি-প্রয়াসী বা অক্ষম ও নিরাশ্রয় আত্মীয়স্বজন ও স্ব-গ্রামের লোকের ভিড়ে বাড়িতে পা দিবার স্থান থাকিত না।

রামজীবনবাবুর চার ছেলে, বড় তিনটি ভয়ানক ডানপিটে, স্কুলে যাইবার নাম করিয়া পথে মারামারি করিত, ঘুড়ি উড়াইত, স্কুলের সময়টি কাটাইয়া ছুটির সময়ে বাড়ি ফিরিত। ইহাদের উপযুক্ত সঙ্গীও জুটিয়াছিল দশ-বারোজন পাড়ার ছেলে, সকলেই সমান ডানপিটে, সমানই তাদের বিদ্যার্জন-স্পৃহা। স্কুলের সময় দল বাঁধিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া হয়তো শহরের বাহিরে পথের ধারের এক বড় পেয়ারা বাগানে ঢুকিয়া ফল ছিঁড়িয়া খাইয়া ফেলিয়া ছড়াইয়া নষ্ট করিয়া বেলা চারটার পরে বাড়ি ফিরিত। কোনোদিন বা সারনাথের পথে কোথাও চড়ুইভাতি করিতে গেল। মাসের মধ্যে পনেরো দিন এইরকম চলিত।

গণেশ-মহল্লাতে প্রেমচাঁদ মুখুয্যে নামে নদীয়া জেলার একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কাশীবাস করিতেন। তাঁর এক পিতৃমাতৃহীন ভাই-পো তাঁর কাছে থাকিয়া নামে বিদ্যাভাস করিত। কাজে সে ছিল উপরোক্ত ডানপিটে স্কুল-পালানো ছেলের দলের একজন চাঁই সদস্য। ভ্রাতুষ্পুত্রটির নাম সতীশ, রং টকটকে গৌরবর্ণ, একহারা চেহারা, নতুন স্প্রিং-এর মত তার সমস্ত দেহের একটা দৃঢ়তা, বাঁধুনী ও স্থিতিস্থাপকতা ছিল। নতুন নতুন বদমায়েশি ফন্দী আঁটিবার বুদ্ধিতে ও সাহসে দলের সকলেই তার কাছে হার মানিত।

ফলে এই দলটির লেখাপড়া যাহা হইবার হইল, তারপর যখন শখের থিয়েটারের ধুম কলিকাতা হইতে কাশী গিয়া পেঁছিল, এদের দল কাশীতে নব আন্দোলনের প্রতিভূ ও প্রাণ-স্বরূপ হইয়া মহা উৎসাহে নিজেরাই বড় বড় কাগজে সিন্ আঁকিয়া বেলের আঠা দিয়া জুড়িতে লাগিল। নিজেরাই স্টেজ বাঁধিল এবং ঘণ্টা মার্কা সবেদার সাহায্যে রাজা, উজির সাজিয়া নাটকাভিনয় শুরু করিল।

বছর পাঁচেক পরে প্রেমচাঁদ মুখুয্যের লীলা-প্রাপ্তি ঘটিল, গণেশ-মহল্লার রামজীবনবাবুও গভর্নমেণ্ট পেন্সনের মায়া কাটাইলেন। তাঁর ছেলেরা পৈতৃক অর্থ ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লইয়া ভায়ে ভায়ে পৃথক হইল। সতীশ নিরাশ্রয় ও কপর্দকশূন্য অবস্থায় এখানে-ওখানে ঘুরিতে ঘুরিতে জুটিল গিয়া নেপালে।

নেপালে যে কি করিয়া সে দরবার হাসপাতালে কম্পাউণ্ডারী পাইয়া চাকুরিতে ও চিকিৎসা ব্যবসায়ে দু'পয়সা রোজগার করিতে লাগিল,—যে সতীশ ইংরাজি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর গণ্ডি দু'তিন বৎসরেও ডিঙাইতে পারে নাই, সে কি করিয়া দুরূহ ইংরাজীতে লেখা ডাক্তারী বই আয়ত্ত করিয়াছিল, সামান্য বেতনের কম্পাউণ্ডার হইয়া সে কি ভাবে অবসর সময়ে রোগী দেখিয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ে বেশ নাম করিয়া ফেলিয়াছিল—সে সব খবর দিতে পারিব না। কিন্তু প্র্যাক্‌টিসে সে বাস্তবিকই সুনাম অর্জন করিল, বিশেষ করিয়া অস্ত্র-চিকিৎসায়। ভালো ও নিপুণ অস্ত্র-চিকিৎসকের যে যে গুণ থাকা দরকার—সাফ্ হাত, সাফ্ চোখ, সাহস, সতর্কতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অবিচলিত বিচার-বুদ্ধি—এই সব গুণ তার ধীরে ধীরে বাড়িতে লাগিল—সঙ্গে সঙ্গে পসারও।

সতীশ নেপালে আসিয়া স্থানীয় স্কুলের জনৈক শিক্ষকের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। শিক্ষকের নাম মৃত্যুঞ্জয়বাবু, বাড়ি নদীয়া জেলার মেহেরপুরে। পাঁচ বৎসর অন্তর বৃদ্ধ পিতাকে দেখিতে একবার করিয়া দেশে যাইতেন। বিবাহের দুই বৎসর পরে বাংলা ১৩০৭ সালে তাঁহাদেরই সঙ্গে সতীশ বাংলাদেশে অনেককাল পরে ফিরিয়া আসিল ও সর্বপ্রথম

কলিকাতা শহর দেখিল। পৈতৃক বাসস্থান যে গ্রামে ছিল, সেখানেও একবার গেল। বাংলাদেশে আসিয়া সতীশের মনে হইল যে, মায়ের মুখ সে ভাল মনে করিতে পারে না, ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্ট সামান্য একটু মনে পড়ে, যেন মেঘলা দিনের দিবানিদ্রার স্বপ্ন—সে মায়ের স্নেহ সারা দেশটাতে ছড়াইয়া পড়িয়া যেন সাগ্রহে তাহার প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া বসিয়া আছে। গ্রামে আসিলে গ্রামের তো কেহ তাহাকে চিনিতেই পারে না, কারণ সে গিয়াছিল নিতান্ত ছেলেবেলাতে দশ-বারো বছর বয়সে। পৈতৃক ভিটা খুঁজিয়া বাহির করিতে বেগ পাইতে হইল, কারণ এমন দুর্ভেদ্য বন-জঙ্গলে ঢাকিয়া পড়িয়াছে যে বাহির হইতে চিনিয়া লওয়াই কষ্টকর।

গ্রামের সকলেই আসিয়া ধরিয়া বসিল যে, তাহাকে দেশে ঘরবাড়ি করিতে হইবে—এখানে বাস করিতে হইবে। ইহার মধ্যে প্রতিবেশীর পুত্রের উপর নিছক নিঃস্বার্থ ভালবাসা ছিল না, তাহা বলাই বাহুল্য। দেশে মোটে ডাক্তার নাই, সতীশের মত একজন নামজাদা ডাক্তার গ্রামে বসিয়া প্র্যাক্‌টিস করিলে গ্রামের লোকের সুবিধা বড় কম নহে—চক্ষুলজ্জার খাতিরে অন্ততঃ গ্রামের লোকের কাছে সে তো আর ভিজিট লইতে পারিবে না?

সেবার সতীশ ভিটার মায়া কাটাইয়া ফিরিয়া গেল বটে, কিন্তু দেশের মায়া তাহাকে পাইয়া বসিয়াছিল—পরের বৎসরই সে পুনরায় শীতকালে ছুটি লইয়া গ্রামে ফিরিয়া পৈতৃক ভিটার বনজঙ্গল কাটাইয়া সেখানে টিনের ঘর তুলিয়া ফেলিল। ছুটি ফুরাইলে আবার কর্ম্মস্থানে ফিরিল সেবারও।

কিন্তু দেশের মায়া একবার পাইয়া বসিলে তাকে কি ছাড়ানো সহজ? চন্দ্রাগিরি, উদয়গিরির দুর্গম গিরিসঙ্কট পার হইয়াও নদীয়া জেলার ক্ষুদ্র গ্রামের ডাক নেপালে গিয়া পেঁৗছিয়াছিল। পর বৎসর সতীশ চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া স্ত্রী-পুত্র সহ দেশে আসিয়া বসিল ও গ্রামে প্র্যাক্‌টিস শুরু করিল।

সে আজ বত্রিশ বছর পূর্ব্বের কথা। তখন অলিতে-গলিতে এম্‌-বি পাশ ডাক্তার হয় নাই, আজকালকারের মত পাশ-করা ডাক্তার খুঁজিয়া মেলানো দুর্ঘট ছিল। নিকটবর্ত্তী নরহরিপুরের বাজারে তখন যাদুরাম স্যাক্‌রা ছিল দেশের মধ্যে বড় ডাক্তার।

যাদুরাম বাদে একজন মুসলমান হোমিওপ্যাথ, একজন কবিরাজও ছিল। ইহারা গেল প্রবীণের দলে। তরুণের মধ্যে কানাইলাল রায় কলিকাতা হইতে কিসের একখানা সার্টিফিকেট আনিয়া ডাক্তার সাজিয়া বসিয়াছিল।

সতীশ আসিয়াই প্র্যাক্‌টিস জমাইয়া ফেলিল। সে উপরোক্ত হাতুড়ে দলের অনুকরণে নরহরিপুরের বাজারে ডাক্তারখানা খুলিয়া আধহাত লম্বা হরফে নিজের নামের সাইনবোর্ড ঝুলাইল না, বা রোগীর বাড়ি আসিয়া স্থানীয় অন্যান্য ডাক্তারদের নিন্দাবাদ করাও অভ্যাস করিল না। গ্রামের বাড়ির একখানা ঘরে ঔষধ রাখিত, আলাদা ডিস্‌পেন্‌সারিও ছিল না —রোগীরা আসিয়া বসিত সতীশের বাড়ির সামনে বটতলায়,—তাহাদের বসিবার স্থানের পর্য্যন্ত কোনো বাবস্থা ছিল না।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও সতীশের বাড়ির সামনের বটতলায় রোগীর ভিড় দিন দিন বাড়িয়া চলিল। দিনরাতে স্নানাহারের সময় নাই, সাত-আট ক্রোশ দূরের গ্রাম হইতেও রোগী দেখিবার ডাক আসিতেছে, গরুর গাড়িতে রোগী দেখিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সতীশ হাঁপাইয়া পড়িল। প্রতিদিন সকালে নিজের বাড়িতে গড়ে তিন-চারটা সার্জ্জিক্যাল কেস লাগিয়াই আছে।

ব্যাপার দেখিয়া যাদুরাম একদিন কানাই ডাক্তারকে ডাকিয়া বলিল, "এত রুগী এ-দেশে

ছিল কোথায় এতদিন হে ?" গত বিশ বৎসরের মধ্যে যাদু ডাক্তার এত রোগীর ভিড় কখনো দেখে নাই এ-অঞ্চলে।

বেগতিক বুঝিয়া কবিরাজটি একদিন জিনিস-পত্র বাঁধিয়া অন্যত্র সরিয়া পড়িল—কানাই দরজির দোকান খুলিবার জন্য সুবিধামত দোকানঘরের সন্ধান করিতে লাগিল। যাদু স্যাকরার অন্য কোনো উপায় ছিল না এ-বয়সে। আগেকার দু'পাঁচটা বাঁধা পুরানো ঘর ও পূর্ব্ব-সঞ্চিত সামান্য কিছু টাকার জোরে কোনো রকমে টিকিয়া রহিল মাত্র।

সতীশের দু'টি ছেলে ও ছোট একটি মেয়ে। মেয়েটির হঠাৎ একদিন ভয়ানক জ্বর হইয়া পড়িল। নিজের বাড়িতে নিজে চিকিৎসা করা যায় না বলিয়া সতীশ যাদুরাম স্যাকরাকে ডাকাইল। যাদুরাম দেখিয়াই বিষণ্ণমুখে বলিল, তাই তো মুখুয্যে ম'শায়, এ তো ভয়ানক রোগ, আপনিও বোঝেন, আমিও বুঝি, এ-রোগ তো এখানে সারবার নয়। এখন অন্য সবাইকে তফাৎ করুন, ছোঁয়াছুঁয়ি না হয়, ডিপ্‌থিরিয়া বড় সাংঘাতিক ব্যাপার কিনা ?

যাদুরাম প্রাণপণে ক'দিন দেখিল, কিছুই করা গেল না। তৃতীয় দিনে মেয়েটি মারা পড়িল।

এই ব্যাপারের পর হইতে সতীশের স্ত্রীর সামান্য মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিল—আপন মনে বকুনি, ইহাই দাঁড়াইল উপসর্গ। নয় তো অন্য সর্বদিকে কোন অপ্রকৃতিস্থতার চিহ্নও নাই, সংসারের কাজ-কর্ম্ম, স্বামী পুত্রের যত্ন—কিছুরই মধ্যে কোন ত্রুটি নাই।

সতীশ বড় দমিয়া গেল। হাতে পয়সার জোর ছিল, কিছুদিন প্র্যাক্‌টিস বন্ধ রাখিয়া এখানে-ওখানে ঘুরাইয়া আনিল সকলকে, পূর্ব্ববঙ্গে শ্বশুরবাড়ি গিয়া রহিল কিছুদিন, কলিকাতায় আসিয়া ডাক্তার-কবিরাজ দেখাইল, তখনকার মত উপশম না হইল যে এমন নয়। কিন্তু দেশে আসিয়াই 'যথা পূর্ব্বং তথা পরং।'

বড় ছেলেটির বয়স বারো, সে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী রামনগরের হাই স্কুলের বোর্ডিং-এ থাকিয়া পড়াশুনা করিতেছিল। ছোট ছেলেটিকেও এবার সতীশ সেখানে রাখিয়া দিল।

এ-সব বাংলা ১৩১২ সালের কথা।

তারপর যেমন অন্য পাঁচজন মানুষের দিন যায়, সতীশের দিনও তেমনি ভাবে যাইতে লাগিল।

রোগী দেখা, টাকা রোজগার, সংসার প্রতিপালন।

ছেলেরা বড় হইল। বড় ছেলেটির নাম বিনয়, সে আই-এস-সি পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়িতে লাগিল। সতীশ পুত্রবধূর মুখ দেখিবার জন্য এই সময় তাহার বিবাহও দিল। ছোট ছেলে তখনও স্কুলের ছাত্র, সে তার দাদার চেয়েও মেধাবী এবং সুবোধ। ইতিমধ্যে নানাস্থান হইতে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ যাতায়াত করিতেছিল।

এ সব গেল বাহিরের ব্যাপার। সতীশের মনের বড় অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল ধীরে ধীরে। পনেরো-ষোলো বৎসর ধরিয়া সে এই গ্রামে এবং পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে ডাক্তারী করিতেছে—এই পনেরো-ষোলো বৎসরের জীবনে নিতান্ত একঘেয়ে ; রোগী দেখা, খাওয়া, ঘুমানো—ভূষণ দাঁ-এর দোকানে বসিয়া মাঝে মাঝে গল্প-গুজব, সংসারের বাজার-হাট করানোর ব্যবস্থা করা—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর—একঘেয়ে, এক রকম জীবনধারা, বৈচিত্র্য নাই, পরিবর্ত্তন নাই, নতুনতর অনুভূতির কোনো আসিবার পথ নাই কোনো দিক্ দিয়া। কিন্তু সতীশ এ বিষয়ে খুব সচেতন নয়, জীবনে তেমন আর আনন্দ নাই, এ কথা এক-আধবার তাহার মনে যে না উঠিয়াছে এমন নয়—কিন্তু এ লইয়া ভাবিতে সে বসে নাই কখনো, ভাবিবার সময়ও পায় নাই।

কিন্তু ক্রমে এ কথাটা তাহার মনের মধ্যে উঁকি মারিতে লাগিল। হয়তো নিস্তব্ধ দুপুরে বিলের পাশের পথ দিয়া গরুর গাড়িতে আরামে সে ভিন্ গাঁয়ে রোগী দেখিতে চলিয়াছে। মাঠের ধারে ধারে ঘুঘু পাখীর ডাকে কিংবা বিলের গভীর জলে বাগদীছেলের ডোঙা চড়িয়া মাছ ধরিবার দৃশ্যে—সে দেখিত সে হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া কাশীতে যাপিত বাল্যজীবনের কথা ভাবিতেছে—রামরাম সাহু হালুইকরের দোকানে লছমী বলিয়া সেই মেয়েটি থাকিত—এতকাল পরেও তার সে গলার সুমিষ্ট সুর যেন প্রাণে লাগিয়া আছে···একবার সে, রামজীবন বাবুর বড় ছেলে বাদল, তাঁর ভাগ্নে নরু—তিনজনে জঙ্গম বাড়ির বারোয়ারী আসরে সিদ্ধি খাইয়া কি কাণ্ডটাই করিয়াছিল।···

নেপালে একবার কর্ণেল খড়্গ সমসেরের জঙ্গ রাণা বাহাদুরের কন্যার বিবাহেতে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিল। গিয়া দেখিল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নাই—একটা মোড়কের মধ্যে মসলা ও সুপারি আর একটা মোড়কে পাঁচটি টাকা। সতীশ কর্ণেল বাহাদুরের দেওয়ানকে বলিল—টাকা কিসের? নিমন্ত্রিত হয়ে এসে টাকা নেওয়া আমরা অপমানজনক মনে করি। দেওয়ান বলিল—এখানে এই নিয়ম। না নিলে কর্ণেল চটতে পারেন।

সতীশ রাগ করিয়া বলিল—চটে আমার কি করবেন তিনি? চাকরি নেবেন? নিন—আমি এখুনি ইস্তফা দিতে রাজী আছি, টাকা কখনই নিতে পারবো না।

গোলমাল শুনিয়া রাণা বাহাদুর নিজে আসিয়া ব্যাপারটা অন্যভাবে মিটাইয়া দিলেন। চাকুরি যাওয়া তো দূরের কথা, সেই মাসেই সতীশের দশ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়াছিল।···

গত পনেরো বৎসর ধরিয়া সতীশ তো অনবরত সকলের কাছেই কাশী আর নেপালের গল্প করিয়া আসিতেছে। তাহার সমবয়সী লোকদের কাছে, দেশের বন্ধুদের কাছে, রোগী ও রোগীদের আত্মীয়-স্বজনের কাছে—কিন্তু সে শুধু বাহাদুরি লইবার জন্য, সে কত দেশ বেড়াইয়া কত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে, কত বড়মানুষী করিয়াছে, কত বড় বড় লোকের সমাজে মিশিয়াছে—তাহা সাড়ম্বরে জাহির করিবার জন্য। এবার কিন্তু এ সব জীবনের স্মৃতি একটা অস্পষ্ট বেদনার মত তাহার মনে আসিয়া উদয় হইতে লাগিল—কি যেন একটা জিনিস চিরকালের জন্য হারাইয়া গিয়াছে, আর কোনো দিন তাহার সাক্ষাৎ মিলিবে না, সতীশের এই এত বড় পসারের বিনিময়েও না, সঞ্চিত অর্থের বিনিময়েও না, কোনো কিছুতেই না।

এ গ্রামের জীবনও ক্রমে নিরানন্দ হইয়া উঠিতে লাগিল। সতীশ গ্রামে আসিয়া ও গ্রামে যে কয়টি সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী প্রবীণ আত্মীয়-স্থানীয় লোক পাইয়াছিল, এ পাড়ার অম্বিকা রায়, শ্যামাকান্ত গাঙ্গুলী—ও পাড়ার বৃদ্ধ গোঁসাই মশায়—এঁরা একে একে মারা গেলেন।

আষাঢ় মাসের শেষে যাদুরাম স্যাকরার রোগশয্যা-পার্শ্বে সতীশের ডাক পড়িল।

যাদুরামের বয়স হইয়াছিল প্রায় পঁচাত্তর বৎসরের কাছাকাছি, গত দশ বৎসর অর্থাভাব ও দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া যাদুরামের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। সতীশ বুঝিল এই বয়সে, তার উপর ডবল নিউমোনিয়া রোগ, যাদুরামও বিছানা ছাড়িয়া আর উঠিবে না। যাদুরাম নিজেও সেটা খুব ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল—ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, মুখুয্যে মশায়, ওষুধ আর কি দেবেন, পায়ের ধুলো দিন। একটা কথা বলি, নাতিটার উপায় করতে পারলাম না, দু'দুটো ছেলে মারা গেল—ওইটুকু বংশের মধ্যে শিবরাত্রির সলতে, ওকে আপনার চরণে দিয়ে গেলাম। কম্পাউণ্ডারীতে ভর্ত্তি করে নেবেন আপনার ডাক্তার-

খানায়—বছর তিনেক দেখে শুনে শিখলে তবুও অন্য চাষা গাঁয়ে গিয়ে হাতুড়েগিরি করেও দুটো খেতে পারবে।

সতীশের চোখ জলে ভরিয়া আসিল ভগ্নহৃদয় বৃদ্ধ চিকিৎসকের অন্তিম শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া। সে আশ্বাস দিল, এ বিষয়ে তাহার দ্বারা যতদূর সাধ্য সে করিতে ত্রুটি করিবে না। যাদুরাম এমন পয়সা রাখিয়া যায় নাই, যাহাতে তাহার শ্রাদ্ধের খরচ নির্ব্বাহ হইতে পারে—সতীশ নিজে শ্রাদ্ধ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিল। নাতিকে নিজের ডাক্তারখানায় আনিয়া কাজ শিখাইতে লাগিল, খুচরা কিছু দেনা ছিল বৃদ্ধের, তাহারও একরূপ সাময়িক মীমাংসা করিয়া দিল।

এই সময় সতীশের নিজের সময়েরও পরিবর্ত্তন দেখা দিল। ছোট ছেলের কলেজের খরচ, বড়ছেলের ডাক্তারী পড়ার খরচ—এদিকে কি জানি কেন রোগীর সংখ্যা কমিতেছে। স্থানটা কি হঠাৎ স্বাস্থ্যনিবাস হইয়া উঠল নাকি? সঞ্চিত অর্থে ক্রমশঃ হাত পড়িতে লাগিল—এবং সাধারণতঃ যাহা ঘটিয়া থাকে, একবার সঞ্চিত অর্থে হাত যখন পড়িল, সে হাতকে আর গুটানো গেল না—বৎসরের পর বৎসর ক্রমশঃ খরচ বাড়িয়াই চলিয়াছে—আয় তেমন নাই, হাতের টাকা নিঃশেষ হইতে এ অবস্থায় কত দিন লাগে?

সতীশ অমানুষিক পরিশ্রম করিতে লাগিল। আর দুটো বছর, বিনয় মানুষ হইলে আর কিসের ভাবনা? এ অঞ্চলে এম্-বি পাশ করা ডাক্তার কটা আছে? কখনো যে সব গ্রামে দশ টাকা ভিজিটের কমে সতীশ যায় নাই—এখন চার টাকা লইয়াও সেখানে যাইতে হইতেছে। নিজে দুধ খাওয়া ছাড়িয়া দিল—বাড়ির চাকরকে জবাব দিল। খরচ কম পড়িবে বলিয়া স্ত্রী ও পুত্রবধূকে কলিকাতায় পাঠাইয়া ছেলেদের বাসা করিয়া দিল—নিজে দেশে হাত পুড়াইয়া রাঁধিয়া খাইয়া এবং সারাদিন টো টো করিয়া গ্রামে গ্রামে রোগী দেখিয়া যাহা পায়, প্রতি সপ্তাহে কলিকাতার বাসাতে বিনয়ের নামে মণিঅর্ডার করে।

বিনয় এম্-বি পাশ করিয়া যুদ্ধে গেল।

সতীশের দুঃখ ঘুচিল এতদিনে।

গ্রামের মধ্যেও একটা সাড়া পড়িল না এমন নয়। এ অঞ্চলে এম্-বি পাশ করা ডাক্তার এই প্রথম। তাহার উপর বিনয় আবার গবর্নমেন্টের চাকরি পাইয়া সুদূর মেসোপটেমিয়ায় গিয়াছে। সেদিন নাকি ছোটখাটো একটি খণ্ডযুদ্ধে আরবদের গুলি বিনয়ের কানের পাশ কাটাইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, পয়সা কি এমনি হয়? বিনয় পত্রে এই ঘটনাটি বাবাকে জানাইয়াছিল। নরহরিপুরের বাজারে ভুষণ দাঁ-এর পুরানো আড্ডাটি আর ছিল না—কারণ পনেরো বৎসর হইল ভুষণ মরিয়া গিয়াছে। তবুও এ দোকানে, ও দোকানে বসিয়া সতীশ গর্ব্বের সঙ্গে পুত্রের চিঠি হইতে যতটুকু সে-দেশের খবর পায়, তারই সাহায্যে যুদ্ধের গল্প করে।

সঙ্গে সঙ্গে বলে—কিন্তু আমাদের নেপালে যখন প্রাইম-মিনিস্টারের বাড়ির সামুনের ময়দানে প্যারেড হোত, তাতে আমরা যুদ্ধের কৌশল সবই দেখেচি। মেশিন্ গান্? ও তো আমাদের সময়েই প্রথমে নেপালে এল···আমাদের কাছে ও সব নতুন নয়—

অর্থাৎ নেপাল ও সতীশের যৌবন—ইহারা কাহারও কাছে পরাজয় স্বীকার করিবে না। সব ছিল নেপালে। দু'চারবার মোটা টাকার মণিঅর্ডার পাইয়া সতীশ মহা উৎসাহে বাড়ি নতুন করিয়া তৈরী করিবার জন্য মিস্ত্রী লাগাইল। ছেলে বড় ডাক্তার হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে, সাহেবী মেজাজ এখন তার—এ ধরণের বে-মেরামতি পুরানো বাড়িতে থাকিতে তাহার কষ্ট হইবে। সতীশ ছেলের উপযুক্ত মত বাড়ির পুনরায় সংস্কার করিতে অনেক ব্যয়

করিয়া ফেলিল। এইখানে ডাক্তারখানা হইবে, এইটি ছেলের বসিবার ঘর, এইটি নাতিদের পড়িবার ঘর।

হঠাৎ মেসোপটেমিয়া হইতে বিনয়ের পত্র আসা বন্ধ হইয়া গেল। দু'দশ-দিন করিয়া মাসখানেক কোন খবর নাই—সতীশ অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল, সে নিজে অটল থাকিয়া স্ত্রী ও পুত্র-বধূকে নানা মিথ্যা স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা করে, ক্রমে গ্রামময় গুজব রটিয়া গেল বিনয় আর নাই, যুদ্ধে মারা পড়িয়াছে।

বিনয়কে গ্রামের সকলেই ভালবাসিত, তাহার সুন্দর চেহারা ও মধুর ব্যবহারের গুণে বিনয়কে কেহ পর ভাবিত না। এ দুঃসংবাদে চোখের জল ফেলিল না, এমন লোক নাই গ্রামে। সতীশের সহ্য করিবার শক্তি দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেল, তাহার মুখে একদিন কেহ কোনো দুর্ব্বল কথা শুনিল না—চোখে জল দেখা তো দূরের কথা।

জ্যৈষ্ঠ মাস। ভীষণ গরম। মুখুয্যে-বাড়ির তেঁতুলতলার সামনে একখান ভাঙা গরুর গাড়ির উপর বসিয়া পাড়ার নিষ্কর্ম্মা যুবকেরা আড্ডা দিতেছে—এমন সময়ে সাইকেলে মোড়ের মাথায় সাহেবী-পোষাকে কাহাকে আসিতে দেখা গেল। বিনয়!

মুখুয্যে-গিন্নী স্নানান্তে শিব-পূজো করিতে বসিয়াছিলেন, পূজো ফেলিয়া ছুটিতে ছুটিতে পথের ধারে আসিলেন অর্থাৎ তাঁহার পায়ের বাতের দরুন যতটুকু ছোটা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় ততটুকু বেগে, বিনয়কে বুকের মধ্যে জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, যুবকেরা সকলে বলিল, আচ্ছা ভয় দেখিয়েছিলেন বিনয়দা, বেশ যা হোক্—

বিদ্যুৎবেগে গ্রামের সর্ব্বত্র বিনয়ের প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সতীশ ডাক্তারের বাড়ির উঠানে সব পাড়ার লোক ভাঙিয়া পড়িল। বিভিন্ন পাড়ায় সেদিন সন্ধ্যায় গ্রামের মেয়েরা হরির লুট দিল।

বিনয় যুদ্ধ হইতে আসিয়া প্রথম প্রথম গ্রামেই বসিয়াছিল—তারপরে সে মহাকুমায় গিয়া বসিয়াছে। এত পসার এ অঞ্চলে কোনো ডাক্তারের কেহ কখনো দেখে নাই।

সতীশও ডাক্তারী করিত স্বগ্রামেই কিন্তু ছেলে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পসার কমিয়া গেল, সবাই বিনয়কে চায়, সতীশকে কেহ বড় একটা ডাকে না। সে সকলকে গর্ব্বের সঙ্গে বলে, তা তো হবেই, বিনয় এসেছেন। অত বড় ডাক্তার, আমরা তো সেকেলে কোয়াক্, ও'দের কাছে কি আমরা—

পরাজয়েরও সুখ আছে, গর্ব্ব আছে।

সতীশ একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল, সে বৃদ্ধের দলে পড়িয়া গিয়াছে। গণেশ-মহল্লার সে ডানপিটে সতীশ—ঠাসা বন্দুকের এক দ্যাওড়ে অসিঘাটের ওপরের চরে যে তিনটা পাখী মারিয়াছিল মনে আছে, বুঢ়ুয়া-মঙ্গলের সময় আলোকিত বজরার পাশ দিয়ে ডুব-সাঁতার দিতে দিতে কাহাদের আলোকোজ্জ্বল বজরা—

যাক্, সে সব পুরানো কাসুন্দি ঘাটিয়া লাভ কি? মোটের উপর সতীশকে সবাই এখন 'বুড়োকর্ত্তা' বলিতে শুরু করিয়াছে, এটা সে লক্ষ্য করিল; বিশেষতঃ বিনয় ফিরিয়া আসিবার পর হইত।

নাতিরা স্কুলে পড়ে। সতীশের ছোট ছেলে কিন্তু ভাল হইল না। সে কলেজ ছাড়িয়া দিয়া এতদিন বাড়িতেই বসিয়া ছিল—এইবার দাদার ডাক্তারখানায় কম্পাউণ্ডারী আরম্ভ করিল।

জলের স্রোতের মত বৎসর কাটিয়া যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে বিনয়ের প্রত্যাবর্ত্তনের পর সাত বৎসর কাটিল।

এই সাত বৎসরে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল সতীশের জগতে। বিনয় কুসঙ্গে পড়িয়া

ঘোর মাতাল হইয়া উঠিয়াছে—পয়সা যথেষ্ট রোজগার করে কিন্তু হাতে রাখিতে পারে না। কাহাকেও মানে না। যুদ্ধে গিয়াই সে মদ খাইতে শিখিয়াছিল। আগে বাপকে ভয় করিত, লোকলজ্জার ভয় রাখিত। এখন বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বাপকে আর তেমন মানে না।

সতীশ স্ব-গ্রামেই থাকিত। প্রথম প্রথম পুত্র-বধূরা গ্রামের বাড়িতেই থাকিত। ক্রমে তাহারা চলিয়া গেল বিনয়ের বাসায়। সতীশের স্ত্রীর সেই উন্মাদ রোগ একেবারে কখনো সারে নাই, এই সময় বেশী করিয়া দেখা দিল। সেই জন্যই মাকে বিনয় দেশের বাড়িতে রাখিয়াছিল। তবু এতদিন সর্বদা দেখাশুনা করিত, শুশ্রূষা ও চিকিৎসার ত্রুটি কখনো করে নাই।

ক্রমে ক্রমে কিন্তু মাকেও সে অবহেলা করিতে লাগিল। এক মাসেও একবার মাকে দেখিতে আসে না, অথচ সে মোটর কিনিয়াছে। এই ন' মাইল পথ আসিতে কতক্ষণ লাগে?

শুধু পানদোষ নয়, আনুষঙ্গিক অনেক উপসর্গই জুটিয়াছে বিনয়ের। স্ত্রী-পুত্রকেও যন্ত্রণা দেয়, সংসারের ন্যায্য খরচের টাকা রাত্রে কোথায় গিয়া ব্যয় করিয়া আসে, কেহ জানে না। প্রায়ই সারারাত্রি বাহিরে কাটায়। মাঝে মাঝে দিনমানেও ডাক্তারখানায় বসে না। পসার কমিতে লাগিল, রোগীরা আসিয়া ফিরিয়া যায়। বৃদ্ধ বয়েসে সতীশ ঘোর অর্থকষ্টে পড়িল। বিনয় বাপ-মাকে মাঝে মাঝে টাকা যে না দেয় এমন নয়, কিন্তু তাহাতে সতীশের চলে না। ছোট ছেলেটি দাদার অবস্থা দেখিয়া নিজের স্ত্রী পুত্র লইয়া শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গেল, সে-ও বাপ-মায়ের কোনো সংবাদ লয় না।

সন্ধ্যাবেলা বসিয়া বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে সতীশ অন্যমনস্ক ভাবেই এই সব কথাই ভাবিতেছিল, এমন সময়ে উঠানে কাহাকে আসিতে দেখা গেল।

—কে?

—আমি পটল, দাদা।

সতীশ খুশি হইয়া একগাল হাসিয়া হুঁকা হাতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

—আয়, পটল! আয়, আয়,—

পটল বিনয়ের বড় ছেলে দিব্যেন্দুর ডাকনাম। গৌরবর্ণ, সুশ্রী, চোদ্দ-পনেরো বছরের হাস্যমুখ বালক। নাতিদের জন্য বৃদ্ধের মন-কেমন করে সর্বদা—কিন্তু তাহারা বড় একটা এদিকে পা দেয় না। অপ্রত্যাশিত ভাবে নাতিকে দেখিয়া সতীশ যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল।

—তোর বাবার খবর কিরে, পটল?

দিব্যেন্দু অপরাধীর মত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—সেই একই রকম দাদা। বরং আরও বেড়েচে। পরে সে দাগ দেখাইল, মাতাল অবস্থায় বাবা কি একটা শক্ত এ্যালজেব্রার অঙ্ক কষিতে দিয়াছিল, সে পারে নাই বলিয়া ছড়ি দিয়া মারিয়াছে। দুজনে বসিয়া অনেক কথা হইল। সতীশ বলিল—বোস্ পটল, রাঁধি গে গিয়ে, খাবি কি নৈলে?

সতীশের স্ত্রী এখন সম্পূর্ণ পাগল, একটা ঘরে একা দিনরাত শুইয়া থাকে, আপন মনে বিড়্ বিড়্ করিয়া বকে, কাজকর্ম করা দূরের কথা, না খাওয়াইয়া দিলে খায় না। সতীশ বলিল—এক একবার মনে হয় পটল, আবার প্র্যাকটিস শুরু করি। কিন্তু এখন আর কেউ আমায় ডাক্‌বে না। ত্রিশ বছর আগে যখন এসেছিলাম এ দেশে, তখন তেমন ডাক্তার ছিল না। এখন নরহরিপুরের বাজারেই তিনটে ক্যাম্বেল পাশ, একটা এম্-বি। ওদিকে তো বিনয় রয়েচে, অমল রয়েচে, শ্যামবাবু—সবাই এম্-বি। আমাকে আর কে ডাক্‌বে?

দিব্যেন্দু বলে—ভেবো না দাদা। আমি পাশ করে যখন চাকরি করবো, তখন তোমার আর এ দশা থাকবে না।

সতীশ উৎসাহের সহিত বলে—আমায় কাশী পাঠিয়ে দিস, পটল। কতকাল দেখি নি—এই শুনুবি তবে আমরা কি করতাম সেখানে ?

দিব্যেন্দু জ্ঞান হইয়া পর্যন্ত কাশীর গল্প, নেপালের গল্প অনেক শুনিয়াছে ঠাকুরদাদার মুখে। একই গল্প পঞ্চাশবার সে শুনিয়াছে অন্ততঃ। মুখস্থ বলিতে পারে। তবুও বৃদ্ধ ঠাকুরদাদাকে খুশি করিবার জন্য বলিল—বল না, দাদা! চন্দ্রগিরি পার হবার সময় সেবার নেপালের পথে সেই কি হয়েছিল ?

দিব্যেন্দু কখনো নেপাল দেখে নাই, কিন্তু ঠাকুরদাদার মুখে আজন্ম বর্ণনা শুনিয়া চন্দ্রগিরির রত্নগিরি, রক্সৌলের পশুপতিনাথ-মেলার দৃশ্য—এসব তাহার মানসপটে সুস্পষ্ট রেখা ও বর্ণে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। চোখ বুজিলেই এ সব যেন সে দেখিতে পায়।

সকালে উঠিয়া দিব্যেন্দু চলিয়া গেল।

সতীশ বলিল—তোর বাবাকে বলিস্ দিকি পটল, জুতো এই দ্যাখ, একেবারে নেই—স্যাণ্ডেলটা সেই তোর বাবার দরুন, সেবার বাসা থেকে এনেছিলাম, তা ছিঁড়ে গিয়েছে।

দিব্যেন্দু যাবার সময় বলিয়া গেল—এ-সব কথা আমি বলেচি, বোলো না যেন বাবাকে, দাদা। তা হোলে বাবা পিঠের ছাল তুলবে আমার—

দিব্যেন্দু চলিয়া গেলে বৃদ্ধ আবার পুরাতন দিনগুলির স্বপ্ন দেখিতে থাকে। আজকাল হাতে কাজকর্ম একেবারেই নাই—এ ধরনের অলস জীবন সে যাপন করে নাই কখনো—আপন মনে বসিলেই সেই সব কথা মনে আসে।

গাঙ্গুলী-বাড়ির আন্নাকালী দুটি কাঁচ শসা হাতে পৈঠাতে উঠিয়া বলিল—গাছে হয়েছিল জ্যাঠাবাবু, মা বললে দিয়ে আয়।

আঁচলের মুড়োয় বাঁধা কি একটা জিনিস খুলিতে খুলিতে বলিল—আর এই ক'টা—

সতীশের মনের নিরানন্দ ভাব অন্তর্হিত হইয়া গেল। আগ্রহ-উজ্জ্বল চোখে আন্নাকালীর আঁচলে বাঁধা দ্রব্যের দিকে চাহিয়া বলিল—কি রে ওতে ? মটর ডালের বড়ি! বাঃ বাঃ—দে, রাখ্ এখানে, মা।

সতীশ চিরকাল খাইতে ও খাওয়াইতে ভালবাসে। আজকাল অভাবে পড়িয়া গিয়াছে, অমন উপার্জনক্ষম ছেলে থাকিতেও নাই—তাই গ্রামের মেয়েরা ভাল জিনিসটা বাড়িতে হইলে সতীশকে মাঝে মাঝে পাঠাইয়া দেয়।

আন্নাকালী চোদ্দ-পনেরো বছরের সুন্দরী মেয়ে—উপরি উপরি চারটি কন্যার জন্মগ্রহণের পরে বাপ-মা পঞ্চম ও সর্বকনিষ্ঠ কন্যাটির ওই নাম রাখিয়াছিল, নামের সঙ্গে তার চেহারার কোনো সম্পর্ক নাই। সে হাসিয়া বলিল—আপনার হাতের সেই কলায়ের ডাল রান্না কখনো ভুলবো না জ্যাঠাবাবু। মেয়েমানুষে অমন রাঁধতে পারে না।

সতীশ খুশী হইয়া উজ্জ্বল মুখে বলিল—কবে খেলি রে, আন্না ?

আন্নাকালী ঘাড় দুলাইয়া বলিল—বা রে, এই তো ভাদ্রমাসে অরন্ধনের দিন ? তারপর ঘরের দিকে চাহিয়া বলিল—জ্যাঠাইমা কেমন ?

—ওই এক রকম, ওর আবার ভালো আর মন্দ। ওরই জন্যে তো কোথাও যেতে পারি নে আন্না। নইলে কাশীতে গেলে একটা পেট চলে যায়। আর কাশীময় আমার বন্ধু বান্ধব—তা ওর অযত্ন হবে, ওকে দেখবে শুনবে কে, সেই জন্যেই তো আছি আট্‌কে। নইলে আমার আবার ভাবনা ? ওই শুনবি, কাশীতে আমরা কি করতাম ?

তারপর কাশীর গল্প আরম্ভ হয়। আন্নাও এসব গল্প ইতিপূর্বে শুনিয়াছে, কিন্তু গল্প শুনিতে সে ভালবাসে, বিশেষ করিয়া জ্যাঠামহাশয়ের মুখে। সে রোয়াকের পৈঠার উপর বসিয়া পড়ে। কাশীর কথা হইতে কখন নেপালের কথা আসিয়া পড়িয়াছে দু'জনের

কেহই লক্ষ্য করে নাই, হঠাৎ আন্না উঠানের দিকে ভীত চোখে চাহিয়া বলিল—জ্যাঠাইমা কোথায় বেরিয়ে যাচ্ছে যে !···

—ধর্, ধর্, মা, ধর্—নিয়ে আয়। নাঃ, জ্বালালে বাপু।

আন্না দৌড়িয়া উঠিয়া গিয়া শীর্ণদেহ, রুক্ষকেশ, বকুনি-রত জ্যাঠাইমার হাতখানা খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—এসো জ্যাঠাইমা, কোথায় যাচ্ছ, এসো···

—একেবারে ঘরের মধ্যে নিয়ে যা, মা। নাঃ, আমার হয়েচে যতো বিপদ ; তা ইয়ে আন্না কলায়ের ডাল রাঁধবো এখন মা, আজ দুপুরে আমার এখানে দুটো খাস্ এখন।

পরের বছর হইতে বিনয়ের পসার একেবারেই কমিয়া গেল। দশ-বারো বছর আগের ব্যাপার আর ছিল না, এখন এক মহকুমা-টাউনের উপর তিনজন এম্-বি। পানদোষ ও উচ্ছৃংখলতার জন্য ভদ্র-গৃহস্থের বাড়িতে তাহাকে কেহ আজকাল ডাকে না, তা ছাড়া রোগীরা আসিয়াও ডাক্তারের দেখা পায় না।

তাহার পর দেখা দিল পৃথিবী-ব্যাপী মন্দা। পাটের বাজার একেবারে পড়িয়া গেল। রোগ হইলেও আর লোকে ডাক্তার দেখাইতে পারে না। বিনয় মহা অর্থ-কষ্টের মধ্যে পড়িল। সে লোক খারাপ নয়, হাতে পয়সা থাকিলে যতক্ষণ খরচ করিতে না পারে, ততক্ষণ তাহার মনে শান্তি হয় না, উদার দিলদরিয়া মেজাজের মানুষ। বাবাকে সে ইচ্ছা করিয়া যে অবহেলা করে তা নয়, বাবা এত ঘনিষ্ঠ, এত সুপরিচিত যে, তাহার সম্বন্ধে সে কোনো খেয়ালই করে না। সতীশ মুখ ফুটিয়া কখনো ছেলেকে জানায়ও নাই তাহার অসচ্ছলতার কথা, পাছে ছেলেকে বিব্রত হইতে হয়।

এই অবস্থায় একদিন বিনয় পিতার সহিত দেখা করিতে আসিল। সতীশ অপ্রত্যাশিত ভাবে ছেলেকে দেখিয়া মহাব্যস্ত হইয়া উঠিল। সারা বাড়ির মধ্যে একখানা চেয়ার কি টুল পর্যন্ত নাই, ছেলেকে বসিতে দেয় কিসে যে !

বিনয় বলিল—থাক্ বাবা, থাক্, আমি এই যে বেশ বসেছি।

সতীশ ব্যস্তসুরে বলিল···উঃ, ঘেমে একেবারে···দাঁড়াও একটু চা করে আনি। ভাড়াটে মোটরে এলে কেন ? তোমার গাড়ি কোথায় ?

—গাড়ি আছে, ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেছে, মেরামতের জন্য একমুঠো টাকা দরকার, হাতে পয়সা কোথায় ? কাজেই গাড়ি গ্যারেজে পড়ে।

—পটল কোথায় ?

—কলকাতাতেই আছে। ওর পড়াশুনোর যে.. কি করি ? মেসে তো একগাদা টাকা খরচ, তিনমাসের মেসের দেনা বাকী। কলেজের মাইনেও দু'মাস পাঠাতে পারি নি।

পিতা-পুত্রে অনেকক্ষণ পরামর্শ হইল। তিন জায়গার খরচ বিনয় তো আর পারে না। দেশের বাড়ি, টাউনের বাসা এবং দিব্যেন্দুর মেস ও কলেজের খরচ। কি এখন করা যায় ?

বিশেষ কিছুরই মীমাংসা হইল না। উঠিবার সময় বিনয় কুণ্ঠিত ভাবে বাবাকে দু'টি টাকা দিতে গেল। ছেলের শুষ্ক ও চিন্তাকুল মুখ দেখিয়া বৃদ্ধ টাকা দু'টি প্রাণ ধরিয়া লইতে পারিল না। বলিল—রেখে দাও এখন, সোমবার দাস্তঘাটা থেকে ডাক এসেছিল ; কিছু পেয়েচি, তোমার মোটরের ভাড়াও তো লাগবে আবার ?

গ্রামের একটি ছেলে রেলে কাজ করিত, ছুটি লইয়া দেশে আসিয়া প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা সতীশের কাছে গল্প করিতে আসিত। একদিন সতীশ বলিল—দ্যাখো উমাপদ, ভাবচি কি জানো ? তোমার জ্যাঠাইমাকে ওর বাপের বাড়িতে রেখে আমি কাশী চলে যাই। একজন লোকের কাশীতে বেশ চলবে। নইলে এদিকে সবই তো শুনলে—বিনয় বড় মুশকিলে

পড়েচে, রুগী-পত্তর নেই, ডাক নেই, এই বাজারে দুটো সংসার চালোনো কি সোজা কথা রে, বাবা ? আমরা চলে গেলে, ও তবু খানিকটা খোলসা হয়···তা ছাড়া কাশীতে আমার বন্ধু-বান্ধব ভর্ত্তি, আহা, কত কাণ্ডই করেচি সব এক সময়, কাশীতে কাকে না চিনি ?

উমাপদ আবাল্য এসব গল্পের সঙ্গে পরিচিত, সে বলিল—পাগল হয়েচেন ? আপনার ছেলেবেলার আমলের তারা কি আর কেউ এখন আছে ভাবচেন ? সে সব কি—

সতীশ কথাটা পছন্দ করিল না, বাধা দিয়া বলিল—তুমি কি ক'রে জানলে নেই ? আমাদের সে ডানপিটে দলের ছেলে হঠাৎ মরবার নয় জেনো ('ছেলে' কথাটা অসতর্ক মুহূর্ত্তে মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল)—সব আছে, হেঁ-হেঁ হঠাৎ আমরা মরচি নে। তুমি জানো না, আমাদের সে দলের কথা—শুনবে তবে ?

উমাপদ ব্যস্ত হইয়া বলিল—ইয়ে, জ্যাঠামশায় আর একদিন বরং এসে—আজ একটু কাজ আছে—উঠি এখন।

দিন পনেরো পরে সতীশ একদিন কাশী ষ্টেশনে দুপুরবেলা নামিল। স্ত্রীকে মেহেরপুরে ছোট শালার কাছে রাখিয়া আসিয়াছে। আসিবার সময় বাড়ির চাবিটা আন্নাকালীর হাতে দিয়া আসিয়াছে, বিনয় আসিলে দিবার জন্য। ছেলেকে কোন খবর দেয় নাই—কেন মিছামিছি তাহাকে বিব্রত করা।

কাশীতে নামিয়া মনে একটা অপূর্ব উৎসাহ ও উত্তেজনা অনুভব করিল—বাল্যের সেই কাশী ! এতদিন কি করিয়া ভুলিয়াছিল সে ! বাংলা দেশের একটা জঙ্গলে-ভরা ছোট্ট পাড়া-গাঁয়ে জীবনের ত্রিশটি বছর—

সারাদিন ধরিয়া সে কাশীর পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইল। পঞ্চগঙ্গা ঘাটে স্নান করিল, বিশ্বনাথ দর্শন করিল। বাল্যের দিনগুলির সঙ্গে জড়িত যে সব জায়গায় একদিনের মধ্যে পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া সম্ভব, তাহা সে বড় বাদ দিল না।

কিন্তু ধীরে ধীরে তাহার মনে হইতে লাগিল—কাশী, তাহার সে চল্লিশ বছর আগেকার কাশীকে সে যেন খুঁজিয়া পাইতেছে না, সে কাশী কোথায় গেল ? এ কাশীকে তো চেনে না।

গণেশ-মহল্লায় পুরাতন সঙ্গীদের সন্ধান কেহ জানে না, কেবল রামজীবনবাবুর মেজছেলে পতিতপাবন পৈতৃক বাটীতে এখনও বাস করিতেছে। পতিতপাবন সতীশকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল। বলিল, সতীশ-দা, তোমার চেহারা তো এখনো বেশ আছে ! আমারও ধরো এই বাষট্টি হোল, আমি তোমার চেয়ে বুড়ো হয়ে গেছি—মানে, অম্বলের অসুখে আমার —এতদিন ছিলে কোথায় ?

নানা পুরাতন দিনের গল্প হইল। পতিতপাবনের অবস্থা ভাল নয়, ব্যবসায় বার বার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছিল। তারপর উপরি উপরি দু'টি উপযুক্ত ছেলে মারা গিয়াছে। ছোট ছেলেটি রেশমের কাপড়ের ব্যবসা করে বিশ্বনাথের গলির মধ্যে—তাতেই কোনোরকমে চলে। ভাইগুলির মধ্যে কেবল ছোট ভাইটি বাঁচিয়া আছে, পাটনাতে শ্বশুরবাড়ি বাসা বাঁধিয়াছিল, বহুদিন হইল সেইখানেই আছে।

সন্ধ্যাবেলা সতীশ দশাশ্বমেধ ঘাটে চুপ করিয়া বসিল। সম্মুখের হাসি-মাখা, কত অজানা তরুণ মুখ—গান···আনন্দের উচ্ছ্বাস···দিব্যেন্দুর কথা মনে পড়িল। দিব্যেন্দু বলিয়াছিল—দাদা, আমি চাকরি করলে তোমার ভাবনা থাকবে না। দিব্যেন্দু জানে না যে, তাহার দাদা লুকাইয়া কাশী চলিয়া আসিয়াছে। এই দশাশ্বমেধ ঘাটে, এই সন্ধ্যাবেলা যেন প্রত্যেক বালককেই মনে হইতে লাগিল দিব্যেন্দু। দিব্যেন্দু না সে পঞ্চান্ন বছর আগেকার নিজে ?

আন্নাকালীর মুখ মনে পড়িল—যখন গরুর গাড়ির পাশে দাঁড়াইয়া ঘরের চাবিটা তার হাতে দিয়াছিল, সে সময়কার তার ছলছল চোখ দু'টি মনে পড়িল।

নাঃ, সে ডানপিটে সে আর নাই। কাশীও তার কাছে আর কিছুই না। তাঁর সে কাশী হারাইয়া গিয়াছে।

রাত্রে ঘুম হইল না কত রাত পর্য্যন্ত। শুইয়া শুইয়া ঠিক করিল সে ফিরিয়া যাইবে। আন্নাকালীর জন্য কাশীর কৌটা লইতে হইবে, ছেলেমানুষ, খুশি হইবে এখন। দিব্যেন্দুর জামার উপযুক্ত খানিকটা সিল্ক, পতিতপাবনের কাছে ধারে লইয়া গেলেই হইবে, গিয়া দাম পাঠাইবে। ভাল পট···বৌমা ছবি ভালবাসে।

কিন্তু সকালে উঠিয়াই সে পতিতপাবনকে বলিল—তুমি একটা উপকার করো ভাই আমার। তোমার এখানে আর ক'দিন থাকবো? তুমি একটা বাজার-সরকারী গোছের কাজ জুটিয়ে দাও দিকি আমায়। অভাবে রাঁধুনীগিরিতেও রাজী আছি। খুব ভাল রাঁধতে পারি, দেখে নেবে তারা।

নাঃ, সে ছেলেকে বিব্রত করিতে ফিরিবে না। ছেলে পারিয়া উঠিবে কেন? শেষে কি দিব্যেন্দুর কলেজের পড়া বন্ধ হইবে? বৌমার গহনা বন্ধক দিতে হইবে, ছিঃ—

একটা পেটের জন্য কাশীতে আবার ভাবনা?

যাত্রাবদল

ভাটপাড়াতে পিসিমার বাড়ি গিয়েছিলুম বড়দিনের ছুটিতে। সারাদিন বাড়িতে বসে থেকে ভাল লাগ্‌লে না,। বিকেলের দিকে নৈহাটি স্টেশনে বেড়াতে গেলুম। তখন দেশেই থাকি, বিদেশে বেরুনো অভ্যেস নেই, এত বড় স্টেশন ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখবার সুযোগ বড় একটা হয় নি। ডাউন প্ল্যাটফর্মের ওধারে প্রকাণ্ড ইয়ার্ডটা মালের ওয়াগান ভর্ত্তি, ওভারব্রিজের ওপর দিয়ে যাত্রীরা পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে যাতায়াত করচে, নানা ধরনের লোকের ভিড়, নানা রকমের শব্দ—দুখানা পাইলট এঞ্জিন ইয়ার্ডের মধ্যে ওয়াগনের সারি টানাটানিতে ব্যস্ত··· ওপারের গাড়ি একখানা ছেড়ে গেল, আর একখানা এখুনি আসবে···বাজারের দিকে সাইডিং লাইনে দুখানা কেরোসিন তেলের ট্যাঙ্ক বসানো গাড়ি থেকে তেল নামাচ্চে।···এত মাছিও প্ল্যাটফর্মে, কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়াবার জো নেই, বসবার জো নেই, যেখানে যাই সেখানেই মাছি ভন্ ভন্ করে; চা খাওয়ার ইচ্ছে ছিল কিন্তু স্টলের অবস্থা দেখে সেখানে বসে কিছু খেতে প্রবৃত্তি হোল না। প্ল্যাটফর্মের ওধারে একটা ছোট ঘর, দোর বন্ধ, ঘরটার আশেপাশে পুরানো স্লিপার ও ফিশ্-প্লেট্ পড়ে আছে রাশীকৃত, একটি ক্ষুদ্র কুলীপরিবার সেখানে তেরপলের তাঁবু খাটিয়ে তোলা উনুনে আঁচ দিয়েচে।

হঠাৎ প্ল্যাট্‌ফর্মের সবাই একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। সবাই যেন প্ল্যাটফর্মের ধারে ঝুঁকে কলকাতার দিকে চেয়ে কি দেখবার চেষ্টা কর্ত্তে লাগল—একজন হিন্দুস্থানী যাত্রী প্ল্যাটফর্মের নিতান্ত ধারে দাঁড়িয়ে চোখ মুছতে ব্যস্ত—ওপার থেকে একজন কুলী তাকে হেঁকে বল্লে—এ আঁখ্ পুছনেওয়ালা, হঠ যাইয়ে, ডাকগাড়ি আতা হ্যায়—

কাছের একটি ভদ্রলোক যাত্রীকে জিজ্ঞেস্ কল্লুম—কোন্ ডাকগাড়ি মশাই?

তিনি বলেন, দার্জ্জিলিং মেলের সময় হয়েচে—

একটু পরেই ধুলো কুটো উড়িয়ে একটা ছোটখাটো ঘূর্ণি ঝড়ের সৃষ্টি করে স্টেশন

কাঁপিয়ে দার্জিলিং মেল বেরিয়ে গেল এবং সে শব্দ থাম্‌তে না থাম্‌তে ডাউন প্ল্যাটফর্মে একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেন সশব্দে এসে দাঁড়ালো।

একটু পরে দেখি যে প্ল্যাটফর্মে একটা গোলযোগ উঠেচে। অনেক লোক ওভারব্রিজের ওপর দিয়ে ডাউন প্ল্যাটফর্মের দিকে ছুটে যাচ্ছে—সবাই যেন কি বল্‌চে—ট্রেনটা ছাড়তেও খানিকটা দেরি হোল। তারপরে ট্রেনখানা ছেড়ে দিলে দেখলুম প্ল্যাটফর্মের এক জায়গায় অনেক লোকের ভিড়, গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে সবাই কি যেন দেখচে।

ভিড় ঠেলে ঢুকতে না পেরে একজনকে জিজ্ঞেস্ কর্ত্তে সে যা বল্লে তার মর্ম্ম এই যে মুর্শিদাবাদের ওদিক থেকে একটি ভদ্রলোক সপরিবারে এইখানে গাড়ি বদ্‌লোবার জন্যে নেমেছিলেন পশ্চিমের লাইনে যাবার জন্যে, তাঁর স্ত্রী প্ল্যাটফর্মে নেমেই হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যান, সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে অজ্ঞান নয়, তিনি মারাই গেছেন।

লোকের ভিড় পুলিস এসে সরিয়ে দিল। তারপর একটা অতি করুণ দৃশ্য চোখে পড়ল। গোটা দুই স্টীলের তোরঙ্গ, একটা ঝুড়ি, গোটা চারেক ছোট বড় পুঁটুলি—একটা মানকচু ও এক নাগরী খেজুরের গুড় এদিক-ওদিকে অগোছালো ভাবে ছড়ানো—গৃহস্থালীর এই দ্রব্যাদির মধ্যে একটি পাড়াগাঁয়ের বৌয়ের মৃতদেহ, রং ফর্সা, বয়স কুড়ি-বাইশের বেশী নয়। বৌটির মাথার কাছে একটি মধ্যবয়সী ভদ্রলোক, গায়ে কালো বুকখোলা কোট—কাঁধে একখানা জম্‌কালোপাড় ও কল্কাদার সস্তা আলোয়ান, পায়ে ডার্বি জুতো পাড়াগাঁয়ের অর্দ্ধশিক্ষিত ভদ্রলোকের পোশাক। তাঁর কোলে একটি বছর আড়াই বয়সের ছোট ছেলে—মায়ের মত ফর্সা, চুলগুলি কোঁকড়া কোঁকড়া, হাতে কি একটা নিয়ে নাড়াচাড়া করচে ও একত্র করায় বিস্ময়ের দৃষ্টিতে সমাগত লোকের ভিড়ের দিকে চাইচে। মায়ের মৃতদেহের চেয়েও তার কাছে বেশী কৌতূহলের বিষয় হয়েচে চারিধারে এই গোলমাল ও অদৃষ্টপূর্ব্ব লোকের ভিড়।

একটু পরে সাহেব স্টেশন মাস্টার ও তাঁর সঙ্গে একজন ভদ্রলোক এলেন। বুঝতে দেরি হোল না যে ভদ্রলোকটি ডাক্তার, তিনি বৌটির নাড়ী দেখলেন, চোখ দেখলেন, স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে কি কথা হোল তাঁর, স্বামীটির সঙ্গেও কি যেন বললেন তারপর তাঁরা চলে গেলেন।

মৃত্যুই তা হোলে ঠিক!...

কৌতূহলী জনতা আরও খানিকক্ষণ তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল—মৃতা পল্লী-বধূ, তার শোকস্তব্ধ স্বামী, অবোধ ক্ষুদ্র পুত্র ও তাদের ঘর-গৃহস্থালীর সাধের দ্রব্যাদি। তারপর একে একে যে যার কাজে চলে গেল—আরও নতুন দল এল—তারাও খানিকটা থেকে নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি কর্ত্তে কর্ত্তে ফিরে গেল। এবার এল রেলওয়ে পুলিশের লোক, তারা খানিকক্ষণ ধরে ভদ্রলোকটিকে কি সব প্রশ্ন কর্লে, নোটবুকে কি টুকে নিলে—তারপর তারাও চলে গেল—কেবল একজন কনস্টেবল একটু দূরে দাঁড়িয়ে রৈল।

এ সবে কাটল প্রায় এক ঘণ্টা। তখন সন্ধ্যে প্রায় হয়-হয়। স্টেশনের আলো জ্বালিয়েছে, আপ্ ডাউন দুদিকের সিগন্যালে লাল সবুজ বাতির সারি জ্বলেচে; কিন্তু তখনও অন্ধকার হয়নি, সিগন্যালের পাখা তখনও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, আপ্ লাইনের হোম স্টার্টার নামানো—বোধ হয় কোনো ট্রেন আসচে।

যা হবার তা তো হয়ে গিয়েচে, এখন সৎকারের ব্যবস্থা! এ ধরনের প্রশ্ন কেউ ভদ্রলোকটিকেও কর্লে না—তিনিও কাউকে কর্লেন না। এদিকে ভিড় ক্রমেই পাতলা হয়ে এল—অনেকেই আপ্ ট্রেনের যাত্রী—কল্‌কাতার দিকে দুখানা সিগন্যাল নামানো দেখে তারা ওভারব্রিজ দিয়ে উঠি-পড়ি অবস্থায় ছুটলো আপ্ প্ল্যাটফর্মের দিকে। এটা যে থ্রু ট্রেন

আসচে, তা ভেবে তখন কে দেখে ? ভিড়ের মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল হিন্দুস্থানী কুলী-খালাসীর দল, তারা খৈনি টিপতে টিপতে নিজেদের কাজে চলে গেল।

আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলুম—ভদ্রলোক আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। কাছে যেতেই আকুল ভাবে বল্লেন—মশাই আপনি তো দেখচেন, একটা ব্যবস্থা করুন দয়া করে। এখন কি করি আমার মাথামুণ্ডু, এই অচেনা দেশ, তাতে শীতের রাত। আমরা ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের দেহ শেষে কি অন্য জাতে ছোঁবে ?···এই একটা বাচ্চা, এরই বা উপায় কি করি ?

মুখে অবিশ্যি তাঁকে সাহস দিলুম। কিন্তু তারপর আধ ঘণ্টা এদিক ওদিক ঘুরেও সৎকারের কোনো ব্যবস্থাই আমায় দিয়ে হয়ে উঠলো না। না আমাকে এখানে কেউ চেনে, না আমি কাউকে চিনি—অধিকাংশ লোকই বলে তারা যাত্রী, এই ট্রেনেই তাদের অমুক জায়গায় যেতে হবে। কেউ কথা শোনে না। আকস্মিক ব্যাপারের উত্তেজনাটুকু কেটে যাবার পরে সবাই বুঝেচে বেশী ঘনিষ্ঠতা কর্ত্তে গেলে এই শীতের রাত্রে দুর্ভোগ আছে কপালে—কাজেই সবাই আমায় এড়িয়ে চলতে চায়। অবশেষে একজন টিকিট কালেক্টরকে কথাটা বল্লুম। অনেক সাধ্য-সাধনার পরে তাঁকে রাজীও করানো গেল। তিনি বল্লেন, কিন্তু শুধু আমি আর আপনি এতে তো হবে না ? আপনি দাঁড়ান—আমি দেখে আসি।

একটু পরে একজন অতি কদর্য্য চেহারার ময়লা কাপড় পরা লোককে সঙ্গে করে তিনি ফিরে এলেন। আমায় বল্লেন—শুনুন মশাই, লোক যেতে চায় না কেউ শীতের রাতে। এই লোকটি ভাল বামুন, আমাদের ইস্টিশানে পাঁউরুটির ভেণ্ডার, এ যেতে রাজী হয়েচে, এ আরও দুজন লোক আনতে রাজী আছে। কিন্তু—

টিকিট বাবু সুর নীচু করে বল্লেন—জানেন তো ছোট লোক—ওদের কিছু খাওয়াতে হবে, নৈলে রাজী হবে না। একটু ইয়ে—মানে—বুঝলেন তো ? ওরা নেশাখোর লোক, লেখাপড়া জানে না—সবই বুঝতে পারচেন। তার একটা ব্যবস্থা কর্ত্তে হয়—

আমি বল্লুম—সে কি রকম খরচ পড়বে না পড়বে আমায় বলুন, আমি গিয়ে বলচি। ঘাট খরচের হিসেবটাও ধরবেন—। টিকিট বাবু টাকা-পনেরোর এক ফর্দ্দ দাখিল করলেন। আমি ফিরে গিয়ে বলতেই ভদ্রলোক মণিব্যাগ খুলে দুখানা দশ টাকার নোট আমার হাতে দিয়ে বল্লেন—এই নিন্—যা ব্যবস্থা করবার করুন, আমায় এ দায় থেকে উদ্ধার করুন, বাঁচান আপনি—কথা শেষ না করেই আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধর্ত্তে এলেন—আর আমার এই খোকার একটা কিছু···ওকে তো এই ঠাণ্ডায় সেখানে নিয়ে যেতে পারি নে, তা হোলে ও কি বাঁচবে ?···

আমি ফিরে এসে খোকার কথা তুলতেই তিনি বল্লেন—আমার তো ফ্যামিলি এখানে নেই, তা হোলে আর কি কথা ছিল ? আচ্ছা দাঁড়ান, দেখি-ছোট বাবুর বাসায়—

ছোট বাবুর বাসায় খোকার ব্যবস্থা হয়ে গেল। ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে বল্লুম দিন ওকে আমার কাছে। ছোট বাবুর বাসায় তাঁরা রাখবেন বলেচেন।

ভদ্রলোক বল্লেন—যাও খোকন বাবা, বাবুর কাছে যাও। তোমার মাসীমার বাড়ি নিয়ে যাবেন, যাও বাবা—

তাঁর চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগলো। আমায় বল্লেন—অনেকক্ষণ কিছু খায় নি, রাণাঘাটে ওর মা গজা কিনে দিয়েছিল—একটু গরম দুধ যদি—

খোকা বেশ সপ্রতিভ। বেশ শান্ত ভাবেই আমার কাছে এল, হাসি হাসি মুখে। তাকে কোলে নিয়ে মনে হল খোকার যত বয়স ভেবেছিলুম তার চেয়ে ছোট—এখনও তেমন কথা বলতে পারে না। ছোট বাবুর বাসায় ঝি তাকে কোলে করে বাড়ির ভিতর নিয়ে গেল। ওকে কোলে তুলে নিয়ে কাঁদো কাঁদো সুরে বল্লে—আহা, এ যে একেবারে দুধের বাছা ? এস

এস সোনামণি আহা! মাণিক আমার—

খোকা ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারে নি, বরং এত লোক তাকে কোলে নিয়ে নাচানাচি করাতে সে খুব খুশি।

একটু পরে আমরা কজনে মৃতদেহ বহন করে শ্মশানের দিকে রওনা হলুম। আমি, পাঁউরুটির ভেণ্ডার, টিকিট বাবু ও পাঁউরুটির ভেণ্ডারের একজন বন্ধু। টিকিট বাবুর এক ভাইপো আমাদের সম্মিলিত গরম কোট ও আলোয়ানের পুঁটুলি হাতে ঝুলিয়ে পিছনে পিছনে আসছিল। সকলের পিছনে ভদ্রলোকটি; তাঁকে আমরা অবশ্য শব বহন কর্ত্তে দিই নি। ভদ্রলোকের জিনিসপত্র মৃতদেহের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়েচে, কারুর বাসায় জায়গা দেবে না, সেগুলি স্টেশনে ক্লোকরুমে জমা দেওয়া হোল। নৈহাটির বাজার যেখানে প্রায় শেষ হয়েচে, সেখানটায় এসে ভদ্রলোক বল্লেন—একটা ভুল হয়ে গিয়েছে, দাঁড়ান আমি সিঁদুর কিনে আনি, ওর কপালে দিয়ে দিতে হবে।

শ্মশানঘাট নৈহাটি স্টেশন থেকে প্রায় তিন পোয়া পথ দূরে। বাজার ছাড়িয়ে দক্ষিণে মাঠের মাঝখান দিয়ে পথ, সুমুখে জ্যোৎস্নারাত, সন্ধ্যার পরে মেঘশূন্য আকাশে ফুটফুটে চাঁদের আলো ফুটেচে, কনকনে হাড়কাঁপানো শীত, মাঝে মাঝে পৌষ রাত্রির ঠাণ্ডা হাওয়া বাধাশূন্য প্রান্তরে আমাদের শিরার উপশিরার রক্ত জমিয়ে দিচ্চে, তার ওপরে মুশকিল—আমন ধানের জমির ওপর দিয়ে পথ—ধান কাটা হয়ে গিয়েচে, শীতের ঘায়ে ধানের গোড়াগুলো পায়ে যেন কুশাঙ্কুরের মত বিঁধছিল।

হঠাৎ পিছন থেকে ভদ্রলোক মেয়েমানুষের মত আকুল সুরে কেঁদে উঠলেন। আমরা অবাক হয়ে ফিরে চাইলুম। টিকিটবাবু বল্লেন—ওকি মশাই ওকি, অত ইয়ে হোলে চলবে কেন—ছিঃ—আসুন এগিয়ে আসুন।

পুরুষমানুষকে অমন অসহায় ভাবে কখনো কাঁদতে শুনি নি, তখন বয়েস ছিল অল্প, লোকটির কান্না শুনে যেন আমার চোখও অশ্রুসজল হয়ে উঠল। তারপর তিনি চুপ করলেন, আমরা সবাই আবার চুপচাপ চলতে লাগলুম।

শ্মশানে যখন পৌঁছানো গেল, রাত তখন সাড়ে সাতটা হবে। মৃতদেহ চিতায় উঠানো হোল। সেই সময় সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য কর্লুম বধূটির দুপায়ে আলতা—কোথাও বেরুতে হলে গ্রামের মেয়েরা পায়ে আলতা পরে থাকে জানতাম, মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল, মেয়েটি কি ভেবেছিল আজ কোন্ যাত্রার জন্যে তাকে দুপুরে আলতা পরতে হয়েছিল? কপালে খানিকটা সিঁদুর—ভদ্রলোকটি নিজেই দিয়েছিলেন—বধূটিকে সর্ব্বপ্রথম এই ভাল করে দেখে মনে হল সত্যই সুন্দরী। টানা টানা জোড়া ভুরু, পাণ্ডুর বর্ণের গৌর মুখ, অনিন্দ্য দেহকান্তি। মৃত্যুতেও যেন ম্লান হয় নি, মুখের চেহারা দেখে মনে হয় যেন ঘুমিয়ে পড়েচে। মনে হচ্ছে গোলমালে এখুনি ঘুম ভেঙে উঠে পড়বে বুঝি।

জ্বলন্ত চিতার একটু দূরে সেই পাঁউরুটি ভেণ্ডার ও তার বন্ধু। পাঁউরুটি ভেণ্ডার আমার দিকে চেয়ে দাঁত বার করে হেসে বল্লে—যাক্, আজ শীতের রাতটা কাটবে ভালো—কি বলেন? লালু চক্কোত্তির পরোটার দোকানে ভাজতে দিয়ে এসেছি। আমাদের শশী আচাৰ্য্যিকে বসিয়ে রেখে এসেচি, রাত বারোটার মধ্যে এখানকার কাজ শেষ হয়ে যাবে—গরম গরম বেশ—

তার বন্ধু বল্লে—মাংস কতটা? কুলুবে তো?

—বাঃ, জোনাজাৎ বেড়েপোয়া হিসেব করে দিয়ে এসেচি—মোট তিন সের—কজন আছি আমরা, তুমি, আমি, যতীনবাবু, যতীনবাবুর ভাইপো লালু, শশী আচার্য্যি, (আমার দিকে আঙ্গুল দিয়ে) এই বাবু—

আমি বললুম—আমি খাবো না।

দুজনেই আশ্চর্য্য হয়ে আমার দিকে চাইলে। আমার কথা যেন বুঝতেই পার্লে না কিংবা বুঝে বিশ্বাস কর্ত্তে পার্লে না। পাউরুটি ভেণ্ডার বলে—খাবেন না কিছু? সে কি মশাই! এই হাড় কন্‌কনে পৌষ মাসের রাত, খাবেন না তো এলেন কেন?…পাগল!…তাঁর বন্ধু বললে—খাবেন না কেন? ভাল জিনিস মশাই, আমরা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কিনিয়েচি—খাসা চর্বিওয়ালা খাসি। লালু চক্কোত্তি নিজে রাঁধবে, অমন মাংস-রাঁধিয়ে গঙ্গার এপারে পাবেন না। ওই যে দেখ্‌চেন নৈহাটির বাজারের চাটের দোকানখানা—শুধু ওর রান্নার গুণে আজ পনেরো বছর এক ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে—দেখবেন খেয়ে—

এই সময় টিকিট বাবুর ইশারায় দুজনেই অন্যদিকে একটু দূরে কি জন্যে উঠে গেল এবং একটু পরেই আবার নিজেদের জায়গাটিতে মুখ মুছতে মুছতে এসে বস্‌লে। আমায় বললে—আপনার চলে না বুঝি?

আমি বল্লুম—কি?

—একটু আধটু…এই শীতের রাতে, নৈলে চলে কি করে বলুন…বেশ ভাল মাল—। কেন এদের টিকিট বাবু ডেকেচে ওদিকে, তখন ব্যাপারটা বুঝলুম। ও আমার চলে না শুনে তারা আরও আশ্চর্য্য হয়ে গেল। এই শীতের রাতে শ্মশানে আসবার স্বার্থটা যে আমার কি, এ তারা ভেবেই পেলে না। আমার দিকে আর কোনো মনোযোগ না দিয়ে তারা নিজেদের বিষয় কথাবার্ত্তা বলতে লাগলো। নৈহাটি স্টেশনে পাউরুটির ব্যবসা করে আর কেউ কিছু কর্ত্তে পারবে না। রেল কোম্পানীর লাইসেন্সের দাম ক্রমেই বাড়চে, তার ওপরে শিখেরা এসে চায়ের স্টল খুলে ওদের অর্দ্ধেক ব্যবসা মাটি করেচে। খরচা ওঠাই দায়! দেশে সুবিধে নেই তাই ওরা পেটভাতায় এখানে পড়ে আছে। নইলে কাঁথিতে ওদের অমন চমৎকার দোকান ছিল—

পাউরুটি ভেণ্ডারটির নাম বিনোদ বাঁড়ুয্যে। সে আর একবার উঠে গেল ওদিকে। আমি ওর বন্ধুকে জিজ্ঞেস্ কল্লুম—খাবার-টাবার কত খরচ হোল?

—তা প্রায় টাকা সাতেক ধরুন। কিছু মিষ্টিও আছে। তা ছাড়া দু'একটা—আপনার তো দেখ্‌চি ওসব চলে না।

বিনোদ ফিরে এসে নিজেদের মধ্যে আবার গল্প শুরু করলে। হঠাৎ আমার মনে পড়ল আমার গরম কোটের পকেটে বিস্কুট আছে, নৈহাটির প্ল্যাটফর্ম্মে কিনেছিলুম সেই, কিন্তু খাওয়া হয় নি। টিকিট বাবুর ভাইপোকে ডেকে বল্লুম—আমার কোটের পকেটে বিস্কুট আছে দয়া করে আমার মুখে খানকতক ফেলে দিন্ না—আমি এই হাত আর ওতে দেবো না—

আমায় ওভাবে বিস্কুট খেতে দেখে টিকিটবাবু অবাক্ হোলেন। আমি শব ছুঁয়ে স্নান না করেই বিস্কুট খাচ্চি! আমায় বল্লেন—আপনার খুব খিদে পেয়েচে দেখচি, তা চলুন নৈহাটিতে ফিরে খুব খাওয়াবো—

আমি বল্লুম—আমি খাবো না কিছু। তাছাড়া আমি স্টেশনের দিকেও যাবো না—এখান থেকে সোজা ভাটপাড়া চলে যাবো।

—খাবেন না আপনি, সে কি মশাই? না না, তা কি হয়?…অতটা মাংস…ওহে বিনোদ, কাঠ দাও ঠেলে—বসে বসে গল্প-গুজব করবার জন্যে তোমাদের আনা হয় নি।

টিকিট বাবু আমার দিকে চেয়ে আবার কি বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু আমি তাঁকে সে সুযোগ না দিয়েই নিজের জায়গাটিতে গিয়ে বসলুম।

বিনোদ বাঁড়ুয্যে চিতায় কাঠ ঠেলে দিয়ে ফিরে এসেচে। দুই বন্ধুর মুখের বিরাম নেই। এবার তারা কার বিয়ের কথা আলোচনা করচে—বোধ হোল বিনোদ বাঁড়ুয্যের ভাইয়ের।

বিনোদ এক পয়সা সাহায্য কর্ত্তে পারবে না। ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে বিনোদের বৌ ওর কাছে টাকা চেয়ে পাঠিয়েছিল সে দুটো টাকা বাড়িতে মনিঅর্ডার করে দ্যায়।

—সোজা লিখে দিলাম দু'টাকার বেশী হবে না—এতে ভাইদুতীয়েই করো—

বিনোদের বন্ধুটি বল্লে—আর বোনদুতীয়েই করো—হি-হি—কি বলো?

বিনোদ দু'পাটি দাঁত বার ক'রে হেসে বল্লে—হ্যা, হ্যা—তাই বলি, বিয়ে কর্লেই হয় না। তুলো দেখতে নরম, ধুনতে লবেজান—বিয়ে করে এই বাজারে সংসারটি চালানো—সে বড় ঠ্যালা।···

রাত অনেক বেশী—বোধ হয় এগারোটা। হালিশহর জুট মিলের আলোর সারি নিবে গিয়েচে। প্রকাণ্ড একটা অশরীরী পাখী যেন জ্যোতির্ম্ময় পাখা মেলে গঙ্গার ওপর উড়ে বেড়াচ্ছে, এক একবার সেটা যেন জলের কাছাকাছি আসচে, স্নিগ্ধ জ্যোতির বিশাল প্রতিবিম্ব ফুটে উঠচে গঙ্গার বুকে—আবার যখন দূরে চলে যাচ্ছে, তখন অল্প সময়ের জন্য সে জায়গাটা অন্ধকার···আবার আলো ফুটে উঠ্‌ল, আবার অন্ধকার।

এতক্ষণ ভদ্রলোকটি চিতার শিয়রের একটু দূরে চুপ করে বসে ছিলেন। হঠাৎ তিনি আমার পাশে উঠে এলেন। বল্লেন—খোকা বোধ হয় এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েচে—কি বলেন?

—হ্যাঁ এতক্ষণ নিশ্চয়ই।

খানিকটা চুপ করে থেকে বল্লেন—কাল সকালে নৈহাটিতে দুধ পাওয়া যাবে না মশাই?

—অভাব কি? সেজন্যে ভাববেন না। সে যোগাড় হয়ে যাবে।

একটু চুপ করে থেকে আমি জিজ্ঞেস্ করলুম—আপনারা কোথায় যেতেন? পশ্চিমে কোথাও বুঝি?

ভদ্রলোক বল্লেন—পশ্চিমে বেশী দূর নয়—আমি যাচ্ছিলাম আসানসোলে। সেখানে চাক্‌রি করি। অনেক দিন চাক্‌রি খুঁজে বেড়িয়ে বেড়িয়ে শেষে ওইটি জুটিয়েছিলাম। তা চাক্‌রিও করাচ আজ এক বছর। এতদিন রেলবাবুদের মেসে খেতাম, আশ্বিন মাসে মেসে খেয়ে খেয়ে ডিসপেপসিয়া গোছের দাঁড়ালো। এত ঝাল দ্যায় মশাই, অত ঝাল খাওয়া আমার অভ্যাস নেই। আমার স্ত্রী বল্লে—যা পাও, একটা বাসা করো, আমাদের দুজনের খুব চলে যাবে। তোমারও কষ্ট থাকবে না, আমারও এখানে তোমায় বিদেশে ফেলে থাক্‌তে ভাল লাগে না। তাই এবার বাসা করে বড়দিনের ছুটিতে একে আন্‌তে যাই শ্বশুরবাড়িতে—সেখানেই বিয়ের পর আজ চার পাঁচ বছর রেখেছিলাম। দেশে আমার বাড়ি-ঘর সবই আছে, কিন্তু সেখানে মশাই শরিকী গোলমাল। সেখানে ওকে রাখার অনেক অসুবিধে—বার-দুই নিয়ে গিয়েছিলাম, তাতেই জানি।

আমি বল্লুম—ও'র কি কোনো অসুখ ছিল—হঠাৎ এমন—

—অসুখের কথা তো কিছুই জানি নে। তবে মাঝে মাঝে বুক ধড়ফড় করতো বল্‌তে শুনেচি।···অসুখটা আমার বাড়িতে যখন আনি আর-বছর, তখন বড় বেড়েছিল। আমার সে সময় নেই চাকরি, হাতে নেই পয়সা, আর এদিকে বাড়িতে আমার জ্যাঠতুতো ভাইয়ের স্ত্রী—তার যৎপরোনাস্তি দুর্ব্ব্যবহার; এই সবে সংসারে শান্তি তো ছিল না একদণ্ড।···ও আবার ছিল একটু ভালমানুষ মতো—ওর ওপরই যত ঝাক।

খানিকটা আপন মনেই যেন বল্‌তে লাগলেন—কালও বিকেলে কত কথা বলেচে। বাসার কথা আমায় কত জিজ্ঞেস কর্লে। বল্‌ছিল, সেখানে পাতকুয়ো না পুকুর? আমি বল্লাম—দুই-ই আছে। তবে পুকুরে রেলের কুলী চাপরাসীরা নায় আর কাপড় কাচে—তার চেয়ে তুমি বাসার পাতকুয়ার জলেই নেও। খাবার জন্যে রেলের বাবুদের কোয়ার্টারে টিউবওয়েল আছে—নিকটেই—সেখান থেকে জল আনাবো। বাসায় পেঁপে গাছ আছে শুনে কত খুশি!

বল্লে, হ্যাঁগা, ওদেশের পেঁপে নাকি খুব বড় বড় ? কাল দুপুরের পর থেকে বাক্স গুছিয়েচে··· মানকচু সঙ্গে নিয়ে যাবে বলে বিকেলে বেছে বেছে বড় মানকচুটা ওর ভাইকে দিয়ে তোলালে। রাত্রে ঘুমোয় না—কেবল বাসার গল্প করে···এ করবো···ও করবো···আমায় বল্লে —পেতলের ডেকচিতে খেয়ে খেয়ে তোমার অসুখ হয়েছে···তারা তো আর তেমন মাঁজে না ? ···অসুখের আর দোষ কি ? সেখানে মাটির হাঁড়ি-কুঁড়ি পাওয়া যাবে তো ?···রাত অনেক হয়েছে দেখে আমি বল্লাম—শোও ঘুমোও, কাল আবার সারাদিন গাড়ির কষ্ট হবে···রাত দুপুর হোল···ঘুমিয়ে পড়···কোথায় চলে গেল আর···আর আমায় রেঁধে খাওয়াতে আসবে না।···

হঠাৎ একটা গোলমাল ও বচসার আওয়াজে ভদ্রলোক ও আমি দুজনেই ফিরে চাইলুম। বিনোদ বাঁড়ুয্যে ও তার বন্ধু টিকিট বাবুর সঙ্গে কি নিয়ে ঝগড়া বাধিয়েছে এবং আমার মনে হোলো তারা এমন সব কথা বলচে যা হয়তো তারা স্বাভাবিক অবস্থায় বলতে সাহস কর্ত্তো না টিকিট বাবুকে। বিনোদ বাঁড়ুয্যে বলচে, যান্ যান্ মশাই অনেক দেখেচি ওরকম —আমরা গড়বাড়ি বাঁড়ুয্যে—সুতোহাটা পরগণার মধ্যে যেখানে যাবেন ওদিকে তমলুক এস্তেক—আমাদের এক ডাকে চেনে—ছোট নজর যেখানে দেখি সেখানে আমরা থাকি নে। এই শীতের রাতে কে আসতো মশাই ?—আমাদের আগে খোলসা করে আপনার বলা উচিত ছিল তা হোলে দেখতাম নৈহাটির বাজার থেকে কোন্ ব্যাটা পৈতেওলা বামুন আজ মড়া নিয়ে আসতো···মুদ্দফরাস দিয়ে না যদি···

ব্যাপার কি উঠে দেখতে গেলুম ; বিনোদ বাঁড়ুয্যে আমায় দেখে বললে, এই তো এই ভদ্দর লোক রয়েছেন—আচ্ছা বলুন তো আপনি ? আমরা সকলের আগে বলে দিয়েচি আমাদের এই চাই, এই চাই···এখন আসলে হাত গুটোলে চলবে কেন ? আপনিই বলুন তো ?···হ্যাঁ, মানুষ বলি এই বাবুকে···কোনো লোভ নেই, উনি খাবেন না, কিছু করবেন না—উনি এসেচেন মড়া নিয়ে এই শীতে। উনি বলতে পারেন—ওঁর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় দিতে হয়—

ঝোঁকের মাথায় বিনোদ বাঁড়ুয্যে সত্যিই আমার পায়ে হাত দেবার জন্যে ছুটে এল। আমি সেখান থেকে সরে পড়লুম—এদের অপ্রকৃতিস্থ অবস্থার ভাগ-বাঁটোয়ারা সংক্রান্ত কথার মধ্যে আমার থাকবার দরকার কিসের ?

মনে কেমন একটা দুঃখ হোল। এই অভাগিনী পল্লীবধূর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উপযুক্ত সম্মান এখানে রক্ষিত হলো না। মনে হোল ও এখানে কেন ? এই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত গঙ্গার উদ্দাম তরঙ্গভঙ্গ, এই হিমবর্ষী নক্ষত্রবিরল বিরাট আকাশ, এই অমঙ্গলময়ী মহানিশার মৃত্যু অভিযান—জীবনের নানা ছোটখাটো সাধ যাদের মেটে নি, এ রুদ্র আহ্বান তাদের বেলা আর কিছুদিন স্থগিত রাখলে বিশ্বকর্ম্মার কাজের কি ক্ষতিটা হোত ?···ছোট্ট একটি গৃহস্থ বাড়ির দাওয়ায় মেয়েটি খোকাকে কোলে নিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছে, সবে সে নদীর ঘাট থেকে গা ধুয়ে এসেচে, পায়ে আলতা, কপালে টিপ, খোঁপাটি বাঁধা—ওকে মানায় জীবনের সেই শান্ত পটভূমিতে—শ্মশানে মাতালের হুড়োহুড়ির মধ্যে ওকে এনে ফেলা যেমনি নিষ্ঠুর তেমনি অশ্লীল···

রাত দুপুর···

বিনোদ বাঁড়ুয্যে হঠাৎ কি মনে করে আমার পাশে এসে বসলো। সে আমার প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমান হয়ে উঠেচে···আমি কি করি কোথায় থাকি, বাড়িতে কে কে আছে,—এই সব নানা প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল।

—আপনি মশাই এর মধ্যে মানুষ। মানুষ চিনি মশাই, আজ না হয় দেখচেন ইস্টিশানে

পাঁউরুটি ফিরি করি···আমরা গড়বাড়ির বাঁড়ুয্যে···যান্ যদি কখনো ওদিকে, পায়ের ধুলো ঝেড়ে দিলেই বুঝতে পারবেন—সুতোহাটা পরগণার মধ্যে—

সব শেষ হতে রাত একটা বাজ্‌লো। চাঁদ ঢলে পড়েচে।

চিতা ধুতে গিয়ে ভদ্রলোক আবার হাউ হাউ করে কেঁদে উঠ্‌লেন—আমরা অনেক সান্ত্বনা দিয়ে তাঁকে থামালুম। আমি ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা পিসিমার বাড়ি চলে আসবো—ওরা কিছুতেই ছাড়ে না। টিকিট বাবু বল্লেন—আসুন আসুন অতটা মাংস খাবে কে? সব গরম গরম পাবেন—আমার বলে দেওয়া আছে—রাত বারোটার পর তবে ময়দায় জল দেবে। গিয়েই গরম গরম···চলুন মশাই···

অতি কষ্টে ওদের হাত এড়িয়ে পিসিমার বাড়ি ফিরলুম। কিন্তু সকালে উঠেই খোকাকে দেখ্‌বার ইচ্ছে হলো। সাড়ে সাতটার ট্রেনে নৈহাটি গিয়ে ছোটবাবুর বাসায় হাজির। খোকা নাকি অনেকক্ষণ উঠেচে। ভোরবেলা থেকে মায়ের কাছে যাবার জন্যে কাঁদ্‌ছিল, বাসার মেয়েরা অনেক কৌশলে থামিয়ে রেখেচেন।

ভদ্রলোকটিও এলেন। তিনি টিকিটবাবুর বাসায় রাত্রে শুয়েছিলেন—দেখে মনে হলো রাতে বেশ ঘুমিয়েচেন। খোকা এখন আর কাঁদিচে না। বাসার মেয়েরা কমলালেবু দিয়েচে হাতে; তাই খেতে খেতে ঝিয়ের কোলে বাইরে এল। ঝি বল্লে—কাল ছোটবাবুর বৌ নিজের কোলের কাছে ওকে নিয়ে শুয়েছিলেন। জেগে উঠলেই মুখে মাই দিয়েচেন, রাতের ঘুমের ঘোরে ও ভেবেচে ওর মা। কিন্তু ভোরে উঠেই সে কি কান্নাটা! কেবল বলে 'মা যাবো' 'মা যাবো'—আহা বাছা আমার, মানিক আমার···

একটু পরে আমি ভদ্রলোককে ট্রেনে তুলে দিতে গেলুম, খোকাকে কোলে নিয়ে। তিনি এই ট্রেনে মুর্শিদাবাদে শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাবেন। আমায় বল্লেন—কি ক'রে সেখানে ঢুক্‌বো মশাই, ভেবে আমার হাত পা আস্‌চে না। তবে যেতেই হবে, খোকাকে ওর দিদিমার কাছে দিয়ে আস্‌বো—নইলে কে দেখবে আর ওকে?

তারপর পাগলের মত হাসি হেসে বল্লেন—যাত্রাটা বদ্‌লে আসি মশাই। কি বলেন?··· হ্যা—হ্যা—

আমি বল্লুম—টিকিটবাবু কাল আপনাকে কিছু ফেরত দিয়েচেন?

—না, আমিও চাই নি। তবে আজ সকালে একটা ফর্দ্দ দেখাচ্ছিলেন, বলেন সব খরচ হয়ে গেছে। সে ফর্দ্দ আমি দেখিও নি— যা উপকার করেচেন আপনারা, তার শোধ কি কখনো দিতে পারবো?···

ট্রেন ছেড়ে চলে গেলো।···

প্ল্যাটফর্মে বিনোদ বাঁড়ুয্যের সঙ্গে দেখা। আমায় একপাশে ডেকে মুখ ভার করে বল্লে —শুনেচেন টিকিটবাবুর আক্কেলটা? সাড়ে সাত টাকা হাতে ছিল কালকের দরুন। কাল রাতে খাওয়া দাওয়ার পরে বল্লাম—ভাগ করো। তা আমাদের দিলে এক টাকা করে— দু'জনকে দু'টাকা। নিজে নিলে সাড়ে পাঁচ টাকা। বলে ওদের দু'জনের ভাগ, ও আর ওর ভাইপো। আচ্ছা, ভাইপো কি করেচে মশাই? শুধু কাপড়ের পুঁট্‌লিটা হাতে ঝুলিয়ে গিয়েচে বৈ তো নয়?···আর আমাদের অত ছোট নজর নেই···হাজার হোক্, কুলীন বামুনের ছেলে মশাই···না হয় পেটের দায়ে আজ পাঁউরুটি ফিরিই করি···

ঊর্মিমুখর

অনেকদিন এবার গ্রামে আসি নি। প্রায় মাস-তিনেক হোল। এবার দেশে গরমও খুব। একটুকু বৃষ্টি নেই কোনদিকে। দুপুরের দিকে হাওয়া যেন আগুনের হল্‌কার মত লাগে।

এবার গ্রামে এসে আমাদের ঘাটে নাইতে গিয়ে দেখি সলতেখাগী আমগাছটা ঝড়ে ভেঙে গিয়েচে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম কতক্ষণ। সলতেখাগী ঝড়ে ভেঙে গেল! ও যে আমার জীবনের সঙ্গে বড় জড়ানো নানাদিক থেকে। ওরই তলায় সেই ময়না-কাঁটার ঝোপটা, যার সঙ্গে আবাল্য কত মধুর সম্বন্ধ।

সলতেখাগীর সঙ্গে আর দেখা হবে না। ওকে কেটে নিয়ে জ্বালানী করবে এবার হাজারী কাকা। সত্যিই আমার চোখে জল এল। যেন অতি আপনার নিকট আত্মীয়ের বিয়োগ অনুভব করলুম।

গাছপালাকে সবাই চেনে না। এতদিনের সলতেখাগী যে ভেঙে গেল, তা নিয়ে আমাদের পাড়ার লোকের মুখে কোনো দুঃখ করতে শুনি নি।

পথের পাঁচালীতে সলতেখাগীর কথা লিখেচি। লোকে হয়তো মনে রাখবে ওকে কিছুদিন।

খুকুদের কাল আসবার কথা গিয়েচে দু-ধার থেকে। আজও এল না, বোধহয় আবার জ্বর হয়ে থাকবে।

আজ বিকেলে বেলেডাঙার পথে বেড়াতে বার হয়েচি, পথে গিয়ে বসেচি গঙ্গাচরণের দোকানে, কবিরাজ মশায়ের সঙ্গে গল্পসল্প করচি, এমন সময়ে কি মেঘ করে এল সুন্দরপুরের দিক থেকে! গঙ্গাচরণ বললে, খুব বৃষ্টি এল। আমি ওর দোকান থেকে বার হয়ে যেমন এসে বাঁওড়ের ধারের পথে পা দিয়েচি, অমনি বেলেডাঙার ওপারের বাঁশ বনের মাথার ওপর কালবৈশাখীর মেঘের নীল নিবিড় রূপ দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। কোথা থেকে আবার একসারি বক সেই সময় নীল মেঘের কোলে কোলে উড়ে চলেচে—সে কি অপরূপ রচনা! এদিকে মনে ভয় হচ্চে যে তাড়াতাড়ি গাঁয়ে ফিরতে হবে, ঝড় মাথায় মাঠের মধ্যে থাকা ভাল নয়, অথচ যাবো তার সাধ্য কি! পা কি নাড়াতে পারি? তারপর সোঁদালী ফুলের-ঝাড়-দোলা বনের ধার দিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছলাম আমাদের ঘাটে। সেখানে স্নান করে যখন আমাদের গুয়াতেলির তলা দিয়ে যাচ্চি—হাজরী জেলেনী সেখানে আম কুড়ুচ্চে—বড় চারার তলাতেও রথযাত্রার ভিড়। বৃষ্টি এল দেখে পালিয়ে বাড়ি এসে ঢুকলাম।

সলতেখাগী আমগাছটা একেবারে কেটে ফেলে করাতীর দল তক্তা তৈরী করচে। হাজারী ঘোষ রোড্‌সেস নীলামে বাগান কিনেচে—ওই এখন তো কর্ত্তা। ও কি জানে সলতেখাগীর সঙ্গে আমার বাল্য জীবনের কি সম্পর্ক!

কাল বিকেলে গোপালনগরে গিয়ে হাজারীর বৈঠকখানায় অনেকক্ষণ বসে ছিলুম। তার মেয়ের বিয়ে হবে, সেখানে ফর্দ্দ ইত্যাদি করা হচ্চে, সকলে খুব ব্যস্ত। এমন সময়ে অনেকদিন আগেকার দেখা সেই ভদ্রলোকটি, হলদিবাড়িতে যাঁর পাটের ব্যবসা ছিল, তিনি এলেন। আজ প্রায় পনেরো বছর তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি। আমি যখন কলেজে পড়তুম—ইনি তখন এই গ্রীষ্মের বন্ধের সময়ই মাঝে মাঝে এখানে আসতেন। মতি দাঁয়ের দোকানের বাইরের বারান্দায় বসে এঁর সঙ্গে কত কি আলাপ হোত। তখন এঁর বয়স ছিল পঞ্চাশ, এখন পঁয়ষট্টি। কিন্তু তখন ইনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, ঘোর তার্কিক ছিলেন, অনেক ব্যাপারের খোঁজখবর রাখতেন। এখন হয়ে পড়েচেন একেবারে অন্য রকম। আর কিছুতে উৎসাহ

নেই, নানারকম বাতিকগ্রস্ত হয়ে উঠেচেন। একটা প্রধান বাতিক তার মধ্যে এই দেখলুম যে ও'র বিশ্বাস, ও'র শরীর খারাপ হয়ে গিয়েচে আর সারবে না। আমি কত বোঝালুম, বললুম, 'আপনার বয়েস হয়েচে, তার তুলনায় আপনার শরীর ঢের ভাল। কেন মিছে ভাবচেন ?' ভদ্রলোকের ছেলে আমার সঙ্গে গোপালনগর স্কুলে পড়তো অনেক দিন আগে। সে ছেলেটি শুনেচি মারা গিয়েচে। আমি সে কথা জিজ্ঞেস্ করিনি।

ভদ্রলোক আমার সঙ্গে খানিকদূর এলেন। আমি তাঁকে বোঝাতে বোঝাতে এলুম। তুঁতভলায় স্কুলের কাছে তিনি চলে গেলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়েচে, মাথার ওপর বৃশ্চিক উঠেচে, জ্বল্ জ্বল্ করচে নক্ষত্রগুলো—বাঁওড়ের মাথার ওপরে উঠেচে সপ্তর্ষি। এতক্ষণ বিয়ের বড়লোকী-ফন্দরূপে বন্ধ হাওয়ার মধ্যে থেকে মনটা হাঁপিয়ে উঠেছিল, এইবার এসে আকাশের দিকে মুক্ত বহুদূর নাক্ষত্রিক জগতের দিকে সেটা ছড়িয়ে দিয়ে বাঁচলুম।

হাট থেকে এসে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গেলুম। বেলা খুব পড়ে গিয়েছে। আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালের নির্মেঘ অপরাহ্নের শোভা এত সুন্দর যে যার অভিজ্ঞতা নেই তাকে ঠিক বোঝানো যাবে না। এই অপরূপ সৌন্দর্যলোকের মধ্যে বসে কত কথাই মনে আসে!

হাজার বছর কেটে যাবে—এই রঙীন মেঘমালা, এই গায়কপাখীর দল, এই সব নরনারী, গাছপালা—কোথায় ভেসে যাবে কালস্রোতে; কিন্তু মানুষ তখন থাকবে। নতুন ধরনের কি রকম মানুষ আসবে, কি রকম হবে তাদের সভ্যতা, কি জ্ঞানের আলো তারা পৃথিবীতে জেলে দেবে—এই সব ভাবি।

নদীতে স্নান করতে নেমেচি, পুঁটি দিদি তখনও ঘাটে। বৃশ্চিক রাশির একটা নক্ষত্র খুব জ্বল্ জ্বল্ করচে। নদীর ওপারে সাঁই বাবলা গাছগুলোতে অস্তদিগন্তের রঙীন্ মায়া-আলো পড়েচে।

সারা রাত কাল আম কুড়িয়েচে লোকে লণ্ঠন ধরে। আমার মাঝে মাঝে ঘুম ভাঙে, মাঝে মাঝে দেখি সবাই আম কুড়ুচ্চে।

কাল করুণার সঙ্গে আকাইপুরে গেলুম যেমন প্রতি বৎসর যাই। করুণার মায়ের মুখে সেখানের গল্প শুনে বড় তৃপ্তি পাই। সহায়হরি ডাক্তারের দ্বিতীয় বিবাহের কথা আবার শুনলুম। সে এক করুণ কাহিনী। তারপর শুনলুম মধু মুখুয্যে ও প্রেমচাঁদ মুখুয্যের বাড়ির ডাকাতির গল্প। এ গল্প অবিশ্যি আমি ছেলেবেলায় শুনেচি, তবুও আবার ভাল করে শুনলুম। করুণাদের বাড়ির অতিথি-সেবা ও তার বাপের টাকা ওড়ার গল্প বড় মজার। টাকা আদায় করে নিয়ে আসছিল গোমস্তা। ২৫০ টাকার হিসাব দিলে না। বললে, কর্তা মশায়, মাঠে ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল, টাকাগুলো উড়ে গিয়েচে, আর পেলুম না। ওর বাবা তাদের রেহাই দিলেন। মরবার আগে সবাইকে ডেকে বন্ধকী খত ছিঁড়ে ফেললেন। ও'র ছেলেরা কার নামে নালিশ কর্ত্তে যাচ্ছিল, করুণার মা বললেন—শোন্, তা তো হবে না, কর্ত্তা বারণ করে গিয়েচেন মরবার সময়ে। ওদের পীড়ন করতে পারবে না। যা দেয় নাও গে যাও।

একদিকে যেমন করুণার বাবা, অন্যদিকে তেমনি সহায়হরি ডাক্তার। সহায়হরির মত অর্থপিশাচ মানুষ পাড়াগাঁয়ে বেশী নেই। খতে টাকা উশুল দিয়ে নেয় না, অথচ আদায়ী টাকার জন্যে খাতকের নামে নালিশ করে। চক্রবৃদ্ধি হারের সুদের এক আধলা রেহাই দেবে না খাতককে।

বিকেলে একটু মেঘ করেছিল। গঙ্গাচরণের দোকানে কবিরাজ মশাইয়ের সঙ্গে গল্প করছিলুম। আমি বললুম—কি রাঁধলেন, কবিরাজ মশাই?—কণ্টিকারীর ফল ভাজা আর ভাত। এই কবিরাজটি বড় অদ্ভুত মানুষ। বয়স প্রায় সত্তর হবে, কিন্তু সদানন্দ, মুক্তপ্রাণ লোক। কোন্ দেশ থেকে এদেশে এসেচে কেউ জানে না। বিশেষ কিছু হয় না এই অজ পাড়াগাঁয়ে। তবুও আছে, বলে—এদেশের ওপর মায়া বসে গিয়েচে। সোঁদালি ফুল দিয়ে একটা বালিশ তৈরী করেচে, সেই মাথায় দিয়ে শুয়ে থাকে।

একটু পরে ঘন মেঘ করে এল। বেলেডাঙার ওপারে বাঁশবনের মাথার ওপরকার আকাশে যে কি সুনীল নিবিড় মেঘসজ্জা! মেঘের কোলে আবার একসারি বক উড়ল। কি রূপ যে হোল, আমি বৃষ্টির ভয়ে পালাচ্ছিলুম, কিন্তু সৌন্দর্য্য দেখে আর নড়তে পারি নে। কে একটি মেয়ে নদীর এপারে কালো চুলের রাশি খুলে দাঁড়িয়ে আছে। কি চমৎকার ছবিটি!

আজ বেশ মনের আনন্দ নিয়েই সকাল সকাল বেলডাঙা গিয়েছিলুম। তখনও চারটের গাড়ি যায় নি। গঙ্গাচরণের দোকান খোলে নি। আইনদ্দির বাড়িতে তেল-পড়া নেবার জন্যে পাঁচী পাঠিয়েছিল আবার সঙ্গে জগোকে ও বুধোকে। আইনদ্দির বাড়িতে ছেলেবেলাতে একবার গিয়েছিলুম, ওর ছেলে আহাদ মণ্ডল তখন বেঁচে ছিল। আইনদ্দির বাড়িটা কি চমৎকার স্থানে! সেখান থেকে দূরের মেঘভরা আকাশের নীচে প্রাচীন বট অশ্বত্থের সারি কি অদ্ভুত দেখাচ্ছিল! আইনদ্দি চকমকি ঠুকে সোলা ধরিয়ে তামাক সাজলে ও একটা সোলা ফুটো করে আমায় তামাক খেতে দিলে। তারপর সে কত গল্প করলে বসে বসে। ১২৯২ সালে সে প্রথম এদেশে এসে বাস করে। তখন তার বয়েস বিয়াল্লিশ বছর। সে বছর বন্যার জল উঠেছিল তার উঠোনে। মরা গাঙ তখন ইছামতী ছিল, একথা কাল মতি মণ্ডল ওজলের ওপর দাঁড়িয়ে আমায় বলেছিল। আইনদ্দি বললে—বড্ড ফুর্ত্তি করেচি মশাই, যাত্রার দলে গাওনা করেচি, বহুরূপী সেজেচি, বেহালা বাজিয়েচি। আপনাদের শাস্তরটা খুব পড়েচি। ধরো গিয়ে বেরুষোকেতু, সীতার বনবাস, বিদ্যেসুন্দর সব আমার মুখস্ত। তারপর সে 'বিদ্যাসুন্দর' থেকে খানিকটা মুখস্থ বলে গেল। মহাভারত থেকে 'দাতাকর্ণ' খানিকটা বললে। এখন ওর বয়েস নব্বইয়ের কাছাকাছি, এই বয়সেও সে নিজে চাষবাস দেখে। সে হিসাবে আমি তো এখন নব্য যুবক। আমার সামনে এখন কত সময় পড়ে আছে। মনে করলে কত কাজ করতে পারি। কাল মতি মণ্ডলকে ঘুনি তুলতে দেখেও ঠিক এই কথাই মনে হয়েছিল।

আইনদ্দির বাড়ি থেকে সুন্দরপুরের পথে খানিকটা বেড়াতে গেলুম। মরাগাঙের বাঁকে দাঁড়িয়ে আরামডাঙার ওপারের চক্রাকার আকাশের নীলমেঘের সজ্জার দৃশ্য যেন মনকে কতদূরে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল।

পথে আসতে আসতে একটা করুণ দৃশ্য দেখে সন্ধ্যাবেলাটা মন বড় খারাপ হয়ে গেল। গোয়ালাদের একটা ছোট মেয়েকে তার মা ঘরের উঠোনে এমন নিষ্ঠুরভাবে মারচে, আর মেয়েটা কাঁদচে। আহা, নিজের সন্তানের ওপর অত নিষ্ঠুরভাবে হাত ওঠায় কি করে তাই ভাবি! কি করবো, আমার কিছুই করবার নেই। এদিকে বৃষ্টি পড়চে টিপ্ টিপ্ করে, সঙ্গে দুটো ছোট ছোট ছেলে, তাড়াতাড়ি কুঠীর মাঠের বনের পথ দিয়ে আমাদের আর বছরের চড়ুইভাতির জায়গাটা বুধোকে আর জগোকে একবার দেখিয়ে—তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এলুম।

আজ দিনটা মেঘে মেঘে কেটেচে ! কিন্তু সকালবেলায় একটু সূর্য্যের মুখ দেখে ছিলুম। মেঘ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। দুপুরে ঘুমুচ্চি, জগো এসে ওঠালে। একটু পরে খুকুও এল। জানলার গরাদটা ধরে দাঁড়িয়ে তার নানা গল্প। তার মাথা নেই, লেখাপড়া কি করে হবে···এই সব কথা। আমার কর্ত্তব্য হিসাবে তাকে যথেষ্ট আশ্বাস দিলুম। তারপর পাঁচীকে আর ওকে রোয়াকে বসে সূর্য্য ও গ্রহনক্ষত্র সম্বন্ধে অনেক কথা বললুম। খুকু বেশ আগ্রহের সঙ্গে শুনলে। বললে, এ আমার বেশ ভাল লাগে। সূর্য্য সম্বন্ধে কিছুই জানতুম না। আরও বলবেন একদিন।

তারপর আমি বেলেডাঙ্গার মাঠে বেড়াতে বার হোলাম। কি সুন্দর বিকেলটা আজ ! ঠাণ্ডা অথচ পথঘাট শুকনো খট্‌খট্ করচে। মাঠের গাছপালাতে সোনালী রোদ পড়েচে। কুঠীর মাঠে যেতে যেতে প্রত্যেক সোঁদালি গাছ, ঝোপঝাপে, বাঁশবন আমার মনে গভীর আনন্দের সঞ্চার করেচে। নতজানু হয়ে ভগবানের কাছে তাই মনের আনন্দ জানালুম। কুঠীর মাঠে ঘাসের ওপর এখনও জল বেধে আছে।

কবিরাজ ও গঙ্গাচরণ পথের ধারে মাদুর পেতে বট অশ্বত্থের ছায়ায় বসে গল্প করচে। কাপড় কেটে কবিরাজ নিজেই জামা সেলাই করচে। শুকনো ভেষজ পাতালতা কলকাতায় চালান দেবে, তারই মতলব আঁটচে। বড় ভাল লাগল বিশেষ করে আজ ওদের গল্পসল্প। আসবার সময় ছাতা নিয়ে এলুম, তখন রাত হয়ে গিয়েচে, আমাদের ঘাটে যখন নাইতে নেমেচি, আকাশে অনেক নক্ষত্র উঠেচে।

ক-দিন মনে কেমন একটা অপূর্ব্ব আনন্দ। বিশেষ করে যখনই কুঠীর মাঠে যাবার সময় হয়, তখনই সেটা বিশেষ করে হয়। কাল যখন বিকেলে ঘন নীলকৃষ্ণ মেঘ করল, তার কোলে বক উড়ল, তখন আমি সেদিকে চেয়ে এক জায়গায় বসে আছি। আবার যখন পুলের রেলিং ধরে উঠে দাঁড়াই অস্ত-আকাশের পটভূমিতে সবুজ বাঁশবনের দিকে চেয়ে থাকি, তখন আমি যেন শত যুগজীবী অমর আত্মা হয়ে যাই—সেদিন যেমন হয়েছিল, আজও তাই হোল। বেলেডাঙার ওদিকে মোড় থেকে চক্রাকৃতি দিগবলয়লীন শ্যাম বেণুবনের অপূর্ব্ব শোভায় মেঘধূসর আকাশতলে মন এক অপূর্ব্ব আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। যখন এই শুকনো মরাগাঙে আবার ইছামতী বইবে, তখন আমি কোন্ নক্ষত্রে রইবো—কত কাল পরে—কে জানে সে খবর ? বাবলার সোনালী ফুল দোলানো গাছের তলা দিয়ে সেই পথ। ভাবতে ভাবতে চলে এলুম। পুলের ওপর খানিকটা দাঁড়াই। সেই কত কালের প্রাচীন বট অশ্বত্থ, কত কালের আইনদ্দি মণ্ডলের বাড়ি ও বাঁশবনের সারি। মনে এ কয়দিনই সেই অপূর্ব্ব অনুভূতিটা আছে। পুলের পাশে একটা হেলা বাবলা গাছে ফুলের কি বাহার! যখন নদীর ঘাটে এসে নামলুম স্নান করতে তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েচে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে শুধু বৃশ্চিকের একটা নক্ষত্র অস্পষ্টভাবে জ্বলচে। মাথার ওপর দ্যুতিলোক, চারিদিকে নীরব অন্ধকার, নদীজল ও গাছপালার দিকে চেয়ে মনে যে ভাব এল, তা মানুষকে অমরতার দিকে নিয়ে যায়। বুড়ো ছকু পাড়ুই এই সময় তার স্ত্রী আদাড়িকে সঙ্গে করে নদীতে গা ধুতে এল। সে অন্ধকারে চোখে দেখতে পাবে না বলে স্ত্রী ওর সঙ্গে এসেচে।

সকালে উঠে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে আজ বড় আনন্দ পেলাম। দুপুরে পাট্‌শিমলে রওনা হওয়া গেল পায়ে হেঁটে। কবিরাজ মশায় পাঠশালায় ছেলে পড়াচ্চেন, তাঁর কাছে বসে একটু গল্প করে বট অশ্বত্থের ছায়াভরা পথ দিয়ে মোল্লাহাটির খেয়া ঘাটে গিয়ে পার হলাম। কেউটে পাড়ার কাছে গিয়েচি, এক জায়গায় অনেকগুলো বেলগাছ একসঙ্গে দাঁড়িয়ে।

সেখানে বড় বৃষ্টি এল। পূর্বদিকের আকাশ বৃষ্টিধোয়া, নীল, পরিষ্কার সেই ইন্দ্র নীল রং-এর আকাশের পটভূমিতে দূরে গ্রামের তাল খেজুরের সারি, বাঁশবনের শীর্ষ, কি চমৎকার দেখাচ্ছে। আর এদিকে ঘন কালো বর্ষার মেঘ জমেচে। গোবরাপুরের মোড় বেঁকে কুঁদীপুরের বাঁওড়ের ওপারের রানীনগর বলে ছোট একটা চাষা-গাঁয়ের দৃশ্য ঠিক যেন ছবির মত। এখানে একজন বৃদ্ধাকে পথ জিজ্ঞেস করলুম। তিনি বললেন—তোমার নাম বিভূতি? সাতবেড়েতে একবার গিয়েছিলে না? আমি বললুম—হ্যাঁ। আপনি কি করে চিনলেন? তিনি নিজের পরিচয় দিলেন না। গোবরাপুরের একটা দোকানে মণীন্দ্র চাটুয্যের, ভট্টাচায্যির সঙ্গে দেখা। সেখানে বসে একটু গল্প করেই আবার পথে বেরিয়ে পড়ি। কি ঘন বন পথের দু-ধারে। বড় বড় লতা কালো কালো গাছের গুঁড়ির গায়ে উঠেচে—এই কয়দিনের বৃষ্টিতেই গাছের তলায় বনের ছোট ছোট গাছপালার জঙ্গল বেধে গিয়েচে। 'বৌ-কথা-কও' ডাকচে চারিধারে। কেউটে পাড়ার গায়ে পথের ধারের একটা সোঁদালি ফুল গাছে এই আষাঢ় মাসের প্রায় মাঝামাঝি সময়েও অজস্র ফুল দেখেছি। পাটশিমলের মধ্যে কি ভীষণ tropical forest-এর রাজত্ব! ছোট ছোট জাম ফলে আছে বুনো জামগাছে—বড় বড় লতা-বনের মধ্যেটা মিশ-কালো। পাটশিমলের মোহিনী কাকার সঙ্গে বাঁওড়ের ওপারে একটা চাষাগাঁয়ে দেখা হোল। তিনি আমার সঙ্গে গেলেন প্রায় বাগান গাঁ পর্যন্ত। পিসিমার বাড়ি গেলুম তখন সন্ধ্যা হয়েচে। পিসিমার সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা। দু-জনে অনেক রাত পর্যন্ত গল্পগুজব করা গেল। সকালে কোদলার জলে নাইতে গিয়ে দেখি যে টলটলে জল আর নেই নদীর—কচুরি পানায় নদী মজে গিয়েচে, জল রাঙা, ঘোলা—সেইটুকু জলে সব লোকে নাইচে, গোরু বাছুরের গা ধোয়াচ্চে।

পরদিন সকালে খাওয়া দাওয়া করে বৃষ্টি মাথায় আবার বাড়ি রওনা হই। সারাপথটা বর্ষা আর বাদলা—কিন্তু খুব ঠাণ্ডা দিনটা। আমার সেই ঘন বন—পাটশিমলে থেকে গোবরাপুরের পথে দু-জন চাষা লোকের সঙ্গে গল্প করতে করতে এলুম। আবার সেই ঘন tropical forest-এর মত বন, বড় বড় কাছির মত লতা—পথ নির্জন, টুপটাপ করে জল ঝরে পড়ছে গাছের মাথা থেকে, আরণ্যশোভা কি অদ্ভুত! রানীনগরের এপারে একটা সাঁকোর ওপর কতক্ষণ বসে বসে নীল আকাশের পটভূমিতে আঁকা গ্রামসীমার বাঁশবনের দিকে চেয়ে রইলুম। মোল্লাহাটির ঘাট যখন পার হই, তখনও খুব বেলা আছে। আজ মোল্লাহাটির হাটবার, হাটে গিয়ে একটা আনারসের দর করলুম। সুন্দরপুরের গোয়ালাদের একটা ছেলের সঙ্গে দেখা হোল। মনে পড়ছিল আজ ওবেলা যখন আসছিলুম পাটশিমলের ঘন ক্ষুদে জামবনের মধ্যের সেই পথটা দিয়ে—মনে হচ্ছিল আমি একজন বন্ধনহীন মুক্ত পথিক, দেশে দেশে এই অপূর্ব রূপলোকের মধ্যে দিয়ে বেড়িয়ে বেড়ানোই আমার জীবনের পেশা। কি আনন্দ যে হয়েছিল, কি অপূর্ব পুলক, মুক্তির সে কি অমৃতময়ী বাণী! কেন মানুষে ঘরে থাকে তাই ভাবি। আর কেনই বা পয়সা খরচ করে মোটরে কি রেলের গাড়িতে বেড়ায়? পায়ে হেঁটে পথ চলার মত আনন্দ কিসে আছে? সে একমাত্র আছে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ালে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে ঘোড়ায় চড়ার আনন্দ আমি জানি। তার সঙ্গে কিছুরই তুলনা হয় না।

মোল্লাহাটির হাট ছাড়িয়েচি, পথে আমাদের গাঁয়ের গণেশ মুচি নকফুল গ্রামে ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ করতে যাচ্চে। ওকে দেখে বড় আনন্দ হয়—শান্ত, সরল, সাধুপ্রকৃতির লোক বলে বাল্যকাল থেকে ওকে আপনার-জনের মত দেখি।

বেলা যাব-যাব হয়েচে দেখে একটু জোর-পায়ে পথ হাঁটতে শুরু করলুম। খুব রাঙা রোদ উঠেচে চারি ধারে। খাবরাপোতা ছাড়লুম, সামনে আইনদ্দির বাড়ির পেছনের

প্রাচীন বটগাছটা, আইনদিদের বাড়ির মোড় থেকে দেখ্‌তে পাওয়া সেই দূরপ্রসারী দিগন্তের— আজ আবার মেঘভাঙা রাঙা অস্ত সূর্যের রোদ পড়েচে দূরের সেই সব বাঁশবন, শিমুলবনের মাথায়, ঝিঙে খেতে ফুল ফুটেচে, বৈশাখের গায়ক পাখী পাপিয়া আর 'বৌ-কথা-কও' চারিদিকে ডাক্‌চে, বেলেডাঙার হাজারী ঘোষ গোরুর পাল নিয়ে নতিডাঙার খড়ের মাঠ থেকে বাড়ি ফিরচে, মেয়েরা মরগাঙের ঘাট থেকে কলসী করে জল নিয়ে যাচ্চে,—কি সুন্দর শান্ত গ্রাম্য দৃশ্য, একবার মনে হ'ল পাটশিমলের সেই কালীবাড়ি ও দেবোত্তর বাঁশঝাড়ের কথা। আজ দুপুর বেলা সেখানে ছিলাম, কালীবাড়ির পেছনের এক গৃহস্থের বাড়ির বৌ প্রতিবেশিনীকে ডেকে বলছিল—ও সেজ বৌ, একটু তরকারী দেবো, খুকীকে দিয়ে বাটি পাঠিয়ে দ্যাও তো!

সন্ধ্যার আগে কতদূরে এসে গিয়েচি। সন্ধ্যাও হল, বাড়ি এসে পা দিলাম, আমার পথ চলাও ফুরুল।

আজ শরতের অপূর্ব্ব দুপুরে পাগল করেচে আমায়। অনেক দিন লিখি নি—নানা গোলমালে অবসাদে মনটা ভালো ছিল না—আজ রবিবার দিনটা দুপুরে একটু ঘুমিয়ে উঠেচি —কি পরিপূর্ণ ঝলমলে শরতের দুপুর। এর সঙ্গে জীবনের কি যে একটা বড় যোগ আছে— ভাদ্রমাসের এই রোদভরা দুপুর কেন যে আমায় পাগল করে তোলে। বনে বনে মটরলতার কথা মনে পড়ে, ইছামতীর ঘোলা জল, পাখীর ডাক—মনটা যেন কোথায় টেনে নিয়ে যায়! সব কথা প্রকাশ করা যায় না—কারণ আনন্দের সবটা কারণ আমারই কি জানা আছে? কি করচে খুকু এই শরৎ দুপুরে, বকুলতলায় ছায়ায় ছায়ায়, একথাও মনে এসেছে। ওর কথা ভেবে কষ্ট হয় যে, ওর লেখাপড়া হ'ল না।

কাল দিনটি বড় সুন্দর কেটেচে, তাই আজ মনে হচ্চে আজ সকালটিও বড় চমৎকার। অনেকদিন কলকাতায় একঘেয়ে জীবনযাত্রার পরে কাল বাড়ি গিয়েছিলুম। প্রথমেই তো খয়রামারি মাঠে দুপুরের রোদে বেড়াতে গিয়ে সবুজ গাছপালা লতাপাতার গন্ধে নতুন জীবন অনুভব করলুম। হাওয়াতেও একটা তাজা গন্ধ আছে যা কিন্তু শহরে নেই। ঝোপে থোলো থোলো মাখম শিমের নীলফুল ফুটেচে, মটরলতার সবুজ ফল ও সোঁদালি গাছের কাঁচা সুঁটি বন-জঙ্গলের শোভা কত বাড়িয়েচে—তাদের ওপর আছে শরতের মেঘমুক্ত সুনীল আকাশ, আর আছে তপ্ত সূর্য্যালোক। প্রতিবারই দেখেচি নতুন যখন কলকাতা থেকে আসি এমন একটা আনন্দ পাই! মনে হয় এই তো নীলাকাশ আছে মাথার ওপর, চারিপাশে বেষ্টন করে রয়েছে ঘন সবুজ গাছপালার ঝোপ, পাখীর ডাক আছে, বনফুলের দুলুনিও আছে—এ থেকে তো এতই আনন্দ পাচ্চি—তবে কেন মিথ্যে পয়সা খরচ করে দূরে যাই! দূর আমায় কি দেবে, এমন কি দেবে যা এখানে আমি পাচ্চি নে? আসল কথা দূরেও কিছু নয়, নিকটও কিছু নয়—প্রকৃতি থেকে আনন্দ সংগ্রহ করবার মত মনের অবস্থা তৈরী হয়ে যদি যায় তবে যে কোনো জায়গায় বসে দুটো গাছপালা, একটুখানি সবুজ ঘাসে ভরা মাঠ, দুটো বন্য পক্ষীর কলকাকলী, বনফুলের শোভাতেই পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করা যায়।

কাল বারাকপুরে গেলুম সকাল বেলা। দুপুরে ইছামতীতে স্নান করতে গিয়ে সত্যি বড় আনন্দ পেয়েচি। কূলে কূলে ভরা নদী, দু-ধারে অজস্র কাশফুল, আরও কত কি লতা ঝোপ, বর্ষার জলে সব ঘনসবুজ—চক্‌চক্ করচে কালো কচুর পাতা, মাখম শিমের নীল ফুল ফুটেচে—একটা গাছে সাদা সাদা বড় বড় ঢোল-কলমীর ফুলও দেখলুম।

বৈকালে যখন, খুকু, আমি আর কালো নৌকোতে বনগ্রামে আসি, তখনও দেখলুম দু-ধারে গাছপালার কি অপরূপ রূপ, বনের ফুলের কি শোভা!

ছকু মাঝিকে জিজ্ঞেস্ করলুম—ওটা কি ফুল ছকু? ছকু বললে—কোয়ারা…

খুকুকে কাশফুল দিয়ে একটা বাংলা সেন্টেন্স তৈরী করতে দিলাম!

রাঙা-রোদ বৈকালটি মেঘমুক্ত আকাশে, নদীতীরে অপূর্ব শোভা বিস্তার করচে।

কাল রাত্রের ট্রেনে তারাভরা আকাশের তলা দিয়ে যখন এলুম, সেও বেশ ল্যাগছিল।

আজ স্কুলের ছুটি হবে। সুন্দর প্রভাতটি।

আজ সকালটি বড় সুন্দর! গুয়া নদীতে হাতমুখ ধুয়ে এসে বটতলায় এসেচি—দূরে সবুজ পাহাড়শ্রেণী—সকালের হাওয়ায় একটু যেন শীতের আমেজ। কাল ঘন জঙ্গলের পথে আমরা অনেকদূরে গিয়েছিলুম, পথে পড়ল দুখানা সাঁওতালী গ্রাম। বরমডেরা কুলামাতো। আর বছর যে রাস্তা ধরে সার্টাকিটা গ্রামে যাই, এবার সে রাস্তায় না গিয়ে চললুম সোঝা ধনঝরি পাহাড়ের দিকে। বামে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি। সামনে ডাইনে পিছনে চারিদিকেই পাহাড়। নীলঝরণার ওদিকের পাহাড়ের বড় বড় সামনের চাঁইগুলি নীল আকাশের পটভূমিতে লেখা আছে। ছোট একটি পাহাড়ী ঝরনা এক জায়গায়। ঝরনা পার হয়ে দু-ধারে শাল, মহুয়া, তমালের বন, বুনো শিউলি গাছও আছে। একটা ভাল জায়গা দেখে নিয়ে আমরা চা খাবো ঠিক করলুম। বন সামনের দিকে ক্রমেই ঘন হচ্চে, ক্রমে একধারে উঁচু পাহাড়ের দেওয়াল, বড় বড় বনের গাছে ভরা, আর বাঁ দিকে অনেক নিচে একটা ঝরণা বয়ে যাচ্চে ঘন-সন্নিবিষ্ট গাছপালার মধ্য দিয়ে। আমরা দূরে থেকে ওর জলের শব্দ শুনতে পেয়েছিলুম। সবাই মিলে নেমে গিয়ে বড় বড় গাছ ও মোটা কাছির মত লতা দিয়ে তৈরী প্রকৃতির একটি ছায়াশীতল ঘন কুঞ্জবনে একখানা বড় চৌরস কালো শিলাখণ্ডের ওপর দিয়ে বসে চা পান করা গেল। টাঙি হাতে একজন সাঁওতাল জঙ্গলে কাঠ কাটতে যাচ্ছে, বললে—বেশী দেরি করবেন না, একটু পরে এখানে বুনো হাতী জল খেতে নামবে। গাছপালার মাথায় মাথায় শরতের অপরাহ্নের রাঙা রোদ। সামনে পেছনে বড় বড় পাথর, একখানার ওপর আর একখানা আকাশের দিকে ঠেলে উঠেচে—ওদিকে আরও ঘন জঙ্গলের দিকে ঝরনার পথ ধরে খানিকটা বেড়িয়েও এলুম। বেলা পড়লে রওনা হয়ে ছায়াভরা পার্শ্বত্যপথে হেঁটে আমরা এলুম নীলঝরনার উপত্যকার মুখ পর্য্যন্ত। ডাইনে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি মাথা খাড়া করে আছে। আশেপাশের বন্য সৌন্দর্য্য সন্ধ্যার ছায়ায় আরও সুন্দরতর হয়েচে—সেইদিনই যে সুদূর পথে ইছামতীতে আসবার সময় আমাদের ভিটেটাতে গিয়ে মায়ের কড়াখানা দেখেছিলুম—সে কথা মনে পড়চে। নীরদবাবু ও আমি নীল ঝরনা বেড়িয়ে অনেক রাত্রে বাংলোতে ফিরি।

সকালে উঠে সুবর্ণরেখার পুলের ধারে মাছ কিনতে এলুম। সকালটি বড় চমৎকার, নির্মেঘ নীল আকাশের দিকে চাইলে কত কালের কত সব কথা যেন মনে পড়ে। পুল থেকে চারি ধারে চেয়ে দেখি মাছ বা জলের সম্পর্কও নেই কোনো ধারে। নিচে নেমে ছায়ায় একটা শিলাখণ্ডে অনেকক্ষণ বসে রইলুম—ভাবচি সুপ্রভার পত্রের আজ একটা উত্তর দেব। ওখান থেকে ফিরে এসে বাংলোর পেছনে যে পাহাড়ী নদী—তাতে নাইতে গেলুম আমি আর শঙ্কর। সুন্দর নদীর ঘাটটি, পাথর একখানা বড় ঘাটে ফেলা আছে, জলের ধারে একটা অশ্বত্থ গাছের নীচে জলজ লিলি ফুটে। সামনে থৈ থৈ করচে পাহাড়শ্রেণী, ঘন সবুজ তার সানুদেশ। দূরে Governor's pool-এর কাছে একটা গাছের আঁকাবাঁকা মাথা সবুজ পাহাড়ী ঢালুর পটভূমিকে দেখা যায়। এ ক-দিনের প্রখর সূর্য্যালোক আর বছরের এ সময়ের বর্ষা-বাদলের

কথা মনে করিয়ে দেয়···সূর্য্যের আলো না থাকলে এসব পাহাড় শ্রেণী, এ পাহাড়ী নদী, এই গাছপালা—এই প্রসারতা এত ভাল লাগত ? এই এখন বসে আছি বাংলোর বারান্দাতে, দূরে দূরে কালাঝোর ও অন্যান্য পাহাড় শ্রেণী অপরাহ্ণের পড়ন্ত রোদে কি সুন্দরই না দেখাচ্চে ! দুপুরে মহুলিয়ার পোস্ট মাস্টার এসেছিল, কেষ্ট আবার এসেছিল—ওরা বললে সেদিন যে হাতীঝরনায় গিয়ে চা খেয়েছিলুম, তার ওদিকে বাঁকাই বলে গ্রাম আছে, গভীর জঙ্গল তার ওপারে—ধান পাকলে নিত্য হাতীর দল বার হয়। বাসাডেরা ও ধাড়াগিরির পথ এখন নিরাপদ নয়, কেষ্ট বলছিল। সেদিকে এখন জঙ্গলও খুব ঘন, তাছাড়া বড় বাঘের ভয় হয়েচে, অনেকগুলো মানুষ-গরুকে বাঘে নিয়েচে এ বছর। সাতগুড়ুমের পথেও বাঘের উপদ্রব হয়েছে এ বছর।

পোস্ট মাস্টার বললে—আপনার জন্যে জমি রেখে দিলে বিষ্টু প্রধান, আর আপনি মোটে এলেন না। নেন যদি, জমি এখনও আছে।

বিজয়ার দিন মহুলিয়া যাবো, সেখান থেকে টাটানগর ও চাইবাসা।

এইমাত্র পাহাড়ের সানুদেশে বসে হালুয়া তৈরী করে চা খাওয়া গেল। মাথার ওপর অষ্টমীর চাঁদ, আকাশে দু-দশটা তারা, সামনে অরণ্যাবৃত পাহাড়ের অন্ধকার সীমারেখা, দূরে বামদিকে অরণ্য আরও গভীর, মৃদু জ্যোৎস্নালোকে পাহাড়, উপত্যকা, সানুদেশস্থ বনানী অদ্ভুত হয়েচে দেখতে। আজই পট্টনায়েকবাবু বলেছিলে ৪নং shift-এ বাঘ আছে, সেজন্যে সন্ধ্যার পরে আমাদের সকলের গা ছম্‌ছম্ করচে। রামধন কাঠ কুড়িয়ে আগুন জ্বালিয়ে রেখেচে পাছে বাঘভাল্লুক আসে সেই ভয়ে। কেবলই মনে পড়তে থাকে আজ মহাষ্টমীর সন্ধ্যা, বাংলাদেশের গ্রামে-গ্রামে এই সময়টিতে পুজোর চণ্ডীমণ্ডপে দেবীর আরতি হচ্চে শঙ্খঘণ্টা রবের মধ্যে, ছেলেমেয়েরা হাসিমুখে নতুন কাপড় পড়ে ঘুরচে—আর আমরা সিংভুমের এক নির্জ্জন বন্যজন্তু-অধ্যুষিত পাহাড়ের মধ্যে বসে গল্প করচি ও প্রকৃতির শোভা দেখচি।*

ওখান থেকে ফিরচি, রুখামের মুদীর দোকানের সামনে সাঁওতালী নাচ হচ্চে, মাদল বাজার তালে তালে। আমাদের একটা কম্বল পেতে দিলে, আমরা অষ্টমীর চাঁদের নিচে পাহাড়ের সামনের ছোট গ্রামে খাঁটি সাঁওতালী নাচ দেখে বড় আনন্দ পেলুম। কবিরাজের সঙ্গে বসে একটু গল্প করা গেল। তার বাংলোর সামনে কবে রাত্রে চিতাবাঘ এসে দাঁড়িয়েছিল। সাঁওতালদের গোরস্থানে সেবারে ভুত দেখেছিল, ইত্যাদি কত গল্প।

মহুলিয়াতে আজ সারা দুপুর ঘুরে বেড়িয়েচি। বাদলবাবুর বাংলো থেকে কালাঝোরের দৃশ্যটি বেশ লাগল। বলরাম সায়েবের ধারে সেই গাছটি, নানারকমের পটভূমিতে দুপুরের পরিপূর্ণ সূর্য্যালোকে কি অদ্ভুত যে দেখাচ্ছিল ! তিনটের ট্রেনে গেলাম টাটানগর। বাসে কাশিডি নেমে আশুর বাসা খোঁজ করে বার করি। সে একটা গন্ধরাজ ফুলগাছের তলায় চেয়ার পেতে বসে আছে। দু-জনে সন্ধ্যার পরে নিউ এল্-টাউনে প্রতিমা দেখে এলাম। লোক-জনের ভিড়, মেয়েদের ভিড়, তারপর ওল্ডএল্-টাউনের প্রাইমারি স্কুলে ঠাকুর দেখি। একবার আশু বাড়ি এল মোটর লরি দেখতে—পাওয়া গেল না, তারা সব বর্ম্মা জিঙ্কে ঠাকুর দেখতে যাচ্চে। হেঁটে বর্ম্মা জিঙ্ক যাবার পথে ডুপ্লে প্ল্যান্ট্ ও slug ঢালার সময়কার রক্ত আভা থেকে মনে হ'ল আগ্নেয়গিরি কখনো দেখি নি, বোধ হয় এই ধরনের জিনিস হবে। ওই সাদা আগুনের স্রোতের মতই তার উষ্ণ লাভা-স্রোত। বর্ম্মা মাইনসের ঠাকুর সাজিয়েচে খুব ভাল, আবার তার সামনেই একটা কৃষ্ণলীলার ছবি সাজিয়েচে। বাসে স্টেশনে জুগসলাই ও

* এই অংশটি ৪নং shift-এর বসে লেখা।

বিষ্ণুপুর ঘুরে কাশিডি এলাম। পথে বাস হাঁকছে, টিনপ্লেট, বর্ম্মা জিংক, যেমন কলকাতায় হাঁকে 'ভবানীপুর', 'আলিপুর'।

সকালে টাটানগর থেকে প্যাসেঞ্জারে বাসায় নামলুম। শ্যামপুর গ্রামখানা পাহাড়ী নদীর ঠিক ওপারে, কাঁকুরে জমি, কাছেই এদেশের ধরনের বনজঙ্গল। পথে সিংভূমের প্রকৃত রূপ দেখলুম, অর্থাৎ উচ্চাবচ ভূমি, পাথরের চাঁই, শাল ও কেঁদ গাছ, রাঙা মাঠ। তিনটের ট্রেনে মহুলিয়া থেকে বাদলবাবু, বিশ্বনাথ বসু প্রভৃতি অনেকে এল। অশ্বত্থ তলায় বসে চা খাওয়া গেল। বেলা পড়ে এসেচে। দুটো বাজে। সে সময় আমি একা গেলুম পাহাড়ী নদীর ধারে শালচারার জঙ্গলে—একা বসতে। সামনে পাহাড় শ্রেণী থৈ থৈ করচে, দূরে কালাঝোরের নীল সীমারেখা নীল আকাশের কোলে। ঐ দিকে আজ বাংলাদেশে আমাদের গ্রামের বাঁওড়ের ধারে আড়ং বসেচে, কত দোকানদারের কত বেচাকেনা, কত নতুন কাপড়-পরা ছেলেমেয়েদের ভিড়। পাথরের ওপর অপরাহ্নের ঘনায়মান ছায়ায় এক জায়গায় বসে চারিধারের মুক্ত প্রসারতা দেখে কেবলই বাংলা-জোড়া বিজয়া দশমীর উৎসব ও কত হাজার হাজার ছেলে-মেয়েদের হাসিমুখ মনে পড়ল। দু-দিনের বিজয়া দশমীর কথা আমার মনে আছে ছেলেবেলাকার।···যুগল কাকা সেদিন এসে রান্নাঘর ও বড় ঘরের মাঝখানে উঠোনেতে দাঁড়িয়ে বাবার সঙ্গে বিজয়ার আলিঙ্গন ও প্রণাম করলেন।···আর যেদিন গঙ্গা বোষ্টমকে আমরা আশুদের চণ্ডীমণ্ডপে ব্রাহ্মণ ভেবে ভুলে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করেছিলুম।

আজকার দিনে যেখানে যত লোককে ভালবাসি সকলের কথাই মনে পড়ল, তাদের মধ্যে কাছে কেউই নেই, অনেকে পৃথিবীতেই নেই, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্যে আমার এ প্রীতিনির্দেশ হয়তো বা ব্যর্থ যাবে না।

গালুডির হরিদাস ডাক্তারের সঙ্গে অনেককাল পরে আজ দেখা। সে গিয়েছিল ধলভূমগড়ের রাজবাড়িতে রোগী দেখতে, আমরা এখানে আছি শুনে বাদলবাবুদের সঙ্গে এখানে ট্রেন থেকে নেমেচে; তার সঙ্গে জ্যোৎস্নাফুল্ল সন্ধ্যায় পাহাড়ী নদীর ধারে তপ্ত শীলাখণ্ডের ওপর গিয়ে বসলুম। অমনি যেন অন্য এক জগতে এসে পড়েচি মনে হ'ল। দূরে নদীর কুলুকুলু জলস্রোত, ওপারের জ্যোৎস্নাশুভ্র পাহাড় শ্রেণী, খুব একটি আঁকাবাঁকা কি গাছ, আর এক প্রকারের বন্যফুলের মিষ্টি সুবাস—মাথার ওপরের নক্ষত্রবিরল আকাশ—সবগুলো মিলে আমায় এমন এক রাজ্যে নিয়ে গেল যে চুপ করে সেদিকে চেয়ে বসেই থাকি, হরিদাস ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলা আর আমার হয় না, কথা বলবার মত মনও নেই, কেমন যেন হয়ে গেলুম। দু-জনেই চুপচাপ, কতক্ষণ বসে থেকে রাত দশটার কাছাকাছি বাংলোতে ফিরি।

বৈকালে নীলঝরনা বেড়াতে গেলুম কিন্তু বেলা গিয়েছিল বলে বেশীক্ষণ নীলঝরনার উপত্যকায় বসে থাকা সম্ভব হ'ল না। পাহাড়ের ওপারে উৎরাই-এর পথে বনতুলসীর জঙ্গলে ঘন ছায়া নেমেচে, তার মধ্যে বড় বড় কেঁদ গাছ, সিদ্ধেশ্বর ডুংরির মাথায় অস্তমান সূর্য্যের আভা একটু। ঝরনা পেরিয়ে বরমু-ডেরার পথে খানিকটা গিয়ে একটা উঁচু জায়গায় পাথরের স্তূপ খুঁজচি, জনকয়েক লোক কুলামাতোর দিক থেকে আসচে, ওদের সঙ্গ নিলুম। ওরা বললে, তুই এখানে কি করচিস রে? বললাম পাথর কিনতে এসেচি।

৪নং shift-এর কাছে এসেচি তখনও জ্যোৎস্না ওঠে নি, মুদীর দোকানটা আজ বন্ধ, রাধাচূড়া গাছে যে ফুলের লতাটা সেদিন দেখেছিলুম, তাতে আজ আর ফুল নেই। এঞ্জি-নিয়ারের বাংলোতে লোক খাটচে কারণ ডেপুটি কন্‌জারভেটর অফ ফরেস্টস্ এখানে এক-

মাসের মধ্যে এসে বাস করবে। পট্টনায়েক যে বাংলো দেবে বলেছিল, সেটা দেখলাম। বড় বড় গাছের মধ্যে বাংলোটা, বারান্দায় বসে সিদ্ধেশ্বর ডুংরির দৃশ্য উপভোগ করা যায়। নিকটেই নীলঝরনা, জলের কষ্ট হবে না।

কবিরাজ নেই, ডাক্তারও নেই ওদের বাংলোতে। কবিরাজ গিয়েচে টাটানগর; ডাক্তার গিয়েছে মহুলিয়া, কাজেই বিজয়ার সম্ভাষণ এদের আর জানানো গেল না। ফিরবার পথে আমি গুররা নদীর ধারের পুলের ওপর বসে রইলুম অনেকক্ষণ। দূরে কালাঝোর জ্যোৎস্না রাত্রে অস্পষ্ট দেখাচ্চে। পাহাড়ী নদীর কুলকুলু শব্দ যেন সঙ্গীতের মধুর শোনাচ্চে। তামা পাহাড়ের মাথার ওপর দু-একটা তারা মনকে নিয়ে যায় অনেক দূরে, কতদূরে, পৃথিবী পার করিয়ে অসীম দ্যুতিলোকের মধ্যে।

একটু পরে পট্টনায়েক এল পুলের ওপরকার কাঠ ধরে। আমি বসে আছি দেখে বললে, চলুন আমার বাসায়। একটু বিজয়ার মিষ্টিমুখ করবেন।

আমি বললুম—হেঁটে ক্লান্ত আছি, আজ আর নয়।

তারপর সে অনেকক্ষণ বসে নানা গল্প করলে। রাত নটার সময় বাড়ি ফিরি।

পশুপতিবাবু আজ আসবেন কথা ছিল, এলেন না, সেজন্যে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। আমি আর নীরদবাবু বেরুলাম সন্ধ্যায় ঠিক সময়ে। যাওয়ার পথে অপরাহ্নের ঘন ছায়া নেমে এসেছে পাহাড়ের অধিত্যকায়, তার কোলে-কোলে এদিকে ওদিকে চারিদিকে সাদা সাদা বকের দল উড়চে। সমস্ত দিনের অবসাদ একমুহূর্তে কেটে গেলে যেন, সেদিকের অপরূপ সন্ধ্যার পানে চাইলুম। ওখান থেকে এসে নীলঝরনার দিকে চলি। তামা পাহাড়ের ওপর উঠলুম পিয়ালতলা দিয়ে। বড় বট গাছটাতে একরাশ জোনাকী জ্বলচে, ওধারে উঠেচে ত্রয়োদশীর চাঁদ, তামা পাহাড়ের বিরাট অধিত্যকার গায়ে পূব থেকে পশ্চিমে দীর্ঘ বড় বড় ছায়া পড়েচে। আমরা দু-ধারে পাহাড়ের গিরিপথটা পার হয়ে নামলুম ওপারের জ্যোৎস্নাশুভ্র উপত্যকায়। বনতুলসীর জঙ্গল আর তার মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে আছে শাল ও তমাল। চারিধারে রূপ যেন থৈ থৈ করচে। পাহাড়ের মাথায় এদিকে ওদিকে দু-চারটি নক্ষত্র। নীলঝরনার জল পার হয়ে বরমুডেরার পথে একজন পাহাড়ী লোকের সঙ্গে দেখা।

সে একা একটা লাঠি হাতে গান গাইতে গাইতে চলেচে কুলামাতোর দিকে। তাকে বললাম—অত জঙ্গলে এত রাত্রে একা যাবি, যদি বাঘের হাতে পড়িস্।

সে বললে—খেদিয়ে দিব বাবু।

অর্থাৎ সে লাঠি দিয়ে বাঘ তাড়িয়ে দেবে। আমরা আর একটু এগিয়ে যেতেই চারিধারের পাহাড়ী অধিত্যকার নির্জনতায় জ্যোৎস্না-ধৌত সৌন্দর্য্য যেন কেমন হয়ে গিয়েচি। একটা ভারি আশ্চর্য্য জিনিস দেখা গেল। দূরে ধঞ্জরী শৈলমালার গায়ে একটা নক্ষত্র জ্বলছিল, খানিকক্ষণ থেকে সেটা আমরা দেখচি। আর আমি মাঝে মাঝে দেখচি ডাইনের রুখাম পাহাড়ের দিকে, বাংলা দেশের আলো ছায়া ভরা কোজাগরী পূর্ণিমা রাত্রের কথা ভাবচি, এমন সময় নক্ষত্রটা যেন টুপ করে খসে গেল পাহাড়ের ঢালু থেকে। আর সেটা দেখা গেল না। আমরা দু-জনেই অবাক হয়ে রইলুম।

সবুজ ঝরনার কাছে এসে বসলুম, ওখানে একটি সুবৃহৎ শিমুল গাছের শাখা নত হয়ে আছে। ঝরনার জলের ওপর কুলকুলু ক্ষীণ শব্দ হচ্চে ঝরনার জলধারার, জ্যোৎস্না রাত্রে ঝরনার জল চিক্‌চিক্ করচে, বড় শিমুল গাছের মাথায় একরাশ জোনাকী জ্বলচে, সে এক অপরূপ ছবি। ছবিটা বহুদিন মনে থাকবে। তারপর রুখামের পাহাড়ের একেবারে মাথায় একটা বড় শিলাখণ্ডের ওপরে উঠে বসি। যেদিকে চাই, জ্যোৎস্নাবিধৌত বনরাজি-

শোভিত শৈলমালা, দূরে টাটার কারখানার রক্ত-আভা যেন বহুদূরের কোন অজানা আগ্নেয়গিরি অগ্নি-গহ্বরের রক্তশিখার আভা বলে মনে হচ্ছে। পিছন দিকের ঢালুটা সহজ বলে মনে হ'ল, সেখানেই নেমে জঙ্গলের মধ্যে পথ ঠিক করতে পারচি নে। নারীকণ্ঠে বললে কে, এদিক দিয়ে বাবু। চেয়ে দেখি নিচে একটা সাঁওতালদের ঘর। নেমে এলুম তাদের উঠোনে। দুটি মেয়ে ও একটি পুরুষ উঠোনে আগুন জেবলে সম্ভবতঃ আগুন পোয়াচ্চে।

আমরা তাদের জিজ্ঞেস করলুম—এই বনে পাহাড়ের নিচে আছিস্ কেমন করে, হাতী নামে না ?

তারা সবাই দেখলুম অদৃষ্টবাদী। বললে—বাবু, ভয় করে কি হবে ? যেদিন বাঘে নেবে সেদিন নেবেই।

রাখাম থেকে আমাদের বাংলো প্রায় দু-মাইল, এদিকে রাত হয়েচে, ন-টা বাজে। আর বেশীক্ষণ এ সব জায়গায় থাকা ভাল নয় বুঝে দু'জনে বেশ জোর পায়ে হেঁটে রাত পৌনে দশটায় পরিপূর্ণ ত্রয়োদশীর জ্যোৎস্নার মধ্য দিয়ে বাংলোতে পৌঁছে গেলাম।

আজকার রাতের জ্যোৎস্নাটি আমাকে ইসমাইলপুরের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে কেন এত ? Shuqul সাহেবের বাগানের মধ্যের গাছগুলো ঠিক যেন ইসমাইলপুর কাছারীর চারিপাশের সেই বনঝাউ গাছ। আহারাদির পরে বাংলোর সামনে বসে গল্প করচি, একটা প্রকাণ্ড উল্কা জ্বলতে জ্বলতে অত জ্যোৎস্নাভরা আকাশেও ঠিক যেন হাউই বাজির মত আগুনের রেখা সৃষ্টি করে আকাশের গায়ে মিলিয়ে গেল।

ভারি সুন্দর ভূমিশ্রী সিংভূমের, ভারি চমৎকার জ্যোৎস্না-রাত্রিটা আজ! অনেককাল এদের কথা মনে থাকবে।

রাখামাইনস্ থেকে এসেও যখন ব্যারাকপুরের এই গাছগুলোর গন্ধ, ছায়া ও শ্যামলতা আমাকে এত মুগ্ধ করেচে তখন আমাদের এ অঞ্চলের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আমার মত আরও দৃঢ় হয়ে গেল সন্দেহ নেই। সকালে একটু রোদ উঠলে যখন গাছপালায় ঝোপে, ছায়ায় ছায়ায় বেড়ান যায় তখন যে বনলতার কটুতিক্ত সৌরভ, বনফুলের সুবাস পাই, পাখীর যে কলকাকলী শুনি, কোথায় এর তুলনা ? পাহাড় শ্রেণী না থাকলে রাখামাইনস্ তো মরুভূমি। তবে পাহাড়ের ওপরকার বন সকালের ছায়ায় ভাল হয় কিন্তু কেন জানি না সেখানে এ ধরনের কোমলতা নেই, স্নিগ্ধ নয় রূক্ষ। শাল তমাল গাছের বৈচিত্র্য নেই, তারা মোহ সৃষ্টি করতে পারে না, তাদের বনে লতা নেই, প্রাকৃতিক কুঞ্জ সৃষ্টি করতে পারে এমন পুষ্পিত বৃক্ষ বা লতা নেই। এই সব জন্যেই তো প্রথম হেমন্তে দেশের বন এত ভাল লাগে। সুস্মিত জ্যোৎস্না রাতে কোথায় এমন পুষ্পিত তৃণপর্ণের মন মাতান সৌরভ!

কাল বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে কুঠির মাঠের বনশোভা দেখে আরও বেশী করে আমার থিওরীটার সত্যতা উপলব্ধি করলুম অর্থাৎ আমাদের এ অঞ্চলের গাছপালার বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য সিংভূম সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ার অরণ্যের শোভার অপেক্ষা অনেক বেশী। কত কি লতা, কত কি বিচিত্র বনফুল, কত ধরণের পত্রবিন্যাস—এত বৈচিত্র্য কোথায় ওসব দেশের অরণ্যে ? আমি রাখামাইনস্ থেকে বারো মাইল পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সবটাই হেঁটে মুসাবনি রোড পর্য্যন্ত গিয়েচি, সিংভূমের বিখ্যাত সারেণ্ডা ফরেস্ট দেখেচি, গবর্নমেণ্ট প্রোটেক্টেড্ ফরেস্টের মধ্যে গিয়েচি। সেখানে বন খুব ঘন ও বহুবিস্তৃত বটে কিন্তু বনশোভা নিম্নবঙ্গের বনের মত নয়। ও অঞ্চলের বড় বড় গাছের মধ্যে শাল, কেঁদ, আসান, পলাশ ও মাঝে মাঝে আমলকী ও বন্য শেফালি এই কটি প্রধান। বন্যলতা আমার চোখে অন্ততঃ পড়ে নি। কোন কোন স্থানে শিমুল বৃক্ষ আছে। সারবান কাঠ বাংলাদেশের বনে তত নেই যত ওদেশে

আছে কিন্তু আমার বলবার উদ্দেশ্য বাংলা দেশটাতে যদি আজ সারেন্ডা রিজার্ভ ফরেস্টের মত একটা অরণ্য গড়ে উঠত, তার বনবৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য এবং নিবিড়তা অনেক বেশী হ'ত—শ্রীনগরের ও ছঘরের পথের ধারের বন দেখে এ ধারণা আমার মনে আরও বদ্ধমূল হয়েছে। তবে বাংলার বনে পাহাড়ী নদী বা ঝরণা নেই, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ড নেই—তেমনি ও সব বনের পথে এত পাখী নেই, বিচিত্র বর্ণের বনপুষ্পের সুবাস নেই।

এ আমি স্বীকার করি যদি বাংলা দেশের বনভূমির পিছনে থাকত দূরবিস্তৃত নীল গিরিমালা, মাঝে মাঝে যদি কানে আসত পাহাড়ী ঝরনার কুলুকুলু শব্দ, শিলাসন আস্তৃত থাকত স্নিগ্ধ ছায়া ঝোপের নিচে, চরত ময়ূর, চরত হরিণ-নন্দন—উপলাকীর্ণ বন্য নদীর শিলাময় দুই তটে স্তবকে স্তবকে সুবাসভরা বনকুসুম ফুটে থাকত—গিরি-সানুদেশে থাকত ঘনসন্নিবিষ্ট বাঁশবন—তবে এ বন আরও সুন্দর হ'ত।

কল্পলোক ছাড়া সে বন কোথায়—যেখানে এত সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ সম্ভব? অন্ততঃ আমি তো দেখি নি।

যদি কোথাও এমন থাকে ভারতবর্ষের মধ্যে তবে আমার সন্দেহ হয় তা আছে বা থাকা সম্ভব গোদাবরী তীরের অরণ্যে, রাজমহেন্দ্রী থেকে গোদাবরীর উজান পথে গিয়ে উতকামন্দ ও কোদাই কানাল অঞ্চলে। মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুরের রিজার্ভ ফরেস্টে, হিমালয়ের নিম্ন অধিত্যকায়, আসামের বনে। যদিও এদেশের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে আমি যা কল্পনা করচি তা আছে কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ।

আজ মনে বড় আনন্দ ছিল। জগো আর গোপালকে সঙ্গে নিয়ে বন-ফুলের সুবাসভরা বনপথ দিয়ে বেলেডাঙার আইনদ্দি মণ্ডলের বাড়ি গেলাম। আইনদ্দি যত্ন করে বসালে—ও নিজে কত গ্রামে পরিচিত সে গল্প করলে। 'বহুরূপী সেজেচি বাপু, কাটামুণ্ডুর খেলা খেলেচি—নাগরদোলা ঘুরিয়েচি।'

আমি ওকে খুশি করবার জন্যে বললুম—চাচা তোমাকে অনেক দূরের লোকে জানে।

ও বড় খুশি হ'ল। বললে—শোন তবে আমায় কত গাঁয়ের লোকে জানে। এই কাটকোমুরা, ইছেপুর, মেটারি, শুলুকো হানিডাঙা···

ওর তালিকা আর শেষ হয় না।

বললে—তা লাঠিতে বা বন্দুকে মরব না, আমার গুরুর কৃপায়। আগুন খাব। শূন্যে উড়ে যাব। মুণ্ডু কেটে আবার জোড়া দেব।

আমি বিস্ময়ের সুর বললাম···বল কি চাচা?

হ্যাঁ, তোমাদের বাপ-মার আশীর্বাদে, গুণ কিছু ছেল শরীলে! ওই যেখানে চটকা-তলায় স্যায়ের ছেল, ওখানে এক সান্নিসি এসে আস্তানা বাঁধে আজ চল্লিশ বছর আগে। আমার তখন অনুরাগ বয়েস। তিনিই আমার ওস্তাদ।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েচে দেখে উঠলুম। জগো, গোপাল ও আমি ঘন বনের পথে আবার ফিরি। তখন কুঠীর মাঠের জঙ্গলে অন্ধকার বড্ড ঘন হয়েচে। ওরা বাঘের ভয়ে বনের মধ্যে কথাবার্ত্তা বলে না। আমি যত সাহস দিই, ওরা তত ভয় করে।

আমাদের ঘাটে যখন এসেচি, তখন নিস্তব্ধ নদীচরের ওপরকার আকাশে অগণ্য দ্যুতিলোক—বনশিমের ফুল ফোটা ঝোপটি ঘাটের ওপর নত হয়ে আছে, জোনাকী ঝাঁক জ্বলচে অন্ধকারের ফাঁকে ফাঁকে।

বাড়ি এসে দেখি সবাই বাড়ির চারিদিকে মাটির প্রদীপ জেলেচে, কারণ আজ দীপ দান করবার নিয়ম। কুদুদের বোধনতলায়, আমার লেখবার ঘরের সামনে, পুঁটিদিদের

রোয়াকে, খিড়কীর পথে, বাঁশবনে—সর্ব্বত্র প্রদীপ জ্বলচে।

ন-দি হেসে বললে—এই দ্যাখো, এবার তোমাদের কলকাতার হ্যারিসন রোড হয়ে গিয়েচে। না ?

ক-দিনই বড় আনন্দে কাটল। আজ দুপুরে একটা মালো এলো সাপ খেলাতে। আমতলায় চেয়ার পেতে আমরা সবাই বসে সাপ খেলানো দেখি। ন-দি, খুড়ীমা, ক্ষুদু, পাঁচী, জগো, গোপাল—সাপ খেলা দেখে সবাই খুব খুশি। এবার পুজোর ছুটিতে যত গান শুনেচি দুটো গান আমার মনে বড় ছাপ রেখে গিয়েচে, গানের সুরের জন্যে নয়, যে বিশেষ স্থানে ও বিশেষ অবস্থায় সেই গান দুটি গাওয়া হয়েছিল তার জন্যে। সেদিন পাহাড় পেরিয়ে এসে রুখামের মুদীর দোকানে একটা ছোকরা যে গাইছিল :—

হায় হায় শিশুকালে ছিলাম সুখে···

এ গানটার এই পর্য্যন্ত মনে আছে। আর একটা আজকার সাপুড়ের গানটা :—

সোনার বরণ লখাই আমার হয়ে গেল কালো
(ওগো) কি সাপে দংশেচে তারে তাই আমাকে বলো।

সাপুড়ে উচ্চারণ করলে—'ডুংশেচে'—তাই যেন আরো মিষ্টি লাগলো।

তার পরেই রোদ পড়ল। কুঠীর মাঠে বন ঝোপের ধারে কেলেকোঁড়ার লতায় ফুলের সুগন্ধে বৈকালের বাতাস ভারাক্রান্ত। তারই মধ্যে কতক্ষণ বসে রইলুম, বেড়ালুম। ছেলেমানুষের মত প্রকাণ্ড মাঠটার এদিকে ওদিকে ছুটোছুটি করে বেড়িয়ে আবার যেন বাল্যের আমোদ ফিরিয়ে পেলুম। ভাগ্যে ওদিকে কেউ লোকজন থাকে না তাহলে আমাকে হয়তো ভাবতো পাগল।

পল্লীপ্রান্তের বনশোভা ও বনপুষ্পের সুবাস আর এবারকার অপ্রতিহত পরিপূর্ণ তপ্ত সূর্য্যালোক—তার ওপর সব সময়ের জন্যে মাথার ওপরকার ঘন নীল আকাশ—আমাকে একেবারে মুগ্ধ করে দিয়েচে। দিনরাত এই মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে বাস করেও যেন আমার আশ মেটে না—রাত্রির নক্ষত্ররাজি কি জ্বলজ্বলে, কত রকমের, দিক্‌বিদিকে কতদূরে ছড়ানো।

বেজায় শীত পড়লো শেষ রাত্রে। অকালে নদীর ঘাট থেকে ফিরচি, আমাদের ঘাটের পথে গাবতলায় সাত-আটখানা বড় বড় মাকড়সার জাল পাতা। রোদ পড়ে বিচিত্র ইন্দ্রধনুর রং-এর সৃষ্টি করেচে। আমগাছের এডালে ওডালে টানা বেঁধে উঁচুতে নিচুতে কেমন জাল বুনেচে। প্রত্যেক জালেতে গোটাকতক মশা মরে রয়েচে। একটা মাকড়সা জাল গুটিয়ে একটা মাত্র টানা সুতোতে পর্য্যবসিত করলে—সেই সুতোটা বেয়ে ছোট্ট মাকড়সাটা গাবগাছের ডালে উঠে গেল। বনে বনে এই সব দেখে বেড়ালেও কত শিক্ষা হয়। আমাদের দেশে কত ফুল, ফল, দামী ঝোপঝাপ, কীট পতঙ্গ। এদের জীবনের ইতিহাস আলোচনা করলে যে আনন্দ পাওয়া যায়—একরাশ প্রাণী-বিজ্ঞানের বই ঘাঁটলেও তা হয় না।

"We live too much in books and not enough in nature, and we are very like that simpleton of a Pliner the younger who went on studying a Greek author while before his very eyes Vesuvius was overwhelming fine cities beneath the ashes."

তারপর কতক্ষণ দুপুরে মানুষের বাড়ি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার নিমন্ত্রণে গিয়ে ওদের সঙ্গে বসে গল্প করলুম। কে বলেছিল 'অন্ধ নাচার বাবা' ক্ষুদু খুব উৎসাহের সঙ্গে সে গল্প করলে। আমি বনপথ দিয়ে তালঘাট গেলাম। সেখানে নিরাপদদের বাড়ি চা খেয়ে কতক্ষণ গল্প করি। নিরাপদ এক অদ্ভুত লোক। সে বলে নাকি ভুত দেখে। মাঠে-ঘাটে সর্ব্বদাই

ভূত বেড়াচ্চে সরু সুতোর মত।

আমি বললুম—বলেন কি?

—হঁ্যা, বিভূতিবাবু। ওরা আবার তারা ধরে নামে। আমি সকালে উঠে দেখেচি বনের সব তারা পড়ে আছে। সূর্য্য ওঠবার আগে তারার ঝাঁক আপনিই আকাশে উঠে যায়। কেবল যেগুলো শিশিরে খুব ভিজে যায়, সেগুলো ঝোপের তলায় খুব ভোরে পড়ে থাকে। ভিজে ভারি হয়ে যায় কিনা, তাই আর উঠতে পারে না।

আমি খুব অবাক-মত মুখখানা করে নিরাপদর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

ও নাকি সূর্য্যালোক থেকে তাপ সংগ্রহ করে দেশের কাজ করবে, সেজন্যে সূর্য্যকে জয় করচে। রোজ মাঠে বসে সূর্য্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

ঘন অন্ধকার। বড় বড় গাছের মাথায় অগণ্য নক্ষত্রদল জ্বলজ্বল করচে—কি অসীম দ্যুতিলোক পৃথিবীর চারিধার ঘিরে। টর্চ্চের ব্যাটারি ফুরিয়ে এসেচে বলে একরকম অন্ধকারেই চলে আসতে হোল। নিরাপদ সঙ্গে খানিকদূর এল গল্প করতে করতে—রাস্তার ধারে সাঁকোর ওপর দু-জনে কতক্ষণ বসলুম। আমি গল্প করি আর মাথার ওপর চেয়ে চেয়ে নক্ষত্র দেখি, একবার চারিধারের অন্ধকার বনানী দেখি।

আজ বিকেলে কুঠীর মাঠে গিয়ে একটা চমৎকার সূর্য্যাস্ত লক্ষ্য করলুম। আর সেই বন ঝোপের সুগন্ধ। এ গন্ধটা আমায় বড় মুগ্ধ করে রেখেচে। এদের ছেড়ে কলকাতা চলে যাবার দিন নিকটবর্ত্তী হয়েচে মনে ভাবলেই মনটা খারাপ না হয়ে পারে না, কিন্তু এখানে নানা কারণে কাজ করা সম্ভব হয়ে উঠচে না—প্রথম কথা, সঙ্গে বই নেই—আমার নোটবই-গুলো নেই। এমন কি লেখবার উপযুক্ত খাতা বা কাগজপত্র পর্য্যন্ত বেশী আনি নি। বই ভিন্ন আমি থাকতে পারি নে। বই উপযুক্ত সংখ্যায় না আনা একটা বড় ভুল হয়ে গিয়েচে এ ছুটিতে। এমন ভুল আর কখনো হবে না। দুটো ছোট গল্প লিখেচি—এবারকার পূজোতে তার বেশী কিছু হ'ল না।

আমাদের পাড়ার সবাই কাল সকালে সাত-ভেয়ে কালীতলায় যাবে। অভিলাষের নৌকো ব'লে ওই পথে অমনি সইমাদের রান্নাঘরে গিয়ে বসলুম। কতকাল পরে যে ওদের রান্নাঘরে গেলাম! নলিনীদিদি যত্ন করে বসালে—চা আর খাবার দিলে, তারপর কতকালের এ গল্প ও গল্প, কত ছেলেবেলার কথা, নলিনীদিদির বিয়ের সময়কার ঘটনা। ওর স্বামী উত্তর আফ্রিকায় ছিলেন সে সব গল্প। সোনার মেয়ে হয়েচে, কি সুন্দর টুকটুকে মেয়েটি, কি চমৎকার মুখখানি, বছর দুই বয়েস হবে। আমায় দেখে কেমন ভয় পেলে, কিছুতেই আমার কোলে আসতে চাইলে না।

টেঁপি দিদিকে দেখলুম আজ সকালে বছর পনেরো পরে। একেবারে বুড়ী হয়ে গিয়েচে। সেই ফর্সা রঙ, সুন্দর চোখমুখের আর কিছু নেই। মানুষের চেহারা এত বদলেও যায় কালে! যা হোক, ষোল বছর পরে যে ওরা আবার দেশে এসেচে এই একটা বড় আনন্দের বিষয়।

আমাদের গ্রামের প্রকৃতি অদ্ভুত, কিন্তু মানুষগুলো বড় খারাপ। পরস্পর ঝগড়াদ্বন্দ্ব, ঈর্ষা, পারিবারিক কলহ, জ্ঞাতিবিরোধ, সন্দেহ, কুসংস্কার এতে একেবারে ডুবে আছে। লেখাপড়া বা সৎচর্চ্চার বালাই নেই কারো। Æschylus-এর কথায়:

"They live like silly ants
In hollow caves unsunned;
To them comes no sun, no moon,

No Stars, no music, no spring
Flower-perfume…"

আজ সকালে আমরা নৌকোয় সাত-ভেয়ে কালীতলায় গেলাম। পথে চালতেপোতার বাঁকে কত রকমের ফুল যে ফুটেচে—সেই আর বছরের কুচো কুচো হলদে ফুলগুলি, নীল ঘাসের একরকম ফুল, কলমীর ফুল—সকলের চেয়ে বেশী ফুটেচে তিতপল্লার ফুল, যে ঝোপের মাথা দেখি—সর্বত্র আলো করে রয়েচে ওই ফুলে। বেলা একটার সময় কালীতলায় গিয়ে পেঁছিনো গেল। তারপর আমরা গেলুম রেলের পুলে বেড়াতে। বটতলায় রান্না করে খাওয়া হোল। ক্ষুদু ছুটে গেল আমাদের সঙ্গে রেলের রাস্তায়। আমরা পুরোনো বনগাঁয়ের দিকে যাচ্চি—রামপদ সাইকেল নিয়ে এসে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে গেল। খাবার পরে আবার একটু রেল লাইনে বেড়িয়ে সন্ধ্যার সময় নৌকোয় উঠে নৌকো ছাড়ি। পথে কত কি গল্প করতে করতে চমৎকার জ্যোৎস্না রাত্রির মায়া যেন আমাদের পেয়ে বসল। তখন চালতেপোতার বাঁকে এসেচি, তখন নিস্তব্ধ নির্জ্জন সুগন্ধ বনের চরে কাটা চাঁদের শিশির-পাণ্ডুর জ্যোৎস্না ও নক্ষত্রলোকের শোভা যেন সমস্ত নদী ও বনকে মায়াময় করেচে মনে হোল। চাঁদ-ডোবা অন্ধকারের মধ্যে আমাদের ঘাটে এসে নৌকা লাগল।

তবুও মনে হয় এ সব জায়গায় বারো মাস আসা আমাদের মত লোকের চলে না। কারণ জীবন নদীর স্রোতধারা এখানে মন্দ গতিতে প্রবহমান—সক্রিয়, উন্নতিশীল, বেগমান জীবন এখানে অজ্ঞাত। বন্ধ জলে পানা-শেওলা জমে, জলকে শীঘ্র দূষিত করে ফেলে। যে চায় জীবনকে পরিপূর্ণ ভাবে ভোগ করতে, যাকে তার উপযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তি ও ক্ষমতা দিয়ে ভগবান সৃষ্টি করেচে, যাকে dull, bore এবং stupid করে সৃষ্টি করেন নি, যার জীবনের পুঁজি অনেক বেশী, তার জন্যে এসব জায়গা নয়। কিছুকাল এসে বেশ কাটানো যায় বা আসাও উচিত। কিন্তু চিরদিন এখানে যে কাটাবে তাকে তাহলে নিজের স্বার্থ সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়ে সেবাব্রতে দীক্ষিত হতে হবে, যে বলবে, আমার নিজের কিছু চাই নে, দেশের ছেলেদের জন্যে স্কুল খুলব, তাদের পড়াব, দরিদ্রদের দুঃখ মোচন করব, ম্যালেরিয়া তাড়াব ইত্যাদি—সে রকম মানুষ হাসিমুখে সমস্ত অসুবিধা ও অন্ধকারকে বরণ করে নিয়ে এখানে এসে চিরকাল বাস করতে পারে।

আজ শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে একবার বাইরে এলুম, মনে হোল খুব মৃদু জ্যোৎস্নালোক ঘরের দাওয়ায়—চাঁদ তো অনেকক্ষণ অস্ত গিয়েচে তবে এখন কিসের জ্যোৎস্না? ক্ষীণ হলেও এটা জ্যোৎস্নালোক সে বিষয়ে কোন ভুল নেই, কারণ খুঁটির ছায়া পড়েচে, বেড়ার কঞ্চির ছায়া পড়েচে, আমার নিজের ছায়া পড়েচে।* দূরে আকাশে এক সময় হঠাৎ নজর পড়ল—দেখি শূন্যে তারা উঠেচে। শুক্র-জ্যোৎস্না এত স্পষ্ট কখনও দেখি নি জীবনে—সত্যি কথা বলতে কি স্পষ্টই কি বা অস্পষ্টই কি—শুক্র-জ্যোৎস্নাই দেখি নি কখানো। এমন অবাক হয়ে গেলুম, এত কথা মনে আসতে লাগল যে ঘুম আর হোল না। আমার মন পৃথিবীর গণ্ডি ছাড়িয়ে বহুদূর ব্যোমপথে গেল উড়ে—আমি যে গ্রহলোকের জীব, আমার বাসস্থান যে বিশাল শূন্যের মধ্যে, অন্য আরও গ্রহ ও অগণ্য তারাদলের মধ্যে কত কোটি সূর্য্য সেখানে দীপ্যমান, কত নীহারিকা পুঞ্জ, কত দৃশ্য অদৃশ্য শক্তি, বিদ্যুৎ, কসমিক রে,—এদের সঙ্গে আমার আত্মা যেন এক হয়ে গেল। আমার অর্থলিপ্সু বৈষয়িক আত্মা মুক্তিলাভ করলে অল্প কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে, ওই শুক্র তারার আলোর পথ বেয়ে উড়ে চলে গেল অসীম দ্যুতিলোকের মধ্যে।

কাল এখান থেকে চলে যাব। তাই যেন সব কিছুর ওপর মায়া হচ্চে। ছায়াঘন

অপরাহ্ণে আমাদের পোড়ো ভিটের পেছনকার বাঁশবনে বেড়াতে গিয়ে এক জায়গায় খানিকটা চুপ করে বসে রইলুম। রাঙা রোদ পড়েচে ওদিকের একটা বাঁশঝাড়ের গায়ে। সেই রাঙা রোদ মাখানো বাঁশঝাড়ের দিকে চেয়ে সমস্ত জীবনের গভীর রহস্যের অনুভূতি যেন মনে এসে জমল। কতকাল আগে এমন কার্ত্তিক মাসের দিনে মামার বাড়ি থেকে বাবার সঙ্গে এসে প্রথম এ গাঁয়ে উঠেছিলুম আমার বাল্যকালে। চুপ করে ভাবলে সে দিনের হেমন্তদিনের কটুতিক্ত বনলতা-ফুলের গন্ধভরা দিনগুলির স্মৃতি আজও আমার মনে আসে—কেমন একটা মধুর, উদাস ভাব নিয়ে আসে ওরা। তারপর কত পথ চলেচি, কখনও কণ্টকাকীর্ণ আরণ্যপথ বেয়ে, কখনও রৌদ্রদগ্ধ মরুবালুর বুক চিরে, কখনও কোকিল-কুজিত পুষ্পসুরভিত কুঞ্জবনের মধ্যে দিয়ে, চলেচি···চলেচি···কত সঙ্গী-সাথীর হাসি-অশ্রুভরা নিবেদন আমার মনের মধ্যে সঞ্চিত হোল, কাউকে পেলাম চিরজীবনের মত, কাউকে হারালুম দু-দিনেই, কিন্তু অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য্যই দেখলুম জীবনের সব চেয়ে বড় ঐশ্বর্য্য। সুখ দুঃখ দু-দিনের —তাদের স্মৃতি চিরদিনের, তারাই থাকে। তারাই গভীরতার ও সার্থকতার পাথেয় আনে জীবনে। আজ এই শুকনো বাঁশের খোলা বিছানো, পাখী-ডাকা, রাঙা রোদমাখানো বাঁশ-বনের ছায়ায় বসে সেই কথাই মনে হোল। সেই বাঁশের শুকনো খোলা! মামার বাড়ি থেকে প্রথম যেদিন এ গ্রামে আসি তখন দুপুরে আমাদের বাড়ির দরজার সামনে ধুলোর ওপর যে বাঁশের খোলা নিয়ে রাজলক্ষ্মী ও পটেশ্বরীকে খেলা করতে দেখেছিলুম ত্রিশ বছর আগে। আজ কোথায় তারা ?

ইছামতীর ওপর দিয়ে নৌকো বেয়ে চলেচি। বেলা গিয়েচে। দু-ধারের অপূর্ব্ব বনঝোপে রাঙা রোদ পড়েচে। কত কি ফুলের সুগন্ধ। কিন্তু চালতেপোতার ডান ধারে যে সাঁই ব্যবলার নিভৃত পাখী-ডাকা বন ছিল, মনি গাঁয়ের নতুন কাপালীরা এসে সব নষ্ট করে কেটে পুড়িয়ে ফেলে পটল করেচে। আমার যে কি কষ্ট হোল! পুত্রশোকের মত কষ্ট। কত তিৎপল্লার ফুল ফুটে থাকত, বন কলমীর বেগুনী ফুল ফুটে থাকত—আর বছরও দেখেচি। কত কাঁচ কাঁচ জলজ ঘাসের বন, তার মাথায় নীল ফুল—এবার ডান ধার এরা সাফ্ করে ফেলেচে। আমার নৌকোর মাঝি সীতানাথ বলচে—'দা-ঠাকুর, বড্ড পটল হবে, চারখানা পটলে একখানা গেরস্তের তরকারি হবে। আমার জ্ঞানে কখনও এখানে কেউ আবাদ করে নি।' কুলঝুটির ফুল আর বন শিমের ফুল এবার অজস্র। এই দস্যি কাপালীরা, এই Destroyers of Beauty, কোথা থেকে এসে যে জুটল, ইছামতীর পাড়ের রূপ এরা কি নিষ্ঠুর ভাবে নষ্ট করে ফেলচে।

রোদ একেবারে সিঁদুরে হয়ে বাঁশঝাড়ের মাথায় উঠেচে। অপরাহ্ণের বাতাস নানা অজ্ঞাত বনফুলের মিষ্ট গন্ধে ভারাক্রান্ত। নদীপথে বিকেলে ভ্রমণের মত আনন্দ আর কিসে আছে? কি গভীর শান্তি, কি বন-শোভা, কি অস্ত আকাশের মায়া!

ছুটীর দিন। কলকাতা ভাল লাগচে না। এই ক-দিনেই কলকাতা যেন বিস্বাদ হয়ে গিয়েচে। আজ বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে থ্যাকারের দোকানে গিয়ে একখানা বই পড়ছিলুম কার্জ্জন পার্কের সামনের জানলায় দাঁড়িয়ে। সেখানে থেকে মাঠে একটা জায়গায় অনেকক্ষণ বসে রইলুম। একটা বেঞ্চে বসে আছি, দেখি ডাঃ পি. সি. রায় সামনে দিয়ে যাচ্চেন। দু-জনে গল্প করতে করতে বেড়ালুম অনেকদূর পর্য্যন্ত। উনি বেশীর ভাগ বললেন 'প্রবাসী'র কথা। যোগেশ বাগল 'প্রবাসী' ছেড়ে গিয়েচে সেজন্যে দুঃখ করলেন। গিরিশবাবুও দেখি বিছানা পেতে লর্ড রবার্টসের প্রতিমূর্ত্তির পাদপীঠে বসে আছেন। আমরাও গিয়ে জুটলাম। আজ রাত্রে মাদ্রাজ মেলে ডাঃ রায় বাঙ্গালোর যাবেন, সে কথা হচ্ছিল। তাঁর গাড়িতে ফিরে এলাম। Nineteenth Century Review থেকে ক'টা ভালো ভালো

কবিতা তুলেচি :—

Beyond the East the Sunrise, beyond the West the sea,
And East and West wander-thirst that will not let me be.
And come I may, but go I must, if men ask you why.
You may put the blame on the stars and the sun, on tha white
cloud and the sky.

'To scorn all strife and to view all life
With the curious eves of a child.'

'To travel hopefully is better than to arrive.'

'To love Nature for the sake of what it brings forth, for its beauty, for its harmony will help you a little nearer to perfection.'

'To feel love for humanity in the sweetness of spiritual communion. in the joy of helping one another, in the happiness of playing a part together in the everlasting work of the farm of worlds 'aud universe, will bring you all the nearer to the goal of evolution.'

আজ আশুতোষ হলে জাপানী কবি ইয়োনে নোগুচির বক্তৃতা শুনতে গেলুম। চিত্রকর হিরোসিকের কতকগুলি ছবি, প্রধানতঃ ল্যাণ্ডস্কেপ, বড় ভাল লাগল—বিশেষতঃ অর্ধচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, নানারকমের চাঁদের রূপ। প্রধানতঃ পল্লীদৃশ্য, ঝরনা, বাঁশঝাড়, গ্রাম্য নদী ইত্যাদি। হকুসাই ও হিরোসিকে এ দু-জনের শক্তিই এ বিষয়ে খুব অসাধারণ বলে মনে হয়েছে আমার। নোগুচির বক্তৃতাও বেশ সুন্দর—সকলের চেয়ে আমার ভাল লাগল ঐ কথাটা—'In the twilight when the vision awakes'; আমি ত আমার জীবনে কতবার এটা দেখেচি বলেই আমার কথাটা বড় মনে ধরেচে। নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলে অনেক ভালো কথাই যে বোঝা যায় না, আমাদের দেশের অনেক Self-styled সমালোচক সেই সব বোঝেন না। সেদিন বাঁশবাগানের রাঙা রোদ পড়ে যে দৃশ্যটার সৃষ্টি করেছিল, আজ পনেরো-ষোল দিন হয়ে গেল এখনও এই নোগুচির বক্তৃতা শুনতে শুনতে সেই কথাটা মনে হোল। সে আনন্দ মনের গোপন মন্দিরে এখনও সেই রকম সতেজ ও নবীন আছে। ওই দৃশ্যটা মনে এলেই আনন্দটাও আসে সঙ্গে সঙ্গে। প্রকৃতিকে দেখবার চোখ না খুললে মানুষের জীবনে সত্যিকার আনন্দ নেই, একথা কতবার বলেচি আমার নানা লেখার মধ্যে—কিন্তু আমাদের দেশের লোকে সব এক জোটে চোখ বন্ধ করে আছে। চোখ খোলায় সাধ্য কার? স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও হার মেনে গিয়েচেন। অনুর্বর মরু বালুতে বীজ বপন করে ফল পাওয়ার আশা তো আকাশ কুসুম হতে বাধ্য।

আজ রবিবার দিনটা দমদমার ওপারে একটা বাজে বাগান বাড়িতে গিয়ে নষ্ট হোল। আমার এ ধরনের Outing মোটে পছন্দ হয় না—কি করি, দলে পড়ে যেতে হোল—বিশেষ করে মহিলাদের কথা ঠেলতে পারা যায় না। কিন্তু একটা কপির ক্ষেতের সামনে বসে সতরঞ্চি বিছিয়ে রবীন্দ্রনাথের গান শুনে সদলবলে চা খাওয়ায় যে কি আনন্দ আছে, আমি তা বুঝলুম না। আর কি মশা! কলকাতার উপকণ্ঠে এই শীতকালে যেমন ভয়ঙ্কর মশার উপদ্রব, পাড়াগাঁয়ে বর্ষাকালেও এর সিকি নেই। অথচ শহরের লোকে বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করে শহরের উপকণ্ঠে—এই ধরনের সাজানো-গোছানো বাগান বাড়ি করে—মাঝে মাঝে সেখানে বন্ধুবান্ধব নিয়ে হল্লা করে। এই সব insipid ধরনের Outing-এর সংসর্গ

আমায় ছাড়তে হবে এবার।

সার অলিভার লজের পত্রাবলীর মধ্যে সেদিন পড়লুম এই বিশাল বিশ্বের আকৃতি, গঠন প্রসারতা (Structure and extent of the Universe) তাঁকে চিরকাল মুগ্ধ করে এসেছে —তাই এক জায়গায় তিনি বলেচেন দেখলুম—'Universe is the body of God—this is one of His modes of manifestations,' তাঁর রচিত বিশ্বের আকাশ, নক্ষত্র, গাছপালা, কীটপতঙ্গ, মানুষ, জীবজন্তু—সব মিলেই তিনি। তিনি এই ভাবে পদার্থের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করচেন। তাই উপনিষদ বলেচে—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। একই আছে, দ্বিতীয় আর কিছু নেই।

ঈশোপনিষদের—'ঈশাবাস্য মিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।'

আজ সন্ধ্যায় দমদমার বাগান বাড়ি থেকে ফিরে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে নক্ষত্র জগতের পানে চেয়ে চেয়ে ঐ সব কথাই মনে হচ্ছিল। সেদিনকার সেই গানটা—'The home I was born.' আমার কানে এখনও যেন বাজচে—তা থেকেই কথাটা মনে এল। এ রকম যে কতবার হয়েচে। একটা অনুভূতি পেলে মন শীঘ্র চলে যায় আর এক শ্রেণীর অনুভূতিতে।

শুক্রবারে বিকেলে বনগাঁয়ে গেলাম। সেখানে নেমে বাসায় গিয়েই খয়রামারির মাঠে বেড়াতে গেলুম তখন চাঁদ উঠেচে—মাটির সোঁদা সোঁদা সুগন্ধ ভুর ভুর করচে বাগানে। কেলেকোঁড়ার ফুল এখনও আছে বটে, সুগন্ধ নেই।

দু-দিন বনগাঁয়ে থেকে আজ বিকেলের ট্রেনে এলুম কলকাতায়—জাপানী কবি নোগুচিকে P. E. N.-এর পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা করা হচ্ছে। প্রথমেই হোটেলের হলে ঢুকে দেখি তখনও সবাই আসে নি, কেবল মণীন্দ্র বসু ও দু-পাঁচজন এখানে ওখানে আছে। কিরণশঙ্কর রায়ের সঙ্গে গালুডি ও ঘাটশিলা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলচি, এমন সময়ে পবিত্র এসে বললে, তোমাকে ডাকচে, নলিনী পণ্ডিত তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। তাকে কে একজন তোমার সম্পর্কে পত্র লিখেচে সেজন্যে।

বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলচি, মণীন্দ্র এসে টেনে নিয়ে গেল। তারপর সবাই টেবিলে যে যার বসে গেল। সুরমা বসু ও ক্ষীরোদের স্ত্রী, আমি এবং নির্ম্মল বসু এক টেবিলে। চা পরিবেশন হওয়ার পরে স্যাণ্ডউইচ চলেচে সেই সময় নোগুচি এলেন। কালিদাস নাগ নিয়ে এলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী কবি-সম্মেলন থেকে। রামানন্দবাবু উঠে তাঁর ষষ্টিতম জন্মতিথি উপলক্ষে অভিনন্দন জানালেন। নরেন দেব আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন চারু রায়ের স্ত্রীর সঙ্গে পরিচিত করতে। চারু রায় কেন যে সাহেবী পোশাক পরে এসেচেন, এ আমি বুঝতে অক্ষম, যেখানে নোগুচি নিজে এসেচেন জাপানী পোশাকে। তারপর নোগুচি নিজের জাপানী কবিতা পাঠ করলেন এবং তারপর ইংরেজী অনুবাদ পড়লেন। কালিদাস নাগ আন্তর্জাতিক P. E. N.-এর সভাপতি H. G. Wells-এর একখানা চিঠি পড়লেন। আমাদের বঙ্গীয় P. E. N.-এর প্রতি শুভেচ্ছাজ্ঞাপক পত্র। জাপানী কনসাল জেনারেল কিছু বললেন, কিন্তু তা কেউ বুঝতে পারলে না। যখন এ পর্যন্ত হয়েচে—তখন চপলা দেবীর ভাই ফণী চক্রবর্ত্তী এসে আমাদের টেবিলে বসল। সুরমা বসু তাকে চা করে দিলেন। ফণীর সঙ্গে মণীন্দ্র বসু আমার আলাপ করিয়ে দিতে যাচ্ছিল—ফণী হেসে বললে অনেক কালের আলাপ আছে, আলাপ করিয়ে দিতে হবে না। তারপর জাপানী সাহিত্য সম্বন্ধে সে কিছু কিছু নিজের মত জানালে, বিশেষতঃ নোগুচির কবিতা সম্বন্ধে। আমি, নির্ম্মলবাবু ও ফণী তিনজনেই তখন মজে গিয়েচি। সুরমা বসুকে ইউরোপীয় সঙ্গীত বিষয়ে জিজ্ঞেস করলুম। কারণ তিনি মিউনিকে বেহালা শিখতে গিয়েছিলেন এবং জার্ম্মান ক্লাসিকাল

মিউজিক সম্বন্ধে কিছু কিছু জানেন। ক্ষীরোদের স্ত্রীও বেশ মেয়ে।

নোগুচি জাপানী কবিতা পড়লেন, রামানন্দবাবু সামান্য কিছু বক্তৃতা করলেন—তারপর আমরা যাঁরা গুপ্তের দলে বসে কিছুক্ষণ গল্প করে নীরদবাবু ও সোমনাথবাবুর সঙ্গে মোটরে ময়রা স্ট্রীটে এলুম। ও'রা একটু পরে গেলেন Regal-এ A mid summer Night's Dream দেখতে। আমি বাড়ি চলে এলুম।

আজ সুধীরবাবুদের বইয়ের দোকান থেকে বার হয়ে গোলদীঘিতে গিয়ে যখন বসেচি, তখন রাত সাতটা। ধোঁয়া এত বেশী যে আকাশে সপ্তমীর চাঁদকে ঢেকে ফেলেচে। ট্রামের আলো, বাড়ির আলো, রাস্তার আলো, ধোঁয়ার জালের মধ্যে মিটমিট করচে। মনে পড়ল ১৯১৪ সালের এমন দিনের কথা। আজ একুশ বছর আগেকার ব্যাপার। আমি তখন ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র, সবে কলকাতায় এসেচি—এই রকম ধোঁয়া দেখে মন তখন দমে যেত। নতুন এসেচি গাছপালা ও ইছামতী নদীর সংসর্গ ছেড়ে। তারপর কতদিন কেটে গেল—কত বিপদ, আনন্দ, দুঃখ ও আশার মধ্য দিয়ে। তখন আমরা সবাই তরুণ। The world was very young then—মামাদের তখনও বিয়ে হয় নি। এই বৈশাখে ছোটমামার বিয়ে হোল। এখন মন পরিণত হয়েচে—কত ভুল শুধরে নিতে পেরেচি, অপরের মত সহ্য করবার ক্ষমতা অভ্যাস করেচি—আমার মনে হয় জীবনে এই জিনিসটাই সব চেয়ে বড়। Intolerence-এর চেয়ে বড় শত্রু জীবনে আর কিছু নেই। ইউনিভার্সিটির আলোগুলোর দিকে চেয়ে সেই সব দিনের কথাই মনে পড়ছিল, সঙ্গে সঙ্গে আনন্দও পেলুম খুব। জীবনের একটা গভীরতার দিক আছে, সেটা সব সময় আমাদের চোখে পড়ে না—এই রকম নির্জ্জনে বসে না ভাবলে।

কাল মতিলাল ও আমি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে কার্জ্জন পার্কে অনেকক্ষণ বেড়ালুম ও গল্প করলুম, মতিলাল আমার ক্লাসফ্রেন্ড, ও কলেজ থেকে বার হয়ে কিন্তু বিবাহ বা চাকরি করলে না, পৈতৃক কিছু টাকা আশ্রয় করে আজ ষোলো বছর ধরে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে পড়চে—জানবার জন্যে যে, মানুষের আত্মা সত্যিই অমর কি না।

ও বললে, মা মারা যাওয়ার পরে এ প্রশ্ন আমার মনে জাগে—তারপর ঢুকলুম ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে, নিজেও অনেক বই কিনেচি।

বললুম—কি সিদ্ধান্তে উপনীত হলে ?

ও বললে—মানুষের আত্মা অমর। আমার আর কোনো সন্দেহ নেই।

—তা তো হোল, কিন্তু জীবনটাকে দ্যাখো এইবার। পড়াশুনো করেই জীবন কাটালে, এবার সংসার কর। জীবনের অভিজ্ঞতা কোথায় তোমার ?

মতিলাল বললে—এবার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ছাড়বো। একখানা বই লিখচি এ বিষয়ে। সেখানা শেষ হতে আর বেশী দেরি নেই। এবার ছাড়বো।

তারপর ওখান থেকে ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে গিয়ে দেখি শেরিফ বড়লাটকে যে গার্ডেন-পার্টি দিচ্ছে সেই উপলক্ষে বাগানে চমৎকার আলো দিয়ে সাজিয়েচে—গাছপালার ফাঁকে পূর্ণচন্দ্র উঠচে যখন ঝিলের ধারে ফুটন্ত ফুলগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। ওখান থেকে গিয়ে মাঠের মধ্যে ক্লাবের সাদা বেঞ্চির ওপর বসলুম—সামনেই পূর্ণিমার চাঁদ। স্থানটা নির্জ্জন—কেবল আধজ্যোৎস্না অন্ধকারের মধ্যে একজন অশ্বারোহী পুলিস এল, গেল। আধঘণ্টা পরে লর্ড রবার্টস-এর প্রতিমূর্ত্তির পাদপীঠে গিয়ে দেখি শুধু গিরিশ বোসে এসে শুয়ে আছেন, ডাঃ রায়ের চাদর পাতা, কিন্তু তিনি বালিগঞ্জে গিয়েচেন এখনও আসেন নি।

তাঁর আসতে একটু দেরিই হোল। সোয়েন হেডিনের তাকলা-মাকান মরুভূমি পার হওয়ার গল্প করলুম—ও'রা খুব মন দিয়ে শুনলেন।

সকালে বীরেশ্বরবাবু এলেন। তারপর বালিগঞ্জে অন্নদা দত্তের বাসায় গেলাম, দুপুরে নিমন্ত্রণ ছিল। অন্নদাবাবুর শরীর খুব খারাপ—পূর্ব্বে দেশের জন্যে খুব করেচেন—এখন কেউ মানে না, পোঁছে না—অথচ চট্টগ্রাম মেডিকেল স্কুলের জন্যে উনি কি ভয়ানক পরিশ্রমই না করেচেন। আমি সব জানি। ১৯২২-২৩ সালের কাউন্সিলে উনি চট্টগ্রামের প্রথম M. L. C. ছিলেন। আমি ও'র কাগজপত্র আমাদের League Office থেকে টাইপ করে এনে দিতুম। অন্নদাবাবুর মেয়ে মণির সঙ্গে পনেরো বছর পরে দেখা। ওর ভাল নাম যে মণিকুন্তলা তা আমি আজ এতকাল পরে ওর মুখে শুনলুম। মণি তখন ছোট মেয়ে ছিল, —আমি যখন ১৯২২ সালে অন্নদাবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলুম চট্টগ্রামে। আমার মুখে গল্প শুনতে ও ভালবাসত। মণি যে বৃত্তি পেয়ে ম্যাট্রিক ও আই-এ পাস করেছিল—সে সব খবর আমি আজই প্রথম জানলুম। ওর ছোট একটি মেয়েকে কোলে নিয়ে বসে রইলুম—বেশ চার মাসের ছোট খুকীটি। পৃথিবী অদ্ভুত, জীবন অদ্ভুত। কে ভেবেছিল যে আজ এত বছর পরে মণির সঙ্গে বালিগঞ্জে এভাবে আবার দেখাশোনা হবে! মণির মুখে শুনলুম সুপ্রভা মণিদের নিচে পড়ত এবং দু-জনে এক সঙ্গে দেশে যেত।

ওখান থেকে বার হয়ে আমি আর বেগুন এলুম মণীন্দ্র বসুর বাড়ি। সেখান থেকে সুরমা বসুর বাড়ি,—রামমোহন রায় রোডে। বেশ সাজানো বাড়ি, সাজানো ড্রয়িং রুম। সুরমা বসু ও তাঁর একটি বোন গান গাইলেন বড় চমৎকার। মেয়েটি মিউনিকে ছিলেন, ইউরোপীয়ান মিউজিক শিখতেন।

দেখে মনে হোল এই সব মেয়ে, মণি, সুরমা বসু কেমন চমৎকার ঘর বর পেয়েচে, বেশ আছে। কিন্তু যার আরও বেশী ভালভাবে এ সব জিনিস পাওয়া উচিত ছিল—সে কোথায় পড়ে কষ্ট পাচ্চে, তার কিছুই হোল না। জীবনে এমন ট্র্যাজেডি কতই যে হচ্চে প্রতিনিয়ত। অথচ সে কি বুদ্ধিতে, কি বিদ্যায়—কোন অংশে এদের চেয়ে কম তো নয়ই—বরং অনেক বেশী। ভেবে সত্যিই বড় কষ্ট হয়।

সুরমা বসুর সুন্দর গান শুনবার সময়ে আরও মনে হোল পল্লীগ্রামের সেই সব অভাগিনী মেয়েদের কথা, যারা জীবনে কোন সুখই কোনদিন পেলে না। এমন কত আছে, জীবনে তাদের সঙ্গে কত ভাবে কত পরিচয়। আজ সন্ধ্যায় তাদের সবারই করুণ মুখ মনে পড়ে আনন্দের পরিবর্ত্তে গভীর দুঃখ ও সহানুভূতিতে মন ভরে উঠল।

আজ সাতভেয়ে তলায় আমাদের বনভোজন গেল। বনগাঁয়ের আমাদের বন্ধুবান্ধব উকীল মোক্তার সকলেই ছিল, তা ছাড়া সাবরেজিস্ট্রার ও ডাক্তার। বেলা দশটার সময়ে নৌকো করে আমরা গান করতে করতে নদীপথে চলেচি—পুরনো বনগাঁ ও শিমুলতলার সবাই ভাবচে এ আবার বাবুদের কি খেয়াল! তারপর বটতলায় গিয়ে মাদুর পেতে বসে আমরা সবাই খুব গল্পগুজব করলুম। আমরা ধূমপান করতে পারি নি, কারণ প্রবীণের দল সর্ব্বদা কাছে কাছে রয়েচে। সতীশ মামাকে অনেক কৌশল করে সরিয়ে একটু আমাদের সুবিধে করে নেওয়া গেল। এর আগেও গত পুজোর ছুটিতে একদিন সাতভেয়ে তলায় এসে খুদু, খুড়ীমা, ন-দি আমরা সবাই বনভোজন করে খেয়েছিলুম। এত বড় বটগাছ এখানে আর কোথাও নেই,—এক রাজনগরের বট ছাড়া। নদীর দু-ধারে এড়াঞ্চির ফুল ফুটে আছে—কিন্তু কুঠীর মাঠের সে শোভা নেই এখানে। রামায়ণে সেই শ্লোকটা মনে পড়ল—

সন্তি নদ্যো দণ্ডকেষু তথা পঞ্চবটী বনে।
সরযূ বিচ্ছেদ শোকং রাঘবস্তু কথং সহেৎ॥

পঞ্চবটি ও দণ্ডকারণ্যে তো কত নদনদী বর্ত্তমান, কিন্তু সরযূ বিরহ দুঃখ কি রামচন্দ্র সহ্য করতে পারেন?

আমার মনে হয় বারাকপুরের ওদিকের বনশোভা নেই এই অঞ্চলে। মাঠে এদিকে চাষ অত্যন্ত বেশী, পোড়ো জমি কোথায় যে যদৃচ্ছাবিস্তৃত বনভূমি গড়ে উঠবে? অরণ্য-প্রকৃতি এখানে মানুষের সংস্পর্শে এসে ভীতা, সঙ্কুচিতা তার সে উদ্দাম স্বাধীনতা নেই।

রান্না শেষ হবার কিছু আগে আমরা নদীর ধারে রৌদ্রে বসে তেল মেখে সাঁতার দিয়ে স্নান করলুম। আমি তো তেল মাখলুম বোধহয় তিন বৎসর পরে। সাঁতার দেবার সময়ে খুব আনন্দ হোল। ওপারে কাঁচ মটরের ক্ষেতে কেমন সুন্দর ফুল ফুটেচে—এই দলের মধ্যে গাছপালা ভালবাসে দেখলাম কেবল একমাত্র সাবরেজিস্ট্রার। আর কারো সেদিকে খেয়াল নেই।

বেলা তিনটের সময় আমরা সবাই খেতে বসলুম। নিশিবাবু ও সুরেনবাবু পরিবেশন করলেন। সকলের সঙ্গে আমোদ করে খাওয়া হয়ে গেল কিছু বেশী। সন্ধ্যার সময় সেই ঝোঁকে আমরা গল্প করতে করতে ফিরলুম।

সন্ধ্যার সময় যতীন ডাক্তারের দোকানে, আমার বাল্যবন্ধু নিতাই পাড়ুইয়ের সঙ্গে যতীনদার দোকানের অংশ নিয়ে খুব ঝগড়া হোল। নিতাই নিজের জিনিসপত্র লেপ বালিশ, দাঁড়িপাল্লা নিয়ে ছোট ছেলের হাত ধরে অন্ধকার রাত্রে বাড়ি চলে গেল। যতীনদা ওর প্রাপ্য টাকা দিলে না, আরও বললে, তুমি দোকানের তালের মিছরি খেয়েচ, তোমার ছেলে দুধ খেয়েচে,—টাকা আমার যখন খুশি হবে তখন দেব। কার যে দোষ তা দু-পক্ষের কেউই বুঝতে দিলে না—এ বলে ওর দোষ, ও বলে এর দোষ। বাঙ্গালীর ব্যবসায় এই রকম করেই নষ্ট হয়ে যায়।

র‍্যাঙ্কোর পল্ ভারলেনের জীবনী পড়ছিলুম। নিচের লাইন কটি বড় চমৎকার!

Et je m'en vais	And I going
Au vent man vais	Born by blowing
Qui us' emporte	Wind and grief
Deac, deta	Flutter here and there
Parcil a la	As on the air
Feville morte	The dying leaf.

শেষের ছত্র কয়টির ছন্দ ও সুর এত মধুর যে বার বার পড়লেও তৃপ্তি হয় না।

ওর প্রথম দুটো stanzas

Le Sanglots longs	Long sobbing wind
Des violins	The violins of a autumn drove
De l'automre	Wounding my heart
D'une Languer	With languor as smart
Monotone.	In monotone.
Fout suffo quant	Choking and hale
Et leteme, quand	When on the gale
Sonne l'heune	The hours sound deep
Je me Son viens	I call to mind

Des jours anciens	Dead year behind
Et je pleune	And I weep.

Verlain-এর বিষয়ে এ কথাটা ঠিকই মনে হয় যে, লেখক বর্তমান যুগের লোককে মজাতে না পারলে সে কোন যুগের লোককেই মজাতে পারবে না। Bernard Shaw তাঁর Sanity of Art-এ যে কথা লিখেচেন, ভারি সত্যি।

The writer who aims at producing the platitudes which are 'not for this age but for all time' has his reward in being unreadable in all ages. Whilst Plato and Aristophanes peopling Athens with living men and women, Shakespeare peopling with Elizabethan Mechanics and Warwickshire hunts, Carpaccio painting the life of St. Ursula exactly as if she were a lady living in the street next to him, are still alive and at home everywhere among the dust and ashes of thousands of academic, punctilious, archaeologically correct men of letters and art.

Montaign সম্বন্ধে একটি কথা বড় ভাল লাগলো। 'He was the greatest artist of all—he knew the art of living'.

অনেক দিন আগে ঠিক এই দিনে আজমাবাদ কাছারী থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে কলবলিয়া পার হয়ে কাটারিয়া পুলের ওপরে সূর্য্যাস্ত দেখেছিলুম। মেসে বসে আজ ডালহাউসি স্কোয়ার ঘুরে বেরিয়ে এসে সে কথা মনে পড়ল ডায়েরী দেখে। কি উন্মুক্ত জীবনের পরে কি বদ্ধ জীবন যাপন করেচি এখানে। ঠিক সেই বিকেলেই আজ বইয়ের গুদামে বসেছিলুম!

আজ সারাদিনটা অত্যন্ত ঘোরা হয়েচে, বেলা সাতটা থেকে রাত এগারোটা পর্য্যন্ত। আমার মেস থেকে বেরিয়ে নীরদ চৌধুরীর বাড়িতে চা খেয়ে পশুপতিবাবুর বাড়ি গিয়ে পেনেটীর বাগান-বাড়ি যাবার কথা বলি। বন্ধুদের নতুন বাসায় যাই, তার আগে একবার নতুন পত্রিকার আপিসেও যাই। বেশী আড্ডা দিলে একটা অবসাদ আসে—শারীরিক ও মানসিক, যদিও আমি তা আজ অনুভব করি নি, তবুও আমার মনে হয় এতে কোনো আনন্দ নেই। তবে সপ্তাহে একদিন এমন বেড়ানো যেতে পারে—যদি অন্য সব ক'টা দিন নিজের কাজ করা যায়।

লেখাপড়া সম্বন্ধেও দিনের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন বিষয়ের বই পড়া খুব খারাপ। এক বিষয়ে মনোনিবেশ অভ্যাস করতে হয়, এবং যে এক বিষয়ে মনোনিবেশ করে, সে হয়তো আরও পাঁচটা জিনিস থেকে বঞ্চিত আছে, কিন্তু সে সৃষ্টি করতে পারে।

অনেকদিন পরে পানিতর গেলুম। রাত্রে ইটিন্ডা ঘাটে নেমে একজন লোক পাওয়া গেল। সে আবার ইটিন্ডা বাজারের ডাক্তার। হাটের ভিড় ঠেলে রাত্রে পানিতর গিয়ে পেঁছাই। উপেনবাবুর বাড়ি বেড়াতে গেলুম, বৃদ্ধ শয্যা আশ্রয় করেছেন। পুঁটীর সঙ্গে দেখা করলুম বাড়ির মধ্যে গিয়ে, ওরা জল-খাবার খাওয়ালে। নরেনের বাড়িতেও আবার খাবার খেলুম। তারপর পানিতরের ওপরের ঘরে (দোতলার উপরের ঘরে) রাত্রে শুলুম। কোণে সেই খাটখানা পাতা আছে, প্রথম পানিতরে গিয়ে ঐ খাটখানাতে আমি শুয়েছিলুম মনে আছে। ঠিক সেই পুরানো জায়গাতে খাটখানা এখনও পাতা। রাত্রে কত কথা মনে পড়ল। আজ কত দিনের কথা যেন সে সব। জাঙ্গিপাড়ার দিনের কথা, সেই অন্ধকারময়

দুঃখের দিন। তখন কি ছেলেমানুষ ছিলুম আর কি নির্বোধই ছিলুম তাই এখন ভাবি। তখন বি-এ পাস করে, কি না জানি ভাবতাম নিজেকে।

আমি খেয়া পার হয়ে বাসে উঠে আসচি, শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে পথে দেখা। তাঁর সঙ্গে দেখা করে কথা বলে আবার বসিরহাট এলুম ওঁদের নতুন বাসায়। দিদি ও পাঁচী ওখানে আছেন। দিদিকে দেখলে চেনা যায় না এমন নয়, তবুও সে দিদি আর নেই—কি যেন নেই মুখে যা তখন ছিল। একথা বলা বড় কঠিন। বয়েস হলে মানুষের মুখের কি যেন চলে যায়, এর উত্তর কে দেবে? পাঁচীকে তো চেনাই যায় না। দেড়টার গাড়িতে পাঁচীর সঙ্গে এক গাড়িতে কলকাতায় এলুম।

ঠাকুরমায়ের শ্রাদ্ধের পর সেই মার্টিন লাইনের গাড়িতে বসিরহাট থেকে এসেছিলুম, তখন আমি জাঙ্গিপাড়া স্কুলে চাকরি করি। কলেজ থেকে বার হয়ে প্রথম চাকরিতে ঢুকেচি। আর আজ এই সতেরো-আঠারো বছর পরে মার্টিনের গাড়িতে চড়ে বসিরহাট থেকে এলুম। সতেরো-আঠারো বছরের আগের আমি আর আজকার আমার চিন্তাধারা, অভিজ্ঞতা, জীবনের outlook সব বিষয়ে কি ভয়ানক বদলে গিয়েচে তাই ভাবচি।

দিদি তাঁর মেয়ে মানীর বিয়ের জন্যে ট্রেনে উঠবার সময় পর্যন্ত বলছেন। বললেন—ভেবেছিলুম তোমার সঙ্গে দেখা হোল না, এখানে যখন এলুম, তখন দেখা হবে তোমার সঙ্গে। কিন্তু এ কথায় তেমন আনন্দ পেলুম না। আগে হলে দিদির কথায় কত খুশি হ'তাম কিন্তু আজ—মানুষের মন কি বদলেই যায়! মন যে কি বহুরূপী দেবতা, কি বিচিত্র রহস্যময় তার প্রকৃতি, ভেবে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

সন্ধ্যাবেলা বন্ধুর বাসায় গিয়ে চা খেয়ে একটু গল্পগুজব করলুম রাত নটা পর্যন্ত। আসবার সময় ১০নং রুটের বাসে অনেকদিনের অচল একটা টাকা চলে গেল। গত পুজোর সময় টাটানগরে খাঁদা টাকাটা আমার নোট ভাঙানি দিয়েছিল, কিছুতেই এতদিন চলে নি।

আজ সকাল থেকে কত ছবি চোখের সামনে এল গেল। ইটিণ্ডার পথ, চাঁদা কাঁটার বন ইছামতীর ধারে। বিস্তৃত ইছামতী, ইটিণ্ডার ঘাটে লোকে সব বসে রোদ পোয়াচ্চে, ইন্দুবাবুর ছেলে অনাদি, নরেনের ছেলে, দিদি, দিদির মেয়ে মানী, পাঁচী। ছোট লাইনে আসবার পথে মনে পড়ল, আগে রবীন্দ্রনাথের বলাকা থেকে কবিতা মনে মনে আবৃত্তি করতুম 'এবার আমায় সিন্ধুতীরের কুঞ্জবীথিকায়'। কবিতাটি বড় প্রিয় ছিল তখন।

কাল সারাদিন যে বসিরহাট পানিতর অঞ্চলে কাটিয়েছি, আজ যেন সে সব স্বপ্নের মত মনে হচ্চে। ইছামতীর তীরের চাঁদা কাঁটার বনের পথে, ওই স্রোতাপসারিত কর্দমাক্ত তীর-ভূমির সঙ্গে প্রথম যৌবনের যে সব স্মৃতি জড়িত, তা কাল একটু একটু অস্পষ্ট মনে এল। প্রসাদকে কাল বড় ভাল লেগেচে—আর প্রসাদের বাবাকে।

আজ সকালে উঠে রমাপ্রসন্নের বাড়ি গিয়ে শুনি সে গিয়েচে আপিসে। বাসায় ফিরেই হঠাৎ গিরীনবাবু এসেচে দেখলুম। সে বললে, রাজা নাকি মারা গিয়েচেন শুনেচেন। আমি অবিশ্যি জানতুম পঞ্চম জর্জ খুব অসুস্থ, কিন্তু এত শীঘ্র যে তিনি মারা যাবেন, তা ভাবি নি। খবরের কাগজ মেসে আসে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'—তাতে মাত্র এই খবর দেখা গেল 'King's life is peacefully drawing a close'—একজন গিয়ে পাশের বাসা থেকে স্টেটসম্যান দেখে এসে বললে রাজা মারা গিয়েছেন বাস্তবিকই।

স্কুলে গিয়ে তখনি ছুটি হয়ে গেল। নতুন একটি প্রকাশক আমার কাছে ঘুরছিল বই নেবার জন্যে, তাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে গেলুম শৈলজাবাবুর বাড়ি, সেখান থেকে বিচিত্রা

অফিসে, সেখান থেকে নাট্যকার যোগেশ চৌধুরীর বাড়ি। রাত দশটায় বাড়ি ফিরলুম।

সম্রাট বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন এবং গত ১৯২৮ সালে অত বড় অসুখ থেকে উঠে কাবু হয়েও পড়েছিলেন। মনে পড়ে ১৯১২ সালের কথা, যখন তাঁর দরবার উপলক্ষে আমাদের স্কুলে ভোজ হয়েছিল, আমি তখন বনগ্রাম স্কুলের ছাত্র। সেই উপলক্ষে জীবনে প্রথম বায়োস্কোপ দেখলুম বনগ্রামে ডেপুটিবাবুর বাসার প্রাঙ্গণে। সে সব বাল্যস্মৃতিতে পর্যবসিত হয়েচে—তারপর দীর্ঘ চব্বিশ বৎসর কেটে গেল। জীবনের পথে আমিও কতদূর অগ্রসর হয়ে এসেচি। বর্ত্তমান প্রিন্স অফ ওয়েলসকে বালক দেখেছি (ফটোতে অবিশ্যি), দেখতে দেখতে তাঁর বয়স এখন হোল তেতাল্লিশ বছর।

জীবন, বছর, আয়ু হুহু করে কেটে যাচ্চে। বিরাট স্রোতস্বতী এই রহস্যময়ী জীবনধারা, কে জানে একে ? ডিসরেলী বলেছিলেন জীবন সম্বন্ধে 'youth is a blunder, maturity is a struggle and old age is a regret' —চমৎকার বিশ্লেষণ ও summing up ; তাই সত্যি কিনা কে জানে ?

কাল রাজপুরে অনেকদিন পরে বেশ কাটল। বেলা পড়লে আমি ও ভোম্বল ধুনি ডাক্তারের বাড়ি বসে গল্প করে বোসপুকুরে বেড়াতে গেলুম। তখন কি চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেচে, বোসপুকুরের ওপারের নারকেল গাছগুলোর কি রূপ ফুটেচে ! ফিরবার পথে একটা বাঁধানো পুকুরের ধারে দু-জনে বনে গল্প করলুম। বাঁধা ঘাটটা বড় সুন্দর। এই রাস্তাটার ধার দিয়ে একবার আমি কিশোরী বসুর বাড়ি থেকে বোসপুকুরে বেড়াতে এসেছিলুম, তখন মা আছেন,—ওখানে পুকুরঘাটে একটা ছেলে এসে জুটল, সে থাইসিসে ভুগছিল বলে তার বাড়ির লোকে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে তাকে নৈনিতালে রেখেছিল। সে এসে বললে—এদেশে কোন কিছু ভাল বিষয়ের চর্চ্চা নেই, এখানে বসে মন টিকচে না। তারপর আমরা গেলুম খুকীদের বাড়ি, সেখানে আহারাদির পরে খুকী পাড়ার লোকের নানা দুঃখের কাহিনী বললে : মহেন্দ্রবাবুর পনেরো বছরের নাতনীটি বিধবা হয়েছে, তার মাও বিধবা, জায়ের ছেলের গলগ্রহ, কারণ ধীরেন (ওই ছেলেটির নাম, এক সময়ে ও আমার ছাত্র ছিল) বাড়ির মধ্যে একমাত্র রোজগারে লোক। ধীরেনের মায়ের কটূক্তির জ্বালায় ওদের মা ও মেয়ের জীবন অতিষ্ঠ হয়েচে। তারপর মেয়েটি আবার অন্তঃসত্বা। মা বলে মেয়েকে, তুই বিষ খেয়ে মরে যা, আমি তোকে নিয়ে কি করি। একাদশীর দিন মেয়েটা মরে যাওয়ার যোগাড় হয়। তার ওপর পেটের ছেলে টান ধরে, জলতেষ্টায় ও খিদেতে, একাদশীতে বড় কষ্ট পেয়েচে। সবাই বলেছিল জল খেতে দাও, মহেন্দ্রবাবুর স্ত্রী ও দেবী দু-জনেই বলেচে, একে তো বাড়ির দুই ছেলে (মহেন্দ্রবাবুর মেজো ও সেজো ছেলে) এর আগে মারা গিয়েচে, একাদশীতে বাড়ি বসে বিধবা জল খেলে, পাছে আরও কোন অকল্যাণ হয় ! দেবী বলেচে, আমার তো ওই বাচ্চা, আমার সে সাহস হয় না বাবু, জল খাওয়াতে হয় ও মেয়েকে নিয়ে তুমি অন্যত্র যাও।

কাজেই মেয়ের জল খাওয়া হয় না।

এরা একটা কথা ভুলে যাচ্চে—

'By day and by night, year in and year out, century after century, there is going out a colossal broadcast of power which gives real life to all who will enter into it. Normal function of the organism is to act as a receiving set for Life Power. Clear out hatred, malice, lust, fear and all other frictions and you will find that entirely without any other effort

on your part, there will pervade your being and your life that hitherto unheard wave of spiritual power.'

আমরা আরও ভুলে যাই যে, পাপ জিনিসটাতে ভগবান রাগ করুন বা না করুন—

'Sin should be synonymous with bad radio production. A bad man is known by its poor reproduction of God's life.'

'When we began to deny ourselves for the good of others it was a highly important step in the soul's development and destined to lead on to increasing concern for others' good. Then we begin to realise God with a personal interest in our life and we decide to consider his wishes.'

আরও কথা আছে। টাকা রোজগারই তো সংসারের উদ্দেশ্য নয়। জীবনের চরম সার্থকতা আসবে মনের পথ ধরে। কিন্তু সময় আসে যখন মনে হয় ভগবান জীবনের কেন্দ্র, তাঁর কাছ থেকে সব মঙ্গল আসবে। 'It is well to have a clear-cut aim. Unless we are striving to attain, our policy is drift, and drift will not bring us the lost things. The lost things have to be thought for, prayed for, worked for and the supermost thing in earthly life is the development of soul qualification for a spacious and satisfying activity when entering the Beyond.'

'It is the outermost or highest sphere. Life there is realised more impersonally. One's whole work and activity on that sphere would be solely for the good of others. There would be no personal bias, selfiish aims of ambitions would be impossible.'

আজ বেশ একটা অভিজ্ঞতা হোল। মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষে সকাল সকাল স্কুল বন্ধ হবার পরে গেলুম কার্জন পার্কে ডালিয়া ফুল ফোটা দেখতে। সেখান থেকে বেরিয়ে একবার ভাবলুম ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী গিয়ে কিছু একটা পড়ব। সাত পাঁচ ভেবে সামনেই একখানা টালিগঞ্জের ট্রাম দেখে উঠে পড়লুম তাতে। টালিগঞ্জ ডিপোতে নেমে একটু ফাঁকা মাঠ কি পাড়াগাঁ খুঁজে নেবার জন্যে হেঁটে চলেচি, কালী ফিল্মের স্টুডিও পার হয়ে একটা খাল পেলাম। খালে খেয়া আছে, আধপয়সা করে তার পারানি। খাল পেরিয়ে যাচ্চি। একটা লোক আমার আগে যাচ্ছিল, তার মুখে শুনলুম যে নিকটে কোন গ্রামে মাঘীপূর্ণিমা উপলক্ষে কি একটা মেলা হয়। সেখানে চলেচে সে। আমি তার সঙ্গ নিলুম। ভাবলুম দেখাই যাক কি রকমের মেলা। চলেচি তো চলেইছি, দিব্যি পাড়াগাঁ, বাঁশঝাড়, শিমুল গাছে রাঙা ফুল ধরেচে, ঘেঁটুবনে মুকুল দেখা দিয়েচে, সজনে ফুলের মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্ছে, দু-একটা কোকিলও ডাকচে। ক্রমে দূর থেকে লোকজনের কলরব শোনা গেল। দু-একটা দোকান বসেচে, অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে কাছে গিয়ে দেখলুম। একটা নীচু পাঁচিলে ঘেরা বাগান-বাড়ি মত জায়গায় অনেকগুলি মেয়ের ভিড়—প্রায় চার পাঁচ শো মেয়ে। পুরুষ তত বেশী নয়, সবাই মহা ব্যস্ত, ইতস্ততঃ ছুটোছুটি করচে, ছেলেমেয়ে কাঁদচে, চীৎকার করচে। বাগান-বাড়িতে ঢুকে দেখি ছোট্ট একটা একতলা বাড়ির সামনের উঠোনে গাছতলায় প্রায় দু-তিনশো মেয়ে ছেলেপুলে নিয়ে শালপাতা পেতে বসে আছে। শুনলুম তারা খেতে বসেচে কিন্তু আগের দল খিচুড়ি সব খেয়ে সাবাড় করে দিয়েছে। খিচুড়ি চড়েচে, আবার না নামলে এদের খেতে দেওয়া যাবে না। মেয়েরাই সেখানে কর্ত্রী, তারাই সবাইকে দিচ্চে থুচ্চে,

আদর-আহ্বান করচে, কাউকে বা শাসন করচে। একটা ছোট ঘরের মধ্যে সবাই ভিড় করে ঠাকুর দেখতে ঢুকচে দেখে আমিও ঢুকলুম। ছোট্ট কালী প্রতিমা, নাম সুশীলেশ্বরী। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, এখানে একজন বৃদ্ধা থাকেন, তিনিই এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেচেন। একটু পরে সেই বৃদ্ধাকেও দেখলুম, সবাই তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করচে। আর তিনি সবাইকে মিষ্টি কথায় বলচেন—না খেয়ে যেও না যেন বাবা। একটা ইট বাঁধানো চৌবাচ্চায় খিচুড়ি ঢালা হচ্চে, পাশেই আর একটা চৌবাচ্চায় কপির তরকারি। সকাল সকাল খাবার জন্যে সবাই উমেদারী করচে—অনেক দূরে যাব, মেয়েছেলে নিয়ে এসেচি, ভাড়াটে গাড়ি, প্রসাদ দিয়ে দিন।

আমাকে একটা ঘরে খাওয়াতে বসালে। আমার অত্যন্ত কৌতূহল হোল এখানে কি খাওয়ায় না দেখে যাবো না। তাই একটি মেয়েকে বলতেই সে আমায় ঐ ঘরটায় নিয়ে একখানা পাতা করে বসিয়ে দিলে। ঘরের মধ্যে আমার বসবার আসনের কাছেই আর একটি বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে বসে খাচ্ছে আর তার ছোট ছোট দুটি ছেলে মেয়েকে খিচুড়ি মুখে তুলে খাওয়াচ্চে। যে মেয়েটি আমায় পাতা করে বসিয়ে দিয়েছিল সে কোথায় চলে গেল। আর একজন আমায় পরিবেশন করলে। খিচুড়ি, চচ্চড়ি, আলুর দম, কপির তরকারি, বেগুন ভাজা, চাটুনি, পায়েস, দই, মুড়কী ও রসগোল্লা। তা খুব দিলে, পাতে ঘি দিলে। এটা নেবে, ওটা নেবে জিজ্ঞেস করে খাওয়ালে। কেমন যত্ন করলে যেন বাড়ির ছেলের মত, অথচ আমাকে তারা জীবনে এই প্রথম দেখলে। মেয়েদের এই একটা গুণ, খাওয়াতে মাখাতে যত্ন করতে ওদের জুড়ি মেলে না।

খাওয়া শেষ হোল, আর একটি মেয়ে আবার সাজা পান দিলে। এমন মচ্ছবের খাওয়ায় যেখানে রবাহুত অনাহুত কত আসচে যাচ্চে তার ঠিকানা নেই, এখানে কে আবার খাওয়ার পরে পান দেয়! এ আমি এই প্রথম দেখলুম।

দেখে কষ্ট হোল আমি যখন খাওয়া শেষ করে বাইরে এলুম, তখন সেই অল্প বয়সের বধূটি রোয়াকের সামনে পাত পেতে বসে আছে—তখনও তাদের কেউ খেতে দেয় নি। এদের জিনিসপত্র বেশী কিন্তু লোক কম। খাওয়ার সময়ে পরিবেশনকারিণী মেয়েরা বলাবলি কচ্ছিল—আর পারি নে বাপু। সকাল থেকে খাটুচি, আর রাত বারোটা পর্যন্ত কত খাটি? আসচে বছর আর এখানে আসা চলবে না দেখচি।

ওখান থেকে বার হয়ে একটা বাঁশবনের মধ্যের পথ ধরে অনেকটা হেঁটে গেলুম, বেলা পড়ে এসেচে, বাঁশবনে বেশ ঘন ছায়া, এক জায়গায় সাতটা ভাঙা শিব মন্দির সারি সারি, অনেকগুলো শিমুল গাছ। ফুলে ফুলে রাঙা। বড় মাঠে বসে খানিকটা বিশ্রাম করলুম—তারপর এসে ট্রাম ধরে চৌরঙ্গির মোড়ে নামলুম। সেণ্ট্রাল এভিনিউ দিয়ে হেঁটে সুধীরবাবুর দোকানে এসে ভাবলুম সরোজকে গল্পটা করব, দেখি সরোজ বেরিয়ে গিয়েচে।

কি একটা অবর্ণনীয় আনন্দ পেয়েছি আজ! অথচ কেন যে সে ধরনের আনন্দ এল, এর কোন কারণ খুঁজে পাই নে। নীরদবাবুর বাড়ি যখন বসে আছি, তখনই এটা প্রথম অনুভব করলুম, কিন্তু তখনই পশুপতিবাবু ফোন করলেন এখুনি আসুন ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে প্রমথ বিশীর নাটক হচ্ছে। নীরদ যেতে পারলে না, আমি মিসেস দাসগুপ্তকে নিয়ে ওদের মোটরে ইন্‌স্টিটিউটে এলুম। সেখানে পরিমল গোস্বামী, প্রমথ বিশী এবং সবাই হাজির। পরিমল বললে, আপনার 'দৃষ্টিপ্রদীপ' পড়েচি, কাল রাত্রে। বড় ভাল লেগেচে। আরও গল্পগুজব চলল। আমি গিয়ে বৌঠাকরুনের সঙ্গে দেখা করে এলুম। তারপর ওখান থেকে পার্ক সার্কাসে মণীন্দ্র বসুর বাড়িতে চা-পার্টিতে এলুম, কারণ সেখানে জ্যোৎস্নার

বিবাহের কথা হবে অন্নদাশঙ্করের আত্মীয়ের সঙ্গে এবং আমিই তার ঘটক। পার্ক সার্কাসের বাস থেকে নেমে যখন মণীন্দ্র বসুর বাড়ি যাচ্ছি, তখন ছিন্নভিন্ন বাদলা মেঘের অন্তরালে প্রতিপদের চাঁদ উঠেচে, সে যে কি এক সৌন্দর্যভরা ছবি, না দেখলে বোঝানো যাবে না। তখনই আমার বিহারের জঙ্গলের ও তার হতভাগ্য দরিদ্র নরনারীদের কথা কি জানি হঠাৎ মনে পড়ল, তাদের মধ্যে ছ-বছর থেকেচি, তাদের সব অবস্থাতে দেখেচি, জানি। আর সেই নির্জন বনানী!

রাত্রে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না উঠেচে যখন বিছানাতে এসে শুই; মণীন্দ্রবাবুর বাড়িতে চারু রায়, সুরেন্দ্র মৈত্র এঁদের সঙ্গে spiritualism নিয়ে ঘোর বাদানুবাদ করে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েচি। তারপর হিমালয়ের শৃঙ্গরাজি ও গঙ্গার উৎপত্তিস্থান সম্বন্ধে আর একপালা বাদানুবাদ।

আজ ট্রামে স্কুল থেকে গেলুম গঙ্গার ধারে। গিরিজাপ্রসন্ন সেনের কবিরাজি ডিসপেনসারির মধ্যে অয়েল-পেণ্টিংখানা ঠিক সেই জায়গাটিতে আছে – বাবার সঙ্গে কতবার ভগবতীপ্রসন্ন কবিরাজের কাছে আসতুম। বাড়িটা সেইরকমই আছে, তবে খুব পুরোনো হয়ে পড়েচে। ভাবলুম আজ এই যে এই ঘরে ঢুকলুম, জীবনে যা কিছু সব হয়েচে, সেবার এই ঘর থেকে বার হবার ও এবার পুনরায় ঢুকবার মধ্যে, সেই যে ছেলেবেলায় কিশোর কাকা সত্যনারায়ণের পুঁথি পড়তেন তাও,…যুগল কাকাদের ঢেঁকশেলে আমি, ভরত, নেড়া বাদলার দিনে খেলা করতাম তাও, বাবার সঙ্গে আমি হুঁকোর দোকানে বসে লুচি খেয়েছিলুম তাও, প্রথম যেদিন ধানবনের মধ্যে দিয়ে স্কুলে ভর্ত্তি হতে যাই বনগাঁয়ে তাও, সব কিছু,—সব কিছু, কত কথা মনে হোল, সারা জীবনটা যেন এক চমকে দেখতে পেলুম গঙ্গাপ্রসাদ সেনের বড় অয়েল পেণ্টিংটার সামনে বসে।

তারপর গিরিজাবাবুর সঙ্গে ওদের বৈঠকখানায় অনেকক্ষণ বসে গল্প করি। কত পুরোনো আমলের ছবি টাঙানো, যে সব ছবি আর এখন মেলে না। উঠোনের সেই জায়গাটি যেখানে বসে বাল্যে একদিন মধুছন্দার অভিনয় দেখেছিলুম ভূষণ দাসের যাত্রার দলে, সব সেই রকমই আছে তবে যেন বড় পুরোনো হয়ে গিয়েচে।

বারাকপুরে শৈশবে যাপিত কত রাঙা সন্ধ্যা, পাখীর ডাক ও মায়ের মুখ মনে পড়ল—বাড়ির পিছনে বাঁশবনের কত দিনের কত ছায়া গহন, রাঙা রোদ গাছের মাথায় মাখানো সন্ধ্যা। যে সন্ধ্যা, যে শৈশব, যে বারাকপুর আর কখনও ফিরে আসবে না আমার জীবনে।

ওখান থেকে বার হয়ে গঙ্গার ধারে বাঁধানো ঘাটের পৈঠায় অনেকক্ষণ বসে রইলুম।

কালোর বৌভাতে শনিবার বাড়ি গিয়েছিলুম। দুপুরে খয়রামারির মাঠে যেমন বেড়াতে যাই,—গিয়েচি। একটি ঝোপের ধারে বৈঁচি গাছে কচি বৈঁচি পাতা গজিয়েছে, মাথার ওপর নীল আকাশ, কি ঘন নীল, বাতাসে যেন সঞ্জীবনী মন্ত্র, মাঠের সর্ব্বত্র ছড়ানো শিমুল গাছ ফুলে রাঙা হয়ে রয়েচে। ট্রেনে আসতে কাল শনিবারে রাঙা শিমুল ফুলের শোভা মুগ্ধ হয়ে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেচি, মনে মনে ভাবি প্রতি বৎসর দেখচি আজ চল্লিশ বছর কিন্তু এরা তো পুরোনো হোল না, কেন পুরোনো হোল না—কেন প্রতি বৎসর শিরায় শিরায় আনন্দের স্রোত বইয়ে দেয়, তা কে বলবে?

গত শুক্রবারে আবার বসিরহাট গিয়েছিলাম। মাঠে মাঠে শিমুল গাছগুলি রাঙা হয়ে উঠেচে ফুলে ফুলে, বৈঁচি ফুল ফুটেচে বাঁশবনের শুকনো ঝরা লতার মধ্যে, বাতাবী লেবু

ফুলের গন্ধও মাঝে মাঝে পাচ্চি। বসিরহাটে নামলুম বিকেলবেলা, প্রসাদের সঙ্গে বাঁধানো জেটির ঘাটে গিয়ে বসে রাঙা রোদ মাখানো ইছামতীর ওপারের দৃশ্যটি দেখলুম। এই স্থানটিতে দাঁড়িয়ে একদিন গৌরী বলেছিল—'গাড়িতে কেমন কলের গান হচ্ছিল, শুনছিলাম মজা করে'। সে কথাটি বললুম প্রসাদকে। রাত্রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত দিদির সঙ্গে গল্প করলুম। পরদিন সকালে অর্থাৎ শনিবার কবি ভুজঙ্গভূষণ রায় চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। বয়স চৌষট্টি-পঁয়ষট্টি বছর হয়েচে, কিন্তু মাথায় একটা চুলও পাকে নি, আমায় দুখানা বই দিলেন, চা খাওয়ালেন। গীতার কাব্যানুবাদ করচেন পড়ে শোনালেন, বেশ লোক।

এই দিন বিকেলের ট্রেনে ফিরলুম কলকাতায়, ওপথে গাছপালার সৌন্দর্য্য তেমন নয়, একটি মেয়ে ট্রেনে কেমন গান করে শোনালে। সন্ধ্যার সময় নীরোদবাবুর বাড়িতে সাহিত্য সেবক সমিতির অধিবেশনে যেতে যেতে নির্জ্জন অকল্যান্ড স্কোয়ারে বসে কি অপূর্ব্ব আনন্দ পেলুম, দু-একটা নক্ষত্রের দিকে চেয়ে। এ আমার অতি সুপরিচিত পুরাতন আনন্দ। ছেলেবেলা থেকে পেয়ে আসচি, এতে অবিশ্যি আশ্চর্য্যের কথা কিছু নেই। অনেকে আমার এ আনন্দটা বোঝে না, কিন্তু তাতে কিই বা যায় আসে—আনন্দের উপলব্ধিটুকু তো আর মিথ্যে নয়।

বাইরে কোথাও ভ্রমণের একটা পিপাসা আবার জেগে উঠেচে। ভাবচি আফ্রিকা যাব, শম্ভু আজ এসেছিল, সে বললে, তার কে একজন আত্মীয় ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জির আপিসে কাজ করে, তারই সাহায্যে যদি কিছু হয় দেখবে ও চেষ্টা করে। আজ সারাদিন স্কুলেও ওই কথাই ভেবেচি, বেশীদূরে কোথাও যেতে চাই নে। কিন্তু জগতের খানিকটা অন্ততঃ দেখতে চাই।

সেদিন P. E. N. Club-এ যে মধ্যাহ্ন ভোজ হোল বোটানিক্যাল গার্ডেনে—সেখানে অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হোল। মেয়েটি খুব বুদ্ধিমতী, অক্সফোর্ড থেকে এম্-এ পাস করে এসেচে।

পরের বৃহস্পতিবারে ইদের ছুটিতে বাড়ি এলুম। আসার উদ্দেশ্য এই ফাগুনে বাংলার বনে, মাঠে অজস্র ঘেঁটুফুল ফোটে—অনেকদিন ঘেঁটুফুলের মেলা দেখিনি, তাই দেখব। তাই আজ সকালে এঞ্জিনিয়ার ও সাবডেপুটীবাবুর সঙ্গে মোটরে বেড়াতে গেলুম চৌবেড়ে। সেখানে ওদের ইউনিয়ন বোর্ডের এক কাজ ছিল, মিটিয়ে সবাই মিলে যাওয়া হোল দীনবন্ধু মিত্রের বাড়ি। ভাঙা সেকেলে পুরোনো কোঠা, বট অশ্বত্থের গাছ গজিয়েচে—তাঁর জন্মস্থান দেখলুম—দীনবন্ধু মিত্রের এক জ্ঞাতি ভাইপো বাড়ির পিছনে একটা সজনে তলা দেখিয়ে বললেন—ঐ গাছতলায় তখনকার আমলে আঁতুড় ঘর ছিল—ওইখানে দীনবন্ধু কাকা জন্মেছিলেন। আমি ও মনোরঞ্জনবাবু সার্কেল অফিসার স্থানটিতে প্রণাম করলুম। তারপর ঘেঁটুফুলের বন দেখতে দেখতে মাঠে মাঠে অনেকগুলো চাষাদের গ্রাম ঘুরে বেড়ানো গেল—চৌবেড়ে, ন'হাটা, সনেকপুর, দমদমা, মামুদপুর ইত্যাদি। বেলা একটার সময় এলুম কালীপদ চক্রবর্ত্তীর বাড়ি। সেখানে কালীপদ খুব খাতির করলে। ওখান থেকে বার হয়ে আমি নামলুম চালকী। সেখানে খাওয়া দাওয়া করলুম। চালকীর পিছনের মাঠে কি ঘেঁটুবনের শোভা! দিদিদের বাড়ি বসে ঘটুর বিয়ের বড়মানুষি গল্প শুনলাম। সন্ধ্যার কিছু আগে বনগাঁয়ে গিয়ে খয়রামারির মাঠে ঘেঁটুফুলের বনের মধ্যে একটা শুকনো গাছের গুঁড়ির ওপর কতক্ষণ বসে রইলুম। দূরে গাছের ফাঁকে চাঁদ উঠেচে—মাথার ওপর দু-চারটা তারা। মনের কি অপূর্ব্ব আনন্দ! কাছে ছিল একখানা বই—বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যা। সেখানে ঐ রকম স্থানে ফুটন্ত ঘেঁটুফুলের বনের মধ্যে বসে পড়ে যেন একটা মসৃণ

প্রনুভূতি নিয়ে ফিরলুম।

ঘোষপাড়ার দোলে এলুম অনেকদিন পরে। আজ সকালে বনগাঁ থেকে নটার ট্রেনে বার হয়ে রানাঘাটে সাড়ে দশটায় শান্তিপুর লোকাল ধরলুম, দোলের মেলায় আসতে হোল বেলা সাড়ে বারোটা। ছোট মাসীমা খেয়েদেয়ে ওপরে শুয়ে ঘুমিয়েছিলেন, আমি আসতে চা করে দিলেন। দুপুরের রোদে বাঁশবাগান আমার বড় ভাল লাগে—আর এই সব বাঁশবনের সঙ্গে আমার আশৈশব সম্বন্ধ। বিকালে একটু ঘুমিয়ে উঠে মেলায় গিয়ে একটি বড় সাংঘাতিক ঘটনা চোখের ওপর ঘটতে দেখলুম। একজন গুণ্ডা জনৈক যাত্রীর পকেট কেটেছিল, পাশেই ছিল একজন হিন্দুস্থানী ভলাণ্টিয়ার, সে যেমন ধরতে গিয়েচে, আর গুণ্ডাটি ওকে মেরে দিয়েচে ছুরি। আমি যখন গেলুম, তখন আহত লোকটাকে ওদের তাঁবুতে এনে শুইয়েচে, খুব লোকের ভিড়। একটু পরেই সে মারা গেল। ওদিকে সেই গুণ্ডাটিকেও পুলিশে ধরে ধরে ফেলেচে—তাকেও লোকে মেরে আধ-মরা করেছে। মেলাসুদ্ধ লোক সন্ত্রস্ত—সবাই বলচে, এমন কাণ্ড কেউ কখনও এমন স্থানে ঘটতে দেখে নি! আমি আরও খানিকটা এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে চলে এলুম। রায়বাড়ির পাশের একটা ঘন বনের-মধ্যের পথ দিয়ে ঢুকে একটা শুকনো পুকুরের পাড়ে ঘাসের ওপর গিয়ে বসলুম। ফিরে যখন আসচি তখন একটা শিমুল গাছের বাঁকা ডালপালার পেছনে পূর্ণচন্দ্র উঠচে—স্থানটি আফ্রিকা হতে পারতো, কি নির্জন, আর কি ভীষণ জঙ্গল—বাংলাদেশের গ্রামে এমন জঙ্গল আছে, না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে? কি মহিমময় দৃশ্য সেই উদীয়মান পূর্ণচন্দ্রের, সেই ঘন জঙ্গলের মধ্যে, আঁকাবাঁকা শিমুল গাছের ফাঁকে। আজ আমার ঘোষপাড়ার দোলে বেড়াতে আসা সার্থক হোল মনে হচ্চে শুধু এই দৃশ্যটা দেখবার সুযোগ পেলুম বলে। সেদিনের সেই খয়রামারির মাঠে শুকনো ডালের ওপর বসে থাকা ঘেঁটুবনের মধ্যে, আর আজকার কামারপুকুরের পাড়ের জঙ্গলে এই পূর্ণচন্দ্রের উদয়—এবারের দোলের ছুটির মধ্যে এই দুটো ঘটনা জীবনের অনেক মূল্যবান অভিজ্ঞতার মধ্যে আসন পেতে পারে।

তারপর মাসীমা ছাদে বসে চা করে দিলেন, লুচি ভাজলেন, আমি কাছে বসে গল্প করলুম। অনেকদিন আগের কথা তুললেন, আমি, গৌরী, মণি ও মাসীমা ছাদে বসে কত তাস খেলতুম। আমি তো ভুলেই গেছলুম, এতদিন পরে আবার সেকথা মনে এল। সুপ্রভার কথা জিজ্ঞেস করলেন।

এর মধ্যে একদিন কার্জন পার্কে একটা গাছে হেলান দিয়ে বসে জনৈক জাপানী চোরের আত্মকাহিনী পড়ছিলুম। বইখানাতে আছে, সে নিজে ভয়ানক বদমাইশ থেকে যীশুখৃষ্টের বাণীর প্রভাবে কেমন করে হঠাৎ ভাল লোক হয়ে পড়ল। আমার ডাইনে এক গাছে ফুটেচে চেরী ফুল, সামনে লাটসাহেবের বাড়ির কম্পাউণ্ডে সারি সারি দেওদার গাছে নতুন কচি পাতা গজিয়েচে—সেদিন ভুলে গেলুম যে কলকাতায় বসে আছি—ট্রাম, বাস আসচে যাচ্ছে, সে যেন আমার চোখেই লাগে না—আমি যেন বহুদূরে হিমালয়ের কোন অরণ্যে বসে আছি —সে গম্ভীর হিমারণ্যের নিস্তব্ধতা শুধু ভঙ্গ করচে তুষার নদীমুক্ত স্রোতধারা আর দেওদারের শাখা-প্রশাখার মধ্যে বায়ুর স্বনন।

তারপরেই একদিন গেলুম রাজপুরে। সন্ধ্যার সময় গিয়ে মাঠের ধারে বসলুম, মাথার ওপরে এক আধটা নক্ষত্র উঠেচে, হুহু দক্ষিণ হাওয়া বইচে, সামনে একটা বটগাছ, দূরবিসর্পী দিকচক্রবাল সন্ধ্যার অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখাচ্চে। আমার মনে কেমন একটা আনন্দ হোল—গত শনিবারে শার্লি টেম্পলের ছবি দেখে যেমন আনন্দ পেয়েছিলুম, এ যেন তার চেয়েও বেশী—যদিও শার্লিকে আমার খুবই ভাল লাগে এবং ঐ ছোট্ট মেয়েটির ছবি

থাকলেই আমি দেখি।

"To those who have some feeling that the natural world has beauty in it, I would say, cultivate this feeling and encourage it in every way you can. Consider the seasons, the joy of spring, the splendour of the summer, the sunset colours of the autumn, the delicate and graceful bareness of winter tress, the beauty of snow, the beauty of light upon water, what the old Greek called the unnumbered smiling of the sea."

'In the feeling for that beauty, if we have it, we possess a pearl of great price.'

—Lord Grey of Falloden

এ দিনটি প্রথম এক বাণ্ডিল পরীক্ষার কাগজ সুনীতিবাবুর বাড়ি নিয়ে গিয়ে দিয়ে এলাম। কথা ছিল মণিকুন্তলারা আজ রাজপুরে যাবে পিক্‌নিক করতে, ৮।৫৪ লোকাল ট্রেনে। আমিও ওদের সঙ্গে যাব, কিন্তু স্টেশনে যেমনি পা দেওয়া অমনি ট্রেন গেল চলে। পরের ট্রেনে গেলাম। বেণুদের মা খুব রান্না-বান্না করেছেন গিয়ে দেখি। মণিকুন্তলাকে বললুম—দু-দিন তোমার ওখানে গিয়ে দেখা পাই নি, এখানে এসেচ ভালই হয়েচে। আমরা খুব আনন্দ করে চা ও কলার বড়া খেলাম। মণির বোন রেণুর সঙ্গে আলাপ হোল, বেশ মেয়েটি, বুদ্ধিমতী খুব। রেণু যে ভাল নাচতে পারে, এ আমি এই প্রথম শুনলুম মণির মুখে। রেণু আমার কাছে এসে বললে—গল্প বলুন। ছেলেমানুষ—দু-একটি ভূতের গল্প শোনালুম। তারপর সে আর আমার কাছছাড়া হয় না। যেখানে আমি যাব সে সেইখানেই আছে উপস্থিত।

বললে—আপনাকে আমার বড় ভাল লাগচে। তারপর সবাই মিলে বোসপুকুরে নাইতে গেলুম। খুকীকে ডেকে নিলাম ওর বাড়ি থেকে। বোসপুকুরে সাঁতার দিয়ে পার হয়ে গেলাম। তারপর আর একটা পুকুরে নাইলাম।

রেণু বললে—এক একজনকে কেমন হঠাৎ বড় ভাল লাগে, আপনাকে যেমন লেগেচে। দেখচেন না সব সময় আপনার সঙ্গে সঙ্গে আচি।

তারপর বাড়ি এসে আমার আঙুলগুলো মটকাতে লাগল। বললে আর-জন্মে আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল।

আমি বললুম—আমি তোর বাবা হব, আমার মেয়ে হবি?

সে বললে—তাহলে মেয়ের মতই দেখুন। বলে—পাশে এসে আমার কাঁধে মাথা রেখে বসল।

মণিকুন্তলা গান গাইলে আর ও নাচলে।

'মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর
নমো নমো, নমো নমো'

বাবার শোকে রেণু নাকি পূর্বজন্মে আত্মহত্যা করেছিল, ওকে কে বলেচে নাকি। অদ্ভুত মেয়ে। ওর দিদি জ্ঞানবাবুর বাড়ি গেল—ও গেল না। বললে—ওরা মোটরে যাক্‌, আপনি আর আমি যাব হেঁটে।

সারা পথ ট্রেনে দু-বোনে গান গাইলে। বালিগঞ্জে জোর করে আমায় নামিয়ে নিলে। একটা গন্ধরাজ ফুল কোথা থেকে তুলে নিয়ে এসে আমায় দিলে। চেয়ারের পাশে জ্যোৎস্নায় বসে রইল সব সময়। বললে—ঠিকানা দেবেন, বাড়ি গিয়ে পত্র দেব। দুঃখ এই যে শীগ্‌গির

চলে যাচ্ছি। আগে কেন ভাব হোল না।…ইত্যাদি। অদ্ভুত মেয়ে বটে! ভারী ভাল লাগে ওকে, সব সময়ে 'বাবা' বলে ডাকবে আমাকে।

রেণুর কথাটা কেমন এক ধরণের আনন্দে আমায় ক-দিন যেন ডুবিয়ে রেখেচে। এমন একটা মনের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটল—যার সন্ধান পথে ঘাটে পাওয়া যায় না। তাই সবাইকে গল্প করে বেড়াচ্চি। আজ বিকেলে নীরদবাবু, বউঠাকরুন, পশুপতিবাবু, মিসেস দাশগুপ্ত সবাই মিলে গড়িয়ার মাঠে বেড়াতে গিয়েছিলুম। সঙ্গে হারমোনিয়াম গিয়েছিল, স্টেশনে নেমে মাঠের মধ্যে বসে আমরা গান গাইলুম। আমি হালুয়া তৈরী করলুম উনুন জেলে। চা খাওয়ার পরে গল্পগুজব হোল। আমার কিন্তু রেণুর কথা বার বার মনে হয়ে বিকালটা কি রকম হয়ে গেল। কেবলই মনে হয়, আহা, রেণু থাকলে বেশ হত! ওদের কাছে কথাটা বললুম। ওরা তো শুনেই বললে, আগে কেন বললেন না, আমরা গিয়ে তাকে নিয়ে আসতুম।

কাল রেণুদের বাড়ি গিয়েছিলুম। যেমন গিয়েচি ও তখনই দৌড়ে একখানা পাখা নিয়ে আমায় বাতাস করতে বসল, বললে,—শরবৎ করে নিয়ে আসি, দাঁড়ান। তারপর সব সময়েই মণি, আমি আর ওর বাবা গল্প করচি, রেণু আমার পাশে জানলার ধারে বসে রইল। লক্ষ্মীপুজো গিয়েচে কাল ওদের বাড়িতে, তা ও ভুলেই গিয়েচে। ওর বাবা বলে, আপনি এসেচেন আর ও সব ভুলে গিয়েচে। বাইরের বারান্দাতে জ্যোৎস্নায় মণি ওর কলেজ-জীবনের কত কথা বললে। রেণু বললে—আপনার জন্যে রজনীগন্ধা রেখেছিলুম, শুকিয়ে গিয়েচে, পদ্ম আছে, দেব এখন? আসবার সময় নিচু পর্য্যন্ত নেমে এল সঙ্গে, আর কেউ নয়, মণি এসেছিল, কিন্তু ওর বাবা ডাকলেন বলে আমি আবার ওপরে গেলাম উঠে, তাই মণি এবার আর আসে নি কিন্তু রেণু দু-বারই এল। আমার কোলের কাছটি ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললে—আপনি বুধবারে আসবেন তো? আমি পথের দিকে চেয়ে থাকি, কখন আসবেন। কি সুন্দর মেয়ে!

ছ-বছর পরে খুদুদের ওখান থেকে বেড়িয়ে এসে দুপুর বেলাতে মনে বেশ আনন্দ হোল, কারণ পথে পথে নতুন-পাতা-ওঠা গাছ, কোকিলের ডাক। রাত দশটার পরে জ্যোৎস্না উঠেচে, চেয়ার পেতে বাইরে বসে দেখি আর ভাবি, কাল ঠিক জ্যোৎস্না উঠতে দেখে মণি আমার সঙ্গে তর্ক করলে যে এটা নাকি শুক্লপক্ষ—ওদের বাড়ির ছাদে। তারপর, তিনু আর আমি খয়রামারির মাঠে গেলুম বেড়াতে। বেশ জ্যোৎস্না উঠেচে—পথে ঝোপেঝাড়ে কত কি ফুলের সুগন্ধ। এই গ্রীষ্মকালে বনঝোপে রাত্রে নানারকম বনফুল ফোটে—তার মধ্যে বনমল্লিকা বেশী। মনে এমন একটা অদ্ভুত আনন্দ ও উত্তেজনা আসে যে মনে হয় খয়রা-মারির মাঠেই সারারাত বসে থাকি। খুকুর কথা ও রেণুর কথা যত মনে হয় আর তত আনন্দ বেশী পাই। মাথার ওপরে কেমন নক্ষত্র উঠেচে, এই জ্যোৎস্না রাত্রে সারা বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে যে প্রীতি ও ভালবাসা উৎসারিত হচ্চে, পবিত্র প্রাণের অবলম্বনে তারা আমার জন্যে, তোমার জন্যে, সেই প্রীতি ভালবাসার কিছু অংশ homely ভাবে পরিবেশন করবে। কতরাত্রে ফিরে এলুম, তবুও ঘুম আসে না। একে গরম, তাতে আনন্দের উচ্ছ্বাস মনের মধ্যে, কি করে ঘুমোই? জীবনে আজকাল বড় বেশী আনন্দ পাচ্চি, খানিকটা মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক থেকে।

নৌকো করে সকালে বারাকপুর যাচ্চি। এ সময়টা আর কখনও ইছামতীতে নৌকো

করে যাই নি, বর্ষাকালের চেয়ে প্রকৃতি এখন আরও সবুজ—সত্যিই আরও সবুজ। গাছে গাছে নতুন শোভা। চারিদিকে পাখী ডাকচে পিড়িং পিড়িং, কোকিল ডাকচে, ঠ্যাং উঁচু করে বকগুলি শেওলার দামে বসে আছে—শিমুল গাছগুলোর রূপ কি অদ্ভুত! শিমুল ঝাড়া আর বাবলা গাছে নদীর শোভা বাড়িয়েচে। আমি বসে কাগজ দেখচি মেয়েদের, প্রায়ই সব পাস করিয়ে দিচ্চি—মেয়েদের ফেল করাতে মন সরে না—আর রেণুর কথা ভাবচি, কাল খুদু বলেছিল বিকেলে—'আপনার সঙ্গে কথা বলে যেমন অদ্ভুত আনন্দ পাই, এমন আর কারও সঙ্গে কথা বলে পাই নে' সেই কথা ভাবচি। খুদু কাল যেতে বলে দিয়েচে কিন্তু আজ রাত্রেই আমি যাব চলে, সুতরাং কাল কি করে তার সঙ্গে আর দেখা করব? এ ক-দিনই কি অদ্ভুত আনন্দে কাটচে।

আমাদের ঘাটে গিয়ে নৌকো লাগল। এবার বন জঙ্গল কেটে দেশের শোভা অনেকটা নষ্ট করে ফেলেচে। দুপুর হয়ে গিয়েছিল, আমি কুঠীর মাঠের দিকে একটু বেড়াতে গেলুম—পুঁটি দিদিদের বাড়ি ব্যাগ রেখেই। বাঁশবনে পাতা পুড়িয়েচে—চারিদিক যেন ফাঁকা ফাঁকা দেখাচ্ছে। স্নান করতে গেলুম ঘাটে, সেই বনিমের ঝাড় দাঁড়িয়ে আছে, খুকু আর আমি সেই ঘাটে নাইতে আসতুম, খুকু ওর তলায় দাঁড়িয়ে থাকত—মনে হোল যেন কত কাল হয়ে গেল। খেয়ে বিশ্রাম করে চড়ক-তলায় গেলুম। উমা এসেচে অনেকদিন পরে, তার সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। মণিকুন্তলার পত্রখানা ও আবার দেখলে। চড়কতলায় এসে কতযুগ পরে কাদামাটি দেখি। সোনা, নলিনীদির মেয়ে তাকেও দেখলুম কতকাল পরে। পাগলো জেলে সন্ন্যাসী সেজেচে, ওকে কত ছোট দেখেচি। অজয় মণ্ডল বড় বুড়ো হয়ে গিয়েচে। সে জিজ্ঞেস করলে আমার বাড়ির কথা, আমার ভাই কেমন আছে।

চালতেপোতার বাঁধ দিয়ে যেতে যেতে এখন এই অংশটা লিখচি। কি অপূর্ব গাছপালার শোভা,—বারাকপুরের পুলে,—আর এই চালতেপোতার পুলে। নদীর জলের ও হাকরা বনের এই যে সুগন্ধ এটা আমাদের ইছামতীর নিজস্ব। এবার গুড ফ্রাইডের ছুটিটা সর্ব্বরকমে বড় আনন্দেই কাটল। এত আনন্দ জীবনে অনেক দিনই পাই নি।

রোদ রাঙা হয়ে আসচে। ডাইনে চালকীর পথের ধারে কচি পাতা ওঠা শিমুল গাছটায় চাইলে চোখ যেন আর ফেরানো যায় না। যখন এ সব দৃশ্য দেখি, তখন অনর্থক অর্থব্যয় করে দেশভ্রমণ করতে প্রবৃত্তি হয় না। এর চেয়ে ভাল কোন দেশ আছে! এত বিচিত্র বনশোভা কি ট্রপিক্যাল আফ্রিকার? একটা প্যাপড়ি ফাটা শিমুল গাছের কি শোভা হয়েচে। প্যাপড়ি ফেটে তুলো বেরিয়ে আছে আঁকাবাঁকা গাছের ডালে ডালে। নদীর জলে মাঝে মাঝে কচ্ছপ ভেসে উঠে, মুখ বার করে 'ভু-উ-উস্' শব্দে নিশ্বাস নিচ্চে।

আজ অনেকদিন পরে জালিপাড়ার সেই বায়োস্কোপওয়ালা সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দু-চারজন আছে বাল্য জীবনের আলাপী, তাদের সঙ্গে যখন পথে ঘাটে এইভাবে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়, তখন বড়ই আনন্দ হয়। একজন আমাদের 'আচার্য্যি-দা', একজন হচ্চে চালকীর শশিবাবুর বাড়ি থেকে ফিরে যাচ্ছিল মোল্লাহাটীতে আম কিনতে সেই যে ছোকরা, যাকে আমি ও ছোটমামা আমাদের বাড়ি ডেকে নিয়ে গিয়ে খাইয়েছিলুম, আর একজন হচ্চে পেরুর কনসাল ডন মটয়াস্কি, যাকে পায়েস খাইয়েছিলুম, বনগাঁয়ের বাসা থেকে তৈরি করে। এই বছরটাতে কি যোগ আছে জানি নে, যত সব পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল আবার—যেমন ধরি মণিকুন্তলাদের সঙ্গে, এই বছরই বিশেষ করে আবার যোগ পুনঃস্থাপিত হয়েচে রাজপুরের অন্নপূর্ণাদের সঙ্গে, রমাপ্রসন্নদের সঙ্গে, সুরেনদের সঙ্গে। মিনুও সেদিন আমার কথা গ্রামে এসে বলেছিল বুড়োর কাছে, বুড়ো বল্লে, সেদিন রাত্রের ট্রেনে

বনগাঁ থেকে আসবার সময়ে। এই বছরেই কতকাল পরে দেখা হয়ে গেল রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে—সেদিন রাণাঘাট স্টেশনে। আর্চ্চারদার সঙ্গে রাণাঘাট মেডিকেল মিশনে, চড়কের দিন দেখা হোল। উমার সঙ্গেও বারাকপুরে প'চিশ-ছাব্বিশ বছর পরে। এই বছরেই ডাঃ পি. সি. রায়েদের আড্ডাতে আবার যাচ্চি ১৯১৪ সালের ছাত্র-জীবনের মত। এই বছরেই বনগাঁয়ে মিনুদের বাসায় গিয়ে রোজ গান শুনি, সেখানে ১৯১৮ সালের পরে আর কোনদিন পদার্পণ করি নি। আবার এই গত গ্রীষ্মাবসানেই বাগান গাঁয়ে রাখালী পিসীমার বাড়ি গিয়েছিলুম, তের বছর পরে। এই বছরেই এই সেদিন কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের সেই ডিসপেনসারি ঘরটাতে গিয়ে গিরিজাপ্রসন্নবাবুর সঙ্গে কথা বলে এলুম—যেখানে আমার ন-বছর বয়সের শৈশবে শেষ বার গিয়েছিলুম। এ সবের চেয়েও বড় ও আমার কাছে সকলের চেয়ে মধুর—এই বছরেই এই সেদিন শনিবার গিয়ে পানিতরে সেই ওপরের ঘরটাতে রাত্রিযাপন করলুম বহুকাল পরে, আমার বিয়ের পরে যে ঘরটাতে আমি ও গৌরী থাকতুম। ওদের সঙ্গেও আবার একটা যোগ স্থাপিত হয়েচে এই বছরেই; জীবনে কখনোও যে আবার যাব তার আশা ছিল না। শ্বশুরবাড়িতে ওদের বাড়িটার পিছনে কি আছে জানতুম না—তা এবার জেনেচি। বহুকাল পরে মুরাতিপুরে মামার বাড়ির ওপরের ও নিচের ঘরে এবার দোলের সময় আবার রাত্রি কাটিয়ে এসেচি। আন্নির সঙ্গে দেখা হয়েচে এবছরে, দিদির সঙ্গে দেখা হয়েচে তাও এবছরে।

অপূর্ব ১৩৪২ সাল কেটে গেল আমার পক্ষে। পুরোনো বন্ধুদের হারাতে চাই নে, বড় কষ্ট হয়। যে যেখানে আছে, যাদের কতভাবে, কতরূপে পেয়েচি—সব ভাল থাকুক, মাঝে মাঝে তাদের যেন দেখতে পাই।

ওঃ সেই বায়োস্কোপওয়ালা সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে কি আনন্দই পেয়েছিলুম আজ বিকেলে। ভাল কথা—লিখতে ভুল হয়ে গিয়েচে, এই কালই বিকেলে ভাগলপুরের যতীন বাবুর মেয়ে সত্যপ্রিয়ার সংবাদ পেয়েচি।

কেবল দুটি কষ্ট মনে রয়েচে—ঊষার সঙ্গে দেখা হয় নি বহুকাল—ভাবচি গরমের ছুটিতে, কি পুজোর ছুটিতে একবার এলাহাবাদে যাব। আবার একদিন রাজপুরের বিন্দুদের শ্বশুরবাড়িতে গেলুম রাধানাথ মল্লিকের লেনে। বিন্দু বড় ভাল মেয়ে, ভারি আদরযত্ন করলে। একে ছোট অবস্থায় দেখেছিলুম—আবার দেখলুম এই বছরই প্রথম। আবার বড়মামার ছেলে গুলুকে আজ আট বছর পরে এই বছরই দেখলুম। কত বছর পরে কুসুমের সঙ্গেও দেখা হয় গত ২৫ই মে। রেণুদের বাড়ি আর একদিন গিয়েছিলুম। ওরা ছেলেমানুষ, ভূতের গল্প শুনে খুব খুশি। আমায় আবার একটা লেবেঞ্চুষের কৌটা উপহার দিলে রেণু। বললে, আপনি আমাদের মত ছেলেমানুষ, তাই এটা দিলাম আপনাকে। ওরা কাল রবিবারে চাটগাঁ চলে গেল, আমি সকালে তুলে দিতে গেছলুম, ওরা ঠিকানা দিয়ে চিঠি দিতে বললে। রেণুর তো কথাই নেই, সে জেতনকে বললে, আপনাকে ধন্যবাদ যে আপনি এ'র সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন।

রেণুর পত্র পেয়েচি। সে গিয়েই পত্র লিখেচে, আর তাতে লিখেচে, 'আসুন শীগগির একবার চাটগাঁয়ে।' আমি আর একদিন রাজপুরে গিয়েছিলাম। যদুনাথ ও খুকী বলছিল, রেণু আর একদিন ওখানে গিয়েছিল বেড়াতে, সেদিন আমি ছিলাম না তাই শুধুই আমার নাম করেচে।···ওইখানে বাবা শুয়েছিলেন, এখানে বসে বাবার সঙ্গে কত গল্প করেছিলুম··· শুধু এই সব কথাই হয়েচে। সেদিন রাজপুর থেকে ফিরবার পথে জ্যোৎস্নালোকিত প্ল্যাটফর্মে বসে বসে কেবল এই সব ভেবেচি।

আজ একটি অদ্ভুত তালজাতীয় গাছের কথা পড়লুম, নাম Microzeminar Plum। অস্ট্রেলিয়ার Tambourine mountain-এ বিস্তর রয়েচে। এই গাছ নাকি বহুকাল বাঁচে। সেখানে পনেরো হাজার বছর একটা গাছ বেঁচে ছিল, সেটা দুশো ফুট উঁচু হয়। Prof. Chamberlain সেখানে অত উঁচু গাছ দেখে খুব উৎসাহিত হয়ে গিয়েছিলেন। পনেরো হাজার বছর বয়সী প্রাচীন গাছটা কে সেদিন কেটে ফেলে দিয়েচে, তাই নিয়ে অস্ট্রেলিয়াতে হৈ হৈ পড়ে গিয়েচে, ব্রিসবেনের টেলিগ্রামে প্রকাশ (রয়টার, ৮ই মে, ১৯৩৫, অমৃত বাজার পত্রিকাতে পড়লুম) বাকী গাছ যা সব আছে, তার মধ্যে একটার বয়েস এগারো হাজার বছর, বাকীগুলি তিন-চার হাজার বছরের শিশু।

কাল স্কুলের ছুটি হবে। আজ ছেলেরা খুব খাওয়ালে। আমি নানা জায়গায় ঘুরে টরুকে সঙ্গে নিয়ে রমাপ্রসন্নদের বাড়ি গেলুম। কুসুমের সন্ধান করে তার ঠিকানা পেলুম। টরুকে সঙ্গে নিয়ে তেত্রিশ বছর পরে গিয়ে কুসুমের সঙ্গে দেখা করলুম। আমার ন-বছর বয়সে কুসুম আমায় কত গল্প বলত। এখন তার বয়স ষাট-এর কম নয়—গরীব, লোকের বাড়ির ঝি। সে চেহারাই আর নেই। ওর সে চেহারা আমার মনে আছে। মানুষের চেহারার কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন হয়।

তপুর সঙ্গে সেদিন দেখা হয়েচে, আজ দিন তিনেক আগে। তাকে দেখেছিলুম ছ-বছরের ছেলে—এখন তার বয়েস তের-চৌদ্দ বছর। এ বছরটিতে পুরোনো আলাপী লোকের সঙ্গে দেখা হচ্চে।

আজ এ বছর গ্রীষ্মের ছুটির প্রথম দিন এখানকার। বাড়িতে কেউ নেই, পাড়া নির্জ্জন। একমাত্র পাঁচী ও ন-দিদি আছে। বকুলতলায় দুপুরে অনেকক্ষণ বসে Valia গল্পটি পড়ছিলুম। একটা দাঁড়াশ সাপ সুপুদের নারকেল গাছটাতে উঠে পাখীর বাসায় পাখীর ছানা খুঁজচে। আর পাখীগুলো তাকে ঠুকরে কি বিরক্তই করচে। গঙ্গাহরি, তুলসী, হাজু সবাই আমার কাছে এল। দুপুরের পরে একটু ঘুমিয়েচি, নির্জ্জন মেঘমেদুর অপরাহ্ণ, বাঁশবনের দিকে গরু চরচে, মেজ খুড়ীমার বাড়ির দিক থেকে মেজ খুড়ীমার গলার সুর পাওয়া যাচ্চে। বাবার একটা শ্লোকের খানিকটা মনে এল ঘুমের ঘোরে। এত স্পষ্ট মনে এল যেন বাবার সঙ্গে বসে আমি কবিতা আবৃত্তি করচি বাল্যদিনের মত। কথাটি এই —'নীচৈস্ববিভরুচিঃ' এই টুকরোটুকু যেন উদ্ভট শ্লোকে ছেলেবেলায় পড়েছিলুম। আমাদের ভিটের পিছনের বাঁশবাগানে গেলুম বেড়াতে ও আমগাছের ফল গুনতে। ওখান থেকে বেলেডাঙার মাঠ। কুঠীর মাঠের বাড়ির দু-ধারে বন কেটে উড়িয়ে দিয়েচে—সেই লতাবিতান সেই ঝোপ-ঝাপ এবার কোথায় উড়ে গিয়েচে। দেশময়ই দেখচি এই অবজ্ঞা। বেলেডাঙ্গার পথের ধারে একটা কামারের দোকানে দশ-বারো জন লোক বসে আছে—তার মধ্যে বিরাশি বছরের সেই হরমোতীও বসে আছে। বহু বছর আগের মোল্লাহাটী কুঠীর সাহেবদের গল্প সে করলে। পুলের ওপারে গিয়ে দাঁড়ালুম—এক ফকির সেখানে গোয়ালপাড়ায় একটা মেয়ের সঙ্গে বসে গল্প করচে। আমায় আবার সে ভক্তি করে একটা বিড়ি খাওয়ালে। আমি তাকে একটা পয়সা দিলাম। হরমোতী এসে বললে—'বাবু, দুকখের কথা বলব কি, আমার ছেলেডা বলে, তোমাকে আর ভাত দেব না। বিরাশি বছর বয়স আমার, কোথায় এখন যাই আমি এই বেন্ধ বয়সে ?'

সন্ধ্যাবেলা ন-দির সঙ্গে রেণুর গল্প করি। রাত্রে এখন ঢোল বাজচে, জিতেন কামারের বাড়ি নাকি মনসার ভাসান হচ্ছে। একবার ভাবচি যাই, কিন্তু বাড়িতে আমি একা, তার ওপর

আজ অমাবস্যার রাত—জিনিসটা-পত্রটা আছে, ফেলে রেখে ভরসা করে যেতে পারচি নে।

রোয়াকে বসে লিখচি ভারী আরামে, বকুলগাছে, কুলগাছে কত কি পাখী ডাকচে—বিল্বপুষ্পের মধুর গন্ধ ভেসে আসচে বাতাসে—দুটো বিড়ালছানা আমার মাদুরের ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করচে, সামনের রাস্তা দিয়ে ছেলেরা আম পাড়তে যাচ্চে, জেলেরা মাছ নিয়ে যাচ্চে। একবার পটল যাচ্ছিল, আমি ডেকে বললুম—ও পটল, উমা চলে গিয়েচে? পটল বড় লাজুক মেয়ে। পেয়ারাতলা পর্য্যন্ত এসে নিচুমুখে দাঁড়িয়ে বললে—দিদি ২৭শে জ্যৈষ্ঠ চলে গিয়েচে, দাদা।

ছেলেবেলার সেই বুড়ো আকন্দ গাছটায় থোলো-থোলো ফুল ফুটেচে। পাখীর ডাক আর পুষ্পের সুবাসে স্থানটা মাতিয়ে রেখেচে।

বিকেলে হাটে গেলাম। এ বছর গ্রীষ্মের ছুটির প্রথম হাট। পথেই আফজলের সঙ্গে দেখা, সে হাটে পটল বেচতে যাচ্চে। তুঁততলার স্কুলের ভিটে দেখিয়ে বললে—দা-ঠাকুর, এখেনে মোরা পড়িচি, কত আনন্দই করিচি এখেনে, মনে আছে?

তা আছে। তুঁততলার স্কুলের কথায় হাঁড়ি-বেচা মাস্টারের কথা উঠল, আর কে কে আমাদের সঙ্গে পড়তো, সে কথাও উঠল।

অনেকদিন পরে গোপালনগরের হাটে গিয়েচি। সেই আশ্বিন মাসের পুজোর ছুটির পর আর আসি নি। সবাই ডাকে, সবাই বসতে বলে। মহেন্দ্র সেকরার দোকান থেকে আরম্ভ করে সব্জির গোলা পর্য্যন্ত। হাটে কত ঘরামী ও চাষী জিজ্ঞেস করে—কবে এলেন বাবু?

ওদের সকলকে যে কত ভালবাসি, কত ভালবাসি ওদের ওই সরল আত্মীয়তাটুকু, ওদের মুখের মিষ্টি আলাপ। যুগল বৈষ্ণব এসে আমার ছেলেবেলার গল্প করলে, আশু ঠাকুর এসে আমায় অনুযোগ করতে বসলো, আমি বিয়ে করচি না কেন এই বলে। ব্রজেন মাস্টার নতুন লাইব্রেরী দেখাতে নিয়ে গেল, মনু রায় তার বিড়ির দোকানে ডেকে নিয়ে বসিয়ে বিড়ি খাওয়ালে, যুগল ময়রা নতুন তৈরী দোকান ঘরে বসিয়ে তামাক সেজে দিলে—এদের যত্ন—আত্মীয়তার ঋণ কখনো শুধতে পারবো না। গৌর কলুর দোকানে চা কিনতে গেলাম, সে আর আমায় কিছুতেই ছাড়তে চায় না। সেও আমার এক সহপাঠী, ওই তুঁততলার স্কুলে ১৩১০-১১ সালে তার সঙ্গেও পড়েচি। সে সেই কথা ওঠালে, আবার একবার হিসেব হোল কে কে আমাদের সঙ্গে পড়তো। একবছর পরে দেশে যখন আসি, সবাই আমায় পেয়ে আবার সেই পুরানো কথাগুলো ঝালিয়ে নেয়।

এ বছরটা কলকাতায় বড় কর্ম্মব্যস্ত জীবন কাটিয়েচি। এই একটা মাস এদের সরল সাহচর্য্য, সুপ্রচুর গাছপালার সান্নিধ্য, নদী, মাঠ বনের রূপবিলাস আমার সমস্ত ক্লান্তি, সমস্ত অবসাদ জুড়িয়ে দেয়। গত দেড় মাস রোজ রাত সাড়ে তিনটার সময় উঠে ইলেকট্রিক লাইট জেলে খাতা দেখতে বসেচি, সেই কাজ শুরু করেচি আর রাত বারোটা পর্য্যন্ত চলেচে নানা কাজ, চাকরি, লেখা, পার্টি, টাকার তাগাদা, বক্তৃতা করা ও শোনা, বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ি দেখা করতে যাওয়া, আমার এখানে যাঁরা আসেন তাঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা—সমানে চলেচে। এদিকে শুয়েচি রাত সাড়ে বারোটা—আবার ওদিকে উঠেচি রাত সাড়ে তিনটাতে। এখানে এসে বেঁচেছি একটু মন ছড়িয়ে বিশ্রাম করে।

হাট থেকে এসে নদীর ধারের মাঠে বেড়াতে গিয়ে এই কথাই ভাবছিলুম। ঝির-ঝির করচে হাওয়া, সোঁদালি ফুল ফুটেচে নদীর ধারে। কোকিল ডাকচে—বেলা পড়ে গিয়েচে একেবারে—কি সুন্দর যে লাগছিল। আর উঠতে ইচ্ছে যায় না নদীর ধার থেকে, কি অদ্ভুত শান্তি!

এখন বসে লিখচি, অনেক রাত হয়েচে। বাঁশজঙ্গলের মাথায় বিশাল বৃশ্চিক রাশি অর্দ্ধেক আকাশ জুড়ে জ্বল্‌জ্বল্‌ করচে। অনেক দূরে একটা কি পাখী একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে একঘেয়ে কুস্বর করে ডাকচে। নায়েব-বাড়ির দিকে একপাল কুকুর অকারণে ঘেউ ঘেউ করচে।

আজ সকালে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর গেলুম সকালের গাড়িতে। অনেক জায়গায় গেলুম, কারণ বাবার সঙ্গে সেই ছেলেবেলায় একবার গিয়েছিলুম, আজ সাতাশ বছর আগে। আবার সেই রাজবাড়ির ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হোল জীবনের যে সব স্মরণীয় ঘটনা ঘটেচে এর পরে। সেই ব্রাহ্মসমাজ, A. V. School, সেই লীলাদিদিদের বাড়ি। লীলাদির সঙ্গে দেখা হোল না।

বিকেলে আজ সইমাদের বাড়ি বেড়াতে গেলাম। বীণাকে দেখলুম অনেকদিন পরে, সে এত মোটা হয়েচে যে তাকে আর চিনতে পারা যায় না। তার দুটি সতীনঝিও এসেচে, ছেলেমানুষ—কিন্তু একজন আবার ওদের মধ্যে বিধবা। আমাদের দেশে বিধবা হবার যে কি কষ্ট তা অন্নপূর্ণার মুখে, ধীরেনের খুড়তুত বোনের গল্প শুনে বুঝতে পারি।

তারপর গেলুম কুঠীর মাঠে বেড়াতে। যেতে যেতে দেখি নদীর ধারে মাধবপুরের চরের গাছপালার গায়ে মেঘে চাপা হলুদে রোদ পড়েচে—তার নিছক সৌন্দর্য্য আমায় মুগ্ধ, অভিভূত করলে। বেলা সাড়ে ছ-টা হবে, সন্ধ্যার দেরি নেই, সেই শান্ত গ্রীষ্মের অপরাহ্নে উষ্ণমণ্ডলের বনপ্রকৃতি, সূর্য্য, আকাশ, নদী, মাঠ, তার সমস্ত ইন্দ্রজাল, সমস্ত রূপ-বিভব আমার চোখের সামনে মেলে ধরেচে। শুধু শিমুল গাছের ডালগুলোর আঁকা-বাঁকা সৌন্দর্য্যময় রূপ, মেঘপর্ব্বতের পাশ দিয়ে বলাকা সারির ভেসে যাওয়া, শুধুই বনফুলের দেবলোকের দুলুনি, আর বন্যপাখীর গান। কতবার দেখেচি, আজ বত্রিশ বছর ধরে দেখে আসচি। কিন্তু এরা কখনো পুরোনো হোল না আমার কাছে। কখনো যেন হয়ও না, এই প্রার্থনা করি, এদের আসন যেন মৃত্যুঞ্জয় হয় আমার জীবনে।

অতি ভয়ানক দুর্য্যোগ, ভয়ানক বর্ষা। আজ ক-দিন চলেচে এমন। খানা ডোবা সব ভর্ত্তি, জলে থৈ থৈ করচে। এমন ভয়ানক বর্ষা জ্যৈষ্ঠমাসে দেখেছিলুম কেবল সেইবার, যেবার কলকাতা থেকে আবার ফিরে এলুম বেলাদের তত্ত্ব নিয়ে, যেবার খুকুর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়, ১৯৩২ সালে। তারপর কত পরিবর্ত্তনই না হয়ে গেল জীবনে! ১৯৩২ সালের সেই সময়ের এবং ১৯৩৬ সালের এই আমিতে বহু তফাত হয়ে গিয়েচে।

বিলবিলের ডোবাতে ব্যাঙ্‌ ডাক্‌চে। বুধো, কেতো এরা এই ভয়ানক দুর্য্যোগ অগ্রাহ্য করে ভিজতে ভিজতে আম কুড়িয়ে বেড়াচ্চে। সাবি ওদের বাড়ি থেকে বিড়ি নিয়ে এল আমার জন্যে, কারণ ওবেলা ওর ভাইকে বলেছিলুম এনে দিতে। মনোর মা আবার দুটো কলমের আম এনেছিল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করলে। আমি পাঁচীর বাড়ি গেলুম মাংসের ভাগ নিতে, কারণ ওখানে পাঁঠা কাটা হয়েচে সকালে। পাঁচী চা করে দিলে, শম্ভুর অসুখের জন্যে অনেক দুঃখ করলে।

সবাই ওকে ঘৃণা করে আমাদের গাঁয়ে। কিন্তু আমি দেখি ও ঘৃণার পাত্রী নয়, অনুকম্পার পাত্রী। বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছিল, তখন ওর বয়েস ছিল মোটে তের বছর—কি বা বুঝত বিয়ের? সে স্বামী মারা গেল, তখন ওর বয়েস বছর পনেরো। ওদের ওই গরীব সংসার, ভাইগুলো অপদার্থ, কেউ এক পয়সা রোজগার করে না। ভাইয়ের ছেলেমেয়েগুলো একবেলা খায়, একবেলা খায় না। ওদের এই দুঃখ ঘুচোতে ও এই কাজ

করেচে কিনা তাই বা কে জানে? কারণ হরিপদ দাদার টাকা আছে সবাই জানে। ও আজ কাঁদতে কাঁদতে সে কথার কিছু আভাস দিলে। এই ব্যাপারের পর ওর সঙ্গে এই প্রথম আমি দেখা করলাম,—যতটা খারাপ লোকে ওকে মনে করে, আমি ততটা ভাবতে পারলাম না। তবে একটা কথা ঠিকই যে, সমাজের পক্ষে এই আদর্শটা বড় খারাপ। গ্রামের বাইরে গিয়ে যা খুশি কর বাপু, গ্রামের মধ্যে কেন? গৃহধর্মের আদর্শ ক্ষুন্ন করে লাভ কি?

আবার সজোরে বৃষ্টি এল।

তারপর বেলা পাঁচটা থেকে ভীষণ ঝড় উপস্থিত হোল। গাছপালায় বেধে ক্রমবর্ধমান ঝটিকার সে কি ভীষণ শব্দ! আমি ভাবলাম যে রকম কাণ্ড, একটা সাইক্লোন না হয়ে আর যায় না। ঠিক সেই রকমই দেখাতে লাগল বটে। সন্ধ্যার আগে এমন ভয়ানক বাড়ল যে আমি আর ঘরে থাকতে না পেরে বাঁশবাগানের পথ দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম নদীর দিকে। দেখব ঝড়ের দৃশ্যটা। আমাদের বাড়ি যেতে বড় একটা বাঁশ পড়েচে—পাড়ার শ্যামাচরণ দাদাদের বাগানেও বড় বাঁশ পড়েচে। গাছপালা, বাঁশবনে ঝড়ের কি শব্দ—আর সে কি দৃশ্য! প্রত্যেক গাছতলায় আম পড়ে তলা বিছিয়ে আছে ঠিক যেন পিটুলি ফলের মত, কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারে আর এই ভয়ানক দুর্যোগ মাথায় জনপ্রাণী বাড়ির বার হয় নি। আমি যা পারলাম কুড়িয়ে নিলাম, কিন্তু কোন পাত্র সঙ্গে আনি নি, আম রাখি কিসে? মাঠের মধ্যে নদীর ধারে গিয়ে আর অগ্রসর হতে পারি নে। যে-দিকে যাব, সে-দিক থেকেই ঝড় উড়িয়ে আনছে বৃষ্টির ধারা, ঠিক যেন বন্দুকের ছররার বেগে। ধোঁয়ার মত বৃষ্টির ঢেউ উড়ে চলেচে। গাছপালা মাটিতে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়েচে। ঝড়ের শব্দে কান পাতা যায় না। সে দৃশ্য আমাকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করল। অনেকদিন প্রকৃতির এ রূপে দেখি নি, কেবল শান্ত সুন্দর রূপই দেখে আসচি।

তারপর মনে হোল আমিই বা কম কি? এই ঝড়ের বেগ আমার নিজের মধ্যে আছে। আমি একদিন উড়ে যাব মুক্তপক্ষে ওই বিদ্যুৎগর্ভ মেঘপুঞ্জের পাশ দিয়ে, ওই বিষম ঝটিকা ঝঞ্ঝাকে তুচ্ছ করে ওদের চেয়েও বহু গুণ বেগে। আমি সামান্য হয়ে আছি—তাই সামান্য। এই কথাটা যখন ভাবি, তখন আমার মধ্যে যেন কেমন একটা নতুন শক্তির আবির্ভাব হয়। সে শক্তি কিন্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না, সেদিন সেখানেই শেষ।

কাল সুপ্রভার চিঠিখানা ডাকে ফেলে দিয়ে আজ সকালে বাগান-গাঁয়ে পিসিমার বাড়ি যাব বলে বেরিয়ে পড়েচি। আজ দিনটা সকাল থেকে মেঘ ও বৃষ্টি, পথ হাঁটার পক্ষে উপযুক্ত দিন, রোদ নেই, অথচ বৃষ্টি খুব বেশীও হচ্চে না। ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া বইচে মাঝে মাঝে। কুঠীর মাঠে আসতেই আমাদের ঘাটের পথে শুয়োখালী আমগাছে অনেক-গুলো আম পড়ল টুবটাব করে। গোটাকতক আম কুড়িয়ে পথের ধারে বসেই খেলাম। কারণ যেতে হবে প্রায় তের চোদ্দ মাইল পথ, কখন গিয়ে পৌঁছুব তার নেই ঠিকানা। কুঠীর মাঠ দিয়ে, বৃষ্টিধোয়া বনঝোপের মধ্যে দিয়ে আসতে আসতে কি আনন্দই পেলাম। পথ হাঁটতে আমার বড় আনন্দ। এই যে বাড়ি থেকে বেরিয়েচি, পথে পথে অনির্দিষ্ট গন্তব্য স্থানের উদ্দেশ্যে চলেচি, এতেই আমার আনন্দ। কাঁচি-কাটার পুল পার হয়ে একটা লতা-ঝোপওয়ালা সুন্দর বাবলা গাছ ভেঙে পড়েচে রাস্তার ওপরে, এ রকম সুন্দর গাছ ভাঙলে আমার বড় কষ্ট হয়। বড় বড় বট অশত্থ গাছের ঘন ছায়া, পথের দু-ধারে বুনো খেজুর গাছে কাঁদি কাঁদি স্বর্ণবর্ণ খেজুর দুলচে, 'বউ-কথা-কও' পাখী ডাকচে—বাংলা দেশের রূপ যদি কেউ দেখতে চায়, তবে এই সব গ্রাম্য পথে যেন প্রথম বর্ষার দিনে পায়ে হেঁটে বহুদূরে গ্রামের উদ্দেশ্যে যায়, তবেই সে বাংলাকে চিনবে, পাখী আর বনসম্পদ, তার

পুষ্পরাঞ্জি, তার মেয়েদের দেখবে, চিনবে, ভালও বাসবে। আমি এই নেশাতেই প্রতি বৎসর এই সময় বেরিয়ে পড়ি।

বাগানগাঁয়ের পথে বড় একটা বট গাছের তলায় বসে লিখচি। চারি ধারে মাঠ, বৃষ্টি পড়চে ঝর ঝর করে, বেলা কত হয়েচে মেঘে আন্দাজ করা যায় না, জোলো হাওয়ায় আউশের ভুঁই থেকে ধানের কচি জাওলার মৃদু সুগন্ধ ভেসে আসচে, বট গাছের ডালে কত কি পাখী ডাকচে, মাঠের মধ্যে অসংখ্য খেজুর গাছ। চাষারা ক্ষেতে নিড়েন দিচ্চে, তামাক খাচ্চে, নীল মেঘের কোলে বক উড়চে।

কাঁচিকাটা পুল পার হয়ে খানিকটা এসেই একটা লোকের সঙ্গে আলাপ হোল। তার বয়েস ষাট-বাষট্টি হবে, রঙটা বেজায় কালো, হাতে একটা পোঁটলা, কাঁধে ছাতি। আমি বললুম—কোথায় যাবে হে? সে বললে—আজ্ঞে দাদাবাবু, ষাঁড়াপোতা ঠাকুরতলা যাব। বাড়ি শান্তিপুর গোঁসাইপাড়া।

লোকটা বললে—একটা বিড়ি খান দাদাবাবু।

বেশ লোকটা। ও রকম লোক আমার ভাল লাগে। সহজ সরল মানুষ, এমন সব কথা বলে যা আমি সাধারণতঃ শুনি নে।

সুন্দরপুরে আসতে প্রমথ ঘোষ সাইকেল চেপে কোথায় যাচ্চে দেখলুম। আমি আর আমার সঙ্গী দু-জনে মোল্লাহাটির খেয়াঘাটে পার হই। সুন্দর মেঘাচ্ছন্ন সকাল বেলা নদীজল শান্ত, ওখানে সবুজ কষাড় বন। খেয়া পার হয়ে কেউটে পাড়া, মড়িঘাটা ছাড়িয়ে আমরা গোবরাপুর এলুম। আর বছর বাজারের যে দোকানে তামাক খেয়েছিলাম, সেখানে আমরা তামাক খাবার জন্যে বসতে গিয়ে দেখি গোবরাপুরের জজ্‌বাবুর সেজছেলে মল্লিনাথ বসে আছে। সে আমাকে দেখে টানাটানি করতে লাগল তাদের বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে। অন্ততঃ চা খেয়েও যেন যাই। তার দাদা রামকৃষ্ণ-মিশনের সন্ন্যাসী, অনেকদিন পরে বাড়ি এসেচেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই হবে। তিনি নাকি আমার বই-এর খুব অনুরাগী ইত্যাদি বলে বাড়ি নিয়ে গেল। আমার সঙ্গীকেও সে নিমন্ত্রণ করলে। ওদের মস্ত বড় বাড়ি, আর কত যে ছেলে মেয়ে! সব ভাইগুলি বড় চাকরি করে বিদেশে, এবার বাড়িতে ওদের সন্ন্যাসী ভাই এসে রামকৃষ্ণ-উৎসব করচেন সেই উপলক্ষে সবাই এসেচে। ওপরের ঘরে মেয়েরা গান গাইচে, বাইরের বৈঠকখানায় ছেলেরা তাস খেলচে—হৈ হৈ কাণ্ড। আমরা চা খাবার খেয়ে ভদ্রতা বজায় রাখার উপযুক্ত একটু গল্পগুজব করে তখনি আবার পথে বার হলুম। পথে বার হয়ে কোথাও একদণ্ড থাকতে আমার ভাল লাগে না। আমার সঙ্গীটি যাবে পাশেরই গ্রামে তার জামাই-বাড়িতে। ওরা আচার্য্যি বামুন, এতক্ষণ নিজের মেয়ের ভাসুরের কথা বলতে বলতে আসছিল। সেই ব্যক্তিটি ঘরে খুব সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে ছেলে না হওয়ার অজুহাতে, আজ দু-মাস হোল পুনরায় দ্বিতীয় বার দার-পরিগ্রহ করেচে। সেই গল্প সে আমাকে নানাভাবে শোনাচ্ছিল। হঠাৎ জজ্‌ বাবুদের বাড়ি থেকে বেরিয়েই সে আমার ওপর অত্যন্ত ভক্তিমান হয়ে উঠল। জজ্‌ বাবুদের বাড়িতে আমার আদর-যত্ন দেখেই বোধ হয় ওর মনের ভাবের এ পরিবর্ত্তনটুকু হোল। বললে, দাদাবাবু, আপনাকে এতক্ষণ চিনতে তো পারি নি। আপনি মাথা থেকে বের করে এমন একখানা বই লিখেচেন যার অত বড় দামী দামী লোকে এত সুখ্যাতি করলেন, তখন তো আপনি সাধারণ মানুষ নন।

সম্ভ্রমে ও শ্রদ্ধায় তার সুর গদ্‌গদ্‌ হবে উঠেচে, তারপর বললে, তবে বাবু যদি অনুমতি করেন, আমিও নিজের পরিচয়টা দিই। এতক্ষণ দিই নি, কারণ বিদেশে, পথঘাটে, নিজের পরিচয় না দেওয়াই ভাল। দিয়ে কি হবে? আমার নাম নদে শান্তিপুর থেকে আরম্ভ করে

কলকাতা পর্যন্ত সবাই জানে, আপনার শ্রীগুরুর চরণকৃপায়, হেঁ হেঁ। কৌতূহলের সহিত ওর মুখের দিকে চাইলুম। কোন ছদ্মবেশী মহাপুরুষের সঙ্গে এতক্ষণ আমার ভ্রমণ করবার সৌভাগ্য ঘটেচে না জানি।

লোকটা বললে—আমার নাম, দাদাবাবু, হাজারী পরটা।

আমি অবাক হয়ে বললুম—হাজারী—?

—আজ্ঞে, হাজারী পরটা।

—হাজারী পরটা?

—আজ্ঞে, সেই আমিই এই অধীন।

বলে সে আমার মুখের ভাব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করবার জন্যে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। বোধ হয় আমার বিস্ময়কে পূর্ণ বিকাশের সময় দেওয়ার জন্যে। কিন্তু আমি তখনও সেই অবাক ভাবে চেয়ে আছি দেখে বললে, দাদাবাবু, যদিও আমরা ভট্টাচার্য্যি কিন্তু আমার উপাধি পরটা। মানে এমন পরটা আর কেউ তৈরি করতে পারতো না নদে-শান্তিপুরের মধ্যে। পাঁচ সের ওজনের একখানা খাস্তা পরটা—যেখানে ধরুন খসে আসবে। আমার দোকান ছিল গ্রাম চাঁদপাড়ায়, দৈনিক দশ-বারো টাকা বিক্রি, পরটা, লুচি, আলুর দম, ডিম, মাংস। আমার দোকানে যে একবার খেয়েচে দাদাবাবু, সে আপনাদের বাপ-মার আশীর্ব্বাদে কখনো ভুলতো না। কলকাতা পর্যন্ত আমার নাম-ডাক। খাঁদা মিত্তিরের বাড়ি রশুই করেচি এক হাতা-বেড়ীতে পাঁচ বছর।

তার গল্প তখনও ভাল করে শেষ হয় নি, একজন ডেকে বললে,—এই যে, বেয়াই মশাই যে! আসুন আসুন, কি সৌভাগ্য আমার। নমস্কার, নমস্কার।

হাজারী পরটা স্মিতহাস্যে বললে—নমস্কার। তা আপনারা তো খোঁজ করবেন না, মেয়েটা আছে পড়ে, বলি এই একবার—আচ্ছা দাদাবাবু, আসুন একটু পায়ের ধুলো নিই।

বলেই লোকটা ঝুঁকে পড়ে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে বসলো। তারপর তার বেয়াই-এর দিকে চেয়ে বললে—দাদাবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েই বুঝেচি উনি মহৎ লোক। ওঁর সঙ্গে জজ্ বাবুর বাড়িতে গিয়ে খাসা আম, উৎকৃষ্ট সন্দেশ, চা কত কি খেলাম। কি আদর সেখানে ওঁর। শুনেই তার বেয়াই আমায় বিনীত ভাবে অনুরোধ করতে লাগলো, সেখানে দুপুরে থাকবার জন্যে। ভাবলে, জজ্ বাবুরা যখন খাতির করেচে, তখন আমিই বা কোন্ ডেপুটি কি অন্ততঃ পক্ষে একজন পুলিসের দারোগা না হব? আমি আমার অক্ষমতা জানিয়ে বিদায় নিলাম। তারা সকলে যতক্ষণ আমাকে দেখতে পায়, আমার দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে চেয়ে রইল এবং আমার সম্বন্ধে কি সব কথা বলাবলি করতে লাগলো।

আমি বেরিয়ে এসে মাঠে পড়লুম। দু-ধারে আউশ ধানের ক্ষেত। একটা বৃহৎ জিউলি গাছের তলায় যখন পৌঁছেচি, তখন জোর বৃষ্টি আসাতে গাছের নিচে বসলুম। মাটি ভিজে গিয়েচে, আর প্রকাণ্ড ডালগুলোর সর্ব্বত্রই আঠার ঝুরি ঝুলচে—অথচ কাল সুপ্রভার চিঠি আঁটবার জন্যে বারাকপুরে একটু জিউলির আঠা খুঁজে পাই নি।

কি সুন্দর লাগছিল উন্মুক্ত মাঠের হাওয়া, দু-ধারে সবুজ ধানের ক্ষেত, বর্ষাস্নাত গাছপালায় ঝোপঝাড়। একটা প্রকাণ্ড বটগাছ মাঠের মধ্যে, তার তলায় অনেকক্ষণ বসে অপেক্ষা করলুম বৃষ্টি না থামা পর্য্যন্ত। ট্যাংরা সুন্দরপুর, কমলাপুর প্রভৃতি গ্রাম পার হয়ে একটা সুন্দর জলাশয়ের তীরে এক প্রকাণ্ড বট গাছের তলায় কলের গান হচ্চে দেখে সেখানে গেলাম। অনেক গ্রাম্য লোক জড় হয়েচে। গ্রামবধূরা ওপারের ঘাট থেকে গান শুনচে। জন-দুই পথ-চলতি লোক কলের গান নিয়ে যেতে যেতে এখানে বট গাছের তলায় শ্রান্তি দূর করবার জন্যে বসে কল বাজাচ্চে। আমিও গিয়ে দুটো রেকর্ড বাজাতে বললুম।

তারা আমায় খাতির করে বসালে, বিড়ি খেতে দিলে, রেকর্ডের বাক্স এগিয়ে দিয়ে বললে,—বলুন বাবু, কোন্ গান আপনার পছন্দ ।

সামনের জলাশয়টা শুনলাম জামুদার বাঁওড়ের আগড় । কি সুন্দর যে তার দৃশ্য সেই বটতলা থেকে ! বাঁওড় অর্থাৎ মজা নদী । তার ওপারে যতদূরে দৃষ্টি যায় বড় বড় নিবিড় বাঁশবন জলের ওপর ঝুঁকে পড়েচে—পদ্মফুল আর পদ্মপাতায় জল দেখা যায় না, আরও ওদিকে শেওলার দাম বেঁধে গিয়েচে । আমি গান শুনতে শুনতে সেই দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি । মনে একটা অপূর্ব্ব মুক্তির সুখ । বেলা সাড়ে দশটা কি এগারোটা,—কলকাতা হলে এতক্ষণ ছুটতে হোত স্কুলে । রুটিন বাঁধা জীবন স্বপ্ন বলে মনে হচ্চে এই সুদূর পল্লীগ্রামের পদ্মফুলে ভরা জলাশয়ের তীরে প্রাচীন বটতলায় বসে ।

পিসিমার বাড়ি বেলা একটার সময় এসে পেঁছে দেখি পিসিমা খেতে বসেচেন । আমিও স্নান করে এসে খেয়ে নিয়ে একটু বিশ্রাম করলুম । পিসিমার ঘরটাতে কেমন একটা পুরানো পুরানো গন্ধ পাওয়া যায় । ১৩০০ সালের পরে আর এঘরে নতুন পাঁজি আসে নি (১৩০০ সালে পিসেমহাশয় মারা গিয়েছিলেন) । সেকালের গন্ধে, সেকালের আবহাওয়ায় ঘরটা ভর্ত্তি । কড়ির আলনা, সেকালের কাঁথা, কড়ির চুবড়ি, কাঁঠাল কাঠের সিন্দুক, গড়ুর মূর্ত্তি বসানো পেতলের ঘন্টা, বেতের প্যাঁট্‌রা—যে সব জিনিস একালে কোনও বাড়িতে দেখা যায় না । একখানা কাশীদাসী মহাভারত আছে ১২৭৬ সালে ছাপা । অনেকক্ষণ ভয়ে ভয়ে সেই সব প্রাচীন দিনের বাতাসে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিলাম, কত পুরোনো দিনের কথা মনে হয়,···যেদিন মেনকা পিসিমা আমার বাল্যে বাবার ওপর রাগ করে এখানে চলে এসেছিলেন, বাবা এসে একবার কথকতা করেছিলেন ।

· বিকেলে হাটতলায় এক ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হোল । ডাক্তারটি অত্যন্ত দুরবস্থাগ্রস্ত । একটা বাঁশের মাচায় মলিন শয্যা, একখানা ভাঙা টেবিল, গোটা বিশ-পঁচিশ শিশি, অন্যদিকে আর একটা মাচাতে এক বস্তা তামাক । একটুখানি বসবার পরই তিনি নিজের দুঃখের কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন । আজ চার মাস থেকে এখানে এক পয়সা রোজগার নেই । হাটখোলার মুজিবর মিঞার দোকানে চালডাল ধার নিয়ে আজ চার পাঁচ মাস চলচে । এদিকে বাড়িতে মেয়ের বিয়ের দিন স্থির হয়েছিল চৌঠো জ্যৈষ্ঠ । টাকা যোগাড় না করতে পারায় বিয়ে ওদিনে হয় নি । তারপর বললেন—দেখুন এখানে একঘর বামুন আছে, বেশ বড় গাঁতিদার, তাদের বাড়ির এক বৌ আজ চার মাস শয্যাগত, তা মশায় একবার ডাকে না । বলে ডাক্তার-কবিরাজ দেখিয়ে কি হবে, আমরা ফকির দেখাচ্চি ।

হাটখোলার এক দোকানে এক মৌলবী সাহেব আমাদের ডাকাডাকি করলেন বলে গেলাম, —এখানকার মক্তবে তিনি নতুন মৌলবী হিসেবে এসেচেন । মাসে বারোটা টাকা পাবেন, হাটখোলাতে একটা মুসলমানদের দরগা ঘর আছে, সেখানেই আপাততঃ থাকবেন । তাঁর মুখে মধুবাবু সাব-ইনস্পেক্টরের গল্প শুনলাম । মধুবাবু আমাদের কালে, আমরা যে পাঠশালায় পড়তাম, সেখানে গিয়ে আমায় একবার 'গ্রন্থ' বানান জিজ্ঞেস করেছিলেন । সে ১৯০৫ সালের কথা হবে ।

সন্ধ্যার পরেই বৃষ্টি এল । আমি হাটখোলা থেকে চলে এলাম । রাতে একটা গোয়ালার ছেলে অনেক গল্পগুজব করলে ।

সকালে স্নান করে পিসিমার কাছে বিদায় নিয়ে পাটশিমুলে মোহিনী কাকার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে রওনা হোলাম । আজ খুব রোদ উঠবে, আকাশ নীল, সকালের হাওয়ায় বিলের জল আর ধানের জাওলার গন্ধ । হাটখোলার ডাক্তার বাবুর সঙ্গে দেখা করে মাঠের পথে হাঁটি । এদেশে যেখানে সেখানে আমগাছের তলায়, পিটুলি ফলের মত, দিব্যি বড় বড়

রাঙা রাঙা আম তলাবিছিয়ে পড়ে রয়েচে, কেউ কুড়োয় না দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। একজনকে জিজ্ঞেস করলুম—তোমাদের এখানে আম কুড়োয় না কেন? সে বললে—বাবু, এখানে এক পয়সা আমের পণ বিক্রি হয়—এত আম এখানে। কে কত খাবে! পাটশিমুলে ঢুকতেই একপাশে একটা বড় বন, একটা উঁচু শিমুল গাছ বনের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে—তার ডালে পাতা মুড়ে পিঁপড়ে বাসা বেঁধেছে। দৃশ্যটা দেখে আমার মনে হোল এই সব সত্যিকার বাংলার বনের দৃশ্য, ট্রপিক্যাল বনানীর দৃশ্য না দেখলে বাংলাকে চিনব কি করে? শহরের লোকের শহরেই জন্ম, শহরেই বিবাহ, শহরেই মৃত্যু—তারা সত্যিকার বাংলার রূপ কখনও দেখে? যে বাংলার মাটির বৈষ্ণব কবিতা, গ্রাম্য সঙ্গীত, ভাটিয়ালি গান, কীর্ত্তন, শ্যামাসঙ্গীত, পাঁচালি, কবি—এরা সে বাংলাকে কখনও দেখলে না। যে-বাংলার শিল্প কাঁথা, শীতলপাটী, মাদুর, কড়ির আলনা, কড়ির চুবড়ী, খাগড়াই পিতল-কাঁসার জিনিস সে বাংলাকে এরা কখনও জানলে না। অথচ সমস্ত জাতিটার যোগ রয়েচে যার সঙ্গে—আর সে কি গভীর যোগ রয়েচে, তা এই পল্লীপথে পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে আমি খুব ভাল বুঝতে পারচি।

পাটশিমুলে ঢুকে একটা ক্ষুদে জাম গাছতলায় শিকড়ের গায়ে বসে এই কথা কটা লিখচি, চারিধারে পাটশিমলের বন। আমার মনে হয় সমগ্র বাংলা দেশের মধ্যে যদি কোথাও বন জঙ্গল ও বাঁশবনকে যথেচ্ছা বৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া হোত—তবে এই ধরনের নিবিড়, দুর্ভেদ্য বনানীর সৃষ্টি হোত দেশে। এর প্রকৃতি মালয় উপদ্বীপের বা সুমাত্রা, যবদ্বীপের ট্রপিক্যাল (Rain forest)-এর সমান না গেলেও বিহার, সাঁওতাল পরগণা বা মধ্যভারতের অরণ্যের চেয়ে স্বতন্ত্র। ট্রপিক্যাল রেন্ ফরেস্টের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে লতা জাতীয় উদ্ভিদের প্রাদুর্ভাবে। এত নানা আকারের লতার প্রাচুর্য্য শুধু উষ্ণমণ্ডলের বনানীরই নিজস্ব সম্পদ। এই জন্যে এই সব বনের রূপ স্বতন্ত্র। এত বুশ আণ্ডারগ্রোথ্ (Bush undergrowth)-ও নেই সিংভূম বা মধ্যভারতের বনে। অল্প জায়গার মধ্যে এত বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিদের সমাবেশও সে সব বনে নেই।

মোহিনী কাকাদের চণ্ডীমণ্ডপে বসে দেখছিলুম—সামনের বৃষ্টিবিধৌত ঘনপত্রসম্ভারের শোভা, নির্ম্মল নীল আকাশ, সেই আকাশ অনেকদিন পরে মেঘশূন্য, আশ্চর্য্য মরকত-শ্যাম পত্রপুঞ্জের ওপর ঝলমলে পরিপূর্ণ সূর্য্যালোক। চণ্ডীমণ্ডপের উঠোনে একটা তরুণ নারকোল বৃক্ষের শাখাপত্রের স্পন্দন বড় ভাল লাগচে। প্রাচীন কালের ছোট ইঁটের ভাঙা বাড়ি, ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপ, ছাদভাঙা পুজোর দালান পূর্ব্বেকার সম্পন্ন গৃহস্থের বর্ত্তমান শ্রীহীনতার সুপরিচিত চিহ্ন চারিদিকে।

দুপুরের একটু পরেই পাটশিমুলে থেকে বার হই। দুধারে প্রকাণ্ড বাঁশঝাড়, আর-বছরে দেখা সেই কালীবাড়ির বাঁশঝাড়টা। বাঁশ না কাটলে কি ভাবে বাড়তে পারে তা কালীবাড়ির বাঁশঝাড় না দেখলে বোঝা যাবে না। বাঁশের দুর্ভেদ্য জঙ্গল। এ বাঁশ কালীপুজোর দিন ভিন্ন এবং ঠাকুরের প্রয়োজন ভিন্ন কেউ কাটতে পারে না, এ গ্রামের এই রীতি। এ গ্রামেও সর্ব্বত্র আম গাছের তলায় যথেষ্ট আম পড়ে আছে, কেউ কুড়োয় না।

মাঠে পড়লুম, অতি ভীষণ রৌদ্র আজ, তবু একটু হাওয়া আছে তাই ঠাণ্ডা। রাস্তায় এসে ছায়া পাওয়া গেল, কিন্তু দুধারে যেমনি জঙ্গল, তেমনি মশা। এক জায়গায় একটা লাল টুকটুকে আম কুড়ুতে একটুখানি দাঁড়িয়েচি, অমনি মশাতে একেবারে ছেঁকে ধরেচে। সাঁড়াপোতার বাজার ছাড়িয়ে কল্যকার সঙ্গী সেই হাজারী পরটার বেয়াই বাড়ি গেলুম। হাজারী পরটা বাইরে বসে তামাক খাচ্ছিল, আমায় দেখে লাফিয়ে উঠল, 'আসুন, দাদাবাবু, মহা সৌভাগ্য যে আপনি এলেন, এঃ, মুখ যে লাল হয়ে গিয়েচে রোদে—(মুখ লাল হওয়ার

যদিও আমার কোনো উপায় নেই, আমার কালো রং-এ) আসুন, বসুন। তারপর সে নিজেই একখানা পাখা নিয়ে এল ছুটে। বাতাস দিতে আরম্ভ করলে নিজেই, তার বেয়াইকে ডেকে নিয়ে এল, আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে—মহা খাতির। অনেকক্ষণ—প্রায় ঘণ্টাখানেক সেখানে বসে গল্প করে সেখান থেকে বার হই। ওরা আবার একটু জলযোগ করালে, কিছুতেই ছাড়লে না। আবার রাত্রেও থাকতে বললে। আমি অবিশ্যি তাদের সে অনুরোধ রাখতে পারলাম না। গোবরাপুরের বাজারের কাছে এসে দেখি মণীন্দ্র চাটুয্যে যাচ্ছেন। মণীন্দ্রবাবু প্রথমে আমায় চিনতে পারেন নি, নাম বলতে চিনতে পারলেন, বললেন—চল আমার বাড়ি। আমি বললুম—বাড়ি গিয়ে তো থাকতে পারব না, সুতরাং গিয়ে কোন লাভ নেই। আপনি কেমন আছেন বলুন। তারপর দু-জনে পথে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ গল্প করলুম। মণীন্দ্রবাবু এ অঞ্চলের মধ্যে একজন মানুষের মত মানুষ। অমন উদারহৃদয় পরোপকারী, সদাশয় বৃদ্ধ এ সব দেশে নেই। আমি ও'র কাছে গুরুতর অপরাধে অপরাধী। সে কথা এখানে আর ওঠাতে চাই নে। তিনিও সে বিষয়ের কোন উল্লেখ করলেন না। বললুম, শনিবারে আসতেই হবে আমাদের এখানে উপেন ভট্‌চাজের মেয়ের বিয়েতে, সেদিন আবার কথাবার্ত্তা হবে। আজ আসি।

আর কোথাও দাঁড়ালুম না। সূর্য্য হেলে পড়েচে। রোদ নিস্তেজ হয়ে আসচে। আমায় যেতে হবে এখনও সাত মাইল পথ।

কেউটে পাঁড়ার পথে এক বুড়ী জিজ্ঞেস করলে—বাবু, এত রোদে বেরিয়েচ কেন ?

বললুম—যাব অনেকদূরে পথ।

বুড়ীটি টিকে বেচতে যাচ্চে গোবরাপুরের বাজারে। মোল্লাহাটির খেয়া যখন পার হই, তখন সূর্য্য হেলে পড়েচে। মোল্লাহাটির হাট বসেচে, আজ আর-বছরের মত হাটে গেলুম। খুব আমের আমদানি। বেলা গিয়েচে দেখে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারলুম না। মোল্লাহাটি থেকে খাবরাপোতা পর্য্যন্ত আসতে রোদটুকু একেবারেই গেল। কিন্তু পথের পাশের আরামডাঙ্গার খড়ের মাঠের দৃশ্য মনে হোল আমাদের এ অঞ্চলটি সুন্দর বেশী। এত নদী বাঁওড়ের সমাবেশ অন্যত্র নেই।

আইনদ্দি মণ্ডলের বাড়ির পিছনে সেই বাঁকে এসে খানিকটা বসে বিশ্রাম করি। এই জায়গাটা বড় ভাল লাগে আমার। মরাগাঙ্ চক্রবূত্তে ঘুরে গিয়েচে, বাঁশবনের শীর্ষ অপরাহ্নের ছায়ায় আর নীল আকাশের তলায় বেশ দেখাচ্চে। পুল পার হয়ে এসে দেখি গঙ্গাচরণের দোকানে তালা, দোকান নাকি উঠে গিয়েচে স্টেশনের ধারে। কুঠীর মাঠের পথ দিয়ে ঠিক সন্ধ্যার সময় বাড়ি পেঁছিই। খুদুরা আসে নি, আসবার কথা ছিল কাল। উষার চিঠি এসেচে, দেখি খাটের ওপরে পড়ে আছে। চার বছর পরে ওর খবর পেলাম।

আবার বৃষ্টি নামল, খুব ঠাণ্ডা পড়ল—কিন্তু কি জানি সারারাত আমার ভাল ঘুম হোল না। শেষ রাত্রের দিকে একটু ঘুম এল।

এসেই উষার চিঠি পেলুম, আর একখানা হাওড়ার রমেন ভট্টাচার্য্যের। তার পত্রখানার উত্তর দিতে হবে। উষা এসেচে কলকাতায় বহুদিন পরে, এর মধ্যে একদিন গিয়ে দেখা করতে হবে।

একটা শিমুল গাছের গুঁড়িতে বসে কত কথা ভাবলুম। বাল্যে ওই সব বাদলার দিনে কেমন নৌকো বেয়ে একা বেড়াতুম, ওদিকে চালতেপোতার বাঁক, চট্‌কা তলার খালের নাম রেখেছিলুম Oysterbrook (অস্টারব্রুক)—তখন সমুদ্রভ্রমণের নানা বই পড়তুম, সর্ব্বদা সেই স্বপ্ন দেখতুম। সেই সমুদ্র ও আমাদের এই ছোট্ট ইছামতী, তার জল একই কালো

জল। সন্ধ্যায় একটা তারা উঠল মাধবপুরের নির্জন চরের একটা অতি সুন্দর তরুণ সাঁই-বাবলা গাছের মাথায়। কত অদ্ভুত চিন্তা মনে আসে তারাটার দিকে চেয়ে!

বড় ভাল লাগে এই দূরবিসর্পিত আউশ ধানের ক্ষেত, বাঁশঝাড়ের সারি—বসে বসে এই সুখদুঃখময় ভাবনা। কলকাতায় ফিরে এসব দিনের কথা বড় মনে হবে। এর মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্তি আছে, কলকাতায় মন থাকে উপবাসী প্রকৃতির উপভোগের দিক থেকে, এখানে দুদিন এসে বাঁচি।

তবুও তো এবার রোদ না ওঠার জন্যে ছুটির শেষের দিকটা মন বড় ভাল নয়। নীল আকাশ দেখা এবার ভাগ্যে বড় একটা জুটবে না।

মুসলমান মাস্টারটি এল। দু-জনে গিয়ে পাঠশালার পেছনে মরাগাঙের ধারে বসব, এমন সময়ে এল ঝোড়ো কালো মেঘের রাশি, বারাকপুরের দিক থেকে উড়ে এল—সঙ্গে সঙ্গে ঝম্‌ঝম্‌ বর্ষার বৃষ্টি।

দৌড়, দৌড়, সবাই মিলে ছুটে গিয়ে পাঠশালার ঘরে আশ্রয় নিলুম। সেখানে বসে ও অম্বিকাপুরের মিটিং-এর কথা বলতে লাগল, আমায় সেখানে নিয়ে যেতে চায় তারা,—কবে আমার যাবার সুবিধে হবে ইত্যাদি।

আধঘণ্টা পরে থামল বৃষ্টি। দু-জনে গিয়ে বসলুম পাঠশালার পেছনে মাঠে মরাগাঙের ধারে, আরামডাঙার চরের এপারে।

মুসলমান মাস্টারটির বাড়ি বরিশাল জেলা। অনেকদিন থেকে সে এদেশে আছে। তার খেয়াল গ্রামে গ্রামে চাষাদের মধ্যে শিক্ষার প্রচার করা। অম্বিকাপুর, মামুদপুর, শচীনন্দনপুর, মহৎপুর, হুদো, মানিককোল, বউজুড়ি, সর্পরাজপুর—এসব গাঁয়ে সে পাঠশালা বসিয়েচে, নিজে দেখাশুনো করে, চাষামহলে তার খুব খাতির। নিঃস্বার্থ সেবাব্রতে ব্রতী উদার ধরনের যুবক। তাই ওকে বড় ভাল লাগে। বললে—আসুন, বেশ জায়গাটা, বসে একটু গল্প করি। বিড়ি নেই পকেটে—মুশকিল হয়েচে, কাকে দিয়ে আনাই বলুন তো।

আমি গামছা পাতলাম বৃষ্টিসিক্ত কাঁচ ভেদ্‌লো ঘাসের ওপর। ওকে বললুম—বসুন।

ও বললে—আপনার গামছায় বসব?

জোর করে তাকে বসালুম।

তারপরে সে একটা গল্প ফাঁদলে।

বললে—শুনুন, সেদিন অম্বিকাপুরে একটা বড় করুণ ব্যাপার হয়ে গিয়েচে। অম্বিকাপুরে আমার যে পাঠশালা আছে, সেখানে একটি মুসলমান মেয়ে পড়ত, তার নাম মোমেনা, ও-বছর উচ্চপ্রাইমারী পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে পাস করেচে। চাষার মেয়ে, কিন্তু চাষার ঘরে অমন রূপ কেউ দেখে নি। এই টক্‌টকে গায়ের রং, এই পটল-চেরা চোখ, এই স্বাস্থ্য, এই গড়ন—সবদিক থেকে মেয়েটি যেন আপনাদের বামুন কায়স্থের ঘরের সুন্দরী মেয়ের মত। তার ওপর তার লেখাপড়ার খুব ঝোঁক, গান জানে, শিল্পকাজ শিখেচে স্কুলে, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

মেয়েটির এগারো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, সেই বছরেই বিধবা হয়। উচ্চপ্রাইমারী পরীক্ষা দেবার পর যখন পাসের খবর বেরুল, তখন তার দেওর তার বাপ মার কাছে যাতায়াত শুরু করলে তাকে বিয়ে করবার জন্যে। মেয়েটির বাপ মা রাজি হয়ে গেল। কিন্তু মেয়ের তাতে ঘোর আপত্তি। তার দেওর নিতান্ত মূর্খ চাষা। স্বাস্থ্য অতি খারাপ, চেহারা কালো। মেয়েটি ওই গ্রামেরই একটা ছেলেকে ভালবাসে, মুসলমানেরই ছেলে, থার্ড

ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিল রাণাঘাট স্কুলে, এখনও বাড়িতে বই, খবরের কাগজ আনিয়ে পড়ে। বয়েস পঁচিশ-ছাব্বিশ, সুশ্রীও বটে, মেয়েটির বয়েস সতেরো। মেয়ে বাপ-মাকে নাকি গোপনে বলেছিল,—যদি তোমরা আমার বিয়ে দিতেই চাও, তবে অমুকের সঙ্গে দিও, আমার দেওরকে আমি বিয়ে করব না।

বাপ মা তাতে ঘোর গররাজি। দেওরদের নাকি খুব ধানের গোলা আছে, ক্ষেত খামার আছে, এ ছোকরার কিছুই নেই।

মেয়েটির কথা কেউই শুনলে না। তাকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দিলে তার দেওরের সঙ্গে। বিয়ের সময় আমাদের মুসলমানদের প্রথা আছে বিবিকে মোল্লা জিজ্ঞেস করবে, তুমি একে বিয়ে করতে সম্মত আছ তো?

মোল্লা সে কথা মেয়েকে জিজ্ঞেস করতেই মেয়ের ফিট হয়ে গেল সেই বিয়ের আসরে।

ভাবুন, কতটা দুঃখ সে বুকে চেপে রেখেছিল নীরবে মুখ বুজে।

আমি বললুম—বিয়ের কি হোল?

সে বললে—বিয়ে কি আটকে আছে? হয়ে গেল। তারা শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে গেল।—বড় লক্ষ্মী মেয়ে, কিন্তু তার জীবনটা—

The usual story—অনেক শুনেচি এমন ধরনের গল্প। কিন্তু কেন এমন হয়, তা কে জানে?

সূর্য্য অস্ত যাচ্চে। বাবুই পাখীদের অত্যাচার বড় বেড়ে গিয়েচে। জোলো ধানের ক্ষেতে বেজায় পটপটির আওয়াজ ও ভাঙা টিনের বাজনা! ময়ূরকণ্ঠী রংয়ের আকাশে যেন একটা কালো আভা লেগেচে।

অমন সুন্দর স্থান, অমন মরাগাঙের ধারে, আরামডাঙ্গার চরের এপারে, অমন ইন্দ্রনীল আকাশের নীচে বসে গল্পটা বড়ই করুণ লাগল।

হয়ত গল্পটা কিছু নয়—মানুষের ব্যথাহত আত্মার আকুতি—সেটাই আসল জিনিস। আইভ্যান বুনিনের কথায় বলি:—

'Then what is Art? It is the prayer, the music, the song of the human soul'—এই কথাটা আমাদের দেশের পণ্ডিতম্মন্য সমালোচকদের বুঝতে দেরি লাগবে। শুধু teller of tales হওয়া আর প্রাণের ভাষার ব্যঞ্জনা—দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস, আমাদের অনেকে বলে—গল্প তো বলা হয়ে গেল, আর কেন? পাঠকে বুঝে নিক না বাকীটুকু।…পাঠকে বুঝবে কাঁকুড়!

রোজই যখন হাট করে ফিরি, তখন আমার চোখে পড়ে বটগাছ, বাঁশবন, আমবন, বড় বড় কুকুরে-আলুর লতা গাছের গায়ে জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেচে। পানের মত তার চকচকে সবুজ পাতা, গাছে-গাছে কাঁঠাল ঝুলচে, নারকেলগাছ, কলাগাছ, পেঁপেগাছ, ঘন আগাছার জঙ্গল, বাঁওড়ের চর, কচুরিপানার দাম, কোকিল ও 'বৌ-কথা-কও' পাখীর ডাক, কুঁচ ঝোপ, শিমুলগাছ, সোনালী-ফুল-দোলানো বাবলাগাছ, উলঙ্গ শিশুর দল, মাছ ধরা জেয়াড়ী, কুমোর পাড়ায় হাঁড়ি পোড়াবার পণ, কলসী কাঁখে গ্রামবধূর দল—ট্রপিকসের কোনও একটা দেশের পরিচিত দৃশ্য। যেমন দেখা যায় যবদ্বীপে, সুমাত্রায়, মালয় উপদ্বীপে, বোর্ণিও ও ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে। ইউরোপ আমেরিকা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এদের জীবনযাত্রা, চিন্তাধারা, শিল্প, খাদ্য, পরিচ্ছদ, দেশের দৃশ্য। আমরা বলি আমাদের ভাল, ওরা বলে ওদের ভাল। ওদের বিজ্ঞান আছে, কলকব্জা আছে, সাহস আছে, অধ্যবসায় আছে—আমাদের দর্শন আছে, প্রাচীন ঋষিরা আছেন, পাঁজিপুঁথি বিস্তর আছে…আমরা বলিই

আমরাই বা কম কি ?

আমি তো দেখি এসব কিছুই নয়। এবার ট্রপিক্‌সের কোনও দেশে (যদিও বাংলা ওর মধ্যে পড়ে না) জন্মেচি, দূরে কোনও জন্মান্তরে যাব ইউরোপে কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিংবা বৃহস্পতি কি অন্য কোথাও গ্রহান্তরে, কি কোন্ দূর নক্ষত্রে—আমি অমর আত্মা, আমি দেশকালের অতীত—কোন্ দেশ আমার, কোন্ দেশ পর ? সকলকেই ভালবাসতে চাই স্বদেশ বিদেশ নির্ব্বিশেষে, সকলের সব ভালটুকু নিতে চাই—এই আমার, এই তোমার—এ সংকীর্ণতা যেন থাকে না। এই দেশে জন্মেচি, মানুষ হয়েচি, কিন্তু এদেশের সঙ্গে নিজেকে অনেকটা মিশিয়ে দিলেও যেন খানিকটা আছি কৌতূহলী দর্শকের মত, যেন এই বৃক্ষলতাবহুল সবুজ দেশে এসে দেখে এবার আশ্চর্য্য হয়ে গেছি, প্রতিদিন দেখচি আজ চল্লিশ বছর ধরে, তবু তৃপ্তি নেই, এ নিত্য নতুন আমার কাছে, কোনও দিন বুঝি এর রূপ একঘেয়ে লাগবে না।

সাতবেড়ের একটি ছেলে গল্প ও কবিতা লিখে মাঝে মাঝে আমার হাতে দেয়। গত দু-তিন বছর থেকে দিচ্ছে। গরীবের ছেলে, পয়সার অভাবে লেখাপড়া শিখতে পারে নি, কিন্তু লেখে মন্দ নয়। গল্পের হাত আছে, তবে টেক্‌নিকের ওপর তেমন দখল নেই, থাকবার কথাও নয়—টেক্‌নিক জিনিসটা কতকটা আসে এমনি, কতকটা আসে ভাল লেখকদের গল্পের রচনারীতি দেখে। তার জন্যে পড়াশুনোর দরকার হয়। এ ছেলেটির সেরূপ বই পড়বার সুযোগ কোথায় ?

মুচি-বাড়ির সামনে বটতলায় তার সঙ্গে দেখা। সে আমার সঙ্গে আলাপ করবে বলেই ওখানে বসে অপেক্ষা করছিল, বললে। কাঁচুমাচু হয়ে জিজ্ঞেস করলে—আর-বছরের সেই লেখাগুলো কি দেখেছিলেন ?

ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় বছরে একবার, এই জ্যৈষ্ঠ মাসের ছুটিতে। সেই সময় ও আমার কাছে ওর লেখা দেয়, ইচ্ছেটা এই যে কলকাতার কোনও কাগজে ছাপিয়ে দেবো। কিন্তু কাগজে ছাপাবার উপযুক্ত হয় না ওর লেখা। তবুও আমি প্রতি বৎসর উৎসাহ দিই, এবারও দিলাম। মিথ্যে করে বললুম, তোমার গল্প বেশ ভাল হয়েছিল, কলকাতার অনেকে পড়ে খুব সুখ্যাতি করেচে। ও আগ্রহের সঙ্গে বললে—কোন্ গল্পটা ? আমার নাম মনে নেই ওর কোনও গল্পেরই, কাগজগুলোও কোন্ কালে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। ভেবে চিন্তে বললুম—সেই যে একটা মেয়ে ; বলতেই ও তাড়াতাড়ি বললে—ও বিয়ের কনে ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও বিয়ের কনে।

একটা মিথ্যে কথা পাঁচটা মিথ্যে কথা এনে ফেলে। কাঁচিকাটার পুল পর্য্যন্ত বটতলার ছায়ায় ছায়ায় ও আমার সঙ্গে সঙ্গে অতীব আগ্রহ ও কৌতূহলের সঙ্গে শুনতে শুনতে এল, কলকাতার কোন্ কোন্ বড় লোক ওর গল্পের কি রকম সুখ্যাতি করেচে—কোন্ কাগজের সম্পাদক বলেচে যে, আর একটু ভাল লেখা হোলেই তারা তাদের কাগজে ছাপাবে, তার কবিতা পড়ে কোন্ মেয়ের খুব ভাল লেগেছিল বলে হাতের লেখা কবিতাটা আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে রেখে দিয়েচে কাছে। সন্ধ্যার দেরি নেই, আমি বললুম—তবে আজ যাই, আবার ফিরে নদীর ধারে মাঠে বেড়াতে যাবো। কি করো আজকাল ! ও বললে—বাড়ি বসে তো আর চলে না, তাই ওই পথের ধারে ধান চালের আড়তে কাজ নিইচি। আজ এই তিন মাস কাজ করচি। সকালে আসি আর সন্দের সময় ছুটি পাই।

তারপর একটু লজ্জামিশ্রিত সঙ্কোচের সঙ্গে বললে—আসচে হাটে আপনাকে আর

গোটাকয়েক গল্প ও কবিতা দেবো—পড়ে দেখবেন কেমন হয়েচে। কলকাতার ওই বাবুদেরও দেখাবেন। আমি উৎসাহের সঙ্গে বলি—নিশ্চয়ই। বাঃ চমৎকার লেখা তোমার। পড়ে সেখানে সবাই কি খুশি! তা এনো। আসচে হাটবারেই এনো। তার আর কথা কি!

ও বললে—ফিরবেন তো এমন সময়? আমি লেখা নিয়ে এই বটতলায় বসে থাকবো। আসবেন একটু সকাল-সকাল যদি পারেন—দু-একটা লেখা একটু পড়ে শোনাবার ইচ্ছে—

আমি ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললুম—শোনাবে নাকি? বাঃ তবে তো বেশ দিনটা কাটবে। নিশ্চয়ই আসবো। তোমার কথা কত হয় কলকাতায় বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে।

বেচারীকে সত্যি কথা বলে লাভ নেই। ওতেই ওর সুখ, আমরা সবাই জীবনে মিথ্যের স্বর্গ রচনা করে রেখেচি, উনিশ না হয় বিশ। মিথ্যে বলে যদি ওই দরিদ্র, অসহায় পল্লী-যুবককে এতটুকু আনন্দ দিতে পারি ভালই। ওর মিথ্যে স্বর্গ আগামী জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত অক্ষয় হোক্।

আজ ঘুম থেকে উঠে যখন হাটে যাই, তখন মেঘলা করে এসেচে, বেশ লাগলো। বনে বনে কাঁঠাল গাছে কাঁঠাল ফলে আছে, পানপাতার মত বড় বড় লতা উঠেচে গাছে গাছে—ঘন কালো বর্ষার মেঘ করেচে নৈঋত কোণে। গোপালনগর পেঁছিতেই রাধাবল্লভ নিয়ে গেল ওদের বাড়ি। রাধাবল্লভের স্ত্রী পাঁচী আমাদের গাঁয়ের মেয়ে। ছেলেবেলায় এক সঙ্গে খেলা করেচি বকুলতলায়—বিলবিলের ধারে, যুগল বোষ্টমের কামরাঙা তলার পথে। ওরা জাতে জেলে। ওর বিয়ের পর ওকে আমি এই প্রথম দেখলুম বোধ হয় বাইশ-তেইশ বছর পরে। দেখে বড় স্নেহ হোল—জড় হয়ে এসে প্রণাম করল। কথাবার্ত্তা খুব বিনীত, নম্রসম্র। একটু ভয়ে ভয়ে কথা বললে।

আমি ব্রাহ্মণ, ওর বাড়িতে গিয়েচি, পাছে আমার কোনও অসম্মান হয়, এই ভয়েই তটস্থ। ওর ছেলেকে দিয়ে একটু সন্দেশ ও জল পাঠিয়ে দিলে। তাও ভয়ে ভয়ে। ভাবলে আমি খাবো কি না। নিজের হাতে সাহস করে নিয়ে আসতে পারলে না। আমি ওকে দেখিয়ে সে সন্দেশ ও জল খেলুম, ওর মনে দ্বিধা ও সংকোচের কোনও অবকাশ দিলুম না।

ও পড়ে গিয়েছে বড় বিপদে। এর বড় মেয়ের বয়স প্রায় কুড়ি। মেয়েটি দেখতে শুনতে বড় ভাল, লেখাপড়াও শিখেচে। ওদের জাতে ভাল ছেলে বড় একটা পাওয়া যায় না—অনেক খুঁজে পেতে বাপে বিয়ে দিয়েছিল ওরই মধ্যে একটু আধটু শিক্ষিত একটি ছেলের সঙ্গে। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে ওর ওপর বড় খারাপ ব্যবহার করে বলে, বাপ মেয়েকে আর সেখানে পাঠাতে চায় না। সে জামাই আবার বিয়ে করচে। এই সব নিয়ে গোলমাল। ওরা জেলেপাড়ার মধ্যে বাস করে, ভাল কোঠা বাড়ি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। ওর স্বজাতিরা সেজন্যে ওদের দু-চোখ পেতে দেখতে পারে না। তার ওপর মেয়েটা নাকি সর্ব্বদা বই পড়ে। কি সর্ব্বনাশ! জেলের মেয়ে বই পড়বে কি? ওদের পাড়ার লোক ষড়যন্ত্র করে একরাত্রে ওদের ঘরে ঢুকে কিছু টাকা কাপড়চোপড় চুরি করে নিয়ে গিয়েচে, আর এক বাক্স ভাল ভাল বই সব ছিঁড়ে দিয়ে গিয়েচে।

পাঁচী লেখাপড়া জানে না, কিন্তু বইগুলোর শোক ওর লেগেচে খুব। আমাকে কাঁদতে কাঁদতে বললে—আসুন তো দাদা, দেখুন দিকি, আপনি তো লেখাপড়া জানেন, আমার এক বাক্স বই, খুড়শ্বশুরের কেনা—বইগুলো ছিঁড়ে ছুটে তার আর কিছু রেখেচে দাদা?

গিয়ে দেখলুম একটা আমকাঠের সিন্দুকে অনেকগুলো পুরোনো বই, বেশ ভাল বাঁধানো। দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, কিছু সেকেলে বাজে বটতলার উপন্যাস, মড়েল-ভগিনী, কঙ্কাবতী, পুরোহিত দর্পণ (ওদের বাড়ি পুরোহিত দর্পণে কি কাজ জানি নে.), রামায়ণ, হরিবংশ এই সব বই। মেয়েটা সেই সব বই পড়তো বলে পাড়ার কারও সহ্য হতো

না। তাই বইগুলোর ওপরে ঝাল ঝেড়েচে।

আমি বললুম—যদি ওকে শ্বশুর বাড়ি না পাঠাও, তবে ওর লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করো।

পাঁচীর কান্না দেখে বড় কষ্ট হোল। কতকাল আগে বাল্যে এক সঙ্গে খেলা করেচি, ওদের পর ভাবতে পারি নে।

হাট থেকে যখন ফিরি, তখন বেলা গিয়েচে, রোদ রাঙা হয়ে এসেচে। মাঠে নদীর ধারে একটু বসে ওপারের মেঘস্তূপ লক্ষ্য করি, তারপর জলে নামি স্নান করতে। অন্ধকার হয়ে গিয়েচে, ওপারের চরে সাঁইবাবলা গাছের বন, আর সেই প্রতিদিনের উজ্জ্বল তারাটি উঠেচে, দেখতে বড় চমৎকার হয় ও তারাটা।

সকালে বসে যখন লিখচি, মনোরমা এসে বই চাইলে—পাঁচীর মেয়ে মনোরমা। ও আমার কাছে একখানা বই চেয়েছিল এবার, কিন্তু নানা গোলমালে সুবিধে হয় নি। বললুম, কলকাতায় গিয়ে পাঠিয়ে দোবো, মা।

বেশ মেয়েটি মনোরমা, জেলের মেয়ে বলে ওকে বোঝাই যায় না।

ওপাড়ার ঘাটে সাঁতার দিয়ে যাবার সময় নড়াইল থেকে একখানা নৌকো আসচে দেখি, যাবে গঙ্গায় ইলিশ মাছ ধরতে, দু-দিন হোল ইছামতী নদীতে পড়েচে। তারা জিজ্ঞেস করলে—ইছামতীর মুখ আর কত দূরে?

ঘাটের কেউ জানে না। আমি বললুম—আরও দুদিন লাগবে চূর্ণি নদীতে পড়তে। সেখান থেকে আর একদিন।

বৈকালে বেলেডাঙার পল্লীমঙ্গল সমিতি প্রতিষ্ঠা করলুম। আরামডাঙা, নতিডাঙা, সদানন্দপুর, চিত্রাঙ্গপুর, নতুনপাড়া, পাঁচপোতা প্রভৃতি সাত-আটখানা গাঁয়ের লোক জড়ো হয়েছিল। সদানন্দপুরের সৈয়দ আলি মোল্লাকে সভাপতি করে আমি এক লম্বা বক্তৃতা ঝাড়লাম সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে। ছেলেরা গান গাইলে, ফুলের মালা গলায় দিলে। হৈ হৈ ব্যাপার। তারপর উপস্থিত লোকেদের মধ্যে বেছে বেছে এক কার্যকরী সমিতি গঠন করি। নূর মহম্মদ মাস্টারের আগ্রহেই এ সব হোল। সে লোকটা নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণ, গ্রামে গ্রামে ঘুরে লোক যোগাড় করা, সকলকে খবর দেওয়া, এসব সে-ই করেচে। মিটিং-এর পরে বৈকালে নীল আকাশের বিচিত্রবর্ণ মেঘস্তূপের তলে মরাগাঙের ধারে সবুজ ঘাসভরা মাঠের মধ্যে বসে গ্রামের লোক কত দুঃখের কথা আমার কাছে বলতে লাগল। গাঁয়ে জলের কষ্ট, কচুরিপানায় পচা জল খাচ্ছে, বেলে জমিতে ফসল হয় না, ক-বছর অজন্মা, মোল্লাহাটির খেয়াঘাটের ঘাটওয়ালাদের জুলুম।'

তাদের বুঝিয়ে দিলাম, এই পল্লীমঙ্গল সমিতি থেকে গ্রামে এসব অভাব অভিযোগ দূর করবার চেষ্টা করা হবে। তোমরা চাইতে জানো না, তাই পাও না। অন্য গাঁয়ে দুটো টিউবওয়েল হয় দু-পাড়ায়, তোমাদের গোটা গাঁয়ে একটাও হয় না।

সন্ধ্যার আগে সেখান থেকে রওনা হলুম যখন, তখন মাথায় সেই উজ্জ্বল তারাটি উঠেছে। বাড়ি এসেই উষার পত্র পেলুম।

ছুটি শেষ হয়ে আসচে আর আমার মন খারাপ হয়ে আসচে। এই মুক্ত নদীর চর, নীল উদার আকাশ, বর্ষাশ্যাম তৃণভূমি, আষাঢ়ের টলটলে কালো জল ইছামতী, জোনাকীর ঝাঁক, 'বৌ-কথা-কও' পাখীর ডাক, এসব ছেড়ে যেতে কষ্ট হয়।

জীবনের বেগ যেন মন্দীভূত না হয়। আমাদের দেশে, আমাদের জাতীয় জীবনে তার আশঙ্কা খুব বেশী। পেত্রার্ক সম্বন্ধে যেমন উক্ত হয়েচে—'It is a noble Florentine

profile, the whole aspect suggesting abundance of thought and life…'

আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কার সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় ?

রাত্রে মনু রায়ের বাড়িতে সামাজিক দলাদলির মিটিং হোল রাত একটা পর্য্যন্ত। গাঁয়ের সবাই ছিল, কিছুতেই আর মেটে না। নানা কথা ওঠে, এ রাগ করে চলে যায়, ও রাগ করে চলে যায়। শেষ পর্য্যন্ত কিছুই মীমাংসা হোল না। আমায় দু-বার ডাকতে এল, আমি যাই নি।

সারাদিন বর্ষার বৃষ্টি। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, পথে ঘাটে জল বেধেচে। বৈকালে বৃষ্টি একটু ধরেছিল, সন্ধ্যায় আবার মেঘ এল ঘনিয়ে। আমি সেই সময় নদীর জলে নেমেচি নাইতে—মাধবপুরের পারের ওপরে সেই মেঘনীল দিগ্বলয়ের পটভূমিতে একটা শিমুল গাছ কি সুন্দর দেখাচ্চে। এই ইছামতী, এই মেঘমালা, এই বর্ষার সবুজ বনভূমি এমনি থাকবে—অথচ আমরা চলে যাবো আমাদের সকল সুখ-দুঃখ নিয়ে, আজকের এই মেঘ-মেদুর সন্ধ্যার সকল অনুভূতি নিয়ে। ঘাটের ওপর ওই বনসিম লতার কোলের নিচে খুকুর সে ছবিটা ক্রমে বহুদূরের হয়ে পড়েচে, এই পল্লীনদীটির শ্যামতীরে বাঁশ ও বনসিম লতার ছায়ায় অক্ষম হয়ে থাকবে সে ছবি, এর আকাশে বাতাসে মিলিয়ে, কিন্তু তাকে চিনে নেবার লোক থাকবে না কেউ, কেউ এমন থাকবে না যার মনে ও ছবি বেঁচে থাকবে।

বারাসাত গেলুম পশুপতিবাবুর কাছে। উনি সকালেই যেতে লিখেছিলেন। কিন্তু শরীরটা একটু খারাপ ছিল। বারাসাত নেমে দেখি এ অঞ্চলে খুব বৃষ্টি হয়ে গিয়েচে—অথচ কলকাতায় এক ফোঁটাও জল নেই। হাসপাতালে গিয়ে দেখি পশুপতিবাবু জেল দেখতে গিয়েচেন। আমি বসে রইলুম, তারপর পশুপতিবাবু এলেন। আমায় পেয়ে খুব খুশি। দু-জনে হাসপাতাল দেখতে গেলুম, গোবরডাঙ্গা থেকে এসেচে একটা জখম রোগী। তার মাথায় দু-তিনটা বড় বড় গর্ত্ত। তার বড় ভাই নাকি বিষয়ের ভাগ দিতে হবে বলে তার মাথায় ওই রকম মেরেচে। পশুপতিবাবু বললেন, লোকটা বাঁচবে না। জাতিতে ব্রাহ্মণ, গাঙ্গুলি, গোবরডাঙার কাছে বেড়গুমি গ্রামে বাড়ি। হাসপাতালের কালো, মোটা মত একটা নার্স ওকে যত্ন করচে দেখলুম।

তারপর জেল দেখতে গেলুম। তখন কয়েদীরা সব খেতে বসেচে। খাবার বন্দোবস্ত দেখে মনে হোল জেলের মধ্যে ওরা বেশ সুখেই থাকে। দিব্যি সাদা চালের ভাত, তরকারিটা রেঁধেচে তার বেশ সদ্‌গন্ধ বেরুচ্ছে, ডালটাও বেশ ঘন। সপ্তাহে একদিন মাছ, একদিন মাংস দেয়। ওরা নিজেদের বাড়িতে অমন খাদ্য প্রতিদিন তো দূরের কথা কালেভদ্রে খেতে পায় কি না সন্দেহ। একজন কয়েদী ভদ্রলোকশ্রেণীর, তাকে বললুম, আপনার কি হয়েছিল, কতদিনের জেল ? বললে, চিটিং কেস মশাই, পনেরো মাসের জেল। আর একটা ছোকরাকে বসিরহাট অঞ্চল থেকে ধরে এনেচে। তার বিচার এখনও হয় নি। জিজ্ঞেস করলুম—কি করেছিলে ?

বললে—একটা মেয়েকে খুন করেচি।

—কেন খুন করলে ?

—বাবু, চারদিন খাইনি। ওর গায়ে গয়না ছিল, সেই লোভে মেরেচি।

আমরা বললুম—বাপু। ওরকম বোলো না, পুলিসের কাছেও না বিচারের সময়ও না। বললে মারা পড়বে।

তারপর এসে একটা বড় পুকুরের ধারে বসলুম। তখন বৃষ্টি থেমে গিয়েচে। পুকুরের

ওপারের আকাশে মেঘপুঞ্জ, তবে কি আর দেশের মত ভাল লাগছিল, তা নয়। কলকাতার চেয়ে ভাল বটে। একটা ছোট মেয়ে পশুপতিবাবু বলাতে, অনেকগুলো যুঁই ফুল তুলে এনে দিলে। পশুপতিবাবুর বাসায় বারান্দাতে বসে চা খেয়ে অনেক গল্প করা গেল।

রাত্রে ফিরবার সময় মিনুদের বাড়িটা দেখলুম। বাড়িটা ভালই, তবে বারাসাতে অত্যন্ত ম্যালেরিয়া বলে ও'রা এখানে থাকতে পারেন না।

আজ রাধাকান্তদের বাড়ি গেলুম তার বৌভাতের নেমন্তন্নে। অনেকদিন যাই নি ওদের বাড়ি, ওরাও খুব ভালবাসে। বাইরের ঘরে খুব ভিড় থাকা সত্ত্বেও রাধাকান্ত, খিচু, ভীম, বাটুল সবাই এসে গল্পগুজব ও আপ্যায়িত করলে। ভীম ও বাটুলের সে কি আনন্দ আমি গিয়েচি বলে! রাধাকান্ত খাবার সময়ে হাত ধরে ওপরে নিয়ে গেল ওর বোন লক্ষ্মীর কাছে। লক্ষ্মীকে বললে—এ'কে আলাদা জায়গা করে খেতে দে। লক্ষ্মীর ছোট বোনটা বেশ বড় হয়ে উঠেচে দেখলুম। আমি একবার পুজোর সময় জাহ্নবীর মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলুম, ওর আগের পক্ষের খুড়ীমা তাকে পুতুল দিয়েছিলেন—সে সব কথা বললে।

বাটুল একটা ঘরের কাছে নিয়ে গিয়ে জানালা দিয়ে বৌ দেখালে—ঘরের মধ্যে মেয়েদের ভিড়। সোনারবেনের মেয়েরা অত্যন্ত গহনা, পরে এক একটি মেয়ের আপাদমস্তক গহনায় মোড়া, নাকের নথও বাদ যায় নি। আজকাল যে এত গহনা পরার রেওয়াজ আছে, বিশেষ এই কলকাতা শহরে—সে আমার ধারণা ছিল না।

রাধাকান্তের বোন লক্ষ্মী অন্যরকম দেখতে হয়ে গিয়েচে। শিবু যখন আর একবার দোতলার ঘরে বৌ দেখাতে নিয়ে গেল তখন সে একখানা লুচি হাতে সঙ্গে সঙ্গে ফিরতে লাগল, কিন্তু ও যেন বড্ড ছেলেমানুষ হয়ে গিয়েচে।

রাধাকান্ত ছেলেটি আমায় খুব ভালবাসে এ আমি বরাবরই দেখে আসচি—শিবুর চেয়ে, ভীমের চেয়েও। ওর মধ্যে কপটতা নেই।

কলকাতায় বড় একটা আনন্দ পাওয়া যায় না; কিন্তু কাল সন্ধ্যা ছ-টার সময় বাসায় ফিরে এসে বারান্দাতে বসে আছি, হঠাৎ মনে আপনা-আপনিই আনন্দ এল। সকলের কথা মনে এল। দেখলুম ভেবে নিরাকার ভগবানকে আমি বুঝি নে, তাঁর ধারণাও করতে পারি নে—God as pure spirit তাঁকে বুঝতে পারবো না যতক্ষণ তাঁর রূপ না পাচ্ছি। যখন তিনি নির্দিষ্ট রূপে গ্রহণ করে আসবেন, তখন তাঁকে আমরা ভক্তি করতে পারি। কেন না মানুষ নিরাকার নয়। এমন সে কখনও জীবের কল্পনা করতে পারবে না যার প্রাণ আছে, মন আছে, অথচ আকার নেই। নিরাকার ভগবানের উপাসনা কি সোজা ব্যাপার?

কিন্তু এসব কথা অবান্তর। আমার মনে উঠল একটা অন্য ভাব। খুকুদের কাছে একটা বার-তের বছরের ছোট মেয়ে খেলে বেড়াচ্চে। মেয়েটি ভারী সুন্দরী, নীলাম্বরী শাড়ি পরনে, বিদ্যুতের মত ছুটে ছুটে খেলে বেড়াচ্চে। মাথার খোঁপাটিতে যেমন ঘন কালো চুল, তেমনি পারিপাটী করে বাঁধা। ওকে দেখলেই মনে হোল Out of clay ভগবান এমন সুন্দর ছাঁচে গড়েচেন, এমন আকারে গড়েচেন—আর তিনি নিজে নিরাকার, এ কেমন করে ভাবতে ভাল লাগে? কি অদ্ভুত রসায়ন যার বলে মাটি থেকে অমন সুন্দরী মেয়েটির মত চেহারা তৈরি হয়েচে! তিনি নিজেও ইচ্ছা করলে সুন্দর মূর্ত্তিতে প্রকাশ হতে পারেন নিজে, যে দেশের লোকে যা ভালবাসে সেই মূর্ত্তিতে। যেমন ধরা যাক, আমাদের দেশে বহু শতাব্দী ধরে গলে বনমালা, মাথায় শিখিপুচ্ছ, হাতে বেণু এই শ্রীকৃষ্ণের কিশোর মূর্ত্তির প্রচলন, তাও দ্বারকা বা কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণকে কেউ চায় না—সে সময় তিনি নিশ্চয় প্রৌঢ় হয়েছিলেন যদি

সত্যি ঐতিহাসিক ব্যক্তি হয়ে থাকেন—কিন্তু চাইবে সবাই বৃন্দাবনের সেই কিশোর শ্রীকৃষ্ণকে। সুতরাং আমাদের দেশের লোকের রক্তে ওই শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবানের রূপ নৃত্য করচে—আমাদের দেশের হাওয়ায় তাঁর বাঁশি বাজে, পাখীরা তাঁর নাম করে—এদেশের মাটিতে তাঁর চরণচিহ্ন সর্ব্বত্র। এদেশে ভগবানের সাকার মূর্ত্তির কথা ভাবতে গেলে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিই এসে পড়ে মনে। যে ভালবাসে ওই মূর্ত্তিকেই ভালবাসে, যে না ভালবাসে সেও পাকে-চক্রে ওই মূর্ত্তির কথাই ভাবে, শেষে ভালবাসা এসে পড়ে মনে কোন্ অলক্ষ্য দ্বারপথ বেয়ে।

কলকাতা শহরের একটা অদ্ভুত রূপ আছে, যেটাকে দেখতে হলে বিকেল ছ-টা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত জনবহুল স্কোয়ার, সাধারণ পার্ক, সিনেমা, থিয়েটার, ভাল ক্লাব প্রভৃতি ঘুরে বেড়ানো দরকার। কোনও পার্টিতে গিয়ে স্থাণুবৎ অচল হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিলে শহরের এ ঐশ্বর্য্য, রূপ হারিয়ে ফেলতে হয়। এক জায়গায় বেশীক্ষণ থাকলে হয় না—ট্রামে বা বাসে ঘুরে বেড়াতে হয়, মোটর যদি না থাকে। আলো না জ্বললে শহরের রূপ খোলে না। আজ ভোরে বেরিয়েছিলুম একখানা ট্রামের all day ticket কেটে। কারণ নানা জায়গায় ঘুরতে হচ্চে, রবিবার ভিন্ন সুবিধে হয় না। কমলাদের হোস্টেল হয়ে মণীন্দ্রলালের ওখানে গিয়ে দেখি পুরো আড্ডা বসেচে—পরেশ সেন বিলেতের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করচে, ভূপতি, মহিম, নরেনদা সবাই উপস্থিত। সেখানে ঠিক হোল ওবেলা ছ-টার সময় 'বিজলী'তে সবাই মিলে 'She' দেখতে যাওয়া হবে। মণি বর্দ্ধনের নাচ হবে আজই ইনস্টিটিউটে, আমায় মণি বর্দ্ধন একখানা কার্ড দিয়েচে সে-কথা বললুম। ওরা উড়িয়ে দিলে। তখন ঝমঝম্ বৃষ্টি নামল। সেই বৃষ্টি মাথায় ট্রামে ও বাসে সাঁতরাগাছি গিয়ে পৌঁছই ননীর বাড়ি। ননীরা বাসা বদলে আর একটা বাড়িতে এসেচে।

'বিজলী'তে এসে দেখি শুধু পরেশ সেন এসেচে। একটু পরে মণীন্দ্র ও ভূপতি এল। আমরা সবাই ফিল্ম দেখলুম। 'বিজলী'তে এমন একটা atmosphere আছে সেখানে বসে ফিল্ম দেখে সুবিধে হয় না। ভাল সঙ্গ, ভাল পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভিন্ন যেখানে সেখানে বসে, ছবি বা থিয়েটার বা যে কোনও আমোদ-প্রমোদ ভাল লাগে না। আলোকোজ্জ্বল প্রেক্ষাগৃহ, সুবেশা তরুণীর দল, পারিপাটী আসন—এ সবের খুব বড় একটা স্থান আছে ছবি বা থিয়েটার দেখাতে। ওখান থেকে বেরিয়ে ট্রামে আলিপুর ও খিদিরপুর হয়ে বাসায় ফিরলুম। পথের বৃষ্টিস্নাত গাছপালার ওপর শ্যাওলা পড়ে বেশ দেখতে হয়েচে, কার্জ্জন পার্কে ফুল ফুটে আছে, নরনারীর চিত্র—বেশ লাগল। কলকাতার এই প্রমোদসজ্জা অতি চমৎকার। এত বড় একটা শহরের এ রূপ ভাল করে দেখবার জিনিস।

পরদিনই বিকেলে তরুদের বাড়ি গেলুম শ্যামবাজারে, সেখান থেকে সন্ধ্যায় রঙমহলে বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের নাটক দেখতে গেলুম 'কালের মন্দিরা বাজে' ও 'অতি আধুনিক'। নাটক দু'খানা কিছুই নয়, অতি বাজে, তবে গান ও variety show হিসেবে অনেকগুলো গুণী লোককে একত্র করেচে বটে, নাটকের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। হেমেনদা এসে এক কোণে চুপ করে বসে আছেন। দেখা করে এলাম। সবাই মিলে এক সঙ্গে বসে খুব জমিয়ে আড্ডা দিতে দিতে থিয়েটার দেখা গেল।

গত শুক্রবারে শ্রীরামপুরে দিদির মেয়ে প্রভার বিয়ে হোল। আমি প্রথমে গেলুম লীলাদিদিদের বাড়ি। লীলাদিদির শরীর প্রথমে খুবই খারাপ হয়েছিল। এখন কিছু সেরেচে। অমিয় কলেজ থেকে এল রমেশ কবিরাজকে সঙ্গে করে। ওখানে অল্পক্ষণ বসেই দিদির বাড়ি গেলুম। ওরা সকলে মিলে স্ত্রী-আচারের সময়ে বরকে ঘিরে আলো নিয়ে প্রদক্ষিণ করলে।

আমি ওদের সকলকে অনেকদিন পরে একজায়গায় দেখলুম,—বড় ভাল লাগছিল। রাত দশটার ট্রেনে কলকাতায় এলুম।

পরদিন শনিবার বনগাঁ যাব, ঠিক দুপুরবেলা থেকে ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টি শুরু হোল—অতি কষ্টে বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে তো ট্রেন ধরলুম। বৃষ্টিস্নাত ঘন সবুজ গাছপালা, ধানের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে ট্রেন বনগাঁ গিয়ে পৌঁছল। খয়রামারিতে ফুটবল ম্যাচ দেখতে গেলুম।

তার পরদিন সকাল থেকে কি বিশ্রী বাদলা। নদীর জলে ঘোলা এসেচে, ঘাস পর্য্যন্ত ডুবে গিয়েচে, এত জল বেড়েচে নদীতে। এখন তো খুবই ভাল, মুশকিল বাধবে সেই কার্ত্তিক মাসে যখন হাঁটুভ'র কাদা হবে নদীর ধারের সর্ব্বত্র!

সোমবার বৈকালে চলে এলুম কলকাতায়। দিনটা পরিষ্কার ছিল, নীল আকাশ, রৌদ্রও উঠেচে। মনে হোল ওই প্রজাপতির দলের উড়ে বেড়ানোর দিকে চেয়ে সারাদিন যদি বসে থাকি, চমৎকার গল্পের প্লট মনে আনতে পারি। এই আলো ছায়ার খেলাতেই মনের ভাব নতুন ধরনের হয়—মাটির সঙ্গে, প্রস্ফুটিত ভায়োলেট রঙের বনকলমী ফুলের শোভা বৃষ্টিধোয়া নীল আকাশের রূপে।

আজ স্কুলের ছাদ থেকে দুপুরের চনমনে রোদে দূরে আকাশের দিকে চেয়ে রবীন্দ্রনাথের গানটি মনে পড়ল—

'কেন বাজাও কাঁকন কনকন কত ছল ভরে।
ওগো, ঘরে ফিরে চল কনককলসে জল ভরে'॥

এই গানের ছত্র দুটির সঙ্গে আমার আঠার বৎসর পূর্ব্বেকার প্রথম যৌবনের জীবনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। চেয়ে চেয়ে মনে হোল বর্ষাসতেজ সবুজ গাছপালা বনঝোপে ঘেরা কোন একটি নিভৃত পল্লীভবনে তারা এখনও সব কিশোরই রয়ে গিয়েচে কত বৎসর আগের সেই এক প্রথম শরতের দিনগুলির মত। কোথায় যে তারা ছায়াছবির মত মিলিয়ে গিয়েচে রজনীর মধ্যযামে শুক্লা চতুর্থীর চাঁদ যেমন মিলিয়ে যায়, এ কথা ভুলেই গেলুম ক্ষণকালের জন্যে। পেট্রার্কের সম্বন্ধে যে কথা হয়েচে, বড় সত্যি সে কথা। 'Know that for a lofty soul death is but a release from prison, that she frightens only those who look for their whole happiness in this poor earth.' ইত্যাদি।

প্রায় ছ-বছর পরে আবার রামরাজাতলায় গিয়েছিলুম রামরাজা ঠাকুরের ভাসান দেখতে। ননীদের বাড়ি গিয়ে উঠলুম, জতু খুব খুশি হোল, জতুর মাকে দেখলুম আজ বহুকাল পরে। অনেক সব পুরোন কথা হোল। সাঁতরাগাছি গ্রাম সম্বন্ধে ননী এমন সব গল্প করলে যাতে জায়গাটার ওপরে আমার কোন শ্রদ্ধা রইল না। একজন লোকের স্ত্রী একটু পাগল মত, সে লোকটা নাকি তার স্ত্রীকে প্রায়ই এমন মারে যে দু-তিন দিন বেচারী আর উঠতে পারে না। অথচ সেই লোকটি এখানে নাকি একজন সমাজপতি! কলকাতার এত কাছে অথচ কালচার বলে কোনও জিনিস নেই এখানে, লোকে বোঝে দশটায় খেয়ে আপিসে ছোটা, আর রবিবার দিন ভাল করে বাজার করে দুপুরে ঠেসে খাওয়া। গ্রামটাও অত্যন্ত নোংরা, চারিদিকে খোলা ড্রেন, জঙ্গাল, দুর্গন্ধ, নোংরা জল গড়িয়ে চলেচে রাস্তার পাশ দিয়ে। আমি যতক্ষণ ছিলাম, দম বন্ধ হবার উপক্রম হয় আর কি।

রামরাজার মিছিল বার হবার আগে আমি আর ননী দু-জনে পথের ধারে একখানা গরুর গাড়ির ওপর গিয়ে বসলুম। প্রথমে বাক্‌সাড়া ও ব্যাতড়ের নবনারী কুঞ্জর বেরুল, সঙ্গে অনেক সঙ, কাগজের এরোপ্লেন, রাক্ষসী ইত্যাদি। পেছনে এল রামরাজার মিছিল। শেষের

মিছিলটাই বড় কিন্তু এমন কিছু দেখবার কি আছে বুঝলুম না। রাস্তার দু-পাশে, ছাদে, বারান্দায়, পথের ধারে হাজার হাজার মেয়েমানুষের ভিড়। এ মেয়েদেরই দেখবার জিনিস। ওরা আজ এখানে আসে রামরাজাতলার সিঁদুর দিতে ও মিছিল দেখতে। সব মেয়েরই কপালে অনেকটা করে সিঁদুর লেপা। ভিড়ের মধ্যে আমাদের গাঁয়ের কিশোরী কাকার ছেলে সন্তোষ আর জীবনের সঙ্গে দেখা হোল। সন্ধ্যার সময় আবার ননীদের বাড়ি ফিরে এসে চা খেলুম। আজ ৩২শে শ্রাবণ বলেই মনটা মাঝে মাঝে অনেক দূরে চলে যাচ্ছিল, অনেক দিন আগেকার এই সন্ধ্যা-গোধূলির একটা ছবি পর-পর আমার মনে আসছিল। জতু দেখলুম মনে করে রেখেচে, সে ননীকে বললে—কোন্ গানটা গাওয়া যেত না বিভূতির সামনে, মনে আছে? ননীরও মনে আছে। সে বললে—জানি ঃ 'সে মুখ কেন অহরহ মনে পড়ে' এই গানটা। আমি হাসলুম। এরা বেশ লোক। আমার জীবনের কতদিন আগেকার কথা এরা কেন মনে রেখেচে, কি দরকার এদের! বিশেষ করে জতু মেয়েটি বড় ভাল, এত স্নেহশীলা! সন্ধ্যার পরে চলে এলুম, বাসে ভয়ানক ভিড়, মল্লিকের ফটক বন্ধ, বাস্ ঘুরে এল জামতলা দিয়ে। সারাদিন পরে কলকাতার মুক্ত হাওয়ায় এসে এখন বাঁচলুম। জতু বার বার বললে—আজ রাতটা থেকে যান না, পাঁপর ভাজবো এখন। আমার থাকবার জো নেই, লেখা আছে।

বললুম—আর একদিন এসে রাত্রে থাকব।

স্পেনের বিদ্রোহ কি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করচে। বাড়াজোজ শহর বিদ্রোহীরা অধিকার করেচে, রাস্তায় রাস্তায় barricade এবং প্রত্যেক barricade-এর গায়ে মৃতদেহ স্তূপাকার হয়ে আছে, আর স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকারা মৃতদেহের স্তূপ খুঁজে নিজেদের বাপ, ভাই ছেলে স্বামীর দেহ বার করতে ব্যস্ত। মানুষ এখনও কত আদিম-যুগে পড়ে রয়েচে তা এইসব ঘটনা থেকে বোঝা যায়। জার্ম্মানিতে বিদ্রোহের সময়েও ঠিক এই ধরনের নিষ্ঠুর কাণ্ড এই সেদিন ঘটে গিয়েচে, Ernest Toller-এর বই পড়লে তা জানা যায়। মানুষের প্রতি মানুষ এমন senseless নিষ্ঠুরতার অনুষ্ঠান কি করে করতে পারে ভেবেই পাই নে।

এর মধ্যে বড় মানুষও জন্মেচে বৈকি! Ernest Toller-এর ভাষায় বলি ঃ—

In the war there lined a man among millions Karl Liebkrecht; his was the voice of truth and of freedom. Even the prison groove could not silence that voice.

এদের ideal যে কি তা বুঝি নে। স্পেনে socialist ও communist-রা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে গণতন্ত্র স্থাপন করলে, খুব ভাল কথা। এ পর্য্যন্ত বুঝি। আবার এল Fascists-এর দল, এরা বিদ্রোহ করচে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে socialist-দের শাসনের বিরুদ্ধে, কিন্তু কি ভীষণ রক্তারক্তি আর নিষ্ঠুরতার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হচ্চে, ভাবলে বর্ত্তমান সভ্যতার ওপরে মানুষের আস্থা থাকে না। দলে দলে যুদ্ধের বন্দীদের পুড়িয়ে মারচে, বিষাক্ত গ্যাস পর্য্যন্ত ব্যবহার করচে।

দার্শনিক সত্যিই বলেচে—An easily realizable ideal quickly loses its power of stimulating, nothing lets a man down with such a pump into listless disillusionment as the discovery that he has achieved all his ambition and realized all his ideals. One actually seizes the peach which turns out to be a Dead Sea fruit.

এ কথা স্বীকার করতে হবে যে কলকাতায় এবার গ্রীষ্মের ছুটির পর এসে বিশেষ করে

নানারকম অভিজ্ঞতা হচ্চে। এই অভিজ্ঞতা বিভিন্ন ধরনের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে। জীবনটাকে এভাবে দেখাও বড় দরকার বলে মনে করি। তবে পার্টিতে জীবন দেখার চেয়ে আমি যে লোকজনের বাসায় গিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সঙ্গে মিশি, ওতে আরও ভাল করে ওদের দেখা হয়, যেমন রামপ্রসাদের বাড়ি, বন্ধুদের বাড়িতে বিনুর পাগল হয়ে যাওয়া রাতের দৃশ্য, রমা যখন আমাদের কাছ থেকে চলে গেল মীরাট, তার সেই আকুল কান্নার দৃশ্য, রাজপুরে তেঁতুলের বৌয়ের অসুখের জন্যে চান্দ্রায়ণ করবার ব্যাপার ইত্যাদি।

অনেকদিন আগে কামাখ্যা ছিল ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের একজন চাঁই; থিয়েটারের সময়ে মেয়েদের পার্ট সে-ই করতো, এবং আমাদের সময়ে বেশ নামও করেছিল তাতে। কাল ইনস্টিটিউটে আর একটি ছেলেকে 'মানময়ী গার্লস স্কুলে' নীহারিকার পার্ট করতে দেখলুম--এত চমৎকার মানিয়েছিল তাকে যে কোথায় লাগে মেয়েদের। যেমন রূপসী, তেমনি কমনীয় কান্তি, তেমনি গলার সুর ও গান! হায় কামাখ্যা, তুমি এখন কোথায় তাই ভাবি! সে ভাল লেখাপড়া শেখে নি, থিয়েটার করে বেড়াতো, বোধহয় বি. এ. পাসটাও করেছিল। কোন পাড়াগাঁয়ে এতদিন ছেলেমেয়ে পরিবৃত হয়ে দাবাপাশা ও দলাদলির চর্চা করচে। এখন তার মনের সে স্ফূর্ত্তি নেই, চোখের জলুস কমেচে, চুলে পাক ধরেচে, মুখশ্রীর সে কমনীয়তা আর নেই। এখন যে নীহারিকার পার্ট করল, সে ছেলেটি সে সময়ে হয়তো ছিল তিন-চার বছরের শিশু।

'মানময়ী গার্লস স্কুল' দেখতে দেখতে হঠাৎ আজ কামাখ্যার কথা মনে পড়ল কেন কি জানি।

একদিন মাত্র কলকাতা থেকে বেরিয়েচি অমনি কি ভালই লাগচে। আজ সকালে উঠে অশোক গুপ্তের বাড়ি গেলুম, সেখান থেকে খেয়ে দুজনেই যতীশবাবুদের গাড়িতে গে স্ট্রীট দিয়ে গ্র্যান্ড রোড দিয়ে হাওড়া স্টেশনে। বসুমতীর সেই পুরোনো বাড়িটা, বাবার সঙ্গে যেখানে বাল্যে একদিন এসেছিলুম, সেটা সেই রকমই আছে। কুসুম বলে বাল্যে যে মেয়েটিকে জানতুম, এখন সে বুড়ী হয়েচে, ছেলেবেলায় আমায় তার ছেলের মত ভালবাসতো, সে থাকে কাছেই ওই বাড়িটাতে। ট্রেনে ভিড় নেই, কারণ পুজোর সময় তো আর নয়। দিব্যি আরামে বেঞ্চিতে বিছানা পেতে নিলুম। সাঁতরাগাছি স্টেশনে উঠলো কিশোর কাকার ছেলে সন্তোষ, তাকে উঠিয়ে দিতে এল জীবন। আজ দিনটা বাদলা, জোলো হাওয়া দিচ্চে। কোলাঘাটে রূপনারায়ণের কি রূপ, কূলে কূলে ভরা গৈরিক জলরাশি তীরবেগে ছুটেচে। সেই অন্তরীপ মত জায়গাটা, যেটা প্রতিবারই মনে করিয়ে দেয় পুজোর সময়, সেটা কেমন চমৎকার দেখাচ্চে। রেলের বাঁধের ধারে ঘন বনঝোপে কত কি ফুল ফুটেচে। এসব গাছের নাম জানি নে। এ অঞ্চলে গাছগুলি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, এক-মাত্র বনকলমী ফুল ছাড়া। হলদে কাপাস তুলোর গাছের বড় ফুল, ঘেঁটুকোল ফুলের মত বড় বড় ফুল, সাদা সাদা কুচো ফুল, আরও কত কি! এবার জল বেজায় বেড়েচে, সব গ্রামের বাড়িঘরের চারিধারে জল ভর্ত্তি, ডোবা, বিল, পুকুর। কোলাঘাটে গাড়ি একঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইল লাইন বন্ধ ছিল বলে। খড়্গপুর ছাড়িয়েচি, সেই সময় আবার মেঘ করে এল। ঝাড়-গ্রামে থামবার কিছু আগে সন্তোষ গ্রামের কথা উপলক্ষে বললে—গণেশ মুচির ছোট ছেলেটি মারা গিয়েচে। শুনে খুবই দুঃখিত হলুম, গণেশ বুড়ো হয়েচে, ওই ছেলেটিকে বড় ভাল-বাসতো। আর একটা খবর বললে—হরিদাদার মেয়ে কনকের বিয়ে হয়েচে এক বুড়ো বরের সঙ্গে। আরও দুঃখিত হলুম, কনক মেয়েটি বড় সুন্দরী, তার জন্যে তার বাবা ওর চেয়ে

ভাল বর জোটাতে পারলে না কেন জানি নে, কারণ তার বাবা গরীব নয়, ইচ্ছে করলে দু-পয়সা খরচ তো করতে পারতো।

এইবার ঘন মেঘ করে বৃষ্টি এল। গাড়ি এখন শালবনি ছাড়িয়ে গিড়ুনি স্টেশনে এসে পৌঁছেচে। বড় ইচ্ছে ছিল বাকুড়ি যাবো, কিন্তু যাওয়া হোল না।

সুবর্ণরেখার ধারে এসে ঘন ছায়াভরা বৈকালে শালবনের মধ্যে এক জায়গায় বসলুম। ওই দূরে সিদ্ধেশ্বর ডুংরী, যার মাথায় উঠে বনে চিঁড়ে দই খেয়েছিলুম, যার মাথায় উঠে শিলাখণ্ডে নাম লিখে রেখেছিলুম।

চারিধারে শ্যামল বনানী, প্রান্তর ধানবন, শালগাছ। ওই ওপারে প্রকাণ্ড দীর্ঘ পাহাড়-শ্রেণী। সামনে খরস্রোতা সুবর্ণরেখা, তীরে ছোট বড় শিলাখণ্ড, শাল চারার জঙ্গল। সন্ধ্যা নেমে আসচে, পাহাড়শ্রেণী নীরব, বনানী নীরব, মেঘলা, সুবর্ণরেখার কুলুকুলু শব্দ ছাড়া অন্য কোনই শব্দ নেই। গত শনিবারে এমন সময় ইছামতীর ধারে বসে আছি।

এই নিস্তব্ধ অপরাহ্নে সুবর্ণরেখার তীরে দাঁড়িয়ে পেছনের শালবনের মাথার ওধার দিয়ে পূর্বদিকে চেয়ে দেখলুম, দূরে এমনি ইছামতী নদী বয়ে যাচ্চে, বাংলাদেশের এক অখ্যাত পাড়াগাঁয়ের কোল দিয়ে। সেই নদীর ধারে একটা গাঁয়ের ঘাটে এক জায়গায় একটা বনসিমের ঘন ঝোপ নত হয়ে আছে ঘাটের পথের ওপরে। একটি মেয়ের ছবি সেই বনসিমের লতার ঝোপের তলায় চিরকাল অক্ষয় হয়ে আছে। ছবিটি মনে পড়তেই অপূর্ব আনন্দে ও মাধুর্যে এই সন্ধ্যা ভরে উঠলো, বাতাস আরও মধুর হোল।

আমার ঘরে গত জ্যৈষ্ঠমাসে একদল রামছাগল উঠে উপদ্রব করছিল, আমি হাট থেকে এসে 'দূর দূর' করে ছাগলের দল তাড়িয়ে দিলুম, সেই কথা মনে পড়লো। এই রামছাগলের দল তাড়ানোর সঙ্গে আমার সেদিনের একটা বড় মধুর ঘটনা মেশানো আছে, কেউ তা জানে না—তা আমি এখানে লিখবও না। এটুকু লিখে রাখলুম এজন্যে যে সুবর্ণরেখার তীরে দাঁড়িয়ে এই বর্ষাসন্ধ্যায় সেই ঘটনাটা আমার মনে এসেছিল।

সুপ্রভা কত দূরে আছে, তার কথাও মনে হোল এ সন্ধ্যায়। বড় ভাল মেয়ে সে, তার মতো মেয়ে কখনো দেখি নি।

এই ডায়েরীটি শেষ হয়ে গেল। আমার জীবনে এই দেড় বছর বড়ই আনন্দের। পরিপূর্ণ আনন্দের। নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত—কত নতুন বন্ধু লাভ, কত অভিজ্ঞতা। কত পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ হোল বহুদিন পরে এই দেড় বছরের মধ্যে, এই ১৯৩৬ সালে। যেমন মণিকুন্তলা তার মধ্যে একজন। ভগবানকে এজন্যে ধন্যবাদ জানাই।

কত কি পেলুম এই দেড় বছরে। সব কথা ডায়েরীতে লেখা যায় না। যা এখানে লিখলুম না, তা রইল আমার মনের গভীর গোপন তলে। কর্মহীন অবকাশ-মুহূর্তে তাদের চিন্তা আমায় আনন্দ দেবে। কত জায়গায় বসেই কত ডায়েরী লিখলুম, ভাগলপুরে, ইশ্মাইলপুর দিয়ারায়, আজমাবাদ কাছারীতে, কাশীতে, রাধামাইনুসে, নাগপুরে, কলকাতায়।